

CUK-HO 1819-8-PO11151



8

অন্ধের যষ্টি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বামিনী বায়

‘শিল্পী’ সম্পাদকের সৌজান্য

৬.৩/২৬

756.3

002/26

বঙ্গলক্ষ্মী

“নব জাগরণ-লগনে গগনে

বাজে কল্যাণ-শব্দ

এসো তুমি উষা, ওগো অকলুষা

আনো দিন নিশেধ ॥”

রবীন্দ্রনাথ

অগ্রহায়ণ,

১৩৪৮-সাল

১ম সংখ্যা

দিনান্ত

শ্রীমৎ...

বহে কাল নদী মাঝে কল্লনার তরী ;
বিচিত্র পন্থাতে ভরা কামনা সঞ্জাত,
ভেসে যায় সঙ্কল্পের বায়ু ভর করি
লক্ষ্যহীন-নামহীন উদ্দেশ্য অজ্ঞাত ।

(২)

উদ্বলিত জীবনের দিনান্ত বেলায়
মোহ-কুহেলিকা যবে দৃষ্টি করে রোধ
সঞ্চিত বোঝার ভারে তরী মগ্ন প্রায়
তুচ্ছ হয়ে আসে যত অতীতের বোধ ।

(৩)

জাগ্রত চেতনা প্রাণে থাকিতে সময়,
ত্যাগে বোঝা লঘু হোক দুর্বল বিরাট
ক্লান্তি হরা শান্তি মনে হইয়া উদয়
চন্দ্রিকা মণ্ডিত হোক ও-পারের ঘাট ।



8

বঙ্গলক্ষ্মীতে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা

অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গলক্ষ্মীর বৎসর আরম্ভ। বৎসর আরম্ভের দিনে আজ সর্বাগ্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বর্ণ স্মরণ করি। বাংলায় কোন্ মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক আছে যে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-স্বর্ণে স্বর্ণী নয়! বঙ্গলক্ষ্মীও তাঁর স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই। কত সময় অযাচিত লেখা এসে পৌঁছেছে—কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নত মস্তকে আজ সে কথা স্মরণ করি। কবির সহচর, অহুচর, পার্শ্বচর, বড়সেহের ‘বাঙালি’* সুধীরচন্দ্র কর লিখছেনঃ—

“.....গুরুদেবের কালকের লেখা, নূতন একটি কবিতা বঙ্গলক্ষ্মীর জন্ত (এ মাসের) পাঠালাম—গুরুদেবেরই ইচ্ছায়। পেয়েই যদি সে খবর জানান তো গুরুদেব খুসি হবেন।”

এ স্নেহ বঙ্গলক্ষ্মীকে আর কে করবে, গভীর বেদনায় সে কথা আজ স্মরণ করি।

কালিম্পং থেকে চল্লিশ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে পীড়িত কবি অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় এসে পৌঁছলেন বাড়ীতে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত, অপরিচিত সকলে উৎকণ্ঠায় অধীর, কি জানি কি হয় ভেবে। দিন কাটে,—দারুণ সংকটের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে আসতে লাগল কবির দেহে মনে। যদিও দুর্বলতায় দেহ মন আচ্ছন্ন তখনো, তবু কবিতার দু’একটি ছত্র আসতে লাগল মুখে, ক্ষীণ কণ্ঠে কবি উচ্চারণ করলেন সেই ছত্রগুলি, লিখে নিল যারা পাশে ছিল।

প্রথম কবিতা ছুটি একদিনে লেখা; একটি দিলেন প্রবাসীকে, একটি বললেন “বঙ্গলক্ষ্মীর জন্ত।” স্নেহাস্পদ অনিল চন্দ্র শুনে বললেন, “দেখলেন বড় মা, গুরুদেবের টান দেখলেন বঙ্গলক্ষ্মীর উপর, আগেই মনে পড়েছে বঙ্গলক্ষ্মীকে।”

আমি কাছে যেতেই কবি বললেন,—“তোমার বঙ্গলক্ষ্মীর জন্ত একটা কবিতা দিয়েছি, পেয়েছ-তো?”

—বললুম—না, পাইনি এখনো!

—পাবে এখনি!

বলতে বলতেই কবিতাটি আমার হাতে এসে পৌঁড়ে দেখে বললুম—বেশ, কিন্তু নাম নেই য।

—আর কি নাম হবে—লিখে দাও “মশক-মঙ্গল গীতি” বলেই বললেন—এটা রাবিশ।

বললুম—বলবেন না ও কথা। ওই খুব ভাল। যেখানে মজবুত করতে হলে অনেক রাবিশ ঢালতে হয়, ফেলনা জিনিষ নয়। আমি ঐ নেব।

ঠোটার আগায় হাসি এনে কবি বললেন—নাও বাপু একদিন কবিকে দেখে ফিরে আসছি—কবি তখন স্বস্থ হয়েছেন, আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন, আমার চার ছত্রের একটি কবিতা এসে পৌঁছল—কবি দিও বঙ্গলক্ষ্মীর জন্ত শুনলুম। কবিতাটি হাতে নিয়ে কাঁছে বললুম,—এটিরও যে নাম নেই।

কবি একটু থেমে বললেন—বেদানা—নাম দাও বেদনা বলে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি নাট-নাট দিকে হেলিয়ে বললেন—এই এঁদের উপর লেখা।? দেখতে এঁরা কত যেন শক্ত, কিন্তু ভিতরে রস আছে নিংড়লে পাওয়া যায় প্রচুর। বলেই বললেন—ব্যা! বঙ্গলক্ষ্মীতে দিও—নতুবা কেউ বুঝতেই পারবে না, কিসের জন্ত লেখা।

—ত ই হবে—ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে দেখিয়ে নিলুম—হয়েছে, বললুম।

স্বস্থ হয়ে কবি গেলেন শান্তিনিকেতনে। সেখান থেকেই লেখা পাঠিয়েছেন সুধীরচন্দ্রের মারফৎ—“তুই না ‘উন্টা পাণ্টা’, পেয়ে বঙ্গলক্ষ্মী কৃতার্থ হয়েছে।

বঙ্গলক্ষ্মীতে তাঁর প্রথম দান অতুলনীর। আজ সেই দান-মাথায় নিয়ে লোক সমক্ষে দাঁড়াচ্ছে। উরা-কবি সহস্র গানে, সহস্র কবিতায় উষা-প্রীতি প্রকাশ গেছেন নূতনভাবে, নূতন ভাষায়, নূতন নূতন করে।

“প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি,

তাই ভোরে উঠেছি...”

রোর আকাশ রাঙা হোল

পথ হোল স্বন্দর”

যার শুভ্রতায় কবির চিত্ত যেন ধ্যামময় হয়ে উঠত।

বাঙলার কণ্ঠাদের উষার সঙ্গে তুলনা করে কবি বলে

—তোমরা উষার মত শুভ্র হও, পবিত্র হও, নিশ্চল হও

ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াও উষা মুর্তিতে, নূতন দৃষ্টি এনে দাও

পৃথিবীর চোখে।

বাঙলার নারী-জাগরণকে তিনি বঙ্গলক্ষ্মী মায়কং প্রেরণা
রয়েছেন—

নব জাগরণ-লগনে গগনে

বাজে কল্যাণ-শঙ্খ।

এসো তুমি-উষা, ওগো অকলুষা

আনো দিন নিঃশঙ্ক ॥

ছালোক ভাসানো আলোক সুধায়

অভিষেক তুমি কর বসুধায়

নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার

এনে দাও অকলঙ্ক ॥

দীপ্তপানে নব যুগ আজি মেলুক উদার চিত্র,

অমৃতলোকের দ্বার খুলে দিন চিরজীবনের মিত্র।

বিশ্বের পথে আসিরাছে ডাক

যাত্রীরা সবে যাক্ ধৈর্যে যাক্,

দেহ মন হতে হোক অপগত অবসাদ অপবিত্র ॥

মৌন যে ছিল বক্ষে তাহার বাজুক বীণার তন্ত্র।

নব বিশ্বাসে আশ্বাসহীন শুভ্রক বিজয়মন্ত্র।

এস আনন্দ হৃৎক হরণ

হৃৎকথেরে দাও করিতে বরণ,

মরণ-তোরণ পার হয়ে পাই অমর প্রাণের পন্থ ॥

কল্যাণী, তব অঙ্গনে আজি হবে মঙ্গল কৰ্ম,

শুভ সংগ্রামে যে যাবে তাহারে পরাও বীরের বর্ষ।

বলো সবে ডাকি, “ছাড়ো সংশয়,”

বলো যাত্রীয়ে, “হয়েছে সময়,”

বলো “নাহি ভয়,” বলো, “জয় জয়, জয়ী যেন হয় ধর্ম ॥”

পশ্চাৎপানে ফিরায়ে ডেকোনা, মনে জাগায়োনা দ্বন্দ্ব।

হৃৎকল শোকে অশ্রুসলিলে নয়ন করোনা অন্ধ।

সঙ্কট মাঝে ছুটিবার কালে

বাঁধিয়া রেখোনা আবেশের জালে,

যে-চরণ বাঁধা লজ্জিবে, তাহে জড়ায়োনা মোহবন্ধ ॥



কবির পত্র

বিশ্বভারতী-অনুমোদিত

কল্যাণীয়াসু

কমল, তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড়ো খুসী হলুম। অনেক খুঁজে দেখলুম একটাও বানানের ভুল কিংবা ব্যাকরণের গলদ খুঁজে পাওয়া গেল না, একেবারে বিমুগ্ধ গৌড়ীয় ভাষায় লিখেচ। আমাকে চিঠি লেখবার সময় ভয়ে ভয়ে ভাষা খুঁজে সময় নষ্ট করে না—যে-বাণী তোমার রসনায় আপনিই অধিষ্ঠিত সেই হলো খাঁটি বঙ্গবাণী তাতে কোন সন্দেহ নেই। খবরের কাগজে ও তোমার চিঠিতে মায়াবী খেলার অভিনয়ের খবর পেয়ে সাধারণের জন্ম খুসি ও নিজের জন্ম দুঃখিত হলুম। ওর মধ্যে একটা সাস্থ্যের বিষয়ও আছে—তুমি খবর দিয়েচ আমার স্বজাতীয় দর্শকদের অনেকেরই চিত্ত বিচলিত হয়েছে সেই বিপদ থেকে এবারকার মতো অন্ততঃ আমার উদ্ধার হল। তুমি তো জানোই আত্ম-রক্ষার উপযুক্ত মনের জোর আমার একটুও নেই,—স্বভাবতঃ দুর্বল পুরুষজাতির মধ্যে আমি দুর্বলতম। ভুক্তমণ্ডলের আন্দোলনকে আমি বড়ো ভয় করি কেননা তাতে বুকের মধ্যে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাতে মনের শান্তি ভঙ্গ হয়ে থাকে। কিন্তু খোঁড়ার পা খানায় পড়ে। যে দেশে এসে পৌঁছেছি এখানে ভুক্ত মণ্ডলের আন্দোলন থামেই না, একেবারে সাইক্লোন চলেচে; হৃদয়ের মধ্যে সামান্য সামান্য রব উঠল, হালে পানি মিলচে না—এই বিপদের সময় যাদের স্মরণ করে অনেকটা রক্ষা পাই তাদের নাম করতে চাই নে, করলে পরে তোমার মনে অহঙ্কার হতে পারে, সেটা ভাল নয়। যাই বলা, এখানকার মেয়েরা নাচতে জানে, পুরুষেরাও নাচে—অপর পক্ষ তাদের নাচায় বলেই যে নাচে তা নয় তারা নিজের পদের ঝোঁকেই নেচে বেড়ায়। আমার মনে কেবল দুঃখ হয় বৌমা দেখতে পেলেন না। তিনি দেখলে অনেক ভাল জিনিষ এখান থেকে নিয়ে যেতে পারতেন, ভবিষ্যতে মায়াবী খেলাতে আরো মায়াবী ঘোর লাগত। এখানে যা দেখলুম তা নকল করা সহজ নয়; শিশুকাল থেকে মেয়েরা শেখে, অন্ততঃ পাঁচ ছ' বছর লাগে পাকা হতে। নেচে নেচে

ওদের শরীর এমন আঁট ছিপছিপে হয়ে থাকে যে মনে যেন অঙ্গ ওদের নাচের ছাঁচে ঢালা। স্নাকরা তার হাত দিয়ে ঠুকেঠুকে সোনার গয়নাকে সুন্দর করে গড়ে তো—নৃত্য সঙ্গীতের তাল তেমনি হাতুড়ির ঠুকঠাক দিয়ে শরীরকে সুডোল এবং নিবিড় করে তুলেছে। আ বিদেশের পালা প্রায় শেষ হল। পাড়ি দিতে আর দিন আছে। পথের মধ্যে হয়ত বা দুটো একটা জায়গায় দুটা দিন করে দেরী হতে পারে কিন্তু নিশ্চয় জেনো উত্তলা অনেক আগেই তোমাদের আঙিনায় গিয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবস্থা কি রকম? তার মনটা ফুলঝুরির মত পড়ল না কি? যা হোক ব্যস্ত আছি। এখনকার আসি—দেখা হলে অনেক কথা বলবার আছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু

কিরণ, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসী আমি জানি তোমাকে যখন যে কাজের ভার দিয়ে অসঙ্কোচে তা গ্রহণ করেছে ও সযত্নে পালন করেছে। একান্ত এই ইচ্ছে পাঠভবনকে নিতান্তই তোমাদের জিনিষ মনে করে স্নেহ ও সতর্কতার সঙ্গে একে পালন আমি চলে যাচ্ছি বলেই তোমাদের দায়িত্ব আরো তোমরা সব মেয়েরা কোনো একটি সজ্জ বৈধে সম্মি বিদ্যালয়ের সঙ্গে যদি যুক্ত হতে পার তাহলেও শ্রী ও শক্তিলভ করবে, সন্দেহ নেই। মেয়েদের গুণভূতি কাজ শেখাতে পারলে ভালোই হবে। মেয়েরা যেন বাসে বেশে পারিপাট্য সাধনের অভ্যাস এইটে দেখা বিশেষ দরকার। যে কোনো জায়গাতে থাকে সে যাগগা উজ্জল ও সুন্দর হওয়া চাই।

কালো ঘোঁটে হবে। অত্যন্ত ব্যস্ত। লোকজন এসেও
উৎপাৎ করতে। বিশ্রাম আস্তে।
ফিরে এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ইতি ২৫শে
ফেব্রুয়ারী ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

না হলে আমার স্বপ্নাবশিষ্ট আয়ুকে ভারাক্রান্ত করতে পারি
নে। নিকটে দুই একজন হিতৈষী আছেন যাদের তরুণ
স্বপ্নে আমার চিঠির বোঝা অর্পণ করতে বাধ্য হয়েছি।
তোমরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো এবং এই কামনা
করো, দীর্ঘ কল্পদিনের অন্তে আমার বিশ্রাম যেন অব্যাহত হয়।
ইতি—২৩শে অক্টোবর ১৯৩৫

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

UTTARAYAN
Santiniketon

কল্যাণীয়াসু

এক সময় ছিল যখন চিঠি মাত্রেরই উত্তর দিই বলে সুনাম
অর্জন করেছি। সেই সুনাম রক্ষা করবার দিন ফুরিয়েছে।
কেমনা ওটা একটা বোঝা যা বহন করবার শক্তি আমার নেই।
নিরবচ্ছিন্ন কুঁড়েমি করব বলে কোমর বেঁধেছি, আমার আশা
ছেড়ে দাও। যাবার সময় এই বদনাম নিয়ে যাব যে আমি
চিঠির উত্তর দিই নে—এ সম্বন্ধে নালিশ রুজু করো যখন
তোমারও বয়স ৭৫ হবে। হাতে সময় অল্প, শক্তিও কম অথচ
এখনো কাজ বিশেষ কমেনি—তাই চিঠিপত্র নিত্যন্ত জরুরী

কল্যাণীয়াসু

তোমরা দুজনে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। রচনা
করা যার কাজ, সঙ্কলন করা তার পক্ষে প্রমাদ। ভুল করতে
করতে শিক্ষা হয়—আশা করি ভবিষ্যতে সতর্ক হব।
হাসিরাশির কথা নিরাময় হোক, এই কামনা করি।
ইতি—১৩।১০।৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূজ্যপাদ কবির কোতুকপ্রিয়তা লোকপ্রসিদ্ধ। নাতি, নাতিনী, নাতি-বৌদের সঙ্গে কোতুকপ্রদ রসালোপে আসর
জমাতেন তিনি কথায় কথায়। ১। স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কমলা দেবীকে লেখা পত্রখানি তার নিদর্শন।

২। পত্রখানি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী কিরণবালা সেনকে লিখিত।

৩। পত্র দুখানি শ্রীযুক্তা প্রভাবতা দেবী সরস্বতীকে লিখিত।

হিন্দোলিত

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

চ-চঅং।...লেবরেটরীর পেটা ঘড়িতে রাত্রি ন'টা বাজল। বারান্দা মুখরিত করে শিক্ষানবীশের শেষ দল চলে গেল। তাপস তার ঘরে একলা। বড় বড় গোটা কতক তেজী আলো ঘরটাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করেছে। পাশের ঘরে ঘনঘনে আওয়াজ; তার কাজ চলছে তখনও। হুইচ'টা বন্ধ করে সে এসে চেয়ারে বসল। দিবসের যত ক্লান্তি তাকে ঘিরে ফেললে। ওদিকে জলের বাটির উপরে কাঁচের পাত্রে কি যেন সিদ্ধ হচ্ছে। সারা ঘরটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে। সে এসে একবার বারান্দায় দাঁড়াল। অলিন্দের ফাঁকে এক টুকরো ধূসর আকাশ দেখা যাচ্ছে। অক্ষুট, অর্ধক্ষুট দু' একটি তারা। সামনের নারকল গাছ-গুলো অর্ধমৃত পাংশুল হ'য়ে দাঁড়িয়ে, তাদের মাথায় বাতাসের শিরশিরানি।

কাছে ঘড়িতে দেখলে দশটা বেজেছে। পাঁচ ঘণ্টা হ'ল রাসায়নিক মিশ্রণ সিদ্ধ করা; গ্যাসের কল বন্ধ করলে তাপস। কেমন যেন অবসাদ লাগছে তার; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে এমনি ভাবে, এই ঘরে, রসায়নের বিচিত্র গন্ধপূর্ণ বায়ু গ্রহণ করে। কাঁচের পাত্রের উপরে আলোক বিকীরিত হ'য়ে চক্চক্ করছে। তাপস চেয়ারে বসে দেখেছে। আজ সন্ধ্যায় যে ক্লাবের টুর্নামেন্ট খেলা দেখতে যাবার কথা ছিল। তাই ত, অজিতই বা কি ভাববে! আর কি ক'রেই বা যেতুম, পাঁচ ঘণ্টা পুরো সিদ্ধ করা না হ'লে ত আর যাওয়া চলত না। না, যাওয়া কিছুতেই হ'ত না, যেন থাকত না।

ভবানীপুর ক্লাবের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের শেষ খেলার পরে যে যার বাড়ী চলে গেছে। হুঁচকারজন ক্লাবের সভ্য এখনও রয়েছেন। সদ্য শেষ-হওয়া খেলার সমালোচনা করছেন তাঁরা। সোমেন বলে, “কি হে অজিত, তাপস এল না যে?”

আসবে ত বলেছিল। রাস্তার মোড় বাসের অঙ্গ অপেক্ষা করছিল, আজ সকালে দেখা। অনেক করে ত বলেছিলুম।

—ওর কি হয়েছে বল ত? এতো খেলাধুলা ভালবাসত, ও কি সব ছেড়ে দিল?

—হবে আর কি, রিসার্চ করছে।...ব্যস্ত থাকে।

—রিসার্চ করছে ত কি হয়েছে? তাই বলে কি সমাজের বার হয়ে যাবে না কি? সারাদিন ঐ লেবরেটরীতে পড়ে থাকবে?

—তা' দেখ, যা'ই ভাল করে শিখতে যাই না কেন, তা'তে মনঃ সংযোগ না করলে কি হয়? ব্যাডমিন্টন খেলা যে ভাল করে শিখতে চাইছে তাকেও ত দিন বার চোদ্দ গেম একভাবে খেলে যেতে হচ্ছে, তারপর খেলার সম্বন্ধে বই পড়া, র‍্যাকেট ঘোরানোর কায়দা, মারার কসরৎ—এও ত সব কত অভ্যাস করে তবে আয়ত্ত করা যায়। আর বিজ্ঞানের গবেষণা, সে ত আরও শক্ত জিনিষ।

—অমন ভাল খেলত! খানিকটা মন লাগিয়ে থাকলে ওই চ্যাম্পিয়ন হ'ত।

—আরে বাপু, ও এখন বড় কাছে মন লাগিয়েছে। যৌগিক পদার্থের অণুর গঠনের বিষয় কাজ করছে।

ঘরের সব আলোগুলো নিভে যেতেই সমস্ত অন্ধকারটা ঝপ করে ঘরে এসে পড়ল। তাপস দাঁড়িয়েছে রাস্তার ওপারে বাসের অপেক্ষায়। রাত্রি প্রায়-এগারটা। গ্যাসের আলো সব মিটমিট করছে। রাস্তা অনেক চওড়া দেখাচ্ছে।

তাই ত, অজিত বার বার অনুরোধ করে ক্লাবে যেতে, যাওয়া হয় না। এবার দেখা হ'লে কি যে বলব। হয়ত ভাবছে ওদের সঙ্গে আমি বর্জন করছি।

বাস এসে দাঁড়াল, খালি একেবারে। একটা কোণ

নিম্নে এলিয়ে বসল তাপস। কাল সকালে এসে দেখতে হবে পদার্থটা তৈরী হ'ল কি না। রংটাও বদলাল, মেশাতে না মেশাতেই গরমও হ'য়ে উঠেছিল; হয়ত হ'য়েছে। কাল সকালে ওটাকে বার দুই চোলাই করে নিতে হবে। হওয়া ত উচিত। একবার লাইব্রেরীতেও যাওয়া দরকার। পড়ে নিতে হবে ভাল করে ওর ছবি তোলার প্রণালীটা। ও, কাল আবার রবিবার। অনিতার কাছে যাবার কথা যে! সে ত সেই বিকেলে।

পরের দিন সকাল সাড়ে আটটা। তাপস ঢুকল ঘরে। জামা খুলে, লেবরেটরীর ময়লা কোট পরে নিল। ছিপি বেছে ফুটো করলে। পরিস্কার করা, শুকানো কাঁচের পাত্রে তার তৈরী করা যৌগিক পদার্থ চোলাই করার ব্যবস্থা করলে। বায়ু নিষ্কাশন করার পাম্পের স্বর বদলে এল। খুব ভাল ভ্যাকুয়াম হয়েছে। তাপসের হাতে জলন্ত গ্যাসের শিখা বিচিত্র ভাবে পাত্রের গায়ে খেলতে লাগল। তরল পদার্থটা কৈপে কৈপে উঠছে; থার্মোমিটারের পারদের বাঁধে উচ্ছলিত পদার্থ মাঝে মাঝে লেগে যাচ্ছে। এইবার পারদের স্তম্ভ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাপসের হাত সাবধানে ঘুরছে। ফোঁটা ফোঁটা চকচকে তরল পদার্থ কাঁচের পাত্রে পড়ছে। দশ ফোঁটা, বার ফোঁটা... কতটুকুই বা! থার্মোমিটারের পারাটা আরও উর্দ্ধে চৌ চৌ করে উঠছে। সে গ্যাস-শিখা সরিয়ে নিলে। চোলাই করার যন্ত্রটার ভিতরে কল ঘুরিয়ে বায়ু প্রবেশ করালে। ঘরটা শুক, থমথমে হ'য়ে উঠল। চোলাই করা তরল জিনিষটা ওজন করে দেখলে। যতটা সে আশা করেছিল তৈরী হবে, তার সিকি পরিমাণ তৈরী হ'য়েছে। তার মুখ গভীর, দৃঢ় হ'য়ে এল।

বেলা বারটা বেজে গেছে। লেবরেটরীর বেয়ারাকে কিছু খাবার আনতে বলে, সে চেয়ারে চেপে বসল। এত কম পরিমাণ হল কেন? জিনিষ দুটো মেশাবার সময় বড্ড গরম হ'য়ে উঠেছিল। এবারে বরফে জিনিষ দুটোকে ঠাণ্ডা করে মেশাতে হবে।

খাবার এল। বেয়ারা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিলে। তাপস বললে, দাঁড়া, আসনে। ডেস্ক থেকে পোষ্ট কার্ড টেনে অনিতাকে লিখলে, তোমার হাতের পান্ডিয়া আজ আমার খাওয়া হল না। এবার একদিন হঠাৎ গিয়ে চমকে দেব তোমায়। কবে তা জানিনি।

পেট ঠাণ্ডা করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করে যখন

সে কাঁচের পাত্র আবার পাঁচ ঘণ্টা সিঁক করার জন্তে গরম জলের বাটির উপরে বসালে তখন সন্ধ্যা ছাঁটা বেজে গেছে। সামনের বাড়ীর উনানের ধূয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে লম্বা হ'য়ে তাপসের ঘরে ঢুকছে, সে দরজা বন্ধ করে দিলে। প্রাথমিক সন্ধ্যার আগমনী ঘোষণা করলে।

কাঁচের পাত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিঃশব্দে চলেছে। তাপস একবার পাত্রটা দেখে এসে বসল। আলমারী থেকে একটা মোটা রাসায়নিক পত্রিকা পেড়ে ওলটালে। গেলেই হত অনিতার কাছে। কাল একটু সকাল সকাল এসে ফোটাতে শুরু করলে হত। এখন ত সাতটা; সেখানে পৌঁছতে আটটা, সময় আছে। সে চেয়ার ছেড়ে উঠল। একবার ফুটন্ত কাঁচের পাত্রটার কাছে গেল। পূর্বের মতনই নিঃশব্দে ফুটে চলেছে। তার চিন্তা রূপ নিচ্ছে পাত্রের ভিতর, তার কল্পনায় ক্ষুণ্ণ লিঙ্গিত পরমাণুর বন্ধনকে সে সত্য প্রমাণ করবে। দেখতে, সফল ধারায় কলের জল কাঁচের জল বেয়ে উঠে, রবারের নল দিয়ে সমান ভাবে নেমে আসছে। গ্যাসের শিখাটা বাটির তলায় চ্যাপটা হ'য়ে জলছে। হাতটা তার গ্যাসকলের মাথার কাছে এগিয়ে গেল; না : থাকা! আজ যদি সিঁক করা শেষ হ'য়ে যায়, কালই তা' হ'লে চোলাই করে ছবি তোলার ব্যবস্থা করা যাবে। ছবি তুলতে দিয়ে বরং যাওয়া যাবে। বেচারী বড় অভিমानी, সেবারে অমনি সময়মত যাই নি; চোখ দুটো টসটসে হ'য়ে উঠেছিল।

যন্ত্রের কাছে থানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাপস আবার ফিরে এসে বসল চেয়ারে। আটটা বাজে। চেয়ার ছেড়ে উঠল, বেয়ারার খোঁজ করলে। সে ঘরে চলে গেছে। দাবোয়ানকে এক পেয়ালা চা আনতে বলে এল। পাখা জোর করে চালিয়ে দিয়ে এলিয়ে বসল চেয়ারে। কবেই বা কাজ শেষ হবে! গবেষণার কি অন্ত আছে। এক প্রবলেমের নিরাকরণ করতে করতে আর এক প্রবলেম এসে পড়ে। অনিতাকে আর কতদিন অপেক্ষা করতে বলাব। চার ঘণ্টা ত কেটে গেল। এই কাজটা শেষ করে, পেপার প্রকাশ করার ব্যবস্থা করি, দেখি তারপর কি হয়।

তাপসের স্থখর অন্তর নিখর হ'য়ে এল। সিগারেট ধরালে, টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে শিথিল হ'য়ে বসলে। তার মুখের কোঁচগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সিগারেটের কোঁকড়ান ধোঁয়ার অদ্ভুত অদ্ভুত সচল ছবি আঁকা দেখতে লাগল তাপস পলকবিহীন চোখে।

ব্যথার শেষ

পূর্বাহ্ন

শ্রীহীরালাল সরকার

১১ম অধ্যায়

পাঠক পাঠিকাগণের বোধ হয় মনে আছে কি অবস্থায় অর্চনার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, পুকুর পাড়ে থান পরিহিত অপরিদ্রব ব্যাভরা প্রাণে এলো মাথায় কলসি কক্ষে। আজ প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, অর্চনা বিধবা, বৈধবোর পর সেই যে স্বস্তুর গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে আর সেখানে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। উভয় পক্ষই নীরব কোন পক্ষই আর কাহারও খোঁজ লইবার আবশ্যকতা বোধ করে নাই। হিন্দু বিধবা সমাজের গলগ্রহ তাহার ভার কে নেয়? কে তাহার তালাম করে বিনা পয়সায় ঝিরের প্রয়োজন ব্যতীত? পুত্রসন্তান বিহীন নিঃসহায় বিধবাগণকেই এ কারণেই বাধ্য হইয়া স্বামীর ঘর পরিত্যাগ করিয়া পিতা বা ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখানে আসিয়া যে তাহার মূখে শান্তিতে কালাতিপাত করে তাহা যেন কেহ মনে না করেন। দিবানিশি মনের যে আশুনে তাহার দন্ধ হয় সে কথা কাহারো অবদিত নাই। দিবারাত্রি হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এক বেলা এক মুঠা আতপান জুটিয়া যায় মাত্র। মানুষকে এইরূপে নিঃসহায় করিয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে পুড়িয়া মারাই নাকি আমাদের ধর্ম, তাহাই নাকি গৌরবের। প্রাচুর্যের মধ্যে ঘেরিয়া গোজাতির ছায় মুখুটিয়া দিয়া সংঘম শিক্ষার ইহাই আমাদের প্রকৃষ্ট উপায় বটে।

মানুষকে পাড়ন করাই যদি ধর্মের অঙ্গ হয় তাহা হইলে একটু করিয়া মুসলমানের মুগি পোষার ছায় না মারিয়া হিন্দুর পাঠা কাটার ছায় কর না কেন? তাহাতে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এমনি করিয়া তাহাদিগকে জলিয়া পুড়িয়া ছটকট করিতে হয় না—তোমাদেরও বোঝার লাঘব হয়, তাহাদেরও নিষ্কৃতি লাভ হয়।

যৌবনে একাহারী হইলে যেমন হয় এই দুই বৎসরে অর্চনারও তেমন পরিবর্তন ঘটয়াছে। শরীর জীর্ণ শীর্ণ রোগা হইয়া পড়িয়াছে—মস্তিষ্কে তৈল না দেওয়ায় কেশ কৃষ্ণ, কথা সে প্রায়ই বলে না, পাড়ায় যাতায়াতও বন্ধ করিয়াছে, সময়ে সময়ে শুধু রাণাদের বাড়ী, সেও একান্ত অনুরোধে। অধিকাংশ

সময়ই গৃহকাণ্ড লইয়া পড়িয়া থাকে। কুরসং পাইলে নিজ মনে পুস্তকাদি পাঠ করে, দিন তাহার এইরূপেই কাটিতেছিল। পাড়ার মুরকি ও নেতা হরিনারায়ণ ঘোষ। বরিশালের অন্তঃ-কুলীন বলিয়া তিনি গর্বিত। তিনি স্বস্তুর গৃহে ঘর জামাই রূপে গৃহদেবতা। বহুকাল এ গ্রামে বসবাস করিতেছেন—পিতৃগৃহ এখনও আছে কি না আমরা অবগত নহি কিন্তু তিনি এখন ইদিলপুরেরই বাসিন্দা। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, দেহখানা কাল চকচকে, লম্বা ও বলিষ্ঠ। তিনিই এখন এই গ্রামের নেতা এবং প্রতিদিন খড়ম পায়ে সমস্ত পাড়াখানা চষিয়া বেড়ান। জাল, জুয়াচারি, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিছুতেই তিনি পশ্চাৎপদ নন—অবশ্য সবই গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

বহু দিন এই গ্রামে বাস করিয়া এবং সমস্ত খুটিনাটিতে যোগদান করিয়া হরি ঘোষ হইয়াছেন সমাজপতি। তাহার কাছে কারও টু শব্দটি ও করিবার জো নেই। কাহার মেয়ে কাকে কবে কাহার দিকে তাকিয়াছিল, কাহার পুত্রবধূ কখন দেবরের সহিত হাসিয়া কথা বলিয়াছিল; কে কাহার হুকায় তামাক খাইয়া জাত হারাইল, কোন মেয়ে ঘাটে বাইরা চোখ তুলিয়া পাড়ার কোন ছেলের সহিত কথা বলিল, কে কোন জাতির মড়া পোড়াইল, কোন ছেলে কার বাড়ী বেশী ষাতায়াত করে, কেন করে ইত্যাদি বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন—তাঁহার চিন্তার বিরাম নাই, সমাজের উন্নতির জন্ত শাস্ত্র রক্ষার জন্ত এবং পূর্বপুরুষদের মান, বশ জিয়াইয়া রাখিতে তিনি তৎপর।

স্বস্তুরের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহাতেই সংসার যাত্রা নির্বাহ হয়। ঘেটুকু বাকী থাকে সদর কোর্টে সাক্ষ্য দান দ্বারা উপার্জন হয়। ইদানীং এক সরল নাবালক ছেলেকে ঠকাইয়া এবং জাল করিয়া তাহার সম্পত্তি নিজ নামে খরিদ করিয়া লইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামের বিচার করিয়াও দু পয়সা আয় ছিল। সমস্ত গ্রামখানা যে দিন রাত চষিয়া বেড়ায় সে কি বিনা লাভে না বিনা কাজে? কেননা কোন ছুতায় কাহার নামে একটা কিছু রটাইয়া দিতে পারিলেই ত' তাঁহার দু পয়সা রোজগার।

তাঁর এক বিশ্বাসী শাগরেত ছিল। নাম পুলিন গোয়াল।

পুলিন ছিল হরি ঘোষের চাবি কাঠি। তাহার অবিদিত কিছুই ছিল না কিন্তু প্রাণান্তেও কিছু প্রকাশ করিত না। হরি ঘোষের সহিত পুলিনের মিশামিশী কিন্তু স্ত্রী মোটেই ভাল চক্ষে দেখিত না। এই লোকটির প্রতি তাহার ঘৃণা যেন লাগিয়াই ছিল। কোনরূপেই সে ইহা পরিবর্তন করিতে পারে নাই।

একদিন পুলিন বাড়ী ছিল না, হরি ঘোষ তাহার বাড়ীর নিকটে আসিয়া ডাকিল—পুলিন, পুলিন, পুলিন বাড়ী আছ? পুলিন তাহার এক আত্মীর বাড়ী গিয়াছিল, তাহার স্ত্রী একখানা আসন আনিয়া তাহাকে বসিতে দিল এবং স্বামীর ভয়ে প্রণামও করিল। ঘোষ “থাক থাক” বলিয়া উহাকে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল। পরে অনেক কথাবার্তার ছলে নাত-বো...কেমন?—বলিয়া এইরূপ কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিল যাহা কোন ভদ্রলোকের বলা দূরে থাকুক ভারিও অত্যাচার। বেচারী ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল ঘরের এক কোণে, লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া গেল। তখন তার বয়সও বেশী নয়—গোটা ত্রিশ হইতে পারে—নাম তাহার সোনামণি। ঘোষের সঙ্গে পুলিনের ভয়ে অল্প অল্প কথা বলিত। না বলিলে পুলিন রাগ করিত এমন কি অনেক দিন মারধরও করিয়াছে। ঘোষের এই কুৎসিৎ কথাবার্তার সোনা অনেকদিন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল—তখন তাহাকে উঠাইবার উদ্দেশে ধীরে ধীরে বলিল—এখনও যখন আসছে না তখন কখন আসিবে ঠিক কি? আপনি যান আসিলেই আমি পাঠাইয়া দিব। কেন? তোর কি অসুবিধা হচ্ছে রে সোনা—আমি থাকাতে? যদি তাই হয় তবে উঠি। অনেক হেঁটে এলাম, মনে করলাম পুলিনের বাড়ী বসে গাটা একটু জুড়াই, তাই এসে রসেছিলাম। তা তোর যখন অসুবিধা হচ্ছে তখন...একথায় লজ্জা পাইয়া সোনা জিহ্বা কাটিয়া বলিল—না না তা কেন? আমি বলছি কি আপনার হয়ত অনেক কাজ আছে, তার আশায় আপনি কতক্ষণ বসে থাকবেন, আপনার হয়তো ক্ষতি হবে। কাজ না থাকে তো বসুন না—বলিয়া সে একখানা ময়লা পাখা আনিয়া ঘোষ মহাশয়কে বাতাস করিতে লাগিল। হরিঘোষ—না কাজ আর নেই, সব সেরেস্তরে তোদের বাড়ী এলাম। বেশ বেশ একটু বাতাস কর, আর একছিলুম তামাক দে। সেই আমার কয়েতের তকোটায় দিস কিন্তু, আবার জাত না যায়। এই বলিয়া সে

হরি হে বলিয়া একটা দীর্ঘ হাই তুলিয়া তিন তিনবার ভুড়ি দিল। সোনামণি কোন কথার উত্তর না দিয়া তামাক আনিয়া দিল। ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল এবং বিরক্তিতে মুখ থানা যেন তার কালো হইয়া বাইতেছিল।

এ কথা সেকথার পর হরি ঘোষ বলিল, সোনা কাছে আর—লজ্জা কি? তুই যে আমার নাত বো—আয়না বলিয়া সে হাত বাড়াইল—

যথার্থভিত্তি নিজেকে রক্ষা করিয়া সোনামণি সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দেখ ঘোষ ঠাকুর এসব ভাল নয়, ইয়ারকি করোনা বলছি। তুমি ভাব আমরা ছোট লোক আমাদের মান ইজ্জত নেই—ভদ্রলোক হয়ে পরস্পর গায়ে হাত দিতে চাও, তোমার লজ্জা করে না? তুমি যাও আবার বিচার করতে, তোমার কথা যদি গিয়ে বলি, কেমন হয়? কিন্তু একথায় হরিঘোষ ভুলবার পাত্র নয়, তার গায়ে তখন যে চেউ খেলিতেছিল কেমন করিয়া সে তাহা ছাড়াবে,—বলিল—নে নে মাগী বেশী বকিস নে। এদিকে আর বলছি, তোর মত অনেক সত্য আমি দেখেছি, এই হরি ঘোষ কি বা করেনি আর কি বা দেখেনি। জানে পুলিন জিজ্ঞেস করিস তাকে, এখন বা বলি শোন—আমার কাছে আর বলছি! বলিয়া যেই সে তাহাকে ধরিতে বাইবে সোনাও তেমনি এক ঝাঁটা দিয়া, সপালপ তাহার মাথায় মুখে মারিয়া আত্ম সম্মান রক্ষা করিল।—তাহার চোখ তখন জ্বাফুলের মতন রাঙ্গা—চুল এলোমেলো—হাতে ঝাঁটা, যেন রণচণ্ডী—সে চীৎকার করিয়া বলিল—বের হ এখনই ইতর পাজী বেটা নিজের মা বোন নাই—যা সেখানে। আর আর আমুক ঐ ব্যাটা পাজী ছুঁচো—হয় ও এই বাড়ী থাকবে নয় আমি থাকবো।

এইরূপে হরি ঘোষ ঝাঁটা দ্বারা সমাদৃত হইয়া সেদিন দৌড়াইয়া প্রাণরক্ষা করিল। ঐ দিবস হইতে যাতায়াত সেখানে তার বন্ধ—কিন্তু পুলিন তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। পুলিনের সাহায্যে ঘোষ মহাশয় যে অনেকেরই সর্বনাশ করিয়াছেন একখানা না বলিলেও হয় তো অনেকেই বুঝিয়াছেন। কাজেই পাপের এই একান্ত সহচরটি হরি ঘোষের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল।

গাড়ার এই বৃদ্ধটিকে অর্চনা দাদামহাশয় বলিয়া ডাকিত এবং ভয় করিয়া চলিত। ইদানীং কিছু দিন যাবৎ ঘোষ

মহাশয় অক্ষয় বাবুর বাড়ীতে বড় বেশী যাতায়াত করিতে ছিলেন। তাহাদের প্রতি অল্পকম্পা দেখাইয়া প্রায়ই অপ্রার্থিত উপদেশ দানে আগ্রাসিত করিতেন। অর্চনার জন্ত গভীর হুং প্রকাশ করিয়া চোখের জল ফেলিতেন, সময়ে সময়ে এই বলিয়া হুং প্রকাশ করিয়া বলিতেন আহা—এই ত বয়স, সম্মুখে দীর্ঘ দিন পড়িয়া আছে—কেমন করিয়া যে কাটিবে প্রভুই জানেন, উহার দিকে যখন চাই আমার বুক ফাটিয়া যায়। এই প্রকারে অনাহত চোখের জল ফেলিয়া অর্চনাকে ডাকিয়া বলিতেন—দিদিমণি যা হবার হয়েছে, কি করবি, সবই কর্মের ফের যেখানেই থাক এইটা চির সাথী,—বলিয়াই তিনি অঙ্গুলি দ্বারা নিজ কপালদেশ স্পর্শ করিতেন। পরে আবার বলিতেন—যাক যা হবার হয়েছে—এখন তো আর ভাবলে চলবে না—মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যেই তোমাকে এখন এই মর জগতে দেহ ধারণ করতে হবে। তার সেই দেহ বুক ধরিয়া যৌবনেই, তোমাকে কঠোর ব্রহ্মচারিণী সাজিতে হইবে। উপায় কি? আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম ইহার জন্তই এত গৌরবাসিত। সাবধান দিদি যেন কোনরূপেই বিচলিত হইও না। এই কাঁচা বয়সে অনেক রকম প্রলোভন, অনেক রকম বিপদ আসবেই কিন্তু সাবধান। তোমার এই দাদামশায়টির কথা স্মরণ করিয়া বিপদ সমুদ্রে হইতে উত্তীর্ণ হইও। তৎপর নিজের জন্ত তো আর কিছু রাখি নাই দিদি” বলিয়া নিজের কণ্ঠের রক্তাক্ষের মালাটি স্পর্শ করিয়া বলিতেন—সবই এর জন্ত এবং গলার স্বর পাচ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের ব্যাখ্যা করিতেন—। মাঝে মাঝে তামাকের আদেশ দিয়া বলিতেন—দিদি এইটা আমার বড় আদরের—ভাত না হইলে চলে ছকাটা ছাড়তে পারি না—। বিরক্ত হসনি যেন, একটু তামাক দে।

এইরূপে ক্রমেই এ বাড়ীতে যাতায়াত তাহার বাড়িয়া চলিল এবং অনর্থক অর্চনাকে ডাকহাক করিয়া উত্তাক্ত করিতে ছিল। অর্চনাকিন্তু এই বৃদ্ধের উপদেশাবলী শ্রুতিবিরুদ্ধ হইয়াছিল না বৈধব্য ছিল না ঘোষ আসিলেই অর্চনা কাজ আছে বলিয়া অন্তর্ভুক্ত চলিয়া যাইত—তাহার চোখের আড়ালে। ঘোষ মহাশয় অর্চনার জন্ত ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ত্রায় এদিক ওদিক তাকাইয়া অচু কোথায় রে—কখনও বা দিদিমণি গেলি কোথা

রে, বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি করিতেন। কোন সাড়া না পাইলে বলিতেন—হুগা ঘুমালে চলবে না একটু লক্ষ্য টঙ্ক রাখিস। জানত এ গ্রামের সব কাণ্ড। কিছুই অসম্ভব নয়। সোমন্ত বয়স আজকাল ছেলেপেলে গুলোও ভাল নয়, কিসে কি হয় বলা যায় না, শেষে যেন কেলেঙ্কারী না হয়। ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না। পূর্বাহ্নেই সাবধান হওয়া উচিত।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার বলিলেন—ওবার চক্রবর্তীর বাড়ীর সেই ব্যাপার জান ত ভায়া? ভাগ্যে ছিলুম এখানে, একি তুমি যে অমন চেয়ে রইলে হে? কিছুই যেন জাননা? আরে মথুর চক্রবর্তীর পুত্র রথ—হে হে বলিয়া কতকটা হাসিয়া কাশিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, সেই যে নুতন বিয়ে করে নিয়ে এল খেড়ে বোঁটাকে, কি কাণ্ডটাই না হল। মোছলমানে নিয়ে গেল, তাকে চায় আবার ঘরে তুলতে। আমি হরি ঘোষ তা সহ্য করি কখনো। প্রাণ থাকতে নয়। সেই যে তেড়ে বললাম—দেখ চক্রবর্তী এ বৌকে যদি ঘরে তোল তোমারও এ গাঁ হতে পাট তুলতে হবে পৈত্রিক ভিটা তোমাকে ছাড়তেই হবে জেনো। কিছুতেই মুসলমানে হোঁয়া বউ ঘরে ঢুকতে পারবে না। হুগাবাবু তাহার কথার বাধা দিয়া বলিলেন, মোছলমানে ত’ তাকে নেয় নাই—তাকে কিছু করেও নাই শুনিচি...ঘোষ ইহাতে অত্যন্ত রাগিয়া গলার স্বর যতদূর সম্ভব চড়াইয়া হুগাদাস বাবুকে একপ্রকার ধমকাইয়া বলিয়া উঠিল, কি শুনেছ তুমি, তুমি জান কি। এ পাড়ার খবর হরি ঘোষের চেয়ে কে বেশী রাখে, আমার স্বচক্ষে দেখা মোছলমানে নিয়ে গেল আর তুমি বলছ মোছলমানে কিছু করে নি! অমনিই যদি ছেড়ে দেবে তবে নিয়ে গিয়েছিল কি পূজা করবার জন্তে। দেখ হুগা, এসব চালাকী বুঝতে এখনও তোমার চের দেয়ী, জাত বাঁচাবার জন্ত ওরকম অনেক চাল অনেকে খেলেছে অনেকে খেলে। কিন্তু এই হরি ঘোষ যেখানে আছে তার চোখে ধূলা দেওয়া এত সহজ নয়, বুঝলে? হুগাদাস বাবু—আজ্ঞে হাঁ বুঝছি বলিয়া ঘোষের কথায় সায় দিল। তাহার ভয় পাচ্ছে ঘোষ মহাশয় রূপা করিয়া আবার তাহার উপর সোনার হন। (ক্রমশঃ)

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় শিল্প

শ্রীঅর্কেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, ভারতের কুষ্টির আকাশে ছুটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়,—বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ—বিশ্ব-বিশ্রুত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। দেশের লোক দেশের কবির প্রতিভার পরিচয় লইতে বহুকাল অস্বীকার করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের কবিতা লক্ষ্য করিয়া কাব্য-বিশারদের বিজ্ঞপ-বাণী আজ-ও অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। এমন একদিন গিয়াছে, যে দিন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়-কর্তারা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে পাঠ্য-তালিকায় স্থান দিবার প্রস্তাবে, অস্বীকারে পুনঃপুনঃ মন্তক-সঞ্চালন করিয়াছিলেন। অবশ্য নোবেল-পুরস্কারের পর, কবির প্রতিভার তিরস্কারের পালা শেষ হইয়াছিল। এবং দেশের লোক দেশের কবির বিশ্ব-বিজয়ী প্রতিভার সম্মান দেখাইবার সাহস সঙ্কল্প কবিকে পরিহা-ছিল। দাস-বুদ্ধি পরাধীন জাতির পক্ষে, নিজের দেশের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী মূল্য নির্ধারণ করিবার স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি ও সাহস থাকে না। পশ্চিম-দেশের মনীষীরা ভারতের সাহিত্য, কবিতা, বা শিল্পের মূল্য যাচাই করিয়া না দিলে, আমরা আমাদের নিজের বুদ্ধিতে তাহার মূল্য নির্ধারণ করিতে পারি না। মাস্ক-মূল্যের অঘাচিত ও প্রচুর প্রশংসার পূর্বে,—দেশের ইংরাজী শিক্ষিত মানুষ সংস্কৃত-সাহিত্যকে,—যে সাহিত্য আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-সাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত,—সেই সাহিত্যকে অবজ্ঞা ও অপমান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আজও স্থল-কলেজের ছেলেরা যুরোপের নব্য-তত্ত্বের সাম্প্রতিক সাহিত্যের মোহে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক সম্মান দিতে অস্বীকার করে। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের আবাদন ও গুণ-বিচারের ক্ষেত্রে অনেকটা একই রীতির বিপর্য্য ঘটয়া-ছিল। গ্রীয়ারসন্ ও কাওয়েল সাহেব, আমাদের দেশের প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতার ভাব ও ভাষার সমাদর করিবার পূর্বে বাঙ্গালী বাঙ্গলা দেশের শ্রেষ্ঠ রত্নের আদর করিতে শিখিতে পারে নাই।

একই জাতীয় পরাধীনতার একই বিপাকে পড়িয়া, ভারতের রূপ-শিল্পের মৌলিক প্রতিভা ও ঐশ্বর্য্য বহুদিন এইরূপ অনাদর, অশ্রদ্ধা ও অপমানের ভয়ে আচ্ছাদিত ও প্রচ্ছন্ন ছিল। স্বাভাবিক প্ররোচনায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার রূপ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ রূপ-দৃষ্টি নিয়া, ভারতের শ্রেষ্ঠ-সাধনার উৎকৃষ্ট রস-বস্তুর কলঙ্ক-মোচন করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের কলা-শিল্পের অন্তঃস্থল অন্বেষণ করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শের আধ্যাত্মিক রূপ-তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, দেশের লোক-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতের নবীন রূপ-সাধক। পশ্চিম-দেশের রূপ-শিল্পের আদর্শের পরকলা চোখে আঁটিয়া দেশের শিল্পের বিশিষ্ট রূপ-রসের সন্ধান মেলে না—এই কথা দেশের লোকদের বুঝাইবার ব্রত লইয়াছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেদিনও দেশের বড় বড় শিক্ষিত মানুষ, দেশের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-রথীরা, দেশের শ্রেষ্ঠ কলা-শিল্পীকে বিজ্ঞপ ও নিন্দাবাদের শরজালে আহত করিতে বৃষ্টিত হন নাই। অধুনা-লুপ্ত প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রিকা “সাহিত্যে”র সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর স্বরেন্দ্র সমাজপতি, সেকালের সাহিত্য-সমাজের প্রতিনিধিরূপে, মাসের পর মাস, অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-পদ্ধতিকে বিজ্ঞপ করিয়া প্রচুর আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন—এবং এই বিজ্ঞপের প্রতিধ্বনি দেশের নানা ক্ষেত্রে, উপহাসের কলরবে বহুদিন জীবিত ছিল। অবশ্য, ১৯১৪ সালে, যেদিন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্য-বৃন্দের চিত্রাবলী যুরোপের কলা-ক্ষেত্র পারী-নগরের প্রদর্শনীতে যুরোপের বিশিষ্ট-সমালোচকদের প্রশংসার জয়-মালা অর্জন করিয়া, ভারতের সাম্প্রতিক সাধনার কীৰ্ত্তি-স্তম্ভ রচনা করিয়া দেশে ফিরিল, তখন দেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায় ও মাতব্বর মহাশয়রা বিজ্ঞপের সুর কিরাইয়া, অল্প সুরে গাওনা শুরু করিলেন।

জাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে, জাতীয়তার উদ্বোধনের বাণী অবনীন্দ্র-নাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—এক নূতন যুগের প্রারম্ভ



শিক্কাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসীর সৌজনে

তাহার পর, প্রায় দুইটা যুগ অতিবাহিত হইয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তা ও স্বারাজ্যের দাবী, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বারাজ্যের দাবী অপেক্ষা কোনও অংশে হীন, কোনও অংশে কম মূল্যবান নহে। দেশের আত্মাকে যদি ফিরিয়া না পাই, দেশের আত্ম-বুদ্ধিকে যদি রাজার আসনে বসাতে না শিখে থাকি, তাহলে ব্যবস্থাপক সভায় গিয়ে, রাষ্ট্রশক্তি অর্জন কর্তে পাল্লেই, অর্থ-নৈতিক জগতে মালখানার চাবি দখল কর্তে পাল্লেই, ভারতবাসী স্বরাজ্য লাভ কর্তে পার্কে না। “স্বরাজ”, “স্বরাট্”, “স্বারাজ্য” এই সব শব্দগুলি ভারতের দার্শনিক তত্ত্বের আধ্যাত্মিক চিন্তার যোগরত শব্দ। রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে আমরা এই শব্দগুলি ব্যবহার বা অপব্যবহার কর্তে শিখেছি। কিন্তু, নিজেকে জয় কর্তে না পাল্লে, নিজেকে ক্ষিরে পেতে না শিখলে, অন্তরের জগতে স্বরাট্ হতে না পাল্লে, বাহিরের জগতে রাষ্ট্রনীতির, অর্থনীতির ও সমাজনীতির জগতে আমরা স্বরাজ্য খুঁজে পাব না। সেদিন থিরোসফিক্যাল সোসাইটীর সভাপতি ডাক্তার আরাওন্ডে “স্বদেশী বনাম বিদেশী শিক্ষার” ব্যাখ্যান করে বলেন—শিক্ষাতত্ত্বে স্বরাজ্য না পেলে—রাষ্ট্রতত্ত্বে স্বরাজ্য পাওয়া কঠিন সম্ভা। অনেকে বলেন ‘ঘোড়া হ’লে চাবুক হবে।’ অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে স্বরাজ্য পেলে, জীবনের আর সব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ সহজ হয়ে উঠবে। দেশের অন্তঃস্থ মনীষিরা অল্প মত অবলম্বন করে বলেন যে আগে আধ্যাত্মিক রাজত্ব, দেশের অন্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যে স্বরাজ্য না পেলে—অন্য কোনও ক্ষেত্রে স্বারাজ্যের সন্ধান মিলবে না। জাপানী জাতীয়-শিল্পের পুরোহিত ওকাকুরা এই মতেরই, এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন :—

“অন্তরের দিক থেকে জয়লাভ না কর্তে পাল্লে, বাহিরের দিক থেকে মারাত্মক মৃত্যু অবশ্যসম্ভাবী” [Victory from within, or mighty death from without]। রূপ-শিল্পের ক্ষেত্রে জয়যাত্রা, এই অন্তরের পথে, এই আধ্যাত্মিকতার পথে জয়যাত্রা। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ আমাদের এই আধ্যাত্মিক স্বারাজ্যের পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন। দেশের শিল্পকলার সাধনা, জাতির অধ্যাত্ম-পথের সাধনা। জাতীয় শক্তির উদ্বোধন, জাতীয়তার ঐক্যবন্ধন, জাতিগঠন ইত্যাদি সকল সাধনার মূলতত্ত্ব জাতীয় শিল্পের আদর্শ নির্ধারণ, শিল্পের স্বরাজ্য সাধন। সুতরাং, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের স্বদেশী-

কতার সাধনা, কোনও কারা-বরণ-কারী দেশভক্ত, দেশনাথকের সাধনা হইতে কোনও অংশে হীন নহে, কোনও অংশে কম মূল্যবান নহে।

অবনীন্দ্রনাথের অন্তর্গত সাধনা দুইটি বিভাগে সকল হয়ে উঠেছে। একটি হোলো, প্রাচীন ভারতে শিল্প সাধনার রহস্য ও মর্মস্থান অহুসন্ধান করে ভারতীয় শিল্পের রূপ, আদর্শ ও গুণ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করা, ভারতের শিল্পের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য কোনখানে—তাহা দেখিবার তৃতীয় চক্ষু খুলে দেওয়া। আর একটি হোলো,—ভারতীয় শিল্পের সাধনা যুগোপযোগী নব নব ধারায়, নব নব পদ্ধতি ও রূপে, নূতন পরিণতির পথে চালনা করা।

এই প্রথম কণ্ঠীর সহায়ক-রূপে তাঁহাকে ভারতের প্রাচীন শিল্প-কলার উৎকৃষ্ট নিদর্শনের একটি উপযুক্ত ও নির্বাচিত সংগ্রহ-শালা গড়ে তুলতে হয়েছিলো। এই উৎকৃষ্ট চিত্র ও ভাস্কর্যের নানা নমুনা, নানা স্থান হতে সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনেক বৎসর ধরে, অনেক অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক রস-পিপাসু বিশেষজ্ঞরা—তাঁহার সংগৃহীত ভারতীয় শিল্পের অপূর্ণ ভাণ্ডার দেখিতে আসিতেন। এই মূল্যবান সংগ্রহ-শালা জাতীয় শিল্পের এই অপূর্ণ সম্ভার “T. gore collection of Indian Art” নামে দেশে, প্রদেশে, ও বিদেশে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। তাঁহার এই সংগ্রহ-শালার এমন সব চুল্লি রত স্থান পেয়েছিল—যাহার তুলনা সরকারী, বেসরকারী কোনও সংগ্রহ-শালার অন্যাপি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু জাতীয় সাধনার এই সব শ্রেষ্ঠ সাধনা, জাতীয় শিল্পের ইতিহাসের এই সব বহুত্বা উপকরণ,—শিল্প-শিক্ষার মূল্যবান পাঠ্যবস্তু আমাদের ভাগ্য-বিধাতার বিধানে, বাংলাদেশ আজ হারিয়েছে। এক সময়ে প্রস্তাব হয়েছিল যে, এই মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য একটি বিশিষ্ট অর্থ সংগ্রহ (fund) করে, বাংলার জনসাধারণের অর্থে ক্রয় করে, জাতীয় সংগ্রহ-শালা নির্মাণ করা হবে। কিন্তু এই প্রস্তাব, আমাদের দেশভক্তি, আমাদের শিক্ষাবুদ্ধি, সফল করিতে পারে নাই।

এই সংগ্রহ সম্বন্ধে আর একটি প্রচেষ্টা হয়েছিল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই দ্রব্য-সম্ভার ক্রয় করিয়া—আন্তর্জাতিক মিউজিয়ামে স্থান দিবে। নানা কারণে, এই প্রস্তাবও

কার্যকরী হয় নাই। বাঙ্গলা দেশে অর্থের অভাব নাই, কিন্তু অর্থনীতির অভাব। আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে, ব্যয়-বাহুল্যের প্রমাণ, বাবু-গিরি ও ব্যসনে ব্যয়াক্রমের উদাহরণ নিতাই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু, শিল্প, শিল্প-সাধনা ও শিল্প-শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অর্থ-কার্পণ্য, একটা জাতীয় কলঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ড এবং অন্যান্য সভ্য-দেশে জাতীয় শিল্প-কলার নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, ব্যক্তিগত দানের দ্বারা National Art collection Fund বা “জাতীয় শিল্প-কলার ধন-ভাণ্ডার” সংগঠিত আছে। কংগ্রেসের বাৎসরিক তিন দিনের রাষ্ট্রপূজার জন্ত সাময়িক পর্ব-শালা রচনা করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়—কিন্তু জাতীয় চিত্রশালার জন্ত আমরা অর্থ সংগ্রহ করিতে নারাজ।

যাহা হউক, এই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া অবনীন্দ্রনাথ জাতীয় শিল্পের ভাষা নির্ধারণ করিয়া, উহার উপর ভিত্তি করিয়া নূতন ভারতের শিল্প-কলার পরিণতির পথ দেখাইয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন কলা-পদ্ধতিতে, ভারতের নিজস্ব ভাব, নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করিবার একটা অদ্ভুত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। এই প্রভূত শক্তিশালী ভাষা—জাতীয় জীবনের মূল্যবান সম্পত্তি। এই ভাষার শিক্ষিত করিয়া, তিনি একদল শিষ্য মণ্ডলী গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার এক একজন শিষ্য দেশের এক একস্থানের সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ দখল করিলেন। সরকারী বিদ্যালয়ে—জাতীয় শিল্প-কলার সাধনার নূতন স্থান সমসাময়িক গৃহীত হলো এবং এই নব-প্রবর্তিত শিক্ষার দ্বারা—অবনীন্দ্রনাথ—ভারতের ভাবী চিত্রকলার দ্বারা, প্রাচীনতাবের ও রূপের গভী অতিক্রম করে,—যে নূতন খাতে প্রবাহিত হতে পারে, অবনীন্দ্রনাথ তাহার পথ প্রদর্শন করে দিলেন। এই জাতীয় শিল্প সাধনার একটা অর্থনৈতিক দিক আছে। এক দিকে যেমন দেশের কারু-শিল্প বিদেশী দ্রব্যের অন্ধ ও অন্ধম অন্ধকরণের পথ বর্জন করে নিজস্ব পথে জাতীয়তার রূপ ও পরিকল্পনা অবলম্বন করে—এক নূতন নীতির স্বকীয় শিল্প-সম্ভার গড়ে তুলতে পারে, যাহার দ্বারা দেশের কারু-শিল্প বিদেশের বাজারে তাহার প্রাচীন স্থান আবার অধিকার করিতে পারিবে—তাহার একটা উজ্জ্বল পথ অবনীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়ে

দিয়েছেন। বাস্তবিক, আমাদের দেশীয় পণ্য সম্ভার আজ যে দেশীয় আদর্শ ও পরিকল্পনার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাহার প্রেরণা দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

তাঁহার শিষ্য, প্রশিষ্য, উপশিষ্য ও নাতিশিষ্যরা—এক নূতন শিক্ষা-গোষ্ঠী নির্মাণ করে, দেশে, ভারতীয় নূতন চিত্রপদ্ধতির নূতন প্রথা অবলম্বন করে—অবিরাম গতিতে চিত্র লিখে চলেছে। যাদের প্রতি কথা সরস্বতী বিমুখ, লিখিত পঠিত বিদ্যায় যাহারা পারদর্শী নহে, এমন অনেক অশিক্ষিত নিরক্ষর, রূপের পথে, নিরক্ষরের পথে—তাহাদের গ্রামাচ্ছাদনের অর্থ উপার্জন করবার স্বেচ্ছা পেয়েছে। এই সব শিষ্যমণ্ডলী আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞ। তাদের কাছে আচার্য্য তাঁহার গুরুদক্ষিণার দাবী করিতে পারেন।

আচার্য্যের আবিষ্কারের আর একটা বড় দিক হলো প্রাচীন ভারতের শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা ও তাহার অলৌকিক বিবর্তন ও পরিণতির সম্যক পরিচয় লাভ করা। এই বিভাগ—শিক্ষার ক্ষেত্রে, ভারতীয় সংস্কৃতির একটা অমূল্য-দান। কলা-শিল্পের সম্যক পরিচয় ও সমালোচনার সাধনা শিক্ষাভিত্তিক একটা গুরুতর শিক্ষা সাধনার প্রাধান্য সাধক ও উপকরণ। বিদেশের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে—কলা-শিল্পের পঠন-পাঠন ও গবেষণা উচ্চ-শিক্ষার একটা বিশিষ্ট বিভাগ ও অত্যাৱশ্যকীয় অঙ্গ। কেবল সাহিত্যের মধ্য দিয়া মানুষের মনোভা ও সাধনার সমস্ত পরিচয় পাওয়া যায় না। কলা-শিল্পের উজ্জ্বল পুঁথিতে ভারতের সভ্যতা ও সাধনার শ্রেষ্ঠ কথা নিরক্ষরের অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

ভারতের প্রাচীন শিল্প-কলার বৈজ্ঞানিক অমূল্যলীন ও সাধনা—ও বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ, জাতীয়-জীবনের অবশ্য পালনীয় ধর্ম। কিন্তু জ্ঞানের এই বিভাগে—ভারতের শিক্ষিত গণ্ডিত গণ সম্মানের স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ভারতের শিল্প-কলার অমূল্যলীনের ক্ষেত্রে বিদেশী পণ্ডিতেরা কঠোর সাধনা দ্বারা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রাচীন শিল্পকলার ইতিহাস অমূল্যলীন ও গবেষণার কিছু ব্যবস্থা আছে বটে। কিন্তু দেশের বিন্যার্থীগণ ভারতের শিল্পের বিশিষ্ট জ্ঞানের দাবীদার হইতে পারেন নাই। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে—যে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের

শিক্ষকতার পদে অবসর লইবার পর—ভারতের কলা-বিদ্যার উচ্চ শিক্ষার স্থান এখন বিদেশী বিশেষজ্ঞেরা দখল করিয়াছেন। ভারতের কোনও স্থানেই—ভারতের-কলা-শিল্পের বিশিষ্ট জ্ঞানের দাবী করিতে পারেন, এমন ভারতীয় পণ্ডিত আজও দেখা যাইতেছে না। জাতীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পরাভবের পরিচয়—আমাদের উচ্চ-শিক্ষার এক বিভাগে কলঙ্কের কাহিনীর প্রচার করিতেছে।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানী মহিলারা উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ-শিক্ষার্থীদের পরাজিত করিয়া—পরীক্ষার গেজেটের নামের তালিকায় সম্মানের উচ্চাসন অধিকার করিতেছেন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে, অনেক মহিলা-ছাত্রী দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করিতেছেন, কিন্তু ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার ক্ষেত্রে কোনও কোনও মহিলা-ছাত্রীর অনুশীলন ও গবেষণার পরিচয় আজও আমরা

পাই নাই। একই রাস্তায় একাধিক মোটর বাসের মত, আমাদের শিক্ষার্থিনীরা—জ্ঞানের অভি-পরিচিৎ ও জন-প্রিয় পথেই চলা ফেরা করিতেছেন। কিন্তু ভারতীয় জ্ঞান সাধনার একটা উচ্চতর পথে,—যে পথের সন্ধান আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ আমাদের দেখাইয়া দিয়াছেন—সে পথে জ্ঞান-সাধক ও সাধিকার আবির্ভাব আজও ঘটে নাই। জাতীয় শিক্ষার এই কলঙ্কের কথা নিতাই অরণ করিয়া আমি লজ্জিত হই। দেশের কলা-শিল্পের অন্ত্যস্ত ক্ষেত্রে, দেশের “গীতবী”রা সাধনার দীপ জালিয়া উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন,—রূপ-শিল্পের অনুশীলন ও গবেষণার সাধনায় কুললক্ষ্মীর কতদিনে তাঁহাদের পদ্য আখির স্থিত-দৃষ্টিতে, ভারতের কলা-শিল্পের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভাগ উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন,—সচঞ্চল আশায় প্রতীক্ষা কর্ছেন দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভক্ত ও উপাসক সম্প্রদায়।

চিরন্তনৌ

(শৈলী হইতে)

শ্রীমানসী বসু এম, এ,

গীত শেষে স্তব্ধ স্মৃতির মাঝারে

দোলা দেয় বারে বারে,

যখন মধুর পুষ্প শুকায়ে যায়

গন্ধ তাহার অমুভাবে সঞ্চারে।

গোলাপের পাতা গোলাপ শুকায়ে গেলে,

গন্ধের সাথে স্তপাকারে দেই ফেলে।

তুমি নাই তবু স্মৃতি তোমা ঘেরি গুঞ্জরে,

ভালবাসা—সে ত ঘুমাইয়া রয় অন্তরে।

মহিলা সংবাদ

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

সরকারী চাকুরীতে বিবাহিতা নারী

পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট সরকারী চাকুরীতে বিবাহিতা নারীদের নিয়োগ নিষেধ করিয়া নির্দেশ জারি করিয়াছেন। ইহাতে শিক্ষিত নারী সমাজ যেমন ক্রুদ্ধ তেমনই অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ভেদ সরকারী চাকুরীতে সৃষ্টি করিলে শিক্ষিতা যুবতীদের বিবাহে স্পৃহা থাকিবে না, সমাজে অমঙ্গলের সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইবে। নারীর মর্যাদা ও দেশের কল্যাণের জন্ত এ নির্দেশ রহিত করা উচিত।

আলিগড়ে মহিলা কলেজ

বড়ই সুখের সংবাদ, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম মহিলাদের উচ্চশিক্ষা দিবার জন্ত কলেজ খুলিবার ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত ভারত সরকারের শিক্ষা সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইন পাশ করিবার প্রস্তাব আনিয়াছেন। এই বিলটি পাশ হইলে মুসলিম নারী সমাজের বিশেষ উপকার হইবে।

পরলোকে নীলিমা মুখাজ্জি

স্ত্রর আন্তরিকতা মুখপাখায় মহাশয়ের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কুমারী নীলিমা অতি অল্প বয়সে, মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। নিষ্ঠাবান হিন্দুর ঘরের মেয়ে হইয়াও লেখা পড়ার তাঁহার আগ্রহ উল্লেখযোগ্য। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া বাটতে সংস্কৃত শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া ‘আদ্য’ আদি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ‘ব্রজমাধুরী’ সংজ্ঞে কীর্তন শিখিয়াছিলেন! তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পিতা ও পুত্রতাত মহাশয় যে নিদারুণ শোক পাইয়াছেন তাহাতে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি!

কলিকাতায় রুক্মিণী আরনভেল্

রুক্মিণী দেবী মাদ্রাজের এক সদ ব্রাহ্মণ কুলের কন্যা। তাঁর পিতা একজন সুপণ্ডিত এবং আড়িম্বারের থিয়সোফিক্যাল সোসাইটির সুপ্রতিষ্ঠিত কর্মী ছিলেন। রুক্মিণী দেবী আড়িম্বারের থিয়সোপিষ্টদের আবর্তনের মধ্যে শিক্ষিত ও লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

তিনি ইংরাজী ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরে রুক্মিণী দেবী সমগ্র বিশ্বের থিয়সোফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডাঃ জি, এম্, আরনভেল সাহেবকে বিবাহ করিয়া ইয়রোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

রুক্মিণী দেবী ভারত নাট্যধারার বিশেষ অমুরাগীণী। তিনি নিজে নাট্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নৃত্যকলা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। কেবল পুণ্ডিগত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই—নিজে নৃত্য শিক্ষা করিয়া একজন কুশলী নৃত্য-শিল্পী হইয়াছেন।

আডেম্বারে কলা ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া ভারত নাট্য শাস্ত্র-মুখারী নৃত্য ও গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই কলাক্ষেত্রের উদ্দেশ্য প্রচার ও ভারত নাট্য শাস্ত্রের পুনঃ প্রচলনের জন্ত কলিকাতায় সপ্তাহ কাল অবস্থান পূর্বক তিন দিবস উচ্চাঙ্গের পরম রমণীয় নৃত্য দেখাইয়া শিল্প-অমুরাগীদের তৃপ্তি প্রদান করিয়াছিলেন।



রুক্মিণী দেবী

রুক্মিণী দেবী কেবল নৃত্য-কুশলী তাহা নহে, তিনি একজন সুবক্তা। অতি সরল প্রাজ্ঞ ইংরাজি ভাষায় তিনি ‘ইণ্ডিয়ান কালচারেল রেনিসেন্স’ (ভারতের কৃষ্টির অমুরাগীণী) নামক বক্তৃতায় ভারতবাসীর সত্য শিব স্বন্দরে উপাসনা এবং শিল্প অমুরাগের এবং শিল্প (নৃত্য গীত, ধাতু প্রস্তুত শিল্প) সৃষ্টির শক্তির বিষয় বক্তৃতা দিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বাঁধ ও বন্যা

শ্রীমনোজ বসু

পূর্বাহ্ন

আলো জলিল। ষ্টেজে Charity performance শুরু হইয়াছে। দৃশ্যপটে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের ছবি। তাহার উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, 'প্লাবন-পীড়িতগণের সাহায্যার্থে'।

একটা মেয়ে দাঁড়াইয়া গান করিতেছে। প্লাবনের গান। তাহার কণ্ঠস্বরে ও ভঙ্গিতে প্লাবনের ভয়াবহতা ফুটিয়া উঠিতেছে।

কাল ভৈরব গভীর রাত্রে দিল হানা...দিল হানা।

কালো জলে হলো একাকার গ্রামখানা।

তুই তট ছিল জল অবরোধি—

তট ভেঙে গাঁয়ে ছুটে এলো নদী—

বন-পথ প্রান্তরে

আমাদের ঘরে-ঘরে

প্রাঙ্গণে-চলে একটানা।

গাছের মাথায় মিতালি মাছুবে সাপে—

শক্তি সাপ মাছুবে জড়াবে কাঁপে।

প্রেমসী পায়না প্রিয়তমের তার বাহু মেলে—

মা কাঁদিয়া ওঠে—'ছেলে...আমার ছেলে?'

মেঘলা আকাশ ব্যাপিয়া কি ওই—

মৃত্যু-মেলিল-ডানা?

গানের পর পর্দা পড়িল। পর্দা সরাইয়া পরিচালক আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি প্রেক্ষাগৃহের উদ্দেশে হাত বাড় করিলেন। পরিচালকের ভাব দেখিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মনে করিবে, ইহা অভিনয়ের অংশ নয়; সত্য সত্যই অভিনয়ে গোলমাল ঘটিয়াছে।

পরিচালক। নিবেদন আছে।...এর পর সর্প-নৃত্য হবার কথা। কিন্তু অনিবার্য কারণে প্রোগ্রাম থেকে সেটা বাদ দিতে হচ্ছে। তার বদলে আর একটা ভাল নৃত্য...

জনৈক দর্শক। না...না মশায়, ভালমন্দ বুঝি। যা আছে, তাই হবে। হঠাৎ অনিবার্য হয়ে উঠল...হয়েছে কি শুনি?

পরিচালক। অর্থাৎ আর সব ঠিক আছে...গোলমাল হ'ল বাঁশী বাজানো নিয়ে। বাঁশী হ'ল এই নৃত্যের প্রাণ। কিন্তু মুশ্কিল হয়েছে, যিনি বাঁশী বাজাবেন—

দর্শক। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এইত? ধরে এনে ষ্টেজে দাঁড় করিয়ে দিন। পরসী খরচ করে এসেছি, এমনি নয়। অসুস্থ হয়ে হয়ে বাংলা থিয়েটার জাহান্নামে যাচ্ছে...তবু কাণ্ড-জ্ঞান হয় না।

পরিচালক। মানুষের শরীর—অপরাধ কি? নটেয়াও মানুষ!

দর্শক। ও সব বুঝিবে মশাই, বাদ দেয়া দেয়ি চলবে না। লাগিয়ে দিন...নইলে চেয়ার-বেঞ্চি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

[নানা দিক দিয়া নানা জনে গোলমাল করিয়া উঠিল]

পরিচালক। চুপ করুন। ঠাণ্ডা হন। আচ্ছা এক মিনিট, এক মিনিটের মধ্যে বলছি।

[পরিচালক পর্দার আড়ালে গিয়া আবার একটু পরেই দেখা দিলেন]

পরিচালক। বেশ...সর্পনৃত্যই হবে এবার; আপনাদের আদেশ শিরোধার্য।

[প্রেক্ষাগৃহে করতালি ধ্বনি। পর্দা উঠিল]

সর্পনৃত্যের বিষয় বস্তু মোটামুটি এই—ঘন বন। বেদের সর্দার (উৎপল) ব্যাকুলভাবে নৃত্য ছন্দে ছুটিয়া আসিল। বাজনা সাপের হিস-হিস শব্দ। একটি সাপ তাহাকে ছোঁ মারিয়া পলাইল। বেদের সর্দার আর্জনা দ করিয়া মাটিতে পড়িল; বেদের মেয়ে (সুরমা) ও তাহার সঙ্গী বংশীবাদক তাড়াতাড়ি আসিল। নৃত্য ও বংশীর সুরে তাহারা সাপকে আকর্ষণ করিল। সাপ আবার আসিল। একটা গাছের ধারে ফণা মেলিয়া ছলিতে লাগিল। ক্রমে, সাপ সম্পূর্ণ বশীভূত হইল। বেদের মেয়ে সাপটাকে হাতে তুলিয়া চুষন করিল। তারপর মুচ্ছিত সর্দারের কাছে ধরিতে সাপ তাহার দেহ হইতে বিষ

শুধিয়া লইল। সন্দের উঠিল। যুগ্মনৃত্যের পর পান শেখ হইল।

হিরণের বাঁশী বাজাইবার কথা কিন্তু তার বদলে আর একজন বাঁশী বাজাইতেছে। লোকটির সুরবোধ আদৌ নাই। বাঁশী বেথাপ্লা বাজিতেছে, নাচের তাল কাটিতেছে। সুরমা রুটে চোখে এক একবার তার দিকে তাকাইতেছে। তারপর বিরক্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।

দর্শক। এই.....কি হচ্ছে! তাল কেটে যাচ্ছে—

আর একজন। অসুস্থ সতিহই হয়েছ বাপধন, মাত্রা বেশি হয়ে গেছে।

[নির্মল প্রেক্ষাগৃহে ছিল। সে আগাইয়া মঞ্চের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

নির্মল। ষাঁরা মঞ্চের উপরে রয়েছেন, তাঁরা সকলে সুশিক্ষিত, এবং তাঁহার মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা রয়েছেন। ষাঁরা অভিনয় দেখতে এসেছেন, তাঁরাও সব বিশিষ্ট ব্যক্তি। অতএব এখানে আশা করা যায়, সকলে সংযত হয়ে মতামত প্রকাশ করবেন।

দর্শক। কি বলছেন মশায়, ষ্টেজের উপর উঠে বসুন না। মুখ দেখতে পাচ্চিনে—

[নির্মল মঞ্চের উপর উঠিল]

নির্মল। বলছি, কবে আমাদের দেশে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে এই রকম শত্রু-সম্বন্ধ উঠে যাবে! একজন হলেন রসের পরিবেশক, আর একজন রসপিপাসু—এঁদের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক না থাকলে রঙ্গালয় কোনদিন সম্মানের বস্তু হবে না।...আজকে কোন কোন দর্শকের মন্তব্য শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। এই নৃত্যগীতের আসর সংকাজের জন্ত, এতে যে অর্থাগম হবে তা আমাদের প্লাবন-পীড়িত অঞ্চলের উপকারে লাগবে। আমাদের আবেদনে কুমারী সুরমা এর আয়োজন করছেন। আর আমি মনে করি, আপনারা শুধু আনন্দ-উপভোগের জন্ত নয়—সংকাজের সাহায্যকল্পে এখানে টিকিট কিনে এসেছেন। যে ভদ্রলোক বাঁশী বাজাচ্ছিলে উনি অপ্রকৃতিস্থ নন। আসল কথা, উনি ঐ বাঁশী বিশেষ জানেন না, দায়ে পড়ে ওঁকে নামাতে হয়েছে। ষাঁর একটু রসবোধ আছে, তিনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। তবু ঘের সাহস করে উনি নেমেছিলেন, এজন্ত গঙ্গামণ্ডল-বাসীদে

পক্ষ থেকে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বাঁশী বাজাবার কথা ছিল শ্রীযুত হিরণ সরকারের, তিনি আসেন নি। কেন যে নির্দয় হলেন, জানি না। যাই হোক, সুরমা দেবীর সুন্দর নৃত্যের এমন যে অপঘাত হল, এজন্ত রসপিপাসু আমরা—সকলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছি। আপনারা যদি অনুমতি করেন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

[দর্শকদের কয়েকজনের নিকট হইতে সম্মতিসূচক সাড়া আসিল—নিশ্চয়...আচ্ছা...হাঁ ইত্যাদি।]

নির্মল। বাঁশীতে 'ফু' দিল। একটুখানি বাজাইতেই সুরমার অবসাদ কাটিল, উৎসাহে তার চোখ জল-জল করিতে লাগিল। সে উঠিয়া চঞ্চল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নির্মলও সমগ্র সজ্জা দিয়া বাজাইতেছে; সুরমা তন্ময় হইয়া নাচিতেছে—এমন নৃত্য সে কোনদিন নাচে নাই।

আগেকার বংশীবাদক নিজের মাথা থেকে বেদের টুপি... গা হইতে জীর্ণ চাদর প্রভৃতি একের পর এক নির্মলের গারে পরাইয়া দিল। অর্থাৎ মঞ্চের উপরেই কতকটা সাজা হইয়া গেল।

প্রচুর হাততালি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে নৃত্য শেষ হইল। এক দিক দিয়া নির্মল ও আর একদিক দিয়া সুরমা প্রভৃতি নিজস্ব হইল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ঘুরিল, কিন্তু আলো নিবিল না।

যে দিকে মঞ্চ ঘুরিল, নির্মল সেই দিক দিয়া বাহির হইতেছিল। উইংসের আড়ালে আসিতেই পরিচালক পরম আগ্রহে তাহার হাত ধরিয়া আগাইয়া চলিলেন। মঞ্চ আরও ঘুরিল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের পিছনের অংশ দেখা যাইতেছে। সেখানে একখানা চেয়ারের উপর পরিচালক নির্মলকে বসাইলেন। আর একজন দুইটা ফুলের তোড়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। নির্মল উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিল, নমস্কার করিয়া সে তোড়া ছুটি টেবিলে রাখিল।

পরিচালক। ওরে অমূল্য, চা দিয়ে যা দুই কাপ। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দোবো। সন্ধ্যা থেকে কম ধকলটা গিয়েছে। হিরণবাবুর বাড়ী তিন তিনবার গাড়ী পাঠিয়েছি। পরের ষ্টেজ ভাড়া নিয়ে কাজ...চেয়ার বেঞ্চি একখানা আস্ত থাকত না।

নির্মল। হিরণ বাবুর কি হয়েছে? কোথায় তিনি?

পরিচালক। কি জানি...কোথায়? এমন করে মানুষকে অপদস্থ করে! শুনলাম তার বাপ ছুপুরবেলা তাকে দেশে ধরে নিয়ে গিয়েছে, বিয়ে দেবে বলে।

[এমন সময় সুরমা ও উৎপল আসিয়া দাঁড়াইল। সুরমার হাতেও উপহার-পাওয়া অনেক ফুল। তাহারা এখনও সাজ বদলায় নাই]

পরিচালক। আপনারা? বসুন...বসুন।—আরো চেয়ার পাটিয়ে দিচ্ছি, ওরে অমূল্য, কালা হয়েচিস, হারামজাদা? চা জানতে বুড়া হয়ে গেলি?

[পরিচালক ব্যস্ত হইয়া ওদিকে চলিয়া গেলেন]

নির্মল। এখনো মাথার পাখনা-টাখনা খোলেন নি? খুব ত কষ্ট হয়েছে...ওসব খুলে ফেলে বিশ্রাম করুন।

সুরমা। সকলের আগে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।

নির্মল। লজ্জা আমারই সুরমা দেবী। এই যে অপমান হতে যাচ্ছিল...সে আমাদেরই জন্যে আপনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন। অথচ সেই দুঃখী মানুষদের কাউকে আপনি চোখে দেখেন নি।

সুরমা। অপমান থেকে বাঁচিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা সেজন্য নয়। কি অপূর্ণ সুর শোনালেন আজ আপনি!

উৎপল। (একটানে দাড়িটা খুলিয়া ফেলিল) বাঁশের বাঁশী প্রাণের মধ্যে এমন করে কথা করে গেল...আমি সারাক্ষণ ভেবেছি, সার্থক আমার নৃত্য-পরিকল্পনা। সুরমা দেবীর নৃত্য আপনার বাঁশীর সঙ্গে মিলে কল্পনাতীত হয়ে উঠেছিল।

সুরমা। সুরময় আপনার প্রাণ। আমার ত মনে হচ্ছিল, বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে আপনার চোখের দৃষ্টি, আপনার প্রাণ—সব সুর হয়ে বাজছিল।

নির্মল। আসলে আমি কিন্তু একটা রীতিমতো অসুর! আচ্ছা...আপাতত বিদায়—আজই ফিরতে হবে কি না!

[নির্মল উঠিতে যাইতেছিল, সুরমা বাধা দিল]

সুরমা। এক মিনিট। শুনে যান কি হ'ল। গৌঁসাই বস্ত্র-অফিস আগলে আছেন। উৎপল বাবু আপনি গিয়ে বসুন আমার কথা। আমারও জানতে আগ্রহ হচ্ছে।

[উৎপল চলিয়া গেল]

এমন চমৎকার বাঁশী...কার কাছে শিখলেন বলুন ত!

নির্মল। নিজেই। বীরভূমের এক ফাঁকা গাঁয়ে ছিলাম এক বছর—সঙ্গী পেতাম না। তখন এক সাঁওতালের কাছ থেকে কিনেছিলাম এক বাঁশী—

[অমূল্য চা দিয়া গেল...ছ'জনে চা খাইতেছে]

সুরমা। সেখানে কেন? বাড়ীর পরে রাগ হয়েছিল বুঝি!

নির্মল। উহু...রাগ হয়েছিল গবর্ণমেন্টের উপর, ডেটিনিউ করে রেখেছিল, বালুভরা ময়ুরাক্ষী...তারই পাশে বসে সকাল সন্ধ্যা বাঁশী বাজাতাম।

[গৌঁসাই ও উৎপল আসিল। গৌঁসাইয়ের হাতে একখানা কাগজ]

গৌঁসাই। টিকিট সেল হয়েছে ন'শ আশি টাকার। খরচও ত প্রায় হাজারের কাছে দাঁড়াচ্ছে।

সুরমা। এত?

গৌঁসাই। তা হবে না? ষ্টেজ ভাড়া, আলো, কনসার্ট-পার্ট, ট্যাক্সি, টিকিট, চাকর-বাকরের বখশিশ...Every thing is here...to the last farthing.

নির্মল। (মুখে ব্যঙ্গের হাসি) আমি জানতাম, তা'হলে টাকা কুড়িক তো আমাকেই দিয়ে যেতে হয়। এই জামা জুতো—এ না হয় রেখে যাচ্ছি...আর কি করা যায় বলুন তো সুরমা দেবী।

সুরমা। (রাগিয়া উঠিল) Auditorium-এর অপমান থেকে বাঁচিয়ে নিজে অপমান করছেন। বলেছি যখন, টাকা আমি দেবই। এই নিন...এই নিন...

[সুরমা রাগের বশে ক'গাছি চুড়ি খুলিয়া ফেলিল। আরও খুলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নির্মল ব্যাকুল কণ্ঠে নিষেধ করিল। নির্মলের মুখের দিকে চাহিয়া সুরমা থামিয়া গেল]

নির্মল। না—না—না—আপনাকে মনে করে বলিনি সুরমা দেবী। আপনি আঘাত পেয়েছেন...আমি বড় দুঃখিত। আমায় মাফ করুন।

[গৌঁসাই ও উৎপলের মধ্যে তর্ক বাধিয়াছে...বোধ করি কি একটা খরচ লইয়া। তাহারই একটা কাগজ দেখিতে ছ'জনে বাহির হইয়া গেল]

সুরমা। টাকা দেব, আমি কথা দিয়েছি—

নির্মল। বেশত, পরে সুরমি মত পাঠিয়ে দেবেন। এক মাসের মধ্যে পেলেই হবে—

সুরমা। আপনার ঠিকানা?

[নন্দলাল ও সন্ধ্যারাগী প্রবেশ করিলেন]

নন্দ। খাসা বাজালো...খাসা শিখেছ, নির্মল।

নির্মল। সেই জন্তে দেবী হয়ে গেল। এক্ষুনি রওনা হয়ে যাব।...তুমি দেখতে এসেছিলে নন্দ-দা?

নন্দ। আসব না।...সবাই এসেছি। খুকীদিদির ব্যাপার। এই ইনি রাণী-মা।

নির্মল। নমস্কার।

সন্ধ্যা। বেশ বাবা...বড় খুশি হলাম। আমরাও মহালে যাচ্ছি। তখন দেখা হবে। চল খুকী যাই—

সুরমা। যাচ্ছি না, গাড়ীতে বোস গে। এইগুলো চেড়ে আসি।

[নন্দলাল ও সন্ধ্যারাগী চলিয়া গেলেন]

সুরমা। আপনিই নির্মল বাবু?

নির্মল। তাইত শুনলেন।

সুরমা। নিজের নাম গোপন করে আমাকে ঠকিয়েছেন।

নির্মল। (হাসিমুখে) সে কথা বলতে পারতেন যদি গয়না নিয়ে চলে যেতাম—নিইনি ত।

সুরমা। নাম বলেননি কেন?

নির্মল। ভয়ে সুরমা দেবী। আপনার যে রকম রাগ, পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে আমাকে তাড়াবেন...ঐ অবস্থায় নাম বলতে ভরসা হ'ল না।

সুরমা। তাড়াতে আমার বয়ে গেছে। আমি টাকা দেব প্রজাদের কাজে।

নির্মল। তা, হ'লে থাকতে পারব? যাক, দূর্বাবনা ঘুচলো। মহালে যাচ্ছেন, দেখা হবে। নমস্কার।

[সুরমা অহুদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল]

বাঃ রে—প্রতি-নমস্কার করলেন না?

সুরমা। আচ্ছা, আচ্ছা...নমস্কার।

[সে হাসিয়া ফেলিল]

[যবনিকা পড়িল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

সকাল বেলা। বিরামবাড়ির সেই ঘর, যেখানে শ্যামল খুন হইয়াছিলেন। এই পনের বৎসরে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, ঘরের আর সেই আগেকার স্ত্রী নাই। দেয়ালে মার্বেল-পাথরের একখানি স্মৃতি-ফলক স্থাপিত হইয়াছে। ঠিক তাহারই উপরে শ্রামলনাথের একখানা বড় তৈলচিত্র টাঙানো আছে। আসবাবপত্রের বাছল্য নাই—খানকয়েক টল ও বেঞ্চি একপাশে পড়িয়া আছে।

মঞ্চের আলো জ্বলিলে দেখা গেল নির্মল স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ লেখাটা সশব্দে পড়িতেছে। বাহির দরজার বন্ধ উকি দিতেছিল, নির্মল হাতের ইঙ্গিতে তাহাকে সরিয়া যাইতে নির্দেশ করিল।

নির্মল। ফলকের লেখা পড়িতেছে বিপ্লবের সহায়, পরম ধার্মিক প্রাতঃস্মরণীয় প্রজাবন্ধু শ্রামলনাথ মজুমদার মহাশয় সন ১৩৩৩ সালের ২৭শে আষাঢ় এই গৃহে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহারই পুণ্যস্মৃতিতে শোকার্ভ প্রজামণ্ডলী কর্তৃক এই প্রস্তর-ফলক উৎকীর্ণ হইল।

[নির্মল পড়িতেছে, এমন সময়ে ভিতরের দিককার পর্দা ঠেলিয়া সন্ধ্যারাগী প্রবেশ করিলেন; পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া নির্মল হাসিমুখে তাঁহাকে নমস্কার করিল]

নির্মল। নমস্কার! বড় জরুরি ব্যাপার—তাই খবর পাঠিয়েছি।

সন্ধ্যারাগী। বেশ করেছে, বাবা। বোসো—বোসো। আমিই যে তোমার ডেকে পাঠাচ্ছিলাম—

নির্মল। কেন?

সন্ধ্যা। তোমার গালি দেব বলে। মনের মধ্যে অভিমানের পাহাড় জমে উঠেছে, বাবা। ঐ বাঁর ছবি, তাঁর কথা মনে পড়ে?

নির্মল। (নিঃশ্বাস ফেলিল) আমি ওঁর ছেলে ছিলাম, আমি ওঁকে বাবার মতো দেখতাম।

সন্ধ্যা। আর ওঁরই এই বিরামবাড়ী কাল রামেশ্বর রায়ের কাছে বিক্রি করে দিয়ে এসেছি। সে যে কত বড় দুঃখে—

নির্মল। (অকস্মাৎ কর্ণশ্রবণকঠোর হইয়া উঠিল) এমন চমৎকার বাড়ীখানা...বিক্রি করলে, দুঃখ ত হবেই। তা

ছাড়া এটা ছিল আপনারই সম্পূর্ণ নিজস্ব—ওঁর নয়, মজুমদার এন্ট্রিটেরও নয়—

সন্ধ্যা। হুগ্গে সেজন্ত নয়, নিশ্চল। একমাস এসেছি এখানে। মাতব্বর প্রজাদের কেউ বাকি নেই—আমি আর সুরমা সবাইকে ডেকে ডেকে এনেছি। তাদের প্রজাবন্ধুর মেয়ে এই ঘরে বসে এত কাতর মিনতি জানাল, কেউ কানে নিল না। নিলামের টাকার কোন উপায় হল না। তোমরা যে মানা করে দিয়েছ, সেইটেই সকলের চেয়ে বড় হয়ে রইল।

নিশ্চল। মানা করিনি, মিথ্যে রটনা। বন্ধার জলে বছর বছর প্রজাদের ঘর-বাড়ী ভেঙে যায়, ক্ষেত-খামার, লাঙ্গল-গরু ভেসে যায়—কি আছে তাদের? কোথেকে দেবে? এবারে ভৈরবে বাঁধ বাঁধা হচ্ছে, দেশের দিন ফিরছে। তখন সব হবে। আপনার কাছে তার সাহায্য নিতে এসেছি।

সন্ধ্যা। চাঁদা?

নিশ্চল। কিছা বলব, প্রজাদের পাওনা। বিরাম-বাড়ীর কাছারি ঘরে তারা চিরকাল রক্তের মতো টাকা চেলে গিয়েছে—এখন জীবন-মরণের সময় তারা কিছু পাবে না—তা কি হয়?

সন্ধ্যা। কিন্তু রামেশ্বর রায় ত বাঁধ বেঁধে দিচ্ছে। এই লোভ দেখিয়ে তাদের হাত করে ফেলেছ। আবার চাঁদা চাও—সে কি পিছিয়ে পড়ল?

নিশ্চল। বাঁধের টাকা রায় মশায় দেবেন। তার উপর ছোটো Sluice gate হল এন্ট্রিটের বাইরে। সে টাকা ত চাইতে পারি না—তারই দরুণ হাজার পাঁচেক আমাকে তুলে দিতে হচ্ছে।

সন্ধ্যা। কত উঠল?

নিশ্চল। পাঁচ হাজার পয়সাও নয়। কারো এক ফোঁটা রক্ত থাকতে ছেড়েছেন? আপনাদের কত দয়া! তাই ভেবে চিন্তে বড়লোকের কাছেই এলাম। ছ-চার আনা নয়—এক সঙ্গে ছ-চার হাজার।

সন্ধ্যা। বড়লোক নই আমরা। এককালে অবস্থা মজুমদারেরা সে কথা বলতে পারত—

নিশ্চল। (বিরক্ত স্বরে) চুলোর যাক। তর্কের সময় নেই। টাকা ত অনেকগুলো আছে—তাই দিন—

সন্ধ্যা। কোথায় টাকা? এন্ট্রিট নিলামে উঠছে, টাকার জন্ত বাধ্য হয়ে বাড়ী বিক্রি করলাম—

নিশ্চল। কাল রাতে বাড়ী বিক্রির চার হাজার টাকা রায় মশায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। তার এক পয়সাও খরচ হয়নি।

সন্ধ্যা। সেই টাকা চাইতে এসেছ?

নিশ্চল। হ্যাঁ.....অমন করে চেয়ে রইলেন যে! সেই টাকাই। আজ পঞ্চমী, ভর কোটাল—নদীর জল ফেঁপে ফুলে উঠছে। এমন দিনে গল্প করবার সময় নয়।

সন্ধ্যা। আশুক সুরমা, আশুক নন্দলাল, পরামর্শ করে দেখি টাকা দেবার মালিক কি আমি?

নিশ্চল। হ্যাঁ—আপনিই। ঐ টাকা কেবল আপনারই। শ্রামল মজুমদার বিরাম বাড়ির ষোল আনা আপনাকে লিখে দিয়ে যান। আমরা তা জানি।

সন্ধ্যা। তাই যদি হয়, এর থেকে চাঁদা চাইবার অধিকার তোমার নেই। আমি এন্ট্রিটের জমিদার নই—

নিশ্চল। কিন্তু বিরামবাড়ি নেবারই কি অধিকার আপনার ছিল?—রাগ করছেন কেন? ফাঁকির জিনিষ যদি একটা সংকাজে লেগে যায়, সে তো ভালই।

সন্ধ্যা। (উত্তেজিত স্বরে) তুমি বাড়ী বয়ে অপমান করছ। বেরিয়ে যাও—

নিশ্চল। টাকাটা পেলেই বেরিয়ে যাব, তার আগে নয়, আমরা জানি, কে আপনি। জানাজানি হয়ে যাবে, তাতে কাজ নেই।

সন্ধ্যা। (ভয় পাইয়াছেন, কণ্ঠস্বরে স্থলিত ভাব প্রকাশ পাইতেছে) কি জান? কি বলবে তোমরা? কিছু ত বাকি রাখলে না। মিথ্যে অপবাদে আমি ডরাই না।

নিশ্চল। মিথ্যে কি সত্যি চিঠিতে প্রমাণ হবে (শ্রামল নাথের লেখা চিঠিখানি বাহির করিল) দেখুন—চিনতে পারেন? এই চিঠি শ্রামল নাথ আপনাকে লিখেছিলেন। কি সব লিখেছিলেন, মনে আছে ত এদিন পরে?

সন্ধ্যা। কোথায় পেলে এ চিঠি? দাও—দাও [সন্ধ্যারগী চিঠি কাড়িয়া লইতে গেলেন, নিশ্চল সরাইয়া লইল]

নির্মল। উহ—পাবেন না। চিঠি দান করতে আসিনি
...বিক্রি করতে পারি। পুরো চার হাজার টাকা; একটি
পয়সা কম নয়। (হাসিতে লাগিল)

সন্ধ্যা। (বিরক্তভাবে বসিয়া পড়িল) টাকা আমি দেব
না...চাই না চিঠি। যা ইচ্ছে করো।

নির্মল। আজকে অন্তত পাঁচশ লোক বাঁধে কাজ
করছে। তাদের জমায়ত ক'রে পড়া হবে এই চিঠি। দেশ
স্বল্প লোক জানবে, কেমন করে আপনি ভালমাস্থ্য শ্রামল
নাথকে পাঁকের মধ্যে নামিয়েছিলেন, এই বিরামবাড়ী আপনি
নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন সুরমা দেবীকে বঞ্চিত
করে—

সন্ধ্যা। সুরমা—আমার মেয়ে—তাকে বঞ্চিত করব আমি ?

নির্মল। সত্যি সত্যি মেয়ে নয়। ও অভিনয়ের কথা।
আপনি শ্রামলনাথের পত্নী নন—লোকে যা জানে তা ভুল।
আপনি জালিয়াতের বউ। আপনার নামে আর আপনার
স্বামীর নামে ওয়ারেন্ট বুলছে। পুলিশে জানলে হাতকড়ি
দিয়ে নিয়ে যাবে। সকলে ছি ছি করবে, সুরমা দেবী স্বর্ণার
মুখ ফিরিয়ে রইবেন—

সন্ধ্যা। না, না—নির্মল! তুমি ভাগী, দেশপ্রেমিক—
অত নির্ভর তুমি হোয়ো না। আমি সব সইতে পারি, সুরমার
স্বর্ণা সইতে পারব না। সে স্বর্ণা করবে, তবু কাঁদবে—তার
যে বিশ্বজগতে কেউ থাকবে না। হাত জোড় করে বলছি,
দয়া কর নির্মল, বাঁচাও—চিঠি দিয়ে দাও।

নির্মল। দাম দিন। চার হাজার টাকা—

[সন্ধ্যারাগী ভাবিতে লগিলেন, তাঁহার জ-কুক্ষিত হইল]

সন্ধ্যা। এ চিঠি শ্রামল মজুমদারের পোর্টফোলিওর মধ্যে
ছিল; খুন হবার সময় সেটা চুরি যায়। তুমিই খুন করেছ
তাকে।

নির্মল। পনের বছর আগে আমার বয়স ছিল বারো।

সন্ধ্যা। খুন করেছে ঐ রামেশ্বর রায়, যার পায়ের নীচে
মাথা বিকিয়ে বসে আছ। ঐ লোক ছাড়া কারও সাধ্য
নেই, এত বছর পুলিশের চোখে-ধুলো দিয়ে বেড়াবার। এখন
নির্ভাবনায় সেই সব চিঠিপত্র সাক্ষরদেদের দিয়ে দিচ্ছে
ব্রাকমেল করবার জন্য। খুনীকে আমি ধরিয়ে দেব, আমি
তাকে ফাঁসি দেওয়াব—

[বল্লভ আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেন, বাহিরের
দরজা দিয়া সে প্রবেশ করিল]

বল্লভ। ধরিয়ে দেবে? বল কি ঠাকরণ? আমি ত
ভেবেছিলাম, জানতে পারলে খুনীকে তুমি পুজো করবে।

সন্ধ্যা। তার মানে ?

বল্লভ। ভুলে গেছ? শ্রামলনাথ তোমার হাত এঁটে
ধরল। তুমি চোঁচিয়ে উঠলে। এই ঘরে, এইখানে। আঁধার
রাত—আকাশে তারা ছিল না। যে ভগবানের নামে তুমি
ডাক দিলে, সেও ছিল না। ডাক পৌঁছল ডাকাতের কানে।
শ্রামলনাথের বুকে গুলি মেরে তোমার ইজ্জত বাঁচাল। তুমি
তাকে ধরিয়ে দিতে চাও, ঠাকরণ?

সন্ধ্যা। উঃ—আজও একটা গুলি করতে পার? করো—
করো...আমি আর পারছি নে।

[সন্ধ্যারাগী অচেতনের স্থায় এলাইয়া পড়িল]

নির্মল। (বিরক্ত ভাবে বল্লভের দিকে তাকাইল) তুমি
চুকেছ কেন বল্লভ? বাইরে যাও। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে
বিশী হবে। বাইরে বসে যেমন নজর রাখছিলে তেমনি
থাকোগে। উনি একটু সামলে উঠেই টাকা দিয়ে চিঠিটা
কিনে নেবেন। টাকা পেলেই তোমাকে দেব, লোহওয়ালাকে
দিয়ে এসো। (একটু স্তব্ধ হইল) আমার এখানে থাকা অকারণ
নয়, অস্বাভাবিকও নয়। স্বর্গীয় শ্রামলনাথ এত ভালবাসতেন,
তাঁর মৃত্যু-দিনে তাঁরই জীবনের একটা বড় অস্থানের প্রায়শ্চিত্ত
হয়ে যাচ্ছে। [বল্লভ চলে গেল, সন্ধ্যারাগী সোজা হইয়া
বসিল]

সন্ধ্যা। নির্মল, ঐ ছবির দিকে আর একবার চেয়ে
দেখ। ওর মেরেকে ঐ রকম করে ভাসিয়ে দিতে পারবে?

নির্মল। তা পারব। হাজার হাজার ঘর ভেসে যাচ্ছে,
তাদের বাঁচাতে একটা মেয়েকে ভাসিয়ে দিতে পারবো না—এত
কাপুরুষ ভাবেন আমার?

সন্ধ্যা। বিবেকে বাধবে না? না, তাও রামেশ্বর রায়ের
পায়ে ডালি দিয়েছ?

নির্মল। বিবেক নেই, ধর্ম অধর্ম কিছু আমার নেই,
শ্রামলনাথ ছিলেন বাপের মতো, সত্যি সত্যি বাপ নন।
কিন্তু একদিন সত্যিকার বাপ-মাকে চোখের জলে ভাসিয়ে
বিদায় নিয়েছিলাম। আজ ওপারে গিয়ে তাঁরা হয়ত শান্তি

পেয়েছেন। আর আমি কখনও ডিটেনশন্ ক্যাম্পে কখনও বা অজানা গ্রামপ্রান্তে বন্দী হয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছি। ...কিন্তু এ সব বাজে কথাবার্তা। সুরমা দেবী সত্যি সত্যি ভাসছেন না, এষ্টেট বাচাবার চের উপায় আছে, সুরমা দেবীর নিজেরও বিস্তর গহনা রয়েছে...কলকাতায় সে দিন খুলে দিছিলেন আমি নিইনি (ক্লটকর্টে) যান, টাকা আনুন। চিঠি দিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে, কেউ জানতে পারবে না। সত্যি, আজ দেবী করবার সময় নেই।

[সন্ধ্যারাপী পর্দা সরাইয়া ভিতরের দিকে নিজাক্ত হইল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাহির দরজা দিয়া সুরমা প্রবেশ করিল। তার সর্বাঙ্গ সজ্জ, হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে, মুখের কোতুক-হাস্য কিন্তু বিলীন হয় নাই। নির্মলকে দেখিয়া সুরমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]

সুরমা। সারা সকাল আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে মরছি, নির্মল বাবু।

নির্মল। জলে ডুব দিয়ে দিয়ে নাকি? আমাকে তুমি জলচর মনে করেছ, সুরমা?

সুরমা। প্রজাদের মধ্যে তোমার কাজ। একটা ডিঙি নিয়ে তাই এপাড়া-ওপাড়া সব জায়গায় সকলের ঘরে ঘরে ঘুরেছি। তারপর দাঁড়িটাকে সরিয়ে Rowing করতে গিয়ে রপ্পাস করে খালে পড়ে গেলাম। (খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল) আর তুমি দিবি এখানে বসে রয়েছ!

নির্মল। কি করব বলো। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বিদায় করবে। এখনো পাইনি যে! পেলেই চলে যাবো, দেখো।

সুরমা। তোমার দেশে তুমি থাকবে, আমি বিদায় করতে যাব কেন? আর তুমিই বা তা শুনবে কেন?

নির্মল। আচ্ছা, দিয়ে দেখ টাকাটা—

সুরমা। টাকা সস্তা কিনা! কেউ যদি টাকা দিতে যায়, আমি মানা করব...হাত এঁটে ধরব।

নির্মল। তার মানে। আমাকে এখানে আটকে রাখতে চাও। এই তোমার মতলব?

সুরমা। নিশ্চয়। এখানে রাখব...তবে রামেশ্বর রায়ের মোসাহেবি করতে দেব না। বরঞ্চ নূতন কোন মনিব চাও

তো ভেবে দেখতে পারি।...বোসো, কাপড় চোপড় ছেড়ে আমি আসছি এখুনি।

[সুরমা গমনোদ্যত। পিছন হইতে নির্মল তাহাকে ডাকিল]

নির্মল। আজ সময় নেই, সুরমা—

সুরমা। (মুখ ফিরাইয়া) আচ্ছা আধঘণ্টা। তা-ও নয়? পনের মিনিট? চা খেয়ে যাবে। নন্দদার ব্যবস্থায় কোন কিছুই অভাব নেই। কলকাতা থেকে কত আসবাব এসেছিল জানো। এখন বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে—মা বলছে আবার সব বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

[হাসিতে হাসিতে সুরমা ভিতরে ঢুকিল একটু পরে সন্ধ্যারাপী প্রবেশ করিল]

সন্ধ্যা। নাও টাকা [নির্মল নোটগুলো দেখিয়া লইল। তারপর হাসিয়া চিঠিখানা আগাইয়া দিল।]

নির্মল। নিন চিঠি, [চিঠি পাইয়াই সন্ধ্যারাপী উহা টুকরা টুকরা করিয়া হাতের মুঠায় রাখিল]

সন্ধ্যা। যাও...দেবী করছ যে!

নির্মল। সুরমা দেবী বসতে বলে গেলেন।

সন্ধ্যা। দেখা হবে না...আর তোমায় ভয় করি না, চলে যাও (নির্মল উঠিল) শোন...একটা কথা। সুরমা গয়না খুলে দিচ্ছিল, তুমি নিলে না কেন? আর সেই বা আমায় না জানিয়ে দিতে গেল কেন?

নির্মল। নিতে পারলাম না, হাত কাঁপতে লাগল। সেটিমেন্টের বালাই একেবারে নিঃশেষ হয়নি দেখলাম। সুরমা দেবীর গায়ের গয়না নষ্ট করতে প্রাণে লাগল। তিনি কেন দিতে গেলেন, সে তিনি জানেন। হয়ত আমাকে স্নেহ করেন, আমার কাজ তাই নিজের বলে নিচ্ছেন।

সন্ধ্যা। এই টাকা ত দিবি হাসিমুখে নিতে পারলে। শোন নির্মল, মনে মনে তোমার পরে শ্রদ্ধা ছিল। আজ থেকে এমন হয়ে গেল যে, রামেশ্বর রায়কেও আমি অত ঘৃণা করি না।

নির্মল। আমার কিন্তু আনন্দ হচ্ছে রাণীমা। শ্রামলনাথ মোহের বশে যে অকাজ করেছিলেন, তার একটা সঙ্গতি হল। মনে বড় শান্তি পেলাম। নমস্কার!

(নির্মল বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যারাপী মাথায় হাত

দিয়া অবসরের মতো বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে বাহিরের দিক হইতে নন্দলাল প্রবেশ করিল]

নন্দ। নিশ্চলের মতো দেখলাম। নিশ্চল বেরিয়ে গেল না?

[বেশ পরিবর্তন করিয়া সুরমা ঘরে ঢুকিল]

সুরমা। নিশ্চল বাবু কোথায় মা, তাঁকে বসতে বলে গেলাম—

সন্ধ্যা। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। আর না আসে, তাও বলে দিয়েছি। নন্দলাল আবার পাড়ায় বেরিয়েছিলে?

নন্দ। আজ সাতাশে আষাঢ়। সেই কথাটা সকলকে মনে করিয়ে দিয়ে এলাম। আগে কখনও মনে করাতে হয়নি, প্রজারা আপনি দলে দলে আসত। কিন্তু দিনকাল বড় ধারাপ হচ্ছে, রাণীমা।

(নন্দলাল একটু চুপ করিল) একটা কথা বলি রাণীমা! নিশ্চলটা এমন নেকহারাম...ওর পরে রাগ হবারই কথা। তবে অবস্থা বিবেচনায় রাগারাগিটা না করলেই বোধ হয় ভাল হয়।

সন্ধ্যা। নিশ্চল রামেশ্বর রায়ের ডান হাত—

নন্দ। সেইজন্তে এখন দরকার হয়েছে, নিশ্চলকে হাতে রেখে রামেশ্বরের ডানহাত ভেঙে দেওয়া। আর তা পারবে আমার এই খুকী দিদি। সেদিন দিদি, শুধু তাদের থিয়েটার দেখিনি, অনেক কিছু ভেবে দেখেছি। রাণীমা, পার ত নিশ্চলের সঙ্গে খুকীর বিয়ে দাও। বাবুর সেই ইচ্ছে ছিল। নিশ্চল সহায় হলে আমাদের ভাবনা কি? আমার ত এই মত।

সন্ধ্যা। আমার মত তা নয়!...সুরমা, নিশ্চল তোমার বাপের অমর্যাদা করেছে, সে আমাদের বড় শত্রু। আর তার সঙ্গে মেলামেশা করো না। আমার কথা শুনবে?

সুরমা। কিন্তু রামেশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক যদি চুকে যায়। এই বাঁধ হয়ে গেলেই আর সম্পর্ক থাকবে না—আমায় বলেছেন।

সন্ধ্যা। তবু নয়—কোনদিন নয়। কি...সায় দিতে পারছ না! এই প্রথম মায়ের সঙ্গে মেয়ের মত মিলছে না। মেয়ে বড় হয়েছে, মেয়ের আমার বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে, মায়ের কথা পছন্দ হয় না। বেশ তাই হবে। মায়ের যখন দরকার নেই, মা তোমাদের পথের বাধা হয়ে থাকবে না [ভাবাবেগে সন্ধ্যারাগীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল]

সুরমা। এ তুমি কি বলছ মা, কেন বলছ? আমি কি করেছি যে এমন করে বলতে পারলে আমার?

[উদ্যত অশ্রু রোধ করিতে করিতে সুরমা দ্রুত পলাইয়া গেল]

নন্দ। তোমার মন ভাল নেই, রাণী মা! হঠাৎ এই রকম উত্তেজিত হচ্ছে। তুমি আমার শাস্ত লক্ষ্মী মা, কি হয়েছে বলো—বুড়ো ছেলেকে গোপন করো না।

সন্ধ্যা। ঐ—ওঁকে খুন করেছিল কে জানো? রামেশ্বর রায়—

নন্দ। (চমকাইয়া উঠিয়া) বল কি? কোন প্রমাণ পেয়েছে?

সন্ধ্যা। না...ঠিক প্রমাণ পাই নি। কিন্তু আমার মন বলছে, আমার নিশ্চিত ধারণা। নিশ্চলের সঙ্গে কথা বলে আমার সন্দেহ আরও বাড়ল।

নন্দ। তা হলে নিশ্চলটাকে হাত করা আরও দরকার। নিশ্চল থাকলে জানোয়ারটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাতে একটা মাসও লাগবে না।

সন্ধ্যা। আর...আর এই বাড়ী বিক্রীর দরুন যে টাকা কাল পেলাম, সমস্ত চুরি হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস তাতে নিশ্চলের হাত রয়েছে। তাই তাকে ডাকিয়ে এনেছিলাম।

নন্দ। টাকা চুরি হয়ে গেছে? কি সর্বনাশ!

[নন্দলাল তন্তুত হইয়া তাকাইল। সন্ধ্যারাগী দৃষ্টি নত করিল। মঞ্চ ঘুরিয়া—আমাদের সামনে নতুন দৃশ্য উদ্ভাসিত হইল।

(ক্রমশঃ)

বাড়গ্রামের পত্র

ত্রীপঞ্চানন নিয়োগী

বাড়গ্রাম
জেলা মেদিনীপুর
৬/১০/৪১

পরম কল্যাণীয় ননীবাবু,

বিজয়া দশমীর আপনার নমস্কার পত্র পাইলাম। আপনারা আমাদের স্নেহাশীষ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিবেন। কলিকাতা হইতে এইরূপ পত্র অনেকগুলি পাইয়াছি। প্রবাসে সেগুলি বড়ই তৃপ্তিদায়ক এবং উহাদের উত্তর দান কালে এখানকার মূল্যহীন অবসর-মুহূর্ত্ত অনেকটা কাটিয়া যাইতেছে।

এখানে পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করিতেছি। স্বাস্থ্যের পক্ষে এরূপ বিশ্রাম একান্ত আবশ্যিক। কলিকাতায় আমাদের মত লোকের অনেক কাজ, বা অনেকের মতে ‘অকাজ’—যথা, সমস্ত দিনই কলেজ, সমিতি, মিটিং, বক্তৃতা, পার্টি, ইত্যাদি। ইহাতে দেশের কাজ যত হউক আর নাই হউক পরমায়ু ক্ষয় খুবই হয়। এখান হইতে ফিরিয়াই আবার সেই সব কাজই করিতে হইবে। তজ্জন্ত সর্বচেষ্টাবিরতির দ্বারা এই এক মাস কাল শারীরিক সামর্থ্যের উপযোগী রসদ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছি। ভরসা এই যে পরবর্তী ছয়মাস কাল শরীরের কলকল্যাণগুলি অনেকটা কৰ্ম্মঠ থাকিবে। গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বৎসরে দুইবার, গ্রীষ্ম ও পূজার বন্ধে, শরীরটাকে এইরূপ সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়া উহাকে এখনও অনেকটা কার্যক্ষম করিয়া রাখিতে পারিয়াছি।

এই স্থানটি আমি খুব পছন্দ করি। এটা বাংলাদেশের মধ্যেই অবস্থিত। চতুর্দিকে শাল বৃক্ষের সারি ও বন, তাহার মধ্যে বাড়ী ও রাস্তা। স্থান বেশ স্বাস্থ্যকর। বাড়গ্রাম সহর ও, পল্লীগ্রামের মাঝামাঝি কোনও একটা নাম হইতে পারে! ‘পল্লীসহর’ বা ‘সহর-পল্লী’ এইরূপ একটা নাম গঠন করিলে কিরূপ হয়? এটা যে পল্লীগ্রাম নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, এখানে পাঁকা লাল রাস্তা, দৈনিক বাজার, এম, বি, ডাক্তার, ছোট হাঙ্গামাঘর, মোটর, বাস, ডাকবাংলা, সরকারি কাছারি,

মায় জেলখানা পর্যন্ত আছে। এটা যে সহর নয়, তার প্রমাণ যে এখানে ইলেকট্রিক নাই, পিচ্ দেওয়া রাস্তা নাই, জলের কলও নাই। এইরূপ ‘পল্লী-সহর’ইত অবসর বিনোদনের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। শালবনের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইতে খুবই ভাল লাগে। বনের মধ্যে সকলে মিলিয়া পিকনিক করিবার অনেক স্থান আছে। কাছাকাছি অনেকগুলি পরিবার মিলিয়া এইরূপে পিকনিক করিয়া আমরাও খুব আনন্দ পাইয়াছি।

আমি যে বাড়ীতে আছি তাহার কম্পাউণ্ড চারিবিধা জমি। সে জমির মধ্যস্থলে এক আবলুশ বৃক্ষের তলদেশে আমি বসিবার স্থান বা বৈঠকখানা করিয়াছি। পাশের এক পাঠশালা হইতে তিনখানি বেঞ্চি ও মাষ্টার মশায়ের বসিবার চেয়ারখানা পাইয়াছি—তাহাই আমার ফারনিচার। পাঠশালাটি এখন পূজার ছুটিতে বন্ধ। এই আবলুশ বৃক্ষের তলদেশে মাষ্টার মশায়ের চেয়ারে বসিয়া একখানা বের্থকে টেবিল করিয়া এই পত্র লিখিতেছি। কি রোমান্টিক বলুন ত? কলিকাতায় প্রাতে সাতটা হইতে রাত্রি আটটার মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্রাদির সংবাদ বড় রাখিবার অবসর ছিল না। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, যে সেখানে সমস্ত দিনই ‘কাজ’। এখানে কিন্তু আমি একেবারে ‘অকেজো’। এখানে আমি বসিয়া এই পত্র লিখিতেছি, স্ত্রী সামনে বসিয়া কি একটা সেলাই করিতেছেন, পুত্র কতারা অদূরে ব্যাডমিণ্টন কোর্টে খেলা করিতেছে। ক্ষুদ্র দৌছিত্রিটা তাহাদের বল কুড়াইয়া দিতেছে। দেখুন, সাহেবদের বিবাহের পর হনিমুন হয়। হনিমুনটা যে কি ব্যাপার, আমরা ভারতবাসী তাহা জানি না। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে এই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌছিত্র লইয়া প্রবাসে অবসর যাপন—এও এক প্রকার হনিমুন, তাহাতে সন্দেহ নাই! আপনি এম্, এ পাশ করিয়াছেন, ইন্দুমতীর মৃত্যুতে রাজা অজের খেদোক্তি—স্ত্রী, গৃহীণী, সচিব, প্রিয়-সখী, ললিতা, কলাবিৎ, এবস্থিৎ সঙ্ঘোদনের সহিত

নিশ্চয়ই পরিচিত আছেন। সকল স্ত্রী ললিতা বা কলাবিৎ নাও হইতে পারেন, কিন্তু সকল স্ত্রী প্রকৃত পক্ষে স্বামীর গৃহিণী, সচিব, প্রিয়সখী হন নিশ্চয়ই, কিন্তু যৌবনে নহে, প্রৌঢ় বয়সে। বিবাহের পর যখন নব বধু স্বামীগৃহে আসেন সেইদিন হইতে তিনি শ্বশুর ও শাশুড়ীর “বৌমা” হইলেন। তাঁরাই তাঁহাদের বৌমাকে গ্রেপ্তার করিয়া সংসার কার্যে দক্ষতা অর্জন বিষয়ে উপদেশ ও আদেশ দিতে লাগিলেন। বধুর স্বামী সন্দর্শন মিলিতে লাগিল সংসারের কাজকর্মের পর রাত্রি দশ ঘটিকার পর। তারপর এই বধু যখন পুত্র কন্যার মাতা হইলেন তখন তিনি ক্রমেই গৃহিণীর গ্রেডে উন্নীত হইলেন। পরে ইনিই তাঁহার নিজের পুত্র কন্যার বিবাহ দিলেন। বধু যেরে আসিল, জামাট হইল, পোত্র দৌহিত্র হইল—তখন তিনি সংসার সাভিসের ‘ডিরেক্টর’ পদে প্রামোশন পাইলেন, তখনই তিনি বাস্তবিক স্বামীর গৃহিণী, সচিব, প্রিয়সখী হইলেন। আপনারা এখনও যুবক, কথাটা বুঝিবেনও না, মানিবেনও না। আমার বয়স প্রাপ্ত যখন হইবেন তখন বুঝিবেন, তখন অবশ্যই মানিবেন।

যাক্ ধান ভানিতে শিবের গীত অনেক হইল। বলিতেছিলাম এই পল্লী সহরটি আমার খুব ভাল লাগে। এখানে সাধারণ প্রাণীও অনেকগুলি হইয়াছে। ছয় সাত মাইল দূরে ‘বোধনা’ নামে ক্ষীণবুদ্ধি বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যায়তন অনেক দিন আছে। সম্প্রতি সেখানে একটি ক্ষুদ্র রেল-স্টেশনও হইয়াছে—অনেক লোক ঘর-বাড়ী করিতেছে। অল্প একদিকে প্রায় সমপরিমাণ দূরে—এংলো-ইণ্ডিয়ানরা ‘শালবনী’ নামে একটি ‘কলোনী’ করিয়াছে। অনেক জমি তাহারা লইয়াছে। উদ্দেশ্য তাহারা চাষ-বাস করিয়া থাইবে। ‘নাহেব’ লোক কিরূপ চাষবাস করিয়া থাইতেছে দেখিবার জন্য এক বৎসর বড় দিনের ছুটিতে এখানে আসিয়া ‘শালবনী’ দেখিতে গেলাম। সঙ্গে আরও পাঁচ সাতজন পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। দেখিলাম অনেকগুলি অবসর-প্রাপ্ত এংলো-ইণ্ডিয়ান এখানে বাড়ী করিয়াছেন। চাষ আবাদের চিহ্ন খুব কমই দেখিলাম। তবে বাগান বাগিছা করিয়া শাক-শব্জি তাঁহারা করিয়াছেন। ইহারা খুব ভদ্র। প্রত্যেক বাটীতে আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেলেন ও ছেলে-মেয়েরা গান শুনাইল ও নাচ দেখাইল। কেব ইত্যাদিও থাইতে দিল।

ঝাড়গ্রামের নতুন রাজবাটা একটা দেখিবার জিনিষ। পুরাতন রাজবাটা ভাঙ্গিয়া নতুন ষ্টাইলে রাজবাটা সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে। উহার বিস্তীর্ণ বহির্বাট ও বাগানে সকলের প্রবেশাধিকার আছে এবং উহা এখানকার ‘ইডেন গার্ডেন’ স্বরূপ। রাজবাটার কিছু দূরে লেডী অবলা বন্থ মহোদয়া ছ বৎসর আগে তাঁহার কলিকাতার ‘বাণী ভবনের’ একটি শাখা স্থাপন করিয়াছেন। ঝাড়গ্রামের রাজা বিনামূল্যে পঁচিশ বিঘা জমি এবং অর্থও দান করিয়াছেন। ইহার উদ্বোধন করেন বন্ধের গভর্নর বাহাদুর। লেডী বন্থর সহিত আমরা দশ-বারো জন পুরুষ ও মহিলা এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে ঝাড়গ্রাম আসিয়াছিলাম এবং রাজবাটাতে অতিথি হইয়াছিলাম। বাণী-ভবনের এই শাখাটির কার্যকলাপ সরোজনলিনী এসোসিয়েসনের পুরী-বিধবাশ্রমেব অনুরূপ। এখানে এখন সতেরটি বিধবা বাস করেন ও তাঁহাদিগকে সাধারণ ও শিল্প শিক্ষাদান করা হয়। কলিকাতার এত নিকটে (দূরত্ব ৯৬ মাইল) এরূপ স্থায়িক স্থানে আরও বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই গড়িয়া উঠিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এখানে উপার্জনেরও অনেক উপায় রহিয়াছে দেখিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি ঝাড়গ্রামের চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ শালবন—রাজার জমিদারি। এই সকল শাল বন হইতে জালানি কাঠ আহরণ করিবার অধিকার রাজবাড়ী হইতে বৎসর বৎসর ইজারা দেওয়া হয়। এই জালানি কাঠ আহরণ ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে চালান দেওয়া এই স্থানের একটা প্রধান ব্যবসা। ইহাতে ঝাড়গ্রামের রাজার বাৎসরিক আয় হয় এক লক্ষ টাকার উপর। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিঘা শালবন ছয়টা বড় বড় বিভাগ বা প্লটে বিভক্ত করা হয়। আবার একটা একটা বড় প্লট ছোট ছোট বিশ পঁচিশটা সাব-প্লটে বিভক্ত হয়। এই ছয়টি বড় প্লটের এক একটির সব প্লটগুলিতে যত শাল গাছ আছে সেগুলি এক বৎসরের মধ্যে ষাটগা জালানি কাঠে পরিণত করিবার অধিকার বৎসর বৎসর নিলাম করা হয়। ছয় বৎসর পরে কর্তৃত শালবৃক্ষগুলি আবার বড় হইয়া পূর্বাধিকৃত প্রাপ্ত হয়। তখন সেগুলি আবার নিলাম হয়। এক একটি সাব প্লটের ডাক হয় তিন চারি হাজার বা ততোধিক টাকা। সব টাকা একসঙ্গে দিতে হয় না—কিস্তিবন্দিতে দেওয়া যাইতে পারে। এ বৎসর গত ৭ই অক্টোবর তারিখে জঙ্গল-নিলাম হইল।

শুনিলাম। জঙ্গলের কারবারিরা কিন্তু প্রায় সকলেই মাড়োয়ায় বা হিন্দুস্থানী। পূর্বে বাঙ্গালী প্রায় ছিল না বলিলেই হয়; এবার কয়েক জন বাঙ্গালী নিলামে কয়েকটি সাব প্লট লইয়াছেন শুনিলাম। লাভ যথেষ্ট হয়; টাকাও খুব বেশী লাগে না— দুই তিন হাজার টাকা মূলধন হইলেই কাজ আরম্ভ করা যায়। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, চাকুরীই ভাল বুঝি, ব্যবসায় অনিশ্চিত ভাগ্য পরীক্ষা করিতে নারাজ।

এখানে জঙ্গল হইতে আরও অনেক প্রকার জিনিস আহরণ করিয়া মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীরা লাভপতি হইয়াছেন ও হইতেছেন, কিন্তু আমরা বাঙ্গালীরা কেবল বসিয়া বসিয়া ব্যবসা সম্বন্ধে গল্পই করি, বড় জোর এক আধটা ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখি। শুনিলাম আমার যে বাড়ীওয়ালা তিনি শালপাতা ও বিড়িপাতা আহরণ করিয়া চালান দিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন। গাড়ী গাড়ী শালপাতার তাড়া রাস্তা দিয়া রোজ যাইতেছে দেখিতেছি। আমরা শালপাতার চৌদ্দাতে জিলাপী রসগোল্লা খাইতে অভ্যস্ত, সিগারেটের অভাবে বিড়িপাতায় প্রস্তুত বিড়ি এই টানিতে অভ্যস্ত, আর মাড়োয়াড়ীরা এই স্থানের জঙ্গল হইতে সব পাতা আহরণ পূর্বক চালান দিয়া লক্ষপতি হইতেছেন!

ঝাড়গ্রামের দুইটা স্টেশনের পরে চাকুলিয়া নামক স্থান। শুনিলাম সেখান হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার হতুাকি, বহেড়া, আমলকি, অনন্তমূল, প্রভৃতি বনজ দ্রব্যও প্রধানতঃ মাড়োয়াড়ীরাই চালান দেয়। ঝাড়গ্রামে দুইটি চাউলের কল আছে তাহা মাড়োয়াড়ীদের। কাছাকাছি অস্ত্রাঙ্গ স্টেশনেও অনেক চাউলের কল আছে—সেগুলিও প্রায় সবই মাড়োয়াড়ীদের। তবে ঢেঁকির চলনও এখানে এখনও বেশ আছে। অনেক পরিবার খান কিনিয়া লইয়া গিয়া ঢেঁকিতে চাউল প্রস্তুত করে এবং সেই ঢেঁকিছাটা চাউল বাজারে বিক্রয় করে। তাহাতে তাহাদের অল্পের সংস্থান হয়। এখানে আমরা সকলেই এই ঢেঁকিছাটা চাউলই খাই। কলের চাউল বিদেশে রপ্তানি হয়। সহরের কাছাকাছি ত্রিশ চল্লিশ ঘর তাঁতি আছে। তাহারা তাঁতে মোটা মোটা ধুতি, শাড়ী, বিছানার চাদর বোনে। এখানকার বাসিন্দারা তাহা কিনে। তাব মিলের কাপড়ও পরে অনেকে।

এখানে ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক মাসে আতা হয় বিস্তর,

শুনিলাম ছয় পয়সা দু আনা শ' পাওয়া যায়। দিন এক শতের উপর ঝড়ি আতা এখান হইতে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে চালান যায়। কিন্তু চালান দেয় কতিপয় পশ্চিমা ফল-ওয়ালা। পেয়ারাও বিস্তর জন্মে। অনেকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক অনেক শত বিঘা জমি লইয়া পেয়ারা গাছ লাগাইয়াছেন। তাহাতে বিস্তর পেয়ারাও হয়। সেগুলি কিন্তু উপরোক্ত পশ্চিমা ফলওয়ালারা বৎসর বৎসর কিনিয়া লইয়া নানাস্থানে চালান দেয়। গোটা দুই নাসারী আছে, সেগুলি বাঙ্গালীর। সহরের দূরে দূরে সস্তায় অনেক জমি পাওয়া যায়। বুদ্ধি খরচ করিলে ও অধ্যবসায় থাকিলে অনেক বাঙ্গালী যুবক এখানে করিয়া খাইতে পারিবেন।

একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিতেছি। কলিকাতার লোক বলিয়া আমার কাছে উহা নূতন ঠেকিতেছে বলিয়া কথাটা পাড়িতেছি। এখানে প্রায় এক বা দেড় সহস্র গরুর গাড়ী আছে, ইহাদের গাড়োয়ানেরা সবই বাঙ্গালী। কলিকাতায় বিশ ত্রিশ হাজার গরুর গাড়ী আছে, কিন্তু সকলেই জানেন যে ঐ সকল গাড়ীর গাড়োয়ানদের মধ্যে বাঙ্গালী একজনও নাই। কিন্তু বাঙ্গালীরা রিক্স গাড়ী টানে না। কলিকাতায় বোধ হয় চারি পাঁচ হাজার রিক্স গাড়ী খাটে, সেগুলি টানার লোকও সবই হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী নহে। এখানে এক ভদ্রলোক হুথানা রিক্স গাড়ী কিনিয়া আনিয়াছিলেন কিন্তু টানিবার লোক নাই, বলে রিক্স টানিলে জাতি যাইবে। অনেক কষ্টে তিনি একজন লোক পাইয়াছেন, নিম্নজাতীয় বাঙ্গালী। সে বলে যে সে দিন দেড় টাকা দু টাকা রোজগার করে। কিন্তু তাহারও জাতি গিয়াছে। হায় জাতি! লোকে জাতি যাইবার ভয়ে আগে বিলাতেই যাইত না, সেই ভয়ে আমাদের মধ্যে এক জাতি অল্প জাতির পৃষ্ঠ অন্নও খান না বা আরও অনেক কিছু করেন না। এখানে দেখিতেছি জাতি যাইবার ভয়ে নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালীও রিক্স টানিয়া দৈনিক দেড় টাকা দুটাকা রোজগার করিতেও সাহস করে না।

এইখানেই থামিলাম। লিখিবার আরও অনেক কিছু ছিল, আমার সময়েরও অভাব নাই, তবে 'বঙ্গলক্ষ্মীর' স্নানাতাব নিশ্চয়ই হইবে। একজন এদেশীয় বৈষ্ণব ভিখারী গান করিতে আসিয়াছে। সে প্রায়ই আসে। ছোট একটা খোল বা মুদঙ্গ বাজাইয়া কীর্তন গান করে। কীর্তন আমি খুব ভালবাসি।

গাইতে পারি না, তবে শুনিতে বেশ ভাল লাগে। লোকটার
গলাও খুব মিষ্ট। যে গানটি সে এখন গাহিতেছে সেটা এই :—

(হরি) কি ফুলে পূজিব রাঙ্গা চরণ তোমার।

• (শুনেছি) প্রেম ফুলে পূজিলে নাকি পূজা হয় তোমার।

তুলসী আর গঙ্গা জলে

পূজিলে নাকি তোমায় মিলে

(হরি) নয়ন জলে ধোয়াইব চরণ তোমার।

শুনেছি পূরণে আমি

সকল ঘাটে থাকো তুমি

আমার হৃদয় স্বামী ভরসা আমার।

মুখে বলব হরি হরি

ধুলায় দিব গড়াগড়ি

(দেখে বো) কর কিনা কর দয়া মিনতি আমার।

ঐ হরিনাম নিতে নিতে

যদি ও ফুল ফুটে ওঠে

ফুটলে ফুটিতে পারে নয়নেরই দ্বার।

কেমন—গানটা কি মন্দ ? ভিখারীদের মধ্যে এইরূপ ভাল

গায়ক অনেক মিলে বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন। ইহারা

সুযোগ ও শিক্ষা পাইলে ভাল গায়কও হইতে পারে। কিন্তু

এদের শেখায়ই বা কে ? এরা গরীব। এরা ভিখারী।

আজ এই পর্য্যন্ত।

ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীপঞ্চানন নিগোপী

আমাদের রবিদাদা

শ্রীস্বরূপা দেবী

ছোট্ট বেলা প্রায় বাবার (অবনীন্দ্রনাথ) মুখে শুনতাম তাঁদের রবি-কাকার গল্প, তিনি যে মানুষটি কেমন তখনও চোখে দেখি নি। এই সময় একদিন ইঠাৎ শুনলাম রবি দাদা বিলেত থেকে ফিরেছেন। বাবা ও জ্যাঠামশাই আমাদের অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দলকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন রবিদাদার তেতলার ঘরে, আমাদের হাতে ছিল ছোট ফুঁকো শিশিতে ভরা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। খুব ছোট ছিলাম কিনা তাই স্বপের মত মনে পড়ে তিনি আমাদের হাত থেকে ফুলগুলি নিয়ে সবাইকে আদর করেছিলেন। আর মনে পড়ে সেই পুষ্প-সমারোহে ও পুষ্প সমান শিশুদের মাঝে তাঁকে দেখাল কত বড়,—বুঝি এক বিরাট মহীরুহের মত অথচ কত কোমল সরল, যেন আমাদেরই একজন।

তারপর মনে পড়ে রবিদাদার বিচিত্রা স্কুল। জোড়াসাঁকোর বড় বাড়ীর নীচের তলায় আমাদের স্কুল বসত, স্কুলে কোন ক্রটিই ছিল না, ভাল ভাল মাষ্টার মশাই থেকে আরম্ভ করে ছেলে-মেয়ে ও মাষ্টার-মশাইদের জলখাবার গেল্লাস কুঁজো পর্য্যন্ত। আমরা সারি বেঁধে ছিটের থলে ভরা বই ও আসন

ঘাড়ে বিচিত্রা স্কুলে প্রবেশ করলাম, কি ভালই না লেগেছিল। রবিদাদা নিজে বড় বড় ছেলে-মেয়েদের পড়াতেন। আমাদের ক্লাস ঘর থেকে তাঁর মধুর কণ্ঠ-নিশ্চুত ইংরাজী ও বাংলা আবৃত্তি গুলি শোনা যেত, কিছুই বুঝতে পারতাম না, কিন্তু সেই অপূর্ব স্বর আমার ছোট্ট মনটির ভিতরে যে কি ঝঞ্ঝার তুলত তা কেমন করে বলি। বিচিত্রা স্কুলের সেই মেঘ-থম্থমে দিন গুলির সঙ্গে, “ছুটির পড়া”র “ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে মিলিয়ে এলো আলো” ও “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদের এলো বান” এই কবিতা যেন একই ছন্দে বাঁধা ছিল। অজস্র বৃষ্টি ঝরা দিনে মায়ের ঘরের বাগানের দিকে খড়্‌খড়ি টেনে জল-ভরা নর্দমাতে যখন “কাগজের নৌকা” ভাসাতাম, তখন মন ভেসে বেড়াত “কাগজের নৌকা” কবিতাটির ভাবে, ছন্দে। রবিদাদার গান ও কবিতা দিয়ে গাঁথা আমাদের ছোটবেলাটি ত ভালবার নয়। বিচিত্রা ক্লাব ঘরে ছোটদের প্রবেশ নিষেধ। তা ছাড়া আমার ভয়ও করত, কত বড় বড় লোক সেখানে আসতেন! আমাদের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই অজানা জায়গাটির অল্প অল্প আভাস পেতাম গানের সুরে সুরে।

হঠাৎ একদিন আমার ডাক এলো সেখান থেকে, আমার বয়েস তখন বছর নয় হবে, শুনলাম রবিদাদা ডাকছেন। ভয়ে ভয়ে বাবার মস্ত বড় শরীরের আড়ালে প্রায় লুকিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। রবিদাদা আমাকে বললেন “তুই বই পড়তে পারিস্?” আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—“দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেছি।” তিনি আমাকে ‘ডাকঘর’র সুধা-মালিনী মেয়ের পার্টটি পড়তে বললেন। কেমন পড়লাম জানি না, রবিদাদা বললেন “ঠিক হয়েছে, অবন, তুমি একে ভৈরী কর।” দুইদিন পরে বিচিত্রা হলে রিহাসাঁলের সময় তিনি একটু আধটু শিথিয়ে দিয়ে বাবাকে বললেন “এই ঠিক, বেশী শেখালে ওর সহজ সরল ভাবটি থাকবে না।” সেই সময় থেকে তিনি আমাকে মালিনী বলে ডাকতেন আর আদর করে একটি সবুজ রেশমী রুমাল দিয়ে বলেছিলেন “তোর মেয়ে পুতুলের সাজী করিস্।” আর একটি তুলনাহীন দান তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম, একখানি গান—

“ঘারে কেন দিলে নাড়া ওগো মালিনী
কার কাছে পাবে সাজা ওগো মালিনী,
তুমি ত এনেছ ফুল গাঁথেছ মালা,
আমার আঁধার ঘরে লেগেছে তালা,
খুঁজে ত পাই নি পথ আলো জালিনি;
ঐ দেখ গোধূলির ক্ষীণ আলোতে
দিনের শেষের সোনা ডোবে কালোতে
আঁধার নিবিড় হলে আসিযো পাশে
যখন রাতে তারা জলে আকাশে
অসীম পথের সাথী দীপ-মালিনী।”

তারপর বলি আমাদের ডাকঘর অভিনয়ের কথা।
অভিনয়ের দিন এগিয়ে এলো।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়, গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রের শিল্প চাতুর্যে ও নন্দলাল বসুর নিপুণ হস্তক্ষেপে বিচিত্রা হলু বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে সেজে উঠল। তেমন মঞ্চ তখনকার দিনে কোন বাংলা থিয়েটার করনা করতে পারত না। সেই আড়ম্বরহীন হৃন্দর টেজটি মনে পড়ছে, একটি খোড়ো-চালের দরজা বেরা চালা ঘর, আলপনা ও কড়ির আলনা দিয়ে সাজানো সেই ঘর, তাতে আছে বড় বড় হুটি খোলা জানলা, সামনে দিয়ে চলে গেছে গ্রাম ছাড়া কোন্ রাজা মাটির পথ। সে অভিনয়ই বা কি

চমৎকার। ছোট্ট মেয়ে ছিলাম, তবু যখন নিপুণ শিল্পীদের সঙ্গে সেই অপূর্ব পারিপার্শ্বিকের ভিতর অভিনয় করতাম তখন ভুলে যেতাম নিজেকে, মনে হতো আমি বুঝি একটি গ্রামের মেয়ে, রুগ্ন বন্দী সেই- ছেলেটির বাইরের সঙ্গে পরিচয় করবার সেই ব্যাকুলতা আমাকে কাতর করত। পিসে মশাইএর (গগনেন্দ্রের) কথা ঠাকুরদার (রবীন্দ্রনাথ) আশ্বাস ও মোড়লের (অবনীন্দ্র) হৃদ্যার অভিনয় বলে মনেই হতো না, মনে হতো সত্যি সব। বাউলের সেই উদাসী গান “ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে” দৈওয়ালার সেই একটানা ‘দৈ, দৈ, জল দৈ,’ করে হেঁকে যাওয়ার সুর আমার যখন মনে পড়ে, ফিরিয়ে নিয়ে যায় আমাকে সেই শিশু-বয়সের অপূর্ব অল্পভূতির মাঝখানে।

তারপর বড় হয়েছে, রবিদাদার কত গীত উৎসব ও অভিনয়ে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছে, তখন কি অদ্ভুত যত্নে ও পরিশ্রমে তিনি সেই সব গান ও অভিনয় শিক্ষা দিতেন তাই মনে পড়ছে। আমার বালিকা-জীবনেই আর একবার তাঁর কাছে এই অভিনয় শিক্ষা করেছিলাম—সেই কথাই বলছি। যখন “নটীর পূজা” নাটক হয় তখন “মালতী” বলে একটি গ্রাম্য মেয়ের ভূমিকায় যে মেয়েটি অভিনয় করছিল সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, রবিদাদা বললেন আমাকে “তোকে সাজতে হবে মালতী।”

অভিনয় হতে মোটে দিন দুয়েক বাকী, আমি ভয় পেয়ে গেলাম খুব, তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন “কোন ভয় নেই, মুখস্থ কর সব, আমি তোকে শিথিয়ে দেবো।” তাঁর কথা মত কাজও তিনি করলেন, নিজে আমাদের বাড়ীতে এসে সারা হুপুর কি দারুণ পরিশ্রম করে আমাকে শিথিয়ে দিলেন আমার পার্ট। তাঁর উৎসাহ-বাণীতে কী উদ্দাপনাই জেগে ছিল আমার মনে, তবু অভিনয়ের প্রথম রাত্রে আমার ভয় ও সঙ্কোচ কিছুতেই কাটতে চায় না। অভিনয় শেষ হলে তিনি নিজের কাছে আমাদের ডেকে বললেন, “ভয়ে যে তুই একেবারে কাঁপ ছিলি, তা ভুলেই যাচ্ছে, রাজ-বাড়ীতে গ্রামের মেয়ের ভয়টুকু বেশ ফুটেছিল। এই বলে আস্তে আস্তে আমার পিঠ চাপড়ে সেই জানাঙ্গন হে তারপর দেখেছিলি।” রবিদাদার অভিনয় দক্ষতা ‘বিসর্জন’

নাটকখানিতে, তিনি জয়সিংহের ভূমিকায় যখন ঠেজে নাবলেন তখন কে বলবে তিনি বুদ্ধ, তাঁর সেই সুদৃঢ় লাবণ্য ভরা দেহে ও কৃষ্ণ শশ্রু শুষ্করাজী শোভিত স্তন্যর মুখখানিতে তাঁকে দেখাচ্ছিল পঞ্চবিংশ বর্ষের যুবা জয়সিংহ, অষ্টাদশী অপর্ণার ক্ষীণ তনুলতার পাশে তাঁকে দেখাল বিশাল শালু লী তরুর মত।

তারপর তাঁর সেই মধুময় স্থূললিত কণ্ঠের আবৃত্তি ও অপূর্ব সেই অভিনয় যে শুনে ছ ও দেখেছে, সার্থক হয়েছে তার জীবন। তেমন জয়সিংহ, তেমন অপর্ণা ও তেমন রঘুপতির সৃষ্টি সেই বিসর্জনেই সম্ভব হয়েছিল, আর তা হবার নয়, তাই সেই স্মৃতি টুকুই অক্ষয় হয়ে আছে জীবন ভোর।

রবীন্দ্রনাথের কথা

ত্রিভ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

রবীন্দ্রনাথের ষাট বছরের জীবন কথা ‘বঙ্গলক্ষ্মী’র পূর্ব-বর্তী তিন সংখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভার যেমন অস্ত্র নাই তাঁহার লীলারও শেষ নাই। তিনি যখন ১৯২১ সালের মে মাসে বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করিলেন তখন সমগ্র ভারত মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে ভাসিয়া চলিয়াছে। কত শত সহস্র ধনী ও কৃষির বর পুত্র স্বৈচ্ছায় কারাবরণ করিতেছে। সমস্ত বাঙ্গলা দেশ এক বিপুল উত্তেজনার উৎস হইয়াছিল। ত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেন মহিমায় বাঙ্গলার আকাশ বাতাস আলোড়িত।

এই নিখিল ভারতের জনপ্রিয় আন্দোলনের ও কঠোর সমালোচনা করিতে কবি বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। ১৫ই আগষ্ট, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে স্মার আশু-তোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে আহৃত জনসভায় “শিক্ষার মিলন” প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজের স্বাধীন মতের পরিচয় প্রদান করেন। এই প্রবন্ধটি পুনরায় স্মার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কবি আলফ্রেড থিয়েটারে পাঠ করেন। তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিকূল সমালোচনা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর ‘শিক্ষার বিরোধ’ প্রবন্ধে করিয়াছিলেন। ২-শে আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে “সত্যের আহ্বান” প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করেন। মহাত্মাজীর মতের উপর ও রবীন্দ্রনাথের সমা-

লোচনা বিরোধিতা ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজ করেন। ২রা ও ৩রা জোড়াসাঁকোর বাটীতে ‘বর্ষাবঙ্গল’ গীতোৎসব হয়। ইহা যেমন প্রীতিপ্রদ তেমনই অভিনব হইয়াছিল। কবি কবিতা আবৃত্তি করেন এবং নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ স্বয়ং বর্ষার কয়েকটি তান মৃদঙ্গে বাজাইয়াছিলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কবিবরকে অভ্যর্থনা করেন। গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাটীতে মিলিত হইয়াছিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় যুক্তি তর্ক করিয়া গান্ধিজী রবীন্দ্রনাথকে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করাইতে সক্ষম হন নাই। এই বৎসর মিঃ এল, কে, এলমহাষ্ট্র সাহেব মিসেস ট্রেটের সম্পত্তির আয় হইতে স্বকলের প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার জন্য বাৎসরিক ৫০,০০০ পঞ্চাশহাজার টাকা দান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ, ১৯২১ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের যাবতীয় সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠান ‘বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়’ভুক্ত হয় এবং সেই দিবস স্মার ডাঃ ব্রজেন্দ্রলাল শীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রাক শ্রু সভায় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার উৎসব হয়। রবীন্দ্রনাথ ‘নোবেল প্রাইজের’ সমস্ত টাকা এবং তাঁহার বাঙ্গলা পুস্তকের মালিকানি স্বত্ব বিশ্বভারতীর ভাণ্ডারে দান করেন। এই বৎসব দিলভান লেডী শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য আগমন করেন। ১৯২২ খৃঃ ১৬ই জানুয়ারী জোড়াসাঁকোর ভবনে ‘মুক্তধারা’

পাঠ করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী পঞ্জী উন্নয়ন কার্যের জন্ত শ্রী নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০ই মার্চ মহাত্মা গান্ধির অংশযোগ আন্দোলনের জন্ত ছয় বৎসরের কারাদণ্ড হয়। সেই জন্ত কবি তাঁর ৬২ বৎসর জন্মোৎসব অনাড়ম্বর সম্পন্ন করিতে নির্দেশ দেন। ৮ই জুলাই কলিকাতায় শেলী শতবার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ পৌরহিত্য করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর স্মৃতিসভায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মর্ম্মস্পর্শী স্তুতিবাক্য পাঠ করেন। ১৯২২ সালে জুলাই মাস কলিকাতায় বিশ্বভারতীর সহিত যোগাযোগ রবিবার জন্ত ‘বিশ্বভারতী সম্মিলনী’ স্থাপিত হয়।

১৯২২ সালে ইউরোপে ‘ইটার ক্লাশনাল কংগ্রেস অফ পিস্ ফণ্ড ফ্রীডম’ এর অধিবেশন লেগোতে (Lugano) হয়। সেই অতীতের মধ্যে ‘টেগোর ইভিনিং’ আলোচনা সভার ডাঃ কালিদাস নাগ আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সভায় রবীন্দ্রনাথের লেখা ও চিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রোমোরোলা, পল হাইসী, জর্জ দুহাসেল, ব্যট্রম রাসেল প্রভৃতি মনিষীগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

১৬ ও ১৭ই সেপ্টেম্বর এলফ্রেড ও ম্যাডেন থিয়েটারে শারদোৎসব অভিনীত হয়। বুদ্ধ কবি যুবা এলমহাষ্ট সহিত একযোগে যেমন সহজ স্তম্ভর কায়দায় নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা এখনও চোখের সামনে ভাসিতেছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ পুণা ও বোম্বাই সহরে গিয়েছিলেন। সেখানে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা সম্বন্ধে Indian Renaissance নামে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৫শে অক্টোবর পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মহীশূর, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, কোইম্বটর, কলোম্ব, ত্রিভাণ্ড্রাম, কোচিন সহর পরিদর্শন করেন এবং সকল স্থানেই শিক্ষাধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। দক্ষিণ ভারত হইতে পুনরায় বোম্বাই হইয়া আহাম্মদাবাদে গমন করেন। শবরমতি আশ্রম পরিদর্শন করিয়া তিন মাস পর্য্যটনের পর শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। এই সময় বাঙ্গালার গভর্নর লর্ড লীটন শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন।

১৯২৩ সালে ৯ই জানুয়ারী কবির মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ মহাশয় পরলোক গমন করায় কবি ব্যথিত হইয়া পড়েন। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে সেই সমস্ত চিন্তা লইয়া

দিকুপ্রদেশ, করাচী ও হায়দ্রাবাদ ভ্রমণ করেন। সার রতন টাটার নিকট হইতে ২৫,০০০ টাকা পাওয়াতে শান্তিনিকেতনে ‘রতনকুঠি’ নিশ্চিত হয়, গ্রীষ্মকালে শিল্প এ বাস করেন এবং ‘রক্তকরবী’ রচনা করেন। এপ্রিল মাসেই তাঁহার সম্পাদনে বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, এবং অর্থনৈতিক সমস্যা বিভেদ সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে বিশদরূপে লিখিয়াছিলেন।

১৯২১ সালে ২৫, ২৭, ২৮ তারিখে কলিকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে ‘বিসর্জন’ অভিনীত হয়, বুদ্ধ কবি যুবা বীর পুরুষ জয়সিংহের অংশ অভিনয় করেন। তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া বিশ্বাসী চমৎকৃত হন। এই সময় ‘রথযাত্রা’ নামে একটি নাট্য রচনা করেন। ইটালীতে পিয়ানো সাহেবের মৃত্যুতে ব্যথিত হন এবং তাঁর স্মৃতি একটি হাসপাতাল স্থাপন করিয়া রক্ষা করেন।

পশ্চিম-ভারতের কতকগুলি করদরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বিশ্বভারতীর জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আলফ্রেড থিয়েটারে একীম্যালেরিয়া সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

চীন ভ্রমণ

চীন সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের The University Lecture Associationএর সভাপতি লিচিংচী চাও মহাশয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালের ২১শে মার্চ চীন দেশে মাইবার জন্ত আউট্রাম ঘাট হইতে রেজুন গামী জাহাজে যাত্রা করেন। এবার তাঁর সঙ্গে গিয়াছিলেন এলমহাষ্ট, কিত্তিগোহন সেন, নন্দলাল বসু ও ডাঃ কালী দাস নাগ। পথে রেজুন, পেনাঙ্গ, কুয়ালং, লোমপুর ও সিঙ্গাপুরে কবিকে, সেই দেশের অধিবাসীরা বিপুল সম্বর্ধনা করে।

১২ই এপ্রিল সাংঘাই নগরে অবতীর্ণ হন। ১৭ই এপ্রিল একটি জাপানি নরনারী পূর্ণ সভাতে জাপানের সাম্রাজ্য লোলুপতার নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দেন এবং তিনি

আর একটি সভায় এসিয়াবাসীকে পাশ্চাত্য জড় ঐশ্বর্য প্রিয়তা ও জাতীয়তার মোহর বিষয় ফল আশ্বাদন হইতে সংযত রাখিবার উপদেশ দেন। তাহার বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা যে কেবল ইংরাজি ও আমেরিকার সংবাদপত্র-গুলি করিয়াছিল তাহা নহে, এমন কি পাশ্চাত্যসভ্যতার নব অমুরাগী চীন ছাত্রগণ কবির উক্তিভিত্তি ভোগ করিয়াছিল।

২৩শে এপ্রিল পিকিং সহরে গমন করেন, ২৬শে মাসাচুসেট্‌স্‌ ইন্‌স্টিটিউট অব পিকিং তাঁহাকে বিপুলভাবে সন্মান করেন। তদানীন্তন ছাত্র সমাজের জনপ্রিয় দলপতি ডঃ ছ হাঙ্গী তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও তাঁর কবিতার মর্মগ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ও অমুরাগী হন। তাহাতে চীনার ছাত্র মণ্ডল কবির প্রতি বিশেষ আস্থা দিত হয়। কয়েকটি বক্তৃতা দিবার পর তিনি জাপান যাত্রা করেন।

দ্বিতীয়বার জাপানে

১৯২৪ সালের ২৯ শে মে জাপানে অবতীর্ণ হন। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বিত্যাড়িত বিপ্লবী জাপান প্রবাসী বাঙ্গালী রাসবিহারী ঘোষ কবিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার ভ্রমণে সাহায্য করেন। এই ভ্রমণের খরচের জন্ত রাজা যুগল কিশোর বিড়লা ১০,০০০ দশ হাজার টাকা প্রদান করেন। ১৯২০ সালের ২১ শে জুলাই ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এখানে সেই সময় লর্ড লীটন পুলিশকে প্রশংসা করিয়া বাঙ্গলার নারীর চরিত্রের উপর যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাতে সমস্ত বাঙ্গলার বিরাট প্রতিবাদ আন্দোলন চলিতে ছিল। কবিও ব্যথিত হন, এবং লর্ড লিটনকে এক প্রতিবাদ পত্রে তাঁর মন্তব্য সরকারী প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিতে অনুরোধ করেন। ফজলুল হক সাহেব, কবি ও লর্ড লিটনের মধ্যে আপোষ আলোচনার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার ফলে কবি ও লর্ড যে বিবৃতি দেন তাহা ২৯ আগষ্ট কলিকাতার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘অরূপ রতন’ অভিনয় এলফ্রেড থিয়েটারে করেন।

দক্ষিণ আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ

১৯২৪ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু রাজ্যের শত বার্ষিক স্বাধীনতা দিবস উৎসবে যোগদান

করিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়া যাত্রা করেন। সঙ্গে এবার ছিলেন এল, কে, এলেমহাষ্ট সাহেব। সমুদ্র পথে গীড়িত হইয়া বিডানস্ আইল্যান্ডস সহরে অবতীর্ণ হন, আর্জেণ্টাইন বাগীরা তাঁহার বিপুল সন্মান করিয়াছিলেন। অমরত্বের জন্ত পেরুতে যাইতে সক্ষম হইলেন না, সান ইসাডোর (San Isadore) সহরে ম্যাডাম ভিক্টোরিয়া উকামপো (Victoria ocumpo) মহিষী মহিলার বাগান বাটিতে তাঁহারই অতিথি হইয়া কিছুদিন ছিলেন। সেখানে ‘পূবী’ রচনা করেন এবং সেই পুস্তকখানা তাঁহাকেই উৎসর্গ করেন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর ৩০ তারিখে আর্জেণ্টাইন রিপাব্লিকের সভাপতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাত্রা করেন।

ইয়োরেদেপ পঞ্চমবার

সাউথ আমেরিকা হইতে ১৯২৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী একটি ইটালীয়ান জাহাজে ইয়োরেদেপে যাত্রা করেন। ২১শে জানুয়ারী জেনোয়াতে অবতীর্ণ হইলেন। মিলানের ডিউকের সভাপতিত্বে মিলান সহরে এক বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তথায় তাঁহাকে বিপুল সন্মান করা হইয়াছিল; বিখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রকর রাইয়েটি (Rietti) কবির প্রতিমূর্তি অঙ্কন করেন। ২৯শে মহাসমারোহে কবিকে ডেনিস সহরে লইয়া যাওয়া হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতে ফিরিয়া আসেন।

১৯২৫ সালে ৪ঠা মার্চ রাঁচিতে তাঁহার অগ্রজ ও সাধনার সহায়ক জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহলোকে গমন করেন। কবির চিত্ত ব্যথিত হয়। ৬৫ বৎসর জন্মোৎসব হইবার পরেই গান্ধিজী শান্তি নিকেতনে গমন করেন। সে সময়ে আমেরিকার বিশপ ফিসার কবি ও মহাত্মাজীকে দর্শন করিবার জন্ত শান্তিনিকেতনে গমন করেন।

১৯৩৫ সালে ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের তিরোভাব হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ ২টি লাইন কবিতা লিখিয়া তাঁহার স্মৃতি চির জাগরুক রাখিয়া গিয়াছেন।

বন্ধু কাউন্ট কাইজারলিংএর ‘বুক অব ম্যারেজ’ পুস্তকের জন্ত তাহারই অনুরোধে বিবাহ প্রথার উপর উপদেশ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ষ্টার থিয়েটারের চিরকুমার সভা

অভিনয়ের উদ্বোধন করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন শীল মহাশয়গণের ‘চরকা’ কাটা আন্দোলন হইতে তফাতে থাকার জন্ত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক জনসভায় দুঃখ প্রকাশ ও নিন্দা করেন। তাহার উত্তর কবি সবুজপত্রে ‘স্বরাজ সাধনা’ প্রবন্ধে দিয়াছিলেন এবং চরকা দ্বারা যে স্বরাজ লাভ হইবে না তাহা স্পষ্ট ও নির্ভিক ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৯২৫ সালে নভেম্বর মাসের ২১শে তারিখে ইটালীর রাষ্ট্রকর্তা মুসলিনীর প্রদত্ত গ্রন্থাজী লইয়া অধ্যাপক ফর্মিচী এবং টুসী (Carlo Formichi and G. Tucci) শান্তি নিকেতনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে আগমন করেন। ২৪শে নভেম্বর লর্ড লীটন শান্তিনিকেতনে গমন করেন। ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রথম দর্শন মহাসম্মেলনে সভাপতির অধীন অলঙ্কৃত করেন।

১৯২৬ সালের ১২ই জানুয়ারী আমেরিকার বিখ্যাত গ্রন্থকার মার্ডিন সাহেবকে কবি শান্তি নিকেতনে সাধরে সঞ্চর্জন করেন। এই মাসের শেষে লন্ড্রোতে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯২৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী) সংবাদ পান।

৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় গমন করেন; ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্ত আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া বান। ঢাকার পৌরসভা তাঁহার সঞ্চর্জন করেন। তৎপরে তিনি কুমিল্লা, ময়মনসিংগ হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যেও গমন করেন। পোরাবন্দরের মহারাজা তাঁহার ৬৫ বৎসর জন্মোৎসব স্মরণ রাখিবার জন্ত কলাভবন প্রতিষ্ঠা করিতে বিশ্ব-ভারতীকে রাজ্যোচিত অর্থ প্রদান করেন।

ইয়োরোপে সঞ্চর্জার

১৯২৬ সালের ১২ই মে কবি রবীন্দ্রনাথ পূজবধু প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে লইয়া অষ্টমবার বিদেশ ভ্রমণে স্বমুদ্র যাত্রা করিলেন। ৩০শে মে নেপোলস নগরে অবতীর্ণ হন। মুসলিনী স্পেশাল ট্রেনে করিয়া রবীন্দ্রনাথকে মহা-

সমারোহে রোমে লইয়া গিয়াছিলেন। ৩১শে মুসলিনী রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন “Glad of this opportunity to see for myself the work of one who is assuredly a great man and a movement that will be certainly remembered in history.” তিনি আরও বলিয়াছিলেন “আমি একজন আপনার সেই ইটালিয়ান ভক্ত, যিনি ইতালি ভাষায় অমুবাদিত আপনার যাবতীয় পুস্তক পাঠ করিয়াছেন”

৭ই জুন রোমের গভর্নর সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ সহরে রবীন্দ্রনাথকে বিপুল সঞ্চর্জনার আয়োজন করেন। ব্রিটিশ রাজদূতাবাসে রবীন্দ্রনাথকে সঞ্চর্জনা করা হয়। কবি “দি মিনিং অব আর্ট” নামে একটি বক্তৃতায় রোমের বিদ্যাজ্ঞান সমাজের নরনারীকে পরম ভূষিতা দান করেন। ১০ই জুন অপরাহ্নে প্রাচীন কলিজিয়ামের রোমের শিশু সঙ্গীৎ উৎসবে যোগদান করেন। কবি সভাষলে প্রবেশ করিবারাত্রই প্রায় ২৫০০ হাজার দর্শকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিবাদন করেন এবং প্রায় হাজারটা শিশুর সমবেত একাতানবাদ্য বাজিয়া উঠে। শ্রীযুক্ত প্রণান্ত মহলানবীশ ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী রাণী মহালানবীশ রবীন্দ্রনাথের সহিত এই স্থানে মিলিত হইয়া ভ্রমণ করেন।

রোমের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাধরে অভ্যর্থনা করেন। ১১ই জুন ইটালীর রাজা রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইটালিয়ান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রা’ অভিনয় হয়। কবি সেই অভিনয় দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৩ই জুন মুসোলিনীর সহিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। ইতালীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক Benedotte Croceর সহিত কবি সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়—সরকারের আজায় রোম হইতে নেপোলাস্ নির্বাসিত হওয়া সত্ত্বেও—মুসোলিনী তাহাকে আনাইয়া কবির সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

রোম হইতে ক্লোরেন্সে গমন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে “আমার স্কুল” বক্তৃতা করেন। ২০শে জুন টুরিণে “সহর ও পল্লী” বক্তৃতা দেন। টুরিণ হইতে কবি সুইজারল্যান্ড গমন করেন। তথায় তিনি প্রথমে ভিনিনিউয়েড সহরে

হোটেল বাইরন (Hotel Byrone at Villneuve) যে ঘরে ভিক্টর জুগো বহুদিন বাস করিয়াছিলেন—সেই ঘরে রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করেন। জুগোর মতনই তিনি জানালা দিয়া হৃদের মনোরম দৃশ্য দেখিতেন। এইখানে রোমে রৌলা, জর্জ দুহামল, জে, জি, ফ্রেজার, অধ্যাপক ফোরল ও বভেট প্রভৃতি মনীষীগণের সহিত রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা হয়।

৬ই জুলাই জুরীচে গমন করেন। সেই সময় ম্যাক্‌গেটার গার্জেনে রবীন্দ্রনাথ “ফোসিইজিম”কে নিন্দা করিয়া এক পত্র দেন। তাহাতে মুসলিনী বিরক্ত হন। অধ্যাপক ফার্মেসী তিনি ইটালীতে কবির সহিত সত্যত থাকিতেন এবং দোষাধীর কাষ করিতেন, তিনি সংবাদপত্রে জানান রবীন্দ্রনাথ কখনও মুসলিনীকে নিন্দা করেন নাই। নোউসনে একদিন থাকিয়া ১০ই জুলাই ভিয়ানাতে গমন করেন।

ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথ—ভিয়েনা হইতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীগণ (রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, প্রশান্ত ও রাণী মহালানবীশ) ইংলণ্ডে আগমন করেন। নিজের একটা আবক্ষ মূর্তির জন্য এপিষ্টাইনের মূর্তিশালায় গমন করেন। ব্রেগসফোর্ড, রাণেটাইন, রবার্ট ব্রীজ (তদন্তনীন পয়েট লরিয়েটে) সহিত আলাপ ও আলোচনা করেন।

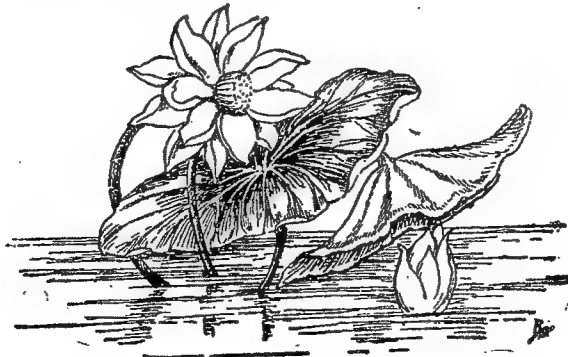
১৯২৬ সালের ইং ২১শে আগষ্ট লর্ড এস পি সিন্‌হার সহিত নরওয়ে ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। ওসলো রাজধানীতে নরওয়ের রাজা রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ষ্টকহলম-নানসেন, স্তেন হেদিন, বজরলসেন, বজের প্রভৃতি স্বধীজনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তথা হইতে কবি

কোপেনহেগেনে গমন করেন এবং তথায় দার্শনিক হফডিং ও সমালোচক জর্জ ব্রানডেন্স এর সহিত আলাপ হয়।

জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার—১৯২৬ সালের ১০শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ সদলবলে হামবার্গ নগরে গমন করেন। পরদিন বারিলে গমন করিয়া ফিলহারমণিক হল ‘ভারতের দর্শন’ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৪ই প্রেসিডেন্ট ভন্ হিনডেনবার্গ রবীন্দ্রনাথকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কবির পুস্তকের জার্মান প্রকাশক কার্ট উলফ কবিকে সম্বন্ধিত করেন এবং বহু লেখকের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। বার্লিন হইতে ম্যাক্‌গেটার গার্জেন পত্রিকায় তিনি মুসোলিনীর ব্যক্তিত্বে অজস্র প্রশংসা করিয়া এবং ফোসিইজিমকে নিন্দা করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন ইহাতে ইটালীর অনেক কাগজ রবীন্দ্রনাথকে নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিল।

বার্লিন হইতে চেকোশ্লাভিকিয়াতে গমন করেন। প্রায়গে ১০ই ও ১৫ই অক্টোবর ‘আর্ট ফর্মস’, ও ‘সিভিলিজেসন এণ্ড প্রগ্রেস’ বক্তৃতা দেন। চেক গভর্নমেন্ট তাঁহার ব্যবহারের জন্য যে বিমানপোত দিয়াছিলেন তাহাতে কবি উড়িয়া ভিয়েনেতে গমন করেন। ভিয়েনাতে তাঁহার বিপুল সম্বন্ধনা হইয়াছিল। ভিয়েনাতে বসিয়া তিনি ‘বনবাণী’র প্রথম পদ্য রচনা করেন।

২৬শে বুডাপেষ্টে একটা বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ হাঙ্গেরিয়ান কবি Sandor Kisfaludy মূর্তির সন্নিহিতে উদ্যানে একটি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন এবং হাঙ্গেরিয়ান ঔপন্যাসিক মোরীস জোকাই এবং স্থতিগোধে মালা অর্পণ করেন। (ক্রমশঃ)



ফল দীপিকা

প্রথম অধ্যায়

শ্রীগণপতি সরকার

পিতৃলোক দেবলোক এবং মনুষ্যালোক, ইহাদের মাস বৎসর এবং দিন দ্বারা যে দিন বিভাগ (অর্থাৎ এক সৌরমাসে পিতৃলোকের একদিন, এক সৌরবৎসরে দেবলোকের একদিন এবং এক সৌরদিনে মনুষ্যালোকের একদিন) এবং উল্লিখিত জ্যোতিষমণ্ডল যাহার দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, আর যিনি কখনও দক্ষিণ অয়নে এবং কখন উত্তরায়নে পরিভ্রমণ করেন, সেই একমাত্র পরম জ্যোতিঃপদার্থ—সূর্য্যনারায়ণ—আমাদিগকে অমিতকলাপ প্রদান করণ।

সরস্বতী, কুলদেবতা, আমার গুরুদেব, কালত্রয়ের (ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান) জ্ঞানবিধায়ক সূর্য্যাদি নবগ্রহ, গণপতি এবং ঈশ্বরকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া, অত্রি পরাশর প্রভৃতির (জ্যোতির্বিদগণের) প্রকাশিত গ্রন্থগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আমি দৈবজ্ঞ মন্ত্ৰেশ্বর, জ্যোতির্বিদগণের শ্রীতির জন্ত সূর্য্যমণ্ডল ফলদীপিকাগ্রন্থ বলিতেছি। ২।

পদচ্ছায়া, শঙ্কুচ্ছায়া এবং ঘণ্টাদি নির্ণয় যন্ত্র (অর্থাৎ ঘড়ি) দ্বারা প্রথমতঃ বিশেষভাবে জন্মসময়ের দণ্ডগুলাদি নির্ণয় করিতে হইবে, তদনন্তর গণিতের দ্বারা এবং দৃক্‌সিদ্ধি দ্বারা গ্রহগতি, গ্রহের ভাব এবং গ্রহের বল জানিয়া—তাহার দ্বারা ফল নির্দেশ করিবে। ৩।

মন্তক, মুখ, বক্ষ, হৃদয়, জঠর, কাট, বস্তি, প্রজ্ঞানস্থল, উরুযুগল, জাহ্নযুগল ও পদযুগল এই দ্বাদশস্থান লগ্ন হইতে কালপুরুষের অঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বৃশ্চিক, মীন, কর্কট, এই তিন রাশির অন্তিম অংশ ভসন্ধি নামে খ্যাত। কেহ কেহ (অর্থাৎ কোন কোন জ্যোতিষী প্রত্যেক রাশির অন্তকে—অন্তিম অংশকে—ভসন্ধি বলে। ৪।

মেঘের বাসস্থান অরণ্য, বুধের কেদার (ক্ষেত্র), মিথুনের শয়নগৃহ, কর্কটের গর্ভের জল, সিংহের পর্বত, কন্যার জল ও শশ্যযুক্ত ভূমি, তুলার বৈশ্বগৃহ, বৃশ্চিকের বিল,

ধনুর রাজগৃহ, মকরের জলযুক্ত বন, কুন্তের কুন্তকার গৃহ, এবং মীনের জল ইহাই কথিত হইয়াছে। ৫।

মঙ্গল শুক্র বুধ চন্দ্র রবি বুধ শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি শনি শনি ও বৃহস্পতি যথাক্রমে মেঘ বুধ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুন্ত ও মীন রাশির অধিপতি।

মেঘ বুধ মকর কন্যা কর্কট মীন ও তুলারশি রবি চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র ও শনি গ্রহের যথাক্রমে উচ্চ বা তুঙ্গ গৃহ। মেঘের ১০ অংশ, বুধের ৩ অংশ, মকরের ২৮ অংশ, কন্যার ১৫ অংশ, কর্কটের ৫ অংশ, মীনের ২৭ অংশ ও তুলার ২০ অংশ রবি চন্দ্র মঙ্গল প্রভৃতি নবগ্রহের উচ্চাংশ বা তুঙ্গাংশ। এই প্রত্যেক রাশির সপ্তম রাশি এবং এই অংশই রব্যাদি গ্রহের নীচ গৃহ ও নীচ অংশ—যথা মেঘের সপ্তম অর্থাৎ তুলারশি রবির নীচগৃহ এবং তুলার ১০ অংশ রবির নীচাংশ; এইরূপ চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহের বৃশ্চিকাদি নীচগ্রহ এবং বৃশ্চিকের ৩ অংশ চন্দ্রের নীচাংশ—এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে। ৬।

রবির সিংহ, চন্দ্রের বুধ, মঙ্গলের মেঘ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা, এবং শনির কুন্ত মূলত্রিকোণ স্থান। রবির প্রথম ২০ অংশ পর্য্যন্ত, চন্দ্রের উচ্চ অংশের পর অর্থাৎ ৩ অংশের পর ২৭ অংশ পর্য্যন্ত, মঙ্গলের ১২ অংশ পর্য্যন্ত, বুধের উচ্চাংশের পর ৫ অংশ অর্থাৎ ১৫ অংশের পর ২০ অংশ পর্য্যন্ত, বৃহস্পতির ১০ অংশ পর্য্যন্ত, শুক্রের ৫ অংশ পর্য্যন্ত এবং শনির ২০ অংশ পর্য্যন্ত মূল ত্রিকোণাংশ।

ধনুর প্রথমার্ধ (১-১৫ অংশ পর্য্যন্ত), কন্যা, মিথুন, কুন্ত, এবং তুলা রাশি মর্ত্য অর্থাৎ দ্বিপদরাশি; বৃশ্চিক কীট রাশি; কর্কট এবং মকরের শেষার্ধ (অর্থাৎ ১৫ অংশের পর ৩০ অংশ পর্য্যন্ত) এবং মীন ইহার জলজ রাশি; অবশিষ্ট রাশিগুলিকে চতুষ্পদ রাশি জানিবে। ৭।

বুধ কর্কট ধনু মেঘ এবং মকর ইহার পৃষ্ঠোদর রাশি।

আর মিথুন ও মীন উভয়োদর রাশি। এবং কন্যা সিংহ তুলা বিছা ও কুম্ভ ইহার শীর্ষোদর রাশি। পৃষ্ঠোদর রাশি এবং মিথুন ইহার চান্দ্ররাশি এবং রাত্রিসংজ্ঞক। অবশিষ্ট রাশি সকল সৌররাশি এবং দিন সংজ্ঞক। অর্থাৎ যে রাশিকে ত্যাগ করিয়াছেন সেই রাশি হইতে পর পর রাশি ক্রমে উর্দ্ধরাশি, অধোরাশি, সমরাশি এবং বক্ররাশি নামে অভিহিত হয়। পুনরায় উহার পরের রাশিগুলিকেও আবার উর্দ্ধ অথঃ সম ও বক্ররাশি বলিয়া জানিতে হইবে। ৮।

মেঘ-বৃষ মিথুন এই ক্রমে পরপর (১) চর স্থির উভয় (বা দ্ব্যন্তক); (২) দ্বার বহির্গত (৩) ধাতু মূল জীব সংজ্ঞা। মেঘ-বৃষ এই ক্রমে পর পর রাশি (১) ক্রুর ও সৌম্য; (২) ওজ ও সম; (৩) স্ত্রী ও পুরুষ সংজ্ঞা। মেঘ সিংহ ধন পূর্বদিকের অধিপতি, বৃষ কন্যা মকর দক্ষিণ দিকের অধিপতি, মিথুন তুলা কুম্ভ পশ্চিম দিকের অধিপতি এবং কর্কট, বিছা ও মীন উত্তর দিকের অধিপতি। অন্তঃ (অর্থাৎ সপ্তমরাশি হইতে দ্বাদশ রাশি পর্যন্ত কালপুরুষ (বামাঙ্গ এবং অবশিষ্ট ছয়টি গৃহ) অর্থাৎ লগ্ন হইতে ষষ্ঠরাশি পর্যন্ত দক্ষিণাঙ্গ। ৯।

লগ্ন, হোরা, কল্যা, দেহ, উদয়, রূপ শীর্ষ বর্তমান এবং জন্ম এইগুলি লগ্ন বা ভাবের পর্যায় অর্থাৎ একার্থবাচক বা নাম।

বিত্ত, বিদ্যা, স্ব, অন্নপান, ভুক্তি, দক্ষিণ চক্ষু, আশ্র, পত্রিকা, বাক্ এবং কুটুম্ব এইগুলি ধনভাবের পর্যায়। (১০)

হুশিক্যা, উরঃ, দক্ষিণ কর্ণ, সেনা, বৈধ্যা, শৌধ্য, বিক্রম এবং ভ্রাতা এইগুলি সহজ বা তৃতীয় ভাবের পর্যায়।

গেহ, ক্ষেত্র, যাতুল, ভাগিনেয়, বন্ধু, মিত্র, বাহন, মাতা, রাজ্য, গো, মহিষ, স্বগন্ধ, বস্ত্র, ভূষণ, পাতাল, হিবুক, স্ত্রুথ, অম্বু, সেতু এবং নদী এইগুলি চতুর্থ বা মাতৃ বা বন্ধু ভাবপর্যায়।

রাজাঙ্ক, সচিব, কর, আত্ম, ধী, ভবিষ্যদ, জ্ঞান, অস্থ প্রাণ) স্তত, জঠর, শ্রুতি এবং স্মৃতি এইগুলি স্ততভাবের (পঞ্চমভাবের) পর্যায়। ১১-১২।

ঋণঃ অস্ত্র, চোর, ক্ষত, রোগ, শত্রু, জাতি, আজি যুদ্ধ) দুষ্কৃতি, অঘ, ভীতি এবং অবজ্ঞা এইগুলি ষষ্ঠ বা রিপুভাব পর্যায়।

জামিত্র, চিত্তোথ (ইচ্ছা), মদ, অস্ত, কাম, দান, অধ্ব, লোক, পতি, মার্গ ও ভাষ্যা এইগুলি সপ্তম বা জামাতাব পর্যায়। ১৩।

মাঙ্গল্য, বস্ত্র, মলিন, আধি, পরাভব, আয়ু, ক্লেশ, অপবাদ, মরণ, অশুচি, বিষ এবং দাস (ভৃত্য) এইগুলি অষ্টম বা মৃত্যু ভাব পর্যায়।

আচার্য্য, দৈবতঃ, পিতৃ, শুভ, পূর্বভাগ্য, পূজা, তপঃ, স্বকৃত, পৌত্র, জপ ও আর্ধ্যবংশ—এইগুলি নবম বা ভাগ্য-ভার পর্যায়।

ব্যাপ্যার, আশ্বাদ, কর্ম, জয়, সং কীর্তি, ক্রতু, জীবন (জীবিকা), ব্যোম, আচার, গুণ, প্রবৃত্তি, গমন, আজ্ঞা এবং মেঘবস এইগুলি দশম বা কর্মভাব পর্যায়।

লাভ, আয়, আগমন, আশ্রি, সিদ্ধি, বিভব, প্রাপ্তি, ভব শ্লাঘ্যতা, জ্যোতিভ্রাতা, বামকর্ণ, সরস, সন্তোষ ও অকর্ণণ (শোনা) এইগুলি একাদশ বা লাভ বা আয় ভাব পর্যায়। ১৫।

দুঃখ, অজি, বামচক্ষু, ক্ষয়, হুচক, অন্ত্য, দারিদ্র্য, পাণ, শয়ন, ব্যয়, রিস্ক, ও বন্ধন এইগুলি দ্বাদশ বা ব্যয়ভাব পর্যায়।

তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম এবং দ্বাদশ স্থানের নাম লীন স্থান। ১৬।

অষ্টম, ষষ্ঠ এবং দ্বাদশ ভাবের নাম দুঃস্থান এবং অবশিষ্ট ভাবগুলিকে সুস্থান জানিতে হইবে এবং এইগুলি শুভপ্রদ রাশি।

লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম গৃহের নাম কেন্দ্র, কর্ণক এবং চতুষ্ঠয়। ১৭।

কেন্দ্রের পর গৃহ (অর্থাৎ দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ) গৃহের নাম পঞ্চকর। ঐক্লপ পঞ্চকরের পর গৃহ অর্থাৎ তৃতীয় ষষ্ঠ নবম ও দ্বাদশ ভাবের নাম) আপোক্রিম। চতুর্থ এবং অষ্টম গৃহের নাম চতুরঙ্গ।

তৃতীয় ষষ্ঠ দশম ও একাদশ গৃহকে উপচয় বলে। পঞ্চম এবং নবম গৃহের নাম ত্রিকোণ। ১৮।

ইতি (বিদ্যারত্ন, জ্যোতির্ভূষণ, জাতক প্রভাকরো-পাঞ্চক ত্রীগণপতি সরকার কর্তৃক অল্পদিত মন্ত্রেশ্বর বিরচিত ফল দীপিকাগ্রন্থের সংজ্ঞানামক প্রথমাধ্যায়।

সে

শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী

(১)

এইখানে সে এসেছিল,
এইখানে সে বসেছিল,
এইখানে সে চেয়েছিল

হেসে !—

ব'য়ে যেত কথায় কথায়
দীর্ঘ নিশি হাসি-ব্যথায়,
আনন্দে ও আঁখির জলে

ভেসে !—

পলাশ-বনের দোয়েল-পাখী
কানের কাছে যেত ডাকি',
শেফালিকা পড়ত মাথায়

ব'রে,—

নদীর জোয়ার ভোরের বেলায়
চাপা-সুরে কাঁপা গলায়
ইসারাতে বলত যেতে

স'রে !—

ধূমে যেত আলতা পায়ের,
তবু চরণ উঠত না,—
পূবের আলো লাগত মুখে—
চোখের নেশা ছুটত না !

(২)

এইখানে সে এসেছিল,
এইখানে সে বসেছিল,
এইখানে সে চেয়েছিল

হেসে !

আঁখির পানে আঁখি রেখে
মিটত না সাধ দেখে দেখে,
চেয়ে থেকে শুধুই অনি-

মেবে !

কেয়াগাছের পাতায় পাতায়,
কুঞ্জবীণির মাথায় মাথায়,

ছেয়ে যেত জ্যোছ'না থরে

থরে,

লতা-পাতার ফাঁকে ফাঁকে

আসত নেমে আঁকেবাঁকে

নাকের আগায় চোখের পাতার

'পরে !—

আঁধার-আলোর সবুজ রাগে

দুলত কানের ঢুল-ঢুলী,—

এলোচুলে উঠত যেন

রূপার শত ফুল ফুটি' !

(৩)

এইখানে সে এসেছিল,

এইখানে সে বসেছিল,

এইখানে সে চেয়েছিল.

হেসে !

বাদলা-রাতে দীপের মত,

দীপ্ত শিখা কল্প রত,

শিশির-ভেজা যুঁইয়ের আর্দ্র-

বেশে !

কাজল-পরা সজল আঁখি

কমল-করতলে ঢাকি'

বিদায় নিতে চরণ-তলে

বসি,

অধীর প্রাণে গভীর ত্রাস—

শিথিল হ'ল বাহুর পাশ,

অধর হ'তে অধর গেল

খসি' !

বিদায়-কালে মুখের বাণী—

ফুটে ফুটে ফুটল না,—

বিদায় হ'ল—আঁখির পাতা

উঠে উঠে উঠল না ! *

ভোলার বন্ডার মর্মান্তিক কাহিনী

মহিলা সমিতির সম্পাদিকা কর্তৃক প্রদত্ত

১১ই জ্যৈষ্ঠ কর্মকুটিরের ঘর তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করে খুসী মনে আমি ও সুধীন বাসায় ফেরার পথে রাধাবল্লভের বাসায় গেলাম তাকে দেখতে... সে তখন অসুস্থ ছিল। সন্ধ্যা হতেই বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো। হেঁটে বাসায় আসা অসম্ভব মনে করে ছেলেরা রিকসা খুঁজতে গেল, কিন্তু এ দুর্ঘোণে পাবে কোথা? বাধ্য হয়ে অতি কষ্টে হেঁটেই বাসায় ফিরলাম। সুধীন আমাকে রেখে তার বাসায় চলে গেল।

বাতাস ক্রমেই বাড়তে লাগলো। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করে সবাই ঘরে এলাম। রাত ৯ টার সময়ে আমি পড়ছিলাম, উনি ছিলেন নথীপত্র নিয়ে মক্কেলের কাজে ব্যস্ত। বড় ছেলে মণি দালান থেকে ডেকে বললো,—“মা শীগগীর বেরিয়ে এস টিন উড়ে যাচ্ছে।” আমরা দুজনা, দেবরপুত্র গুণু, পালিত পুত্র বিষ্ণু এই পাঁচজন বের হতে না হতেই প্রকাণ্ড টিনের চালা দরজা বন্ধ করে পড়ে গেল। গুণু ছিটকে অল্প বাসার কাছে পড়লো, আমরা দুয়াকেই রইলাম। কিছুক্ষণ বাদে ঝড়ের ঝাপটায় চালাটা দূরে সরিয়ে নিতেই আমরা সব ফেলে রেখে দালানে চলে এলাম।

বহুদিনের জীর্ণ দালান ঝড়ের বেগে যেন কাঁপতে লাগলো। দরজা-জানালা সব ভাঙতে লাগলো। নতুন ঠাকুর দালানে সবাই চলে গেলাম। মাঝে মাঝে দূর থেকে কান্না-হাহাকার কানে আসতে লাগলো, একে একে ঘর বাড়ী সব পড়তে লাগলো—জানালা দিয়ে বুষ্টির স্থতীক্ল ঝাপটা গায়ে বিঁধতে লাগলো। অমাবস্তার রাত্রি—ঘোর অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না, শুধু প্রলয়ের হাজার কানে আসতে লাগলো—মনে হতে লাগলো পৃথিবী এইবার যেন ভেঙ্গেচূরে খান খান হয়ে যাবে।

আরো ছ’বাড়ীর লোক ঠাকুর দালানে ছিল—ওদের একজন ছেলেকে নিয়ে আসতে না পারায় বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে মাঝে মাঝে হরিণাম করতে লাগলো, কেউ ভগবানের নাম জপ করতে লাগলো, কেউবা তাঁকে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো

—যেন ওর করুণ নিবেদন তাঁর কানে যায় এই ভেবে। কিছুক্ষণ বাদে টর্চের আলো চারদিক থেকে পড়তে লাগলো—কেউ যেন বাঁসায় ঢুকতে চায়—পথ না পেয়ে ঢুকতে পারছিল না। মণি বের হয়ে অতি কষ্টে টর্চের আলো ফেলে তাদের এনে দালানে পৌঁছাতে লাগলো। লোকজনের সংখ্যাধিক্য দেখে আমরাও দালানে চলে এলাম। প্রায় সাড়ে তিনশ লোক ছোট্ট দালানটুকুতে একত্র হল। গায়ে কাপড় নেই সমস্ত শরীর আঘাত প্রাপ্ত, চোখে জল, মুখে হাহাকার করতে করতে দালানে ঢুকলো—জী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, শিশু-বৃদ্ধ সকলের সমান অবস্থা। যে কয়খানা কাপড় ঘরে ছিল পরতে দিলাম। শিশুগুলির কী দুর্দশা! একটি বৃদ্ধ তার নাতিকে কোলে করে ছুটে আসতে ভ্রঞ্জে পড়ে গিয়ে তাঁর পাজরার হাড় ভেঙ্গে গেছিলো—তার কি করুণ কান্না। সমস্ত শরীর রক্তময়। একটি উকীলবাবু তাঁর শিশুপুত্রকে ছুঁড়ে দালানে ফেলে অস্ত্রের সন্ধানে চলে গেলেন,—শরীর তাঁর রক্তমাখা। এ দুর্ঘোণে কে কোথায় কিভাবে আছেন মণি তা দেখতে চলে গেল। আমার খণ্ডর চীৎকার করছে লাগলেন। মণি ছুটি মহিলাকে অর্ধচেতন অবস্থায় কোলে করে নিয়ে এল—সেঁক তাপ দিবার পরে তাঁরা একটু সুস্থ হলেন। সবাই কিছুক্ষণ গা ঘেঁসে বসে রইলো ভোরের প্রতীক্ষায়। সাধ্যমত সবাইকে সাশ্বনা দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে উনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন—সর্বনাশ! বন্ডার জল এসে পড়েছে—আর রক্ষে নেই। সবাই তখন হাহাকার রবে ছুটছুটি করে দালান থেকে বের হতে লাগলো। কোন না তার ৩৪টি শিশুসন্তান সহ জলে নেমে পড়ে ছুটতে লাগলো আশ্রয়ের আশায়, কিন্তু প্রবল স্রোত তাকে অল্প টেনে নিতে চায়; কী যে কান্না,—কী যে হাহাকার!

উপরে মাত্র একখানা কোঠা,—শ’খানেক লোক ইট, কাঠ টিন মাড়িয়ে অতিকষ্টে উপরে উঠে গেল—বৃদ্ধ খণ্ডর মহাশয়কে কোলে নিয়ে উনি উপরে উঠে গেলেন। উপরের কোঠার দরজা, জানালা, সিঁড়ি ভেঙ্গে গিয়েছে—বুষ্টির ঝাপটায় সব

শরীর ভিজে যেতে লাগলে। এক একটি ঝাপটা যেন একরাশ স্তূতীক্ষ্ম সূঁচ—এমন স্তূতীক্ষ্ম শরের মতো বৃষ্টি আর দেখিনি। একটা তোষক গায়ে জড়িয়ে বসে রইলাম,—বাইরের দিকে মাঝে মাঝে অতিকষ্টে তাকিয়ে দেখি—একটু যেন আলোর মতো দেখা যায়—জলটা যেন একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সবার দৃষ্টি সে দিকে—সবাই মহোন্মাদে চীৎকার করে উঠলো। তখন বাতাসটা পশ্চিম দিক থেকে আসছিল। সবাই বলছিল পূর্বের বাতাস বইলে আর রক্ষে নেই।

ক্রমে ভোর হয়ে এলো, আমি ও মনি নীচে নেমে দেখি প্রসিদ্ধ একটি চোর কুকুর নিয়ে দালানের মাঝে একা বসে। সব পেয়েও সে নিতে ভুলে গিয়েছে, প্রাণের মায়া এমনি বটে। চারদিকে চেয়ে দেখি গাছপালা নেই, ঘর নেই—সব পরিষ্কার মহা সমুদ্রে ছোট দালানখানা যেন ভেসে যাচ্ছে। কী অপক্লপ সৌন্দর্য। জলের কী বেগ দাড়ানো যায় না। জ্যোতিকে ডেকে বললাম “চোখ ভরে এ সৌন্দর্য দেখে নে—এতো আর দেখবে না!” কী চমৎকার! তখনও ঝড় বৃষ্টি অল্প অল্প আছে। শ্রোতে জিনিষপত্র ভেসে যাচ্ছিল, ছেলেরা তুলে রাখতে লাগলো। বেলা ১০টা জল নেমে গেল, বৃষ্টি থেমে গেল, ছেলেরা ভোরেই জল ঠেলে বের হয়ে গিয়েছিল সহরের অবস্থা দেখতে। কর্ম-কুটিরের কর্মী ও মহিলাগণ শ্রোতে ভেসে ক্রমে একটি বাগানে ঢুকে পড়ে। গাছ আশ্রয় করে সমস্ত রাত কাটিয়ে ভোরবেলা সাতারিয়ে স্কুলের দালানে উঠে। জল নেমে যাবার পর আমাদের বাসায় আসে। একটি মহিলার পায়ে আঘাত লেগে সেদিনই জ্বর হয় এবং পরে সেপটিক হয়ে পড়ে।

কাট নেই, উনোন নেই, ঘর নেই, পানীয় জল নেই খাবে, কি? এ দেশে নারকেলের অভাব নেই বলেই এদেশ বেঁচে গেল—পথা হোল তার শাঁস, পানীয় তার জল। দু’তিন দিন পরে কেউ ষ্টোভ জ্বলে, কেউবা কয়লার তোলা উনোনে রান্নার ব্যবস্থা করে নিল। চিড়ার দর ১০ আনার স্থলে হলো ৫০ আনা। যার একটু চালা অবশিষ্ট ছিল তার বাসার তিন চার বাসার লোক খেতে লাগলো। এখন আর আর আমাদের মান, অভিমান, জাতি-বিচারের বালাই নাই। প্রকৃতির একটি অকুটিতে সাম্প্রদায়িক অর্নৈক্য, জাতিভেদ-বিচার, ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রভেদ সব বুচে গেল। এখন আমরা

মস্ত সাম্যবাদী, প্রকৃত সোশালিষ্ট;—এমনি হয়। শত বৃত্তি তর্ক, শত বক্তার বাণী যা করতে পাবে নি, প্রকৃতির শাসন এক মূহুর্তে তা করে দিয়ে গেল। প্রবলের কাছ হতে দুর্বল এমনি করেই মাথা পেতে শাস্তি নেয়, সেখানে আর বিচার-বুদ্ধির অহঙ্কার টিকে না। জড় সমাজের উপরে এমনি আঘাতই বুঝি চাই—আঘাত না পেলে তার চৈতন্য হবে না। এ-সব দেখে মনে হয় ব্যক্তিগত বিপদ, আপদ, শুচিতা, অশুচি-তার প্রশ্ন কত অকিঞ্চিৎকর, এ নিয়ে হৈ-চৈ-এর কথা ভাবলেও যেন হাসি পায়, লজ্জা হয়; অথচ এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকি।

তিনদিন পরে স্বধীন ও আমি একটু বাইরে ঘুরে সবাইকার অবস্থা দেখতে গেলাম। ঘর নেই, বাড়ী নেই, পুকুরের জল ঘোলাটে; চাল, ডাল, খান নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, অবস্থা ওঁকে এসে জানালে উনি বের হয়ে দেখে-শুনে কিছু কিছু সাহায্য দিয়ে এলেন। বাড়ীতে এসে অবস্থার বর্ণনা করতে কঁদে ফেললেন। এর পরে আমরা দলে দলে বের হয়ে সহর ও গ্রামের অবস্থা দেখতে লাগলাম। কী শোচনীয় অবস্থা। চারিদিকে শুধু হাহাকার, আতের হৃদয় বিদারক কান্না, কারো স্বামী নেই, কারো পুত্র নেই, কারো স্ত্রী কারো-বা সন্তান নেই—শ্রোতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে, বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। স্বামী-পুত্র-হারাদের সে কী কান্না! কিন্তু হাভাতের নাকি আবার দুঃখ : পেটের তাড়নায় ছুটোছুটি করে, তাদের আর কাঁদবার সময় থাকে না। এত বড় ক্ষুধার কাছে শৌক বিরহও যেন এক রকম বিলাস বলেই মনে হ’তে লাগলো। এক মুষ্টি চালের জন্ত; এক খণ্ড বস্ত্রের জন্ত সর্বহারাদের ছুটোছুটি দেখে চোখের জল ঝাঝে মানে নি। এই ক্ষুধা—এই অভাবের হাহাকার কি দিয়ে পূরণ করব ভেবে ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। ৫৬ দিন পরেই “বরিশাল ষ্টর্ম অ্যাণ্ড ফ্লাড রিলিফ কমিটি” স্থাপিত হয়ে চাল পাঠাতে লাগলো, ক্রমে কাপড়ও আসতে লাগলো, গভর্ণমেন্ট রিলিফ দিতে লাগলেন। স্থানীয় এস্, ডি, ও, নরোনহা সাহেব অতি দরদী লোক ছিলেন। তিনি সর্বহারাদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন, এরূপ দরদী অফিসার খুব কম মিলে। বড় দুঃখের বিষয় তিনি বড় অসময়ে অন্যত্র বদলি হলেন। তাঁর কথা চিরদিন মনে থাকবে।

ষ্টম অ্যাণ্ড ফ্লাড রিলিফ কমিটি, হিন্দু মহাসভা, রামকৃষ্ণ

মিশন, সংসদ, ফরোয়ার্ড ব্লক, র্যাডিকাল পার্টি, ভারত-সেবাশ্রম ও কংগ্রেসের ছেলেরা—যাঁর যতদূর সাধ্য সংগ্রহ করে আর্ন্তদের সেবা করছেন। কিন্তু হায়, এত বড় ক্ষতির পূরণ কি সহজে হয়? দশ বছর লাগবে ভোলায় এ ক্ষতি পূরণ হতে। এখানে সুপারী নারিকেলের বাগানই সব-চাইতে বড় সম্পত্তি তাই নষ্ট হয়েছে। বাক জীবীদের বরোজ নষ্ট হয়েছে, জেলেদের জাল গিয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, ছোট বড়র সকলেরই প্রায় এক অবস্থা। পাবলিক স্কুলের মাষ্টারগণ জী-পরিবার দেশে পাঠিয়ে সুদূরের আশায় বিনা মাইনেতে গুরু মুখে স্কুল চালাচ্ছেন। ডাক্তার, কবরেজ, উকিল মোক্তার বেকার বসে। এদেশ থেকে বহু লোক চলে গিয়েছেন—এখানে থাকেন কি? ব্যবসায়ীদের দোকান তুলে নিচ্ছেন। ভোলা আর সেই ভোলা নেই যেন মহাকালের তাণ্ডব-লীলা সঙ্কেতে সব লণ্ড-ভণ্ড ছত্রখান হয়ে পড়েছে। পার্থক্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা শোচনীয়। কী ভাবে চলবে এগুলো? অথচ না চললেও উপায় নেই, বীনাপাণি বালিকা বিদ্যালয় কোন প্রকারে খাড়া হয়েছে, কিন্তু চলবে কি করে সেই-ই সমস্যা। কর্ম-রুটির ভেঙ্গে চুরে স্রোতে ভেসে গিয়েছিল ছেলেরা কোন প্রকারে তা তুলে দিয়ে কর্মীদের ঠাঁই করে দিয়েছে, কিন্তু তাঁত, ঢেকী, ধান সব নষ্ট হয়েছে—আবার কত দিনে তৈরী হবে কে জানে? এখানে “হরিজন বিদ্যালয়” বিভাগে প্রায় এক শ ছাত্র-ছাত্রী হয়েছে, অর্থনয় অবস্থার বিদ্যালয়ে আসে। শীতের সময়ে এদের জামা কাপড় দেওয়া দরকার—বই নেই, শ্লেট নেই, সবই দেওয়া দরকার।

কতইতো করতে চাই কিন্তু টাকা কোথায়? দেশের সমুদ্র

বন্ধুগণ যদি এ দুঃসময়ে ভোলা মহিলা-সমিতির দিকে একটু নজর দেন, একটু দরদ করেন তবেই যে অনেক কিছু করতে পারে। এ পর্য্যন্ত আমরা যা সাহায্য করেছি তাতে ভিক্ষা-বৃত্তিরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এতে অভাব মিটতে পারে না—পাঁচ মাসেও তো মিটতে পারলাম না। যার যতটুকু আত্ম-সম্মান, মনুষ্যত্ব ছিলো তাও নষ্ট হচ্ছে। কূলবধুগণ ও ঘর সংসার ছেড়ে ভিক্ষায় বের হয়েছে পেটের জালায়। এখন সঙ্কোচ ভেঙ্গেছে, ভিক্ষাই এখন এদের ভাল লাগে, কাজের কথা বললে অনেকেই তাতে অরুচি প্রকাশ করে। অথচ ভিক্ষার আবেদন নিবেদনের অন্ত নেই। কান্নাকাটি লেগেই আছে, তাই ভাবছি কিছু খাটিয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা দরকার। এ নীচ প্রযুক্তি রোধ করতে হলে খেটে খাওয়াবার বন্দোবস্ত করতে হবে। তখনই প্রকৃত অভাব কার তা বোঝা যাবে। আমি গ্রামের সাথে সহযোগ করে দু’মাস পূর্বেই এ সব আরম্ভ করেছি, তাতে অনেক সুবিধাই পেয়েছি ॥

আজ আমি আমার মা বোনদের কাছে, দরদী বন্ধুদের কাছে অতি অসহায় দরিদ্র নারায়ণের সেবাকল্পে সাহায্য ভিক্ষা করছি। যার যতটুকু শক্তি ভোলা মহিলা সমিতিতে দান করুন। আপনাদের সেবা ভাণ্ডার আপনাদেরই অক্ষয় করে তুলুন এই প্রার্থনা।

ইতি নিবেদিকা—

সম্পাদিকা—

সরোজনলিনী দত্ত মহিলা সমিতি,

ভোলা।

রবীন্দ্র নাথের মর্ম্মর মূর্তি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মর্ম্মরের মূর্তি শুধু সে কান্তির ছায়া,
এখানে করিছে অধিষ্ঠানে,
ছবি করে রবি পূজা—নয় ভ্রম, মায়া
রূপ চায় পূজারীর প্রাণ।
আমাদের বুক দিয়ে এই বেদী গড়া,
নিখিলের মণিকোঠা এষে,
জগতের কুসুমের স্তবকে এ ভরা,
আমাদের আঁখি জলে ভেজে।

রূপ যার ছিল গোটা যুগ আলো করা,
কিন্নরের কর্তৃ ছিল যার;
লাবণ্য যা ভাস্করের চেষ্টা ছিল ধরা,
সে তবু অণুতে একাকার।
মিনাইল যে প্রতিভা অমৃতের ধারা
মাগরের সঙ্গে হিমালয়;
সর্ব দেশ জাতি এক প্রেমানন্দে হারা
জয়, জয় তাঁর জয় জয়।

গঙ্গার হাসি

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আমাদের হাটতলার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে একটা রাত্তা, এই রাত্তাটা হাটতলার এক দিক্কার অশ্বখ তলা দিয়ে গেছে গংগার দিকে। এখানকার গংগা নদী অদ্ভুত অনেকটা হিংস্রটে আছরে মেয়ের মত, এ যেখান দিয়ে বয়ে যায়, তাতে সে সন্তুষ্ট একেবারেই নয়, ও চায় আরো জায়গা বাড়ায়। হাটতলার রাত্তাটা আগে ছিল খুব বড় এখন এই ভাঙ্গনের জন্তে ক্রমে ক্রমে হয়ে আসছে ছোট; এই পথ বেয়ে কত যাত্রী যার চলে। পথটাও অদ্ভুত, মনে হয় এ যেন এক গংগা-যাত্রী যুগ যুগ ধরে হেঁটে চলেছে আর গংগার অন্ত-হলের গভীরে প্রবেশ করে, ধীরে ধীরে নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। গংগা যেন উন্মাদিনী—কখনো কলহাস্যে, কখনো ক্রোধ গর্জনে, কখনো নিশ্বাসে এর তীর ধ্বংস করে চলেছে, কোন ক্রক্ষেপ নেই, খেরাল নেই। সত্যিই সে পাগলী!

আমি পাগলীর কথাই বলব। তবে এ গংগা নদী—পাগলীর কথা নয়, সে আরেক পাগলী তারও নাম গংগা। সত্যি এই দুই পাগলীর নামের সঙ্গে আচরণেও আশ্চর্য্য ঐক্য।

গংগা পাগলী থাকে হাটতলার অশ্বখতলায়। বয়স ৪০।৪৫ হয়ে গেছে, প্রায় বুড়ী। গংগা নামটা মুছে গেছে পাগলামির তাড়নায়—সবাই এখন তাকে পাগলী বলেই ডাকে। তার সম্বলের মধ্যে একটা ময়লা কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি আর একটা ভাঙ্গা এলুমিনিয়ামের বাটি। সংসারে সকল সম্পদের উদ্দেশ্যে এ যেন তার ক্রুর ব্যঙ্গ। যখন খুব ক্ষিদে পায়...কট করে হাত পেতে বলে—“বাবু খেতে দিবি?” তার কথা শুনে যদি কেও হেসে ফেলে, সেও হেসে গড়াগড়ি দ্যায়। সত্যিই সে পাগলী।

গংগা নদী কলকল করে অবিশ্রাম বয়ে চলেছে।

আমি পাগলীকে দেখেছি—কখনো কাউকে অজ্ঞান গাল দিচ্ছে—অশ্বখ তলায় বসে, কখনো হাটতলার সেই কালো কুকুরটাকে বক্কে—খালি খাওয়া, আর খাওয়া এই বলে তাকে কিছু খেতে দিচ্ছে, কুকুরটা নির্বিবাদে খাচ্ছে আর লেজ নাড়চে। আবার কখনো আপন মনে এলো গোলো গান করচে আর নাচ্চে গঙ্গা। স্রোতের অম্লকূলে একটা নৌকো পাল তুলে চলেচে। গঙ্গাও গান গেয়ে নেচে নেচে চলেচে।

আমাদের হাটতলায় হাট রোববার আর বেম্পতি বার বসে। হুপুর থেকে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এর জের।

পাগলী কখনো ব্যস্ত ভাবে কখনো অন্তমনস্ক হয়ে সমস্ত হাটটা সারাক্ষণ চষে বেড়ায়।

আজ রোববার।

বেলা ১০।১১টার সময় বাড়ী ফিরছি। হাট বসতে অনেক দেরী—দেখলাম পাগলী মাথার ধুলো মাথা চুলগুলো পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে পা ছড়িয়ে অশ্বখ তলায় বসে আছে, পাশে সেই কালো কুকুরটা। আমার দেখে বললে—“কিছু খেতে দিবি, বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে।” আমি একটু হেসে চলে এলাম। আমার পেটে তখন ভরানক জ্বালা, কিছু বলবার মত অবস্থায় আমি ছিলাম না।

বিকলে হঠাৎ গোলমাল শুনে বাইরে এসে জানলুম, আজ একটা লোক গংগায় ডুবে গেছে। অনেকগুলো লোক তাকে জল থেকে খুঁজে তোলবার চেষ্টা করছে। বুড়ু গংগার কিন্তু ক্রক্ষেপ নেই সেদিকে। বয়ে চলেছে আগেরই মত!

বিকল প্রায় যায় যায়, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

হাট খুব জমেচে। পাগলী এই হাটের ভীড়ের মধ্যে উন্মাদিনীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাকে দেখে তাকেই বলে—“ওরে কিছু খেতে দিবি, বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে।” কেউ হাসে কেউ বকুনি দায়, হয় তো কোন বান্দর ছেলে—“খাবার নিবি খাবার নিবি” বলে এক মুঠো ধুলো দায়, কিন্তু খাবার কেউ দায় না। পাগলী একজন পথিকের কাছে খাবার চাইল। “আমি কি তোর জন্তে খাবার নিয়ে বসে আছি?”—পথিক পাগলীকে ধমকিয়ে তাড়িয়ে দায়। পাগলী আরেক জনকে গিয়ে ধরে—তিনি তখন এক প্রকাণ্ড মাছ নিয়ে দর করতে ব্যস্ত—পাগলীর কথায় কান দেবার মত তাঁর অবস্থা নয়। পাগলী ভীড়ের ঘন শ্রোত ঠেলে ক্রমাগত এগিয়ে চলে। পেছনে তার সেই কালো কুকুরটা।

ছুটো নৌকা, নদীর প্রতিকূল স্রোতে মাঝিরা সবগে গুণ টানছে।

হাট ক্রমে খুব ভাল করে জমে আসে। এখনও অনেক লোক আসচে—কেনা বেচার কাজে। ফিরেও যাচ্ছে অনেকে—কার হাতে একটা মুটরি, কার হাতে কিছু তরি তরকারি আবার কার মুখে পান সিগ্রেট।

হাটের এই বিপুল জনতার কলহ, কোলাহল, হট্টগোল মিশে এক অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করে। হাটের মধ্যে থেকে এই সংগত শোনা যায় না। একটু দূরে দাঁড়ালেই স্পষ্ট শোনা যায়।

আমি গংগার তীরের দিকে দাঁড়িয়েছিলাম। কতকগুলো লোক সেই ডুবন্ত লোকটিকে গংগা থেকে বার করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমার কানে তখনো হাটের সেই মিশ্রিত কোলাহল বাজছে।

হঠাৎ এই শব্দ ছাপিয়ে কর্কশ এক চীৎকার শোনা যেতে লাগলো—“চোর চোর” শুনে হাটের দিকে ছুটে গেলাম।

সেখানে গিয়ে দেখি—কতকগুলো লোক নিদ্রভাবে পাগলীকে গ্ৰহণ করচে। বাধা দিয়ে আমি বললাম—“করছ কি! মেয়ে মানুষ যে!” এর উত্তরে একজন বললে—“যে চুরী করে, তার আর মেয়েমানুষ পুরুষ মানুষ কি—সেতো অমানুষ। আরেকজন বললে—“উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে।

শুনলাম পাগলী নাকি একটা মিষ্টির দোকান থেকে না বলে করে ৫০টা মিষ্টি নিয়ে পালাচ্ছিল, তাই এই শাস্তি। দেখলাম মারের চোটে পাগলীর কপালে কালসিটে পড়েছে, পিঠের অবস্থা কত বিক্ষত। ঠোঁট কেটে গিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে—জিত দিয়ে লাল পড়ছে, চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

মারামারি ধাক্কা ধাক্কিতে পাগলীর হাত থেকে চুরী করা মিষ্টিগুলো মাটিতে পড়ে গেছে, কালো কুকুরটা মহা উৎসাহে খেয়ে চলেছে।

সেই লোকগুলো ওদিকে ডুবন্ত লোকটাকে গংগা থেকে টেনে বার করেছে। অনেকেই দেখতে ছুটলো—পাগলীও—কালো কুকুরটাও।

গংগাও বিহ্যৎবেগে ছুটে চলেছে—সাগরের দিকে। আকাশে কালো মেঘের ভীড়—এনোমেলো, তার ছায়া পড়েছে নদীর তরল স্রোতে।

সেই ডুবন্ত লোকটার চারিদিকে ভীড় জমেছে অগ্নয়। মুখে মুখে সবাই অনর্গল মন্তব্য করে চলেছে। লোকটাকে বাঁচাবার তখনো কি অক্লান্ত উৎসাহ। লোকটা যে বাঁচবে সে আশা করছে না কেউ, হারানো প্রাণ ফিরিয়ে আনার তবু সে কি নিশ্চল চেষ্টা।

ক্ষিদের কথা, মারের কথা ভুলে গিয়ে পাগলী উদ্ভাস্ত হয়ে সেই ভীড়ের দিকে চেয়ে রইল। তার চোখের কোলে জল তখনো শুকোয়নি। ঠোঁটটা ঝর ঝর করে কাঁপচে। ডুবন্ত লোকটার দিকে সে ফাকা চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। সবাইকে চমকিয়ে দিয়ে হঠাৎ সে বিকট স্বরে থিল থিলিয়ে হেসে উঠলো—গংগার দিকে চেয়ে। সারা ঘাটটা কেঁপে উঠলো তার হাসিতে। অদ্ভুত সে হাসি। কান্নাও বোধ হয় অমন হৃদয় বিদারক নয়। হাসতে গিয়ে পাগলীর ঠোঁট দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরতে লাগলো। মুখটা তার অদ্ভুত হয়ে গেল। সমস্ত ঠোঁটটা টকটক করছে লাল। যেন হাসির চিত্র।

স্বর্ঘ্য তখন অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশের রক্তরাগে গংগার জলও হয়ে উঠলো রক্তবর্ণ।

৩২রা দেবী (৫০)

১১ চন্দ্র

ভ্রম সংশোধন

৩২রা দেবী ছিলেন আমার ৪র্থ দেবর সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় সন্তান। ৩২রাজেন্দ্রনাথের প্রথম পুত্রসন্তানটি নিত্যশিশুকালে মারা যায়। ৩২রা দেবীর জন্ম ১৩০৩ সালের ৬ই আষাঢ় এবং মৃত্যু ১৩৪৮ সালের ১৬ই আষাঢ়।

মৃত্যু সময়ে স্বামী গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও একমাত্র সন্তান প্রমুখ কুমারকে রেখে তিনি সধবা অবস্থায় পরলোকগতা হয়েছেন। বঙ্গলক্ষীর কান্তিকের সংখ্যায় ৩২রা দেবী প্রবন্ধে তাঁর বৈধব্যের কথা লিখিত হয়েছে, এ একেবারেই ভুল। এই ভুলের জন্ত আমি পাঠকপাঠিকাদের কাছে ক্রটি স্বীকার করছি। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখিকা শ্রীযুক্তা অম্বরূপা দেবীর পত্রখানি নিম্নে প্রকাশ করা হোল। বঃ সঃ

৮/১১/৪১

১৬এ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রাট

মাননীয়স্ব,

৩২রা দেবীর চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঢাকুরিয়া বোডের চক্র বৈঠকে আমি মৌখিক যে কথাগুলি তার সম্বন্ধে বলেছিলাম, কেউ তার একটা মর্মার্থ লিপিবদ্ধ করে বঙ্গলক্ষীতে বার করেছেন দেখলুম। বড়ই দুঃখের বিষয়, তার মধ্যে কয়েকটি মাংগ-অঙ্ক ভুল থেকে গেছে এবং সেজন্য ঠাকুর পরিবার ও ৩২রার মার কাছে আমার বড়ই লজ্জিত করেছে। আগত সংখ্যায় ভুলগুলি আপনি শুধরিয়ে দিলে বিশেষ বাঞ্ছিত হবে।

১। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চুচুড়ার বাড়ীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকদিন ছিলেন। ইহার পরিবর্তে হইবে, ...চুচুড়ার গঙ্গাতীরের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর বাস করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে দিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। দিনুদা ও নলিনী ছিল আমাদের বালাসঙ্গী।

২। তার কয়েক বৎসর পরে তাদের মা মারা যান।

৩। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া ইত্যাদি এইটি কথাই প্রবন্ধের সব হইতে মর্মান্তিক ও লজ্জার ভুল। ৩২রা শেষ পর্যন্ত সধবা ছিল। বিধবা কথাটি লেখক কি করিয়া লিখিলেন জানি না।

লেখার পর আমায় একবার দেখাইয়া লইলে, অথবা তার কোন আত্মীয়কে দেখাইলে, এই অসঙ্গত ও অশ্রুত ভুলটি হইত না।

৪। “সেই সত্যই আমি যাহা লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা কোন কাগজে ছাপা হয় নাই;” ইহা লেখার ভুল, সেই প্রবন্ধটি ছ’ এক স্থানে সেই সময় ছাপিতে ভরসা পাই নাই। পরন্তু প্রবাসীতে ছাপা হয়; এই কথাই বলিয়াছিলাম।

যাহা হোক আমার এই পত্র বঙ্গলক্ষীতে ছাপা হইলেই পাঠকেরা আমার ও আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মর্ম গ্রহণে অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তিকারী লেখকের ভুল সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন ও ক্ষমা করিবেন।

আশা করি ভাল আছেন। প্রণাম লইবেন।

আপনার মেহের অম্বরূপা

কেন্দ্র সমিতির কথা

মহিলা সমিতির প্রতি নিবেদন

(১)

সবিনয় নিবেদন,

আগামী পৌষ মাসে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি ১৮শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। কেন্দ্র-সমিতির বাবিক কার্য-বিবরণী লিখিত হইতেছে। তজ্জন্ত কেন্দ্র-সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহিলা-সমিতির কার্যবিবরণী অবিলম্বে কেন্দ্র সমিতির কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। কি কি বিষয়ে মহিলা সমিতির বিবরণী প্রদান করিতে হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল :—(১) মহিলাসমিতি স্থাপনের ইতিহাস ও সভ্যসংখ্যা, (২) মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার এবং মাতৃ মঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কার্য, (৩) গৃহশিল্প-শিক্ষা :—(ক) গৃহ-শিল্প-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কিরূপ, (খ) কোন শিক্ষয়িত্রী আছেন কিনা? (গ) কি কি বিষয়ে গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, (ঘ) কতজন মহিলা কি কি প্রকার গৃহশিল্প শিক্ষা করিয়াছেন, (ঙ) যে গৃহশিল্প-শিক্ষা দ্রব্য সমিতির সভ্যারা প্রস্তুত করেন, তাহার মূল্য মাসিক কি পরিমাণ হইতে পারে, (ছ) প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা কিরূপ আছে, (জ) কোন শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল কিনা, (ঝ) নিম্নলিখিত শিল্প ও চারুকলার কোনগুলি সমিতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন :—সেলাই ও কাঁট-ছাঁট, রিগুকর্ষ, সুচিশিল্প, চিকণের কাজ, লেস, আসন, কাঁথা, বেত ও বাঁশের কাজ, হুতা কাটা, বয়ন, মণিপুরী তাঁতে তোয়ালে বোনা, পাটের ও শোনের দাঁড় প্রস্তুত, কাপড় ও কাগজের ফুল তোলা, তালের পাখা,

পরিতাক্ত দ্রব্যাদি হইতে নানাপ্রকার জিনিষ প্রস্তুত, হুপারী কাটা, পাগোষ, নানাপ্রকার উলের কাজ, রেশমের হুতা তৈয়ারী, কার্পেট প্রস্তুত, চিত্রাঙ্কন, আলিপনা, মাটির কাপড়ের ও কাঠের গুঁড়া দ্বারা পুতুল ও খেলনা তৈয়ারী, হুতা ও কাপড়ের রং করা প্রভৃতি; (ঞ) দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্ত সমিতি হইতে জিনিষ সরবরাহ করা হয় কিনা? (১৪) মহিলা সমিতি সম্বন্ধে সাধারণের সহায়ভূতি কিরূপ, (১৫) সজী-বাগান এবং উদ্যান-রচনার মহিলা-সমিতির কার্য, (১৬) গো-পালন, কৃষি প্রভৃতি কার্যে সভ্যগণের ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং সমিতির সহায়তায় তাহার আলোচনা, (১৭) বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষা বিধান, পারিবারিক জীবনে অধিকতর নৈপুণ্যলাভের জন্ত সমিতির সভ্যগণের চেষ্টা, (১৮) বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার পরিচালনে সাহায্য (১৯) বিধবাদের জন্ত সমিতির কর্ম প্রচেষ্টা, (২০) সমিতির বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ, (২১) বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব।

মহিলা সমিতি-পরিচালনে উৎকৃষ্ট কার্য করার জন্ত কেন্দ্র সমিতি যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া থাকেন।

এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ মহিলা-সমিতিকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিনীত

শ্রীহেমলতা দেবী

সম্পাদিকা

(২)

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন যে, প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে কেন্দ্র-সমিতির উৎসব সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলা-সমিতির উৎপন্ন শিল্প দ্রব্যের একটি বিরাট প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরের ছায় এবং আরোও সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতির কর্তৃপক্ষগণ আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে এইরূপ একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। আপনাদের সাহায্য এবং সহায়ভূতি না পাইলে ঐ অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। আপনাদের সমিতিতে যে সকল শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করা হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এবং বিক্রয়ের জন্য আমাদের

নিকট ২৩১ বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে পাঠাইয়া দিবেন। তালিকা সহ দ্রব্যগুলি রেলওয়ে পার্শ্বেলৈ ট্রাট ডেলিভারী ২৩১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, দিবার কথা লিখিয়া এমন সময় পাঠাইবেন, যেন ৭ই জানুয়ারীর পূর্বে আমাদের অফিসে পৌঁছে।

বিনীত

শ্রী হেমলতা দেবী

সম্পাদিকা

* প্রত্যেক জিনিষে নম্বর, সমিতির নাম, ও মূল্য লিখিয়া

দিবেন।

রচনা প্রতিযোগিতা

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি কর্তৃক “বাংলার জীবনে গুরুসদয় দত্তের দান” সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট বাংলা প্রবন্ধের জন্য ১০০ টাকা মূল্যের একটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

মাত্র বাংলার মহিলারা এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ১৯৪১-সনের ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে ২৩১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলিকাতা—ঠিকানায় সমিতির সম্পাদিকার নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ নির্বাচন ও পুরস্কার বিতরণ সম্পর্কে যে-কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সর্বপ্রকার ক্ষমতা সমিতির থাকিবে। নির্বাচিত প্রবন্ধ সমিতির মাসিক পত্রিকা “বঙ্গলক্ষ্মী”তে মুদ্রিত হইবে।

ভ্রাতৃত্বদ্বিতীয়

শ্রীনিস্তারিনী দেবী সরস্বতী

কে এলরে কার্তিকের শুরু দ্বিতীয়।

এলে কি ছুয়ারে মোর'

মুছাতে নয়ন লোর

সারাটি বরষ ধরে আছি অপেক্ষায়।

এস এস মোর এই ক্ষুদ্র আঙ্গিনায়।

শেফালির কম ছায়া

স্বরভি মাখান কায়া,

ফুটেছে কনক-বস্ত্রে হেমন্ত মেলায়

ঐ শিউলির মত,

ঘরে ঘরে বোন যত,

পথ চেয়ে বসে আছে তোমারি আশায়

এস এস হৃষ্ট মনে ধরি দুটি পায়

চিরদিন এক প্রথা

নূতন নাহিক তথা

সেই দুর্বা সেই ধান সুগন্ধি চন্দন

ভগিনী অঙ্গুলি স্পর্শে কল্যাণ বর্ধন ॥

ভ্রাতঃ তব এ ললাটে

হৃদয়ের অকপটে

দিতেছে ভগিনীদল তিলক মঞ্জল।

রেখোহে ফোঁটার মান,

এ নহে পার্থিব দান,

বাহ্যিক ঐশ্বর্যময় নয়ন উজ্জল ॥

সত্য হোক পূর্ণ হোক

নিত্য হোক ধন্য হোক

দীপ্ত হোক ভূমণ্ডল স্বরগ শোভায়।

আয় আয় ভাই ফোঁটা ডাকি উভরায়।

ঋষিযুগ বাণী দিয়া

যমদ্বার কণ্টাকয়া,

স্নেহ ডোরে বেঁধে দেয় মাতৃ আভা ফলে।

ভাই এত মধুময় জীবন কমলে।

সরল শৈশব প্রাণ।

নাহি ছলা কলা জ্ঞান

ভাই বোনে আদি বন্ধু প্রথম মিলনে।

ধরনীর বক্ষোপরি মৃত্তিকা আসনে।

নাহি মনে অভিমান,

শুধু আনন্দের গান,

অফুরন্ত লীলা খেলা অক্লান্ত অন্নান।

জীবনে মরণে নাহি হয় অবসান।

ক্ষুদ্র চন্দনের বিন্দু

পবিত্র-পরাণ হিন্দু

প্রচারিল গৃহে গৃহে শিখাতে একতা

হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে বাড়াল মমতা,

এই নীতি দেয় শিক্ষা,

এই ধর্ম দেয় দীক্ষা,

কে আপন কেবা পর ভুলে গিয়া আজ

জগতে জানাও হবে—নাহি কোন লাজ।

ধনী বা দরিদ্র হও,

ভগিনীর দান লও,

একতার মালা গলে পরহে নির্ভয়ে ॥

সার্থক উৎসব, পূর্ণ সফলতা জয়ে ॥

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

সবিনয় নিবেদন—

আজ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় ও সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতাগণ, ও সমিতির সভ্যগণ প্রভৃতির আন্তরিক সহানুভূতি এবং অনুগ্রহে বঙ্গলক্ষ্মীর ১৬শ বর্ষ কার্তিক সংখ্যায় পূর্ণ হইল এই বোড়শ বৎসর যাবত সর্বসাধারণের নিকট হইতে বঙ্গলক্ষ্মী যে সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছে, আশা করি আগামী অগ্রহায়ণ মাস, অর্থাৎ সপ্তদশ বর্ষও তাহা হইতেও সে বঞ্চিত হইবে না।

নববর্ষের বঙ্গলক্ষ্মী প্রবন্ধ, গল্প, কবিতাদি ও বিভিন্ন চিত্রসম্পদে অধিকতর মনোরম করার জন্য চেষ্টা করা হইবে। এক কথায় অগ্রহায়ণ বঙ্গলক্ষ্মীকে সর্বদ্বন্দ্বমুক্ত করিবার জন্য পূর্ব বৎসর অপেক্ষা অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রমের কোন প্রকার কার্পণ্য সরোজনলিনীদত্ত নারী মঙ্গল সমিতি হইতে করা হইবে না। বর্তমান যুদ্ধের দরুণ কাগজ পত্রের মূল্যায়িত্য সত্ত্বেও আমরা বঙ্গলক্ষ্মীকে পূর্ব মূল্যেই লোক মনোরঞ্জক করিবার চেষ্টা করিব। আশা করি, মহিলাদিগের উন্নতি-বিধায়ক এই এই পত্রিকাখানিকে সকলেই বিশেষতঃ মহিলাগণ নানাভাবে সাহায্য করিবেন।

• যাঁহারা নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন অবিলম্বে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হ'ন। পুরাতন গ্রাহক গ্রাহিকরা অর্থাৎ যাঁহাদের পূর্বপ্রদত্ত বার্ষিক চাঁদা কার্তিকমাসে শেষ হইয়া যাইবে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নববর্ষের বার্ষিক চাঁদা কার্তিক মাসের মধ্যেই মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করেন। তাহা হইলে আর তাঁহাদের অনর্থক ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না এবং যাঁহারা ভিঃ পিঃ তে নববর্ষের বঙ্গলক্ষ্মী লইতে অনিচ্ছুক তাঁহারাও যেন পত্রযোগে কার্তিক মাসের মধ্যে জানাইয়া অনুগৃহীত করেন।

কার্তিক সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মী পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমাদের পুরাতন গ্রাহকদের নিকট হইতে কোন আদেশ বা মণিঅর্ডার না পাইলে বুঝিব যে ভিঃ পিঃ গ্রহণে তাঁহাদের সম্মতি আছে।

৩০শে কার্তিক পর্যন্ত আমাদের পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছ হইতে কোনও প্রকার পত্রাদি না পাওয়ায় বর্তমান ২০শে অগ্রহায়ণের পর হইতে পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট, দেয় বার্ষিক চাঁদার জন্য অগ্রহায়ণ সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মী ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইব।

অনুগ্রহপূর্বক আমাদের গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, যাহাতে তাঁহাদের অবহেলা বশতঃ কোন ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়া অথবা নারীমঙ্গল সাময়িকী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।
নিবেদন ইতি—

বঙ্গলক্ষ্মীর নূতন ঠিকানা
বঙ্গলক্ষ্মী কার্যালয়
২৭১ বালীগঞ্জ স্টেশন রোড,
পোঃ বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

বিনীত
কার্যাবধি
বঙ্গলক্ষ্মী

যত ইচ্ছা তত

ষ্টেইটসম্যান কাগজের স্বপরিচিত স্তবক-লেখক “কিম্” যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের লোক কোন্ কোন্ পানীয় সব চেয়ে পছন্দ করে সে সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিম্-এর মতে ইংলণ্ডে পানীয় সম্বন্ধে রুচি খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে—এবং এর একটা মন্ত প্রমাণ আজকাল পাওয়া যাচ্ছে ব্রিটিশ সৈনিকদের চায়ের প্রতি ক্রমবর্ধমান পক্ষপাতিত্বে; “কিম্” লিখছেন।

“সৈন্তদের মধ্যে প্রায় সকলেই অল্প কিছু বদলে চা ই চায়। তাদের মতে জনপ্রতি যতটুকু চা বরাদ্দ আছে, স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট। এরা নিজেরা কিন্তু সেই সব প্রতিষ্ঠানেই গিয়ে জোটে, গবর্ণমেন্ট যেখানে অত্যন্ত সস্তায় চা সরবরাহ করেন। সেখানে সৈন্তেরা এক পেনি দামে এক পেয়লা চা পায়, তাছাড়া কিনতেও পারে যত পেয়লা ইচ্ছে। ছ’ এক গেলাস “বিয়ার” খাওয়ার চেয়ে যত পেয়লা ইচ্ছে চা খেতেই এরা পছন্দ করে। ভারতবর্ষের সৈনিকদের কাছে এ কথাটা হয়তো খুবই আশ্চর্য শোনাবে, কিন্তু তাহলেও এটা সত্য।”

এর পর “কিম্” বলছেন :

“ইংলণ্ডে সৈন্তেরা যে পরিমাণ চা খাচ্ছে, সে-সম্বন্ধে কারুরই কোন অভিযোগ নেই। তবে যে সব মহিলারা সত্যি সত্যি একরকম চায়ের উপরই বেঁচে আছেন, এবং যাদের চায়ের বরাদ্দও খুব কম, এই রকম কয়েকজনকে আমি এই মন্তব্য করতে শুনেছি যে সৈন্তদের যখন অভিযানের জন্ত শক্ত করে তৈরি করা হতে থাকে, তখন তাদের নাকি কম করে’ চা খেতে শেখানোই উচিত; কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে তো আর এতো প্রচুর চা তারা পাবে না! কিন্তু এই মহিলারা যাই বলুন না কেন, চায়ের ভক্তদের সপক্ষে আমি একটা কথা বলবোই যে চায়ের জন্তই হোক, কিংবা কঠোর শারিরীক ব্যায়াম করতে হয় বলেই হোক,

এদের মতো এমন চমৎকার স্বাস্থ্য খুব কমই দেখা যায়। কাঁধ এদের চওড়া আর মুখে এদের লাল আভা। সাধারণ একজন লোকের উপর চা-পানের কী প্রভাব সে সম্বন্ধে একটা ডাক্তারী মত নিতে ইচ্ছে করে। এ-একটা অবিসংবাদিত সত্য যে অষ্ট্রেলিয়ানরা প্রচুর পরিমাণে চা খায়। যে-সব অষ্ট্রেলিয়ানকে ইংলণ্ডে দেখতে পাওয়া যায়, ইংরেজ সৈন্তদের চেয়েও তাদের স্বাস্থ্য ভালো। এমনও সম্ভব যে এরা ছেলেবেলা থেকে প্রচুর চা খাচ্ছে সেইটেই এর কারণ। ইংরেজ সৈন্তরা সে রকম ভাবে’ চা খাচ্ছে মাত্র বছর দুই থেকে। এরাও যদি অষ্ট্রেলিয়ানদের মতো চা খেয়েই বড় হয়ে উঠতো তাহলে হয়তো এরা আরো বড়-সড় আর বলিষ্ঠ হতো। কিন্তু আজ যে-সব সৈন্ত উত্তর আফ্রিকায় মার্চ করছে কিংবা যুদ্ধ করছে, আমি নিশ্চিত জানি ইংলণ্ডে মোতায়ন সৈন্তদের চেয়ে তারা ঢের কম চা খেতে পায়। খুব বেশি করে’ চা খেতে পায় না বলে কি তাদের খুব খারাপ লাগে? তারা কি কেবল গ্যালন-গ্যালন চা খাবার লোভেই ছুটি নিয়ে কেইরো কি কজামিয়ায় যাবার স্বপ্ন দেখে?”

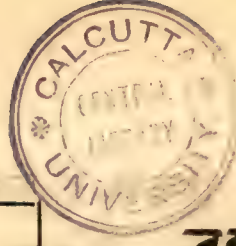
বন্ধে “কিম্” ইংরেজ সৈন্তদের চা-প্ৰীতির যে-সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা গুঁর নিজের চোখে দেখে। শারীরিক ও মানসিক শক্তি জোগাতে চায়ের শক্তি পৃথিবীর লোকে যতই বুঝতে পারছে, ততই সর্বত্র, বিশেষ করে’ সৈন্তদের মধ্যে এর সমাদর বেড়ে চলেছে। “কিম্”-এর লেখা পড়ে’ মনে হয়, তিনি সৈন্তদের আরো বেশি করে’ চা খেতে দেবার পক্ষপাতী। কেননা তাঁর বিশ্বাস শরীর তাজা রাখতে চায়ের শক্তি খুব বেশি। আধুনিক গবেষণার ফলে যতদূর জানা গেছে, তাতে দেখা যায় যে “কিম্”-এর এ-বিশ্বাসের মূলে অনেকখানি সত্য আছে। এ-দেশে চায়ের বহুল প্রচলন হলে আমাদের দেশের লোক যে অষ্ট্রেলিয়ানদের মতো সুস্থ-সবল হয়ে উঠবে না তা কে বলতে পারে?

বঙ্গলক্ষী—



উদযশস্বরের সংস্কৃতি-কেন্দ্র

—সংস্কৃতি—



গ্রালোক ভাসানো

আলোক-সুধার

অভিষেক তুমি

করো বসুধার,

নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার

এনে দাও অকলঙ্ক।

রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গলক্ষ্মী

পৌষ,

১৩৪৮ সাল, ২য় সংখ্যা

আমি

আমি কি আকাশ ছাড়া !
আমি কি তোমার প্রেমের প্রকাশে
হয়ে যাবো দিশাহারা !
পাবনা কি নির্দেশ—
পাবো না কি সেই অগাধ-অসীম
অনন্ত নির্বিশেষ !
আমার প্রকাশ হবে না কি তব
প্রেমের প্রকাশ-ধারা,
আমার চেতনা দিবে না কি তব
আনন্দ-বেদনে সাড়া !

(২)

আমি কি প্রকাশ হীন !
তোমার প্রকাশ বহিনি কি আমি
যুগ-যুগান্ত-দিন ?
দিই নি আসন পাতি,
নির্বিশেষের ছায়ায় জ্বালায়ে
রাখিনি প্রেমের বাতি ?

আনন্দ-রসে হুহুঁদোহুঁ মিলি
হইনি কি সার্থক,
আমার সকলি তোমার, তবুও
আমি কি নিরর্থক !

(৩)

ফুলে ফুলে মোর অন্তর-পথ
হয় নি কি ফুলময়,
আলোকের পথে হয় নি কি তার
চিত্তের বিনিময় ;
ধরণীর পথে চলিতে চকিতে
পায়নি সে তব দেখা,
হিয়ার মাঝারে ধরে নি কি প্রিয়-
চরণ-পরশ-রেখা ?
প্রেমের মিলনে মেলেনি কি তব
সাক্ষাৎ পরিচয়,
স্বাধায় তার অক্ষয় সুখা
রয় নি কি সঞ্চয় !

খিলবৎ বা নির্জন সাধনা

শ্রীহেমলতা দেবী

স্বকীয়মতাবলম্বী মুসলমান সাধকেরা যে প্রণালী অবলম্বনে ঈশ্বর সাধনার নিযুক্ত থাকেন, গীতার সাধন-প্রণালীর সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল দেখা যায়। আত্মসম্ভার মন বসাতে পারলে মাতৃয়ের অন্তরে যে আশ্চর্য আনন্দের উপলব্ধি হয়, আত্মসম্ভার নষ্টাবান সকল মানুষের মধ্যে সেই ভাবটি অবিকল এক— হোন তিনি যে সম্প্রদায়, যে জাতি। অন্তরের পথ ধরেই মানুষ মৃত্যুপারের সংবাদ জানে—সৃষ্টির পরম ঐশ্বর্যের সন্ধান পায়— অস্বদৃষ্টি তখন স্বচ্ছ হীরার মত জলতে থাকে। পূজাপাদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বশেষ ক্ষণে এই পথের কথাই বলে গেলেন শেষ লেখায়—

“তোমার জ্যোতিষ তারে

যে পথ দেখায়

সে যে তার অন্তরের পথ,

সে যে চিরস্বচ্ছ,

সহজ বিশ্বাসে সে যে

করে তারে চির সমুচ্ছল।

...

কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিত,

শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে

আপন ভাঙারে।

সেই পুরস্কার—

“সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।”

মহাত্মা স্বকীয়গণের মত, বিশ্বাস ও নির্জন সাধনধারার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দেওয়া হল।—

“ঈশ্বরের সামিধ্য লাভ ছাড়া শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য আর কিছুই নাই। বাহা কিছু ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া, তাহাই আমাদের বিপদ। আত্মবিলোপের (ফণা) অক্ষমতা হইতেই এই বিপদে আমরা ধাবিত হই।

চিন্তাশুদ্ধির সাধনার, বিকৃতির দিকে মনের প্রবণতা মাত্রই প্রকৃত বিকার।

স্বর্গ ও মর্ত্য এই উভয় লোকে যিনি গৌরবাধিত সেই মহান ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া যিনি কোনো পদার্থ কামনা করেন তিনিই কণ্ঠিত। পবিত্র ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবার পক্ষে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার যোগ্যতা লাভের জন্ত এই কলুষ হইতে আপনাকে রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক।

পদমধ্যাদা প্রাপ্তি, কপটাচরণ, অলৌকিক কার্য সাধন ও কোরাণের শ্লোক সকলের ব্যাখ্যা করিবার শক্তিশাল প্রভৃতি হইতে আপন ইচ্ছাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পূজা অভ্যাসের দ্বারা ঈশ্বরের সামিধ্যানে অবস্থান করার প্রতি আপন ইচ্ছাকে নিবিশিষ্ট করাই নির্জন সাধনার্থীর পক্ষে কর্তব্য।

ঈশ্বরের সামিধ্যলাভই বাহাদের মথার্থ ইচ্ছা নহে, বাহারা নির্জনবাস ও কুচ্ছ সাধনের দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ করিবার জন্তই উৎসুক তাহাদের ইচ্ছা যদি কোন অংশে পূর্ণ হয় তবে তাহা বিভ্রমের মাত্র এবং তাহা অহঙ্কার, মূঢ়তা ও ঈশ্বর হইতে দূরত্বেরই কারণ হয়।

হৃদয় পবিত্র করা, অন্তঃকরণ নির্মল করা ও প্রবৃত্তি সমূহের উপরে প্রভাব বিস্তার করার পক্ষে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ, আহার হ্রাস ও নিরন্তর জপ অত্যন্ত ফলদায়ক। নির্জন সাধনার দ্বারা সাধকের ধীশক্তি যখন উজ্জ্বল হইয়া উঠে ও কোন দুলভ বিদ্যার বাহুমূর্তি যখন তাহার সম্মুখে প্রকাশ পায়, এবং সত্য চিন্তা তাহার নিকট বাক্য হইতে থাকে তখন অলৌকিক শক্তি-পিপাসু সাধক মনে করে ইহাই বুঝি নির্জন সাধনার সর্বোচ্চ ও চরম লক্ষ্য। এইরূপে দৃষ্ট শব্দতানকে বড় করিয়া তুলিয়া সে অহঙ্কৃত হইয়া উঠে ও অপর সকলকে দূরার দৃষ্টিতে দেখে।

বাহার অভিপ্রায় বিস্তৃত তাহার নিকট যদি কোন দৈব-শক্তির ক্রিয়া প্রকাশমান হয় তবে তাহাতে তাঁহার বিশ্বাসকে বলিষ্ঠ ও সঙ্কল্পটি দৃঢ় করিয়া তোলে।

গোড়ায় আবদ্ধক সঙ্কল্পটি সত্য হওয়া, তাহার পরে মানুষের কাছে সাধকের যত প্রকার ঋণ আছে সমস্ত হইতে

মুক্তিলাভ করিতে হইবে, কাহারো প্রতি কোন অত্যাচার করিয়া থাকিলে তাহা নিশ্চল করিতে হইবে, নিন্দা করিয়া থাকিলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে এবং সমস্ত শত্রুতা, ক্রুরতা বিদ্বেষ দূর করিয়া চিত্তকে সকলের নিকট পবিত্র করিয়া তুলিতে হইবে।

তীহার সম্পত্তির কোন কিছুর প্রতি যদি তীহার অত্যন্ত আসক্তি থাকে তবে সেই বস্তুকে সম্পত্তি হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে।

নির্জন সাধনার দ্বারে উপস্থিত হইয়া সাধক বলিবেন—হে ঈশ্বর যথার্থ প্রবেশ পথ দিয়া আমাকে প্রবেশ করিতে দাও ও যথার্থ বহির্দ্বার দিয়া আমাকে বাহির হইতে দাও। তোমার দয়ার দ্বারা আমাকে যুক্ত কর।

সাধক প্রার্থনার আসন অধিকার করিবার সময় প্রথমে দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া বলিবেন—

ঈশ্বরের নাম স্মরণ করি, ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করি, ঈশ্বর ধন্য হউন এবং ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতি শাস্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হউক !

হে ঈশ্বর আমার পাপ ক্ষমা কর, দয়ার দ্বার আমার সম্মুখে মুক্ত কর।

পরে ঈশ্বরের আবির্ভাব কামনা করিয়া, প্রসন্ন চিত্তে প্রণত দেহে ও বিনয়িত্ত হৃদয়ে তিনি দুইটি প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন।

প্রথম মন্ত্রে তিনি বলিবেন—হে আমাদের ঈশ্বর, তোমার উপরেই আমাদের নির্ভর। তোমাতেই আমাদের আশ্রয় এবং তোমাতেই আমাদের নিবাস হউক। পরে ঐকান্তিকতা ও বিনয়ের সহিত তিনি তীহার সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। ঈশ্বর হইতে বিমুখ হওয়ার জন্য তীহার অন্তরের অহুতাপকে তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রকাশ করিবেন।

সঙ্কল্পকে বিশুদ্ধ করিয়া অহুতাপ সহকারে ঈশ্বরে সর্বদা নিবিষ্ট থাকার কালে নির্জন সাধনার নিয়মিত সাতটি নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে।

১। বারম্বার স্নান।

সাধক যখন নিজের মধ্যে জড়তা অনুভব করিবেন তখন তিনি স্নান করিবেন কারণ এই উপায়ে তীহার অন্তরের পুণ্য

হ্রোতি উজ্জলতর হইয়া তীহার হৃদয়ের দীপ্তিরক্ষার সহায়তা করিবে।

২। বারম্বার উপবাস।

বাহাতে নিরন্তর কল্যাণে তীহার সমস্ত সময়কে অধিকার করিতে পারে এই জন্য তিনি প্রায়ই উপবাস করিবেন।

৩। স্বল্পাহার।

প্রাতরাশকালে আহারের পরিমাণ অল্প হওয়া উচিত। সাধক যদি কেবলমাত্র রুটি ও লবণ ভোজন করিয়াই থাকিতে পারেন তবে ভাল হয়।

নির্জন সাধকেরা তিন শ্রেণীর। বলশালী, মধ্যম বলশালী, দুর্বল।

দুর্বলেরা প্রতি রাত্রে, মধ্যম বলশালীরা দ্বিতীয় রাত্রে ও বলশালীরা তৃতীয় রাত্রে উপবাস ভঙ্গ করিয়া থাকেন।

সমুদয় খাদ্যই তিনি প্রথম রাত্রে বা শেষ রাত্রে খাইতে পারেন অথবা তাহার কতক অংশ প্রথম রাত্রে ও অবশিষ্ট শেষ রাত্রে আহার করিতে পারেন।

শেষোক্ত প্রকার ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ এই উপায়ে উপাসনা কালে তিনি দুর্বলতাবোধ করিবেন না ও রাত্রির প্রার্থনাকালে দণ্ডায়মান থাকিবার সামর্থ্য তীহার থাকিবে।

সর্বপ্রকার কলুষ, অন্ধকার ও স্থলস্থের কারণ স্বরূপ যে মৃত্তিকার অংশ আমাদের দেহে আছে তাহাকে শরীর হইতে বর্জন করিবার পক্ষে স্বল্পাহার বিশেষ উপযোগী।

৪। স্বল্পনিদ্রা।

যতক্ষণ পারেন সাধক নিদ্রা ঘাইবেন না। নিদ্রা আসিয়া যদি তীহাকে অভিভূত করে পুনর্ব্যার স্বানের দ্বারা অথবা কোরাণ পাঠের দ্বারা তাহার আবেশ তিনি দূর করিবেন। ইহাতেও যদি নিদ্রা দূর না হয় ও তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিদ্রায় আক্রান্ত হন তবে নিদ্রাভঙ্গে তিনি পুনরায় স্নান করিবেন ও প্রার্থনায় নিযুক্ত হইবেন।

যে পরিমাণ নিদ্রা অত্যাৱশ্যক তাহাই ভজন সাধনের

অমূল্য, কারণ তাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তি ও স্বভাবের জড়ত্ব দূর হইয়া যায়। এই জড়ত্ব বশতঃই আমাদের অন্তঃকরণ পূজার আনন্দ ও নিষ্ঠা ধরিয়া রাখিতে পারে না। নিদ্রার দ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তির বিস্তৃতি ও অন্তঃকরণের বিস্তার পুনরায় কিরিয়া আসে, তখন সাধক পুনশ্চ পূজার্কর্মনায় নিবিষ্ট হইতে পারেন।

৫। মিতভাষণ।

লোকের সহিত আলাপ করিবার সময় সাধক সর্বদাই রসনা সংযমের প্রতি সতর্ক হইবেন।

কোনরূপ বিপত্তির আশঙ্কা না থাকিলেও জানী ব্যক্তি মৌন অভ্যাস করিবেন।

ভালই হউক আর মন্দই হউক বাক্যমাত্রের সহিত বিপদের সম্ভাবনা জড়িত আছে। স্বভাব যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ পবিত্রতা লাভ না করে ততক্ষণ সুন্দর বাক্য ব্যক্ত করিয়া মানব আনন্দবোধ করে, এই আনন্দ হইতে অহঙ্কার ও মোহাবরণের উৎপত্তি আশঙ্কা করা যায়। আর কুৎসিত বাক্যের দগুনীয়তা সম্বন্ধে ত কোনো সম্মেহই থাকিতে পারে না।

মৌনাবলম্বন ব্যতীত নিরাপদ পথ লাভ করা যায় না।

মরিয়াম ও জিসার কাহিনীতে দেখা যায় ঈশ্বর মরিয়ামের মৌন দ্বারা জিসার বাক্য ক্ষুণ্ণির ভূমিকা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে আমার স্বভাব স্বরূপ মরিয়াম যখন বাক্যলাপে নিরস্ত থাকে তখন হৃদয়রূপ জিসা বচন প্রাপ্ত হয়।

৬। চিন্তাবর্জন।

ঐশ্বরিক ভাবের ধ্যানে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ ও জপের দ্বারা সাধক চিন্তাপুঞ্জ দূর করিবেন।

৭। কর্মের নিরন্তরতা।

অন্তরে বাহিরে সাধক আপনাকে ভগ্নত্বের পবিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া রাখিবেন। যে মুহূর্ত্তে যে কার্যটি সর্বাঙ্গেকা আবশ্যক এবং উত্তম, সাধক সেই মুহূর্ত্তে সেই কর্মেই নিযুক্ত থাকিবেন। বাহারা প্রথম পংক্তির সাধক তাহার ঈশ্বরের উপদেশ পালন ও উপাসনার নিযুক্ত থাকিবেন এবং সময়ে সময়ে জপ করিবেন।

সকল জপের মধ্য হইতে শেখগণ এই জপটিকেই বাহিয়া লইয়াছেন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (ঈশ্বর ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই) এই বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারণের দ্বারা ঈশ্বরের একত্ব সাধকের অন্তঃকরণে আশ্রয় পায়, তাহার মূল-হৃদয়ে নিহিত হয় এবং তাহার শাখা প্রশাখা আত্মায় বিস্তার লাভ করে।

এই সময়ে জপটি সাধকের অন্তঃকরণের স্বাভাবিক ধর্ম হইয়া উঠে ও তিনি নিয়তই ইহার সাহায্য লাভ করিতে থাকেন। এই অবস্থায় ক্রান্তির কালেও আলস্য-জড়িত জপ সাধককে অভিভূত করে না। অবশেষে জপ এমন একটা স্থানে আসিয়া উপনীত হয় যেখানে সে হৃদয়ের মধ্যে মণির দ্বার খচিত হইয়া থাকে।

তখন জপকর্তা জপের মধ্যে, জপ হৃদয়ের মধ্যে ও হৃদয় জপের মূল অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এই অবস্থায় যদি জপটি অর্থাৎ একাবোধক বাক্যের বাহ্য রূপটি হৃদয়ের বহিঃংশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় তবে হৃদয়ের অন্তর্ভাগে তাহার সত্যটি গ্রথিত হইয়া যায়। ইহাকেই বলে "হান"। তখন জপ, জপকর্তা ও জপের বিঘ্নীভূত ঈশ্বর একই হইয়া যায়।

মধ্যম শ্রেণীর সাধকের পক্ষে ঈশ্বরের উপদেশ সকল পালন করিয়া উৎসাহের সহিত কোরাণ পাঠে নিবিষ্ট হওয়াই সর্বোত্তম।

প্রথম শ্রেণীর সাধকগণ জপের দ্বারা যে বিশেষ গুণ লাভ করেন কোরাণ পাঠের দ্বারা সে গুণ ছাড়াও আরো একট বিশেষত্ব লাভ করা যায়।

ঈশ্বরের গুণ সমূহের মহিমা, বিচিত্র আধ্যাত্মিক সত্য, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সত্যের জ্ঞান, কোরাণের নানা শ্লোক পাঠের দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর সাধক, বাহার মধ্যে জপের আলোক অন্তর্নিহিত গুণ স্বরূপে পরিণত হইয়াছে তাহার পক্ষে কোরাণ পাঠ অতি উত্তম ও প্রার্থনার ক্রিয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ এই প্রার্থনার মধ্যে সাধনের সকল অঙ্গই নিহিত আছে।

জপ, পাঠ, মেহের প্রণতি, অন্তরের প্রণতি সমস্তই ইহার অন্তর্ভূত।

সাধন সম্বন্ধে অধ্যবসায় থাকা শ্রেয়। প্রকৃতির মধ্যে সাধন সম্বন্ধে যদি কোনরূপ বিতৃষ্ণা দেখা দেয় তবে প্রার্থনা

হইতে নিরন্তর হইয়া পাঠে নিযুক্ত হওয়াই উত্তম, কারণ প্রার্থনার সহিত তুলনায় পাঠ সহজ।

পাঠেও ক্লান্তি বোধ হইলে পাঠ হইতে নিরন্তর হইয়া জপে নিযুক্ত হওয়াই উত্তম ; কারণ ভাব-গৌরব-সম্পন্ন বিচিত্র অর্থ-পূর্ণ বাক্য সকলকে ধারণ করা অপেক্ষা লঘুবাচ্য আবৃত্তি করিয়া জপ করা সহজ।

জপকালে রসনাতে যদি জড়তার আবির্ভাব হয় তবে সাধক ঈশ্বরের প্রকাশ সম্বন্ধে নিজের দীনতা ভীতির সহিত স্মরণ করিতে থাকিবেন। ঘটনাক্রমে যদি ইহাতেও আলস্য জন্মে তবে সাধক ক্রিয়াক্ষণের জন্ত আপন মন প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়শক্তি সকলকে বিশ্রাম দিবেন এবং নিদ্রা দ্বারা স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবেন।

এই প্রকারে তাঁহার প্রকৃতি হইতে শান্তি দূর হইয়া যাইবে ও পুনরায় আরামে সাধন কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

বস্তুতঃ বিতৃষ্ণা ও বিষ্ময়তার সহিত প্রকৃতিকে কোন কার্যে নিযুক্ত করা শ্রেয়স্কর নহে।

নির্জন সাধক এমন সকল গ্রন্থ পাঠে সময় বাপন করিবেন যাহার দ্বারা গুঢ় তত্ত্বের পথ তাঁহার নিকট উন্মেষাটিত হইতে পারে।”

সুফী গ্রন্থ পাঠকালে মহাত্মা সুফীগণের নির্জন সাধনার

ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি একটি চার ছত্রের ছোট কবিতা লিখি। কবিতাটি—

অদূর স্বর্গে আসন তোমার

হৃদয়ে কেমনে ফেল চরণ,

অতুল অসীম মহিমা তোমার

কেমনে হৃদয় করে বরণ ?

যোজন যোজন দূর হতে তুমি

কেমনে করিছ যোজনা-

আপনার সাথে ; গোপন নিভৃতে

যে ক’রে তোমার ভজনা।

স্বরগে মরতে রয়েছ অবোধে

নাহিক কেহই তোমা সম,

দূর হতে তুমি দেবতা আমার

নিকটে আসিলে প্রিয়তম।

শূভ্যপাদ কবি সেটি প’ড়ে, বোধ হয় আমাকে উৎসাহিত করার জন্ত, খুব খুসী দেখিবে বলে উঠলেন, “হোয়েছে—হোয়েছে—তোমার কবিতা লেখা এসে গেছে—তুমি পেরেছো,—এই দেখো, সুফীরা তোমার মনের মধ্যে গিয়ে কেমন আসন পেতে বসেছেন।”

কারও সামান্য একটু ভাল রচনা দেখলে কবি কত খুসী হতেন সে কথা আজ মনে পড়ছে।

* সন ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী হইতে।



প্রাচীন ভারতের ডাকটিকিটে ডাকঘরের কথা

শ্রী অমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

আমরা প্রত্যেকে এক একখানি চিঠি ডাকে দিয়া থাকি। ডাকহরকরা তাহার বাঁধা নিয়মামুসারে ঐগুলি ডাকবাঁধ হইতে সংগ্রহ করিয়া, ডাকঘরে জমা দেয়, তথায় চিঠিগুলিকে মুদ্রাক্ষিত করিয়া খামের উপর লিখিত ঠিকানা অনুযায়ী বিভাগান্তর ভিন্ন ভিন্ন থলিতে এগুলি বন্ধ করিয়া, বাষ্পীয় যান বোলে বিভিন্ন ডাকঘরে পাঠান হয়। অনন্তর ঐ ডাকঘরের পেয়াদারা সেই চিঠিগুলি পুনরায় মুদ্রাক্ষিত করিয়া আমাদের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বিলি করিয়া যায়। এই যে শ্রম স্বীকার তাহার পশ্চাতে আছে বহুশতাধিক বৎসরের আশ্রয় চেষ্টা ও অধ্যবসায়, ক্রমোন্নতি ও সুর্যোগ বিস্তার সাহায্য সহিত আমাদের কাহারও মুখ্যভাবে কোনও সম্পর্ক নাই।

ভারতে অধুনা প্রচলিত দুই আনা মূল্যের টিকিট খানিতে দেখিবেন এক ডাকহরকরার ছবি। বহু প্রাচীন কাল হইতে আজিও গ্রামে গ্রামে ঐ ভাবে ডাক বাহিত (Transport) হইতেছে। পরন্তু কবে কোথায় এই রীতি প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে বৌদ্ধযুগে যে চিঠির আদান প্রদান ছিল নাগার্জুনের চিঠিই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। এই নাগার্জুন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাবান সম্প্রদায়ভুক্ত একজন বৌদ্ধ যাজক হইয়াছিলেন। ইহার অপেক্ষাও প্রাচীন অল্প কোন চিঠি ভারতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে সম্প্রতি হরপ্পা ও মহেন্জোদাড়োতে যে সকল শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে আমার মনে হয় যে বৈদিক যুগেও চিঠির আদান প্রদান ছিল এবং বন্ধ-পত্রের উপর মোহর-চিহ্ন দেওয়ার জন্ত ঐগুলি ব্যবহার করা হইত। স্বন্দাদি পুরাণে কোন কোন স্থলে এরূপ ইঙ্গিত আছে কিন্তু স্পষ্টতর প্রমাণ পাই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে। কল্কীদেবী স্বন্দামা নামে এক ব্রাহ্মণের হাতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠান। উহা বাহির হইতে মোহর চিহ্নিত করিয়া বন্ধ করা ছিল। ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ সন্নীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমক্ষে ঐ মুদ্রা উল্কাটন করেন এবং সেই চিঠি

পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শুনান। ব্রহ্মারাক্ষস, হর্ষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থেও আমরা শীলমোহরের এরূপ ব্যবহারের উল্লেখ পাই। তবে সে সময়ের লিখিত কোন চিঠির যে এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহার কারণ ভারতের আবহাওয়া ও বৈদেশিক তাড়না। ভারতের সে যুগে লেখালেখি ব্যাপারে ভূজপত্রই মূলতঃ ব্যবহার হইত, ইহা কালের দাপট সহনক্ষম নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে একখানি প্রাচীন চিঠির কথা উল্লিখিত আছে উহা শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র শেখর বসু মহাশয়ের পৌরাণিক কাল নির্ণয় যদি নির্ভর যোগ্য হয় তাহা হইলে এই চিঠিখানি আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৪৩৩ অব্দে লিখিত হইয়াছিল।

বিক্রম নামে রাজার পুত্র মাধব এবং প্রফরাজ গুণাকরের কন্যা সুলোচনার মধ্যেও এইরূপ পত্রব্যবহার হইয়াছিল (পদ্ম-পুরাণ)। এই সকল চিঠি যে ব্যক্তিবিশেষকে দূত নিযুক্ত করিয়া তাহার মারফৎ আদান প্রদান চলিত এবং সে যুগে ইহাই যে রীতি ছিল তাহাও আমরা পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। এই প্রবন্ধ অবধা ভারি হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় প্রমাণ-বাক্য সমুদয় এখানে দিলাম না।

পরবর্তী যুগে পত্রবাহক রূপে দূতের স্থান অনেকটা অধিকার করিল উষ্ট্র ডাক। অধুনা প্রচলিত ১/১০ পয়সা মূল্যের টিকিটে ইহার ছবি পাইবেন। ছবিখানি সম্প্রতি মুদ্রিত বটে কিন্তু ছবির অন্তর্নিহিত বিষয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলের— তাঁহারই রাজত্বকালে উষ্ট্র ডাক প্রথম স্থাপিত হয়। আমার অনুমান গ্রীকবীর আলেক্সান্দার যখন উত্তর পাঞ্জাব ও কাশ্মীর জয় করেন, সেই সময় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাদের দলভুক্ত থাকায় গ্রীক প্রভাব তাঁহার মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে বোধ হয় তিনি পরবর্তী যুগে তাঁহার বিশাল রাজ্য সর্ব রকমে শাসনবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র আধ্যাবর্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াতের পথ সুগম করিয়া উষ্ট্রের ডাক স্থাপন করেন। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস তাঁহার ভারত

ভ্রমণ বৃত্তান্তে “গুপ্তচর” বলিয়া কোন শ্রেণীর দূতবৃন্দকে অভি-
হিত করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ বা এই
প্রবন্ধে বিবেচ্য নহে।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ ভারতের সর্বত্র
ডাক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ আমরা ইতিহাস হইতে
জানিতে পারি সম্রাটের পুত্র মহেন্দ্র যখন বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের
জন্য সিংহল দ্বীপে যান তাঁহার ভগ্নী সংঘমিত্রাকে ও তাঁহার নিকট
পাঠাইয়া দিবার জন্য একখানি চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। ইন্দো-
নেশিয়া, ইন্দোচীন, সেরেন্দ্রিয়া, ইণ্ডিয়া মাইনর, চীন জাপান
প্রভৃতি বহিঃ রাজ্যগুলির সহিতও এই সময় ভারতবাসীদের
চিঠির আদান প্রদান ছিল। গঙ্গাম ও মালাবার সমুদ্রতট
হইতে অথবা তাতালিগু হইতে ঐ সকল চিঠি যাইত। এই
ভাবে গঙ্গাসঙ্গম হইতে কোচীনচীনে কষোড়িয়ার চিঠি
পৌছাইতে প্রায় এক বৎসর সময় লইত বলিয়া চীন দেশীয়
প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণিত আছে। বর্তমান কালে এই সুদীর্ঘ
সময়ের কথা শুনিয়া হাসি পায় ঠিক কিন্তু যেরূপে কোন
শ্রেণীর জলপোত এই কার্যে ব্যবহার হইত আপনারা তাহার
হয়ত আলোচনা করেন নাই, যদিও বর্তমান আধুনিক ১১০ পরমা
মূল্যের টিকিট তাহারি ছবি বহন করিতেছে। আবার সময়
সময় স্থলপথেও পূর্ববঙ্গ আসাম ও মণিপুরের মধ্যদ্বারা পূর্ব ও
দক্ষিণ পূর্ব দেশ গুলিতে চিঠি যাইত। এ ছাড়া উত্তরে চীন
তিব্বত প্রভৃতি দেশগুলিতে হরকরা দ্বারা গিরিপথ অতিক্রম
করিয়া চিঠি পাঠান হইত।

উজ্জয়িনীর রাজকবি কালিদাস, ভরভূতি প্রভৃতি প্রাচীন
সংস্কৃত কবির শকুন্তলা, নলোপাখ্যান, মঙ্গারীর চরিত ইত্যাদি
কাব্যগ্রন্থ পাঠেও বেশ বুঝা যায় যে চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের
জনসাধারণেও যথেষ্ট চিঠির আদান প্রদান করিতেন,
পারাবতের সাহায্যেও চিঠি প্রেরণের রীতি ছিল।

মহানামতীর গানে আমরা দেখিতে পাই গোবিন্দচন্দ্র যখন
সম্রাস গ্রহণ করিয়া—বাদশ বর্ষ প্রবাসে কাটাইতেছেন সেই
সময় তিনি নিজ উরুদেশের রক্ত লইয়া একটি সামান্য কাঠির
সাহায্যে চিঠি লিখিয়া পারাবতের গলার বাঁধিয়া দিয়া তাহা
পাঠাইয়া দেন।

চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে
জানা যায় যে—৬৩০ খৃষ্টাব্দে রাজকীর চিঠিপত্র বহনের জন্য

ভারতের প্রায় সর্বত্রই ডাক স্থাপিত ছিল। কনৌজরাজ
হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার বানবাহনাদির সুবিধা করিয়া দিবার জন্য
একখানি চিঠি লিখিয়া তাঁহার হস্তে দিরাহিলেন বাহার
সাহায্যে ভারত ভ্রমণের তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।
তিনি ঐ চিঠিখানি দেখাইয়া চীন সীমান্ত পর্যন্ত সকল রাজ
হইতেই যানবাহন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

গুজরাটের মোমনাথ দেবের পুত্রানাদির জন্য গঙ্গা হইতে
জল এবং কাশ্মীর হইতে জল আসিত। এইরূপ ব্যবস্থা হইতে
প্রতীয়মান হয় যে সে সময় খাবকের কার্য পদ্ধতি উত্তরকালেই
জানা ছিল। আবার কর্নেল ব্রাউটন লিখিত A letter
from Marhatta Court নামক পুস্তকে দেখিতেছি,
রাজপুতনার পুস্কর মন্দিরের জলফুলাদি সরবরাহ করিবার ঐ
একইরূপ ব্যবস্থা। অতএব নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে
পারে যে তৎকালে খাবক-পদ্ধতি বিশেষ ভাবে প্রবর্তিত হইয়া-
ছিল ও প্রচলিতছিল। নতুবা ভারত বিজেতা আরবীয়গণ
স্বদেশের সহিত পত্র ব্যবহারে এই দেশেরই হরকরা নিযুক্ত
করিবেন কেন? এবং নিশ্চয়ই এইরূপ পদ্ধতি অর্থাৎ দূরদেশের
সহিত সম্পর্ক রাখিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমধ্যে ডাক বদল আড্ডার
ব্যবস্থা ভালই ছিল তবে যুদ্ধাদি বিগ্রহকালে হয়ত ইহা উপযুক্ত
ভাবে ফলপ্রসূ হয় নাই। কেননা ঠিক ইহার পরবর্তী যুগেই
দেখিতেছি খিলিজী সৈন্য যখনই রণাঙ্গনের অভিমুখে যাত্রা
করিত তাহার সহিত ঘোড়ার ডাক ও হরকরা বা খাবক ডাক
উভয়েরই ব্যবস্থা থাকিত এবং রাজ্যের কোথায় কবে কি
ঘটিতেছে তাহারও খবর এই ডাক মারফৎ সম্রাটের নিকট
পৌছিত। জিন্নাউদ্দীন বারকীর এই উল্লেখ অপেক্ষা বিস্তৃত
বিবরণ ইবন বাট্টার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি।

ইহাতে বর্ণিত আছে চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দুস্থানে ঘোড়ার
ডাক এবং হরকরা উভয়ই ছিল। ঘোড়সওয়ারেরা স্থলতানের
সৈনিক। চারিমাইল অন্তর তাহাদের ঘাটি আছে এবং
প্রতি মাইল অন্তর পর পর তিনটি করিয়া হরকরাদের আড্ডা
আছে। ইহাদের প্রত্যেকের হস্তে দুই হস্ত পরিমিত এক
চাবুক থাকে। উহারা এক হস্তে পত্রাদি লইয়া অপর হস্তে
চাবুক ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরবর্তী আড্ডার প্রতিধাবিত হয়।
ঐ সকল চাবুকের মাথার ঘটা বাঁধা থাকায় ইহাতে একপ্রকার
শব্দ হইতে থাকে। এই শব্দ পরবর্তী আড্ডার লোকে শুনিতে

পাইলেই তাহাদের একজন বাহির হইয়া আসে এবং উক্ত পত্রাদি লইয়া পরবর্তী আড্ডার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। এই কারণে সম্রাট অতি শীঘ্র খবরাখবর পাইতে পারেন। আফ্রিকান পর্যটকের সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাহাবুদ্দীন আবুল আস আমেদও ঐ সময় ঐরূপ ডাকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন বটুটা ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়া অফিসের কাপড়পত্র হইতে জানা যায় ক্রিষ্টের কলম্বাস যখন ভারত অন্বেষণে বাহির হন সেই সময় তাঁহার সহিত তাতার রাজ্যের নামে একখানি পত্র দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। ইহার পাঁচ বৎসর পর ভাস্কোডাগামা লিসবন সহর হইতে ভারত অন্বেষণে বাহির হন। তিনি ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে উদ্ভূতমাশা অন্তরীপ হইয়া মালাবার তীরে কালিকট সহরে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য জন্মে। এই সময় দিল্লীর সিংহাসনে একজন আফগান রাজা উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতে ছয় মাস-কাল অতিবাহিত করার পূর্ব ভাস্কোডাগামা স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় তাঁহার হস্তে মালাবার রাজ পর্তুগাল রাজ্যের নামে এক পত্র প্রেরণ করেন; ইহাতে লিখিত ছিল—*Vascodegama a noble man of your honse-hold has visited my kingdom there is abundance of cimon, cloves, ginger, pepper, and precious stones, what I seek from thy country is gold, silver, coral and scarlet.* এই স্মরণীয় ঘটনার চিত্র আপনারা দেখিতে পাইবেন পর্তুগীজ ভাষাতে ১৯১৩ ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের টিকিটে। ইহাতে ভাস্কোডাগামা ও তাঁহার পাল তোলা জাহাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

সেকেন্দার লোদীর (১৪৮৮-১৫১৮) সময়ও ডাক স্থাপিত ছিল; এবং ইতিহাস হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে ইনি এই বিষয়ে আলাউদ্দীন খিলজীর মতই ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। খিলজীই ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তক কিন্তু পরবর্তী যুগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। আগ্রা হইতে কাবুল পর্যন্ত এই সূদীর্ঘ পথের উপর ডাক বসাইবার জন্ত বাবর আদেশ করেন—উক্ত পথে নয় ক্রোশ অন্তর প্রায় ৩৬ ফুট উচ্চ এক একটি মিনার

প্রস্তুত হইবে; তাহাদের চূড়া চতুর্দ্বারী হইবে। প্রত্যেক ১৮ ক্রোশ অন্তর ছয়টি করিয়া অথ বাধা থাকিবে এবং ডাক-চৌকীর দারোগা, সহিস এবং ঘোড়ার দানার জন্ত খরচ সোপান হইবে। পরন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব। সুতরাং বলিতে হয় শেরশাহাই ঘোড়ার ডাকের প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি সিন্ধুদেশ হইতে পাঞ্জাব হইয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত ২০০০ মাইল বিস্তৃত যে পথের সংস্থার করান, তাহার উপর ঘোড়ার ডাকও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে মিলাব ও আগ্রা এবং সূদূর বঙ্গদেশ হইতে সংবাদাদি পাওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। নানাপ্রকার পথের উপর তিনি সর্বত্র ১৭০০ ডাকচৌকী এবং তাহার প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া ঘোড়া স্থাপন করেন। ইহাতে ৩৪০০ ঘোড়া তাঁহার লাগিয়াছিল। এই সময়ের একটি ডাকচৌকীর ধ্বংসাবশেষ এখনও আগ্রা হইতে সেকেন্দার বাইবার পথে দৃষ্ট হয়। অতঃপর আকবর সাম্রাজ্যের কথা।

সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) ডাক ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহার সাক্ষ্য আইন ই-আকবরী। ইহাতে রহিয়াছে সম্রাট আকবর যে নূতন নিয়ম স্থাপন করেন তন্মধ্যে ডাক মেবড়াগলের নাম উল্লেখযোগ্য, ইহার মেরাটের অধিবাসী এবং ক্রতগামী বলিয়া বিখ্যাত। আকবর ইহাদের ডাকবহন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। আরও আছে, হিন্দুদের একটি সম্প্রদায়কে রায়বড়ি বলা যায়। ইহারা উদ্ভূত পরিচালনায় এবং উহার প্রকৃতি সন্মুখে বেশ অভিজ্ঞ। কি ভাবে চলিলে অল্প সময়ের মধ্যে দূর পথ অতিক্রম করা যায় সে বিষয় উহারা উটদের শিক্ষা দিয়া থাকে। হরকরা ও ঘোড়ার ডাক রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত সর্ব পথে চার ক্রোশ অন্তর স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি জরুরী পত্রাদি বহনের জন্ত রাজপ্রাসাদে সর্বক্ষণ উটের ডাক তৈয়ারী থাকিত। এই সময় সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টায় ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আগ্রা হইতে গুজরাটের আমেদাবাদে পাঁচদিন মধ্যে ডাক পৌঁছাইত।

রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাঁহাজর কলিকাতার ইতহাসে লিখিয়াছেন ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে নিউবেরী ও ফিচ নামক দুইজন সাহেব মহারাণী এলিষাবেথের নিকট হইতে সম্রাট আকবরের নামে একখানি পত্র লইয়া স্থলপথে সৌরভা দিয়া ভারতবর্ষে

উপস্থিত হন। এইখানিই বোধ হয় ইংলও হইতে প্রাপ্ত প্রথম পত্র। এই পত্রখানি হইতে আরও বুঝা যায় যে সে সময় পর্যন্ত ডাক হরকরা বা অন্য কোন নির্দিষ্ট উপায়ে ইংলণ্ডের সহিত নিয়মিত ডাক-পত্র ব্যৱহার ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল যুরোপীয় পর্যটকগণ ভারতে আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে আলেকজান্দ্রা হামিলটন অগ্রতম। ইনি মোগল ডাকের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে, পশ্চিমধ্যে প্রতি দশমাইল অন্তর ডাকচৌকী এবং তথায় হরকরা বদলের ব্যবস্থা থাকায় মোগল রাজত্বের ডাক খুব শীঘ্র যায়। ইহারা পত্রাদি কারুকার্যে খচিত একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া উহা মাথায় বহন করে। ষটায় ৫৬ মাইল হিসাবে দিবারাত্র পথ চলিয়া ইহারা রাজধানী হইতে সত্ৰাটের অধিকার-ভুক্ত রাজ্যের শেষ সীমান্তে প্রায় আট দিনে ডাক পৌছাইত।

এই সময় ডাকচৌকীর দারোগা ও নানা স্থানে সংবাদদাতাও নিযুক্ত ছিলেন। ওয়াকুইনতিস অথবা ওয়াকুই নিপার, গুয়ানিনিপার, কুফিয়া নতিস ও হরকরা নামে তাহারা পরিচিত। ইহারা নিয়মিতভাবে ডাকচৌকীর দারোগার আদেশ মত কার্য এবং সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া তাহা উজীরের মারফৎ সত্ৰাটের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লিখিত একখানি পার্সিয়ান পুঁথি হইতে জানা যায়, ওয়াকুই সপ্তাহে একবার, গুয়ানি দুইবার চোন্ধের মধ্যে তরিয়া জরুরী খবরাদি আসিত, ঐ সকল পত্রাদি সংখ্যা সকল সময় ঠিক না থাকিলেও ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় সে সময় ডাকের বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। ইহা আরও প্রমাণিত হয় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের নেওয়ান মুহম্মদ আলী খাঁ লিখিত Mirat I Ahmid হইতে। ইহাতে আছে প্রদেশস্থ সংবাদদাতাগণের অধীনে অনেক সংবাদ সংগ্রাহক থাকিত, তাহারা ওয়াকুই নামে পরিচিত। ইহারা জেলায় জেলায় ঘুরিয়া সহরস্থ বিচারালয় ও ব্যবসায়ীদের আড্ডাগুলি হইতে খবরাখবর সংগ্রহ করিত এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেই সকল খবরাদি পত্রে লিখিয়া উষ্ট্রের ডাকের দ্বারা রাজ সরকারে পাঠাইয়া দিত। সংবাদদাতাদিগের দ্বিতীয় দল গুয়ানি। ইহারা কৌতুকপূর্ণ খবরাখবর প্রেরণ করিত। তৃতীয় দল হরকরা; ইহারা শাসন কর্তাদিগের নিকট হইতে খবরাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইত। এই সময় এলাহাবাদ

হইতে আজমীর সীমান্ত পর্যন্ত ডাক চৌকী স্থাপিত ছিল এবং ইহাদের প্রত্যেকটিতে ঘোড়া ও হরকরা রাজসরকারের পত্রাদি বহনের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। ইহারা ৭ দিনে দিল্লী বা সাহাজানাবাদে ডাক পৌছাইত। ব্রোচের মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্য অভিমুখেও তৎকালীন একটি ডাক পথ ছিল।

এ পর্যন্ত বাহা বলা হইল, সকলই রাজ সরকারের পত্রাদি আদান প্রদানের কথা। জন সাধারণের ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। কোন পত্রাদি পাঠাইতে হইলে তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে হইত। এই সকল ব্যক্তি বা হরকরা ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্রে বাস করিত ও বাজার, কাসীদ, পাটমার ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইহারা কার্যে ব্যাপৃত ছিল বলিয়া পরিত্রাজক পিটার মতী লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আছে পাটমারেরা ১১-১৫ দিনে পাটনা হইতে আগ্রা ১৫-২০ দিনে দিল্লী হইতে সুরাট পত্র পৌছায়। ডাক্তার জেয়ার বলেন দাক্ষিণাত্যে একমাত্র কাসীদরাই ডাক বহনের কার্য করিয়া থাকে।

সত্ৰাট আকবরের আমলে পথঘাট এবং ডাকের সুবন্দোবস্ত ছিল বটে কিন্তু ইংরাজগণ যখন ভারতে আসেন সে সময় ইহার কিছুই দেখিতে পান নাই। ইলিয়ট লিখিয়াছেন—মোগল রাজত্বের সে সরাই, পথঘাট, মন্দির, গাছ সকলেব কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। তজ্জন্ত প্রথমতঃ ইংরাজেরা কাসীদ বা পাটমারদিগকে নিজেদের পত্রাদি বহনের কার্যে নিযুক্ত করেন। ইহাতে অত্যধিক খরচ বশতঃ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বোম্বাই মাদ্রাজহু তাঁহাদের কর্মচারিদিগকে ব্যবসায়ীদের সুবিধা ও কোম্পানির আর বৃদ্ধির জন্ত ডাকঘর স্থাপনের আদেশ দেন। বোম্বাইয়ে এইরূপ আদেশ দেওয়া হয়। We likewise require you to erect a post office for all letters to be brought to and delivered at setting such rates upon each single letters as may in a few years bring in a vast revenue to the company and a much great convenience to the marchent and trade in general than ever they yet had or understood,

for which purpose you must order fitting stages and passage boat to go off and return on certain days and proper stages by land to Surat and other places to convoy letters with great security and speed. মাদ্রাজেও ঐরূপ আদেশ দেওয়া হয়। ইহাতে মাদ্রাজের কর্মচারী গঙ্গম ও কটকের মধ্যে স্থানে স্থানে ডাকঘর স্থাপন করেন। বোম্বাই এবং কলিকাতার মধ্যেও ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হইল। ইহার বিবরণ একটি বিস্তৃত ব্যাপার। সুতরাং আপনাদের বৈধাচ্যতির সম্ভাবনা আছে। অতএব সে দিকে অগ্রসর না হইয়া উপসংহারে আমি এইটুকু নিবেদন করি যে ভারতবর্ষের যে যে টিকিটে প্রাচীন ডাক পদ্ধতির চিত্র পাইবেন সেগুলি যেন আপনাদের দৃষ্টি এড়াইয়া না যায়।

আপনারা দেখিতে পাইবেন—

৯০ মূল্যের টিকিটে হরকরা বা ধাবক ;

৯১০—গোশকট বা গোধান ;

৯০—টোকা বা একা ;

৯১০—উট ডাক ;

১০—মেলট্রেন ;

১০—মেল ষ্টীমার ;

১০—মেল লরী বা ভ্যান ;

১০ এবং ১০/০—এয়ার মেল

অনর্থক এ ছবিগুলি টিকিটের উপর দেওয়া হয় নাই।

একটু মনোনিবেশ করিলেই তাহা বুঝা যায় এবং এইগুলির মধ্যে যে ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে তাহা সামনে ফুটিয়া উঠে। পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের টিকিটেও আজ কাল বহু রকমের চিত্র পাওয়া যায়, উহার কোনটিই অবহেলার নহে পক্ষান্তরে শিল্প সাহিত্যে স্থান পাইবার অধিকারী।

ছেলের মত ছেলে

শ্রীহেমলতা দেবী

ছেলের মত ছেলে বলি

গুরুসদয় দত্ত

সকল কাজে অগ্রণী সে

দেশের কাজে মত্ত।

লেখায় পড়ায় ঘোড়ায় চড়ায়

উৎসাহ তাঁর অদম্য—

কাজে কথায় এক্য সাধায়

সচেততা অনম্য।

বড়ের আগে মন ছোটো তার

দাঁড়ায় মা সে ধর্ম্মমি

পল্লীহারা জীবনটিতে

জিতেন্দ্রিয় সংযমী—

স্বোপার্জিত ধনে সে তার

করল এতখানি কাজ,

সৌখীনতার সখ ছেড়ে সে

পড়ল হা-ডু খেলার মাজ,

হা-ডু-ডু-ডু হা রে-রে-রে

ছুটছে ছেলে-বুড়োর দল

খেলার গাঙ্গে বান ডেকেছে—

সবার প্রাণে জোয়ার জল।

হবে ছেলের মত ছেলে

গুরুসদয় দত্ত হও—

মায়ের কোলে দলে দলে

সোনার ছেলে জন্ম লও।

বিহারের গভর্ণর ও উদয়শঙ্কর

শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ

সত্যম্ শিবম্ আনন্দম্ এর উপাসক ভারতবাসী নৃত্য-গীতকে কেবল শিল্পের উৎকর্ষতা মনে করেন না; তাঁহারা নৃত্য-গীত পরম সাধনা মনে করিতেন। সেই নিমিত্ত হিন্দু দেবাদিদেব শিব নৃত্যগুরু ও নৃত্যপটু। তাহার নাম সেইজন্মই নটরাজ। ভারতের সেই সংস্কৃতির ধারা বিশ্বের মধ্যে পরিবেশন করিবার জন্ত, ভারতের সেই নৃত্য কৌশল জননভায় প্রদর্শন করিবার জন্ত, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানব হিতসাধনের নিমিত্ত বাদ্যলী নৃত্যশিল্প সাধক উদয়শঙ্কর হিম-



শ্রীমতী অমলা নন্দী, বি-এ

রাজ্যের ক্রোড়ে সেই মনোরম আলমোড়ার পার্কত্যা পল্লীতে নৃত্য শিক্ষা ও সাধনার আসন পাতিয়াছেন।

এই আলমোড়ার আশ্রমে গ্রীষ্ম ও শরৎ দুইটি কালে তিন মাস করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকায় সমগ্র ভারতে

নৃত্যানুরাগীদের সাধনার সুবিধা উদয়শঙ্কর করিয়া দিয়াছেন। এই স্থানে মেয়েদেরও নৃত্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। উদয়শঙ্করের প্রথম উদয়ের সময় প্যারিসে যে বালিকাটী তাঁহার নৃত্য প্রদর্শনের সাথী হইয়াছিলেন সেই শ্রীমতী অমলা নন্দী বি-এ, মহিলা বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্তা পরিদর্শিকা নিযুক্ত আছেন।

উদয়শঙ্কর তাঁহার নৃত্য সাধনা দ্বারা প্রাচ্য ও পশ্চীম দেশে যে আলোড়ন করিয়াছেন, সেই নৃত্য পদ্ধতি একদিকে ভারত নৃত্য বিজ্ঞানের লুপ্ত অধ্যায় যেমন প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, অল্প দিকে তাহার নৃত্য কৌশল দেশ বিদেশের নৃত্যকলা অনুরাগীদের চিত্তে অজস্র রসধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। এই বিশ্ব-বিমোহন নটের প্রধান সহচারিণী একজন সুকোশলা নৃত্যশিল্পী ফরাসী রমণী ম্যাডাম্ সিমকী।

উদয়শঙ্করের আলমোড়ার নৃত্য শিক্ষাশ্রমটী চিরস্থায়ী ও সর্বজন প্রিয় করিবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই পরিকল্পনার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বহু অর্থ ও সাধনার প্রয়োজন। উদয়শঙ্কর দেশ-বিদেশের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন যে পরিমাণে করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে প্রতিষ্ঠানটী গড়িয়া তুলিতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না।

সম্প্রতি বিহারের গভর্ণর আলমোড়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে উদয়শঙ্করের নৃত্য দর্শনে যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা উদয়শঙ্করের ও হিন্দু সংস্কৃতির পরম মর্যাদা বৃদ্ধি করিবে।

গভর্ণরের কাম্প

ইউনাইটেড প্রভিন্স

অক্ট : ২২ : ১৯৪১

বর্তমান বর্ষে আমার আলমোড়া ভ্রমণ কালে উদয়শঙ্করের সংস্কৃতির কেন্দ্রে তাঁহার নৃত্য-গীত উৎসব দেখিবার আমার সুখ ও সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার নৃত্য এবং তাঁহার দলের নৃত্য-শিল্পীদের অভিনয়প্রদর্শন দেখিয়া আমি পরম তৃপ্তি লাভ করি।

তঁাহারা সকলেই উচ্চমানেরেই নৃত্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন এবং তঁাহার শিষ্য ও শিষ্যাগণ তঁাহাদের স্তব্ধ প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করিবার পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। * *

• আমি আলমোরায যে দ্বিতীয় অভিনয় দর্শন করি—সেটা হিন্দুদের একটা পৌরাণিক কাহিনী রামায়ণের ঘটনার ছায়া অবলম্বনে নৃত্যাভিনয়। এইবারেই প্রথম এই নৃত্য-অভিনয়

মধ্যে সর্কোংকট ও আশ্চর্যজনক (I may say without any exaggeration that it is one of the most wonderful performances which I have ever seen) এবং আমার মনে হয় বাঁহারা এই অভিনয় দেখিয়াছেন তঁাহারাই পরম প্রীতলাভ করিয়াছেন। আমি এক বিশিষ্ট হিন্দু পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে যে অভিনয়



উদয়শঙ্কর ও সিমকী

সাধারণের সম্মুখে ওদর্শিত হয়। দুর্গাপূজার সময় উন্মুক্ত নভ-মণ্ডলের তলে প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রাকৃতিক দর্শক আসনে বসিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত দশ সহস্র (১০০০০) দর্শক এই অভিনব অভিনয় দর্শন করিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিল। একটুও অত্যাক্তি না করিয়াও আমি বলিতে পারিব, এই নৃত্য অভিনয় আমি যে সমস্ত অভিনয়াদি দেখিয়াছি তাহাদের

* এই প্রতিষ্ঠানের সকলই অভিনব। এইখানকার ছাত্র ও ছাত্রীগণকে কেবল নৃত্য কৌশল বা নানা নৃত্যের ভঙ্গিমার অনুকরণ করিতে শিক্ষা দান করা হয় তাহা নয়, নৃত্য শাস্ত্রের গুরু-রহস্য শেখান হয় এবং নানা রকমের সৌন্দর্য্যরস স্বজননের জন্য নানা প্রকার কৌশল সাধনা করান হয়। *



উদ্যাকরের ই-র-পারতা নৃত্য

হইয়াছিল তাহার আখ্যান বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

ছুঃখের বিষয় এই রূপ প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না। ভারতের উৎকৃষ্টতম কৃষ্টির সেই প্রতিষ্ঠানের কোন স্থায়ী আবাস নাই। আজকালকার আমাদের যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য নাজীদের ধ্বংস সাধনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবার জন্য প্রচেষ্টা করা কারণ বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতির ও কৃষ্টির ধ্বংস সাধন করিতে নাড়িয়া ষ্টোদাগী হইয়াছেন—তথাপি আমাদের এই সংস্কৃতির পরম উপকারী কেন্দ্রটিকে উৎসাহ দান করা সকলের উচিত। কারণ এই সংস্কৃতি মূলতঃ ধর্ম্মেরই পরিপোষক, বিশেষতঃ, ভারতের সকল কৃষ্টিই ধর্ম্মের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। চির তুঃখরময় অমল ধবল সেই হিমালয় গিরিশৃঙ্গ ও নন্দদেবী ত্রিশূল প্রভৃতি গিরিরাজদের ক্রোড় মধ্যে প্রকৃতিরাগীর অপূর্ব সৌন্দর্য্য লীলা নিকেতনে উদয়শঙ্কর এই মহান নৃত্য শিল্পালয় স্থাপন করিয়া বিচক্ষণতার কার্য্য করিয়াছেন। যদি উদয়শঙ্করের স্বপ্ন সফলতা লাভ করে, তাহা হইলে ভারতে এক সুখের ধারা প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইবে এবং ভারতের গৌরব ও সুখময় দিনের শিল্প-সংস্কৃতির পুনঃ প্রচলন করিতে পারিবে। উদয়শঙ্কর সেই প্রাচীন ধারার সহিত আধুনিক নৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিবার চঃসাহসিক প্রচেষ্টাও করিতেছেন।

এইভাবে গভর্ণর দীর্ঘ মন্তব্যে উদয়শঙ্করের প্রতিষ্ঠানটির মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। এই নৃত্য-শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গালার এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ অবদান হইবে।

অমলা নন্দীর মাতা শ্রীমতী সুশালা নন্দী গত পূজার সময় আলমোড়ায় গিয়া যে পদ্ধতি দেখিয়া আসিয়াছেন তাই তিনি নিম্নে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক কার্য্যধারা—

(১) সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই কেন্দ্রের বাহার বাহার

সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, এমন কি চাকর-বাকর পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে নমস্কার জ্ঞাপন।

(২) সকালে স্নান, ৭।০টার মধ্যে প্রাতর্ভোজন।

(৩) ৮টার General Class (এটা উদয়শঙ্কর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের লইয়া পরিচালন করেন)।

(৪) ১২টায় আহার—একই ভোজন গৃহে ছাত্র এবং ছাত্রী সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক টেবিলে ভোজন।

(৫) ভোজনান্তে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী আহারের পাত্রগুলি গোছাইয়া বাসন ধোতের স্থানে রাখিয়া আসেন।

(৬) দুই ঘণ্টা লাইব্রেরীতে সংগ্রহ এবং সংবাদপত্রাদি পাঠ।

(৭) বিকালে পৃথক পৃথক ভবনে বিশেষ বিশেষ class.

(৮) সন্ধ্যার পূর্বে খেলাধুলা।

(৯) রাত্রিতে বিশেষ বিশেষ class. (বাদ্য এবং সঙ্গীত শব্দকে)।

প্রধান নৃত্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী—

(১) উদয়শঙ্কর।

(২) গুরু শঙ্করণ নাথুদ্রী (মালাবারবাসী)।

(৩) মিস্ সিম্‌কি।

(৪) কুমারী অমলা নন্দী।

(৫) কুমারী জোহরা বেগম্।

ছাত্র সংখ্যা—

স্থায়ী ছাত্র—১৫, ছাত্রী—৮।

Season class (মে হইতে অক্টোবর)।

ছাত্র—২০, ছাত্রী—১০।

শিক্ষার ব্যয়—

স্থায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের Lodging board ing মাসিক

৩০ টাকা, শিক্ষার fee মাসিক ৩০ টাকা।

Season class (৬ মাসের জন্য) আনুমানিক ৩৫০।

আজকের মেয়েদের কর্তব্য কি ?

শ্রীক্ষণপ্রভা ভাট্টা

ঘরে বসে শুধু খাদ্য সংগ্রহ করাইত আজকের মেয়েদের কর্তব্য নয়। তার কর্তব্য দেশের আহ্বানে সর্বোত্তম ভাবে সাড়া দেওয়া। সর্বোত্তম তাকে নিজ দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে অতি সচেতন হতে হবে। মেয়েদের এই শক্তি, সংসাহস ও আত্মরক্ষার অসমর্থতার জন্য আমাদের দেশের নারী হরণ প্রায় লেগেই আছে। “নারী নাকি ফুলের ঘায় মূর্ছা ঘায়” এই অপকলঙ্ক তার জীবন হতে অপসারিত করতে হবে। আত্মরক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে চাই অথও দৈহিক শক্তি, মানসিক বল ও সংসাহস। এই শক্তি সাহস সঞ্চয় করার মূলে আছে স্বাস্থ্য। কিন্তু ছুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে বাংলার মেয়েরা ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত স্বাস্থ্য হীনা হয়ে পড়েছেন। স্বাস্থ্যের প্রতি তাদের মোটেই দৃষ্টি নেই। আসলে আমাদের এ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই নেই। কেহ বা অত্যন্ত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করে স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলেন আবার কেহ কেহ আলস্য চরিতার্থতার জন্য বড়-মানুষীর দোহাই দিয়ে সারাদিন শুয়ে বসে দেহে মেদ বৃদ্ধির সহায়তা করে থাকেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীনতাই আজ আমাদের সকল শুভ কর্মের অন্তরায় স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্যই যদি না রইল তবে নারী শক্তি সাহস সঞ্চয় কোরবে কোথেকে আর কি সাহায্যে সে দেশকে দিতে পারবে উপযুক্ত নাগরিক। আর দেশের এই আসন্ন দুর্দিনে আত্মরক্ষায় সচেতন হয়ে সে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে অতি সহজভাবে পারবে এগিয়ে যেতে।

পশ্চিমের স্বাস্থ্য দেশসমূহে হেলথ বুলেটিনের সাহায্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত বুলেটিনের মধ্যে অতি অল্প কথায় সাধারণভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বর্ণিত আছে। মাদ্রাজ প্রদেশেও সিনেমা লরীর সাহায্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা চলছে। যদিও সম্প্রতি আমাদের দেশেও রেডক্রস সোসাইটি থেকে হেলথ বুলেটিন প্রচারের

চেষ্টা চলছে, তথাপি তার প্রচার এখনও ব্যাপকতা লাভ করেনি। জন স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের শাসন কর্তারা উদাসীন। বাংলার প্রতি ঘরে প্রত্যেক মায়ের উচিত রুত্নাসন্তানদের, শুধু কন্যার কথা উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে সকলেই জানেন বাঙ্গালীরা পুত্রকে কন্যাপেক্ষা অধিক দেখে থাকেন, লেখা, পড়া, নাচ, গান, প্রভৃতি শিক্ষার বিষয় দৃষ্টি রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার নিয়মিত আহার, ব্যায়াম, ও বিশ্রামের প্রতি ও বিশেষ মনোযোগী দৃষ্টি দেওয়া। শিক্ষা সংস্কৃতি কোনও কিছুই স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে সার্থক হতে পারে না। অপটু দেহ চিন্তের সকল মাধুর্য্য নষ্ট করে ফেলে।

কিছুদিন আগে সংবাদ পত্রে দেখেছিলুম ময়মনসিংহ জেলার কোনও গ্রামে, নির্জন গৃহে দুরন্ত কর্তৃক একটা স্ত্রীলোক আক্রান্ত হয়। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখে স্ত্রীলোকটি নিকটে একটা দা দেখতে পেয়ে তারই সাহায্যে আক্রমণকারীকে বাধা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। আত্মরক্ষায় বাঙ্গালী মেয়ের এই শক্তি ও সাহস যে প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নেই। তারপর স্বন্দরবনের নিকটবর্তী ২৪ পরগণার জয়নগর নামক স্থানের পল্লীতে কচিং চিতা বাঘের উপদ্রব হয়। তখন উক্ত পল্লীর রমণীগণ এমন স্বকোশলে আত্মরক্ষা করে যে তাহা আমাদের মেয়েদের নিকট বিশেষ শিক্ষণীয় এবং শুনলেও আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। কোনও রকম সুশিক্ষায় তারা শিক্ষিতা নয়। কিন্তু দেহে আছে তাদের প্রচুর স্বাস্থ্য, মনে আছে প্রভূত বল, তারই সাহায্যে সে এমন আত্মরক্ষায় পারদর্শিনী।

আগেকার কালে ওদেশের মেয়েরা স্বামী পুত্রদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করে, নিজেরা গৃহ, সংসার ও সমাজ রক্ষা করতেন। কিন্তু আজ তাঁরা ঘর বাহির উভয় ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। দৃঢ় আত্ম প্রত্যয়ের সঙ্গে নারী রক্ষা করেছে রাষ্ট্র ও সমাজের শৃঙ্খলা। রাশিয়ার নারীসমাজ এ বিষয় প্রধান অগ্রণী। ফরাসী

জাতির গৌরবোজ্জ্বল কর্ম প্রচেষ্টা দেখতে পাই। রুষ শাস্ত্র অধ্যায়। স্পেন ও চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীজাতির আত্মনিয়োগ ও অবিচলিত কর্মনিষ্ঠা চিরকাল পরবর্তীদের পথরেখা প্রোজ্জ্বল করে ধরবে। লাপ্যাসিও নারিরা, “মাদাম চিয়াং কাইসেক, “তপস্কারা প্রভৃতি কর্মী মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

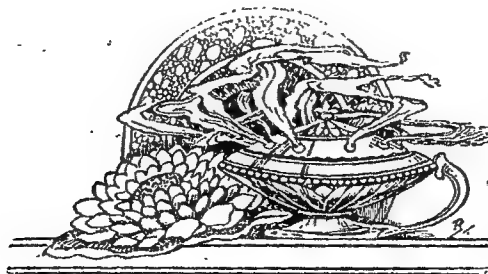
বর্তমান যুদ্ধে পাশ্চাত্যের সকল দেশের নারীরাই যুদ্ধক্ষেত্রে নারীবাহিনীরূপে দেখা দিয়েছে। তারা সৃষ্টি করেছে পুরুষ-নগর ও পল্লীর বৃক্ক নারীসমূহ। আহত, রক্ত, শিশু দম্পত্যের গুণ্ণাকারিণী পথে ঘাটে প্রহরী, যান বাহনের কাণ্ডারী তাঁদের আজ সকল ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ গৃহস্থের কুটির প্রাঙ্গণ ও সমরঙ্গণ উভয়ই সমান। এই সমরঙ্গণের ভিতর থেকে আহত মানব উদ্ধার করেছে নারীরাই। পিতৃমাতৃ পরিত্যক্ত হাজার হাজার শিশু অপরিচিতা ধাত্রীদের কাছে নানা বিদেশে প্রেরণ করা হচ্ছে। সেখানেও তাঁরাই তাদের মায়ের মত করে পালন করেছে এবং শিক্ষা দিচ্ছে। আবার বোমা বিধ্বস্ত স্থানগুলিও তারা নিজ হস্তে পরিষ্কার করেছে। এমন করে শক্তি দিয়ে স্বার্থ দিয়ে পুরুষের পাশে নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে দেশের দুর্দিনে সাহায্য করেছে দেশের নারীরাই। তাই কবি গেয়েছেন—

কোনও কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী”—

আজ আমাদের দেশের মেয়েদেরও এমন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন ও কর্মোষ্ঠা হতে হবে। এখন আর আমাদের ঘরের মধ্যে বসে বিলাস ব্যসনে দিন কাটানোর সময় নেই। এতদিন

আমাদের দেশের মেয়েরা পাশ্চাত্যের মৌখিক বিলাসিতা ও নৌখীনতাই শুধু অহঙ্করণ করে এসেছে। আজ সহ্যই আমাদের অহঙ্করণ করার দিন এসেছে। এদেশের মেয়েরা এখনও বোমার নামে আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। গুণ্ডা দেখলে ভয়ে মুচ্ছা ঘান। কিন্তু ভারতবর্ষেরও এককালে এমন দিন ছিল, যখন দেশের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা কার্যে পুরুষকে নারী সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। সমরঙ্গণে প্রবেশ করতে ও দহ্য নিধন করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। শাস্ত্রে আছে, একদা দেবী জগদ্ধাত্রী নির্জন বনমধ্যে ঋগাধারে উপবেশন করেছিলেন। এমন সময় এক দানব সেই গহণ অরণ্যপ্রান্তে পরমাস্ত্রন্দরী কুমারীকে একাকী দেখে তার উপর বল প্রয়োগ করতে প্রয়াস পায়। নিরুপায় কুমারী তখন বিনা আত্মে শুধু দৈহিক শক্তির সাহায্যে আত্মরক্ষা ও শত্রুকে পরাস্ত করেন। এই দহ্মাই হুর্দান্ত দানব চণ্ডাসুর নামে বিখ্যাত।

এই ভারতবর্ষই একদিন সমগ্র জগৎকে দেখিয়েছিল নারীর অপূর্ব আত্মরক্ষাকারী, ও বীরত্বব্যঞ্জকমূর্তি। যার জন্ম আজও সমগ্র ভারতবাসী সমস্ত্রমে ও আড়ম্বরে শক্তির পূজা করে আসছে। বাংলার নারীকে আজ আবার মনে প্রাণে সেই অমিত শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। সে শক্তি আজ বহু শতাব্দীব্যাপী অনভ্যাস ও বিনা অহুশীলনে মৃতপ্রায়, তাকে পুনোরজ্জীবিত করতে হবে নারীকেই। আজ তাকে হতে হবে স্বাস্থ্যবতী, আত্মনির্ভরশীল ও দৃঢ়চেতা। যার দ্বারা সে দেশের আসন্ন দুর্দিনে নিজের সমগ্র শক্তি দিয়ে স্বার্থ দিয়ে জাতিকে সাহায্য করতে পারবে।



রবীন্দ্রনাথের কথা

(পূর্বাহ্নবর্তী)

ত্রিযোতিষচন্দ্র ঘোষ



রবীন্দ্রনাথ দ্বাদশবার সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করিয়া স্বয়ং যেমন শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন, তেমনই বাঙ্গালীর গৌরব ও মর্যাদা সমগ্র পৃথিবীতে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রতিভার ছটা কেমন করিয়া ইয়োরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার মিশর দেশে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কেমন রাজোচিত সম্মানে তিনি বিদেশের সরকারী ও বেসরকারী মহলের মনোমুগ্ধকর পরিচিত ও সম্বন্ধিত হইয়াছিলেন তাহাই কবির বিশ্ব ভ্রমণের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বুলগেরিয়াতে রবীন্দ্রনাথ

হাঙ্গেরীয়া হইতে রবীন্দ্রনাথ বুলগেরিয়াতে গিয়াছিলেন এবং বেলগ্রেডে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। রাজধানী সোফিয়াতে, বুলগেরিয়ার রাজা বরীস্ রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে কবি রুমেনিয়াতে গিয়াছিলেন। বুখারেষ্ট নগরে রুমেনিয়ার রাজা কার্ডিনেণ্ড রবীন্দ্রনাথের সহিত সাদরে আলাপ করেন।

গ্রীসে রবীন্দ্রনাথ

২৫শে নভেম্বর কবি এথেন্সে পৌঁছাইয়াছিলেন এবং গ্রীসের রাজা তাঁহাকে “Commander of the Order of the Redeemer” উপাধি প্রদান করিয়া রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। গ্রীস হইতে তুরস্কের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ মিশরে গমন করেন।

মিশরে রবীন্দ্রনাথ

২৭শে নভেম্বর আলেকজেন্দ্রিয়াতে কবি আগমণ করেন। এবং ১লা ডিসেম্বর কাইরোতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্মানে ইজিপশিয়ান পার্লামেন্টের একটি অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়; এবং মিশরের মন্ত্রীবর্গ রবীন্দ্রনাথকে একটি সঙ্গীতের অস্থলানে অভ্যর্থনা করেন। রাজা ফুএদ (Fuad) রবীন্দ্র

নাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিশ্বভারতীর জন্য আর্থিক ভাষার কতগুলি মূল্যবান পুস্তক উপহার দেন।

১৯২৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। হাওড়া ষ্টেশনে কলিকাতার মেওর জে, এম, সেন গুপ্ত বহু বিশিষ্ট পৌরবাসীর সহিত তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তারপর ১৯শে ডিসেম্বর শাহিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। গোহাটি কংগ্রেসের প্রাকালে দিল্লিতে স্বামী শ্রদ্ধান দকে হত্যা করায় কবির চিত্ত নিদারুণ ব্যাথা ভরিয়া উঠিয়াছিল। ২২শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর বার্ষিক অধিবেশনে আচার্য্যর কার্য্য করেন।

১৯২৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতায় ‘নটরপূজা’ অভিনয় হয়, কবি স্বয়ং বোদ্ধ ভিক্ষুকের অংশ অভিনয় করিয়া ছিলেন। ১৮ই মার্চ শান্তিনিকেতনে তাঁহার নব রচিত নৃত্য নাটক “নটরাজ” প্রথম অভিনীত হয়। ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একটি পদ্য লিখিয়াছিলেন এবং নন্দলাল বসুর চিত্র সহ ‘নটরাজ’ বিচিত্রাতে প্রকাশিত হয়।

ভরতপুরের মহারাজার নিমন্ত্রণে হিন্দি-সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে জয়পুর, আগ্রা এবং আহম্মদাবাদ ভ্রমণ করেন। সেখানে গুজরাটী সাহিত্য সমিতি রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এপ্রিল মাসে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে প্রবর্তক সভ্যের প্রার্থনা দালানের ভিত্তি স্থাপন করেন। ফরাসী চন্দননগরের পৌর-সভার কর্তা মেওর একটি ‘অর্থখনী’ দিয়া কবিবরকে সম্মানিত করেন। গ্রীষ্মকালে শিলংএ গিয়াছিলেন সেখানে, বসিয়া ‘যোগা-যোগ’ বা তিন পুরুষ উপভাসটি লিখিয়াছিলেন।

পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ

১৯২৭ সালের ১২ই জুলাই রবীন্দ্রনাথ মলয় দ্বীপ, বলি,

শ্রামদেশ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের জন্ত গমন করেন। ইহা তাহার বিদেশ ভ্রমণের নবম অভিযান। এবার তার সঙ্গী ছিলেন ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীস্বরেন্দ্র নাথ কর। ২০শে জুলাই সিদ্ধাপুরে অবতীর্ণ হন। সেখানকার গভর্ণার স্যার হিউ ক্লীফোর্ডের সভাপতিত্বে একটি বিদ্যৎ জনসভায় ‘মানুষের ঐক্য’ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত অনেক প্রীতি সম্মিলনের আয়োজন হয়। ২৭শে কবি মালাকা দীপে গমন করেন। সেখানে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তারপর পেনাঙ্গ হইয়া স্মাট্রা দীপে উপস্থিত হন। ২২শে আগষ্ট ব্যাটাভিয়াতে পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁহার সঞ্চরনার জন্ত আয়োজিত এক বিরাট ভোজ সভায়, তৎপূর্ব্ব দিনের রচিত ‘বিজয়লক্ষ্মী’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

বলি দীপে

২৩শে তারিখে কবি বলি দীপে গমন করেন। জাহাজে ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধটি বঙ্গ সাহিত্যের তরুণ লেখকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন। বলি দীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া ‘সাগরিকা’ কবিতা লিখিয়াছিলেন। সমগ্র দীপটিতে রাজকীয় সম্মান ও আড়ম্বরের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ ব্যবস্থা সেখানকার রাজ সরকার করিয়াছিল। বলির নিজস্ব নৃত্য নাট্য দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ অতিশয় মুগ্ধ হন।

জাভায় রবীন্দ্রনাথ

৯ই সেপ্টেম্বর কবি বলি হইতে জাভায় (সৌরব্যায়ে) উপস্থিত হন। ১২ই তারিখে কবি স্নেহটাকর্তায় (Soetakarta) আগমন করেন, সেখানে তিনি একটি পোল ও একটি রাস্তা উদ্বোধন করেন। সেতুটি ও রাস্তাটি রবীন্দ্রনাথের নামে নামকরণ হইয়াছে। বারবুদারের বিরাট বুদ্ধ বিহার পায়ে হাঁটিয়া রবীন্দ্রনাথ দর্শন ও পরিক্রম করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রামদেশে রবীন্দ্রনাথ

জাভা হইতে বানডঙ্গ ও ব্যাটেভিয়া হইয়া শ্রাম রাজ্যে (অধুনা থাইল্যান্ড নামে খ্যাত) গমন করেন। শ্রামের রাজা ও রাণী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং প্রসিদ্ধ পালির পণ্ডিত চান্তাবুনের (Chantabun) রাজ কুমার রবীন্দ্রনাথকে

সমাদারে সঞ্চরনা করেন। এখানে তিনি এক বিদেশীয় স্বাধীন রাজার মতনই সঞ্চরিত হইয়াছিলেন। বলি, জাভা, শ্রামে ভারতীয় সংস্কৃতির, বিশেষতঃ হিন্দু ধর্মের প্রভাব দেখিয়া তিনি পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন।

২৭শে অক্টোবর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ‘ঋতুরঙ্গ’ অভিনয়ে কবি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। Fireflies এবং Letter, To A Friend মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

১৯২৭ সালে, ৫ই জানুয়ারী শান্তিনিকেতনে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মহাসম্মেলনের (Indian Science Congress) সভ্যগণকে অভ্যর্থনা করেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী গায়িকা (Madam Clara Butt) শান্তিনিকেতনে কবির সহিত আলাপ করেন। প্রাগের জার্মান ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতির অধ্যাপক ভি, লেজনী (V. Lesny) বিশ্বভারতীর অধ্যাপক-রূপে যোগদান করেন। উইলিয়ম উইল্টারনীর স্থলে তিনি অধ্যাপক হন।

বান্দলা সাহিত্যে আধুনিক নব্য তত্ত্বের লেখকদের মতি-গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত এক সভা তাঁহারই জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা হলে আহ্বান করা হয়। তিনি সেই সভায় পৌরহিত্য করেন।

১৯২৮ সালে ৭ই মে তাঁহার ৬৭তম জন্মোৎসব কলিকাতায় সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে প্রচলিত প্রথা অনুসারে রাজস্ববর্গ যেমন তুলা দান করিতেন—(নিজের সমতুল্য ওজনের সোণা ওজন করিয়া বিতরণ করিতেন) সেইরূপ রবীন্দ্রনাথকে একটি তুলাদণ্ডের একধারে বসাইয়া অন্যধারে তাঁহারই রচিত পুস্তক রাখিয়া ওজন করা হয়। এবং সেই সব পুস্তক বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রদান করা হইয়াছিল।

১৯২৮ সালের ১২ই মে, ‘কবি হিবার্ট’ বক্তৃতা দিবার জন্ত ইংলণ্ড যাত্রা করেন। কিন্তু মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যাইয়া হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় যাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। বেসেটের আমন্ত্রণে আড্ডিয়ারে এক সপ্তাহ অসুস্থ অবস্থায় অতিবাহিত করেন। মাদ্রাজ হইতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখিবার জন্ত ২০শে মে পণ্ডিচ্যাতে গমন করেন এবং শ্রীঅরবিন্দের মুখমণ্ডলে তাঁহার অন্তঃস্বামী জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশ দেখিয়া পরম প্রশংসিত হন। তথা হইতে লক্ষা দীপে গমন করেন।

কলোম্বতে রবীন্দ্রনাথ

কলোম্বতে কয়েকটি বক্তৃতা দান ও আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

তথা হইতে বাঙ্গালোরে গমন করেন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রুত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আমন্ত্রণে মহীশূরে যান এবং 'শেষের কবিতা' সেইখানে শেষ করেন।

১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে ব্রাহ্ম সমাজের শত বার্ষিক উৎসবে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বেদীর উপর বসিয়া "রাম-মোহনের বাণী" অতি প্রাণ-স্পর্শী ভাষায় উচ্চারণ করেন। বড় দিনের সময় কলিকাতার টাউনহলে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার মহাসম্মিলনে উপস্থিত না হইতে পারিয়া একটি অভিভাষণ পাঠাইয়া দেন।

১৭ ডিসেম্বর ভাইসরয় লর্ড ইরউইন (লর্ড হালিফেক্স) শান্তি নিকেতনে গমন করেন। কবি তাঁহাকে আদর অথচ আশ্র-মর্যাদা পূর্ণ অভ্যর্থনা যে ভাবে করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিলাম। এই সময় কবি 'মহুয়া' রচনা করেন।

১৯২৯ সালের ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতায় যে সর্ব ধর্ম মহাসভা (Parliament of Religion) হয় তাহাতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

দশমবার বিদেশ ভ্রমণ

১৯২৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যান্ডেডার 'তাসনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের' আমন্ত্রণে কলিকাতা হইতে ক্যানাডাভিমুখে যাত্রা করেন। এবার তাঁর সঙ্গী ছিলেন শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

জাপানে চতুর্থ বার

২০শে মার্চ টোকিও নগরে অবতীর্ণ হন এবং দুই দিন বিখ্যাত "আশী সিঙ্গু" জাপানী পত্রিকার অতিথি হইয়াছিলেন। সেখান হইতে ক্যান্ডেডায় গমন করেন।

ক্যান্ডেডায় রবীন্দ্রনাথ

৬ই এপ্রিল ভ্যাঙ্কোভারে উপস্থিত হন, সেখানকার সম্মিলনে "The Philosophy of Leisure" ও The Principles of literature" নামে দুইটি বক্তৃতা পর পর দুই দিনে

দিয়াছিলেন। সে দেশের নরনারীরা তাহা শ্রবণে কবির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত হন।

১২ই এপ্রিল ভ্যাঙ্কোভারে শিখদের গুরুদ্বার পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ১৪ই এপ্রিল তিনি ক্যান্ডেডায় তাঁর শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া ও ডেটরয়েট বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া তিনি ১৮ই এপ্রিল (Los Angeles) 'লয়স এঞ্জেল' গমন করেন। সেখানে ছাড়পত্র হারাইয়া যাওয়াতে তিনি এমিগ্রেশন অফিসার দ্বার উদ্ব্যস্ত হন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ স্বরূপ এমেরিকা ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া দেন এবং ২০শে এপ্রিল জাপান অভিমুখে যাত্রা করেন।

সুসুত্রের উপর জাহাজে কাপ্তেন ও যাত্রীদের উৎসাহে তাহার ৬৮ বার্ষিক জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হয়। ১০ই মে ইয়াকোহামার বন্দরে অবতীর্ণ হন।

জাপানে পঞ্চম বার

টোকিও সহরে "Oriental Culture and Japan's mission" বক্তৃতা প্রদান করেন। কাউন্ট অকুমা তাঁহাকে এক প্রীতি-সম্মেলনে আপ্যায়ণ করেন। প্রায় এক মাস জাপানে থাকিয়া ৮ই জুন জাপান ত্যাগ করিলেন। ভারতের পথে ইণ্ডো চায়নার ফরাসী গভর্নমেন্ট কবিকে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ছিলেন। ৩রা জুলাই মাদ্রাজে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় পুনরাগমন করেন।

১৯২৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের 'রবীন্দ্র পরিচয় সভায়'—সাহিত্যের স্বরূপ এবং 'সাহিত্যের বিচার' নামে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ২৬, ২৮, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর—জোড়াসাঁকোর ভবনে 'তপতী' অভিনয় হয়। বৃদ্ধ কবি যুবা রাজা বিক্রমের পাঠ সতেজে অভিনয় করিয়া দর্শকগণকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে চিত্রাঙ্কণে কবি মনোনিবেশ করেন।

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী বরোদার গাইকবাড়ের আমন্ত্রণে কবি বরোদায় গমন করেন এবং (Man the Artist)—'মানুষই শিল্পী' বিষয় বক্তৃতা দেন। ২রা ফেব্রুয়ারী ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন অধিবেশন হয়। ৫ই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করিতে সম্মত

হইয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। আমি স্বয়ং কবিরের নকট হইতে মৌখিক ও লিখিত আশ্বাস পাই। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ছিল—অধিবেশনের একদিন অগ্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট তিনি ‘পঞ্চাশোদ্ধ বনং গচ্ছেৎ’ শীর্ষক একটি অভিভাষণ লিখিয়া পাঠাইয়াদেন মাত্র। তিনি উপস্থিত হইলেন না ও না আসিবার খবর আমাদের জানাইলেন না। তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতি ও প্রতিনিধিগণ উদ্বিগ্ন ও নিরাশায় মগ্নাহত হন। সেই অধিবেশনে তাঁহারই ভগ্নি স্বর্ণকুমারী সভানেত্রী হন। অভ্যর্থনা সভার সভাপতি বিপীন চন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার তেজোদীপ্ত বাগ্মিত্য—সমবেত সাহিত্যিকদের বিক্ষুব্ধ চিত্তের ব্যাথা প্রকাশ করেন। এই ব্যাপারে কবিও অল্পতপ্ত ও হুঃখিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁর পত্রদ্বয় বঙ্গলক্ষ্মীর আশ্বিন সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

১০ই গভর্নর শ্রুর স্টালনী জ্যাকসন স্ক্রল সমবায় কর্মীদের সম্মিলন উদ্বোধন করেন এবং বাঙ্গলা সরকার বার্ষিক ১০০০, এককালীন ৫০০০, দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এই বিরাট অনুষ্ঠানে ইহাই প্রথম সরকারী দান।

একাদশবার বিদেশ ভ্রমণ

১৯৩৩ সালের ২রা মার্চ কলিকাতা হইতে ইয়োরোপে যাত্রা করেন। পুত্র, পুত্রবধূ ও ডব্লিউ এরিয়াম সঙ্গে গিয়া ছিলেন। ২০শে ব্রাসিলেসে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হন। এবারও এম খাঁর অতিথী রূপে মন্টি কারলোর নিকট ক্যাপ মার্টিনে থাকেন, এই স্থানে চেকোশ্লাভেকিয়ার সভাপতি ম্যাসারীকের সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়।

২রা মে কবির নিজের জাকা ১২৫ খানির চিত্রের একটি প্রদর্শনী প্যারিস নগরে তাঁহার আরজেনটাইন মহিলা বন্ধু ওকাম্পোর উদ্যোগে খোলা হয়। কবির ৬৯ বৎসর জন্মোৎসব সমারোহে প্যারিসে হইয়াছিল। ১৭ মে লণ্ডনে গমন করেন। তথা হইতে বার্মিংহাম গিয়াছিলেন। ১৭ই ও ১৯শে মে অক্সফোর্ড ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে হিবার্ট লেকচারের প্রথম অংশ ‘মানুষের ধর্ম’ প্রদান করেন।

অক্সফোর্ড হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া ভারত সচিব ওয়েজউড বেন; সাহেবের সহিত ভারতের কংগ্রেস কর্মীদের

নিপীড়ন, মহাত্মা গান্ধির সভ্যাগ্রহ, গান্ধীর মুন তৈয়ারী অভিযান, চট্টগ্রামে অস্ত্রলুণ্ঠনের জন্ত সামরিক আইন প্রচলন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।

লণ্ডনে কোয়েকারদিগের বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতা দেন। Quakerদের ২৫২ বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিবৎসর যে বার্ষিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাঁহাতে এই সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোন মনীষীকে এযাবৎ বক্তৃতা দিতে পূর্বে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। তাঁর বক্তৃতায় ভারতে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে যে সব মন্তব্য করিয়া ছিলেন তাঁহার জন্ত সভায় শ্রোতাদের দ্বারা কবি প্রশংসায় জর্জরিত হন। তিনি উত্তর দানে তাহাদের কৌতুহল ও উষ্ণা নিবৃত্তি করেন।

২৬শে মাঘ অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশ এক বিরাট বহুজন পূর্ণ সভায় পাঠ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া ছিলেন। সেই সভার সভাপতি শ্রুর মাইকেল শুডলার বলেন “We shall never forget in Oxford the gift you have given us and the inspiration you have brought to us.”

বার্মিংহামে ফিরিয়া তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে সারবান বক্তৃতা দেন। ২রা জুন তাঁহার চিত্রের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া এবং মহাত্মজীর New Technique of revolution এর স্তুতিবাদ করিয়া বিলাতের স্পেক্টেটর কাগজে দীর্ঘ পত্র মুদ্রিত করেন। এলেমহাষ্ট সাহেবের ভিতনসায়ারের টটনসো পল্লীতে শিক্ষাকেন্দ্র ডার্টিংটন হল দেখিতে গমন করিয়াছিলেন।

জার্মানীতে চতুর্থবার

১৯৩০ সালে ১১ই জুলাই রবীন্দ্রনাথ বার্লিনে গমন করেন। ১২ তারিখে জার্মান শাসন-পরিষদের (Reichstag) সভ্যদের সহিত মিলিত হন। ১৪ই আইনষ্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বার্লিন সহরে মোলার গ্যালারীতে (Moller Gallery) কবির চিত্রের একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন হয়। তাঁর পর ১৬ই তিনি ড্রেসডেন সহরে গমন করেন। তিনি যখন মিউনিক সহরে গমন করেন, তথাকার অতি প্রাচীন

টাইউন হলে বিশ্বকবি পৌরবাসীগণ অভিনন্দিত করেন। Oberammergauতে ‘প্যাসন প্লেস’ অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হন। রাজোচিত সম্মান সহিত জার্মানীর আরো কয়েকটি নগর ভ্রমণ করিয়া ডেনমার্ক গমন করেন।

৯ই আগষ্ট কোপেনহাগেন নগরে কবির চিত্রের প্রদর্শনী খোলা হয়। তথা হইতে জেনেভায় যাইয়া কয়েকদিন বিশ্রাম করেন। সেই সময় ঢাকায় যে হিন্দু-মুসলমানের তুমুল দাঙ্গা হয় তাহার সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার নিক্কাক থাকায় রবীন্দ্রনাথ স্পেকটেক্টর কাগজে ৩০শে আগষ্ট নিম্না করিয়া একখানি পত্র মুদ্রিত করেন।

রাসিয়াতে রবীন্দ্রনাথ

জেনেভা হইতে তাঁহার প্র-নাতি সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া রাসিয়া যাত্রা করেন। সঙ্গে আরো ছিলেন কবির সাহিত্য সম্পাদক অমিয় চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য রক্ষী ডাঃ হরী টিয়ার ও প্রাইভেট সেক্রেটারী এরিয়াম। বার্লিনে, সোভিয়েট গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি স্বরূপ লুনচাঙ্স্কি (Lunacharsky) কবিবরকে রাসিয়াতে যাইবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া যান। ১৯৩০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মস্কো সহরে পৌঁছান। হোয়াইট রাসিয়া বন্টক রেল ষ্টেশনে বিদেশীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধ রক্ষাকারী সমিতির (Voks) প্রতিনিধিগণ কবিকে অভ্যর্থনা করেন। ‘ভক্তস’ এর বিল্ডিংএ এই সমিতি সভাপতির অধ্যাপক এফ. এন. পেট্রোফ এর সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় ভারতের কবিকে সম্বর্দনা করা হয়।

সেই দিবস সন্ধ্যায় ‘ভক্তস’ ও মস্কোর লেখক সম্ভের মিলিত উদ্যোগে গান বাজনার একটি মজলিস কবির সম্মানে বসিয়াছিল। সেই মজলিসে Prof Kogan (President of the Academy of Arts), Prof. Pinkevitch (Director of the second Moscow state University.) Mme. Litvinov, Mme. Ognayed, Mme. Vera Inber, Fedor Gladkov, Essev প্রভৃতি বহু লেখক ও রূপদক্ষদের সহিত কবির পরিচয় হয়।

১৪ই অনাখাদের হাতে কলমে উপার্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান Pioneer's Commune পরিদর্শন করেন। ১৬ তারিখে চাষীদের আড্ডা The Peasant's home দেখিতে যান।

১৭ই মস্কোতে State Museum of New wes-

tern Art গৃহে কবির চিত্রের এক প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহা দেখিয়া সোভিয়েট শিল্পীগণ সম্বরে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে চিত্র অভিধানের ইতিহাসে এক মহৎ নবধারা প্রবর্তিত হইল। মস্কো আর্ট থিয়েটারের ‘পিটার দি গ্রেট’ এবং ফার্স্ট স্টেট অপেরা হাউসে টলষ্টয়ের ‘রিসারেকসন’ ও ‘বিয়াদার্ক’ অভিনয়-গুলি দর্শনে কবি আনন্দিত হইয়াছিলেন। এক বিরাট ছাত্র সভায় বিশ্বভারতীর বিভাগ্যের স্বরূপ বর্ণনা করেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দর্শন করিয়াছিলেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ট্রেড উনিয়নের সেন্ট্রাল হাউসে কবির বিপুল সম্বর্দনার আয়োজন হয়। তাহাতে সোভিয়েট কবি শিংগালী (Shingalee) রবীন্দ্র সম্বর্দনার জন্তই লিখিত Ode to Rabindranath আবৃত্তি করেন। গ্রন্থকর্তা Galperin (গালপেরিন) রবীন্দ্রনাথের রাসিয়ান ভাষায় অল্পদিত তিনটি কবিতা পাঠ করেন। এবং বিখ্যাত অভিনেতা সিমোনভ (Simonov) রবীন্দ্রনাথের ডাক ঘরের কয়েকটি অংশ অভিনয় করেন। এই সভায় রবীন্দ্রনাথও একটি বক্তৃতায় সোভিয়েট বিদ্যাত্মগুনীকে মুগ্ধ করেন। ২৫শে পুনরায় জার্মানিতে গমন করেন।

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ পঞ্চমবার

১৯৩০ সালের ৩রা অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ জার্মানী হইয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। আমেরিকা হইতে কবি ইংলণ্ডের স্পেকটেক্টর কাগজে ১৯শে নভেম্বর গান্ধিজীর রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দিবার জন্ত অনুরোধ ও যুক্তি প্রদান করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

২৫শে নভেম্বর নিউইয়র্ক সহরের চারিশত ক্রুতি পৌরবাসী তাঁহার সম্মানে বিন্টমোর হোটেলে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। কবি সেই ভোজ সভায় বক্তৃতা দেন।

তারপরই আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের শাসন পরিষদের সভাপতি হুভার কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। নিউইয়র্কের কার্নিগী হলে ১লা ও ৭ই ডিসেম্বর বাহাইদের উদ্যোগে সভা দুইটিতে রবীন্দ্রনাথ Uhe First and last Prophet of Persia (পার্সিয়ার প্রথম ও শেষ অবতার) শীর্ষক বক্তৃতা করেন।

বিখ্যাত নট রথ সেন্ট ডেনিস্ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি ও নৃত্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার কবির

সম্মতি পান। কিন্তু নাট যখন বিজয়লক্ষ অর্থ রবীন্দ্রনাথকে প্রদান করেন, তিনি তখন নিউইয়র্কের বেকারদের সাহায্যে সেই অর্থ দান করেন। 'নিউ ইয়র্ক' ও বোষ্টন নগরে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের দুইটা প্রদর্শনী হয় এবং সে-দেশের শিল্পীরা এই নবধারার অঙ্কিত চিত্রগুলির অশেষ প্রশংসা করেন। The Case for India গ্রন্থের লেখক উইল ডুহেণ্টের সহিত পরিচয় হয়।

২২শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার মীমাংসার মধ্যস্থতা করিবার জন্য তাঁহাকে যে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়—রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৩১ সালের ৮ই জানুয়ারী স্পেকটেক্টর কাগজের সম্পাদক হাইড পার্ক হোটেলে ভোজ দিয়া কবিকে সম্বর্দনা করেন। সেই ভোজে বার্ণাড স র সহিত কবির সুদীর্ঘ আলোচনা হয়।

ফলদীপিকা

শ্রীগণপতি সরকার
দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্র, স্বর্ণ, পিতার শুভফল, আত্মস্থ, প্রতাপ, ধৈর্য, শৌর্য, যুদ্ধে জয়, রাজসেবা, যশ, শুভকার্য, বন এবং পর্বত ভ্রমণ, হোমকার্যে প্রবৃত্তি, দেবস্থান, তীক্ষ্ণতা এবং উৎসাহ, এইগুলি পণ্ডিতগণ রবি হইতে চিন্তা করিবেন। ১।

মাতার শুভ, মনের প্রশান্ততা, সমুজ্জ্বলান, শ্বেতচামর, ছত্র, সুন্দর ব্যঞ্জন, ফল, কোমলতা, পুষ্প, শস্য, কৃষি, কীর্তি, মুক্তা, কাংস্য, রৌপ্য মধুর, ক্ষীরাদি দ্রব্য, বস্ত্র, জল, গো এবং স্ত্রী-প্রাপ্তি, সুখভোজন, দেহস্থ এবং রূপ এইগুলি চন্দ্র হইতে চিন্তা করিবে। ২।

সম্রাট, ভূজাত দ্রব্য, ভ্রাতার গুণ, ক্রুরতা, রণ, সাহস, বিদ্রোহ, রক্তনশালা, অগ্নি, স্বর্ণ, জ্ঞাতি, অস্ত্র, চোর, শত্রু, উৎসাহ, পরকামিনীরতি, মিথ্যা-কথন, বীর্য, চিন্তের সমুন্নতি, কলুষ, সেনাধিপত্য এবং ক্ষত এইগুলি মঙ্গল হইতে বিচার্য। ৩।

পাণ্ডিত্য, মিষ্টবাক্য, কলানিপুণতা, পণ্ডিতের নিকট প্রশংসা-প্রাপ্তি, মাতুল, বাকচাতুর্য, উপাসনাদিতে পটুতা, বিদ্যা বিষয়ে যুক্তি পরিচালন, বুদ্ধি, যজ্ঞ, বৈষ্ণব কর্ম, সত্যবচন, শুক্তি, বিহারস্থল, শিল্প, বান্ধব, যৌবরাজ্য, বন্ধু এবং ভাগিনেয় এই গুলি বৃহ হইতে বিচার্য। ৪।

জ্ঞান, সদগুণ, পুত্র, সচিব, সদাচার, আচার্য, মাহাত্মা, শ্রুতি, শাস্ত্র, বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, সর্বপ্রকার উন্নতি, সদগতি, দেব ও দ্বিজ ভক্তি, যজ্ঞ, তপস্যা, শ্রদ্ধা, কোষাগার, পাণ্ডিত্য,

জিতেন্দ্রিয়তা, ধবস্থ, (স্বামিস্থ বা বস্ত্রস্থ), সম্মান এবং দয়া এইগুলি বৃহস্পতি হইতে বিচার্য। ৫।

সম্পত্তি, বাহন, বস্ত্র, ভূষণ, নিধি, দ্রব্য, তৌধ্যজিক (একত্রে নৃত্য-গীত-বাদ্য) ভাষণ, স্তম্ভ, পুষ্প, মদন ব্যাপার, শয্যা, গৃহ, সৌভাগ্য, কবিতাস্থ, বহুবধুসঙ্গ, বিলাস, মদ (অহঙ্কার), মন্ত্রিস্ত, সরসবাক্য, বিবাহকর্ম এবং উৎসব এই গুলি শুক্র হইতে বিচার্য। ৬।

আয়ু, মরণ, ভয়, পাতিত্যা, দুঃখ, অপমান, ব্যাধি, দারিদ্র্য, ভৃতক (মজুর), অপবাদ, পাপ, অশুচিতা, নিন্দা, অপদ, স্থিরতা, নীচজনের আশ্রয়, মহিষ, তন্দ্রা, ঋণ, লোহ, দাসত্ব, কৃষিসাধন (যজ্ঞাদি), কারাগৃহ এবং বন্ধন এইগুলি শনি হইতে বিচার্য বিষয়। ৭।

পিতৃপ্রকৃতি, অস্থিসার (শক্ত অস্থি), অল্পচুল, রক্ত-শ্রাম-বর্ণ, মধুপিঙ্গল নেত্র, কুসুমফুলের রঙ্গের কাপড়, চতুরঙ্গ (অর্থাৎ চৌরস লম্বা-চওড়া) দেহ, শূর, প্রচণ্ড, স্থলবাহ, ইহাই রবির স্বরূপ। ৮।

যৌবনে স্থূল বৃদ্ধকালে কৃশ, শুভবর্ণ সুন্দর চক্ষু, কৃষ্ণ এবং সুরুচুল, রক্তমাংস (অর্থাৎ রক্তই শক্তি), মৃদু বাক্য, শুভবস্ত্র, গৌরবর্ণ, বাত কফ প্রকৃতি, মৃদু ইহাই চন্দ্রের স্বরূপ। ৯।

কৃশ-কাটি, কুঞ্চিত এবং উজ্জল কেশ, ক্রুর চক্ষু, পিতৃপ্রকৃতি,

উগ্র বুদ্ধি, রক্ত বস্ত্র, রক্তবর্ণ শরীর, প্রচণ্ড, অতি উদার, তরুণ এবং মজাতে শক্তি বিশিষ্ট, ইহাই মঙ্গলের স্বরূপ । ১০ ॥

দুর্বাদলশ্রাম বর্ণ, বাতপিত্ত কফ এই ত্রিধাতু মিশ্র প্রকৃতি, শিরাবান্, মধুর বাকা, রক্ত আয়ত চক্ষু, হরিত বস্ত্র, স্বক্ ইন্দ্রিয় প্রধান, হান্তরুচি এবং সমান অঙ্গ, ইহাই বুধের স্বরূপ ॥ ১১ ॥

পীতবর্ণ, পিঙ্গল বর্ণ কেশ ও চক্ষু, পীন এবং উন্নত বক্ষ, বৃহৎ শরীর, কফ ধাতু প্রধান, শ্রেষ্ঠমতি, সিংহ ও শস্যের আয় স্বরবিশিষ্ট, বস্ত্রপ্রধান (অর্থাৎ অর্থের প্রভুত্ব অথবা পাঠান্তরে 'বসাপ্রধান'—বস। অর্থাৎ চৰ্ম তাহার প্রভুত্ব), ইহাই বৃহস্পতির স্বরূপ । ১২ ॥

বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র, কৃষ্ণিত এবং কৃষ্ণ কেশ, স্থূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহ, বায়ু কফ প্রকৃতি, দুর্বাদলবর্ণের আয় বর্ণ, সূক্ষ্মর এবং বিশাল নেত্র, এবং শুক্র প্রধান, ইহাই শুক্রের স্বরূপ ॥ ১৩ ॥

পঙ্খ, চক্ষু কোটিরগত, কৃশতন্ত্র, লম্বা, শিরায়ুক্ত, অনঙ্গ, কৃষ্ণ-বর্ণ, বাত-প্রকৃতি, অতি খল, আয়ুশক্তি প্রধান, নির্দয়, মূর্থ, স্থূল নখ ও স্থূল দন্ত, কঠিন রোম ও কঠিন অঙ্গ, অশুচি, তমো-গুণী, রোদ্ৰ, ক্রোধী, জরাযুক্ত, কৃষ্ণ-বস্ত্র, ইহাই শনির স্বরূপ ॥ ১৪ ॥

শিবক্ষেত্র, অবাধবায়ুবিশিষ্ট বহিঃপ্রদেশ এবং পূর্বদিক এই-গুলির প্রতি রবির আধিপত্য ।—

জুর্গাদেবী ক্ষেত্র, বধুস্থান (অন্তঃপুর), জলস্থান, ওষধিস্থান, মধুস্থান ও বায়ুকোণ এইগুলির প্রতি চন্দ্রের আধিপত্য ।—

চোর-শ্রেষ্ঠ-অগ্নি ও যুদ্ধভূমি এবং দক্ষিণদিক এইগুলির প্রতি মঙ্গলের আধিপত্য ॥ ১৫ ॥

বিদ্বান্-বিষ্ণু-মভা-বিহার (ক্রীড়াভূমি) ও গণকস্থান এই-গুলির প্রতি বুধের আধিপত্য ।

কোশস্থান, অশ্বখবৃক্ষ, দেবতা-দ্বিধাতি স্থান এবং জ্ঞান কোণ এইগুলির প্রতি বৃহস্পতির আধিপত্য ।

বেশ্যাপাড়া, অন্তঃপুর, নৃত্যশালা, শয়নগৃহ এবং অগ্নিকোণ এইগুলির প্রতি শুক্রের আধিপত্য ।—

নীচশ্রেণীর আবাসস্থান, অশুচিস্থান শাস্তা (অর্থাৎ বুদ্ধ বা ধর্ম ঠাকুরের স্থান) এবং পশ্চিমদিক এইগুলির প্রতি শনৈশ্বরের আধিপত্য ।—

বন্যক (উইচিপি), সর্পস্থান, অন্ধকার, গর্ভ এবং নৈশ্বর্ত কোণ এইগুলির প্রতি রাহু এবং কেতুর আধিপত্য ॥ ১৬ ॥

শৈব, চিকিৎসক, নৃপতি, যজ্ঞকারী, প্রধান (মোড়ল), ব্যাঘ্র, মৃগ (অর্থাৎ পশু) এবং চক্রবাক, এইগুলি রবির অধীন ।—

শাস্তা (ধর্মঠাকুর অথবা শাসনকর্তা), জ্বীলোক, রজক, চাষী, জলজপ্রাণী, শশক, হরিণ, বক ও চকোর এইগুলি রবি প্রতি চন্দ্রের অধিকার । ১৭ ।

মহানসগত (অর্থাৎ রাধুনী), অশ্বধারী, স্বর্ণকার, ছাগল, কুক্কট, শৃগাল, বানর, গৃহ এবং চোর এইগুলির প্রতি মঙ্গলের অধিকার ।

গোয়াল, পণ্ডিত, শিল্পী, উত্তমগণক, বিষ্ণুভক্ত, গরুড়, কিকৌদিবি (অর্থাৎ চাঁদ বা নীলকণ্ঠ পক্ষী), টিয়াপাখী এবং বিড়াল এইগুলির প্রতি বুধের অধিকার ॥ ১৮ ॥

দৈবজ্ঞ, মন্ত্রী, গুরু বিপ্র যতিশ্রেষ্ঠ, প্রধান ব্যক্তি, পারাবত, অশ্ব এবং হংস এইগুলি বৃহস্পতির অধীন ।

গায়ক, ধনবান, বেশ্যার দালাল, বণিক, নট, তাঁতি, বেণ্ডা, ময়ূর, মহিষ, শুকপক্ষী এবং গো এই সকলের প্রতি শুক্রের অধিকার ॥ ১৯ ॥

তৈল ব্যবসায়ী, ভূতা, নীচব্যক্তি, ফিরাত, কামার, হস্তী, কাক এবং কোকিল, এইগুলি শনির অধিকারে ।

বৌদ্ধ, সাপুড়ে, গাধা, ভেড়া, কুকলাস (পাঠান্তরে বৃক নেকড়ে বাঘ) সর্প, অন্ধকার প্রভৃতি, মশা, মৎস্কন, কুমি এবং পেঁচা, এইগুলি রাহুকেতুর অধীন ॥ ২০ ॥

রবির সম, বুধ, শক্র শনি এবং শুক্র, (অবশিষ্ট চন্দ্র মঙ্গল, ও বৃহস্পতি মিত্র) । চন্দ্রের মিত্র রবি এবং বুধ, সম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি । মঙ্গলের সম শনি এবং শুক্র, শক্র বুধ, (অপর গ্রহগুলি মিত্র) । বুধের শক্র চন্দ্র, মিত্র রবি এবং শুক্র, (অপরগুলি সম) ॥ ২১ ॥

বৃহস্পতির শক্র শুক্র ও বুধ, সম শনি, (অবশিষ্ট মিত্র) । শুক্রের সম বৃহস্পতি ও মঙ্গল, মিত্র শনি এবং বুধ (অবশিষ্ট শক্র শনির সম বৃহস্পতি, মিত্র শুক্র ও বুধ এবং অবশিষ্ট গ্রহগুলি শক্র ॥ ২২ ॥ (১))

গ্রহেরা পরস্পর তৃতীয়, চতুর্থ, দ্বিতীয়, দশম, দ্বাদশ এবং একাদশগৃহ গত হইলে তাৎকালিক মিত্র হয় । নৈসর্গিক মিত্র, সম ও শত্রুতা দেখিয়া তাৎকালিক অতিমিত্র, সম ও অতিশত্রু

স্থির করিতে হইবে। (নৈসর্গিক মিত্র ও তাৎকালিক শত্রু এবং তাৎকালিক মিত্র ও নৈসর্গিক শত্রু উভয়ক্ষেত্রেই তাৎকালিক সম। নৈসর্গিক ও তাৎকালিক মিত্র হইলে “অতি মিত্র”। নৈসর্গিক ও তাৎকালিক শত্রু হইলে “অতি শত্রু”—ইহা বুঝিতে হইবে।)

তৃতীয় ও দশমে শনির পূর্ণ দৃষ্টি। পঞ্চম ও নবমে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি। চতুর্থ ও অষ্টমে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি এবং প্রত্যেক গ্রহেরই সপ্তমে পূর্ণ দৃষ্টি। আর সকল গ্রহেরই তৃতীয় ও দশমে একপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবমে অর্দ্ধ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টমে ত্রিপাদ দৃষ্টি ॥ ২৩ ॥ *

রবি অগ্নির (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ) চন্দ্রকণের (মুহূর্তের), মঙ্গল দিনের, বুধ স্নাতুর (ছইমাস), বৃহস্পতি মাসের, শুক্র পক্ষের এবং শনি বৎসরের অধিপতি।

শুক্র এবং শুক্র ব্রাহ্মণের, রবি ও মঙ্গল ক্ষত্রিয়ের, চন্দ্র বৈশ্যের, বুধ শূদ্রের ও শনি অন্ত্যজাতির (চণ্ডালাদি জাতির) অধিপতি

চন্দ্র, বৃহস্পতি ও রবি সত্ত্বগুণের অধিপতি, শুক্র ও বুধ রজোগুণের অধিপতি, আর মঙ্গল ও শনি তমোগুণের অধিপতি।

রবি ও মঙ্গল গ্রীষ্মের, চন্দ্র বর্ষার, বুধ শরতের, বৃহস্পতি হেমন্তের, শনি শীতের এবং শুক্র বসন্তের অধিপতি। ২৪।

দিবাজাতের রবি পিতা এবং শুক্র মাতার কারক। নিশি জাতকের শনি পিতা ও চন্দ্র মাতৃকারক। দিবাজাতের শনি এবং চন্দ্র পিতৃব্য ও মাসীর কারক এবং নিশিজাতের রবি ও শুক্র পিতৃব্য ও মাসীর কারক।

বাম চক্ষুর চন্দ্র ও দক্ষিণ চক্ষুর রবি অধিপতি। মঙ্গল কনিষ্ঠ ভ্রাতার, বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠ সহোদরের এবং বুধ দত্তকপুত্রের অধিপতি। ২৫।

চন্দ্র দেহের, সূর্য আত্মার, মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ পঞ্চেন্দ্রিয়ার অধিকারী। সূর্যের শত্রু গুলিক রাহু ও কেতু আত্মার পীড়া-

দায়ক হয়। বুধের গন্ধ (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়—শ্রবণতত্ত্ব), শুক্র ও চন্দ্রের রস (অর্থাৎ রসেন্দ্রিয়—জ্ঞানতত্ত্ব), সূর্য ও মঙ্গলের রূপ (অর্থাৎ চক্ষুর্বিদ্রিয়—ভেদতত্ত্ব), বৃহস্পতির শব্দ, (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়—আকাশতত্ত্ব), পরে অর্থাৎ শনি, রাহু ও কেতুর স্পর্শ (অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়—বায়ুতত্ত্ব)। ২৬ ॥

ক্ষীণ চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল, রাহু, কেতু ও শনি ইহারা পাপ গ্রহ; পাপযুক্ত বুধ ও পাপগ্রহ। কেতু, বুধ ও শনি ক্লীবসংজ্ঞক; চন্দ্র, রাহু ও শুক্রের স্ত্রী সংজ্ঞা; অবশিষ্ট গ্রহগণের পুরুষসংজ্ঞা। রুদ্র, দুর্গা, কার্তিক, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কমলা, যম, সর্প ও ব্রহ্মা ইহারা রব্যাদি নবগ্রহের পর পর দেবতা।

অগ্নি, জল, অগ্নি, ভূমি, আকাশ, জল ও বায়ু পরপর রব্যাদি সপ্তগ্রহের অধিকারে বুঝিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

রবির গোখুম, চন্দ্রের তণ্ডুল, শনির তিল, বৃহস্পতির ছোলা, কেতুর কুলখকলাই, মঙ্গলের আটক (অর্থাৎ মটর বা অরহর) বুধের কালোমুগ, শুক্রের নিম্পাব (চিটা তুষ বা ভূসি) এবং রাহুর মাষকড়াই।

রাহুর অশ্বর দেশ, সূর্যের কলিঙ্গ, শনির সৌরাষ্ট্র, মঙ্গলের অবন্তি, বৃহস্পতির সিন্ধু, বুধের মগধ, চন্দ্রের যবন, কেতুর পর্বত ও শুক্রের কীকট দেশ ॥ ২৮ ॥

রবির মানিক্য (অর্থাৎ চুনি), চন্দ্রের পরিষ্কার মুক্তা, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের মরকত (অর্থাৎ গরুড়াত জাতীয় পান্না) বৃহস্পতির পুষ্পরাগ (পোখরাজ), শুক্রের হীরক, শনির নির্মল নীলা, রাহুর গোসেদ, এবং কেতুর বৈদূর্য (Cat's eye লক্ষ্মীয়া) ॥ ২৯ ॥

তামা, কাঁসা, তাম্রের উৎপাদক ধাতু, সীসা, সোনা, রূপা, এবং ইম্পাত এইগুলি রব্যাদি সপ্তগ্রহের ধাতু।

ঐ তাম্রাদি ধাতুর বর্ণের বস্ত্রই রব্যাদি সপ্তগ্রহের বস্ত্র, তন্মধ্যে বিশেষ হইতেছে যে, শনির জীর্ণ বস্ত্র এবং মঙ্গলের পোড়া কাপড় ॥ ৩০ ॥

রবির কটুরস, মঙ্গলের তিক্তরস, চন্দ্রের লবণ রস, বুধের মিশ্ররস, শুক্রের মিষ্ট রস, শুক্রের অন্নরস, এবং শনির কষায় রস ॥ ৩১ ॥

রবি, বৃহস্পতি, বুধ এবং মঙ্গলের জন্ত দক্ষিণাঙ্গে লাঞ্জন (জরুড় বা চিহ্ন) হয়, অশ্ব গ্রহদিগের জন্ত বামাঙ্গে লাঞ্জন হয়।

* রাহুর দৃষ্টির কথা এখানে গ্রহকার বলেন নাই। গ্রহান্তরে রাহুর দৃষ্টি :—৭মে, ১২শে, ৫মে ও ৯মে রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি; ২য় ও ১০মে ত্রিপাদ দৃষ্টি; ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ এবং ৮মে অর্দ্ধ দৃষ্টি।

কটি, মস্তক, পৃষ্ঠ, কক্ষ, স্বক, মুখ, উরু হইতে পা পর্যন্ত এই সবস্থলে রব্যাদি সপ্তগ্রহ জ্ঞাত চিহ্ন হয়।

রবির ৫০ বর্ষ, চন্দ্রের ৮ মতান্তরে ৭০ বর্ষ, মঙ্গলের ১৬ বর্ষ বুধের ১০ বর্ষ, বৃহস্পতির ৩০ বর্ষ, শুক্রের ৭ বর্ষ, শনির ১০০ বর্ষ ও রাহুর ১০০ বর্ষ (অর্থাৎ ঐ ঐ বয়স্ক মনুষ্যের উপর ঐ ঐ গ্রহের আধিপত্য) ॥ ৩২ ॥

নীলবর্ণ, দীর্ঘদেহ, কুবর্ণ (নীচজাতী), গামী (চুলকনামুক্ত) পাশাণ্ড মতাবদ্বী, হিকা রোগযুক্ত, মিথ্যাবাদী, কপট, কুঠরোগী, পরনিন্দাকারী এবং বুদ্ধিহীন ইহাই রাহুর স্বরূপ ॥ ৩৩ ॥

রক্তবর্ণ, উগ্রদৃষ্টি, বিধাক্ত বাঁকা, উদগ্র দেহ, সশস্ত্র, পতিত, ধূতবর্ণ শরীর, সর্বদা ধূমপায়ী, ত্রণাক্ত দেহ, ক্রুশ এবং নৃশংস ইহাই কেতুর স্বরূপ ॥ ৩৪ ॥

রাহুর সীসা এবং জীর্ণ বস্ত্র। কেতুর মাটির পাত্র এবং বিচিত্র বস্ত্র কথিত হইয়াছে। রাহু এবং কেতুর বুধ, শনি এবং শুক্রই মিত্র; মঙ্গল সম এবং অবশিষ্ট গ্রহ সকল ইহাদের শত্রু ॥ ৩৫ ॥

মূল (স্বর্ষ্যকরাংশগত), নীচস্থ, শত্রু-গৃহস্থ, অষ্টমস্থ, ষষ্ঠস্থ, এবং ব্যয়স্থ গ্রহের দুঃস্থ সংজ্ঞা। ইহা ভিন্ন অন্তর্গৃহস্থ গ্রহের সুস্থ সংজ্ঞা।

কোনও বুদ্ধি কার্যে অথবা বৃহৎ পয়ঃ প্রণালী নির্মাণাদি কার্যকালে বা ঐরূপ প্রাশ্ন কালে লগ্ন হইতে চন্দ্র ১২শ, ১১শ, ১ম, ৬ষ্ঠ, ৫ম বা ৭মস্থ হইলে জলের বুদ্ধি হইবে ইহা বলা যায়। ৩৬ ॥

রবির অন্তঃসার যুক্ত সমুন্নত বৃক্ষ; শুক্র এবং চন্দ্রের লতা, কেতু এবং রাহুর গুহ্ম; শনি ও মঙ্গলের কণ্টক বৃক্ষ; বৃহস্পতির ফলবান বৃক্ষ; বুধের ফলহীন বৃক্ষ, শুক্র এবং চন্দ্রের ক্ষীরযুক্ত এবং পুষ্পযুক্ত বৃক্ষ; চন্দ্রের ওষধি বৃক্ষ, শনির অসার বৃক্ষ, শাল বৃক্ষ ॥ ৩৭ ॥

প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোক বুঝিবার সঙ্কেত :—

সাধারণ ভাবে মেঘ প্রথম রাশি, বুধ দ্বিতীয় রাশি, মিতুন তৃতীয় রাশি এইভাবে দ্বাদশ রাশির সংখ্যা নির্ণয় হয়। কিন্তু যেখানে ২য় স্থান, তৃতীয় স্থান এইরূপ অথবা ২য় ভাব, তৃতীয় এইভাবে গণনা হয়, অর্থাৎ লগ্নই লগ্ন ভাব বা প্রথম ভাব বা প্রথম স্থান; তারপর দ্বিতীয় স্থান বা দ্বিতীয় ভাব এইরূপ ধরা হয়।

আমাদের দেশের রাশিচক্রে যেখানে লং লেখা থাকে, সেই গৃহই লগ্ন। তাহার বামের গৃহ দ্বিতীয়, তাহার বামের তৃতীয় এইরূপ দ্বাদশ গৃহ বা দ্বাদশ ভাব গণনা করা হয়।

আমাদের দেশের রাশি চক্রে সমুখের উপরের মধ্যম গৃহই মেঘ রাশি ধরা হয়, তাহার বামের গৃহই বুধ রাশি, এইরূপ বামাবর্তে মিতুন প্রভৃতি মীন রাশি পর্যন্ত দ্বাদশ রাশি গণনা করা আমাদের দেশের প্রথা।

এক রাশি ৩০ অংশীয়ক; সুতরাং ৩৬০ অংশে দ্বাদশ রাশি সম্পূর্ণ হয়। এখন মেঘের দশ অংশ রবির উচ্চাংশ বলিলে, মেঘ-রাশির দশম অংশ রবির উচ্চাংশ বা তুলাংশ বুঝিতে হইবে। রবির সিংহ মূল ত্রিকোণ এবং রবির প্রথম ২০ অংশ পর্যন্ত মূল-ত্রিকোণাংশ বলিলে বুঝিতে হইবে সিংহ-রাশিই মূল ত্রিকোণ গৃহ কিন্তু রবির স্বক্ষেত্রও ঐ সিংহ রাশি হওয়ায় সিংহ রাশির ১ম অংশ হইতে বিংশ অংশ মধ্যে রবি থাকিলে রবি স্বক্ষেত্রই না হইয়া মূল ত্রিকোণে অবস্থিত বুঝিতে হইবে। এইরূপ অগ্র গ্রহ সম্বন্ধেও ধরিতে হইবে। আবার ধরুর প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ ধরু রাশির ১ম হইতে ১৫ অংশ পর্যন্ত প্রথমার্দ্ধ এবং ১৫ অংশের পর হইতে ৩০ অংশ পর্যন্ত ধরুর দ্বিতীয়ার্দ্ধ বা শেষার্দ্ধ—এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে।

ইতি জাতক-প্রভাকর জ্যোতির্ভূষণ বিদ্যারত্ন ত্রীগণপতি সরকার কর্তৃক অনুলিখিত মন্ত্রেশ্বর বিরচিত ফল-দীপিকা গ্রন্থ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুন্দর ছবি

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

[গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে রুগ্নদেহে প্রথম দেখেছিলাম
সেদিন অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে ; কবির সেদিনকার সুন্দর ছবি মনে
গভীর রহস্য জাগিয়েছিল। কবির উদাস দৃষ্টি পৃথিবীর
সীমা ছাড়িয়ে যেন কোথায় উধাও হতে চায় ; পৃথিবীর
টানে আবার মাটিতে ফিরে আসে।]

তখন বিষম সন্ধ্যা ছিল জ্ঞান কার অপেক্ষায়
দিন হতে সন্ধ্যার সীমায়

আলোকের সিঁড়িখানি মিলাইল ছায়া অন্ধকারে ;
কান্ত গোরুগাড়ি সারেসারে
পথে চলে ধূলি-বহা তুলি'
বিদায় গোধূলি।

আমার চিত্তের কোণে
অক্ষুট অদেখা কোন বিশ্বয়ের মায়াজাল বোনে
আলোক-ছায়ায় ;
জীবনের প্রথম সন্ধ্যায়
মনের নিবিড় কক্ষে যে রহস্য জেগে জেগে ওঠে,
প্রথম সন্ধ্যার তারা ফোটে
আলোকের কবিতার মতো
তেমনি মনের যতো
স্বপ্ন দুঃখ আনন্দের স্বরে
প্রথম রহস্য জাগে ছায়াচ্ছন্ন জ্ঞান অন্তঃপুরে।

সন্ধ্যার আধারে যুগ-কবি
অস্পষ্ট ছায়ায় সুন্দর ছবি,
মনের নিভৃত কিনারায়
ছলিল বিপুল ছন্দে, সমুদ্রের বিপুল বহুয়ায়।

দেখিলাম প্রথম পলকে
সুন্দর পৃথিবীর কবি বিশ্বয়ে পলকে
সন্ধ্যার স্রমজগানে

সন্ধ্যার অলক্ষ্যস্বপ্নে ভাসে কোন আলোকের টানে,
নীড়ছাড়া বিহংগের প্রায়
দেহ আর মন লয়ে দৃষ্টি ছোট্টে শূন্যের সীমায়।
যুগের কল্পনা যাত্রী ;
ঘনাইয়া আসে রাত্রি,
আলোর প্রবাহ বেগে ভাসি'
মিলায় মনের মাঝে আসি'।
দেখিলাম অরাজ্জীর্ণ বুদ্ধকবি ছায়া অন্ধকারে
যুগের সমুদ্রপারে ;
দেখিলাম সন্ধ্যালোকে সারা পৃথিবীর নমস্কার ;
বিস্মিত যুগের কবি দোলে বুকে মন সুন্দরতার।

আজি কবি আসিয়াছে ফিরে
রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে পৃথিবীর নীড়ে,
পৃথিবীর ভালবাসা, পৃথিবীর স্বপ্নদুঃখমাঝে
নূতন স্বপন লয়ে কাজে।
অশীতি বর্ষের কবি শিশুর স্বপনভরা চোখে
অমর আলোকে।
পিছনের জ্ঞান রেখা মিলাইয়া দিনের আকাশে
স্মৃতির গোপন স্বর ভাসে,
কবিরে টানিয়া রাখে পৃথিবীর স্মৃতির পানে,
জীবনের গানে।

শুভ্রকবি যেন শিশু-তপস্বীর মতো
সন্ধ্যার আধারে নত,
দেহেরে ঘিরিয়া ফোটে আলোরশ্মি কিরণ ছটায়
রাত্রির জটায়।
মহাকবিতার চন্দ্র তনুতে আবেশ তার টানে
পৃথিবীর গানে,
তাহার বিপুল স্বরে
দেখিলাম সুন্দর কবি উদয়নে ছায়া অন্তঃপুরে।

ব্যথার শেষ

শ্রীহীরলাল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাঠকের অবগতির জন্ত ঘোষের কথাটা আমরা একটু খোলসা করিয়াই বলি। মথুর চক্রবর্তীর পুত্র মহেন্দ্র তাহার ঘোড়ষ বর্ষিয়া স্ত্রী স্রীমতী লাবণ্য প্রভাকে লইয়া নৌকাযোগে শ্বশুরালয় হইতে নিজ বাড়ীতে আসিতেছিলেন। রওন হইবার সময় আকাশের অবস্থা তেমন খারাপ ছিল না। কিন্তু অর্ধেক পথ অতিক্রম করিবার পর আকাশে মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে এক প্রবল ঝড় আসিয়া তাহাদের ডিঙিখানি উল্টাইয়া গেল—কে যে কোথায় চলিয়া গেল তাহার সন্ধানই মিলিল না। মহেন্দ্র নিজ প্রাণ রক্ষায় ব্যস্ত, স্ত্রীর কথা ভাবিবার সময় কোথায়? ঝড়ের সময় কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে কেউ জানে না। প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া মহেন্দ্র দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য—অন্ত কিছু ভাবিবার তার অবসর হয় নাই। যাক্ কোন প্রকারে সে নিজেকে বাঁচাইয়াছে। সারা রাত্রি ঝড় বাদল বহিয়াছে, মহেন্দ্র অন্ধকার রাত্রিতে কেমন করিয়া একটা দোকান ঘরে স্থান পাইয়াছে, সে ত প্রায় চৈতন্ত রহিত। পরদিন প্রাতঃকালে স্ত্রীর কথা মনে পড়িতেই তাহার সর্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু নিন্দার ভয়ে “স্ত্রীকে হারাইয়াছি” এই কথা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করায় কাহাকেও কিছু না বলিয়া একথানা ডিঙ্গি করিয়া সে একাই বাড়ী চলিয়া গেল।

এদিকে এই ঘোর অন্ধকারে প্রবল ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে লাবণ্য হাবুডুবু খাইতে খাইতে কখন কিরূপে অচৈতন্ত হইয়া পড়িয়াছে জানে না—জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিল যে, একটা ঝড়ের ক্ষুদ্র একটা ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে সে শুইয়া আছে—জাগিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল—“আমার স্বামী?” বলিয়াই পুনরায় অজ্ঞান হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পর তাহার পুনরায় জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে নিজেকে শক্ত করিবার চেষ্টা করিল এবং বিপদে অধীর হওয়া উচিত নয় প্রবাদ বাক্য স্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল—“আমি কোথায় আছি?”—বৃদ্ধা—মা এখন তোমার বেশী কথা বলবার সময়

নয়। আমি তোমাকে বলিব। এখানে তোমার কোন ভয় নাই। চুপ করিয়া একটু বিশ্রাম কর। একটু বেলা হইলেই আমি তোমার সমস্ত বন্দোবস্ত করিব। কিন্তু লাবণ্য ওসব কথায় কর্ণপাত না করিয়া শুধু বলিতে লাগিল—আপনি বলুন আমার স্বামী কোথায়? এ কাহার বাড়ী, আপনিই বা কে? লাবণ্য যখন কিছুতেই ছাড়িবে না তখন বৃদ্ধা বলিলেন আমরা মুছলমান, এই চরেই থাকি, গৃহস্থ, ঝড়ে তুমি অজ্ঞান হইয়া আমাদের জমির পাশে পড়েছিলে, আমার ছেলে দেখতে পাইয়া তোমাকে ঘরে নিয়া আসিয়াছে, কোন ভয় করিও না মা। আমরা মুছলমান হইলেও স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ রাখতে জানি। আমার ছেলে এই গ্রামের মাতব্বর, সকলেই তাহার অমুগত, কেহই তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। লাবণ্য—আপনারা আমার স্বামীকে পাইয়াছেন? তিনি কোথায়? বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা বলিল—খোঁজ করিয়া দেখিতেছি মা। যদি সন্ধান হয় তাহাকে এখানে তোমার নিকট আনিব, এই বলিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া তাহার পূজকে মহেন্দ্রের খোঁজ করিতে বলিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গফুর জানিতে পারিল যে গত রাতে একজন লোক বাজারের সন্নিকটে ভিজা কাপড়ে ছিল অন্য প্রাতঃকালে নৌকাযোগে সে চলিয়া গিয়াছে, অল্প মানে বুঝিল এই মহেন্দ্র।

গফুর তাহার মাকে এই সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, আচ্ছা বাবা ভালই হইয়াছে। মেয়েটি বড়ই কাঁদাকাটা করিতেছে; চল আমরা একথানা নৌকা করিয়া উহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি।

তখন গফুর মাতব্বর তাহার মা ও লাবণ্যকে লইয়া তাহার নির্দেশ মত লাবণ্যের শ্বশুর-গৃহে উপস্থিত হইল। বধু আসিয়াছে শুনিয়া পড়ার ছেলেপে:রা সকলেই দৈদিকে ছুটিয়া গেল—। মহেন্দ্র ইতিপূর্বেই বাড়ী পৌছিয়াছে, তাহার বাচনিক সকলেই তাহাদের দৈব বিভ্রমনার বিষয় অবগত

হইয়াছে—এবং তাহার স্ত্রী বাড়ে নৌকা উল্টাইয়া নিখোঁজ হইয়াছে—হয়তো মরিয়াছে, ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে, ইতি-মধ্যেই লাভণ্য আবার মরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া অনেকেই নূতন দৃশ্য দেখিতে মথুর চক্রবর্তীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

গফুর মাতব্বর মথুর চক্রবর্তী ও তাহার পুত্র মহেন্দ্রের নিকট কি ভাবে কি অবস্থায় সে এই বালিকাকে পাইয়াছে এবং পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সবিস্তারে বর্ণনা করিল—এবং তাহার বৃদ্ধা জননীই যে সেবা-যত্ন করিয়া ইহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে তাহাও বলিল—। গফুরের মা বলিল—বাবা এইবার আমার দায় খালাস, তোমাদের ঘরের বৌ তোমাদের হাতে যে মানে মানে ফিরাইয়া দিতে পারিলাম এ জন্ত খোদার চরণে শত শত ধন্যবাদ। লাভণ্যের হাত ধরিয়া তিনি মহেন্দ্রের জননীর হাতে তুলিয়া দিতে যাইতেই ব্রাহ্মণি—“থাক থাক” বলিয়া দুই হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে বৃদ্ধা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল এবং ইহাই ভাবিয়া ব্যথিত হইল যে পুত্রবধূকে অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরিয়া পাইয়া ও কেন ইহার স্বশুর-শাশুড়ী ইহাকে বৃকে তুলিয়া লইতেছে না। নৌকায় আসিতে আসিতে এই স্তম্ভর দৃশ্যটি দেখিবার জন্তই যেন বৃদ্ধা ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছিল। সরল প্রাণা বৃদ্ধা জানে না হিন্দুর গোড়ামি কতদূর এবং তাদের সামাজিক জীবন কত কঠোর।

অদূরে কয়েক জন লোকের বাদামুবাদ শুনিয়া বৃদ্ধা সেই দিকে নজর দিল, দেখিল গফুরের চোখ বাঘের চোখের স্থায় জলিতেছে—অপর পক্ষে দেখিল অনাবৃত দেহে খড়ম পায়ে গলায় উপবিত, কাঁধে গামছা কয়েক জন ভদ্রলোক—তাহাদের মধ্যে একজন বলিতেছেন, দেখ মথুর মৌছলমানের স্পর্শ করা বোকে কিছুতেই ঘরে আনা যাবে না—তাহারা উহাকে কি না কি করেছে ঠিক কি? আর একজন বলিতেছে, আরে রাম, ওর কি আর জাত আছে নাকি? একরাত তাদের বাড়ী রয়েছে—গো খাদক... গফুর আর সহ্য করিতে পারিল না। সে জবাব দিল, কি বললেন মশায় গরখোর? গরখোর কি করেছে? যমের হাত থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়েছে, ইহাতেই অপরাধ হ'ল? হরিঘোষ বলিলেন বাবা তুমি কি জান। আমাদের সমাজের নানা রকম কথা

আছে, তর্কচ্ছলে সব কথা ঠিক থাকে না রাগ করো না বসো। গফুর—আপনারা অনেকগুলি অনেক রকম অশ্রায় কথার প্রশ্রয় দিচ্ছেন—দৈবে এই বৌটি আমাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছে ইচ্ছা করিয়া বা কোন অশ্রায় কাজ করিয়া অথবা ঘরের বার হইয়াও যায় নি। এজন্ত আপনারা উহাকে অনর্থক উৎপীড়ন করিতেছেন কেন? আমার বাড়ী গিয়াছে বলিয়াই কি ইহার জাত যাবে। জাত কি এতই হালকা যে উহা কর্পুরের মত উড়ে যাবে ফু দেওয়া মাত্র? আমি আমার মায়ের মত দেবীজ্ঞানে ইহাকে আমার বাড়ী স্থান দিয়াছি—এবং সেই ভাবেই এখানে নিয়া আসিয়াছি—কিন্তু আপনারা অত্যন্ত ইতরের স্থায় ব্যবহার করিতেছেন। মহেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দেখুন মহেন্দ্রবাবু—জাত যায়তো আপনারই যাবে, আপনার স্ত্রীকে অশ্রা লোকে ফেলিয়া দিতে পারে। কিন্তু আপনার নিজের জিনিষ আপনি ফেলিতে পারেন না, বিশেষ আপনিই জানেন যে ইহার কোনই অপরাধ নাই। এই সব লোকের ভয়ে যদি আপনি এই নিরপরাধ বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া রাস্তার বাহির করিয়া দেন সেই কি আপনার পক্ষে গৌরবের হইবে, না তাহাতেই আপনার জাত রক্ষা হবে? ইহাকে এমন করিয়া অকুলে ভাসাইয়া দিলে আপনি কি মানুষ নামের অযোগ্য হইবেন না? গফুর আরও বলিতেছিল কিন্তু তাহার মা বাধা দিয়া বলিলেন—গফুর ভদ্রলোককে এমন কথা বলতে নেই বাবা। এরা যে সমাজে বাস করেন সেখানেই ত ইহাদের মানিয়ে চলতে হবে। ঝগড়া করো না। অনেক বাদামুবাদ ও তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে সমাজ-পতিগণ ইহাই সাব্যস্ত করিলেন যে লাভণ্যের জাত গিয়াছে সে আর এ বাড়ীতে স্থান পাইবে না।

লাভণ্য এই নিদারুণ বিচারের ফলাফল শ্রবণ করিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া নেতাদের পায়ে ধরিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার ক্রন্দনে বনের লতাপাতা ও বোধ হয় অশ্রু বিসর্জন করিল কিন্তু সমাজের নেতা ‘বাড়ুঘো’ ও ‘চাটুঘো’ মহাশয়দের দয়া হইল না। সর্বশেষে মহেন্দ্রের পায়ে পড়িয়া অর্গল নয়নাশ্রু দ্বারা তাহার পা ভিজাইয়া বলিল—ওগো তুমি যে আমার পতি—আমার স্বামী—আমার দেবতা তুমি কেন আমায় বিনা দোষে ত্যাগ কর? ওগো আমার যে কোন দোষ অপরাধ নাই, তুমি বলে দাও আমি কোথায়

যাব কি করবো? আমায় আর যে শাস্তি দাও আমি মাথা পেতে নিব কিন্তু তোমার চরণ ছাড়া করো না।

কিন্তু মহেন্দ্র নির্বাক—নিষ্ঠুর, যে মহেন্দ্র দুই দিবস পূর্বে এই কোমলমতি বালিকার প্রথম যৌবনের সুধারামি আকর্ষণ পান করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়াছে, যে মহেন্দ্র লাভগোর রূপ রাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া নিজ ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়াছে আর যে লাভণী মহেন্দ্রকে দেবতা জ্ঞানে তাহার যৌবনের প্রথম নৈবেদ্য ডালি দিয়াছে আজ সেই মহেন্দ্র সমাজ ভয়ে নির্দোষ স্ত্রীকে নির্দয় পাষণের মত অমাত্যের ত্রায় কুলের বাহির করিয়া দিল।

গফুর ও তাহার মা এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া চোখের জল রাখিতে পারিল না—উন্নত সিংহের হায়ে তাহার দুই চোখ চক্চকে লাল হইয়া গিয়াছে, নাসাজ্ঞ তাহার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে—সে যেন পাগল জ্ঞানশূন্য। অদূরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ নেতার দল বালিকার পানে কোঁতুহল দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতেছে—। গফুর আর চাপিয়া থাকিতে পারিল না—হৃদয় দিয়া বলিয়া উঠিল—আজ্ঞা এই সব পশু ব্যতীত এই গ্রামে কি আর অপর লোক নাই যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে—সবই কি ভেড়া বকরি?

ঠিক এমনি সময়ে অক্ষয় দত্ত ও হরিপদ রায়—“কি হয়েছে” বলিয়া দৌড়াইয়া আসিল। সমস্ত শ্রবণ করিয়া উহার লজ্জায় ও হুঃখে মুগ্ধমান হইয়া গেলেন। বলিলেন—গফুর এ-গ্রামে কেন প্রায় সব গ্রামেই হিন্দুর এই অধঃপতন। আজ তাই হিন্দু দুর্বল, হিন্দু ছিন্ন ভিন্ন, ধর্ম কি আর আছে? সব রসাতলে গিয়াছে—। তুমি যে ইহার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছ—এ জন্ত সত্যি তোমাকে বুক ক’রে প্রাণ জুড়াতে ইচ্ছা করছে—, তুমিই ওকৃত মোছলমান, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। গফুর তাহার জননীর কথা বলিলে অক্ষয়বাবু ও হরিপদ বাবু বুদ্ধাকে সম্মানে প্রণাম করিলেন। তিনি উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—বাবা এই বালিকাটির একটা বিহিত কর। সকলেই ভাবিলেন অক্ষয় দত্ত যখন পিছনে পড়িয়াছে—তখন মেয়েটার একটা পথ হইবে নিশ্চয়।

তিনি সম্মুখে ভূমিতে লুঠমানা লাভণীকে বলিলেন,—মা আর এখানে থাকিয়া অপমান হচ্ছ কেন? এ পাণ্ডু পুত্রীতে তোমার মত দেবীর স্থান হ’তে পারে না, লক্ষ্মী মা আমার, উঠ

বলিয়া উহাকে নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন। নারী আর ঘুমাইও না—তোমার রণ-রঙ্গিনী সাজে সাজে। তারপর চাই পাণ্ডু-দের কবল হ’তে তোমাদের মুক্ত করিয়া লুণ্ঠ হিন্দু জাতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর। ভাঙ্গ এই পঙ্গু, জড়তা, দুর্বল পুঁতিগত যুক্ত সমাজকে। দেখাও তোমার মাতৃস্বের পূর্ণ মহিমা—তোমার সত্যস্বের তেজ, একবার দেখাও মা—। যাইবার সময় গফুর ঐ সকল কাপুরুষদের বলিয়া গেল—সব শালাকে চিনিয়া রাখিলাম, হাটে ঘাটে যেখানে যাহাকে দেখিব ইহার প্রতিশোধ লইব তবে আমার নাম গফুর মাদবর—।

সেই দিনই লাভগোর পিতাকে খবর দেওয়া হইল। তিনি আসিলে কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও যখন কান চুলকাইয়া বলিলেন—কি করবো আমিও তো সমাজের লোক তাদের কথা ফেলবো কি ক’রে। মথুর চক্রবর্তী, নারায়ণ চাট্টো, বিধু মুখোপাধ্যায় সাহস করেন নি আমি তা কি করে সাহস করি? তারপর—এখনও ছ’ ছ’টা মেয়ে পার করতে হবে—আমি কেমন করে ঘরে নেই ইত্যাদি। অক্ষয়বাবু রাগিয়া বলিলেন আপনাদের কারো দরকার নেই—যার বন্দোবস্ত তিনিই করবেন, হিন্দু মরিয়াছে আছে শুধু ভৃত, রসাতলে যাক সব। লাভগোর পিতা ঠাকুর—“সবই গুরুর ইচ্ছা” বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

পরদিন লাভগোর সহিত পরামর্শ করিয়া অক্ষয়বাবু তাহাকে কলিকাতা হিন্দু আশ্রমে রাখিবেন স্থির করিলেন—এবং সেখানে মাইয়া তাহার যাহাতে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, এ জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া আসিলেন। লাভণী এখন কলিকাতায়। এখানে আসিয়া শিক্ষার প্রভাবে লাভগোর ভাব-ধারা কোন পথে কেমন চালিত হইয়াছে সময় মত পাঠককে পরে জানাইবার বাসনা রহিল।

১২ অধ্যায়

অর্চনার বিবাহের কথাটা বিজয়ের নিকট যেভাবে আশিয়া-ছিল তাহার বৈধব্যের কথাটাও ঠিক তেমনিভাবে আশিয়া বিজয়কে অভিভূত করিল। স্বশুরালয় হইতে অর্চনা লিখিয়াছে “সামাজিক বাঁধন কষনের চাপে পড়ে আজ আমাদের স্বৈতবসনে সাজতে হয়েছে—হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর সবই গঙ্গায় ধুয়ে মুছে দিলুম। সমাজপতিরা আমার বাকির দিকটা বৈধব্যের সাজে

সাজিয়ে দিয়ে হয় তো ভাবছেন আমি সত্যি বিধবা। তুমিও কি আমার তাই মনে কর? যাক্ আমার আর এখানে থাকার প্রয়োজন হবে না। দাসীবৃত্তি যদি করতে হয় দু'দিন পরেই করবো ঠিক করেছি,—আগামী কলাই যাব। অনেক দিন তোমায় দেখিনা, একবার এসো। ইতিমধ্যে শুনেছিলাম তুমি “ল” পরীক্ষা দিয়েছ, ফল বার হল?” অর্চনার এই চিঠি খানার পর রাণ্ডে একথানা চিঠি লিখিয়া বিজয়কে অর্চনার অবস্থা জানাইয়াছে, প্রথমটা বিজয় এই সমস্ত সংবাদে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার গণ্ড বহিরা অবিরল অশ্রুধারা পড়িয়াছে—বিষমমনে ভাবিয়াছে এই অল্প বয়সে এই সাজসজ্জা ও আহার করিয়া অর্চনা কাটবে কেমন করে? যখনই অর্চনার কথা মনে হইয়াছে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। পুনঃ পুনঃ বিবাহের বিষয়ও মনে হইত কিন্তু সমাজের শানিত অঙ্গের কথা ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিত। সময় সময় সমাজের এই যে ব্যবধান যে পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করিবে কিন্তু নারী স্বামীর মৃত্যুতেও পুনঃ বিবাহ করিতে নিষিদ্ধ ইহার জন্ত সমাজের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। বলিত, তবে কি আমাদের সমাজ মানুষের সুখের জন্ত নয় শুধু মানুষকে দগ্ধ করার জন্ত?

আইন পরীক্ষার ফল বাহির হইল। বিজয় পাশ হইয়াছে জানিয়া বাড়ী গেল। অনেকদিন বাড়ী যায় না, মনটা তাহার বাড়ীর জন্ত ছটফট করিতেছিল—তছপরি তার অর্চনা। তাকে দেখিবার জন্ত মন তার আরও ব্যাকুল। বাড়ী আসিয়াই বিজয় পূর্বের ত্রায় সকলকে প্রণামাদি করিবার জন্ত এবং কুশলবার্তা জানিবার জন্ত পাড়ায় পাড়ায় বাহির হইল। সর্ব শেষে সন্ধ্যার পর বিজয় অর্চনাদের বাড়ী গেল। ইদানিং এই ছুই পরিবারের মধ্যে পূর্বের সৌহার্দ্য আর ছিলনা—একটা যেন খটকা লাগিয়া উভয় গণ্ডীর মধ্যস্থলে একটা লজ্জার রেখা টানিয়া দিয়াছিল। বিজয়ের সহিত অর্চনার বিবাহ নইয়া সেই যে মনোমালিন্য তাহা এখনও মিটয়া যায়নি। অবশ্য অর্চনার পিতা অর্চনার বৈধব্যের পর তাহার ভুল বুঝিয়াছিলেন এবং অন্ততাপও করেছিলেন অনেক, অক্ষয় বাবু যদিও কিছু বলেন না বরং সময় অসময়ে ইহাদের উপকারই করিয়া যান তবু অর্চনার কথা মনে হইলেই অভিমান হইত—এই ভাবিয়া যে দুর্গাদাসবাবু তাহার অন্তরের একটা প্রধান আশাকে চূর্ণ করিয়াছেন।

বিজয় অর্চনাদের বাড়ী আসিবামাত্র অর্চনার মা তাকে বসিবার আসন দিলেন এবং “বস বাবা বস” বলিয়া আদর আপ্যায়ন করিলেন। পরে অর্চনার কথা তুলিয়া কপালদোষে দুর্বিপাক হইয়াছে বলিয়া চোখের জল ফেলিলেন। তৎপরে ও ঘরেই আছে যাও না বাবা বলিয়া অঙ্গুলী নির্দেশ করিলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন ওরে অচ্চ দেখ কে এসেছে। অর্চনা কিন্তু উঠিল না যেখানে বসিয়াছিল সেখানেই বসিয়া রহিল। ২১ মিনিট এইভাবে অতিবাহিত হইলে বিজয় নিজেই সেই ঘরে প্রবেশ করিল। অর্চনা তাকে টিপ করিয়া প্রণাম করিলে বিজয় “আরে বাঃ” বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল। অর্চনা হাসিতে হাসিতে বলিল—একি আমাকে আশীর্বাদ করিলে না? বিজয়—আশীর্বাদ তো মনের জিনিষ মুখে না হয় নাই প্রকাশ করিলাম। আচ্ছ তো ভাল? অর্চনা—উকীলদের সঙ্গে কি কথায় পারা যায়? জবাব যেন মুখে লেগেই আছে। যাক্ তুমি তো ভাল? এইরূপ কথোপকথন করিবার পর অর্চনার বৌদি আসিয়া বলিলেন—বাঃ খুব যে জ'জনে গল্প? কি বিজয়বাবু খবর সব ভাল তো? বিজয় বলিল—ছনিয়ায় কি আর সব ভাল হয় বৌদি? বৌদি—আমি আপাততঃ তোমার পরীক্ষার কথা বলছি। ফল বেরিয়েছে তো? বিজয়—হ্যাঁ এ পরীক্ষায় পাশ করেছি বটে, তবে এখন যে পরীক্ষায় পড়বো সেটাই বড় পরীক্ষা। অর্চনা—কি রকম? বিজয়—মক্কেল জুটাবার পরীক্ষা। যে বাজার তাহাকে শেষ করতে না দিয়াই বৌদি বলিলেন—মক্কেলের জন্ত ভাবনা কি? আমরাই তো আপনার মক্কেল আছি, আমাদের মোকদ্দমা শেষ করুন তারপর তো অল্প মোকদ্দমা, দেখুন ম'শায় ভুলবেন না যেন আগেই বলে রাখলাম—আমার একটা মন্ত মোকদ্দমা আছে এবং আপনাকেই তা করতে হবে।

বিজয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাতেই বৌদি অর্চনার গায়ে আস্তে একটু ধাক্কা দিয়া দেখাইয়া বলিলেন এর বিহিত ম'শায়কে করতে হবে, ভাবনায় ভাবনায় কিনা রোগাটি হয়ে গিয়েছে, বলিয়াই তিনি হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিলেন। অর্চনা কপট ক্রোধের ভান করিয়া বলিল—দেখ বৌদি এ সব ভাল নয় বলছি। কি যে বল কিছু ঠিক নেই। বিজয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, বৌদি একটা

পাগল, যা খুসি তাই বলে। যাক সে সব কথা। তাহলে তুমি কোথায় বসবে ঠিক করেছ? বিজয়—এখনও কিছু ঠিক করি নাই, তবে আমার ইচ্ছা হাইকোর্টেই আরম্ভ করি, দেখি বাবা কি বলেন,—তুমি কি বল? অর্চনা—আমি কি বলবো? জেঠামশায় যা বলেন তাই করবে। তবে হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করলে বলতে বেশ শোনার বটে—গাল ভরা নাম, কি বল? বিজয়—শুধু নামেই তো চলবে না—কামও তো চাই। তৎপরে একটু আগ্রহভরেই যেন হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা অর্চনা আমি যদি তোমায় কলকাতায় আমার বাসায় নিয়ে যেতে চাই তুমি যাবে তো? এই ক্ষুদ্র প্রশ্নটার উত্তর প্রদানে অর্চনা অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, পরে বলিল যদি তুমি নিতেই পার তবে আমিও যেতে পারবো, বলিয়া কক্ষ দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে চাহিল। বিজয়ও অপলক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

—অনেক দিন পর চারি চক্ষের মিলন হইয়া ভাবের বিনিময় হইল। এমনভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল—কেহ কোন কথা বলে না—ঘর নিস্তব্ধ। হঠাৎ বিজয় ডাকিল—অর্চনা? অর্চনা উত্তর করিল, কি? বিজয়—কাছে এস, অর্চনা—কাছেই তো আছি, বল। বিজয়—অচ্ছু বিজয় তোমার তুমি ছাড়া কারো নয়। কে বলে তুমি বিধবা...ইত্যাদি। অর্চনা আর স্থির থাকিতে পারিল না—টুপটাপ করিয়া তাহার ডাগর চোখ দিয়া অশ্রু বরিয়া পড়িল। বিজয় নিজ রুমালে সযতনে সেই পবিত্র বারি মুছাইয়া দিয়া তাহাকে শাস্ত্বনা দিল। নীরবে উভয়ের প্রাণে বীণার বাজার উঠিল—পুলকে তাহাদের মুখ উজ্জল ও শান্ত।

ত্রমণঃ

নির্ভর

শ্রীমুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

তুমি আসিছ যে পরাণ আমার জানে,
এই মরাগাঙ তাই ত ভরিলে বানে।
ছিলে প্রতীক্ষা করি
মোর ভরা গাঙে কখন ভাসাবে তরী।
শ্রাবণ ধারার বরিষণ ঢালি রচিলে সরসীখানি
বুক ভরা গালে প্রসাদ-পবন নভ হ'তে নিলে টানি।
আসিবে আমার কূলে,
নিঃসঙ্গীরে তরী-পরে ল'বে তুলে।

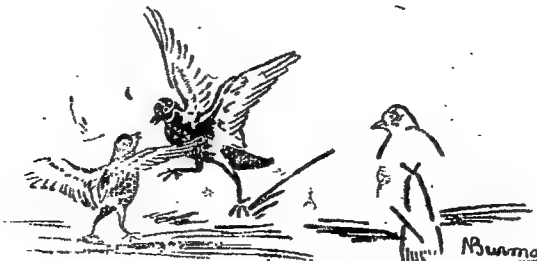
নীরবে বসিবে তুমি তরণীর হালে
টানিব ক্ষেপনী উর্মির তালে তালে।

কোথা মোরে লয়ে যাবে?

—সে প্রশ্ন মোর চিতে নাহি ঠাঁই পাবে।

প্রবাহিনী ধারা অন্তকূল বায়ু যে দিয়াছে তার জানা

ঘাটের ঠিকানা অকূলের পানে, মোর শুধু দাঁড় টানা।



আমাদের রবিদাদা

পূর্বাত্মবৃত্তি

শ্রীমুরূপা দেবী

দ্বারে কেন দিলে নাড়া ওগো মালিনী

কার কাছে পাবে সাড়া ওগো মালিনী !

সাড়া কিন্তু পেয়েছিলাম তাঁর কাছে। শান্তিনিকেতন গিয়ে-
ছিলাম নববর্ষের উৎসবে যোগ দিতে—সেই নীল আকাশের
নীচে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উপলব্ধি করলাম, তিনি কত
বড় ! তাঁর ব্যক্তিত্ব, ওঁদাখ্য, দাক্ষিণ্য রূপ-রস মধুর সান্নিধ্য
আমার প্রাণ নব নব স্রবের প্লাবনে আকুল করে তুলেছিল।
নব বর্ষের প্রথম দিনটির কথা বলি—আমি আর মেধাদি পরামর্শ
করেছিলাম খুব ভোরে উঠে দুগাছি বেলফুলের মালা গাঁথে
রবিদাদাকে পরিয়ে দেবো। তখনও আলো ফোটেনি, প্রায়
অন্ধকার, উদয়নের বেল-যুঁই ছড়ান লাল রাস্তাটিতে
ফুল কুড়োতে কুড়োতে দূরে দেখলাম আমাদের দিকে এগিয়ে
আসছে এক ঋজু শুভ্র মূর্তি, বুঝলাম শান্তিনিকেতনে সূর্যোদয়
আরম্ভ হয়ে গেছে। তিনি রসিকতা করে বললেন “তোদের
হারিয়ে দিলাম।” অত ভোরে তাঁর নববর্ষের উপাসনার
সাজ শেষ হয়েছিল, তারপর সেই শিরীষ শুভ্র পটুবয়ে তাঁর
ভাস্কর প্রতিম রূপ আর শান্তিনিকেতনের দিক্ বিদিগ্ রাস্তা
আলোর স্রোতে রঙিয়ে দিয়ে নববর্ষের নতুন সূর্যের আবির্ভাব
হলো। রাত্রেই ঝরা ফুলে আমরা দুই জনে রবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি
নিবেদন করলাম। তারপর আশ্রম ভরে উঠল রবীন্দ্র কর্তৃক
বেদমন্ত্রে, দিনেন্দ্রনাথ ও বালক বালিকাদের মধুর গীত ধারায়।
মনে হলো চলে গেছি সেই শান্তি-আনন্দ-ভরা তপোবনে।
সারাদিন উৎসবের পর “উদয়নে” ফিরে এসেছি, তখন প্রায়
সন্ধ্যা, দেখলাম রবিদাদাকে, মধুমল্লির কুঞ্জের ভিতর শ্বেত-
পাথরের বেদীটিতে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তাঁর সেই
সুদীর্ঘ ধ্যানী ঋষি মূর্তি দেখে মনে হলো শান্তঃ রবি পৃথিবীর
সমস্ত আলোক আবার নিজের দেহে সঞ্চয়িত করে নিয়ে আর
এক নতুন প্রভাত সৃষ্টির কল্পনার ধ্যানমগ্ন, তাঁর কণামাত্র

দাক্ষিণ্যে প্রফুল্ল এক ফালি বৈশাখী চাঁদ জল জল করে জল্হিল
মাথার উপর। শান্তিনিকেতন জুড়ে বাজছিল একটি শান্তিময়
সুর। এই যে অত্মবৃত্তি একি ভোলবার ! এই সময় আর
একদিনের কথা বলি ; উদয়নের ছাদে মনিপুরী নাচ হচ্ছিল,
হঠাৎ আকাশ জুড়ে হু হু করে বৃষ্টি নেবে এলো, আমরা
একেবারে ভেজবার আগেই দৌড়ে সকলে নীচে নেবে এলাম।
রবিদাদাকে দেখতে পেলাম না, কিছুক্ষণ পরে দেখি তিনি
সিঁড়ি দিয়ে নেবে এলেন তাঁর সর্বাঙ্গ বেয়ে বৈশাখী ধারা
নেবেছে, চোখ কোঁতুকে জল জল করছে। প্রতিমাদেবী
ভয় পেয়ে বললেন “এত ভিজ্ঞে গেলেন, কাপড় ছাড়ুন। অস্থ
করবে।” তিনি খুব হেসে বললেন “নারে ভাবিস না,
সবাই নেবে এলো, নিলেম খানিক চুপিচুপি ভিজ্ঞে, বড়
ভাল লাগে বাদলে স্নান করতে।” সত্যি, তাঁর মত বর্ষাকে
এত ভাল বোধ হয় কেউ বাসেনি। তাঁর বর্ষার কবিতা
যেমন অতুলনীয় তেমন বর্ষার ধারার মত অপূর্ণাঙ্গ অজস্র।
আর একদিন তাঁকে দেখেছিলাম এক অপূর্ণ পারিপাশ্বিকের
ভিতর। একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম। একদিন হুপু
বেলা কি কাজে তাঁর সঙ্গ দেখা করতে গিয়েছিলাম, তাঁর
সেক্রেটারী আমাকে একটি ছোট ঘর দেখিয়ে দিলেন। আমি
অবাক হয়ে দেখলাম সেই ছোট ঘরটি জুড়ে তিনি বসে আছেন
তাঁর দীর্ঘ মূর্তি, তাঁর ছড়ান খাতা কাগজ, তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন
ভরিয়ে তুলেছে ঘরটি। খোলা জানালা দিয়ে বৈশাখের খর রৌদ্র
ও তপ্ত বাতাস অজস্র ঘরে ঢুকছে। আমাকে ব্যস্ত হতে দেখে
বললেন “এ ঘরটি না হলে আমার লেখা হয় নারে।”

সমস্ত ভোগ, সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে দিব্যরাত্রি এই
তপস্বী কবির তাঁর মানসীর জন্তে সাধনা যে না দেখেছে
সে কল্পনা ও করতে পারবে না।

ফুল রবিদাদার বড় প্রিয় ছিল। দেখেছি তাঁর উদয়নের

ঘরগুলি নানা ফুল দিয়ে সাজানো থাকত। কৈতকী, কদম, সাদা শালুকের মধ্যে তাঁকে দেখাত শরতকালের দেবতার মত। তিনি যখনই ফুল উপহার পেতেন কারু কাছ থেকে, আনন্দে একেবারে অধীর হয়ে উঠতেন। একবার ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে তিনি সকাল বেলা চা খাচ্ছিলেন, একজন এসে তাঁর হাতে একগুচ্ছ নাগকেশর দিলেন; তিনি আনন্দাপ্ত স্বরে বলে উঠলেন “আহা, দেখ-দেখ কি সুন্দর” যেন বসন্তের অগ্রদূত। তাই যখনই সাদা মোমের মত নাগকেশর দেখি আপনা-আপনি মনে হয়, আহা এরা বসন্তের অগ্রদূত।

শুভ্র সাজে ও তাঁকে যেমন ঋষির মত সুন্দর দেখাত, রঙিন সাজেও তাঁকে দেখাত অপূর্ব। ফাল্গুন মাসে দোলের দিন শান্তিনিকেতনে বাসন্তী-উৎসব দেখেছিলাম। মাঘী পূর্ণিমার চাঁদ মাথার উপর ঢুলছে, তাহার নীচে ফুলে ফুলে প্রফুল্ল বাসন্তী রঙে রঙিন বসন্ত উৎসবের অঙ্গন আনন্দ ভরা গান আর ফাগে ও ফুল-নন্দিত ললিত নৃত্য মায়া লোকের সৃষ্টি করেছিল। সেই মধুর পরিবেশে দাঁড়িয়েছিলেন কবি, গলায় তাঁর ঢুলছিল যুঁইএর মালা, পরণে ছিল বাসন্তী-রঙের পরিচ্ছদ, তাঁকে দেখাচ্ছিল রসরাজ বসন্তের মত, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি প্রাণে প্রাণে রসের তুফান তুলেছিল। সব সৌভাগ্যের চেয়ে বড় ভাগ্য আমার, যেদিন স্বেচ্ছায় তিনি আমার নিজের ধরটিতে এসেছিলেন, আমার নব জীবনের নতুন ঘর বাঁধা সার্থক হয়েছিল সেখানে তাঁর আশীর্বাদ মাথাকর-স্পর্শ পেয়ে। চিরদিন আমার জীবনে সেই দিনটি সগৌরবে জেগে থাকবে। মনে পড়ে সেই গোঁধুলীর আলো-ছায়া মাথা ঘরটিতে তাঁর মহান উপস্থিতি, অন্তর্মিত স্বর্ষ্যের শেষ রশ্মি তাঁর ললাটে, কেশে, শাশ্রু-রাজীতে মাথিয়ে দিয়েছিল রাজ্য অমর্যোগ। সেই পূরবী বেলায় তাঁর কণ্ঠে জেগেছিল ব্যথা ভরা পূরবীর স্বর, যেন দিনের শেষের সেই সোনা মাথা আলোক পথ বেয়ে এই পৃথিবীর রবির কণ্ঠের সপ্ত রাগিনী মূর্ত হয়ে সেদিন পৌঁছাচ্ছিল স্বর্গের রবির কাছে। তাই ভাবি হে কবি, হে রবি, তোমার জ্যোতি এই পৃথিবীর বুকে যে আলো জালিয়েছে তাইই আলোক-সম্পাতে আমাদের জীবনে কত ঝিকি-মিকি—বেলা আসে যায় কিন্তু তোমাকে জানতে পারে কে? কে বুঝতে পারে তোমার বিশালতা? তাই তো আমাদের বেলা যে যায় সঁকা বেলাতে—তোমার স্বরে স্বর মেলাতে।

কালের গতিতে কত বৎসর কেটে গেল তাঁরা কে জানত যে তাঁর বেলাও শেষ হয়ে এসেছে। বাড়ীতে বসে শুন্ছিলাম খুব কষ্ট পাচ্ছেন, শীঘ্র অপারেশন হবে, দেখা করতে গেলাম। তখন জান্তামনা সে দিনটি ছিল তাঁর অপারেশনের আগের দিন; বাড়ীর লোকরা-ও কেউ জানতেন না। মীরা পিসির কাছে তাঁর অস্ত্রের বিষয়ে কথা হচ্ছিল। রবিদাদাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তিনি ঘুমাচ্ছিলেন বলে সকলে একে একে চলে গেলেন, আমিও হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরব ভাবছি হঠাৎ মীরা পিসি আমাকে ডাকলেন, শুন্লাম তিনি জেগেছেন। তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। প্রথম তিনি আমাকে ভাল চিন্তে পারেন নি বোধ হয়, তবু সে কথা প্রকাশ হবার অবকাশ না দিয়েই তিনি একটি আঙুল আমার দিকে নেড়ে বললেন “দাঁড়া দাঁড়া মনে পড়েছে, তুই। তোর বাবা ত, চমৎকার লিখছেন, আমি বলেছি তাঁকে খুব লিখতে, খালি লিখতে।” তাঁর কণ্ঠে ফুটেছিল এক অদ্ভুত আবেগ, মনে হলো তাঁর লেখবার সমস্ত শক্তি তিনি আর একজনের মধ্যে বিকশিত হবার কল্পনায় অধীর, অতৃপ্ত হয়ে উঠেছেন। আমি বললাম “আপনি কেমন আছেন?” ককণ হতাশ স্বরে তিনি বললেন —“জার কেমন।” আমি ব্যথা ভরা হৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ী ক্রমশই নীরব হয়ে আসছিল, রবিদাদা প্রায়ই কলিকাতায় আসতে পারতেন না; জ্যাঠামশাইরা অনেকেই মারা গেছেন, বাবারও বয়স হয়েছে। সেই আনন্দ কোলাহল শুক্ন হয়ে গিয়েছিল। ৭ই আগষ্ট জোড়াসাঁকো বাড়ী তরে জেগে উঠল এক নতুন কোলাহল, কিন্তু সে কোলাহল ত আনন্দের নয়, সে হচ্ছে কবির মহা-প্রয়াণে সমগ্র জনতার বুক ফাটা ক্রন্দন। মনে হলো সমস্ত পৃথিবীর লোক কি তাঁকে শেষ দেখতে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে? তিল ধারণের ঠাই নাই। বিরাট বিশ্বের সহস্র সহস্র মানব-হৃদয়ে কবি নিজের স্বাভাৱ নিজের প্রাণের বিপুল ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ত শুধু আমাদেরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমস্ত পৃথিবীর, তাঁর নিজের বাড়ীর প্রাঙ্গণটুকুর মধ্যে ধরবে কেন তাঁর ভক্ত বৃন্দকে।

“ঠাই নাই ঠাই নাই।

ছোট এ তরী

আমারই সোনার ধানে

গিয়েছে ভরি।”

৭ই আগষ্ট যত বার সেই জনতা দেখেছিলাম শুধুই কেবল
তুলনীদাসের দৌহাটুকু মনে পড়ছিল—

“তুলসী তুম্‌ বর জগ্‌মে আরো

তুম্‌ রোয় জগ্‌ হসো।

এই সা কন্‌ না বার করোতি

তুম্‌ হস জগ্‌ রোয়।”

তিনি জন্ম নিয়েছিলেন জোঁড়াসাঁকো বাড়ীর ছোট
গণ্ডীটির মধ্যে, চলে গেলেন সমস্ত ভারতের বুক খালি করে।

তাঁর হৃন্দর প্রাণহীন দেহটি যখন এক নিমেষের মধ্যে সমস্ত
জনতার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, মনে হলো বুঝি একটি
ফুলে ভরা, বাসন্তী-রঙের নৌকো কালো মহাসমুদ্রের উপর
ভেসে চলেছে। শূন্য অন্ধকার বাড়ীটির দিকে হাত জোড় করে

কবিরই ভাষায় কবিকে প্রণাম জানালাম—

“মন আঁবণ মেঘের মত

রসের ভারে নম্র নত

একটি নমস্কারে, প্রভু,

একটি নমস্কারে

সমস্ত মন পড়িয়া থাক্‌

তব ভবন দ্বারে।”

গান

শ্রীমতী সরলা বসু রায়

অশ্রু-মুকুল বরে বরে

তোমার চরণ পরে

কে সে গানের ছন্দ গাঁথি’

রাখুল থরে থরে।

কোন সে মধু-মস্তুরে হায়

তোমার পূজার সুর ভেসে যায়,

কোন সে বধুর অন্তরে হায়

নুপুর তোমার বাজে,

তুমিই বল সঙ্গী কাহার

সকাল-দুপুর-সাঁঝে ?

তোমার বিষের দহন-জালা

অমৃত কার ? কোন সে বালা

অশ্রু-কণার গাঁথে মালা

নয়ন জলে ভাসি,

দিবস শেষে মরণ বেশে

আসবে কাহার হাসি।

ভাটিয়ালী

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

(১)

দ্যাশের বন্ধু

ওরে মোর দ্যাশের বন্ধু, কইরে কই, দেখ্যা তোরে যাই ।

মুখখানি তোর না দ্যাখ্লেই প্রাণ করে আইচাই ॥

(তোর) হাতে কেমন কঁকন বাজে,

পায় বাজে রে মল,

ঝামুর ঝুমুর শব্দ শুভা ।

প্রাণ হৈল শীতল,—

পাই না দিশা হাতের দিক না পায়ের দিকে চাই ॥

পান খাইয়া তোর

ঠোট ছুটি হয় রাঙ্গা,

দ্যাখ্লেই মোর বুকের মধ্যে

আরন্ত হয় দাঙ্গা,—

ইচ্ছা করে আউগ্যাইয়া তোর গায়েয় বাতাস খাই ॥

দ্যাশ=দেশ । দেখ্যা=দেখিয়া । দ্যাখ্লে=দেখিলে ।

শুভা=শুনিয়া । আউগ্যাইয়া=আগাইয়া গিয়া ।

(২)

প্রাণের মানুষ

কোন দ্যাশে মোর প্রাণের মানুষ, কে দ্যায় তারে খুঁজ্যা ।

মনের কথা বুকে চাপ্যা রইলাম রে মুখ বুজ্যা ॥

মানুষ সে কি ?—শূন্য ওড়ে গহন-বনের টিয়া,

হাত বাড়াইয়া ধরতে গিয়া পড়ি আছাড় খাইয়া,—

লাগল পাইলে লাল ঠোটে তার দিতাম মধু গুঁজ্যা ॥

রাত-বেরাতে কারো বাড়ী যায় যদি সে পাখী,

ঝুম ভাঙ্গাইয়া ডাইকো মোরে, দেয় না যেন ফাঁকি,—

হাত বুলাইলে গায় নেবে সে মনের কথা বুঝ্যা ॥

দ্যাশে=দেশে । দ্যায়=দেয় । খুঁজ্যা=খুঁজিয়া ।

চাপ্যা=চাপিয়া । বুজ্যা=বুজিয়া । ওড়ে=উড়ে ।

লাগল=নাগাল । গুঁজ্যা=গুঁজিয়া । কারো=কাহারও ।

ডাইকো=ডাকিও । বুঝ্যা=বুঝিয়া ।

সহধর্মিণী

শ্রীদীপ্তি দেবী বি,এ, বি,টি,

রমেশবাবু পুত্র প্রশান্ত কুমারকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠান হির করলেন। প্রশান্তর মা কাদম্বিনী দেবী বলেন—
বিয়ে না দিয়ে ছেলেকে বিলাত পাঠালে ছেলে নিশ্চয় একটি মেম-বোঁ ঘরে নিয়ে আসবে। মায়ের জিদই রইল। প্রশান্তের “রক্ষা-কবচ” হয়ে বীণা চৌদ্দ বছর বয়সে এল রমেশ বাবুর সংসারে। বিলেত ফেরৎ ছেলের উপযোগী করে তুলতে হবে বীণাকে। রমেশ বাবুর অগাধ পরসা। ছই তিনটি মেম সাহেব নিযুক্ত হবে মেয়েটাকে তৈরী করতে। ইংরাজি কথা-বার্তা, খানা দানা, আদব কায়দা, কোন দিকেই যেন ক্রয় না থাকে।

বীণার কিন্তু এসব লাগে না ভাল। তার মন পড়ে থাকে তার মায়ের কাছে। বীণার মার ইচ্ছা ছিল, জামাই না আসা পর্যন্ত বীণাকে নিজের বাড়ীতেই রেখে দিবেন। তবে সন্ধ্যাবেলা তাকে একবার করে তার মার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ’ত। এই সন্ধ্যাটা বীণার সব চেয়ে লাগত ভাল। মার কোলের কাছে বোসে কত গল্পই না সে করত। মার কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প, পুরাণের গল্প, সীতা সাবিত্রীদের গল্প শুনতে তার লাগত বেজায় ভাল। মেম সাহেবদের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে উঠত সে। মাঝে মাঝে মাকে বোলত—“আর পারিনে মা মেম হ’তে, বাঙ্গালীর মেয়ে, কি দরকার মা ওসবে”—মা বলতেন,—“স্বামীর চেয়ে বড় গুরু নেই মেয়ে মানুষের। তোমার স্বামী যেমনটা চান তেমনটা ত’ হ’তে হবে। স্বামী উচ্চ শিক্ষিত হয়ে ফিরবেন বিলেত থেকে, তখন যদি তিনি এসে দেখেন তুমি একটা জড় ভরত হয়ে বোসে আছে তখন তাঁর মনে কত হুংখ হবে বল ত? স্বামীর সহধর্মিণী, সহকর্মিণী, সহচরী হ’তে হবে যে তোমায়।”

দেখতে দেখতে পাঁচছটি বছর গেল কেটে। বিলেত ফেরৎ ব্যারিষ্টারের উপযোগী হ’য়ে উঠেছে বীণা সম্পূর্ণরূপে। বাইরের

আবরণের আড়ালে কিন্তু যে বীণাটি লুকান ছিল সেটি ছিল পুরাপুরী বাঙ্গালী। তার পরিচয় পেত কেবল তার মা।

প্রশান্ত আজ ফিরবে দেশে। বীণার তাকে ভাল করে মনে পড়ে না। বিবাহের অল্পটানাদি মিটতেই সে গিয়েছিল চলে। বিয়ের কনে বীণা মাথা তুলে চাইতেই পারে নি।
আজ তাকে নতুন করে পরিচিত হ’তে হ’বে স্বামীর সঙ্গে। ছ’জনের মিলিত জীবনের এক মধুর ছবি ভেসে উঠল তার মনে। অজানা এই নতুন জীবনের কথা মনে করলে ভয়ও হয় আবার আনন্দও হয়। ভবিষ্যতের রাজ্য স্বপ্নকে আরো রাঙ্গিয়ে দিয়ে এল তার জীবনে প্রশান্তকুমার। একটা সুখের হিলোলে তুলে উঠল তার মন প্রাণ।

শীঘ্রই প্রশান্ত বায়ে নাম করে ফেলল। পসারও জমল বহু। রোজগারের পরসা ছ’হাতে ছড়াতে লাগল সে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই। দলে দলে অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটল প্রশান্তর। আজ গ্রেট ইষ্টার্নে লাঞ্চ, কাগ ফার্মোতে চা, পামগ্র্যাণ্ডে ডিনার, তারপর দিন ক্যান্ডানভাতে ককটেল পার্টি। আজ নাচের পার্টি, কাল ব্রিজপার্টি, এমনি ব্যাপার ত লেগেই ছিল। বীণাকেও যোগ দিতে হত এই সব আমোদ প্রমোদে। কষ্ট হত তায় কিন্তু স্বামী সুখী হবেন এই ভেবে সে কোন আপত্তি করত না। স্বামীর এক বান্ধবী তাকে সিগারেট খেতে অনুরোধ করে। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে কিন্তু রাগ দেখলে স্বামীর বন্ধু অপমানিত বোধ করবেন, স্বামীও বিরক্ত হ’বেন এই মনে করে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে—“সিগারেট খেতে আপত্তি নেই, তবে ওটা আমার সখ হয় না, খোঁয়া লাগলেই মাথা ধরে—” এই ভাবে আল-গোছে থেকে সে স্বামীর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশত।

ভয়ে ভয়ে সে লক্ষ্য করে স্বামী তার গিলিত খাদ্যের সঙ্গে গিলিত পানীয়ও খেতে শিখে এসেছেন। প্রথম প্রথম অল্প

স্বপ্নই চলতো কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, মাত্রাও যেন বেড়ে যেতে লাগলো। সে সকাল সকাল তার স্বামীকে নিয়ে বাড়ী ফিরতে চায়, বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে—“কী? আপনার স্বামী কি একটা বেবী? সাতটা না বাজতেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন।” স্বামীকে সতর্ক করলে তিনি বলেন—“তোমার মন বড় সঙ্কীর্ণ; এই সহজ মেলামেশাকে খারাপ মনে কর কেন? আশঙ্কায় বীণার সারা মন ভরে ওঠে, অথচ কি যে সে করবে বুঝে উঠিতে পারে না। কার পরামর্শ নেবে সে? স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা করতে মন ওঠে না, এমন কি মার সঙ্গেও না। বীণা নীরব থাকলে কি হয় সকলের মুখেও চাপা দেওয়া চলে না। ‘আন্তে আন্তে রমেশ বাবুরও কাণে কথা এল।’ তিনি অল্পনয় বিনয় করলেন, তাজ্যপুত্র করবার ভয় দেখালেন, মা কান্নাকাটি করলেন, শাস্তি সস্তেন করালেন, নিজেকে মাছলী কবচে মুড়ে ফেললেন, মানৎ করলেন, কালীঘাটে নিয়মিত পূজো পাঠালেন কিন্তু প্রশান্তের মতি গতির হ’ল না বদল। মাঝে তাকে পাঠান হ’ল কোলকাতার বাইরে। যদি বন্ধু-বান্ধবদের প্রভাবে বাইরে গেলে এ দোষ-তার কেটে যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য। কিছুদিন সে ভালই ছিল। বীণা ভাবলে এইবার বুঝি বিধাতা তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। সাঁওতাল পরগণার ক্ষুদ্র একটি গ্রামে তারা ঘরকন্না করে সুখেই। এ সুখ কিন্তু বেশী দিন টিকল না। আবার ভূষণয় প্রশান্তের ছাতি কাটে। আবার মদের আমদানী। একদেশ থেকে বীণা যায় তৃত্ত দেশে। ভাবে, পরিবেষ্টনের বদল হ’লে হয়ত মনেরও বদল হবে, হয়ও, তবে সেটা অল্পদিনের জন্তে, দেখতে দেখতে আবার যে কে সেই। কতদিন আর সে এভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে? কোলকাতায় থাকতে বাপ মার ভয়ে দিনে দুপুরে বড় একটা কিছু করত না সে, আজকাল যেন সে হয়ে গেছে আরও বেগরোয়া। চোখের পর্দা যেন আরও খোসে গিয়েছে। যে সব কাজ চলত আগে ক্লাবে বা হোটেল, সেই সব চল এখন বাড়ীতে। কোলকাতায় ফেরাই শ্রেয়। বীণা প্রশান্তকে নিয়ে এল ফিরে।

রমেশবাবুর শরীর এমনতেই ছিল বেমজবুত, এবার পুত্রের শোচনীয় পরিণাম দেখে তিনি একেবারে শয্যা নিলেন। শুয়ে শুয়ে তিনি প্রশান্তের ছেলেবেলার ছবি দেখেন। চার বছরের শিশু প্রশান্ত—এক মাথা চুল, কোঁকড়া রেশমের মত। বড়

বড় চোখ, নিস্পাপ, নিরুলঙ্ঘ। আট বছরের বালক প্রশান্ত—স্কুলে যাবার জন্ত প্রস্তুত—হাতে খাতা বই, উজ্জল চোখে দৃষ্টি মেলে আছে সে। তারপর আঠার বছরের কলেজের ছাত্র প্রশান্ত—পরনে খন্ডরের ধুতি পাঞ্জাবী, শান্ত স্নিগ্ধ মুখ, দেশ সেবার গর্বের গর্বিত। প্রশান্তের এই চেহারা দেখে রমেশবাবুর মনে তখন আসে নি গর্ব, এসেছিল ভয়। স্বদেশী হাঙ্গামার মধ্যে জড়িত হয়ে শেষে কি তাঁর একমাত্র ছেলে যাবে জেলে? এই ধড়পাকড়ের যুগে ক’দিন ও বাইরে থাকবে? দেখতে দেখতে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে সে লুপ্ত হয়ে যাবে। একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে তিনি বাঁচবেন কি করে? ব্যালেন, একে বাধা দেওয়া চলবে না, বাধা দিলে ক্ষেদ্র যাবে আরও বেড়ে। কিছুদিনের জন্তে দেশের বাইরে যদি তাকে কোনরকমে পাঠান যায় তবে এ ঝোঁকটা আপনাই যাবে কেটে। নূতন পরিবেষ্টনের মধ্যে থাকলে পুরাণ স্মৃতি মন থেকে আপনাই মুছে যাবে। উচ্চ শিক্ষার দোহাই দিয়ে তাই তিনি ছেলেকে দিলেন পাঠিয়ে। যেদিন ড্রেস-সুট-পরা প্রশান্তর ছবি এল বিলেত থেকে, সেদিন তাঁর বুক থেকে একটা আরামের নিঃশ্বাস বেরিয়েছিল। যাক তা’ হ’লে খন্ডরের মোহ কাটিয়ে উঠেছে, রোগের ঠিক ওষুধিই উনি দিয়েছেন। তারপর ভেসে উঠে বিলেত ফেরৎ প্রশান্তের মন্ত চাহনী,—সারা বুক মছন করে আবার পড়ে নিঃশ্বাস।

রমেশবাবু টিকলেন না আর বেশী দিন। যাবার আগে তাঁর বিবয় সম্পত্তি রেখে গেলেন ট্রাস্টীদের হাতে। প্রশান্ত শুধু পাবে একটা মাসোহারা।

অভাব অনটন দেখা দিল বীণার সংসারে। সংসারে খরচের অর্ধেক টাকা যায় মদে। বারে প্রশান্তের আর কিছু হয় না। নাম খারাপ ঠিক সময় কোটে উপস্থিত হয় না। মজলরা সেরে পড়ল যে-যার। বন্ধুদের পিছনে আর তেমন খরচ পত্র পারে না করতে সে। বন্ধুর দলও সেরে পড়ল ধীরে ধীরে। মন হয় খারাপ, ভুলে থাকবার একমাত্র উপায় মদ। সকলেই তাকে ত্যাগ করেছে। বাবা গেছেন চলে। মা থাকেন ঘরে। বীণার সামনে আসতে কেমন লজ্জা বোধ হয়। পরের মেয়েকে এনে স্ত্রী করতে পারল না তাকে। জীবনটা তার হয়ে গেল ব্যর্থ; এর জন্ত সে দায়ী। অথচ সে নিরুপায়।

মনে নাই জোর। দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে না সে। সবাই গিয়েছে, আছে শুধু একমাত্র বন্ধু মদের গ্লাস।

সময় মত আহার এসে জোটে। কোথা থেকে আসে সে জানে না। টাকা ত নিঃশেষ হয়ে যায় আসতে না আসতে। একটি একটি করে বীণার গহনা যে যাচ্ছে চলে পোদারের দোকানে, সে খবর রাখবার মত অবস্থা ছিল না প্রশান্তর।

নীচেকার ঘরটি ছেড়ে সে বড় আর বেরয় না। এ ঘরে সে থাকে একাই, কেউ বড় একটা আসে না। হঠাৎ পর্দা সরিয়ে বীণাকে প্রবেশ করতে দেখে প্রশান্ত একেবারে অবাক হয়ে গেল। সব বোতল ও গ্লাসটি সামনে নিয়ে বসেছে, এমন সময় বীণা? একি সত্যিই বীণা? না বীণার প্রোতাত্মা? বীণার পা টোলছে, চোখের ঐ মস্ত চাহনী। যে প্রশান্তের বড় চেনা! বীণাও কি তা' হ'লে মাতাল হয়েছে? বুক কাঁপে।

এ কী দৃশ্য দেখছে সে, এ কি সত্যি? না স্বপ্ন? বীণা এই? টোলতে টোলতে এসে বীণা বোসল প্রশান্তর পাশে। সারা গা শিউরে উঠল প্রশান্তর। টানা টানা স্বরে বলল বীণা—“এত স্বার্থপর কেন? আমারও কি তেঁটা পায় না? এক গ্লাস না হয় আমায় দিলে, বোতল বোতল ত' নিজে ওড়াচ্ছ, আমার বেলায় কেন এত কৃপণতা—” “পাগল হয়েছ নাকি বীণা, এ সব কী বলছ? উঠে যাও এখান থেকে—” বীণা সেই রকমই টানা-টানা স্বরে বলে চলল—“তুমি বেশ ত? আমি না তোমার স্ত্রী? তোমার সহধর্মিণী? যদি তোমায় আমি আমার কাছে তুলতে পারলুম না, তবে আমিই তোমার কাছে যাব। যতদূর তুমি নামবে, আমিও নামব। যে নরকে তুমি স্থান পাবে সে নরকে আমারও যায়গা করে নেব—” প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে বীণা ছিটকে গিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড বড় গ্র্যাণ্ড পিয়নোটার উপর।

যখন জ্ঞান হ'ল তখন বীণা দেখে সে বিছানায় শুয়ে। সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ। ভসম্ভ যন্ত্রণা। পাশ ফেরা যায় না।—চোখ খুলতেও আসে ক্লান্তি। কতদিন এইভাবে যে তার কেটেছে সে জানে না। বাইরের সঙ্গে যেন তার সব যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে পড়ে মার কথা। কার স্নেহ-পূরণ সে যেন মাঝে মাঝে অনুভব করে। মা'র কি? কে জানে? হবে তাই! মা ছাড়া তার আর কে আছে? মাকে কতদিন যে দেখে নি। ঐ যে কত স্নেহ ভরে কে তার মাখাটা

তুলে কি একটা খাইয়ে দিল? চোখ খুলে চাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু চোখের পাতা তোলবার মত ক্ষমতা নেই তার। দিন যায় চলে, একটু সুস্থ হয়েছে সে। নার্স এসে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে গেল। ভাবে মনে বীণা ভাড়া করা নার্সেরই যত্ন পাচ্ছিল যে এতদিন। শাণ্ডি এসে বসলেন কাছে, বল্লেন—“ছেলের আমার সব উল্টো। যতদিন তুমি অঘোর অচেতন হয়ে পড়ে ছিলে, দিবা-রাত্র সে একাই তোমার সেবা করলে, এখন-যখন একটু সেরেছ, এখনই সে বলে পাশ করা নার্স না হ'লে তোমার ঠিক যত্ন হ'বে না; নার্সের হাতে তোমায় তুলে দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকেছে; আর এ দিকও মাড়ায় না—”

শুয়ে শুয়ে বীণা ভাবে প্রশান্তর কথা। কত আশা নিয়ে সে আরম্ভ করেছিল তার বিবাহিত জীবন। প্রশান্তকে কেন্দ্র করে কত স্বপ্নই না সে করেছিল রচনা। প্রজাপতির ডানার মত কত রং দিয়ে না সে সাজিয়েছিল তার ভবিষ্যৎকে। প্রজাপতির ডানারই মত সইল না। সংসারের আসন পেতে না পেতে সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে কোথায় গেল উড়ে।

শাণ্ডি এসে বল্লেন একদিন—“আচ্ছা বোমা, একবার কি প্রশান্তকে ডেকে পাঠাতে নেই? তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তা'ত শোধ দিয়েছে প্রাণপণ সেবা করে। ডাক্তাররা ত সঙ্কট বল্লেন, প্রশান্তর গুপ্তকার গুণেই তুমি এতদূর বেঁচে উঠেছ। এখনও কি তার উপর রাগ করে থাকবে। বাছার আমার কি চেহারা হয়েছে। খাওয়া দাওয়া ত সে এক রকম ত্যাগই করেছে, বিছানার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সারা রাত কেবল বাঁরাণ্ডায় পায়চারী করে কাটায়। এ ভাবে চললে কতদিন টিকবে। মান অভিমানেরও ত একটা সীমা আছে? শাণ্ডির কথা শুনে বীণা হাসে মনে মনে। অভিমান করে আছে সে! কার উপর অভিমান করবে সে? তার অভিমানের মর্যাদা রাখবে কি প্রশান্ত? মা একদিন দেখতে এসে বল্লেন বীণাকে, তুই ত বাছা মা কালীর দয়ায় এক রকম সেরে উঠেছিস কিন্তু জামাইয়ের কি হবে? ওর দিকে ত আর চাওয়া যায় না, দেখলে ভয় হয়, সেরে উঠতে না উঠতেই যদি হাতের নোয়া খোয়াতে হয় তা হলে সেরে উঠলি কি করতে—অনেক কষ্টে মার মুখ থেকে এ কথা গুল বেরুল। বীণা আর স্থির থাকতে পারলে না। ডেকে পাঠাল প্রশান্তকে।

প্রশান্ত এসে বসল দূরে একখানা চেয়ার নিয়ে। তাকে

দেখে বীণার চোখে জল এল। কী স্নান, কী করণ চেহারা বসে বীণা—“মা বলছিলেন তুমি নাকি রাতে না ঘুমিয়ে বারাতায় পায়চারী কর, এমন করলে শরীর টিকবে না ত?” বীর ভাবে প্রশান্ত উত্তর দিল—“চোখ বুজতে পারি না”—

“কেন?”

পূর্বেরই মত শান্ত ভাবে প্রশান্ত বসে—“চোখ বুজলেই তোমার সেই চেহারা চোখের উপর ভেসে ওঠে—যতদিন এ রিভীষিকা কেটে না যাবে ততদিন ঘুমতে পারব না”—একটু হেসে বসে বীণা—“ও সব বাজে কথা। আমার চিকিৎসাতে অনেক পরমা খরচ হয়েছে তাই বোধ হয় পানীয়ের অভাব হয়েছে”—হাত থেকে একটা সোনার বাংলা খুলে প্রশান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বসে—“এই নাও বাংলাটা। মদ আনিবে

খাও, ঘুম হবে।” গভীর ভাবে প্রশান্ত উত্তর করল—“মদ আর আমি খাই না। তোমার মত মেয়েকে মাতলামী করতে দেখে মদের নেশা চিরদিনের জন্তে ছুটে গিয়েছে।” একটু চুপ করে থেকে বীণা বসে—“অতদূরে বোসে আছ কেন? একটু কাছে এসে বসলে ক্ষতি হবে না। অন্ততঃ এখন ত আমি মাতাল নই”—প্রশান্ত তখনও উঠলনা দেখে বীণা বসে—“সত্যি বলছি, তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকারী কথা আছে, একেবারে কানে কানে ছাড়া এ কথা বোলতে পারব না, ইয়া, এইবার আমার হাতটা ধর তা হলে বলতে সাহস পাব”—একটু হেসে বীণা বসে—“সব চেষ্টা যখন আমার বিফল হ’ল কিছুতেই যখন তোমাকে ফেরাতে পারলুম না তখন আমার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলুম। সেদিন আমি মাতাল হইনি, মাতলামীর অভিনয় করেছিলুম মাত্র।”

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ্চন্দ্র ঘোষ

ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তিধারিণী ছাত্রী

মিস্ জোসেফাইন ঘোষ বি-এ ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাঙ্গালায় বি-এ পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বর পাইয়া “হার্ভারিসা” রোপ্য পদক পাইয়াছেন।

মিস্ আত্ময়ার খায়তুন, বি-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ পাইয়াছেন।

শ্রীমতী শান্তি বসু দর্শনে প্রথম শ্রেণীর প্রথম এবং শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় হইয়া ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি-এ পাশ করিয়া পুরস্কৃত হইয়াছেন।

মহিলা পি-এচ-ডি

আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা কুমারী সুরমা মিত্র এম-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এচ-ডি ডিগ্রী পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন গুনিয়া আমরা পরম আনন্দিত। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিনি প্রথম মহিলা ডক্টরেট উপাধি লাভ করিলেন। ইতি পূর্বে ডাঃ প্রভাবতী দাস গুপ্ত, ডাঃ

ফুলরেণু দত্ত, ডাঃ রমা বসু সকলেই বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী-বিমলা শিতলভেদু ও বিশ্বভারতীতে দান

বোম্বাই সহরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “চণ্ডালিকা” আশ্রমিকা সম্বন্ধে সভারা শ্রীমতী বিমলা শিতলভেদের উদ্যোগে অভিনয় করিয়া যে অর্থ-সংগ্রহ করেন তাহার মধ্যে ৪৫০০/- বিশ্ব-ভারতীতে দান করিয়াছেন।

প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনের মহিলা বিভাগ

বর্তমান বর্ষে ঊনবিংশ সাহিত্য সম্মেলন কানীতে হইবে। ইহার মহিলা বিভাগের সভানেত্রী হইবেন শ্রীমতী নিরুপমা দেবী। মহিলা বিভাগের অভিযর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী ও সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রমোদবালা সেন ও সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বকৃতি সাত্তেল—সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসাধিকা। মহিলা-শাখাটা সম্পূর্ণ সফল হইবে আশা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন, তাই এবার রবীন্দ্র-আলোচনা একদিন হইবে, তাহার সভাপতি শ্রীক্ষিতীমোহন সেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ভাদ্র সংখ্যা বঙ্গলক্ষ্মীতে ভ্রমক্রমে ৬শুরুসদয় দত্ত মেমোরিয়েল ফাণ্ডে শ্রীযুক্ত জে, পি, আগরওয়ালার দান ১০১ টাকা ছাপা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীযুক্ত জে, পি, আগরওয়ালার মহাশয় পাঁচ শত এক টাকা এই ফাণ্ডে দান করিয়াছেন।

তাহার এই দানের জন্য সমিতি তাহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

পুস্তক পরিচয়

বাঙ্গলা সাহিত্যের ভূমিকা—

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্তী এণ্ড চ্যাটার্জি, ১৫ কলেজ স্কোয়ার। পৃষ্ঠা ২৮৬, মূল্য—২। পুস্তকখানি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীত।

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—শান্তি-নিকেতনে তিনি যখন শিক্ষক ছিলেন সেই সময় রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে বাঙ্গলা সাহিত্যের এই পরিচয় পুস্তকখানি লিখিবার আয়োজন করেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা অতি সরল ও সংক্ষেপে গ্রন্থকার-বোদ্ধগান ও দোঁহা যুগ হইতে রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। নন্দবাবু বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনার পূর্ব পূর্ব সমালোচকদের ঐতিহাসিক কাঠামো অনুসরণ করিলেও তিনি নির্ভীক ও সরলভাবে বঙ্গ সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রায় চল্লিশখানি খ্যাতনামা সমালোচন প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ ও অবলম্বন করিয়া নন্দবাবু এই বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনার একটি ভূমিকা খাড়া করিয়াছেন।

গ্রন্থকার কুন্তিবাস-কাশীরাম, মঙ্গলকাব্য, ময়মন সিংহ গীতিকা, বৈষ্ণব কাব্য, গ্রাম্যছড়া ও লৌকিক গীত সাহিত্য সম্বন্ধে যে সমালোচনা ও মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সকল সময় গ্রহণীয় না হইলেও অনেকটা সত্যেরই স্বাক্ষর দিয়াছেন। গ্রাম্যছড়া ও বাড়িলের যে স্ততিবাদ করিয়াছেন এবং তাহাদের সংগ্রহ ও সংরক্ষার জন্য যে আবেদন করিয়াছেন সে বিষয় সাহিত্যাত্মরাসী মাত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

ঈশ্বর গুপ্তের আমল হইতে রবীন্দ্ররোত্তর যুগের সাহিত্যকে কাব্য, গান, নাটক, গদ্য, সাময়িক পত্র, উপন্যাস, গল্প, শিশু-সাহিত্য বিভাগ করিয়া তাহাদের গতি, ক্রমোবিকাশ, সমাজের স্থান, সাহিত্যে গতি, ভাবধারা সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের ধারা কিছু খোঁজ করিতে চাহিবেন এই পুস্তকখানি তাঁহাদের পক্ষে উপাদেয় পুস্তক বা গাইড বুরূপে ব্যবহৃত হইবে।

না হ'লে চলে না

আজকের মহাযুদ্ধে অসামরিক জনসাধারণের মনের উপরও চাপ পড়েছে নিত্যান্ত কম নয়। সবত্রই এই যুদ্ধের দিনে মানুষের উদ্বিগ্ন মনকে শান্ত ও উত্তেজিত রাখাকে স্বাভাবিক রাখতে চা যা করছে তাঁর তুলনা নেই। ব্রিটেনের খাণ্ড বিভাগের প্রধান মন্ত্রী লর্ড উল্টন রাধা হয়ে প্রত্যেক ইংরেজের জন্য চায়ের একটা নির্দিষ্ট বরাদ্দ বেঁধে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনিই আবার চাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন এই বলে' যে ব্রিটেনে চা-কে কেবলমাত্র একটা পানীয় বলে' গণ্য করা উচিত নয়, কেননা চায়ের মূল্য তাঁর চেয়ে ঢের বেশি। লর্ড উল্টন আরও বলেছেন যে চা যে কেবল শরীরকে উষ্ণ করে' তোলে' তা নয়, মনের উপরও চায়ের ক্রিয়া অসাধারণ।

একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

“সম্প্রতি ক্লাইডসাইড জেলার উপর এক প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের পর একজন ওয়ার্ডেন দেখতে পেল যে, ছুটো বাড়ির মালিকানাধার একটা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ছুটো বাড়ির একটার তো চিহ্ন মাত্রও ছিলো না।

আরেকটারও ছাত উড়ে গিয়েছিলো, দেয়ালও অবশিষ্ট ছিলো সামান্যই। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সেই বাড়ির তেতলায় উঠে ওয়ার্ডেনটি দেখতে পেল যে যেখানটার আগে জানালা ছিলো সেখানে দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড এক ফুটো হয়ে গিয়েছে আর তার ফাঁক দিয়ে একজন বৃদ্ধা মহিলা একটা লেপ ঝাড়ছেন।

“এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মানুষ দেখতে পেয়ে ধারণারনাই আশ্চর্য হয়ে ওয়ার্ডেনটি মহিলাকে বলল : ‘এখানে আশুনা জ্বলছে!’ মহিলাটি জবাব দিলেন : ‘সে আমি জানি ; আমিই আশুনা জ্বেলছি।’

“ঘরের ভিতর ঢুকে ওয়ার্ডেনটি দেখতে পেলো উত্তনের উপর চায়ের জল ফুটছে আর উত্তনের পাশেই টী-পট গরম হচ্ছে।

বৃদ্ধা মহিলাটি ভাঙা বাড়ি থেকে জিনিষপত্র সরাবার জন্য এসে, বাড়ি ভাঙা টুকরো কাঠকুটো দিয়ে উত্তন ধরিয়েছেন, আর তারপরেই তৈরী করতে বসেছেন চা—যা না হলে আজ আর চলে না—।



— সরোজনলিনী দত্ত





সম্মুখপানে নব যুগ আজি মেলুক উদার চিত্র
অমৃতলোকের দ্বার খুলে দিন চিরজীবনের মিত্র ।

বিশ্বের পথে আসিয়াছে ডাক
যাত্রীরা সবে যাক্ ধৈর্যে যাক্,
দেহ মন হতে হোক্ অপগত অবদাদ অপবিত্র ॥
রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গলক্ষ্মী

মাঘ,

১৩৪৮ সাল, ৩য় সংখ্যা

সরোজনলিনী-গুরুসদয় স্মৃতিসংখ্যা

যুগল

এক বৃক্ষে দুই পাখী সাক্ষী একজন
কালচক্রে ঘুরে মরে তার অগ্ন জন ।
মিলনে মিলিত তারা নাহি হয় কভু
একজন দাস যেন অগ্ন জন প্রভু ।
এ নহে প্রেমের রীতি, এ নহে আনন্দ
অনন্ত রসের সিদ্ধ মন্থনের ছন্দ ।

প্রীতি যার অবিচ্ছিন্ন, প্রেম সুগভীর
অনন্ত মিলনে প্রাণ পূর্ণ চির স্থির ;
মূহূর্ত্তের তরে যাহে না রহে ভ্রষ্টতা
আপনাতে যুক্ত যার আপন পূর্ণতা ;
যদিও সে মর্ত্য্যদেহে মৃত্যুর অধীন
উর্দ্ধলোকে বাজে তার আনন্দের বীণ !

যদিও একাকী সে যে তবুও যুগল,
এ রহস্তে সৃষ্টি নিত্য আনন্দ-চঞ্চল !

সীতা-সাবিত্রীর দেশের মেয়ে আমরা—
আমাদের দেশের মেয়েদের চরিত্র
এমন হওয়া উচিত যে অত দেশের
মেয়েরা তার অনুকরণ করে ।

—সরোজনলিনী

তুমি অমর

— গুরুসদয় দত্ত

ওগো সুন্দর ওগো সুমধুর
ওগো সুশোভনতার চরমা
মধু-বসন্ত বাসর সনে গো
করিব কি তব উপমা !
কমনীয়তর অকঠোরতর
তব সুবিমল সুধমা !
হয় ফাল্গুনেও কভু কোমল প্রসূন
নিষ্ঠুর ঝটিকা তাড়িত
অন্নায়ু শাপে মধু ঋতু হায়
হয়ে যায় আশু ক্ষয়িত ;—
কখনো বা জ্বলে রক্তিম তাপে
মরীচিমালীর নয়ন
কনক-কাস্তি কখনো বা তার
ঘন বিমলিন বরণ ;
তবে আছে যত আর সুন্দর তার।
স্বভাব চপল নিয়মে
দৈব বশে বা হয় গো মলিন
মাধুরী হীনতা সরমে ।
(কভু) হবে না ত ম্লান প্রভা গো
হবে না লুপ্ত কভু ত তোমার
দিব্য মাধুরী শোভা গো
তুমি অমর গো তুমি অমর
চির সুন্দর চির মধুর !
তব অধিকার আশে নারিবে মৃত্যু
গর্ব করিতে হাসিয়া
জাগি অনন্ত ছন্দে তুমি গো
রবে যুগ যুগ ব্যাপিয়া
শ্বাস যতদিন লইবে মানব
চক্ষু পাইবে দেখিতে
ততকাল ভরি রবে এ কবিতা
তোমাতে অমর করিতে !
তুমি অমর গো তুমি অমর
চির সুন্দর চির মধুর ।

গণ্ডীর মধ্যে থেকেই আমরা উন্নতি
করতে পারি—কিন্তু আজকাল শুধু
গণ্ডীর মধ্যে থাকলেই চলবে না—
দিনকাল বদলাচ্ছে ।
—সরোজনলিনী

দারজিলিংয়ে গুরুসদয়

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

“জীবনে কে রাখিতে পারে,
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।”

বেলা দ্বি-প্রহর। বর্ষার আকাশ মুখ ভার ক’রে আছে। কিছুক্ষণ পূর্বে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে আবার নতুন ক’রে মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, প্রস্তুত হচ্ছে বর্ষণের জন্তে।

ঘরের জানালার শাশিতে এসে থাকা দিচ্ছে জোলো হাওয়া, আর স্পর্শ দিচ্ছে ঘন কুয়াশা। বাইরে আবছা দেখা যাচ্ছে দূরের ঘর, আর ঘন সবুজ পাহাড়ের গা। গা বেয়ে নেমেছে আঁকা বাঁকা রাস্তা আর তার সঙ্গে পাশা দিয়ে রোপওয়ার তার।

নাক-চ্যাপটা ছেলের প্রত্যেক দিনের মত আমার সামনের টেবিলের ওপর সে-দিনকার খবরের কাগজখানা রেখে চলে গেল এবং আমিও প্রাত্যহিক কার্যাহুচী অনুযায়ী তুলে নিলাম সে কাগজখানি। হেড্ লাইনের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে চলেছি, প্রতীচ্য সভ্যতার গৌরবময় ইতিহাস রচিত হচ্ছে যে কাহিনী নিয়ে তাদেরই মর্যাদা বেশী করে দিচ্ছেন আমাদের সাংবাদিকেরা। সেগুলি পেরিয়ে চোখ যেখানে গিয়ে কণ-কালের জন্ত ধমকে দাঁড়ায়, সে-টি হয় বাজার-দর, না-হয় মোহনবাগান বনাম মহমেডান।

যাক্ সমস্ত বাধার obstacle race শেষ করে আমার শ্রান্ত দৃষ্টি কাগজের যে স্থানটিতে এসে সহসা ধমকে দাঁড়াল সে স্থানটি যদি আমার দৃষ্টি পথে পূর্বে এসে দাঁড়াতো তাহলে আর মহাবৃষ্টির হেড্ লাইনগুলো চোখে প’ড়তো না, কারণ চোখ হয়ে উঠতে ঝাপসা, যেমন হয়ে উঠল তখন।

বিখ্যাস ক’রতেই ইচ্ছে হয় না যে শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দেহ-রক্ষা করেছেন। দেহ না ব’লে বোধহয় বলা উচিত তত্ত্ব। অত বয়সে দেহের অত কমনীয়তা কমই চোখে পড়ে।

শ্রদ্ধেয় আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিলেন, স্বর-লোকের আহ্বান ত’ উপেক্ষা করতে পারেন না। সেখানে হয়ত আছে তাঁর প্রয়োজন। বৃহত্তর কর্তব্য।

মনে হ’ল, একটি অতি প্রিয়জনকে হারালুম আমি, তুমি, এ, ও, সে, আমরা সবাই। অবসান হ’ল একটি গৌরবময়, কর্মময় জীবনের, সে জীবন মিলিয়ে রয়েছে শত শত জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে।

মনে হল দেশ হারাল তার পরমপ্রিয় কর্মযোগী সন্তানকে, আত্মভোলা সন্ন্যাসীকে, রূপদক্ষ শিল্পীকে।

মনে হ’ল, এই সুদূর দুর্জয়লিঙ্গেও তিনি রেখে গেছেন তাঁর পদচিহ্ন যে পদে তিনি প্রদক্ষিণ ক’রে এসেছেন সারা পৃথিবী, যে পদে জেগে উঠেছিল নটরাজের নৃত্যমাধুর্য্য, এ আমাদের কত গর্ব !

ধীরে ধীরে চোখের সমুখে ভেসে উঠল অতীতের টুকরো টুকরো কয়েকটি খণ্ডচিত্র। চোখের উপর ভেসে উঠলো সেই স্থান স্বন্দর মূর্তি, যেন ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে পাহাড়ের আঁকা বাঁকা রাস্তা বেয়ে অবলৌলিক্রমে নেমে আসছেন, কি প্রচুর প্রাণশক্তি।

সে দিনটির কথা মনে প’ড়ছে স্পষ্ট; কয়েক বছর আগেকার কথা, স্থানীয় নৃপেশ নারায়ণ হিন্দু পাব্লিক হলে তিনি ব্রতচারী সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহযোগে বক্তৃতা করবেন। বহু লোকের জনশ্রোতে ভাসতে ভাসতে আমিও সেখানে যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছলুম। বহু দেশের বহু ভাষাভাষী নরনারীর জনতা। শ্রদ্ধেয় ব’সে আছেন মঞ্চের উপরে। বক্তৃতা শুরু হ’ল। উদ্বাস্ত কণ্ঠের বক্তৃতার সঙ্গে তাঁর নৃত্য; সে এক অদ্বতপূর্ব উদ্ভাদনার সৃষ্টি ক’বলে, যার মাদকতায় অভিভূত হয়ে বহু বৃদ্ধও দাড়ির পতাকা উড়িয়ে মঞ্চের কাছে পাঠকতে শুরু করলেন। তারপর সমবেত জঃ সোঃ ভাঃ সঙ্গীতে—হলের

সিলিংয়ে তার প্রতিধ্বনি বিস্তার করলো। বক্তৃতা শেষ হ'ল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে বাইরে চলে গেলেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, সে মুখও যেন আমার দৃষ্টির বাহিরে চ'লে গেল, দেখলুম সমস্ত হলটিতে প্রাণীমাত্র একজন, সে আমিই।

তারপর কিছুদিন সে কি উৎসাহ! স্থলে স্থলে ব্রতচারী ব্রত গ্রহণ করার ধুম লেগে গেল, স্থলের বাইরেও সজ্ব গঠনের চললো প্রচেষ্টা।

তারপর আমাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের গুণে সে উৎসাহের নদীতে এল ভাঁটা।

কিন্তু তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। যত বারই তিনি এসেছেন এখানে কি চেজে কি সরকারের কাষ নিয়ে কোনদিনও ভোলে ননি তাঁর ব্রতকে। নেপালী, টিবেটান, সিকিমিস, বাঙালী, অ-বাঙালী, ধনী, দরিদ্র সর্বজাতীয়তার সর্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশ'তেন প্রাণ খুলে, প্রচার ক'তেন ব্রতচারীর মহিমা, রাইবেশের গৌরব, অঃ সোঃ ভাঃ প্রাণশক্তি। কাষ যে হয় নি তা বলতে পারি না। এই ত সে দিন বোধ হয় মাস দুই হবে, স্থানীয় নেপালী এবং টিবেটান বিদ্যালয়ের ছেলেরা মাস'ড্রীল প্রভৃতি কতকগুলি শরীর চর্চার খেলা আমাদের দেখালেন, তার মধ্যে কয়েকটি মাদল সহযোগে নৃত্যও দেখলুম বাতে রয়েছে রাইবেশের প্রতিবিম্ব। দেখে বড় অনন্দ হয়েছিল, মনে হয়েছিল শ্রদ্ধাঙ্গদের ব্রত অনেকটা সফল হয়েছে।

তারপর তাঁরি চেষ্টায় তাঁর সরোজনলিনী অ্যাসোসিয়েশনের অনুকরণে এখানেও একটি বাঙালী মহিলাদের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সমিতিতে কাষও হয়েছিল কিছুদিন ভালই। কিন্তু চুঃখের ফিরিস্তিতে আর একটি সংখ্যা বোগ ক'রে এ-সমিতিও গেল উঠে। তবে আনন্দের বিষয় এই যে এই সমিতিক অনুসরণ করে অন্ত সম্প্রদায়ের মহিলারা পরে যে সব সমিতি গঠন করেছিলেন সেগুলির অনেকগুলি আছে এখনও বেঁচে। খানিকটা সাস্থনা বৈ কি।

সবচেয়ে যে জিনিসটি ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে প্রগাঢ় আন্তরিকতা এবং অকৃত্রিমতা, কি কার্যে, কি বাক্যে, সর্ব বিষয়ে। লোকের নিন্দাকে গ্রাহ্য ক'রতেন না, সত্যকে

প্রকাশ করতে পেতেন না ভয়। দেখেছি, বহু জনাকীর্ণ চৌরাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি নৃত্যের ভঙ্গীতে হাতের এবং পায়ের তড়নায় রাইবেশের মহিমা বিবৃত করছেন তাঁর পরিচিত কোন ভ্রলোককে, পাশ দিয়ে কত রাজা মহারাজা কত উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার চ'লে যাচ্ছেন, তাঁর গ্রাহ্যই নেই। পাগল বলবে? বলুক। এইভাবে।

তিনি যেন আমাদের দার্জিলিং প্রবাসী বাঙালীদেরই ছিলেন একজন। কতবার এসেছেন, কতবার তাঁকে দেখেছি। কি নিরহঙ্কার, সদানন্দময় মূর্তি। চোখের দৃষ্টিতে ছিল কি আকর্ষণ শক্তি। একবার যে তাঁকে দেখেছি সে কখনও তাঁকে ভুলতে পারবে না। তাঁর দৃষ্টি ছিল শিল্পীর। কতদিন তাঁকে দেখেছি মাউন্ট প্লেস্যান্ট রোডের curiosর দোকানে দাঁড়িয়ে হাতে হস্ত একটি প্রাচীন তাম্র-বুদ্ধমূর্তি, মুগ্ধনেত্রে মাটির দিকে চেয়ে আছেন। হস্ত কোন নেপালী বিচিত্র নক্সা খচিত কাংস পাত্রের দিকে চেয়ে আছেন, বা দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে টিবেটান চিত্রপটের উপর। রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে আকাশের বিচিত্র বর্ণসমারোহের দিকে চেয়ে আছেন, এও দেখেছি।

আর একটি কথা না বললে আমার এ বলা অসম্পূর্ণ থেকে বাবে। সে-টি হচ্ছে তাঁর দেশভক্তি। তাঁর মহত্তর দেশ-প্রেমের উৎসমুখ ছিল তাঁর জন্মভূমি শ্রীহট্ট। তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এই শ্রীহট্টকে, এবং শ্রীহট্টের সন্তানবর্গকে। ছোট একটি দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারবেন তার সত্যতা। তিনি যখনই দারজিলিংয়ে আসতেন, অতবড় উচ্চপদস্থ মানী শ্রী জ্ঞানী ব্যক্তি হয়েও নিজে খোঁজ ক'রে প্রত্যেকটি দারজিলিং প্রবাসী শ্রী ট্ট সন্তানের, যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই সামান্ত কেরাণী তাঁদের সংসারের সুখস্বখের অংশ গ্রহণ ক'রতেন এবং দারজিলিংয়ের বাইরে থেকেও পত্রাদি দিয়ে এঁদের খবর রাখতেন। এত দরদী ছিল তাঁর হৃদয়।

মনে হচ্ছে, আর কদিন পরেই ত স্নান হবে এখানকার মরুম। কত রাজা আসবেন, কত মহারাজা, কত অফিসার কত স্বাস্থ্যদেষ্টী। ভীড় ক'রে দল বেঁধে ঘুরে-বেড়াবেন অপরাহ্নের স্তিমিত আলোকে চৌরাস্তার চত্বরে, কিন্তু সেখানে আর আমরা দেখতে পাবনা সেই অতি পরিচিত প্রিয়জনের সদানন্দময় মূর্তি। আপশায় হয় না ক?

দক্ষিণ ভারতে গুরুসদয়ের অভিযান

(ত্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ)

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ভাষা সবই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কেবল ধর্মই এই দুইটা আর্ষ্য ও দ্রাবিড় বিভিন্ন সভ্যতার সম্মিলনের সেতু স্বরূপ রহিয়াছে। আর্ষ্য প্রভাব বিস্তারের অনেক অভিযান দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় দেশে হইয়াছে। সে সব প্রাচীন কথা ছাড়িয়া দিলেও বাদ্দলার অবদান দক্ষিণ ভারত সানন্দে ও সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। চৈতন্য মহাপ্রভুর অভিযান দক্ষিণ ভারতে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বহু প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও উপলব্ধি হয়। মাত্রাজ নগরে গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে বিরাট নবরত্ন গৌরীন্দ্র মন্দির জয়পুরের মহারাজার বদান্ততায় নির্মিত করিয়াছেন তাহাই বাদ্দলার বৈষ্ণব প্রভাবের বিজয় নিকেতনের স্বরূপ।

বর্তমান যুগের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা বাদ্দলার মহাপুরুষদের অবদান দক্ষিণ ভারতে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে। রাজা রামমোহনের নবযুগের বাণী দক্ষিণ ভারতবাসীকে বহুল পরিমাণে অল্পপ্রাণিত করিয়া থাকে। মাত্রাজ প্রদেশে এমন কি ত্রিবাক্সুর রাজ্যে ব্রাহ্মসমাজের নীতি ও আদর্শ সাগ্রহে প্রতিপালিত হইতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ মাত্রাজে যে নব চেতনার উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই সাধনায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতের নানা নগর ও পল্লীতে “রামকিশন মিশন” সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কত নরনারী সেবা করিতেছে। মাত্রাজ সহরের “ষ্টুডেন্টস্ হোম” বাদ্দালীর অপূর্বকীর্তি হইয়া রহিয়াছে।

মাত্র দেড় বৎসর পূর্বে সেইরূপে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বাদ্দলার এক অবদান দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া আসিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন এবং বাদ্দলারও সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তিনি ব্রতচারী তথ্য প্রকাশ করিতে মাত্রাজ, বাদ্দালোর, মহীশূর, ওয়ালেটায় গমন করিয়া তৎপ্রদেশ-বাসী নর-নারীর নিকট হইতে বিপুল সঞ্চয় পাইয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান মনীষীগণ গুরুসদয় দত্ত ও তাহার প্রবর্তিত ব্রতচারীর প্রশংসা ও সেই সব ব্রতচারী গণ-পদ্ধতি পালন করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

‘দক্ষিণ ভারত ব্রতচারী সঙ্ঘ’ নাম দিয়া একটা ব্রতচারী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহার সম্পাদক ও উদ্বোধক মাত্রাজের একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ এডভোকেট মিঃ জে, ক্যামাথ্। তাঁরারই চেষ্টায় ব্রতচারী শিক্ষা শিবিরও গুরুসদয়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। বাদ্দলার নিজস্ব পল্লী নৃত্য-গীত, পণ ও মানা মাত্রাজীদের শিখাইয়া ব্রতচারী নায়ক বাদ্দলাকে ধন্য করিয়াছেন।

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সেই সময় যে কয়েকটা দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট মনীষীর স্তুতিবাদ পাইয়াছিলেন সেই সব বাণী হইতে দক্ষিণ ভারতবাসীরা বাদ্দলার সংস্কৃতিকে কত শ্রদ্ধা করে তাহা বেশ উপলব্ধি হয়।

মাত্রাজ প্রদেশের অস্থায়ী গভর্ণর স্তর মহম্মদ উম্মান লিখিয়াছেন—‘যে সময় দেশে মহামিলনের ও একতার প্রয়োজনীয়তা সকলের কাম্য সেই সময়ই ব্রতচারী প্রচেষ্টাকে সাদরে সম্ভাষণ করি’—At a time like the present when the greatest need of the country is unity; the Bratchari Movement is most welcome.”

তদানীন্তন অজ্ঞ বিশ্ববিজ্ঞানব্দের ভাইস চ্যান্সেলার স্তর সর্দপল্লী রাধাকিষণ ঘোষণা করেন—মিঃ দত্ত এদেশে যে উৎসাহ ও অল্পপ্রেরণার বিকৃতি রাখিয়া গেলেন তাহা এ দেশের লোক সাগ্রহে গ্রহণ করিবে ও দেশোপযুক্ত করিয়াই ব্যবহার করিবে।—I have no doubt that the inspiring example which Mr. Dutt leaves behind will make others take up the movement and adopt it to local conditions.

কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী সি, রাজগোপালাচারী ব্রতচারীর
 গুণ তথ্য নিশ্চয়ই সকলকে অভিভূত করিবে মনে করেন।
 I am sure that the inherent merit of the
 thing will carry all before it.

মাদ্রাজ কাউন্সিলের সভাপতি বি, শাস্ত্রমুর্তি লিখিয়াছেন
 —“জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ এই পঞ্চ আদর্শে
 অনুপ্রাণিত প্রচেষ্টায় যোগদান করিলে দেশের যুবকদের
 পরম উপকার হইবে।

It would be an advantage to Indian
 youth if it joined such a dynamic move-
 ment based on the fivefold Ideals of know-
 ledge, Labour, Truth, Unity and Joy.

নিখিলবিশ্ব থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি—জি,
 এরূপডেল সাহেব লিখিয়াছেন—ব্রতচারী প্রচেষ্টা
 ভারতের সংস্কৃতি ও নৈন্দর্ঘ্যের উৎস ভূমি বঙ্গালারই
 উদ্ভাবিত অবদান, এই সংস্কৃতি প্রধান একটা জাতীয়তাব
 প্রকাশক।—Bratchari Movement is one of
 the great movement expressing India's
 national culture born in that home of cul-
 ture and beauty—Bengal.”

মাদ্রাজের মেওর সত্যমুর্তি আশা করেন ব্রতচারী
 দ্বারা মাদ্রাজবাসী উপকৃত হইবে।

বিখ্যাত সাহিত্য সেবী জি, এ নাটেশন লিখিয়াছেন—
 যুবকদের একটা আশ্চর্যজনক খাঁচা স্বদেশী শিক্ষা পদ্ধতি—
 মাদ্রাজ এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়া নিজের দেশেরই
 উপযোগী করিবে।

A wonderful indigenious system of
 training for the youth. I hope Madras
 will take up the movement and adopt it
 to local conditions.

আন্তর্জাতিক শ্রমিক নেতা ডি, গিরি বলেন—এই
 ব্রতচারী প্রচেষ্টা নিশ্চয় এ দেশের যুবকদের বিশ্বের প্রকৃত
 পৌরবাসীতে পরিণত করিবে।—This movement
 will certainly make the youth real
 citizens of the world.

হরিজন নেতা ডি, মুনিস্বামী, পিল্লাই এই ব্রতচারী
 অভিচেষ্টা গুলি যে হরিজনরাই জীবিত রাখিয়াছে ইহা
 দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন—I am glad the
 Harijan uphold a certain amount of the
 great culture of India.

দক্ষিণ ভারতে সর্বাধিক সংখ্যক মুদ্রিত সুবিখ্যাত
 ‘হিন্দু’ পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন—বঙ্গলার পল্লী-গীত
 ও নৃত্যগুলির উদাহরণ অনুলিপি করিয়া এবং নিজ প্রদেশ
 উপযোগী করিলে অন্যান্য প্রদেশও জাতীয় মহাঐক্যের
 পথে অগ্রসর করিতে পারিবে।—In copying the
 example of Bengal and adapting the own
 folk songs and folk dances to the training
 of their youth, the other Provinces would
 not only be helping themselves, but pro-
 moting the realisation of National unity.

প্রবীন সিভিলিয়ান এ, ডবলিউ, ডিকসন্স মাদ্রাজ-
 বাসীদের ব্রতচারী প্রচেষ্টাকে বখানাদ্য সমর্থন ও গ্রহণ
 করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন—I hope that the
 people of Madras will make a determind
 effort to support the Bratachari move-
 ment, because I am confident that it will
 do immense good.

শিক্ষাবিদ রামলিঙ্গ চেট্টয়ার বলেন—ব্রতচারীর ন্যায়
 প্রয়োজনীয় ও স্বদেশীয় বিদ্যা প্রতি স্কুল ও কলেজে শিক্ষা
 দেওয়া প্রয়োজন—Such a useful and indi-
 genious Art should be taught in our
 Schools and Colleges.

শোক-গাথা

শ্রীচুলীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের আকাশ হতে হলো একটা ইন্দ্রপাত ।
চলে গেলেন গুরুসদয়.....খবর এলো অকস্মাৎ ।
করুণ-স্বরে বাংলা জুড়ে উঠল একি হাহাকার ?
কোথায় গেলে.....ও গুরুজী ছেড়ে সোনার দেশ তোমার !
অন্তমিত পূর্ণচন্দ্র অন্ধকার নীলাকাশ ।
কে জানিত আজ আমাদের হবে এমন দর্শনাশ ?
পল্লী-বন্ধ 'গুরুসদয়' নিদ্রা হয়ে কোথায় গেলে ?
লক্ষ লক্ষ ব্রতচারীর বক্ষে শোকের আগুন জ্বলিলে ।
হৃদনেরই বন্ধ তুমি... দীন দুখীদের আশার স্থল ।
রোগে শোকে কে তাহাদের মুছিয়ে দেবে চোখের জল ?
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে কাঁদছে যত ব্রতচারী !
কোথায় গেলে হায় গুরুজী কোথায় গেলে মোদের ছাড়ি !
শিখিয়ে দিলে দেশকে তুমি কি করে হয় বাসতে ভালো ?
সবার প্রাণে জালিয়ে দিয়ে সেবা-ব্রতের নূতন আলো !
এখনও তো কচুরী পানি বাংলা হতে হয়নি শেষ ?
মালেরিয়া কালাজরে মরছে আজো তোমার দেশ ?
নিজের হাতে কোদাল লয়ে করবে কে দেশ পরিষ্কার ?
বুকভরা কার দরদ এত.....এমন ভালোবাসবে আর ?
হেসে গেয়ে হাসিয়ে দিলে.....কাজকে তুমি করলে খেলা ।
সেই তুমি আজ অমন করে কাঁদিয়ে গেলে যাবার বেলা ?
বাংলা দেশের সব চাষীদের ভাইয়ের মত বাসতে ভালো ।
দুঃখ-দিনের অন্ধকারে দেখিয়ে দিলে আশার আলো !
কণে কণেই মুখটি তোমার জেগে ওঠে মনের মাঝে ।
চোখ ফেটে জল পড়ছে যারে কোন বাঁধাই মানে না যে ।
তোমার চলে যাওয়ার সাথে ভেঙ্গে গেল সকল আশা ।
কেমন করে ভুলে গেলে হায় আমাদের ভালোবাসা !
অবোধ এক শিশুর মত মনে মনে তোমায় খুঁজি ।
কোথায় যেন লুকিয়ে আছে.....'ও গুরুজী ও গুরুজী' ।
তোমার মত আমরা যেন দেশের সেবা করতে পারি ।
সখে একে স্বাস্থ্যে জানে মনে প্রাণে ব্রতচারী ।
মৃত্যু তোমার মৃত্যু নয়তো.....মরেই প্রিয় অমর হলে ।
গন্ধ হয়ে ভরে রইলে মানস লোকে স্মৃতি-জলে ।
যাবার বেলা নিয়ে যাও এই হতভাগার প্রণাম পানি ।
আমার মাঝে ওঠে যেন মূর্ত হয়ে তোমার বাণী ।

স্মৃতি-গাথা

শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

মনীষা প্রতিভা-দীপ্ত জনপ্রিয় হে দম্পতী
জনহিতে করে গেছ আত্ম বলিদান,
পত্নী নারী-শিরোমণি, পতি ব্রতচারী-গুরু
—তোমাদেরি নামে আজ উঠে জয়গান।
এসেছিলে সেবাকার্যে অনিত্য সংসারে,
স্মৃতির ঘোষণা রেখে গেছ পরপারে।

কেন্দ্র-সমিতির কথা

বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিয়া
কেন্দ্র-সমিতির পরিচালক মণ্ডলী সরোজনলিনী দত্ত
নারীমঙ্গল-সমিতির বার্ষিক উৎসব সম্পাদিত শিল্প-
প্রদর্শনী, পুরস্কার-বিতরণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি
আপাততঃ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; মাত্র
স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত মহোদয়্যার সপ্তদশ বার্ষিক
মৃত্যুদিবস-উপলক্ষে আগামী ১৯শে জাম্বুয়ারী (১৯৪২)
প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকার সময়ে সমিতি-ভবনে (২৩১
বালীগঞ্জ স্টেশন রোড, বালীগঞ্জ) প্রার্থনা-সভা ও
বৈকাল ৫ ঘটিকার সপ্তদশ বার্ষিক স্মৃতি-সভার
অনুষ্ঠান হইবে।

আমি যদি ধরের কর্তব্যে অবহেলা
করি তবে সামাজিক কর্তব্য করবার
অধিকার লাভ হবে না।

—সরোজনলিনী

স্মরণে

শ্রীনির্মলনলিনী দে

শোভিতেছে মরি মরি মধুর মিলনে
মিলিত যুগল প্রাণ বিধাতা চরণে ;
দেবতার ফুল ছুঁটি
র'য়েছে চরণে ফুটি
অমরা করিয়া আলো সৌরভ কিরণে
এ মহা মিলনে নাহি বিচ্ছেদ মরণে
আত্মার নাটক লয় বলেছিলে মরণে
চিরদিন সেই বাণী জাগিবে যে স্মরণে
আজি তুমি সেই দেশে
জানাও বারতা এসে

সেথাকার সমাচার দাও এই ভুবনে
ব্যবধান নাহি রবে জীবনে ও মরণে
হে গুরু প্রণমী তব স্নেহকোমল চরণে।
মূর্ত্ত হইয়া মোর জাগো সদা স্মরণে
তুমি নাহি এই কথা
বলিতে বাজিবে বাখা

তব উপদেশ বাণী তুলিব না জীবনে
আছ তুমি আছ দেব শেষ নহে মরণে
দাও শক্তি দাও বল তব প্রিয় সন্তানে
পায় যেন নব বল ব্রতচারী সাধনে ;

তোমার আশীষ শিরে
গঠিয়া তুলিবে ধীরে
জগত সভায় নাম স্মরণের কিরণে
উজ্জল করিয়া রবে এ নিখিল ভুবনে।



— গুরুসদয় দাস

শৈশবে সদয় প্রথমে সাক্ষাৎ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

[বাবার বাংলা শিক্ষক তাঁহার বাংলা জীবনী সম্বন্ধে যে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহা ক্রমশঃ বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশিত হইবে—বীরেন্দ্রসদয়]

শরৎ কাল শেষ হইতে চলিয়াছে কিন্তু বর্ষার প্রচণ্ডতা তখনও কমে নাই। দেশ জলে ভাসিতেছে। গৃহস্থের হাংকায়ে সংসার নিনাদিত। এমনই দুর্দিনে আমি বীরশ্রী স্কুলের হেড্‌ মাস্টারি প্রাপ্ত হইলাম। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দুর্গোৎসবের মাত্র ২৬ দিন বাকি থাকিতে আমি বীরশ্রী পৌঁছেছি। তখন নদী, নালা, খাল, বিল সমস্ত জলে একাকার। নারায়ণগঞ্জ হইতে বালাগঞ্জ I G S N কোং মালের ষ্টিমারে ছয় দিন, বালাগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে শ্রীহট্ট সহরে একদিন এবং শ্রীহট্ট হইতে দেড় দিনে ডিঙ্গী নৌকায় বীরশ্রী পৌঁছিলাম। আমার নৌকা সেক্রেটারী মহাশয়ের গুদাম ঘাটে লাগিল। গুদাম ঘাট স্কুলের ঘাট একই ঘাট।

বুশিয়ারা বা বাঙালিয়া নদীর ডাইন পারে স্কুল ঘর আবানী জলে ডুবিয়া দণ্ডায়মান। সেক্রেটারী মহাশয়ের গুদাম ঘর জলে উলমল। হাপরে বসিয়া এ হেন গুদাম ঘরে সেক্রেটারী মহাশয়। দ্বিতীয় শিক্ষক রোহিণীবাবু স্কুলের চৌকীদার বেলারাম এবং দোকানের চাকর প্যারীরাম। ভাটিয়াল নৌকায় দেখিতেছেন এবং নানারূপ আলাপ-সলাপ করিতেছেন। এমন সময় আমার নৌকা ঘাটে পৌঁছিল।

এই দেড় দিনে আমি একটা কথাও কহিতে পারি নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলের সাধারণ লোকের ভাষা তখন আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না এবং তাহারাও আমার কথা বুঝিত না। সুতরাং নৌকার মাঝি আমার কথা না বুঝিতে পারিয়া যেমন ব্যাকুব হইয়াছিল আমিও তাহার কথা না বুঝিতে পারিয়া তেমনই বিপন্ন বোধ করিতেছিলাম। যাহা হউক এখন হাঁপ ছাড়িয়া প্রাণ বাঁচিল। অন্ততঃ কণোপকথনের বিভ্রমনাটা আর রহিল না।

বেলা অধিক হইয়াছিল তাই তথায় আর গোণ করা হইল না, সেক্রেটারী মহাশয় আমাকে লইয়া বাড়ী রওনা হইলেন। সঙ্গে রোহিণীবাবু ও বেলারাম চৌকীদারও চলিল। বরগুণী ও বাস্তবর চঞ্জিশ পঞ্চাশ হাত ব্যবধান।

অধিক বর্ষা হইলে পাড়াগায়ে নায়রী যাওয়ার খুব ধুম পড়িয়া যায়। নৌকা যোগে শ্রীলোকের কুটুম্বালম্বাওয়ার সুবিধাটা সাধারণতঃই অধিক। তাই প্রতিদিনই ছই একখানা নৌকা নায়রী লইয়া বর্ষার দিনে এ ঘাটে ও ঘাটে ঘুরিয়া

বেড়ায়। আমার নৌকা দেখিয়া সেক্রেটারী মহাশয়ের বাড়ীর লোকেরা নায়রী আসিয়াছে মনে করিয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিলেন কিন্তু তাঁহাদের ধারণা ঠিক হইল না। কুটুম্বের পরিবর্তে একেবারে অজ্ঞাত কুলশীল একটা অজ্ঞাত শব্দ যুবককে দেখিয়া তাঁহারা বিম্মিত হইয়া পড়িলেন এবং সেক্রেটারী মহাশয়ের ইঙ্গিতে ঘরে ফিরিয়া গেলেন। কেবল ফিরিল না ছইটি শিশু—একটা মেয়ে—একটা বালক। বালকটা উলঙ্গ করসা রং মুখে অন্ন অন্ন বসন্তের দাগ। আর মেয়েটাও করসা বটে তবে এলোকেশী উলঙ্গিনী নহে। ছইয়েরই বয়স অন্ন, দৃষ্টি সরলতা পূর্ণ স্থির, উভয়েই স্নন্দর।

মাঝি জিনিষ পত্র ঘরে তুলিয়া চলিয়া গেল, আমি স্নানাহার করিলাম। সন্ধ্যার পর প্রতিবেশী ভদ্দলোকগণ (শ্রীযুক্ত হরে কৃষ্ণ চৌধুরী) কুঞ্জ-কিশোর চৌধুরী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র পুর কায়েস্থ রাধাচরণ শর্মা, শ্রীযুক্ত কুঞ্জ-কিশোর চৌধুরী ও মনা ঠাকুর, সেক্রেটারী মহাশয়ের বাড়ীতে সমবেত হইলেন। হেড পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ দত্ত এবং দ্বিতীয় পণ্ডিত রোহিনীকুমার দাস মহাশয় ও উপস্থিত হইলেন। ইহারা উভয়েই ঢাকা জেলার লোক নানারূপ আলাপে অনেক রাত্রি কাটিয়া গেল; সেক্রেটারী মহাশয়ও মেসারগণ আমাকে সহানুভূতি সূচক অনেক কথা বলিলেন। বলিতে কি সেই মুহূর্ত্তে আমি বিদেশ বাসের সকল কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। এবং সেই দিন হইতেই যেন সম্পূর্ণ বিদেশী হইয়াও আমি সেক্রেটারী পরিবারের এক জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে স্কুলের কার্য গ্রহণ করিলাম। স্কুল হইতে লাগিল হরেকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে। ছাত্র সংখ্যা তখন মাত্র ৮ জন। ছই এক দিনের মধ্যে ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের অভিভাবকগণও আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। বেশ মাথামাখি ভাব। আজ কালের ছাত্র শিক্ষকের ছাড়া ছাড়া চলন তখন কাহারো মাথায় খেলিত না। আমি কখনই ছাত্রদিগকে পরের ছেলে মনে করি নাই। ছাত্রেরা ও আমাকে পিতা বই অন্ম জানে না। আজও তাহারা যে যেখানে আছে আমার নামে ভক্তি প্রদায় উদ্বেল হইয়া উঠে। আমিও তাহাদের স্মরণে দর্শনে মেগাধুত হইয়া পড়ি। আজ আমার এই দরিদ্র জীবনে কেবল সেই পূর্ব স্মৃতিই একমাত্র সুখের জিনিষ। (ক্রমশঃ)

কালের কোলে

(অস্তিমদিনের পূর্বরাত্রি)

মহানিশ্বেদের পদধ্বনি (রবীন্দ্রনাথ)

শোনা যাবে নিশিথ জগতে

রাত্রি গভীর—

বারোটা থেকে তিনটা—

চারিদিক নিস্তব্ধ,

ঘরের ভিতরেও শব্দ নাই এতটুকু ;

শুধু কালের কোলে শায়িত

মানব শিশু

শ্বাস ফেলছেন জোরে জোরে।

আশিপাশের ঘরের মানুষগুলি,—

কেউ অধীর উৎকণ্ঠায়, কেউ ভয় ভাবনায়

অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় বিছানায় পড়ে।

ডাক্তার জেগে শুয়ে ক্ষণ গুণ্ছেন—

পরক্ষণে এলো বুঝি ডাক

কোন খবর নিয়ে

ঘরের ভিতর ছপাশে দুইজন দাঁড়িয়ে—চেয়ে—

ভাবান্তর, অবস্থান্তর বুঝি বা ঘটে—

ভয়ে সংশয়ে !

মোড়া টেনে, টুল এনে

বসেনি তারা পাশ ঘেঁসে—

বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরা কপালখানি

দিচ্ছে মুছিয়ে ছোট একখানি তোয়ালে হাতে নিয়ে—

সোজা দাঁড়িয়ে।

অডিকোলনে ভিজান রুমাল দিয়ে মুছে দিল একজন
কপালখানি একবার।

মনে পড়ল অডিকোলনে ভালবাসতেন।

মনে পড়ল “ভাগ নিস্ তোরাও, আমাকে দিস একটু বেশী করে”

নিজের মুখের কথা।

তাপ-মাপা যন্ত্রে জ্বর মেপে

আস্বে, চাপা আঁওয়াজে একজন বলল—একশতিন

রক্তের চাপও বেড়েছে বেশ—

ভয়ের আর নাকী রইলো না কিছু

পূর্বদিনের রোগ-যন্ত্রনার আর্ন্তধ্বনি থেমে গেছে,—

প্রাণক্রিয়া চলছে শুধু শ্বাসের সঙ্গে,—

গলার আওয়াজটুকু

শুধু শোনা যায় ঘড় ঘড়।

বসে পড়তে হোলো ঘরে

পাথরের মেঝের ওপর;

মুহু আলোয় ঘরখানি ছাওয়া

পৃথিবীর প্রাণ-রাজ্যের

অন্তরতম স্তরটি যেন খুলে গেল

মানস চৈতন্যের সামনে।

কালের পদক্ষেপ স্পষ্ট শোনা গেল,—

ক্রম গতিতে কাল যেন পা ফেলে চলে আসছে

পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণের প্রবাহ বেয়ে।

গেল গেল—চলে গেল—

নিয়ে গেল

কাল তুলে নিল কোলে।

অন্তরতম ডাক এসে পৌঁছল

মা, নে মা কোলে নে।

কবির পত্র

বিশ্বভারতীর অনুমত্যানুসারে

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু :—

তুমি যে কি দুর্ব্যোগবশত কাশীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছ তার খবর পাইনি, আশা করি উদ্বেগের বিশেষ কারণ নেই। ত্রিলোচন একদা ক্রোধের অগ্নিতে অনঙ্গকে ভস্ম করেছিলেন, এবারে যে দহন তাতে আমাদের অঙ্গ টেকে না। এত গরম কোনও বৎসরে আমরা ভোগ করিনি।

তোমাদের নিমন্ত্রণে আমি যাবার বিশেষ চেষ্টা করব। বিশেষত যখন আহারাশ্তে দক্ষিণার আশা আছে তখন আমার উৎসাহের অভাব হবার কারণ দেখিনে। আমাকে ভূপাল এবং সিংহলে যেতে হবে, এই ছুটি কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারলেই আমার কাশীধামে যাত্রার কোন বিঘ্ন হবে না। তোমার ছাত্র সূর্যচন্দ্র চৌধুরীর পত্র পেয়েছি। এখন এখানে অধ্যাপক সমিতির অধিকাংশ লোকই অন্তঃপন্থিত বলে তাঁকে পাকা খবর দিতে পারচিনে। তাঁকে কৰ্মে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে আমার নিজের যথেষ্ট উৎসাহ আছে। constitution পত্রী রেজেষ্ট্রী হয়েছে, ছাপাতে গেছে। ছাপা হয়ে এলেই কয়েকখণ্ড তোমাকে নিশ্চয়ই পাঠান হবে। তুমি বিশ্ব-ভারতীর সহায়তাকল্পে চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছ জেনে আমি বড় আনন্দ বোধ করছি।

বঙ্গবাণীর অঙ্গ সম্পাদক বিজয় মজুমদার মহাশয় এবং আশুবারুর ছেলেরা আমার জামাতা নগেন্দ্রকে সহায়স্বরূপে নিয়ে শান্তিনিকেতনে চড়াও হয়ে বঙ্গবাণীর জন্তে লেখা আদায় করে নিয়ে গেছেন। এসব ঘটনা তুমি আসার অনেক পূর্বে, ভারতী ও প্রবাসীর সঙ্গে বহুকাল থেকে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। প্রবাসী আমাকে আমার সকল কাজে সকল প্রকারেই সহায়তা করেচেন—সেজন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাই বর্তমানে যখন আমার লেখার ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তখন দুই এক গণ্ডুষ যা অঙ্গলিতে ওঠে তা প্রবাসীতে না দিয়ে আমার থাকবার জো নেই। তার পরে ভারতীর সঙ্গে আমার নাতির সম্বন্ধ; ওর দাবী সাধ্যমত

কাটাবার জো নেই। তার পরে এই দুই ঘাট পার হয়ে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ভারতী নূতন বৎসরের জন্য একটি বড় গল্পের আশায় আমাকে অত্যন্ত জেদ করে ধরেছিল কিন্তু বড় গল্প লেখার মত সময় ও সুযোগ না থাকাতে মধ্যভাবে শুষ্ক দদ্যৎ করেছিলুম। কথিকার লেখাগুলি হাতে ছিল তার থেকে দুই মুষ্টি দিয়ে তার বিরটি ক্ষুধার কিঞ্চিৎ উপশমের চেষ্টা করেছি। হাতে যা কিছু ছিল সমস্তই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। এখন প্রবন্ধ-দায়গ্রন্থ সম্পাদকেরা আমার দ্বারে আনাগোনা করে কোন ফল পাচ্ছেন না। লেভি সাহেব এখনো নেপালে আছেন। বর্ষা নামলে আশাঢের মাঝামাঝি এখানে নেমে আসবেন। ইতি—৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু :—

আমাকে সভাপতি করতে চাও ত করো। সভা সম্বন্ধে আমি প্রায় কুলীনের ছেলের মতই হয়েছি; আমার বয়স যত বাড়তে সভার সংখ্যাও ততই বেড়ে চলেছে। সুবিধা হচ্চে কুলীন পতির মতই সভাপতির পতিত্বদায় অতি সামান্য কেবলমাত্র নামগোরব অর্পণ করা। আগামী বৎসরের Easter ছুটি বহু দূরে—এখন থেকে সেই দিনের জন্য সত্যবদ্ধ হতে সাহস হয় না। যদি সম্ভব হয় তবেই সম্ভব হবে এর বেশি কিছু বলতে পারিনে। ইতি—১৭ই ভাদ্র ১৩২২ *

তোমাদের—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*পত্রখানি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে কবি লিখিয়াছিলেন।

*প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই সম্মতি পত্রখানি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন।

যেতে নাহি দিব

ত্ৰিৱেণুকা আইচ

কবি ৰবীন্দ্ৰনাথৰ লেখা “যেতে নাহি দিব” কবিতাটো বত
বাৰই পড়ি তত বাৰই আমাৰ কাছে নতুন মনে হয়। কবিতাটি
পড়তে পড়তে চোখৰ সামনে ভেসে ওঠে ছোট গৃহস্থের
বাড়ীতে গৃহস্থামীর বিদায়ের আয়োজন, আর তার সাথে বিদায়
করণ ছ’ একখানি মুখ। বিশেষতঃ ছোট্ট একটি মেয়ের
করণ সজল চোখে ব্যথিত কণ্ঠের ছটা কথা “যেতে নাহি দিব।”
সামান্য ছ’টা কথা কিন্তু এরই মাঝে একটি অস্পষ্ট ভাব প্রচ্ছন্ন
রয়ে গেছে। এ জগতে সবাই চায় সবাইকে ধরে রাখতে।
ধরণীৰ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সেই জনাদি সুর
ধ্বনিত হচ্ছে “যেতে নাহি দিব।” জাধাৱের গ্রাম থেকে কে
যেন নির্বাণোন্মুখ শিখাটিকে ধরে রাখতে চায়। স্বর্গ, মর্ত্য
ছেয়ে সেই সব চেয়ে পুরাতন, সব চেয়ে গভীর ক্রন্দন ভরা
ছটা কথা “যেতে নাহি দিব।” তবু যেতে দিতে হয়। বিশ্বের
বক ক্রন্দনে মুখরিত করে দিয়ে সব চলে যায়। পিছনের ডাক
তার কাণে পৌঁছায় না। যেতে হবে, তাই বাঁধা বন্ধ হারা
হয়ে ছুটে চলে সম্মুখ পথে। যেত দেব না বললেই তাকে ধরে
রাখা যায় না। মৃত্যু তাকে টেনে নিয়ে যায়। স্নেহ, মায়া,
মমতা, প্রেম তাকে যেতে দিতে চায় না, সে মৃত্যুকে স্বীকার
করে না। তবু যেতে দিতে হয়। তবু আপনার স্নেহ অধিকার
নিয়ে প্রবল স্নেহভরা কণ্ঠে শুধু একবার বলে সেই পুরাতন
অতি সত্য ছটা মর্মান্তিক কথা। এই কবিতাটির ভিতর দিয়ে
কবি একটা সামান্য ঘটনার এই ভাবটা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই
ছটা কথা কত সত্য, পুরাতন আর কতখানি করুণ, কবি তাই
দেখিয়েছেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। ছয়টারে প্রস্তুত গাড়ি। দীর্ঘ পূজার
ছুটির পর আজ আবার গৃহস্থামী সেই পুরাতন কম ভূমিতে
কিঁয়ে যাবেন, তারই আয়োজন চলছে।

শুক দুপুর। হেমন্তের রোজ চারিদিকে ঝাঁঝ। ক’ছে।
ছ’ একটি কাকি শুধু ব্যর্থ আশায় গলা ভাজছে। ক্লান্ত বৃদ্ধ
ভিখারী জীর্ণ বসন খাটিতে পেতে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে
দিচ্ছে। চারদিকেই বিশ্রামের শান্ত সুর। শুধু বিশ্রাম
নেই এই বাড়ীটিতে। গৃহিণী নিপুন হস্তে প্রয়োজনীয় জিনিষ-
গোছাতে ব্যস্ত। শুধু ঘরের এক প্রান্তে গৃহস্থামীর চার
বৎসরের কন্যা স্নানমুখে বসে। সজল নয়নে নীরবে এই বিদায়
আয়োজন দেখছে। আর মাঝে মাঝে পিতার কাছে এসে
দাঁড়াচ্ছে। মুখে তার কথা নাই; সে শুধু নীরব, ভাষা হারা
এক রক্তির মেয়ে। যাবার সময় হলো। গৃহিণীর কাছ থেকে
বিদায় নিয়ে গৃহস্থামী কন্যাকে বললেন, “মা, আসি তবে।”
সে করুণ নয়নে একবার পিতার মুখের দিকে তাকাল, তারপর
বলল, “যেতে নাহি দিব।” তার রক্ত করল না। ছোট্ট ছটা
বাই দিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরল না। শুধু আপনার বুকভরা

স্নেহ নিয়ে একবার বলল, “যেতে নাহি দিব।” হায়রে অবোধ
মেয়ে, তবু তাকে যেতে দিতে হলো। গৃহস্থামী বিদায় নিলেন।

সামান্য একটা ঘটনা। কত কতাই তো পিতাকে বলে
“যেতে নাহি দিব।” কিন্তু কবি ৰবীন্দ্ৰনাথের মনে এ ছটা
কথাই কবির মনে ভাবান্তর এনে দেয়। কথা ছটার অন্তরালে
যেন পৃথিবীর চিরন্তন অশ্রু সজল মর্ম ব্যথাটি নিহিত রয়েছে।
গৃহস্থামীর একটি অতি সাধারণ ব্যথাকে অবলম্বন করে কবি
জগতের শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করেছেন। ৰবীন্দ্ৰ কাব্যের
ইহাই অমূল্য বৈশিষ্ট্য।

অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে যার আরম্ভ প্রায়ই দেখা যায়
কবির চিরকালের একটি ভাবের মধ্যে করেন তার পরিসমাপ্তি।
আলোচ্য কবিতাটিতেও আমরা তারই প্রমাণ পেয়েছি। স্ত্রী
কন্যাকে রেখে বাঙ্গালীর ছেলেকে তার কম স্থলে ফিরে যেতে
হয়। যাবার সময় স্ত্রী চোখের জল মোছেন, আবার কন্যা
স্নেহের দাবী জানিয়ে বলে “যেতে নাহি দিব।” এরূপ ঘটনা
তো প্রতিদিনই ঘটছে। এতে তো আশ্চর্য্য হবার কিছুই
নেই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সামান্য ঘটনার
অন্তরালে বিশ্বের যে করুণ নাট্যাভিনয় হয়ে গেল, কবি কেমন
সহজে তার মর্ম উদ্ঘাটন করেছেন। কবিতাটি পড়তে পড়তে
সেই যে দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, আর গৃহস্থামী যাত্রার উদ্যোগ
আয়োজন করতে ব্যস্ত সে সব কথা আমরা একেবারেই ভুলে
যাই। তখন আমাদের চিন্তে একটি মাত্র কণ্ঠের শব্দ পরম
মর্মান্তিক হয়ে জেগে ওঠে। সে সত্যটা হচ্ছে জগতের সব
কিছুকে চলে যেতে হয়। সব কিছুই চলে যাচ্ছে। মুহূর্তের
মধ্যে আমাদের মন বেদনার পরিপ্লুত হয়ে যায়, আমাদের আত্মীয়
আমাদের প্রিয়জন, যে যখনই এ জগত ছেড়ে চলে গেছে
সকলের স্মৃতিভারে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।
কিন্তু তখনই দৃষ্টি পড়ে অন্য দিকে। দেখতে পাই মৃত্যুর এই
নিষ্ঠুর আক্রমণের মধ্যে চিরস্থির হয়ে রয়েছে প্রেম। মৃত্যু
যাকে কেড়ে নিয়ে যায় প্রেম তাহাকে ধরে রাখে। প্রেম বলে—

“মৃত্যু তুমি নাই।”

তার এই অহঙ্কারের কথা শুনে মৃত্যু হেসে চলে যায়।
তবু প্রেম যুগে যুগে মৃত্যুকে স্বীকার করছে। মৃত্যুর আক্রমণে
সে বার বার আহত হয়েছে কিন্তু অভিভূত হয় নি।

এই পরম সান্ত্বনার বাণী, জগতে যদি মৃত্যুই চরম হত যদি
তার নিষ্ঠুর পদতলে প্রেমকে মাথা নোয়াতে হত, তাহলে ব্যর্থ
হয়ে যেত বিদ্যাতার এই সৃষ্টি। জগত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতো।
কিন্তু আমরা দেখতে পাই বিয়োগের সমস্ত বেদনা ভরপুর করে
জেগে ওঠে প্রেমের পরম সান্ত্বনার বাণী। পিতা চলে গেলেও
ছোট্ট মেয়ের স্নেহের দাবী পরাভূত হয় না, বিদায়ের মধ্যে
আরও প্রবল হয়ে দেখা দেয়।

যে নদী মরুপথে হারাল ধারা

শ্রীসরলা বসু রায়

শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার স্নাত হয়ে পৃথিবী অপূর্ণ মাধুর্যময়ী হয়ে উঠেছে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা আন্দাজ হবে, চুঁচুড়া গঙ্গার ধারে দলে দলে যুবক ও বৃদ্ধ গঙ্গার নির্মল সান্ন্য বায়ু সেবন করছেন ধীরে ধীরে পায়ে চারি করে, অথবা কেহ কেহ বা গঙ্গার ধারের কারও বাড়ীর রোয়াকে কিংবা ঘাটের সিঁড়িতে উপবেশন করে এই মধুর সন্ধ্যা বায়ু উপভোগ করছেন।

সেই গঙ্গার ধারে একটা মাঝারি একতলা বাড়ীর মধ্য হতে অর্গানের মধুর বাঁজার বেজে উঠল, অনেকের কান, এবং মন সেইদিকেই গেল, তারপরে ঘণ্টা খানেক ধরে নানা স্তমধুর গং বেজে উঠল তা শুনে কারও বুঝতে বাকি থাকে না যে সেই বাঁজনা কোন আনাড়ী অথবা সাধারণ হাতের নয়, তা একজন রীতিমত গায়কের হাতেরই বাঁজনা।

সেই বাড়ীর ভবশ গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিল কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে, তারা বলে উঠল, “হাঁসে কে এমন চমৎকার বাঁজাচ্ছে তোদের বাড়ীতে? তোর বৌ বুঝি?”

ভবশ বিরক্ত ও অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠল, “হ্যাঁ বৌ, তোদের সব কথাতেই ঐ, বৌ না হলে আর কাজকে বাঁজাতে নেই নাকি?”

রমেন বলল “আর থাক বাহাদুরী দেখাতে হবে না, আমরা হাস খাই কি না, তাই এটা আর বুঝতে পাচ্ছি না, তোর আমার বাড়ীর পথে ঘাটে সব বিটোফেনের গং বাঁজান দারেরা গড়াগড়ি যাচ্ছে আর কি, যে হোক বাঁজালেই হোল। মিছে কথাটা আর কেনই বা বলিস, আমাদের বৌ যদি এমন গাইতে বাঁজাতে জানত, তো আমরা তোকে নিয়ে গিয়ে তার গান শুনিয়ে দিতুম, গরু করেই; তোর মতন এমন নুকিয়ে রাখতুম না।”

দ্বিজেন বলল, “আরে থাক, ভারি তো ওর বৌ, হত আমার বৌয়ের মতন, তো না হয় কথা ছিল; চার দশ চেয়ে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। ও তো একটা ছোট মেয়ে, ওর গান আমাদের শোনাতে কতটাই বা কি হত, ওর কি এখন

তেমন লজ্জা সরম হবার ব্যয়স হয়েছে; বললেই ও এখন শোনাতে, হত আমার বৌয়ের মত বৌ; যে বন্ধুদের নাম শুনলেই লজ্জায় পালাবে।”

হারান বলল “আমি তোর বৌকে এমন হাজার বার দেখছি, তা জানিস? অতটুকু মেয়ে কি করতে খেড়ে ব্যসে বিয়ে করতে গেছলি, আজ কবছর বিয়ে করেছিস সে হুঁস আছে? তবু অতটুকু বৌ, আরে ছ্যাঃ! আমার বাপ মা হাজার বললেও কুলের জন্তে, কি অত কোন কিছু জন্তেই এমন মেয়ে বিয়ে করতুম না।”

দেবেন বলল “আরে তুই জানিস না না কি? ওর বৌয়ের ঠাকুরদা বুড়ো খুব শাসালো, তার আবার ভারি সেকেলে প্রথার ভক্ত; ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে গৌরিন্দান করেছেন। অনেক কষ্টে বুড়ো শিবকে খুঁজে খুঁজে বুলি বার করেছে, ও পরে একটা মোটা রকম দাঁও মারবে, তাই বুড়োর ঐ খুকী নাতনীটিকে বিয়ে করেছে, আরে বাবা, টাকায় সব সঙ্ক হয়।”

দাম্ব বলল, তাহলে ভবশ আমাদের প্রায় বুড়োর টাকার তোড়াকে বিয়ে করেছে বর, তা একরকম মন্দ নয়।”

রমেন পুনরায় বলে উঠল “তার আবার সেই বৌ বাঁজাচ্ছে বলে, লজ্জায় ধামা ঢাকা দিচ্ছেন, আজকাল অধিকাংশ বড় বড় লোকদের বাড়িতেই বৌ, মেয়ে বোন, গান বাঁজনার চর্চা করছেন, এতে দোষের কি আছে তাই এত লোকো ছাপা।”

নীরেন বলল “এই তোর বৌকে রীতিমত পরস্যা খরচ করে শিখিয়েছে, তবে তো? তোর খসুররা বনেদী বড় মাহুদ বলে শুনেছি, তা তোর মত রয়ের হাতে দেবার জন্তেই বুঝি এত চেষ্টা বহু করে মেয়েটাকে তৈরি করেছিল? খুব কপাল যা হোক।”

ভবশ এত সব বন্ধুদের বাক্যবানের জালায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, আর অস্বীকার করতে না পেরে বলে উঠল, “না তাই” “ও গান এখানে কখনও তো গায় না। আমাদের এখানে এসব রেওয়াজ নেই, কখন সখ কয়ে “বাবা” যদি বলেন, তাও

হুগ্রে, হু'একটা হরি নাম গায়, আমি তো তখন অফিসে থাকি, যা মিষ্টি গলা, আর সুন্দর কীর্তন গায়, আমার দাদাশুণ্ডের ভারি গানের সখ, নিজেও একজন গাইয়ে, বাজিয়ে। ঐটি সখের প্রথম নাতনী, ওস্তাদ রেখে ছোট্ট থেকে শিখিয়েছিলেন, নাতনীর তাই এখন গান নেশার মতন দাঁড়িয়েছে, গান বন্ধ করলে ও মাঝে মাঝে কখন বাজনার মেতে যায়, অভ্যাসের দোষ আর কি ; আমাদের বাড়ির বৌ বিবিসানী করে গান বাজনা করবে এসব চলবে না, কেননা আমরা গৃহস্থলোক, ঠাকুরদাদার বড়মাহুদী সখ, তাঁর কাছে যখন থাকবে, তাঁকে শোনালে তাতে তো আর বাধা নেই, এখানে এসব চলবেনা। তোরা একটু থাম ভাই, আমি ধমক দিয়ে আসি একটু, নইলে থামবে না, আবার সখের বাজনাটা সঙ্গে সাজিয়ে দিয়েছে, এবার এটাকে আর না সরালে চলবে না দেখছি।

বাড়ি ঢুকতেই ডানহাতী ঘরের পরের ঘর খানায় একপাশে একটা মাঝারি গোছের তক্তাপোষে শুভ্র বিছানা, একটা দেওয়াল আলোর আলোকে ঘর আলোকিত দরজা ভেজান, ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে অর্গানের সম্মুখে সুধা চোখ বুজে ধ্যানস্থ ; অর্গানের চাবিগুলির উপর তার ছোট ছোট আঙ্গুলগুলি নৃত্য করে চলেছে, আর ঘর ভরা ভবেশের সব ছোট ছোট ভাই বোন, আর পাড়ার ও ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কজন ; ঘরের ভিতর সুরপরিদেব নৃত্য চলেছে ; ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলিকে তারই ছোঁয়াচ লেগে তাদের মুখের ভাব অপূর্ণ ভাবমণ্ডিত করে তুলেছে, তারা মুগ্ধ বিম্বিত নেত্রে সুধার চারি পাশ ঘিরে শুভ্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভবেশ ও খানিকটা সুধার মুখের পানে স্থির নেত্রে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে, কচি কোমল মুখে একটা যেন স্বর্গের মাধুরি, পৃথিবীর কালিমা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি, এমনই পবিত্র সুন্দর সে মুখ, ভবেশ মাথায় তো ? এদিকে কিন্তু ঘরে ভবেশ ঢুকবামাত্র ছেলেদের দলে চাঞ্চল্য স্রব হয়েছে, তাদের শিশুবুদ্ধি বেশ বৃদ্ধ যে এই লোকটা আমাদের আনন্দের ভাগ নিতে আসেনি, ব্যাঘাত জন্মাতে এসেছে, এসব যে এ ব্যক্তি পছন্দ করে না এজন্ত তাদের বৌদিকে রীতিমত বকুনী খেতে হয়, এসব তারা বেশ জানে।

কতকক্ষণ পরে ভবেশ ডাকল “সুধা এসব কি হচ্ছে ? তোমার না এমন নিলজ্ঞপনা করতে বারন করেছি, একি

তোমাদের কলকাতা সহর যে এসব ফ্যানসান খাটবে এখানে ? বাড়ির বৌ হারমনিয়ম বাজিয়ে গান গাইলে নিন্দে হয় এদেশে, তোমার বার বার একথা বলা হয়নি ?”

সুধা ভীত বিবর্ণ মুখে বলল, “কই গান গেয়েছি ? একটু বাজাচ্ছি তো শুধু, ছোট্ট খুঁটা কেবলই কাঁদছে, মা তাকে ভোলাতে বললেন, তা কিছুতেই ভোলে না, যেই বাজনা আরম্ভ করলুম অমনি চুপ করে কেমন বসে আছে দেখ না।”

ভবেশ ফিরে ছোট্ট বোনের মুখের দিকে চাইল, বলল “না না এবাড়ীতে আমার ঢের ভাই বোন মাথায় হয়েছে, অর্গানের বাজনা না শুনেও, ওসব অছিল। আমি শুনেতে চাই না। বাড়িতে বাবা মা উপযুক্ত ভায়েরা চারিদিকে রয়েছেন, আর বৌ গান বাজনায় মাতবে, যতসব নিলজ্ঞ বেহায়া কাণ্ড। আমার এক পাল বজুরা সব ঐ গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছে, তারা শুনেতে পেয়ে আমার বা’ না’ ভাই বলল, তা জান ?”

সুধা উত্তর দিল “কিন্তু এই বাজনা বাজাবার একমিনিট আগে পর্যন্ত খুকীর কান্নার আলায় বিরত হয়ে আমি যে উঠানে টুলের ওপর ওকে কোলে নিয়ে বসে একটা পাখার বাঁট দিয়ে ভাঙ্গা কেনেস্তারা বাজাচ্ছিলুম বিপুল আওয়াজ করে, লোকে যেমন করে এদেশে বাদর তাড়ায় ঠিক তেমনি করে তা সে শুনে কিছু বলেন নি তো ?”

ভবেশ সুধার কথা শুনে অবাক বমল, তা আর কি বলবে তুমিই যে ঐ কাজ করছিলে কে জানবে বল ?”

সুধা বলল “তবে এটা যে আমিই বা বাজাচ্ছি কি করে জানলেন ?”

ভবেশ বিরক্ত হয়ে বললে “তা আমি জানি না, তারা তো আর গল্প নয় ভাই বুঝবে না কিছু। তা তোমার বয়স কম হলে কি হয় তর্ক করার ক্ষমতা খুব বেশী।

সুধা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল “আচ্ছা আমি আর কোনদিন গান বাজনা ছোঁবনা, কিন্তু বাজনাটা সামনে থেকে বিদেয় করে দিও।” তারপর একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করে বলল “একবার লাইব্রেরী যাওনা, আজ ভারতবর্ষটা পাওয়া যাবে বোধ হয়, যাবে একটু কষ্ট করে, মনটা আমার আজ ভারি খারাপ লাগছে,” মিনতিপূর্ব্বক সুধা এই কথাটি বলল।

ভবেশ উত্তর দিল “ওতো তোমার লেগেই আছে, নতুন কথা নয় তো যে শোনাচ্ছ, আচ্ছা দাঁও তোমার বই বদলে

এনে দিছি, ভারতবর্ষটাই পাব কি না তা বলতে পারি না কিন্তু ।”

বই নিয়ে ভবেশ বেরিয়ে গেল, আবার সব বন্ধুরা তাকে ছেঁকে ধরল, “হ্যাঁ রে কি রকম ধমকটা তুই দিলি গিয়ে বল না শুনি, হাতে ও আবার কি? কোথায় চলেছিস আবার?”

ভবেশ বলল, “আর ভাই বলিস কেন? এ আবার এক ফরমান” লাইব্রেরী থেকে বইটা বদলে এনে দাও”, আজ এ মাসের ভারতবর্ষটা পাওয়া যাবে বোধ হয়” ইত্যাদি, আর ভাই কি নেশা, দেখিস যদি একখানা নতুন বই এনে দিলে সে কী আনন্দ কি খুসী, ঐ একটীমাত্র ওষুধ আছে ওর গান ভুলিয়ে দেবার, এটাতেও বাধা দিলে ও মরিয়া হয়ে উঠবে, যতই হোক বড়লোকের আত্মরে নাতনী, বেশী টানতে গেলে ছিঁড়ে যেতেও পারে, নইলে আগে আগে সব কিছু ছাড়াবার জন্তই বহু ত চেষ্টা করেছি, কিন্তু ক্রমেই চোখ কান ফুটছে; এখন বুঝি, অতটা চলবে না।”

রমেন বলল “ঠিক ঠিক, কিন্তু ভাই আমি একটা কথা বলি, আমাদের পাড়ায় গোটা কতক মেয়েকে গান শেখাতে হবে, এজন্য আমরা লোক খুঁজছি, আমি বলি কি যদি তুই মত করিস, তারা দুপুরে না হয় তোর বাড়িতে এসে শিখবে, আমিই তোকে সব ব্যবস্থা করে দেব, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পর্যন্ত দিতে রাজি আছি, দেখ? গোটা দশবার মেয়েকে ঘণ্টা দুই আড়াই করে শেখালেই যথেষ্ট, তাদেরও পেশাদার লোকের কাছে শেখার চেয়ে ঢের সুবিধা হবে, কি রে কি বলিস তুই?”

ভবেশ হেসে বলল “আরে বলিস কিরে, পঞ্চাশ টাকা তো আমিই রোজগার করি না, আর বৌ করবে, তুই পাল হয়েছিস; ছেলেমানুষ, ওদের কি মন মেজাজ, কাজের ঠিক আছে, ও আবার নিয়ম মত নিবিষ্টচিত্তে সকলকে গান শেখাবে,

মাঝে থেকে নেশাটা বেশ করে পেয়ে বসবে, এই লাভ হবে আর কি, আর মাও মত করবেন না ভাই কখনই।”

ভবেশ এসে মাকে বলল “জানি-মা, রমেন বলছিল যদি তোমাদের বৌ দুপুরে গোটা দশ বার মেয়েকে একটু করে গান বাজনা শেখায় তবে সে পঞ্চাশ টাকা করে মাসে দেবে; তোমায় জিজ্ঞাসা করতে বলেছে; তারাই আমাদের বাড়ীতে আসবে, ওকে কোন দিন যেতে হবে না।”

‘মা’, বৃদ্ধা পিসিমা, মাসিমা; বড়ভয়ি সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলেন, “তুই বলিস কিরে বৌ গান বাজনা শিখিয়ে টাকা রোজগার করবে, আর তুই বুঝি রান্নাঘরে গিয়ে এইবার হাঁড়ি ঠেলবি?” তোর কপালে দেখছি সেই দুর্গতিই আছে, না হলে ও যা মেয়ে ঘরে এনেছি ওকে শেখাতে শেখাতে আমার প্রাণান্ত, বাপের বাড়ী তো কেবল বিবিয়ানাই শিখিয়েছে, ঘরের কাজ কর্ম কিছুই শেখায়নি ভাগ্যে ছোটটি এসেছিল, তাই এতদিন ধরে চেষ্টা করছি; এখন-হয়তো গড়ে নিতে পারব, এর উপর যদি ওকে আসকারা দিয়ে ঐ সব করাও, তবে চিরকাল ভুগতে হবে, তা জেনো; এই বেলা আস্তে আস্তে সব ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা কর, নইলে গেরস্থ ঘরে ওরকম বিবি বৌ নিয়ে কি হবে? বাবা একটু বাটনা বাটতে দিলে, এক তো হিমসিম খেয়ে সারা, অকর্মের এক শেষ, তার পর তিন ঘণ্টা সাবান দিয়ে হাত ধোবে—কাপড়, জামায় পাছে দাগ লাগে সম্ভব; আমার বাপের জন্মে কখন এ-রকমটা দেখিনি; ভাগ্যে জামা কাপড়গুলো বাপেরাই যোগায় নইলে ঐ বোয়ের মাসে একশ টাকার কাপড়জামাই লাগত, সাধাসিধে জামা কাপড় তো উনি ছোঁননা দেখি, এমনই সৌখিন। পিসখাশুড়ি বললেন “ও আর কদিন বৌ, যেকটা দিন পারে করে নিক, বলে—“পড়েছি মোগলের হাতে; খানা খেতে হবে সাথে” ওসব কথা তুমি ভেবনা কিছু।”..... (ক্রমশঃ)

ব্যথার শেষ

(পূর্বাহ্নরতি)

শ্রীহীরালাল সরকার বি-এল,

অর্চনা বলিল—দেখ বৌদি, এ সব ভাল নয় বলছি, কি যে বল কিছু ঠিক নেই, বিজয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, বৌদি একটা পাগল, যা খুসি তাই বলে। যাক্ সে সব কথা। তা হ'লে তুমি কোথায় বসবে ঠিক করেছ? বিজয়—এখনও কিছু ঠিক করি নাই। তবে আমার ইচ্ছা হাইকোর্টেই আরম্ভ করি, দেখি বাবা কি বলেন, তুমি কি বল? অর্চনা—আমি আর কি বলবো? জেঠা ম'শায় যা বলেন তাই করবে। তবে হাইকোর্টে প্রেক্ষাপট করলে বলতে বেশ শুনায় বটে—গাল ভরা নাম—কি বল? বিজয়—শুধু নামেই হো চলবে না—কামও তো চাই। তৎপর একটু আগ্রহ ভরেই যেন হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা অর্চনা, আমি যদি তোমায় কলকাতা আমার বাসায় নিয়ে যেতে চাই তুমি বাবে তো? এই ক্ষুদ্র প্রশ্নটার উত্তর প্রদানে অর্চনা অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। পরে বলিল—যদি তুমি নিতেই পার তবে আমিও যেতে পারবো,—বলিয়া করুন দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে চাহিল। বিজয়ও অপলক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—অনেক দিন পর চারি চক্ষের মিলন—হইয়া ভাবের বিনিময় হইল। এমনি কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল; কেহ কোন কথা বলে না, ঘর নিস্তব্ধ। হঠাৎ বিজয় ডাকিল—অর্চনা? অর্চনা উত্তর করিল—কি? বিজয়—কাছে এস। অর্চনা—কাছেই তো আছি বল, বিজয়—অচ্ছা বিজয় তোমার, তুমি ছাড়া কারো নয়। কে বলে তুমি বিধবা...ইত্যাদি। অর্চনা আর স্থির থাকিতে পারিল না—টুপ্ টাপ করিয়া তাহার ডাগর চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, বিজয় নিজ রুমালে সযতনে সেই পবিত্র বারি মুছাইয়া দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিল। নীরবে উভয়ের প্রাণে বীণার স্বরকার উঠিল—পুলকে তাহাদের মুখ উজ্জল ও শান্ত।

হাইকোর্টে প্র্যাক্টিশ না করিয়া পিতার উপদেশ মত প্রথমে বিজয় আলিপুর জজ কোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে কিছু দিনের মধ্যেই তাহার বেশ পসার জমিয়া গেল। দিন রাত খাটিয়া বিজয় আইন-বাট

সমস্ত তত্ত্ব আরম্ভ করিত এবং ছোট বড় প্রত্যেক মক্কেলের কার্য এমন দায়িত্ব নিয়া ও ধৈর্য সহকারে সম্পাদন করিত যে সকলেই তাহার কার্যকলাপ এবং অমায়িক ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইত। ক্রমেই তাহার উপর অনেকের নজর পড়িল এবং জুনিয়ার হইলেও বাবে তাহার স্তুতি শুনা যাইতে লাগিল।

অক্ষয় বাবু তাহার বিবাহের অনেক চেষ্টা করিয়া যখন বুঝিলেন যে পুত্র সম্প্রতি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে মোটেই রাজি নয় তখন নিজের স্বাভাবিক অভ্যাস মত পুত্রের স্বাধীন ভাব-ধারণাকে তিনি আর ধর্ম করিতে প্রয়াস পাইলেন না। একদিন কি জানি কেন নিরানায় ডাকিয়া বিজয়কে বলিয়া-ছিলেন—বাবা আমার কিন্তু কোন বাঁধন কণ্ঠ নাই, তোমার যেখানে মন চায় সময় মত বিবাহ করিয়া গৃহে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান করিও, বিজয় এ কথার কোন উত্তর দেয় নাই, শুধু নীরবে পিতার এই সরল উক্তি শ্রবণে তাহার প্রতি পিতার অগাধ স্নেহ অল্পভব করিয়াছে মাত্র।

বিজয় কলিকাতা ভবানীপুর অঞ্চলে একখানা ছোট বাসা করিয়াছে, সেখানে ছোট ভাই নরেন থাকিয়া কলেজে পড়িত, —একজন ঠাকুর, একটি চাকর আর বিজয় নিজে। অক্ষয় বাবু মাঝে মাঝে আসিয়া পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া যাইতেন। বিজয় পিতাকে দেশের বাড়ী ছাড়িয়া এখানে আসিয়া থাকিবার জন্ত অনেকবার অনুরোধ করিয়াছে কিন্তু তিনি কেবলই বলিতেন তার পিসিমার শরীর ভাল নয়, কোন সময় কি হয় বলা যায় না, তাকে কার নিকট রেখে আসি? বিজয় পিসিমাকে ও এখানে আনিয়া চিকিৎসা করাইবার কথা তুলিয়া বলিত, আমরা সকলেই যখন এখানে তখন সেবা যত্নের তো আর ক্রটি হবে না, তাকে ও নিয়া আনুন, অক্ষয় বাবু একথার উত্তরে বলিতেন, বাবা, এবার সে কি আর তিনি দেশ ছেড়ে বিদেশে আসবেন, না কোন ঔষধ খাবেন যে তাকে বড় ডাক্তার দেখাবি? যে কয়দিন আছেন ঐ ভিটায়ই থাকবেন। প্রকৃত পক্ষে অক্ষয় বাবু কেন যে

বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতা থাকিতে চান না তাহার একটা প্রধান কারণ স্বর্গগতা পত্নীর প্রেম। তাহার গৃহময় যে সতীর সমস্ত স্মৃতি বিজড়িত—সে গৃহের যেখানেই যাওয়া যাক সেখানেই কোন না কোন চিহ্ন আজ ও বিদ্যমান। তহপরি স্ত্রীর সমাধি মন্দিরটি। প্রত্যহ বৈকালে তিনি ঐ মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া একান্তে বেদীর পানে চাহিয়া থাকেন। এমন দিন যায় না যে দিন তাহার প্রেমাপ্লুত অশ্রুশি বেদীতে পড়িয়া উঠাকে প্রেম-ধারায় পূর্ণ না করিত। সেই স্মৃতির স্থানটি তিনি কিছুতেই ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাহার পবিত্র প্রেমের সর্বটুকুই যে ঐ মন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টক খণ্ডের সহিত মিশিয়া মিশিয়া এক অপূর্ণ ভাবের সমাবেশ করিয়াছে—কেমন করিয়া অক্ষয় বাবু সে স্থান ছাড়িয়া থাকিবেন? তিনি এই সব কথা গোপনেই রাখিতে চেষ্টা করিতেন এবং এই নিবিড় প্রেমের আশ্রয় তিনি নীরবেই উপভোগ করিতেন।

এতদ্ব্যতীত গ্রামের অভাব গ্রন্থ ভদ্র অভদ্র সকলকেই তিনি দয়া করিতেন। ইহাদিগকে সমাজপতিগণ ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করেন এবং কাহাকেও বা অবস্থা বিপর্যয়ে নির্যাতন করত। এই উভয় সম্প্রদায়ই অক্ষয় বাবুর অগ্রহপ্রার্থী—ইহাদের কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা করিতেন না বরং দরিদ্রের বন্ধু বিপদের হরির তায় নিয়ত তাহাদের সাহায্যে উদ্ভূত। এদের ছাড়িয়া থাকিতেও তাহার চিত্ত সায় দিত না। কাজেই তিনি পত্নীর সেই নীরবতার মধ্যে, সবুজ মাঠের শোভা দেখিয়া আশ্রম, কাঁঠাল, নারিকেল, ইত্যাদি তরু-রাজীর ছায়াতলে বসিয়া কর্তব্য করিতেই ভালবাসিতেন।

আজ শনিবার কাছারী হইতে বাসায় আসিয়া বিজয় বৈঠকস্থানায় ইজি চ্যাম্বারে বসিয়া আনকক্ষণ ধরিয়। কি যেন চিন্তা করিতেছে—তাহার মনমুখ বিষাদে ভরা। সম্মুখে এক খানা খবরের কাগজ। ঠাকুর জলখাবার লইয়া আসিয়া বাবুর এই অবস্থা দর্শনে চমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যখন দেখিল কোন দিকেই বাবুর খেয়াল নাই তখন ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল। খবরের কাগজে প্রকাশ “জটনক যুবতি বিধবা স্বামীর গৃহে অসহ্য যন্ত্রণার পর ৩ যখন টিকিতে পারিল না তখন বিপন্ন হইয়া ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ভাগ্য সহচর, তাই পিত্রালয়ে অবস্থান কালে ভ্রাতৃবধূর স্নানজরে না পড়িয়া তাহার বিষ নজরে পতিত হইল। হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর

কোন দিন বা একবেলা আতপানে উদর পূরণ করিত কোন দিন বা ভ্রাতৃবধূর বাক্যবাণ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্নভাবেই দিন কাটাইত। সহোদর ভ্রাতা স্ত্রীর বশ, দরিদ্রা নিঃসহায় বোনের দোষটাই সত্য হউক মিথ্যা হউক চোখে ভাসিয়া উঠিত এবং তাহাকেই ভাল মন্দ কহিত প্রতিবেশীরাও দরিদ্রা ও অর্থহীনা বিধবাকেই জ্ঞান করিতে চেষ্টা করিত। তাহাতেও বিধবা বৈধ্য হারায় নাই—ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু কপাল যাহার মন্দ—তাহার কদাচিত্ত পরিবর্তন হয়। একদিন ভ্রাতৃবধূ সকলের সাক্ষাতে এই বিধবাকে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া বলিল—“ও কুলটা ও চরিত্রহীনা” এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে সে আর নিজকে সামলাইতে পারিল না—তাহার নারীত্ব যে বিষম আঘাত লাগিল—তাহা আর কোন প্রলেপেই সূত্ব হইল না। সেই দিনই রাত্রিতে সর্বাঙ্গে কেরোসিন তৈল লিপ্ত করিয়া অগ্নি সংযোগে নিজকে দগ্ধ করিয়া এই মিথ্যা অপবাদ হইতে মুক্তি পাইল। মৃত্যুর পূর্বে এক টুকরা কাগজে এই কয়টি কথা লিখিয়া বলিয়াছে—“বিধবার বন্ধু মৃত্যু—আজ আমি প্রকৃত বন্ধুর সন্ধান পাইলাম। আমাদের জন্তে জুগুপস করিতে জগতে এমন কে আছে? সতীদেহ প্রধার স্বামীর অনুগমন করিয়া বোধ হয় দিন দিন এমনি করিয়া জলিতে হইত না।”

বিধবার এই দারুণ কাহিনী পাঠ করিয়া বিজয় আজ অর্চনাকে যেন নুতন করিয়া দেখিল। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাজের ভেঁড়ে অর্চনার জ্বালা বোধ হয় তেমন করিয়া অল্পতব করে নাই যেমন করিয়াছে আজ, আজ সে বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল—অর্চনার সেই নিরাশ্রয় ক্ষীণ দেহের কথা—হ্যাঁ! সোনার প্রতিমা অর্চনা সহিবে কেমন করিয়া? সুশীলা বৌদি তাহাকে অবশ্যই ভালবাসে কিন্তু বাহিরের নানাদিক দিয়াই না জানি তাহার কত কষ্ট। সংসারে কত কথাই তাকে শুনিতে হইতেছে, কেমন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করা যায়? কেমন করিয়া এই পবিত্র স্নেহমল বালিকাকে রক্ষা করিব? কস করিয়া বৌদির সেই কথাটি—“আমার একটা মোকদ্দমা আছে,—ইহার ব্যবস্থা করুন”—ইত্যাদি মনে পড়িয়া কি একটা ভাবিল, পরে সম্ভব নয় ভাবিয়া মনে করিল—আচ্ছা উহাকে এখানে আনিতে

চাই? কিন্তু তখনই মনে হইল, না, তাতো দিবে না, কারণ—
আমি পাড়াপড়শি বই ত নই কেন আমার সহিত দিবে?
আবার আইনের কূটতর্ক তুলিয়া ভাবে অর্চনা এখন সাবালিকা
যদি সে ইচ্ছা করিয়া আসে কে তাকে রাখিতে পারে? কিন্তু
লোক নিন্দা? বিজয় মনে মনে বলিল, অর্চনাকে পাঁহাড়ের
উচ্চ শৃঙ্গ হইতে আমি টানিয়া নামাইতে চাই না—তাহার
পবিত্রতার মিথ্যা ক্রটি শুনিলে ও আমার প্রাণে আঘাত দিবে—
তা হয় না।

এইরূপে বেলা যখন অবসান হইয়া আসিল এবং সূর্য্যোদয়ের
পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন—তখন তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু উকীল
বিমলবাবু “বিজু আছ নাকি হে” বলিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ
করিল। তিনি বিজয়কে কোর্টের পোষাকে দেখিতে পাইয়া
বলিলেন—কখন তো এসেছ—এখনো এভাবে কেন? কি
হয়েছে? বাড়ীর সব ভাল তো, তাহার এই সব প্রশ্নে বিজয়
যেন একটু চমকিত হইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—হাঁ তাহাতে,
বেলা যে একেবারে পড়ে গিয়েছে, বস ভাই। ওরে বিপিন
কাপড় দে বলিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল। কাপড় জমা
বদলাইয়া জলযোগান্তে ফিরিয়া আসিয়া বিজয় দেখিল—বিমল
বাবু টেবিলে রক্ষিত খবরের কাগজখানার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিয়া নির্বচনিত্বে কি ভাবিতেছে,—তাহাকে এই অবস্থায়
দেখিতে পাইয়া বিজয় বলিল—কি ভাই কি ভাবছো? বিমল—
কাগজখানায় একটা করুণ কাহিনী আছে—তাই পড়ে ভাব-
ছিলাম, এর প্রতিকার কি? বিজয়—কিসের প্রতিকার?
বিমল—এই আমাদের দেশের বিধবাদের সম্বন্ধে। বিজয়—
আচ্ছা, বেশ। এখন চল একটু বেড়াতে যাওয়া যাক।
বিমল—চল।

তখন দুই বন্ধু হাঁটিতে হাঁটিতে বড় রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত
হইল,—বিজয় নিকটবর্তী একটি টেক্সি চালকে ডাকিয়া
উভয়ে গাড়ীর অন্তরে যাইয়া উপবেশন করিল। গাড়ী
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের নিকটবর্তী হইলে উভয়ে অবতরণ
করিল এবং টেক্সি বিন্দায় করিয়া তাহারা এক নির্জন স্থানে
আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বিজয়—বিমল, তোমাকে আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা
করবো—তোমার এ বিষয়ে কি রকম ধারণা বা মতামত খুব
স্পষ্ট করি আমার বলবে—তোমার প্রশ্নের খাটি সত্য কথা
চাই।

বিমল—বল না কি?

বিজয়—আমাদের দেশের বিধবাদের আমরা যে রূপ
আবদ্ধ করি রেখেছি এবং যে প্রণালী অবলম্বনে আমরা
তাহাদিগকে নিঃসহায় করে তুলেছি তাহাতে কি তাহাদিগকে
একেবারে পঙ্গু বা খোড়ার তুল্য করা হয় নি? এ সব কি
তুমি অনুমোদন কর?

বিমল—ঠিক এই রকম মোটেই অনুমোদন করি না,
অনেকটা বাড়াবাড়ি আছে বটে। কতকটা বদলান দরকার
হয়ে পড়েছে।

বিজয়—কি রকম কতকটা বলতে পার?

বিমল—পারি বৈ কি? অবশ্য আমার নিজস্ব মত বাহা
তাহাই বলিব, অস্ত্রের সঙ্গে আমার মতের মিল নাও হ’তে
পারে।

বিজয়—অস্ত্রের মত তো আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করি
নাই, তোমার মতটাই তো জানতে চাই।

বিমল—আমার মতে কতক কতক বিধবা অর্থাৎ বীদের
সন্তানাদি হয় নি তাদের পুনর্বিবাহ দেওয়া উচিত, আর
একটা কথা, বিধবাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে
তাহারা স্বাধীনভাবে কিছু অর্জন করিয়া নিজেদের মানমর্যাদা
বাঁচাইয়া রাখিতে পারে সেরূপ কিছু করা একান্ত প্রয়োজন।
আমাদের দেশের মেয়েরা বিধবা হইলে সম্পূর্ণ পরের গলগ্রহ
হইয়া পড়ে—কিছুই করিবার ইহাদের সাধ্য থাকে না,
কাজেই ইহারা এত কষ্ট পায় এবং সমাজের বোঝা বলিয়াই
সমাজ ও ইহাদের তেমন স্নেহের দেখে না।

বিজয়—সমাজের কথা ছেড়ে দেও—হিন্দুর কি আর
সমাজ আছে? প্রকৃত সমাজ নাই বলিলেই চলে। কেবল
খোলাটা পড়িয়া আছে তাহা লইয়াই আমরা টানাটানি করি-
তেছি। বিধবাদের কি আর আমরা মানুষ বলিয়া গণ্য করি?
তাহারা যেন সার্টিফিকেট লইয়াই জন্মিয়াছেন, বুকে বোমা
মারিয়াও মনে করি উহাদের বুকে লাগে না। অসহায়
পাইয়া শৃগাল কুকুর হইতেও উহাদিগকে ঘৃণা মনে করি। এই
দুঃখ জালা সহ্য করিতে না পারিয়াই কোমল প্রাণা নারী এমন
নিষ্ঠুরভাবে নিজকে বলি দিতেছে।

বিমল—তোমার সব কথাই কিন্তু আমি মানিয়া লইতে
প্রস্তুত নই।

বিজয়—কেন ?

বিমল—তুমি কি একটু বাড়াইয়া বলিতেছ না ?

বিজয়—মোটাই নয়। যে অনুপাতে তাহাদিগকে আমরা অপমান করি, পীড়ন করি তাহার এক অংশও বলি নাই—একটা বিষয় তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাকবে। বিবাহ ইত্যাদি সমস্ত শুভকাণ্ডে বিধবাকে দূরে রাখা হয়। তাহার নাকি অলক্ষ্মী। কোন কোন স্থানে এরূপ প্রথাও আছে যে বিবাহ বাড়ীতে বিবাহ দিবস বিধবার অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন ক'রে খাওয়াও নিষেধ। ভেবে দেখ একবার এই সব নিষ্ঠুর রীতি নীতির কথা যখন বিধবাকে বলা হয় যে তোমাকে অভুক্ত অবস্থায়ই বিবাহ বাড়ীতে যোগ দিতে হবে তখন কত কষ্ট হয় তাহার অন্তরে। যেখানে নারীকে এমনভাবে অপমান করা হয় তুমি কি তাকে মানুষের সমাজ নামে অভিহিত করতে চাচ্ছ ? বিমল, ভুলে যেওনা একটা কথা যে তাহার কোন দোষের জন্তই তো সে বিধবা হয় নাই। ঘটনা বিপর্যয়ে প্রকৃতির খেলালেই না সে আজ বিধবা ? তবে তাহার উপর এত অত্যাচার কেন ?

বিমল—তুমি কি মনে কর সামাজিক এই যে বাঁধন এবং সংঘত বিধান ইহার কোনই মূল্য নাই ? বুঝাই কি তবে শাস্ত্র-কারগণ এই সকল বিধান ও নিয়মাবলি রচনা করিয়া গিয়াছেন ? দেখ বিজয়, সংঘমের একটা মূল্য অবশ্যই আছে এবং সংঘম শিক্ষা দিবার জন্তই এ সব বিধান। এ সব কঠোর হ'তে পারে কিন্তু একেবারে নিরর্থক নয়। এ কথা আমি স্বীকার করি যে সময়ের সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুরই পরিবর্তন আবশ্যিক। আমাদের ঐ সব বিধানগুলিও তদ্রূপ কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া সমন্বয়যোগ্য করিয়া লইতে হইবে নচেৎ জীবন যাত্রা স্তম্ভ হওয়া স্কটন।

বিজয়—একটু নয় ভাই অনেকখানি, মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির দিকে চেয়ে, তার স্বাস্থ্য ও সুখের প্রতি লক্ষ্য ক'রে আমাদের চলতে হবে, এইটি ভুললে চলবে না যে মানুষের সমষ্টি নিয়েই সমাজ এবং মানুষের সুবিধার জন্তই তার গঠন, রূপ এবং ফল। মানুষই সমাজের ভিত্তি এবং তার উৎকর্ষের জন্যই সমাজ সৃষ্টি। সেই মানুষকেই যদি সামাজিক শৃঙ্খলে বাঁধবে তার ক্ষুরণকে বন্ধ করে রাখা হয় তাহলে সেই সমাজের মূল্য থাকে কতটুকু—? সেই সমাজকে নূতনরূপ দিয়ে নূতন ক'রে গঠন কর মানুষের জন্ত সেই মানুষ পুরুষ নারী বিধবা সবই এক—কেউ বড় কেউ ছোট নয়—সকলের সমান অধিকার সেই সমাজের উপর। সমাজের উদ্দেশ্য এই নয় যে একজন করবে শুধু দণ্ড দান আর একজন শুধু করবে দণ্ড বহন।

সংঘমের কথা বলছিলে। সে কথা এখন না বলাই ভাল।

সত্য কথা বলতে কি সংঘম শব্দটার প্রকৃত অর্থ যে কি তা আজও কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারি নাই। যদি সংঘমের অর্থ নির্ণয় হয় তাহলে কতকটা বৃদ্ধি বটে কিন্তু প্রতিনিয়ত ; নিজকে ঠকানই কি স্তম্ভ বা স্বাভাবিক ? প্রাণ অহরহ বাহ্য চায় প্রতিমুহূর্তই তাহাকে সেই বস্তুর হইতে চাবুক মেরে নিবৃত্তি করলে বা ফাঁকি দিয়ে রাখলে শেষ পর্যন্ত কি যে থাকে ভেবে পাই না।

বিমল—বাঃ বেশ তো। তোমার হালকা মন যখন বা বায়না ধরবে তখনই তাকে তা দিতে হবে নাকি ? তা হ'লে যে সংসারে অনাস্থ্যের দেখা দিবে হে, কাণ্ডকে আর ঘর সংসার করে থাকতে হবে না।

বিজয়—তুমিও তো বেশ লোক ? আমি যা বলতে চাই তুমি আদর্শেই সেই দিক দিয়ে যাওনি, তুমি সংঘমকে যত ছোট ক'রে দেখ আমি দেখি তাকে তার চেয়ে ঢের বড় করে, আমি বলি তোমার সংঘম যদি অপ্রাচুর্যের মধ্যেই বিস্তৃত থাকে অর্থাৎ শুধু “এ করো না, তা করো না, ও হবে না”,—ইত্যাদি সহস্র—“না,” এর গণ্ডির মধ্যেই যদি বাস করতে হয় তবে জেলখানার কয়েদীর যেমন শ্রী ফুটিয়া উঠে এদেশের লোকগুলি ও তেমনি মহামানুষে পরিণত হবে। বিমল—এদেশের মানুষগুলির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করে তাদের বুদ্ধির উন্মেষ কর—ভিতরে জ্ঞানপ্রদীপ জালিয়ে দেও—প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে স্বাধীন আবহাওয়ার বদৌলত কর—দেখবে হালকা মন ও আর থাকবে না, যা তা বায়নাও ধরবে না। তাতেই হবে সংঘম স্বাভাবিক স্তম্ভ সবল—তার রূপ হবে নূতন। জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া সংঘমের কি কোন মূল্য আছে ? তার অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণ—যতক্ষণ মানুষ থাকে অসহায় কিন্তু স্বযোগ পেলেই বিদ্রোহ করবে।

তখন প্রকৃতি দেবী ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে—যেমন নববধু লজ্জায় তার মুখ ঢাকে, আকাশে কে যেন মিটমিট করিয়া বাতি জ্বালাইয়া কি খুজিতেছে, সমস্ত সহরময় প্রতিদ্বন্দ্বী সূর্য্য-দেবের মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া বহুপূর্বেই বৈদ্যাতিক আলোক-মালা জলিয়া উঠিয়া অটুহাসিতে ধরাকে ভরিয়া দিয়াছে। মাঠের লোকজন প্রায় শূন্য হইয়া আসিয়াছে—যে ছ'এক জন আছে তাহারাও বাড়ী ঘাইবার জন্য পদযুগলকে সেঙেল শৃঙ্খলে সজ্জিত করিতেছে। ওপাশ হইতে একটা দেশী কুকুর ছালবাকল তোলা একটা দুষ্ট বালকের টিলে “ঘেউ ঘেউ করিয়া দৌড়াইয়া পলাইতেছে। বন্ধুর তর্ক ছাড়িয়া শব্দবাস্তে উঠিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

হাসপাতালে

শ্রীঅমূল্য কুমার দাশ

জীবনময় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে.....শীর্ণ হ'য়ে মিশে গেছে হাসপাতালের বিছানায়। পাঁচ নম্বর বেডের কলেরা পেসেন্ট জীবনময়...। আরো কত রোগী এপাশে ওপাশে! ক্লান্তচোখে জীবনময় এদিক ওদিক চেয়ে দেখে...সময়ে চোখের দৃষ্টি স্থির হ'য়ে আসে। আনমনে দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরিয়ে ভাবে,—বাঁচবো আমি...।

মাথার 'পরে শোঁ শোঁ করে' ঘোর বৈদ্যুতিক পাখাটা। জীবনময় চোখ দু'টি সেদিকে তুলে ধরে। শীর্ণ হাত দু'খানা নিজের মাথার 'পরে রেখে মাথার গরম অহুভব করে। আস্তে হাত দু'খানা সরিয়ে নিয়ে নাস' তার হাতখানা মাথায় রেখে বলে,—না আপনার মাথা ত' বেশ ঠাণ্ডা...ভয় পাবেন না আপনি, ভালো হয়ে যাবেন।

কানপেতে কথা শুনে জীবনময়, বলে,—'ভালো হ'তে পারবো আমি...?'

—'হ্যাঁ, ভালো হবেন না তবে কি...ভালো হয়ে গেছেন ত' অনেকটা।

জীবনময় চোখ দু'টি বুজে নেয়। নাস' কথার সাথে মিশ্র করে হাসে...মুক্তার মত দাঁত জীবনময়ের বুজা চোখে ভেসে ওঠে। বলে,—'নাস'...।

—'হ্যাঁ, বলুন, এই যে আমি...।

হাতখানা বাড়িয়ে দেয় জীবনময়, মুখে কোন কথা নেই। ছুঁচোখ বেয়ে জল ঝরে। হাতখানা তুলে নিয়ে নাস' সান্ত্বনার স্বরে বলে,—ছেলেপিলের মত কাঁদছেন কেন আপনি, বলুন ত'।

জীবনময় চেয়ে থাকে! কেমন একটা স্থিরতা নেমে এসেছে ওর চোখে মুখে। ঠোঁট দু'খানা কেঁপে ওঠে... মুখে তবু কথা নেই। ভাবা যেন হারিয়ে ফেলে জীবনময়...আর যদি কথা না বলতে পারে সে...খানিকক্ষণ পরে আচ্ছন্নতা কেটে যায়। ওপাশে একটি ছেলের চিংকারে সজীব হয়ে ওঠে ভেতরটা। এপাশ ফিরে শোয় জীবনময়।

মেয়েটির গুশ্ফা ভালো লাগে...কি বলবে মেয়েটিকে অথচ মনের ভেতরে কত কথার ভীড় জমাচ্ছে।

চারটে বেজে গেল।

ওপাশের জানালায় দাঁড়িয়ে সাত নম্বর বেডের পেসেন্টের মা ও তার বোন। কত উপদেশ দিচ্ছে তারা... জীবনময়ও কান পেতে কথা শোনে...মার উপদেশ ও সান্ত্বনা। জীবনময়ের অন্তর জুড়ে দশবছর আগেকার কথা আজ ফিরে আসে, তার মা'র কথা...দুর্বল শরীরটার ভেতরে হু হু করে মা'র কথা মনে পড়ে। জীবনময়ের ত বোন আছে, নীলিমা। ভাবতে ভাবতে কথা বলল জীবনময়,—'আমারও বোন আছে, জানো নাস'...?'

কথার মাঝে ব্যস্ত হ'য়ে কথা বলল নাস',—'হ্যাঁ...হ্যাঁ খামুন আপনি...এত কথা বলবেন না। হাত পাখায় হাওয়া চালিয়ে দেয় নাস'। জীবনময় চোখ দু'টি বুজে নিয়ে বলে,—আঃ। যন্ত্রনায় কঁকিয়ে ওঠে ভেতরটা।

'ঘুমোতে চেষ্টা করুন ত' আপনি।' নাস' বলল।

হ্যাঁ, নাস' ঘুমোতে আমি পারবো...নিরাশ কণ্ঠে কথা বলে কেমন চূপচাপ করে থাকে জীবনময়।

এত কথার মাঝে জীবনময়ের চোখে এবার ঘুম নেমে এসেছে। নাস'ের হাতের পাখা এবার নেমে যায়... রাত তখন বারোটা। এপাশে ওপাশের রোগীদের মাঝে মাঝে চিংকার চলেছে...বাঁচবার জ্ঞান মরণের সাথে চলেছে অভিযান...। তারমাঝে অবুধ চোখে কতজন নাস' বসে আছে। হেডনাস' বললে—তোমার পেসেন্ট কেমন আছে অরুণা...পাঁচ নম্বর বেডের পেসেন্ট? অরুণা বলল,—'হ্যাঁ ভালো আছে, এখন ঘুমোচ্ছে। এমনি চলে নানা জনের নানা কথা। অরুণার চোখের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়ে থাকে পাঁচ নম্বর বেডের 'পরে।

রাত ভোর হয়ে এল...হাসপাতালের কুলি শট শট করে স্ট্রীচ টিপে আলো নিভিয়ে দেয়। ভোরের আলোয়

চারদিক আলোকময়। নাস' কত জন ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিচ্ছে রোগীদের...কত রোগী অধুম চোখে রাত পেরিয়ে দিনের আলোতেও ঝুঁকিয়ে উঠছে এত যন্ত্রণা। অরুণা চোখ মুখে জল দিয়ে সাম্নে এসে দাঁড়িয়েছে তার পেসাণ্টের, জীবনময় হঠাৎ চোখ খুলে দেয়...সারাচোখের একাগ্র দৃষ্টিতে নেমে এসেছে কেমন একটা অর্থহীন ভাব...

অরুণা প্রশ্ন করলে,—‘কেমন ফিল্ করছেন আজকে? রাত্রিবেলা ঘুমিয়েছেন ত’ বেশ।

জীবনময় জড়তার স্বরে চোখের কোণে বিষ্ময় নিয়ে আস্তে আস্তে বললে,—‘আপনাকে ত চিন্লাম না... আপনি?’

—ই্যা...আমি আপনার অরুণা...নাস'...অরুণা আমার নাম। এলোমেলো কথা বলতে অরুণা নিজেই চমকে ওঠে। জীবনময়ের চোখে যেন আরো বিষ্ময় নেমে এসেছে, সে বলল,—‘নাস'...নাস' কেন? বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে জীবনময়। অরুণার হাতের পাখা এবার জোরে চলে, বললে,—এত কথা বলবেন না আপনি...অস্থস্থ হয়ে পড়বেন যে...

জীবনময় তবু হাত নেড়ে বলে,—না আমি ভালো আছি...নাস' আমি ভালো আছি...কিন্তু তুমি কি করবে, নাস'?’

—আমি আপনার সেবা করছি...শুশ্রূষা করছি...সেবাসদন যে এইটে। জীবনময় আর কথা বলতে পারলে না, চোখের কোণে জল জমিয়ে রাখলে। অরুণা টেবল থেকে তোয়ালেখানা উঠিয়ে চোখের কোণ মুছে দিয়ে বলল এত ভীতু মানুষ আপনি.....

হেডনাস' এল...টেম্পারেচার নিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে বললে—ভালো হয়ে যাচ্ছেন...আর ভয়কি...

জীবনময় বলল—আমি?...!

অরুণা বললে,—ইস, আপনি।

এর পরে এলেন ডাক্তার মিঃ চাটার্জি। পেসাণ্ট দেখলেন, টিকেট বোর্ড দেখে, বললেন, এখন কেমন আছ, ব্রাদার?!

জীবনময় বললে—ভালো হ'তে পারবো ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার বাবু বললেন...ইয়েস...সার্বটেনলি...

বলে সাম্নের বেডিংএর রোগীর এ্যাকজামিনে গেলেন ডাক্তার চাটার্জি। রোগীর সাথে সে রকম অমায়িক আলাপ...কেমন মিষ্টি কথা। পেছন ফিরে ডাকলেন...অরুণা, ও: তুমি এন্গেজড্ আছ পাঁচ নম্বরে, কথা অসমাপ্ত করে পাঁচ থেকে পঁচিশ নম্বর বেডে চলে যান ডাক্তার চাটার্জি। খাটের ছাঙলে টিকেট বোর্ড নতুন প্রেস্ক্রিপশন্ নিয়ে খুলে। হঠাৎ অরুণার ডাক এল ডাক্তার চাটার্জির রুম থেকে...ডাক্তার চাটার্জির টেবলের সাম্নে এসে দাঁড়িয়েছে অরুণা সেই শুভ্র নার্সিং ড্রেসে। ডাঃ চাটার্জি ছোট ভূমিকা নিয়ে বললেন...যন্ত্র নিও তোমার পেসাণ্টের ভালো করে, বুঝলে অরুণা? অরুণা যেন চমকে ওঠে...

ডাক্তার চাটার্জি আবার বললেন...ই্যা, সিরিয়াস তেমন নয়...সিরিয়াস হতে পারে ত...ই্যা, যাও, এই কথা বুঝলে...

অরুণা চেপে চেপে নিশ্বাস ফেলে।

পরের দিন চলে যায়, তার সাথে যায় আরো কত দিন।

জীবনময় আজ উঠে বসেছে তার বিছানার 'পরে বালিস হেলান দিয়ে।

অরুণা জিজ্ঞেস করল...কেমন আছেন?...

জীবনময় শুকনো ওঠে হেসে বললে...ই্যা ভালো আছি...কিন্তু আপনার দান জীবনের সম্পদ হয়ে রইলো।

অরুণা বললে...কিষে বলেন আপনি।...যাক, তাহলে এবার আমার ছুটি...?

জীবনময় হাসতে হাসতে বললে...ঘরের ছেলে-ঘরে দিয়ে আসুন...বাঁচিয়েছেন যখন দাবী আছে বৈকি।

অরুণা কি বলবে...মনের ভেতরটায় ভোলপাড় করে উঠছে।...কি দাবী জানাতে চায় জীবনময়?

পরের দিন ডাঃ চাটার্জি আসলেন। হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন জীবনময়ের সাম্নে, বললেন—‘কেমন বুঝছেন ই্যা, চেহারাই বলছে বৈকি...’

জীবনময় কৃতজ্ঞের হাসিতে হেসে বললে,—‘হ্যাঁ, ভালো হয়ে গেছি ডাক্তারবাবু!’

অরুণা ছিল একপাশে সে হাসলে।

তারপরে এগারটার ভিস্‌চার্জ হয়ে হাঁসপাতালের বাইরে এসেছে জীবনময়। জনতা পেরিয়ে মোটর হর্ণ দিয়ে চলেছে অরুণা জীবনময়কে নিয়ে।...নেই কলকাতা সহর.....ছ’পাশে সারবাঁধা দোকান-পসার। তার মাঝে জীবনময় চলেছে নতুন জীবন পেয়ে। বাড়ী পৌছে সোফায় এলিয়ে দিলে নিজেকে। বাড়ীর চাকর চরণ ফ্যানের ঘূর্ণন বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—‘দাহুর জন্ত ফলের রস আনি, মায়ের জন্ত চা.....বলতে বলতে অরুণার এসেছে বিশ্বয়...কেমন ঔৎসুক্য নিয়ে বললে,—‘আপনার বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা এলনা কেউ জীবনময়বাবু?’

জীবনময় হেসে বললে,—‘আসবার যারা তারা ত কেউ আসেনি।’ অরুণার ভেতরটা অলঙ্কে শিউরে উঠল, বলল,—‘তার মানে?’

—‘মানে...মানে আর কি! এইত আপনি এলেন, না যদি আসতেন তা’হলে যে মানে।’ বলে মুছ মুছ হাসলে জীবনময়।

অরুণা বললে,—‘তা’হলে—’

কথার মাঝে কথা বলল জীবনময়। বললে,—‘হ্যাঁ...তাই।’

এমনি নানা কথার মাঝে অরুণা নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে—জীবনে সে কি পেলে...হুঁহু করে উঠল নিঃসঙ্গ হৃদয়টা! বিশ্বয় এসে অরুণাকে অপ্রকৃতিস্থ করে ফেলতে চায়...এক সময়ে হাত ঘড়িতে চোখ ফিরিয়ে অরুণা বললে,—‘আজকে তা’হলে উঠি।’

— জীবনময় নমস্কার জানিয়ে অত্বরোধ করলে,—‘আবার খোঁজ করবেন।’

অরুণা হাত তুলে—গ্রীবা বাঁকিয়ে বললে—‘হুঁ!...।’

অরুণা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে অগুছানো ঘরের এলোমেলো জিনিষপত্র গুছিয়ে, শ্রাকড়া নিয়ে ঘসছে ঘরের মেঝেটা। মনে মনে চলেছে পেছনের

কথার আন্দোলন...কতগুলো নৈশ যেন তার বুকের উপর দিয়ে মার্চ করে চলে গেছে। শূন্যতা যেন তার চিত্তের মনি কোঠায় হুহু শব্দ তুলে ব্যাকুল করে ফেলেছে কোথা থেকে কোথায় চলতে জীবনের চলতি পথে আজ অরুণার নারী-অন্তরে কেমন একটা স্বর বেজে উঠল... এমনি নানা কথার নানা ভাবনায় আনমনা হয়ে গেছে অরুণা। বিকেলের দিকে রেলিংএর পরে হেলান দিয়ে সাম্নে বড় রাস্তারটার পর চেয়ে আছে। রাজপথের বুক বেয়ে কত জনতা চলেছে...নানা ভাঙ্গতে চলেছে নানারকম লোক! অরুণা ওদিকে চোখ ফিরায়, যেদিক থেকে এল রিক্সাওয়ালার একটানা ঠুঁন্ঠুন্ শব্দ। সে রিক্সাতেই চলেছে পাশাপাশি ছ’জন। অরুণার চোখে স্বপ্নের আবেশ লাগে। আবার পিছনে আসে ঘোড়ার গাড়ী একখানা তার ভেতরেও পাশাপাশি ছ’জনে...শিশুহলে আর একটি ভ্রমর চোখে একাগ্রদৃষ্টি যেন তুলে ধরেছে অরুণার দিকে। অরুণা আর পারে না এখানে দাঁড়াতে বুকের ভেতরটা যেন মুসড়ে উঠছে। ঘরের মধ্যকার খাটের পরে থপাস করে’ এলিয়ে দেয় নিজেকে। নিঃস্বপ্ন ঘরটায় এমনি একাকী কাটিয়ে দেয় অরুণা।

আবার হাঁসপাতালের ডিউটিতে চলে এসেছে অরুণা, রাজিবেলাকার ডিউটি। ছ’পাশের খাটের পরে সে রকম সারবাঁধা রোগী...উপরে শো শো করে ঘুরছে বৈদ্যুতিক পাখাগুলো। অরুণার মগ্নমগ্নে চিন্তার জাল ছড়িয়ে ছুঃস্বপ্নের মত একজন নারী স্প্রিয়া সে বললে—‘কি ভাই পেশান্ট ভাল হয়েছে?’

অরুণা ছোট্ট করে উত্তর দেয়,—‘হুঁ।’

আর কোন কথাই বেড়ে চলে না। অরুণা এড়িয়ে যাবার অছিলায় রোগীদের খাটের পাশে পাশে ঘুরে চলে; ওপাশের দেয়ালের গায়ে ঘড়ির কাঁটা এগারটার শব্দ তুলল। অরুণা টেবলের পাশের চেয়ারটায় বসে হাত দুখানা দিয়ে মাথায় হেলান দিয়েছে। এমনি কত সময় চলে যায়...চোখে কিন্তু নেমে এসেছে ঘুমের বিমূর্নি। তবু কান পেতে জেগে থাকতে চেষ্টা করে...তার কানে বেজে ওঠে কার বুক ফেটে যাওয়া চীৎকার...! অরুণার

এই আচ্ছন্নতার মাঝে কানে বেজে ওঠে,—মাগো আর বে
আমি পারিনি মা’...

অরুণার নারীঅন্তরে তখন কম্পন চলেছে...মাতৃ
হৃদয়ে যেন হুহ করে উঠছে মাতৃহৃদের বেদনা। অরুণা
নিজেকে এগিয়ে বলে—হ্যাঁ, খোকন...এই যে আমি
কেঁদনা তুমি আর। হাততুখানা বাড়িয়ে দিয়ে অরুণা
বলে—খোকন আমার...

ছেলেটি বললে,—আমি যে মরে যাচ্ছি...আমার যে
কেউ নেই মাগো...

অরুণা আরো জোরে ছেলেটিকে চেপে ধরে।

পিছন থেকে শরীরটা বুঁকিয়ে স্বপ্নভা বলেন—এই
অরুণা, অরুণা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি বলছিগ ছাইভয়...

অরুণা হঠাৎ চমকে উঠল। চোখদুটা রগড়াতে রগড়াতে
আড়মোরা ভেঙে বললে—‘বাই...ভাই-।’

পরের দিন চরণকে দিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে।
অনুরোধ জানিয়েছে আসবার জন্য। অরুণা যেন আজ
শিউরে উঠল...ব্যস্ত হয়ে বলল—না না: চরণ, আমার
সময় নেইত যাবার...এইত যাচ্ছি হাঁসপাতালে।

জীবনময় নিজেই ফুল স্পীডে গাড়ী চালিয়ে একমুখ
সিগরেটের ধূয়া ওপরের দিকে ছেড়ে ষ্টয়ারিং ঘুরিয়ে নের
ডানদিকের মোজা রাখায়। অরুণা তখন হাঁসপাতালে
একটি ছেলের মুখে ঢগ ঢগ করে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে।...

অশ্রু-পথ রচিলাম হে কবি সুন্দর

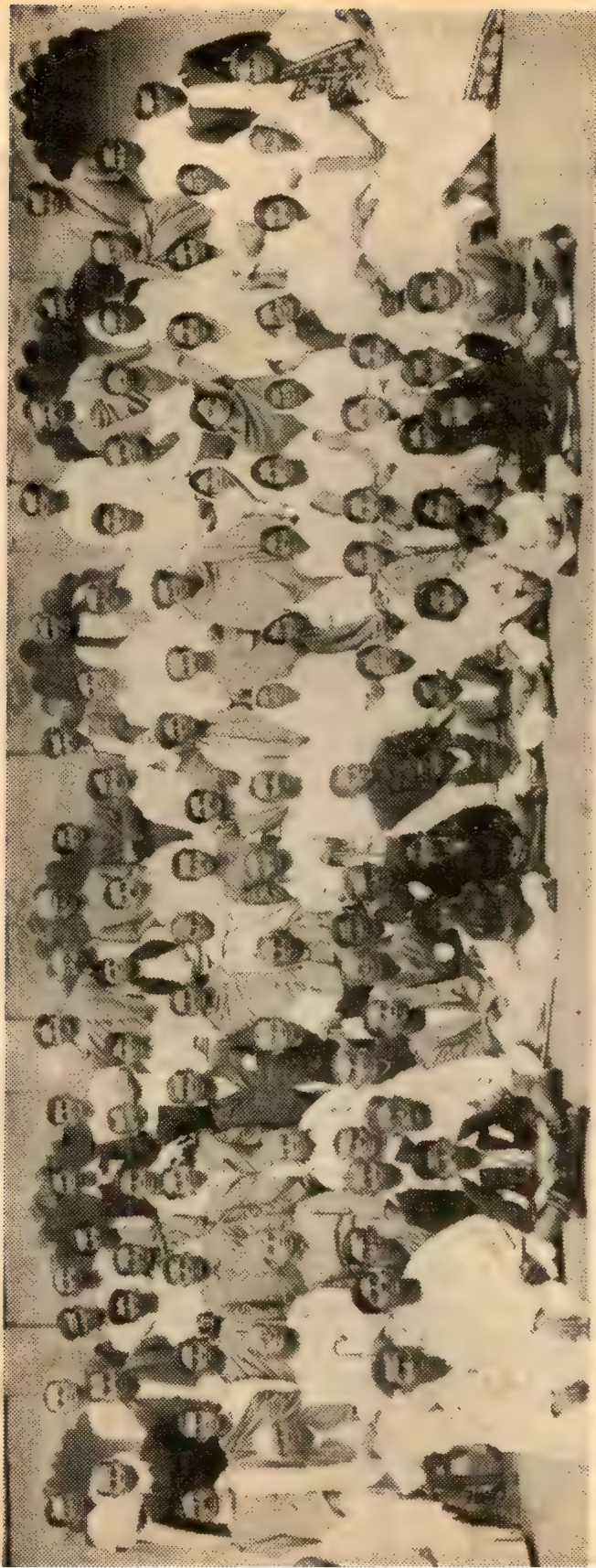
বন্দে আলী মিয়া

(১)

শ্রাবণের দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া
নেমে এলো পৃথিবীর 'পরে—
রাখী পূর্ণিমা ক্ষণে ঘনাইল অমাত্যি
মেঘে মেঘে অশ্রু তাই বারে।
জ্যোতির্ময় লোক হতে এলো রথ তব
তাহার চক্রধ্বনি করি অনুভব
লোক হতে লোকান্তরে তব অভিবান
তাই তুমি নিলে গো বিদায়,
তোমার বিরহে আজ জননী বসুন্ধরা
অন্ধকারে করে হার হার।

(২)

মোদের অশ্রু দিয়া তোমার বাতাপথ
রচিলাম হে কবি-সুন্দর—
এই পথে ফিরে এসো—অনাগত দিন হবে
প্রতীক্ষায় যুগ-যুগান্তর।
অমৃত উৎস ধারা সর্বকাল তরে
রেখে গেলে হে সন্মতি সবার অন্তরে
তোমার সে রস-লোকে নাহি বন্দ নাহি ভেদ
তীর্থ সে নয়নাভিরাম—
অন্তপার হতে তাই শোকময় ভারতের
লহো করি বিদায়-প্রণাম।



বারানসীধামে উনবিংশ প্রবাদী বন্ধ-সাহিত্য সম্মেলনের সমাগত সভাপতি, সভানেত্রী ও প্রতিিনিধিবৃন্দ ।



প্রবাসে বঙ্গ-মহিলাদের মিলন

শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ

বৎসর অন্তর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী বহুল নগরে প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলাগণ স্বজাতির মহিলাদিগের সহিত পরস্পর পরিচয় ও ভাবের আদান প্রদান করিবার সুখ ও সুযোগ পায়। এইরূপ মহামিলন কাশী, এলাহাবাদ, ইন্দোর, নাগপুর, কাণপুর, দিল্লী, রাঁচি, গৌহাটী, জামসেদপুর, মিরট, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, পাটনা প্রভৃতি অষ্টাদশ বার এবং কলিকাতায় একবার হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে বড়দিনের উৎসব আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসের পরিচিত বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য চিত্ত বিচলিত হইয়া পড়ে, এবারও কাশীতে এই প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনে বাঙ্গালীর মেয়েদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিবার জন্য, তাঁহাদের সরল প্রীতি সম্ভাষণ পাইবার জন্য মন উন্মুখ হইয়া পড়িল। তারপর কলিকাতায় জাপ বিমানের আক্রমণ ভীতি সোণায় সোহাগা নাগনরই মতন কাশী আসিবার সুযোগ ঘটাইয়া দিল।

পুণ্য ক্ষেত্র বারাণসী ধাম বাঙ্গালী রমণীদের চির আকাজক্ষিত স্থান। এখানে যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া জীবনের শেষ সময়ে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধারা কাশীবাসী হইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া আসিতেছে। পুণ্য সলিলা গঙ্গা, আর পূত পীঠস্থানের বিশ্বনাথ মেয়েদের জীবন ধন্য ও পুণ্য করিয়া দেয়। প্রাতে প্রভাতী নহবৎ বাদ্য, সদ্যস্নাত ভক্তবৃন্দের ভজন গীত, বিদ্যার্থীদের আবৃত্তি, দেবালয়ের মঙ্গল আরতি, পণ্ডিতদের মন্ত্র ধ্বনি যেমন চিত্ত শুদ্ধ হইবার সহায় করে, তেমনি সন্ধ্যায় পতিতপাবনী গঙ্গার তীরে ঘাটের সোপানে পাঠ ও কীর্তন, দেব-দেউল হইতে উদ্ভিত আরতির বাদ্য-ঘণ্টা রোল, মানব মনকে সেই বিশ্ব নিয়ন্তা বিশ্বনাথের চরণতলে অতর্কিতে লইয়া যায়। তাই দেখা যায় কাশীর নারীর অবলা নহে, তাঁহাদের দেহ ও

সুপুষ্ট, জীবনও সুদীর্ঘ। বারাণসী বঙ্গনারীর মোক্ষ-ধাম।

বারাণসী বঙ্গরমণীর অবদানে পরিপূর্ণ। রাণী ভবানী কাশীতে ৩৬৫ দিনে, ৩৬৫টা ব্রাহ্মণকে, ৩৬৫টা বাটী দান করিয়া বারাণসী ধামে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের এক বিরাট গোষ্ঠি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানীর ছত্র, দশাশ্বমেধ ঘাটের বিরাট পুষ্টিয়ার রাণীর মন্দির, রাণী হরহুন্দরীর ধর্মশালা বঙ্গ-রমণীর পুণ্য কীর্তির অত্যন্ত নিদর্শন। পরম শিব পীঠে বঙ্গের রাণী ভবানী সূক্ষ্ম কারুকার্য মণ্ডিত অপরূপ ছুর্গামন্দির নগর প্রান্তে স্থাপন করে। শক্তি পূজা ও পশুবলির সুযোগ করিয়া দিয়া ছিলেন। কাশীর রামকৃষ্ণ মিশনের আতুরালয় গুলির অধিকাংশই বঙ্গ রমণীর বদান্ততায় নির্মিত হইয়াছে।

সেইজন্যই দেখিলাম বারাণসীর সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের 'কাশী নরেশ মণ্ডপে' প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনে যেন নারীরই মেলা বসিয়াছে। এই বিশ্ব পরিস্থিতির ছুর্দিনে রণোন্নয়ন নিদারুণ রোলের মধ্যেও নারী তার চির স্নেহ ও মমতার রূপ ভুলিতে পারে নাই। কত দূর দূরান্তর হইতে কত রমণী 'ম্যাকডোনাল্ড হোষ্টেলের' ছাত্রাবাস কক্ষে নীড় বাঁধিয়াছে। অল্পপূর্ণার জ্বায়ই শ্রীমতী মমতা ঘোষাল ও গীতা ঘোষাল প্রবাসের ভাই ভগ্নিদের অন্ন বিতরণ করিতেছিলেন। বাঙ্গালী রমণীর গিন্নীপনার দক্ষতা তাঁহাদের কার্যের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সভার মূল ও শাখার অধিবেশন গুলিতে কাশীর মেয়েরা নানারকম সঙ্গীত গাহিয়া প্রীতিদান করিয়াছিলেন। সঙ্গীত শাখার গানের মজলিসেও শ্রীমতী অঞ্জলী ঘোষ বাঙ্গালী মেয়েদের সঙ্গীত অল্পরাগ ও ও সাধনার পরিচয় প্রদান করেন।

রুবীন্দ্র স্মৃতি বাসরে এলাহাবাদের মহিলা কবি শ্রীমতী

প্রতিভা মুখার্জি পদ্যে রবীন্দ্র স্মৃতি তর্পণ করেন। এই বাসরে শীতের প্রকোপ অগ্রাহ্য করিয়া প্রায় সহস্রাধিক মহিলা বহু-রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া বিশ্ব জনবরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। কুমারী অমলা বহু শান্তিনিকেতন হইতে আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত শান্তিনিকেতন দেব ঘোষের পরিচালনায় রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়া তৃপ্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কাশীর শ্রীমতী মমতা চৌধুরী তাঁহার স্মৃতি কোকিল নিন্দিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথেরই গান গাহিয়া প্রবাসী বঙ্গ রমণীর রবীন্দ্র গীত-শ্রীতির প্রমাণ প্রদান করেন। যখন রবীন্দ্র স্মৃতি বাসরের সভাপতি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যানসলার স্যার স্বর্কপল্লী রাধাকিশোর ঔজসিক প্রাণ মাতান ইংরাজী ভাষায় বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন তখনও মেয়েদের আগ্রহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সাহিত্য শাখায় শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর লিখিত “কবি চন্দ্রাবতী” প্রবন্ধটি যখন এলাহাবাদের শ্রীমতী মমতা চৌধুরী স্থললিত কণ্ঠে পাঠ করেন, তখন লেখাটি এবারের সাহিত্য শাখার সর্বোৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া বহু ব্যক্তিকে মন্তব্য করিতে শুনা গিয়াছিল।

গঙ্গা বক্ষে নৌকা ভ্রমণে প্রতিনিধিদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা, বারাণসীর বঙ্গ-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিয়াছিলেন। ছয় খানা নৌকার মধ্যে তিন খানা নৌকা মহিলাসমূহ পূর্ণ করিয়া বিহার করেন। কাশীর গঙ্গাতীরের সৌধ ও সোপানের দৃশ্য অপূর্ণ। মন্দিরের শিল্প ঐশ্বর্য্য অপার। নৌকা ভ্রমণে কাশীর এই মানোরম দৃশ্য চিরকাল স্মৃতিপথে উজ্জ্বল থাকিবে। নৌকাবিহারে মেয়েরা যেমন পরস্পর আলাপের স্বযোগ পাইয়াছিলেন, তেমনই পতিতপাবনীর বক্ষে ভজন ও সঙ্গীত করিয়া চিত্তে প্রফুল্লতা আনয়ন করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে জনযোগও চলিয়াছিল।

আবার কাশীর মহিলা শ্রীমতী ক্ষীরোদ বাসিনী নিয়োগা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মাতৃমঠ ও টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রীদের স্বহস্তে প্রস্তুত হেঁড়া কাপড়ের কারুকার্য্য খচিত পুতুল, স্বজনী, খেলনা, বস্ত্রাদির এক প্রদর্শনী সম্মিলনের মঞ্চের পার্শ্বে খুলিয়া নারী শক্তির পরিচয় প্রদান করেন।

সম্মিলনের শেষ বৈঠকে যখন প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন প্রবর্তিত প্রবেশিকা পরীক্ষার সমবর্তন উৎসব হয় তখনও দেখা গেল উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রদের সংখ্যারই সমান। আওরা দাবাদ, দিল্লী, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী ও মীরাতের হইতে ছাত্রীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে দেখা গেল। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় কাশীরই ৮ জন ছাত্রী (তাঁহার মধ্যে কুমারী স্বকৃতি সাম্মান বি-এ ও মমতা ঘোষাল অন্ততম) প্রশংসা পত্র গ্রহণ করিতে উপস্থিত ছিলেন।

আবার যখন প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের প্রবর্তিত পরীক্ষা পরিচালনের জন্ত অর্থের অনটনের নিদারুণ কাহিনী পরীক্ষা সচিব ডাঃ অমিয় ব্যানার্জী আই-ই-এস ও সম্পাদক রায় সাহেব দেব নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিবৃত করেন তখন মেয়েসমূহ অগ্রণী হইয়া টাকা প্রদান ও সংগ্রহ করেন।

যখন শিশু সাহিত্য শাখায় প্রায় দুই সহস্র বালক ও বালিকা, কিশোর কিশোরী সমবেত হইয়া বিরাট সভা মণ্ডপ মুখরিত করিতেছিলেন তখনও বহু শত শিশুর মা-বোনেরা নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদের তুল্যদের শিক্ষা দীক্ষার কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। “আনন্দবাজার পত্রিকার” আনন্দমেলার ‘মোমাছি’কে বেঞ্চে করিয়া থাকিত বেশীর ভাগ মেয়ের দল। মনীষীদের সাক্ষর গ্রহণ করিবার আগ্রহ মেয়েদেরই অধিক দেখা গিয়াছিল। মেয়েদের এমনই আগ্রহ দেখিয়া কলাবিদ প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বসিয়া বসিয়া এক কুড়ি অটোগ্রাফ পুস্তকে চিত্র অঙ্কণ সানন্দে করিয়া দিলেন।

মহিলা শাখার অধিবেশনেও সহস্রাধিক মহিলা সমবেত হন।

প্রবাসের জন-প্রিয় কবি স্বর্গীয় অতুল প্রসাদের “বল বল বল সব” গানটি গীত হইয়া প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের মহিলা শাখার অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ স্বর্ণ-হলে (সেন্ট্রেল হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গণস্থিত) হয়। কুমারী স্বকৃতি সান্দ্রেল বি-এ শ্রীমতী প্রমোদবালা সেন

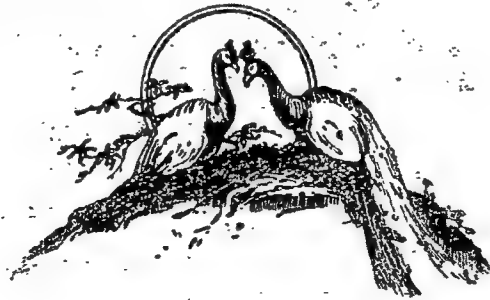
রচিত 'আহ্বান' কবিতা আবৃত্তি করিবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী তাঁর অভিভাষণে কাশীবাসিনীদের জীবনের প্রতিচ্ছবি বিবৃতি করেন। মহালা শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নিকুপমা দেবী তাঁহার সূচিস্থিত অভিভাষণ পাঠ করেন। এলাহাবাদের শ্রীমমতা চৌধুরী বি-এ শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে, কাশীর শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রমত্তরঙ্গিনী দেবী 'নারীর শক্তি', শ্রীমতী প্রমোদালা সেন 'বাঙ্গালী কোন পথে', এলাহাবাদের অনরঙ্গী (অবেতনিক) ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীমতী প্রভা ব্যানার্জী 'প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাষা সমস্যা ও মাতৃ-ভাষার মূল্য' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জি (এলাহাবাদ) "মহিলা মঞ্জলীসের ইষ্টাংকরমাস" কবিতাটি সভায় বসিরা রচনা করিয়া পাঠ করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন। কাশীর শ্রীমতী মমতা চৌধুরী একখানি বৈষ্ণব পদ কীৰ্ত্তন করিয়া সকলকে মোহিত করিয়া দিয়াছিলেন। যথারীতি ধাত্রাবাদ ও শুভ-ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবার পর শ্রীমতী অনিমা সেন গান করেন, তৎপর সভার কার্য শেষ হয়। একটা ছুংখের বিষয় মহিলা শাখায় তেমন স্থলিখিত প্রবন্ধ দেখা গেল না এবং কবিতা বা প্রবন্ধের সংখ্যাও অতি অল্প।

পূর্বে বলা হইয়াছে সকল শাখাতেই মহিলারা সাগ্রহে যোগদান করিতেন, সেই নিমিত্ত মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় সম্মিলনের শেষে মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমি অনেক সভা-সমিতিতে যোগদান

করিয়াছি কিন্তু এমন ভাবে একাগ্রচিত্তে এত অধিক সংখ্যক মহিলাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, বৃহত্তর বদ শাখায় দূরূহ অভিভাষণ ও প্রবন্ধ শুনিতে দেখি নাই।" এই রূপ স্তুতিবাদ মেয়েদের পক্ষে যেমন গৌরব তেমনই ভরসার কথা।

উনবিংশ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় না আসিতে পারায় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সাহিত্য-শাখারও সভাপতি ছিলেন। বিজ্ঞানে শ্রীযুক্ত অমিয় ব্যানার্জি আই-ই-এস্ (এলাহাবাদ), ইতিহাসে ডাঃ হরেন্দ্রনাথ সেন (দিল্লীর), বৃহত্তর বঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত (জামসেদপুরের), চিত্র-কলায় শ্রীযুক্ত প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় (লক্ষ্মেএর) সঙ্গীতে শ্রীযুক্ত বিরেঞ্জ কিশোর রায় চৌধুরী (কলিকাতার), শিশু সাহিত্যে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (কলিকাতার) সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সুসংস্কৃত বঙ্গভাষায় ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বারানসীর প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা, কাশীর প্রাচীনত্ব ও মাহাত্ম্য তাঁর অভ্যর্থনা সমিতির সাদর অভিভাষণে বলিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর এই সাহিত্য সম্মেলনও কাশীরই উপযুক্ত হইয়াছিল।



মহিলা কবি চন্দ্রাবতী

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষা-দীক্ষায়, রাষ্ট্রে ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার ভিতর নারীর যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, একথা অস্বীকার করবার মত মূঢ়তা আজ আর কারো নেই বোধ হয়। জীবন যাপানের প্রত্যেক পদক্ষেপে, ধ্যান ধারণা ও চিন্তারাজ্যে, নারী পুরুষের সমকক্ষতা লাভ না করলেও সামাজিক জীবন যাত্রার ভিতর সংসারের নাগপাশের ভিতর বদ্ধ থেকেও বিশ্বের নারী সমাজসাহিত্য ও রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনায় যা করেছে, যা দিয়েছে পুরুষের দানের সঙ্গে তা নমান সমান না হলেও নিতান্ত নগণ্য নয়; সভ্যজগৎ এ কথাই বলে, সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্রের ইতিহাসও একথাই বলে।

সাহিত্যেও ভারতীয় নারী আপন প্রতিভা ও স্বজন শক্তির অসামান্য বিকাশ ঘটিয়ে, ভারতীয় সাহিত্যে আপনার স্থান আপনি অধিকার করে নিয়েছে। তাই ছাড়া ভারতীয় সাহিত্যে চরিত্র বৈশিষ্ট্যের গুণে নারী চিরকাল শ্রদ্ধার ও গর্বের আসন পেয়ে এসেছে এবং আজও পায়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ও শ্রেষ্ঠতার গুণে কবির কাব্যেও তারা অমর হয়ে আছেন। নারী তার অসামান্য ত্যাগে, তেজে, সেবায়, ধর্মে, আত্মদানের আদর্শের উদ্ভূত শিখরে স্থান লাভ করেছিলেন। প্রাচীন সাহিত্য আমাদের সে কথাই জানায়। বৈদিক যুগের—লোপামুদ্রা, ঘোষা, শ্রাঙ্খতী, উপনিষদ যুগের—গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসা, মহাকাব্যের—আন্ড্রেয়ী, খনা, লীসাবতী, সীতা, সাবিত্রী তার পর মীরাবাই এঁরা প্রাতঃ স্মরণীয়া, প্রণম্যা, ধৃত্বা।

ক্ষয়িষ্ণুদেহকে অতিক্রম করে, দেহাতীত হয়ে জন সাধারণেয় শ্রদ্ধায় এবং স্মরণে আজও এঁরা বেঁচে আছেন আপন আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, আপন আপন অপরিণীত ত্যাগের, শৌর্যের ও আত্মদানের বলে।

এমনি সব প্রাতঃ স্মরণীয়া মহিলারা যুগে যুগে কালে

কালে এই ধূলি ধূসরিত ধরণীতে আবির্ভূত হয়ে কালের সমাজের, সমস্ত বাধা ও গতি কে এমন সমস্ত রূপটাকে পরিবর্তিত করেছেন।

যুগে যুগে সমাজে ও দেশে যে বিপ্লব অ পরিবর্তন আসে আদর্শের শুচিতায় এঁরা তার আলোক সামান্য দেবী হয়ে থাকেন।

যে আদর্শকে বৃকে বেঁধে তাঁরা শত নির্ধ্যাতন, দুঃখাতীত দুঃখ ও বেদনা সয়ে এসেছেন সে নির্ধ্যাতন একদিন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, আদর্শ হয়।

এঁদের ভিতর অনেকেই শিক্ষায় দীক্ষায়, পা সংসার ধর্ম্মে আদর্শস্থানীয়া হয়ে আছেন। তাঁদের আর মৃত্যুর তারিখ দিয়ে মোটামুটি ভাবে বা সাধা তাঁদের জন্ম মৃত্যু হিসাব করলেও—এঁরা যুগের বা সমস্ত প্রভাবকে স্নান করে দেন আপন মহত্বে।

পল্লীর কবি—বাংলার অতীত জীবনে চন্দ্রাবতীকে সেই হিসাব একজন আদর্শ বলে গ্রহণ করতে পারি।

বর্তমানে অতীত গৌরবের প্রতি আমাদে পড়াতে, একদিন ঝাঁরা বিশ্বস্তির অন্ধকারে লুকিয়ে অনাদৃত ভাবে আত্মগোপন করেছিলেন, তাঁর প্রকাশের আলোয় এসে আমোদের নারী জীবন করেছেন। বর্তমান সভ্যতায় ও শিক্ষায় শিখি হয়েও, গৃহে বিদ্যাচর্চা করেই তাঁরা বাংলা সা যে কী ভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন, তা ভাবতেও লাগে, বিখ্যাত মহিলা কবি চন্দ্রাবতী এঁদের এ এঁর রামায়ণ ইত্যাদি পালা গান ময়মনসিং অং স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। স এই ধরণের পল্লীগীতি—বিবাহ সভায় বা যেখানে

মেয়ের একত্র সমাবেশ ঘটেছে—এমনি জায়গায় গান হয়ে থাকে। গীতিকায় নারী চরিত্রই প্রধান—এই পল্লীগীতির বিষয় বস্তু হলো নারীর প্রেম, তার প্রেমের কথা তার আত্ম নিবেদনের কথা, নারীর নারীত্বকে পরিপূর্ণ ভাবে এই সব গীতি কবিতায় চিত্রিত করা হয়েছে।

প্রেমই মানুষকে দেবত্রে নিয়ে যায়। এই ধরণীর ধুলির মাঝে নর বা নারী একান্তভাবে আপনার প্রেমকে, আপনার প্রিয় বা প্রিয়তমাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, একজন আর একজনের স্তনের ও মুখের দিকে চেয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়, দুঃখ, কষ্ট, নির্যাতন হাসিমুখে সহ করে—এরই আভ্যন্তরীণ আমরা দেখতে পাই এই পল্লী গীতিকায়।

এই সব পল্লী গীতিকা—নরনারীর অন্তরের নিভৃত চিন্তার বা গোপন কামনার বিষয় বস্তু হলেও একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় নদী যেমন দূর সমুদ্রের আত্মনাকে উপেক্ষা করতে পারে না, সমুদ্র বাধা বিপত্তি ভাসিয়ে নিয়ে ছোট্ট সমুদ্রের পানে, তেমনি অনেক সময় মিলন আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুল ও তৃপ্তিত হুঁটী আত্ম সমাজের বিধি-ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করে এক হয়ে যেতে চায় বিবাহের ভিতর দিয়ে। সামাজিক ও নানা দৈব দুর্ঘটনায় তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে গেলেও একেবারে ব্যর্থ হতে পারে না।

মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর জীবনে এমনি পরম দুঃখোগ্রাসনে এসেছিল, তাঁর আত্মা, তাঁর মন তাঁর দেহ প্রিয়ের প্রিয় স্পর্শের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মিলন তাঁদের হয় নি। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, আশাভঙ্গের নিদারুণ মনস্তাপে ইনি যৌবনে যোগিনী হয়ে রইলেন এবং আজীবন কুমারী হয়ে সাহিত্য চর্চায় ও দেব আরাধনায় কাল কাটাতে লাগলেন।

এর সাহিত্য প্রতিভা, ভাষার সরলতা ও সরসতা এবং অনাড়ম্বর প্রকাশ ভঙ্গীর জন্য বাংলার জনসাধারণের কাছে তাঁর রামায়ণ গান তাঁর মল্লুয়া ইত্যাদি আজও আনন্দ দান করছে।

চন্দ্রাবতীর পিতা ছিলেন স্বপ্রসিদ্ধ মনসা দেবীর ভাসান গায়ক কবি বংশীদাস ভট্টাচার্য, পল্লী সাহিত্যের

অগ্রতন খ্যাতনামা ব্যক্তি। মহিলা কবি চন্দ্রাবতী হলেন এরই আদরের ছালালী। শিক্ষায় এর অসাধারণ আগ্রহ ছিল এবং তাঁর পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য পুরাণাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। পিতার কবিত্ব শক্তি প্রতিভা ইনি পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছিলেন এবং পিতার পরম ভক্ত ছিলেন।

বংশীদাস ভট্টাচার্য্য কবি ও স্বপ্রসিদ্ধ ভাসান গায়ক বলে প্রসিদ্ধি থাকলেও স্বপ্রসিদ্ধির অল্পপাতে অর্থ লাভ হতো না। স্বতরাং তাঁর ছিল নিত্য অভাবের সংসার। নিত্য অভাবের সংসারে নানাবিধ অনটনের মাঝে এই কাব্য চর্চা কেমন করে চলতো, চন্দ্রাবতী তাঁর সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়ে তাঁর পল্লীগীতি ও গাথার ভিতর দিয়ে তার ঘর সংসারের কথা, তাঁদের অভাবের কথা, তাঁর পিতার তেজস্বিতার কথা, স্বন্দর সহজ ও সরল ভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি পিতার যে তেজস্বিতার ছবি আঁকেছেন তা অপূর্ণ, সে ছবি যেন জীবন্ত। কিন্তু তিনি কোথাও নিজের অন্তরের গোপন ব্যথাকে চাপ দেবার চেষ্টা করেন নি, অতি সঙ্কোচে আপনার মনো-ভঙ্গের দারুণ বেদনা গোপন করে গেছেন। কিন্তু গোপন করলেও রামায়ণ গানের ভিতর সীতার মুখ দিয়ে—সীতার অতীত জীবনের সুখ দুঃখের যে সব কথা বলিয়াছেন তাতে তাঁর অন্তরের গোপন কান্নার সক্রিয় অস্পষ্ট বিলাপ আমরা শুনে পাই। প্রেমে নিরাশ ও ব্যর্থ হয়ে তাঁর দিন ক্ষণ কেমন ভাবে কেটেছিল জনম দুঃখিনী সীতার মুখ দিয়ে চমৎকারভাবে তা প্রকাশ করেছেন :—

আবার মাসেতে দিন রে ঘন বরিষণ

তর্জিয়া গুঁজিয়া আসে গো যত দেবগণ।

মেয়ে তত নাহিকো পানি সীতার চক্ষে যত জল

কান্দিয়া ভিজাই আমি গো অশোকের তল।

বিষ খাই জলে ডুবি গো বুঝিতে না পারি

সাম্বনা করিয়া রাখে সরমা স্বন্দরী।

এইভাবে সীতার দিন যায়, ভাদ্র যায়, আশ্বিনও গেল—

কার্তিক মাসেতে দিন রে ছোট হইল বেলা—

কান্দিয়া কাটাই কাল দিন গো বসিয়া একেলা।

নয়নের জলে মোর গো নদী বইয়া যায়
স্বথের বারতা আইস্যা গো সুরমা জানায়।
কান্দিতে কান্দিতে সীতার অস্থি চর্মসার।
এত দুঃখ ছিল বিধি গো কপালে আমার ॥

কী করণ অথচ কত সজীব সুন্দর! মাত্র তিনটি
পালা গান রচনা করলেও ইনি সাহিত্য রচনা ব্যাপারে
তাঁর পিতাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন। বংশী দাস-
ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদ্মপুরাণে তাই চন্দ্রাবতীর হাতের ছাপ
আছে।

প্রেমে ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে আপনার অশান্ত ও চির-
ক্রন্দনী মনকে ভুলিয়ে রাখবার জন্ত তিনি রামায়ণ গান
রচনায় মন দেন কিন্তু তা সমাপ্ত হবার আগেই নিজের
জীবনের ওপর চির-সমাপ্তির রেখা পড়ে। সে হলো
১৫৭৫ সালের কিছু পরের ঘটনা। এই ধরণের পালা
গান, ব্যাকরণ সম্বত কাব্য আখ্যায়-বিভূষিত না হলেও
পল্লীগীতি হিসাবে আমাদের বাংলা সাহিত্যে এর একটা
বিশিষ্ট স্থান আছে। এর গানের মূল্য আমাদের স্বীকার
করতেই হবে, এর একটা মিষ্টি নিজস্ব স্বর আছে যা
আমাদের কাণ ও মনকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। রচনা ও
নিজস্ব সহজ গতিটা ব্যাকরণ সন্ধি সমাসের ভিতর হারিয়ে
যাযনি কোথাও, নিখুঁত একটা ধারা, অব্যাহত গতিতে
শ্রোতাস্বিনী নদীর মত বয়ে চলেছে। তাঁর এই পালা-
গানের ভিতর কথার মার পাঁচ নেই। তাঁর এই রচনা
করণ সহজ সুন্দর একখানি ছবি মনের সামনে এনে মনকে
মুগ্ধ করে দেয়। সীতার কণ্ঠে তাঁর যে ব্যথা পরম
চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। চন্দ্রাবতীর ব্যক্তিগত
জীবনের তারে যে দুঃখের আশা ও প্রণয়-ভঙ্গের যে
কাহিনী করণ ভাবে বেজেছিল—জনম দুঃখিনী সীতার
দুঃখের মাঝে সে করণ ছবিটা আমরা পুরোপুরী ভাবে
পাই।

‘ছিন্ন মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে’—ইত্যাদি
বলে মহাকবি মাইকেল পঞ্চবটীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা
পড়লে ছবির মত পঞ্চবটীর দৃশ্য আমাদের মনের পটে
ভেসে ওঠে। আর চন্দ্রাবতী বলেছেন :—

গোদাবরী নদীকূলে গো পঞ্চবটী বন
ঘুরিতে ঘুরিতে গো আইলাম আমরা তিনজন
কি করিব রাজ্য স্থখে গো রাজ সিংহাসনে
শত রাজ পাট গো আমার প্রভুর চরণে।
কী চমৎকার। কি শান্ত সহজ কাতরতা ও আত্ম নিবেদন।
তারপর সেই পঞ্চবটীর শান্ত সহজ ছায়ায় আপনার
দিনমান কি করে কাটতো সে কথাও সীতা তাঁর সখীদের
বলেছেন :—

ভোরেতে উঠিয়া মালা গাঁথি গো বনফুলে
আনন্দে পরাই মালা গো প্রভু রামের গলে।
সুন্দর দীঘল প্রভুর গো বাহু উপাধান
প্রত্যেক রজনী গো সীতার এমনি শয়ান।
যুগ মধুর আর গো বনের পশু পাখী
সীতার সঙ্গে সঙ্গী গো তারা সীতার দুঃখে দুঃখী।
শুক সারী দুই ছিল গো পঞ্চবটী বন
বনে হইল প্রতিবেশী গো তারা দুইজন।
কভু বা শুনায় গান গো শুক আর সারি
কাননে বেড়াই গো প্রভু রামের গলা ধরি
কায়ার সঙ্গেতে যেমন ছায়ার ঘুরণ
পর্যন্ত কাননে ঘুরি বেড়াই গো তিনজন।

এইখানেই চন্দ্রাবতীর কৃতিত্ব। জন সাধারণের
উপযোগী করে সাহিত্য রচনা করা অসীম প্রতিভার পরি-
চায়ক। সাহিত্য রচনায় তাঁর প্রতিভা অসামান্য হলেও
আর একদিকে তিনি ছিলেন পঞ্চতপা পার্শ্বতীর মত
তাপনী। সেটা হলো তাঁর প্রেমের দিক—এদিক দিয়ে
তিনি ছিলেন তপস্বিনী। নিজেকে শঙ্করের পায়ে সঁপে
দিলেও প্রিয়তম জয়ানন্দের আকর্ষণকে তিনি একবারে
অস্বীকার করতে পারেননি। মন্দিরের ভিতর পাষণ
দেবতার পূজায় রত থাকতেন আর মন-মন্দির দুয়ারে
চোখ আকুল পিপাসা নিয়ে অপেক্ষায় থাকতো। প্রিয়ের
প্রার্থনা তাঁর কাণে পৌঁছতো না বটে, কিন্তু অন্তরকে পীড়িত
ও চঞ্চল করে তুলেছিল।

প্রেম ও প্রণয়ের মধুর স্বপ্ন বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে
গিয়েছিল। যে জনকে তিনি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলে

ভাবতেন—কৈশোর যৌবনের প্রথম অতিথি হয়ে যিনি ছিলেন সেই জয়ানন্দ বা জয়চন্দ্র তাঁকে প্রতারণা করেছিল কোনও বিধর্মী মেয়েকে ভালবেসে।

প্রিয়ের এ আঘাত তিনি নীরবে সহ করলেও, অন্তর চিরক্রন্দসী হয়ে উঠলো। তারপর যখন জয়চন্দ্র সেই শিব মন্দিরের প্রাঙ্গণে রক্তমালতীর রসে তাঁকে শেষ লিপি দিয়ে মদীতে প্রাণ বিসর্জন করলেন, তখন প্রিয়ের প্রাণ শূন্য দেহ দেখে তাঁর সংঘর্ষের সাধন ছিন্ন হয়ে গেল, আকুল হয়ে কাঁদলেন।

কবিনয়নচাঁদ বলেছেন :—

স্বপ্নের হাসি, স্বপ্নের কাঁদন নয়ান চান্দে গায়।

নিজের অন্তরের স্মৃতি পরকে বোঝান দায়।

প্রেমের নিবিড়তায়, ব্রতচারিণীর একান্ত নিষ্ঠায়, সাহিত্য প্রতিভার উজ্জল আলোকে চন্দ্রাবতী তাঁর সকল কাহিনী নিয়ে পল্লী গীতিকায় গৌরবের ও গর্বের আসনে মরণহীন জ্যোতিতে বিরাজ করেছেন।*

* বারানসী ধামে উনবিংশ প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে পাঠিত।

দেহতত্ত্বের গান

শ্রীননীগোপাল দাশ

প্রাচীন বাংলায় জনসাধারণের মাঝে ধর্মতত্ত্ব শিখাবার জন্য সুন্দর সুন্দর ছড়া গান বাঁধা হত। খড়ের ঘর যেমন একদিন ভেঙে পড়ে, তেমনি আমাদের এ দেহ একদিন না একদিন ভেঙে পড়বে। শত ডাকা ডাকিতে সেদিন এদেহ আর উঠবে না। তাই সময় থাকতে আমাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব কাজ সেরে নেওয়া উচিত। দেহের অসারতা সম্বন্ধে ধর্ম প্রচারকরা যে সব গান বাঁধতেন, তাকে বলা হয় দেহতত্ত্বের গান। গ্রামে গ্রামে এখনও লোকমুখে এই সর্ব গান ও শুনতে পাওয়া যায়। কৃষক তার ক্ষেতে কাজ করবার সময় আর মাঝি তার নৌকা বেয়ে চলার সময় মিষ্টিসুরে গোপন মনে এই দেহতত্ত্বের গান করে। গানগুলির সুর একটু অস্ত্র ধরণের, না শুনলে বোঝান যায় না। গানের সুর ও গান গাইবার পদ্ধতি এমন যাতে অতি সাধারণ মানুষও অতি সহজে গানের গুণ রহস্য বুঝতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হতে পল্লীর শিল্পকলা অনুসন্ধান ও গবেষণা করবার জন্য খুলনা ও যশোর জেলায় বিভিন্ন পল্লীতে নোকায় করে ঘুরবার সময় আমরা মাঝির কাছ হতে এই গানগুলি সংগ্রহ করি। আমাদের পল্লীতে যে সমস্ত ছড়া গান নৃত্য শিল্পগুলি আছে তার সংগ্রহ অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। এখনও

আমাদের পল্লীতে পল্লীতে বাংলার শিল্পকলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে শেষ স্মৃতিটুকু আছে আর দুদিন পর তা আর থাকবে না। ইউরোপেও তাদের প্রাচীন নৃত্য ও লোক গীতির অনুসন্ধান করা হয়। সেসিল সার্প এই অন্দোলনের প্রবর্তক। জাতীয় নৃত্যগীত প্ররক্ষণ ও পুনর্জন্মের সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, নিম্নে তার কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

‘ভাষা ছাড়া আছে রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবদন্তী যেগুলি জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি—এবং তারপর হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়া, জাতীয় খেলাধুলা এবং জাতীয় নৃত্য। এগুলির প্রত্যেকটি উপর আমাদের জাতির প্রত্যেক শিশুর একটা জন্মগত অধিকার বর্তমান রয়েছে, এবং এই জন্মগত অধিকারের প্রয়োগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা একদিকে যেমন অত্যাচার, তেমনি অত্যাচারে অতি অসঙ্গত। সর্বশেষে আছে আমাদের জাতির নিজস্ব লোকসঙ্গীতে—যে সহজ, সরল গান ও সুরের উচ্ছ্বাস বনফুলের মতই অতি স্বাভাবিক ও সহজভাবে আমাদের জাতির ভাষার মতই আমাদের জাতির চরিত্র ও ভাবধারার গভীরভাবে সন্নিবেশ রয়েছে। যদি প্রত্যেক ইংরাজ শিশু এই সব জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হবার সুযোগ পায় তবে সে এখনকার চেয়ে আরো বেশী করে তার স্বজাতির

মানুষদের চিনতে ও বুঝতে পারবে। এবং এই চেনার ও বুঝবার ফলে তাদের বেশী করে ভালবাসতে শিখবে এবং তাদের সঙ্গে তার আত্মার ও প্রকৃতির যে গভীর-সংযোগ তা উপলব্ধি করে সে এখনকার চেয়ে আরো বেশী পরিমাণে আদর্শ-পৌরজন ও স্বদেশপ্রেমিক হয়ে উঠবে।”

তা’হলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাতীয় জীবনে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস সংস্কৃতি নৃত্যগীতকে পুনর্জীবিত করা কত দরকার।

অবোধ মন আমার।

এ ঘরের ভরসা আছে কার ॥

ঘর বান্ধেছেন মন মজাইছেন।

কোন বা সমাদ্দার ॥

ঘরে আড়েদিগে চৌদ্দ পোয়া।

জ্যোৎ দিচ্ছেন দুই খুঁটির পর ॥

অবোধ মন আমার

এ ঘরের ভরসা আছে কার ॥

ও যেদিন ঝড় আসবে প্রলয় হবে।

ভেঙ্গে যাবে তোর সাধের ঘর ॥

অবোধ মন আমার।

এ ঘরের ভরসা আছে কার ॥

(২)

ওরে আজব তরী দেখ্যা করি।

কি গড়ন গড়েছে সারিসারি ॥

আট কোটরী নয় দরজা গো।

আছে যোলজন গ্রহরী ॥

উহার চার খোঁপে চার মহজনী।

শুকনাদে চালায়ে যায় তরী ॥

ও যখন তরী পড়বে পাকৈ।

ভয় পাইয়া পালাবে ছয়জনী ॥

ছয়জনী তার ভাঙ্গা গেলেরে।

আসবে তার সরকারী গঠনা ॥

সকোলে পালায়ে যাবে।

মনোরথ হবে বন্ধাখানা ॥

ও তায় বলেছে অধম রজপালি।

ও ভোলা মন তোরে বলি ॥

ও তুই জোয়ারে ভাসাসনা তরী।

ভাটাতে সরাসরি ॥

মাপ দিলে হয় সাড়ে তিন হাত।

ঠিক বেশী কম নয় তার ॥

(৩)

ও ভাই একতলা ঘর ভবের পরে

ঘর দেখ্যা প্রাণ কেমন করে।

সে ঘরের নাইকো খুঁটি—

আমি বলি দোস্ত পিয়ার

ষত বলি দোস্ত পিয়ার

সেই তো মোরে ব্যস্ত করে

মেপে নিচ্ছে উপরের কাঠি

সিঁড়ির পরে বাঁশ বিছাইয়া

উপরে তার দেয় মাটি

চাল না ঢেকনা

রাস্তা সে ঘর।

আজিমুদ্দি ভাইব্যা বলে

কি জানি কি আছে কপালে

ঘরের মধ্যে বেশম যন্ত্রণা

বলব কিরে তাই সকলে

চিরদিন বিন্দা কেহ বায়না।

(৪)

আমার দেহ জমির আবাদ হ’ল না

গুরুবীজ বুনতে তো পারলাম না।

অনন্ত মোহরের চারখানা

ওসে শব্দ করে কোনজন।

সেবা কোনজন, আমি কোনজন

চার যোগে ঠিক হয় না।

গাম্ভীর্যে কামরান্দাকল খালে

তামিজুদ্দির শেষ তারে যন্ত্রে না।

(৫)

তুই ভবে আইসে রইলি বসে মোন পাজি

তুই পরের কথায় হয়ে রাজি

বসে বসে সব খোয়ালি

মহাজনের পুঁজি।

কাম কর না—

নাম দাও করিম কাজি
যাবার বেলা ভবের খেলা
কে হবে তোর ভবতরীর মাঝি ।
দেখে নৌকার গঠন, দাড়া পত্তন চৌদ্দ পোয়া সার
আমি ভাবছি অনিবার
কোন সন্ধানে আইনে কষ্টেরে
ছুতোর তরী করেছে তৈয়ারী ।
মাঝখানে আগুনের কুণ্ড তাহার
দেখে আগুন, মেতারির গুণ
হাল ধরে বঁসা আছে কতাদার ।
নৌকার পর এক মেয়ে বসে আছে
কোলে তার শিশু নাচে
উর্দ্ধ নয়ন পঞ্চবদন রে শিশুর ।

হাতে চার ফুল আছে

ভুবন মোহন সেই ফুলেরি বাস
বলিছে আবদুল সেই ফুলের মূল
পাব যেয়ে কোন দেশ ।

(৬)

শুভের পর এক দিরাগ পয়দা
রয়েছেন ভবের পরে
আসমান জমিন তারি ভিতরে
ডালছাড়া তার পাতায় চাঁদ ধরে ।
কত ঠাকুর বেটন হাসেম কাজেল
সেই গাছের ঔষ্টুম করে

মোহন-সুর

শ্রীঅম্বকুল চন্দ্র চক্রবর্তী

কে তুমি বাঁধগো সুর !
চির পরিচয় উহার সনেতে
নহে দূর অতিদূর ।
ধরণীর কোলে একেলা অজানা
বিশ্ব ভূলাতে কত যে ছিলনা
মোহন-সুরেতে মোহিত ললনা
ধনিলে করুণ-সুর !
সুপ্ত-বাসনা জাগিয়া উঠিল
বাস-আবরণ জড়ায়ে ধরিল
নিজের লীলায় বিভোর আপনি
বাজালে জলদ-সুর !
কত সে কাকলী মধুর বিরাব
তরীর তায়ে করিছ আলাপ
যন্ত্রী তুমি হে যন্ত্র বাজাবে
বাজিবে তেমনি সুর ।
মধ্যাহ্ন-বেলায় কৰ্ম-ক্লান্ত

অলীকে মিটাতে স্বেদ-সিক্ত
বজ্র-কঠিন অবসাদ-গত
বাজাও দীপ্ত-সুর !
বাজা-ও বাজা-ও বাজা-ও বাণা
এ অবসরে ঘুমালে হবে না
রাগিনীর শেষে বাজিয়া উঠিল
আমার বিদায়-সুর !
অযুত-চেষ্টায় শত-বিনিময়ে
ফিরাতে পারিনা বেলা যায় বয়ে
খেয়া ঘাটে বসি' উন্মি গুণিতে
পশিছে ওপার-সুর !
কে তুমি বাঁধগো ছিন্ন-বীণা !
এতদিনেও কিগো সুর মিলিল না ?
অবসর মত বাজায়ে দেছ
অন্তর-বীণা-সুর !
কার তরে গুণী, বসেছ বাজাতে
ও-সুর গুণিতে ভাল লাগে চিতে
সরুহারার যাবার বেলাতে
বাজাও মোহন-সুর !

ফলদীপিকা

শ্রীগণপতি সরকার

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষেত্র (১), দ্রেকাণ, নবাংশ, দশাংশ, হোরা, ত্রিংশাংশ, সপ্তাংশ, ষষ্ঠাংশ, বোড়শাংশ এবং দ্বাদশাংশ, এই দশটিকে লইয়া দশ বর্গ হয়। *

প্রত্যেক রাশির স্বীয় নবাংশকেই বর্গোত্তমাংশ বলে ॥ ১ ॥

দশাংশ, ষষ্ঠাংশ এবং বোড়শাংশ (পূর্বোক্ত দশবর্গ হইতে) বাদদিলেই সপ্তবর্গ হয়। আর ঐ সপ্তবর্গ হইতে 'সপ্তাংশ' বাদদিলেই ষড়বর্গ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে রাশি-ভাবের তুল্যই নবাংশের ফল বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

ক্ষেত্রের ফল পূর্ণ, অস্তবর্গের ফল অর্দ্ধ, বোড়শাংশ দশমাংশ ও ষষ্ঠাংশবর্গের ফল সিকি।

বিষমরাশির ১ হইতে ৬ অংশ 'বাল'; ৭ হইতে ১২ অংশ; 'কুমার'; ১৩—১৮ অংশ 'যুবা'; ১৯—২৪ অংশ 'বৃদ্ধ' ২৫—৩০ অংশ 'মৃত' অবস্থা। আর সমরাশিতে ইহার বিপরীত। অর্থাৎ—১—৬ অংশ 'মৃত'; ৭—১২ অংশ বৃদ্ধ; ১৩—১৮ অংশ যুবা; ১৯—২৪ অংশ কুমার; এবং ২৫—৩০ অংশ বাল অবস্থা জানিবে ॥ ৩ ॥

ক্ষেত্রের অর্ধেক হোরা (অর্থাৎ ১৫ অংশ)।

বিষম রাশির প্রথমার্দ্ধ রবির হোরা, শেষার্দ্ধ চন্দ্রের হোরা এবং সমরাশির প্রথমার্দ্ধ চন্দ্রের ও শেষার্দ্ধ রবির হোরা।

দ্রেকাণ বলিতে রাশির ত্রিভাগ (অর্থাৎ ১০ অংশ)।

রাশিপতি প্রথম ভাগের, পঞ্চম পতি দ্বিতীয় ভাগের এবং নবমপতি তৃতীয় ভাগের অধিপতি।

রাশির দ্বাদশাংশ বলিতে ১২ ভাগ (অর্থাৎ ২২ অংশ)। এই ভাগ রাশি হইতেই পরপর গৃহীত হইবে। এবং প্রত্যেক রাশির অধিপতিই প্রত্যেক ভাগের অধিপতি হইবে।

ত্রিংশাংশ (অর্থাৎ ঠেঁ অংশ বা এক অংশ); বিষম

(১) যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি, সেই রাশিই সেই গ্রহের ক্ষেত্র; যথা—মেঘ ও বিছা মঙ্গলের ক্ষেত্র, বুধ ও তুলা শুক্রের ক্ষেত্র ইত্যাদি।

* সহজে বুঝিবার জন্য হোরা দ্রেকাণ প্রভৃতির চক্র অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হইল।

রাশিতে মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র যথাক্রমে ৫, ৫, ৮, ৭, এবং ৫ অংশের অধিপতি হইবে। সমরাশিতে উহার বিপরীত অর্থাৎ শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, শনি এবং মঙ্গল যথাক্রমে ৫, ৭, ৮, ৫, ৫ অংশের অধিপতি।

মেঘ, মকর, তুলা এবং কর্কট হইতেই প্রথম নবাংশ আরম্ভ হয় অর্থাৎ নবাংশ বলিতে রাশির ৯ ভাগের ১ ভাগ (অর্থাৎ ৩২ অংশ)। চররাশির প্রথম নবাংশ নিজ রাশি হইতে, স্থির রাশির প্রথম নবাংশ নবম রাশি হইতে, দ্বিষভাব রাশির প্রথম নবাংশ পঞ্চম রাশি হইতে। পরপর নবাংশ ও তাহার অধিপতি পরপর রাশি ও ঐ ঐ রাশিাধিপতি হইবে যথা—মেঘ রাশির প্রথম নবাংশ মেঘ ও উহার অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় নবাংশ বুধ ও উহার অধিপতি শুক্র ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ ঙ্গ বা ৩০ কলা। বিষম রাশির পক্ষে প্রথম, ২য়, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৫শ, ১৬শ, ৩০শ, ৩১শ, ৩২শ, ৩৩শ, ৩৪শ, ৩৫শ, ৩৯শ, ৪০শ, ৪২শ, ৪৩শ, ৪৪শ, ৪৮শ, ৫১শ, ৫২শ, ৫৩শি ভাগগুলিই ক্রুর ষষ্ঠাংশ। এবং বাকি ভাগগুলি সৌম্য ষষ্ঠাংশ। আর সমরাশিতে উল্লিখিত ক্রুর ভাগগুলি সৌম্য এবং অল্লিখিত ভাগগুলি ক্রুর বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

সপ্তাংশ বর্গ নির্ণয়ে ঐ বিষম রাশি পক্ষে স্বরাশি হইতে এবং যুগ্ম রাশি পক্ষে সপ্তম রাশি হইতে পরপর গণনা হইবে।

দশাংশ ১০বর্গ নির্ণয়ে বিষম রাশির পক্ষে স্বগৃহ হইতে পরপর গণনীয় এবং সমরাশির পক্ষে নবম রাশি হইতে পরপর গণনীয়।

বোড়শাংশবর্গের ১৬ ভাগ রাশিতে পরপর অংশের বিধি, হরি, হর ও সূর্য্য অধিপতি। ঐরূপ যুগ্মরাশিতে ইহার বিপরীত অর্থাৎ সূর্য্য, হর, হরি ও বিধি পরপর অধিপতি। বোড়শাংশ বলিতে প্রতি ভাগ ১ অংশ ৫২ কলা ৩০ বিকলা। চররাশিতে মেঘ হইতে পরপর, স্থির রাশিতে সিংহ হইতে পরপর এবং দ্বিষভাব রাশিতে ধনু হইতে পরপর গণনা হইবে।

ত্রিকোণ, মূলত্রিকোণ, স্বক্ষেত্র, তুঙ্গগৃহ, কেন্দ্র ও বর্গোত্তম এই ছয়টি প্রসিদ্ধ স্থানও বর্গান্তর্গত। সপ্তবর্গের সহিত এই

ছয়বর্গ মিলিত হইলে ত্রয়োদশবর্গ হয়, এবং দশবর্গের সহিত এই ছয়বর্গ মিলিত হইলে ষোড়শবর্গ কথিত হয় ॥ ৬ ॥

(প্রসিদ্ধ) দশবর্গের সহিত মিত্রক্ষেত্র, অক্ষেত্র, এবং তুঙ্গ-গৃহ লইয়া ত্রয়োদশবর্গ কল্পনাকরতঃ উহাদের মধ্যে ২টি, ৩টি, ৫টি, ৪টি, ৯টি, ৭টি, ৮টি এবং ৬টি বর্গ, গ্রহ পাইলে যথাক্রমে উত্তম, পারিজাত, সিংহাসন, গোপূর, ঐরাবত, দেবলোক, সুরলোক এবং পারাবত বর্গ হয়। (প্রচলিত নিয়মমত ২টি বর্গে পারিজাত এবং ৩ বর্গে উত্তম) ॥ ৭ ॥

পারিজাত অংশস্থ গ্রহ জাতককে আর্ঘ্য, বহুগুণ সম্পন্ন, অর্থবান্, সুখী এবং বিভব যুক্ত করে। উত্তমাংশস্থ গ্রহ সদাচারযুক্ত, বিনয় সমন্বিত এবং নিপুণ করে। গোপূরস্থ গ্রহ সদবুদ্ধি, অর্থ, ক্ষেত্র, গো এবং গৃহ প্রদান করে। সিংহাসনস্থ গ্রহ রাজপ্রিয় এবং নৃপতুল্য করে ॥ ৮ ॥

পারাবতাংশস্থগ্রহ, শ্রেষ্ঠ অর্থ হস্তি-ও বাহনাদি এবং বিভব প্রদান করে। দেবলোকাংশগতগ্রহ সংকীর্তি এবং ভূমণ্ডলের অধীশ্বর দিয়া থাকে। ঐরাবতাংশস্থগ্রহ রাজভূষণ কর্তৃক বন্দিত এবং ইন্দ্রতুল্য করে। সুরলোকস্থগ্রহ উত্তমভাগ্য এবং ধনধান্য পুত্রযুক্ত রাজা করে ॥ ৯ ॥

গ্রহদশবর্গে দুর্বল হইলে মৃত্যু। দশবর্গের মধ্যে ৯ বর্গে দুর্বল হইলে নাশ (সর্ববিভবধ্বংস)। ৮ বর্গে দুর্বল হইলে দুঃখ। ৭ বর্গে দুর্বল হইলে অনর্থ। ৬ বর্গে দুর্বল হইলে সুখের অভাব। ৫ বর্গে দুর্বল হইলে বন্ধুপ্রিয়। ৪ বর্গে দুর্বল হইলে বন্ধুশ্রেষ্ঠ। ৩ বর্গে দুর্বল হইলে রাজবন্ধু। ২ বর্গে দুর্বল হইলে ধনী এবং ১ বর্গে দুর্বল হইলে রাজা। আর দশবর্গে বলবান্ হইলে শ্রেষ্ঠরাজা বা রাজচক্রবর্ত্তিপ্ৰদান করে।

বধিসু, সুখী, নৃপ, রোগী এবং মৃত ইহা গ্রহের বালাদি অবস্থার পরপর ফল জানিবে ॥ ১০ ॥

শুভ গ্রহ ষড়্ বর্গে অধিকগুণ যুক্ত হইলে জাতক শ্রীমান্ এবং চিরজীবী হয়। লগ্ন ষড়্ বর্গে বহু কুরাংশযুক্ত হইলে জাতককে দীন অন্নজীবী ও শঠ করে।

লগ্নের ষড়্ বর্গের অধিপতিগণ বলবান্ হইলে রাজা। লগ্নের নবাংশপতি, দ্রেকাণপতি এবং লগ্নপতি বলবান্ হইলে যথাক্রমে সুখী রাজতুল্য এবং ভাগ্যবান্ রাজা হয় ॥ ১১ ॥

ক্রুরগ্রহ ওজরাশিস্থ ইহা স্বর্ঘ্যহোরাগত হইলে জাতক বলবান্ ক্রুরবৃত্তি ও ধনাঢ্য হয়। যুগ্মগ্রহগত শুভগ্রহ চন্দ্র-

হোরা গত হইলে জাতক দ্রুতিমান্ বিনয়বাক্ হৃদয় ও সৌভাগ্য যুক্ত হয়। ইহার ব্যস্ত (অর্থাৎ ওজস্ব ক্রুরগ্রহ চন্দ্রহোরাগত হইলে অথবা যুগ্মস্থ শুভগ্রহ রবিহোরাগত) হইলে বিপরীত ফল হয়। আর মিশ্র হইলে শুভাশুভ মিশ্র ফল।

লগ্ন ও চন্দ্র বলবান্ হইলে এবং লগ্নপতি ও চন্দ্রাধিপতি রাশ্যাধিপতি ঐরূপ বলবান্ হইলে জাতক চিরজীবী অহঃখী ও বশস্বী হয় ॥ ১২ ॥

(গ্রহান্তরে যুত ৪টি দ্রেকাণের অল্লাস)

সিংহ, মেঘ, ধনু, তুলা, মিথুন, ইহাদের শেষ দ্রেকাণ, ধনু ও মেঘের প্রথম দ্রেকাণ, কন্যা এবং মিথুনের মধ্যদ্রেকাণ, ইহাদের নাম আয়ুধভূৎ। বৃশ্চিকের মধ্য দ্রেকাণের নাম পাশদ্রেকাণ, মকরের প্রথম দ্রেকাণের নাম নিগল। সিংহ এবং কুম্ভের প্রথম, তুলার দ্বিতীয়কে গুপ্তাশ্র (পক্ষি) দ্রেকাণ কহে। বৃষের শেষ দ্রেকাণের নাম বিহগ। কর্কটের প্রথমদ্রেকাণের নাম কোলানন (শুকরমুখ) ॥ ১৩ ক।

বৃশ্চিকের প্রথম, কর্কটের শেষ, মীনের শেষ দ্রেকাণ অহি সংজ্ঞক। মেঘ ও বৃষের দ্বিতীয়, সিংহের প্রথম ও বৃশ্চিকের তৃতীয় দ্রেকাণকে চতুস্পদ (পশু) বলে।

(সাধারণতঃ) লগ্নটি উল্লিখিত দ্রেকাণগত হইলে তাহার ফল নিধন, ক্রুর, নিন্দিত ও দরিদ্র।

লগ্নদ্রেকাণের ফল কথিত হইতেছে—দ্ব্যাত্মক রাশির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেকাণের যথাক্রমে অধম, মিশ্র এবং শুভ ফল হয়। চররাশির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেকাণের যথাক্রমে, শুভমিশ্র ও মন্দ ফল হয়। এইরূপ স্থির রাশির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেকাণে যথাক্রমে অশুভ, শুভ ও মিশ্রফল হয়, ইহাই পণ্ডিতদিগের উক্তি ॥ ১৩খ।

দ্রেকাণপতি স্বীয় বর্গ প্রাপ্ত হইলে অথবা শুভগ্রহযুক্ত হইলে অথবা উচ্চস্থ বা মিত্রগ্রহে থাকিলে, এইরূপ ত্রিংশাংশপতিও বলবান্ হইলে, ঐরূপ দ্বাদশাংশপতিও বলবান্ হইলে অথবা হোরানাথ ঐরূপ বলবান্ হইলে, অধিলগ্নগমযুক্ত নিত্যশুদ্ধ, প্রবীণ, দীর্ঘায়ু দয়াবান্ স্ত্রুত ও ধনযুক্ত কীর্ত্তিমান্ এবং রাজতুল্য-ভোগ-সম্পন্ন হয় ॥ ১৩গ।

মান্দি যে রাশিতে পড়িবে সেই রাশির অধিপতি যে রাশিতে থাকে তাহার ত্রিকোণ রাশি, অথবা মান্দিরনবাংশ যে রাশিতে পড়িবে সেই রাশির অধিপতির নবাংশের ত্রিকোণ

রাশি, অথবা গুলিকনবাংশের ত্রিকোণ রাশি লগ্ন হইবে।
 ঐরূপ চন্দ্র যেখানে লগ্ন সেখানে হইবে অথবা ঐরূপ চন্দ্র
 বলবান হইলে চন্দ্র হইতেই লগ্ন স্থির করিবে। ১৩৮।

চন্দ্র স্বীয় দ্রোণাণ কিংবা সুহৃদ্ দ্রোণাণ গত হইলে সুন্দর চেহারা ও গুণবান্ হয়। চন্দ্র উত্তমবর্ণপ্রাপ্ত হইলে শ্রেয়ঃ প্রদান করে। চন্দ্রের এইরূপ অবস্থা ব্যতীত চন্দ্র যে রাশিতে থাকে সেই রাশিপতির গুণ প্রদান করে। গ্রহ স্বীয় ত্রিংশাংশ প্রাপ্ত হইলে স্বীয় কারকতা অনুযায়ি গুণ প্রদান করে। তন্মধ্যে ঐ স্বীয় ত্রিংশাংশগত গ্রহ যদি স্বীয় বন্ধু গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট বা যুক্ত হয় এবং স্বগৃহস্থ বা উচ্চস্থ হয় তাহা হইলে ধনবান্ রাজা হয় ১৩। (গ্রহাস্তরের সংখ্যা ১৭)।

এহ উচ্চস্থ হইলে প্রদীপ্ত, মূলত্রিকোণস্থ হইলে সুখী,

স্বগৃহস্থ হইলে স্নান, মিত্রগৃহে আনন্দিত, শুভগ্রাহের বর্গ যুক্ত
হইলে শান্ত এবং উদিত হইলে শত্রু (সমর্থ্য হয় ॥১৪। গ্রঃ ১৮)।

কোন গ্রহ গ্রহের দ্বারা পীড়িত হইলে নিপীড়িত,
পাপগ্রহের বর্গগত হইলে খল, শত্রু গৃহস্থ হইলে ক্ষুণ্ণখিত,
নীচস্থ হইলে অতিভীত এবং অন্তর্গত হইলে বিকল সংস্কার-
প্রাপ্ত হয় ॥১৪।

গ্রহ প্রদীপ্ত অবস্থায় পূর্ণ ফল দেয়। বিকল হইলে শূন্য ফল। মধ্য অবস্থায় অনুপাতে শুভ ফলের তারতম্য হয়। এরূপ অনুক্রমেতে অশুভ ফলদাতা হয়। মোটের উপর নামের অনুসারেই গ্রহদের ফল বর্ণিবে ॥১৬। (গ্রঃ ২০)।

হিত-বিদ্যারত্ন জ্যোতির্ভূষণ জাতকপ্রভাকরোপাধিক
শ্রীগণপতি সরকার কর্তৃক অনুদিত মস্তেখর-বিরচিত ফলদীপিকা
গ্রন্থের বর্গবিভাগ নামক তৃতীয় অধ্যায়।

হোঁরা চক্র

সংখ্যা	অংশ	মেঘ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্না	তুলা	বিছা	ধমু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	১৫	৫৪	৪৮	৫৪	৪৮	৫৪	৪৮	৫৪	৫৪	৫৪	৪৮	৫৪	৪৮
২য়	৩০	৪৮	৫৪	৪৮	৫৪	৪৮	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৪৮	৫৪

৫ অর্থে পঞ্চম রাশি সিংহ; ৬ অর্থাৎ রবি; কোন গ্রহ মেঘ রাশির ১৫ অংশ মধ্যে আসিলে তাহার রবির বা সিংহের হোৱা। ঐরূপ ৪৮ অর্থে কর্কট রাশি চন্দ্ৰের গৃহ। কোন গ্রহ ১৫ অংশের পর ৩০ অংশ মধ্যে মেঘ রাশিতে আসিলে তাহার কর্কটের বা চন্দ্ৰের হোৱা।

ଦ୍ଵେଷାଂ ଚକ୍ର

সংখ্যা	অংশ	মেঘ	বৃষ	শিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	১০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২য়	২০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৩য়	৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

কোন গ্রহ মেঘের ১০ অংশ মধ্যে থাকিলে, উহার মেঘের দ্রেকাণ ;

“ “ “ ২০ অংশ মধ্যে থাকিলে, উহার সিংহের ভ্রেকাণ ;

” ” ” ৩০ অংশ ” ” ” ১১- ধনুর দ্রেকান ।

১, ২ প্রভৃতি মেবাদি ক্রমে রাশি সংখ্যা বৃদ্ধিতে হইবে।

যে গ্রহ যে রাশির দ্রেকাণে পড়ে, ঐ রাশির অধিপতিই ঐ দ্রেকাণের অধিপতি।

অগ্র নবাংশ, দ্বাদশাংশ প্রভৃতি চক্রে সংখ্যাগুলি রাশি জ্ঞাপক ; আর ঐ রাশির অধিপতিই সেই-সেই নবাংশ, সপ্তাংশ, দ্বাদশাংশ প্রভৃতির অধিপতি বন্ধবে।

নবাংশ চক্র

সংখ্যা	অংশাদি	মেঘ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	৩২০	১	১০	৭	৪	১	১০	৭	৪	১	১০	৭	৪
২য়	৬৪০	২	১১	৮	৫	২	১১	৮	৫	২	১১	৮	৫
৩য়	১০১০	৩	১২	৯	৬	৩	১২	৯	৬	৩	১২	৯	৬
৪র্থ	১৩২০	৪	১	১০	৭	৪	১	১০	৭	৪	১	১০	৭
৫ম	১৬৪০	৫	২	১১	৮	৫	২	১১	৮	৫	২	১১	৮
৬ষ্ঠ	২০১০	৬	৩	১২	৯	৬	৩	১২	৯	৬	৩	১২	৯
৭ম	২৩২০	৭	৪	১	১০	৭	৪	১	১০	৭	৪	১	১০
৮ম	২৬৪০	৮	৫	২	১১	৮	৫	২	১১	৮	৫	২	১১
৯ম	৩০১০	৯	৬	৩	১২	৯	৬	৩	১২	৯	৬	৩	১২

কোন গ্রহ মেঘ রাশির ৩ অংশ ২০ কলা মধ্যে পড়িলে তাহার মেঘ নবাংশ। এরূপ কোন গ্রহ বৃষ রাশির ৩ অংশ ২০ কলা মধ্যে পড়িলে তার ১০ রাশি অর্থাৎ মকর নবাংশ ইত্যাদি।

ত্রিংশাংশ চক্র

মেঘ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিহা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
মঃ	শুঃ	মঃ	শুঃ	মঃ	শুঃ	মঃ	শুঃ	মঃ	শুঃ	মঃ	শুঃ
শঃ	বুঃ	শঃ	বুঃ	শঃ	বুঃ	শঃ	বুঃ	শঃ	বুঃ	শঃ	বুঃ
বুঃ	বুঃ	বুঃ	বুঃ	বুঃ	বুঃ	বুঃ	বুঃ	বুঃ	বুঃ	বুঃ	বুঃ
বুঃ	শঃ	বুঃ	শঃ	বুঃ	শঃ	বুঃ	শঃ	বুঃ	শঃ	বুঃ	শঃ
শুঃ	মঃ	শুঃ	মঃ	শুঃ	মঃ	শুঃ	মঃ	শুঃ	মঃ	শুঃ	মঃ

এখানে সংখ্যাগুলি অংশ জ্ঞাপক। কোন গ্রহ মেঘ রাশির ৫ অংশ মধ্যে থাকিলে তার মেঘ বা মঙ্গলের ত্রিংশাংশ; ঐ রাশির ৫ অংশের পর ১০ রাশি মধ্যে থাকিলে কুম্ভের বা শনির ত্রিংশাংশ, এরূপ ১০ অংশের পর ১৮ অংশ মধ্যে থাকিলে বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ; ১৮ অংশের পর ২৫ অংশ মধ্যে থাকিলে বুধের ত্রিংশাংশ এবং ২৫ অংশের পর ৩০ অংশ মধ্যে থাকিলে শুক্রের ত্রিংশাংশ। বিষম রাশিতে গ্রহের বিষম গৃহ এবং সম রাশিতে গ্রহের সমগৃহ বুঝিবে। এইরূপ বৃষ মিথুন প্রভৃতি রাশি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

সপ্তাংশ চক্র

সংখ্যা	অংশাদি	মেঘ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	৪১১৭২	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১	৬
২য়	৮৩০৪১৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭
৩য়	১২৫১২৬	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮
৪র্থ	১৭৮৩৪	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯
৫ম	২১২৫৪৩	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০
৬ষ্ঠ	২৫৪২৫১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১
৭ম	৩০১০	৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২

ইহাতে কেবল অধিপতির ক্ষেত্র সংখ্যা প্রদত্ত হইল। সংখ্যাগুলি রাশি বাচক। অন্যান্য চক্রেও এইরূপ বুঝিবে।

দশমাংশ চক্র

সংখ্যা	অংশ	মেঘ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	৩।০	১	১০	৩	১২	৫	২	৭	৪	৯	৬	১১	৮
২য়	৬।০	২	১১	৪	১	৬	৩	৮	৫	১০	৭	১২	৯
৩য়	৯।০	৩	১২	৫	২	৭	৪	৯	৬	১১	৮	১	১০
৪র্থ	১২।০	৪	১	৬	৩	৮	৫	১০	৭	১২	৯	২	১১
৫ম	১৫।০	৫	২	৭	৪	৯	৬	১১	৮	১	১০	৩	১২
৬ষ্ঠ	১৮।০	৬	৩	৮	৫	১০	৭	১২	৯	২	১১	৪	১
৭ম	২১।০	৭	৪	৯	৬	১১	৮	১	১০	৩	১২	৫	২
৮ম	২৪।০	৮	৫	১০	৭	১২	৯	২	১১	৪	১	৬	৩
৯ম	২৭।০	৯	৬	১১	৮	১	১০	৩	১২	৫	২	৭	৪
১০ম	৩০।০	১০	৭	১২	৯	২	১১	৪	১	৬	৩	৮	৫

দ্বাদশাংশ চক্র

সংখ্যা	অংশাদি	মেঘ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	২।৩০	ম৩	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বু৯	শ১০	শ১১	বু১২
২য়	৫।০	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বু৯	শ১০	শ১১	বু১২	ম ১
৩য়	৭।৩০	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বু৯	শ১০	শ১১	বু১২	ম ১	শু২
৪র্থ	১০।০	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বু৯	শ১০	শ১১	বু১২	ম ১	শু২	বু৩
৫ম	১২।৩০	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বু৯	শ১০	শ১১	বু১২	ম ১	শু২	বু৩	চ৪
৬ষ্ঠ	১৫।০	বু৬	শু৭	ম৮	বু৯	শ১০	শ১১	বু১২	ম ১	শু২	বু৩	চ৪	র৫
৭ম	১৭।৩০	শু৭	ম৮	বু৯	শ১০	শ১১	বু১২	ম ১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬
৮ম	২০।০	ম৮	বু৯	শ১০	শ১১	বু১২	ম ১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭
৯ম	২২।৩০	বু৯	শ১০	শ১১	বু১২	ম ১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮
১০ম	২৫।০	শ১০	শ১১	বু১২	ম ১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বু৯
১১শ	২৭।৩০	শ১১	বু১২	ম ১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বু৯	শ১০
১২শ	৩০।০	বু১২	ম ১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বু৯	শ১০	শ১১

ষোড়শাংশ চক্র

সংখ্যা	অংশাদি	মেঘ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	১।৫২.৩০	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯
২য়	৩।৪৫।০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০
৩য়	৫।৩৭।৩০	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১
৪র্থ	৭।৩০।০	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২
৫ম	৯।২২।৩০	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১
৬ষ্ঠ	১১।১৫।০	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২
৭ম	১৩।৭।৩০	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩
৮ম	১৫।০।০	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪
৯ম	১৬।৫২।৩০	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫
১০ম	১৮।৪৫।০	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬
১১শ	২০।৩৭।৩০	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭
১২শ	২২।৩০।০	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮
১৩শ	২৪।২২।৩০	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯
১৪শ	২৬।১৫।০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০
১৫শ	২৮।৭।৩০	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১
১৬শ	৩০।০।০	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রহের ছয়প্রকার বল আছে, ইহা কথিত হয় যথা—

কালজ বল, চেষ্টাবল, উচ্চবল, দিগ্‌বল, অয়নবল এবং স্থানবল। রাত্রিতে মঙ্গল, চন্দ্র এবং শুক্র বলবান্; অত্র গ্রহসকল দিনে বলবান্ এবং বুধ দিব্যরাত্রি সর্বদাই বলবান্। শুভগ্রহগণ শুক্র পক্ষে বলবান্ ও অবশিষ্ট গ্রহগণ কৃষ্ণ পক্ষে বলবান্। গ্রহনিজের বর্ষে পাদবলী, নিজের মাসে অর্দ্ধবলী, নিজের দিনে ত্রিপাদবলী ও নিজের হোরায় (ঘণ্টায়) পূর্ণবলী (৪ পাদ বা একরূপ বল) হয়। ১

পূর্ণিমার চন্দ্রের চেষ্টাবল, উত্তরায়ণে সূর্যের চেষ্টাবল, ও অত্র গ্রহবলী হইলেই তাহার চেষ্টাবল আছে। উত্তর দিকস্থ প্রথর তেজশালী (অর্থাৎ উত্তর দিকে উদ্ভিত) গ্রহই যুদ্ধে জয়ী হয়।

তুঙ্গগ্রহের উচ্চবল আছে। রবি এবং মঙ্গল দশমস্থ হইলে, চন্দ্র ও শুক্র চতুর্থস্থ হইলে, বুধ এবং বৃহস্পতি লগ্নগত হইলে, শনি সপ্তমস্থ হইলে দিগ্‌বলী হয়। বুধ, শনি এবং চন্দ্র দক্ষিণায়ণে অয়ন বলী হয় এবং অবশিষ্ট গ্রহগণ উত্তরায়ণে অয়নবলী হয় ৥২

গ্রহ স্বীয় (ক্ষেত্রাদি) ষড়্‌বর্গস্থ হইয়া উচ্চ স্বক্ষেত্র বা মিত্রগৃহগত হইলে স্থানবলী হয়। এবং ঐ স্থানবলী গ্রহ কেন্দ্রে থাকিলে পূর্ণবল, পণফরে অর্দ্ধবল এবং আপোক্রমে পাদবল প্রাপ্ত হয়।

নপুংসক গ্রহ মধ্যকালে, পুরুষগ্রহ আরম্ভে ও স্ত্রীগ্রহ শেষ কালে বলী হয়। শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র এবং রবি ইহারা পরপর নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক বলবান্ হয়। ৩

গ্রহ বক্রী হইলেই বলবান্ এবং গ্রহ নীচস্থ, শত্রু গৃহস্থ কিংবা নীচাংশস্থ, শত্রুনাংশস্থ হইয়াও উজ্জল রাশি সমূহে পরিপূর্ণ (অর্থাৎ পূর্ণ উদ্ভিত) হইলে বলবান্ হয়। গ্রহ উচ্চস্থ, মিত্র গৃহস্থ অথবা স্বক্ষেত্রস্থ হইয়া চন্দ্রের স্রায় হতদীধিতি (অর্থাৎ গ্রহযুদ্ধে পরাজিত কিংবা সূর্য্যদীপ্তাংশ গত হইয়া অন্তর্মিত) হইলে দুর্বল হয়। ৪।

সকল গ্রহই তুঙ্গস্থ হইলে বলবান্ হয়। চন্দ্রের পক্ষ-বল শ্রেষ্ঠ। সূর্য্য দিগ্‌বলী (অর্থাৎ দশমস্থ) হইলেই বলবান্। তারাগ্রহগণ (অর্থাৎ, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি) বক্রী হইলেই বলবান্। রাহু কর্কট, বুধ, মেঘ, কুস্ত, বৃশ্চিকস্থ

হইলে এবং কেতু, কন্না, মান, বুধ এবং ধনুর শেষার্দ্ধ গত ও পরিবেশ অথবা ইন্দ্রধনুসহ যুক্ত হইয়া রাত্রিকালে রবিচন্দ্রযুক্ত হইলে, বলবান্ হয়। ৫।

লগ্ন মনুষ্যরাশিতে একরূপ (পূর্ণ) বল, বৃশ্চিকে পাদবল, অত্র রাশিতে অর্দ্ধবল যুক্ত হয়। লগ্ন ও লগ্নপতির বল তুল্য; কিন্তু লগ্নপতি উপচয়গত হইলে লগ্ন অতি বলশালী হয়। আর লগ্ন যদি শুক্র বুধ শুক্র দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয় এবং অত্রগ্রহ কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট না হয় তাহা হইলেও লগ্ন অতিবলী হয়। রাত্রি সংজ্ঞকরাশি রাত্রি জন্মকালে এবং দিব্যসংজ্ঞক রাশি দিব্য জন্মকালে বলা হয়। ৬।

গ্রহ উচ্চস্থ হইলে পূর্ণ বল; মূলত্রিকোণস্থ হইলে ত্রিপাদ; স্ব-ক্ষেত্রস্থে অর্দ্ধ; মিত্রগৃহে একপাদ; শত্রুক্ষেত্রে অল্পবল; নীচস্থ বা অন্তগত হইলে ক্ষেত্রবল শূন্য হয়। ৭।

কেন্দ্রস্থগ্রহগণের বল সম্বন্ধে বাহা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে চতুর্থ, দশম, সপ্তম এবং লগ্নের বল পরপর পাদক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৮।

গ্রহের সপ্তম গৃহের উপর যে দৃষ্টি তাহাই পূর্ণ দৃষ্টি, ইহাই সর্বত্র বলা হয়। অত্র গৃহে দৃষ্টি শ্রেষ্ঠ নয়। পরন্তু গ্রহের (মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতির) যোগাদি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি যে কম বলবান্ ইহা কেহই বলেন নাই। ৯।

নৈসর্গিক শত্রু মিত্রত্বই সম্যক ফলদায়ি বলিয়াই প্রামানিক। আর তাৎকালিক শত্রু-মিত্রত্ব কার্য্য বশেই ধর্তব্য, ইহা অনিত্য (অর্থাৎ সর্বদা গ্রাহ্য নহে)। ১০।

সমগ্র গ্রহের মধ্যে নিঃশেষ দোষ হরণে এবং শুভ বর্দ্ধনে শুক্রর বীর্ধ্যই অধিক। বুধ এবং শুক্রের এই শক্তি শুক্র অপেক্ষা ১ এক পাদ কম। (মন্ত্রদেশীয় সূত্রজ্ঞা শাস্ত্রীর মতে এই শক্তি বুধের ১ পাদ এবং শুক্রের দ্বিপাদ)। সকল গ্রহের বলবত্তার বীজ অর্থাৎ কারণই চন্দ্রের বল (অর্থাৎ জাতকের চন্দ্র দুর্বল হইলে অত্র গ্রহের বলশালিত্ব পূর্ণ ফল নহে)। ১১।

চন্দ্রের জাত দণ্ডকে পলে আনিয়া উহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে উহার নাম চন্দ্রক্রিয়া। উক্ত পলকে ৩০০ দিয়া ভাগ করিলে প্রাপ্ত ফলের নাম চন্দ্রাবস্থা। এবং উক্ত পলকে ১০০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে তাহাই চন্দ্রবেলা ৥১২।

রবীন্দ্রনাথের কথা

ত্রিযোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
(পূর্বানুবর্তি)

সত্তর বৎসর জন্মোৎসব

১৯৩১ সালে ১৪ই মার্চ এম্পায়ার থিয়েটারে বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যে নূতন নৃত্য-নাটক 'নবীন' লিখিয়াছিলেন তাহারই অভিনয় হয়। কবি স্বয়ং এক একটি গান আবৃত্তি করিতে লাগিলেন তাহার ভাব গীত ও নৃত্যের দ্বারা পরিবেশিত হইয়াছিল। কবির সত্তর বৎসর বয়স হওয়াতে ২৫শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে সমারোহে জন্মোৎসব সম্পাদিত হয়। সমগ্র ভারতের বহু স্থানে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব সমস্ত বছর ব্যাপীয়া চলিতে থাকে। তাঁহার সত্তর বৎসর বয়সের জন্মোৎসব স্মরণীয় করিয়া রাখিবে, তাঁর "রাশিয়ার চিঠি" মুদ্রণ।

কলিকাতায় রবীন্দ্র জয়ন্তী

১৯৩১ সালে ১৬ই মে সকল সম্প্রদায়, সকল জাতির সকল ভাষাভাষী বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' করিবার ইচ্ছায় উনিভাঙ্গিট ইনষ্টিটিউট হলে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি মহামাহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী সেই সভার সভাপতির পদে বৃত্ত হন। উক্ত সভায় রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবন কামনা করা হয় এবং শীত কালে বিশ্ববরেণ্য কবির জয়ন্তী উৎসব করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং একটি গুণীজন বহুল সমিতির উপর রবীন্দ্রজয়ন্তী সম্পাদনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। শ্রর জগদীশ বসু সেই সমিতির সভাপতি, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমলচন্দ্র হোম ও শ্রীশ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ রবীন্দ্রনাথকে "কবি সার্কভোম" উপাধি প্রদান করেন। ২৫ শে ডিসেম্বর হইতে এক সপ্তাহ রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব বিপুল সমারোহের সহিত কলিকাতায় সম্পাদিত হয়। উক্ত দিবস টাউন হলে ও তাহার প্রাঙ্গণে

বিরাট শিল্প প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মানিক্য বাহাদুর করেন। এই প্রদর্শনীতে (১) কবির অঙ্কিত প্রায় একশত চিত্র (২) কবির বহু পুস্তকের পাণ্ডুলিপি (৩) বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত কবির পুস্তক সমূহ (৪) কবির উপর লিখিত গ্রন্থ (৫) নানাদেশ বিদেশ হইতে প্রাপ্ত উপহার ও উপঢৌকন (৬) বিশ্বভারতীর শিল্প সন্ভার (৭) কবির বিভিন্ন বয়সের গৃহীত বিভিন্ন দেশের বহু প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়া ছিল। মেলায় কথকথা, যাত্রাদি নানাপ্রকার বাঙ্গলার নিজস্ব আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। উদ্বোধন সময় কবি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

এই দিবস অপরাহ্নে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য বৈঠকে কবির রচনার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়।

পরদিন ২৬শে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিধি নানা শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র, বিভিন্ন ভাষার ও জাতির সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মহা সম্মেলন হয়। শ্রর রাধাকিশন সেই সভার উদ্বোধন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, কর্ম, সমাজ, মানবত্ব ও বিশ্বপ্রেমের অবদানের সম্যক আলোচনা হয়।

২৭শে টাউন হলের সম্মুখে বিরাট জনসভায় কবিবরকে সম্বর্ধনা করা হয়। কলিকাতা করপোরেশনের মেওর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পৌরসভার অভিনন্দন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রর প্রফুল্লচন্দ্র রায় পরিষদের অভিভাষণ, অম্বিকা বাজপাই হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণ, শ্রীমতী প্রতিভা দেবী প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের প্রশস্তি—পত্র এবং সমগ্র দেশের পক্ষে মহিলা কবি শ্রীমতী কামিনী রায় বঙ্গবাসীর অভিনন্দন পত্র পাঠ ও শ্রীতি উপহার প্রদান করেন।

একটি উচ্চ মঞ্চে কবিকে বসান হয়। ৫টী বালিকা (তাহার মধ্যে আমারই কন্যাঘর ৬নিশারানী ও ৩উমারানী

ছিল। মাদ্রিক দ্রব্য সম্ভার লইয়া মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীর স্বস্তি বচন পাঠের সহিত কবিরকে বরণ করে; উলু ও শঙ্খ ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠে। এমন মহতী সম্বন্ধনা উৎসব জীবনে দেখি নাই।

বিশেষ মনিবাগণ রবীন্দ্রনাথের অবদানের যে সমস্ত গুণগান লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দর ও সুদূরপে সংগৃহীত ও সম্পাদিত করিয়া এক বিরাট গ্রন্থ "The Golden Book of Tagore" মুদ্রিত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই পুস্তক একখণ্ড সুদূর মূল্যবান আধারে করিয়া কবিকে উপহার প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে তিন দিনই সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের সমধুর বৈটক ও জলসা উনিভান্দিটি ইনষ্টিটিউট হলে হয়েছিল।

তারপর তিন দিন কবির জোড়াসাঁকোর বাটিতে বিখ্যাত "নটর পূজা" অভিনয় হইয়াছিল। প্রত্যেক দিনই সত্তর বছরের বৃদ্ধ কবি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভূমিকা কেমন সহজে উৎকর্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা দর্শকমাত্রই অবগত আছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্য পরিষদে ২৩শে ডিসেম্বর প্রীতি সম্মেলন ও সম্বন্ধনার আয়োজন হয়। এই দিন পরিষদ মন্দিরে শ্রী পি, সি, রায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তির মধ্য ফলক (শ্রীমল হোম কলক উপস্থিত) প্রতিষ্ঠা করিয়া রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

বাক্সার ছাত্রগণ সিনেট হলে মহতী সম্মেলনে রবীন্দ্র নাথকে সম্বন্ধনা করেন। কবি তাহার প্রতি উত্তরে অতি সারগর্ভ প্রবন্ধে তাহার কবি জীবনের বিকাশের মূল তথ্য প্রকাশ করেন। বাক্সার ও একখানি রবীন্দ্র প্রশস্তি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

দ্বাদশবার বিদেশ ভ্রমণ—পারস্য

১৯০২ সালের ১১ই এপ্রিল পারস্য দেশের অধিপতির আমন্ত্রণে দম্ভম্ বিমান পোতাশ্রয় হইতে বিমানযোগে পারস্য দেশে গমন করিয়াছিলেন। এবার সঙ্গে ছিল

পুত্রবধূ, অমিয় চক্রবর্তী, কেরার নাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়-গণ। পারস্য রাজ্য সীমানায় প্রবেশ করা মাত্রই বেতারে পারস্য গভর্নমেন্ট অভিনন্দন বার্তা পাঠান।

১৩ই এপ্রিল বুশায়েরে বিমানপোত হইতে অবতরণ করিলে তৎ প্রদেশের গভর্নর সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং সেই রাত্রে এক বিরাট ভোজে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ছিলেন। ১৬ই এপ্রিল সিরাজ নগরে রাজোচিত সন্মানের সহিত কবিকে অভ্যর্থনা করা হয়। কবি কয়েক দিন অতি প্রফুল্ল চিত্তে সিরাজে অবস্থান করেন। তিনি এক দিবস হাফেজের কবরস্থানে গমন করিয়া শ্রদ্ধাজলী প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রাচীর পার্শ্বপল্লিস নগর হইয়া ২২শে এপ্রিল ইম্পাহানে উপস্থিত হন। সেখানে গৌরবাসীরা কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। সেখান হইতে পারস্যের রাজধানী তিহারন নগরে গমন করেন। তথায় গৌরবাসী রাজ সরকার, বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বর্গের, সমগ্র জনসাধারণের আদর আপ্যায়ন সম্বন্ধনা ও অভ্যর্থনা পাইয়া দুই সপ্তাহ পরম আনন্দে ও মর্যাদার সহিত অবস্থান করেন; ২রা মে পারস্যের অধিপতি মহামাত্র রেজা সাপেহলারী রবীন্দ্রনাথকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। কবি তাহার সন্মানে নিজের রচিত একটা পদ্য লিখিয়া উপঢৌকন দেন। তাহারই আদেশে কবির ৭২ বোৎসরিক জন্মোৎসব মহা সমারোহের সহিত রাজধানীতে সন্মিলন হয়।

সামরিক তোপধ্বনির বহুরে সামরিক ভোজ ও প্রীতি সম্মেলনে কবিকে সম্বন্ধনা করেন যাবতীয় সংবাদ পত্র এক বাক্যে "The Greatest star shining in the Eastern sky" বলিয়া সম্ভব্য লিখিয়া ছিল।

ইরাক রাষ্ট্র হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ বাগদাদে গমন করেন। সেখানে রাজা ফাইজলের সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। গৌরবাসীরা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধনার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। বাগদাদ হইতে বিমান পোতে করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালের ৩রা জুন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব সম্প্রদায়িত বাঙ্গলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

পদ গ্রহণ করেন এবং 'উনিভার্সিটি ছাত্রদের নিকট কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরম গৌরবের 'কমলা লেকচারার' নির্বাচিত হন এবং কয়েকটি বক্তৃতা বাঙ্গলায় প্রদান করেন।

১৯৩২ সালের ৬ই আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হয়। ৮ই আগষ্ট তাঁহার একমাত্র 'দৌহিত্র' নিতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর জন্মদীপ্তিতে মৃত্যু হওয়ার সংবাদ পান। গদ্য-পদ্য পুস্তক 'পুনশ্চ' রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন ধারা প্রবাহিত করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৫৭ বৎসর জন্মোৎসব অরণে "কালের যাত্রা" গদ্য-পদ্য বইখানি লিখিয়া তাঁহার নামে উৎসর্গ করিলেন।

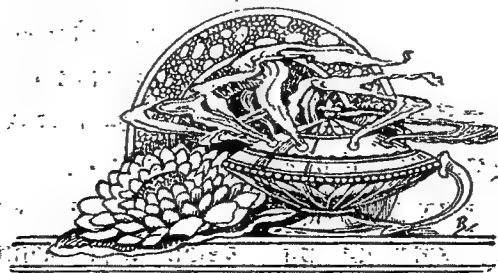
২০শে সেপ্টেম্বর সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা দ্বারা উন্নত অহুমত হিন্দুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি আশঙ্কায় মহাত্মা গান্ধির অনশন ব্রতের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। বর্ণ হিন্দু ও অহুমতদের মধ্যে প্রভেদ নষ্ট করিবার জন্ত কবি দেশবাসীকে নিকট কাতর নিবেদন জানান। ২৪শে সেপ্টেম্বর অনশনে গান্ধির জীবন বিপন্ন হইয়াছে শুনিয়া পুণায় ছুটিয়া যান। যরবেদা জেলে মহাত্মাজী তখন নিদান অবস্থায় শায়িত—রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সম্রাজ্যের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী রামজি ম্যাকডোনাল্ডের নিকট এই বাটোয়ারা সংশোধন করিয়া মহাত্মাজীর মূল্যবান জীবন রক্ষা করিবার জন্ত কাতর নিবেদন জানাইয়া 'কেবল' করেন। ২৬শ তারিখে প্রধান মন্ত্রী মহাত্মার অহুমতদের বাটোয়ারা মীমাংসায় সম্মত হওয়াতে, যখন গান্ধিজী অনশন ব্রত ত্যাগ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা ও গান গাহিয়া মহাত্মাজীর প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। সত্য ও স্নহের প্রতীকের

অপূর্ব মিলনের দৃশ্য শ্রীমতী সরেজিনী নাইডু ১৯৪১ সালের ৩০শে আগষ্টে কলিকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রস্মৃতি বাগুরে মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন।

১৯৩২ সালে ২রা ডিসেম্বর যখন পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য শান্তিনিকেতনে গমন করেন কবি সাহসে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতার টাউন হলে আচার্য্য প্রফুল্ল রায়ের সত্তর বৎসর জন্মোৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রুর ডেনিয়াল হামিলটনের প্রতিষ্ঠিত গ্লোসাক পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। পারস্যের হিজ মাজিটি সা অধ্যাপক পৌরে দাউদকে শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়াছিলেন। কবিতার সমাদর করেন।

১৯৩৩ সালের জাহুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ "কমলা লেকচার" বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশ প্রদান করেন। ১৮ই জাহুয়ারী দিনেট হলে রামমোহন শতবার্ষিক উৎসবের প্রাথমিক সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ২৫শে জাহুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতলু অধ্যাপক হিসাবে Fusion of Knowledge বক্তৃতা দেন। ১৯৩৩ সালে মাঘ মাসে কলিকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে "শাপমোচন" অভিনীত হয়। এপ্রেল মাসে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করিয়া দিবার জন্ত নিখিল ভারতের নেতৃবৃন্দ যে আবেদন পত্র পেশ করেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম স্বাক্ষর করেন। এই বৎসর শান্তিনিকেতনে উদয়শঙ্কর গমন করিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১২ই সেপ্টেম্বর ম্যাডান থিয়েটারে "তাম্রের দেশ" অভিনয় হয়। কবি অভিনয় সময়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকিতেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দ'র উপর ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা দেন। (ক্রমশঃ)



বাঁধ ও বন্যা

পূর্বাহ্নরুত্তি

শ্রীমনোজ বসু

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চের আলো জ্বলিলে দেখিলাম, ভৈরব-নদের উচ্চ পাড়ের উপরে রাস্তা। দূরে ভৈরবের কালো জল খানিকটা নজরে পড়িতেছে। বেলা অপরাহ্ন। কুবক শ্রেণীর কতক গুলি নরনারী (তাহাদের মধ্যে মহেশ, নিমাই প্রভৃতি অগ্রবর্তী) অনতিদূরের খেয়া পার হইয়া এই পথে দল বাধিয়া যাইতেছিল। কেহ ফুল লইয়াছে, কেহ শস্য, কেহ প্রদীপ—এমনই সব। উল্টা দিক দিয়া বল্লভ সঙ্গীর তাহাদের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল।

বল্লভ। কোথায় চলেছ সব? নেমন্তন্ন? একি... হাতে ফুল, শস্য, বড় বড় ফুলের মালা, পিদ্দিনম—

মহেশ। আমরা যাচ্ছি মজুমদার-বাবুদের বিরাম-বাড়ি।

বল্লভ। আজ সাতাপে। শ্রীমল মজুমদার এই দিনে খুন হইয়েছিল। তোমরা সেই ঘরে ফুল ছড়াবে, পিদ্দিনম দেবে? আজ বড় মজব!

[বল্লভ প্রবল শব্দে হাসিয়া উঠিল। লোকগুলি বিমুঢ় ভাবে চাহিয়া রহিল।]

নিমাই। তা মজব বই কি। কর্তার মেয়ে পরিবার—সব কলকাতা থেকে এয়েছে, আমাদের খবরা-খবর করতেছেন। পেলায় কাণ্ড।

বল্লভ। আর ওদিকে কত বড় কাণ্ড হচ্ছে, খবর রাখ? ভৈরব বছর বছর তোমাদের ক্ষেত-খামার গরু বাছুর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গাঙের সে দেমাক ভেঙে ফেলেছি। মস্ত বড় বাঁধ—কত মানুষ দিন-রাত্রি খেটে গড়ে তুলছে।

ঐ যারা মেয়েমানুষ—তাদের কথা ধরিনে। কিন্তু তুমি? তুমি? তুমি? তোমরা না পুরুষ-বাচ্চা! এ অঞ্চলের সকল জোয়ান কোদাল মেয়ে হিমসিম হয়ে গেল, আর তোমরা ফুলের সাজি নিয়ে চলেছ...লজ্জা করে না।

মহেশ। কি বলছ, বলভ? বাঁধ বাঁধতে আমরা কি যাই নি? তবে আজকে হল একটা বিশেষ দিন—

বল্লভ। হাঁ—বিশেষ দিনই আজ। আজ পঞ্চমা—ভরা কোটাল। তার উপর ঐ আকাশে মেঘ থমথম করছে। রাত্রে জোয়ার আসবার আগেই বাঁধ শেষ করতে হবে। যদি এক হাতও বাকি থাকে, কাল সকালে কিছু থাকবে না, সব মাটি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। হু-হু করে গাঙের জল বাড়ছে...জল ঢুকতে পারে। ত সমস্ত বাঁধ ভাঙবে... তোমাদের কপাল ভাঙবে। বজ্রার হুংখ জানো না তোমরা? গাছের ডালে মাচা বেঁধে সমস্ত রাত্রি বউ-ছেলের হাত ধরে কাপোনি-কখনো?

মহেশ। বাঁধ তাইলে রাতের মধ্যেই শেষ করতে হবে?

বল্লভ। রাতই বা পাছ কোথায়? জোয়ারের আগেই।

মহেশ। নিমাই ভাই, চল তবে ঐ-দিক পানে। বড় বউ, তোমরা এগুতে লাগ, আমাদের যাওয়া হবে না। তাতো ঠিক, একর বেঁধে এনে একটুর জন্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে...

বল্লভ। (উৎফুল্ল ভাবে) হ্যাঁ...কেলো পিদ্দিনম, ফেলে দাও ফুলের মালা। শকু মঠের কোদাল ধরে ওদের ডেকে বলো, 'ভাই-সব আমরাও সঙ্গে আছি।' ওদের গায়ে অস্ত্রের বল আসবে। কতক্ষণ লাগবে বাঁধ শেষ করতে!

[মহেশ তাহার হাতের ফুল প্রভৃতি সহ-বাত্রিণী একটি বউয়ের হাতে দিতে যাইতেছিল, কিন্তু নিমাই ঘাড় নাড়িল]

নিমাই। না,—সে হয় না মোড়ল। আমরা বরং তাড়াতাড়ি ওদিককার কাজ সেরে বাঁধের ওখানে আসব। রাণী-মা ডাকাডাকি করছেন, খুকীরাণী ডাকছেন, নন্দলাল পাড়ায় ঘুরে ঘুরে আমাদের এই খেয়াঘাট অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল। এবার নাকি লোকজন মোটে হচ্ছে না—এর পর এই অবস্থায় আমরাও না গেলে কি রকমটা হবে।

বলভ। নন্দলাল খুব ডাকাডাকি করে বেড়াচ্ছে বুঝি! মোটে লোক হচ্ছে না? (প্রবল হাসি হাসিতে লাগিল।) নন্দ-দা বড়ো হয়েছে, শিরদাঁড়া বেকে গেছে, কোদাল তুলবার মরোয় নেই...ফুল তুলতে পারে। নিজে তাই করছে, দশজনকেও সেই রকম করাতে চায়। হয় রে কপাল! এক ওস্তাদের কাছে লাঠি শিখেছি; নন্দদা'র হাঁকে তখন 'বিশ গায়ের' লোক কেঁপে উঠত—

[খেয়াঘাটের দিক হইতে নন্দলাল আসিয়া উপস্থিত হইল]

.. নন্দ। কি হয়েছে নন্দলালের? এই যে বলভ...এর কি বলছিলে?

বলভ। বলছি নন্দ-দা, যে, মরা গরুকে ঘাস খাওয়াও কেন? যতই ফুল ছড়াও, আর আলো আলো—শ্রামল মজুমদার চিতা থেকে উঠে এসে কাছারি আলো করে বসছেন না। ওতে কিছু লাভ নেই।

নন্দ। (জুহু কণ্ঠে) লাভ লোকসান খতিয়ে তুমি জাস্ত গরুর লেজ ধরে বেড়াও গে। জিজ্ঞাসা কর, দেশস্বল্প জুটির নিয়ে বেইমানের দল বলতে চাও? সবাই বুঝি তোমার রামেশ্বর-রায়ের পিছনে ঘুরবে, দিনকে রাত বলবে—

বলভ। মিছে চট্‌ছ নন্দ-দা, সবাইকে বাঁচতে হবে ত।

নন্দ। না...এমন বেঁচে কাজ নেই। মরুক—মরুক ওরা। বলভ, এক ওস্তাদের কাছে আমরা লাঠি সড়কি শিখেছিলাম। সে-সব সোজা জিনিস, বুকের উপর সোজা এসে পড়ে। কিন্তু অঞ্চলটা জুড়ে এই যে মানুষ খেপাচ্ছে আর ধাপ্পাবাজির জাল ছড়াচ্ছে—এ শিখলে কোন ওস্তাদের

কাছে শুনি? প্রজাদের দিয়ে খাজনা বন্ধ করেছ...তারও না হয় মানে বুঝি, তারা নিরস্ত। কিন্তু মরা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা কেন? এই দিনে আট-দশ কোশ দূর থেকেও মহালের প্রজারা সর আসে, ফুল ফুলে পাহাড় জমে যায়, এরার দশটা মানুষও এলো না। আমার খুকীদিদি বসে বসে কাঁদবে। কেন এ-সব? আমরা বলতে হবে, না বললে ছাড়ব না—

[নন্দলাল বলভের হাত ধরিল]

বলভ। মুখে বলব কি নন্দ-দা, চোখে দেখে যাও। রাগ করে নিশ্চয় চোখ বুজে থাক, তাই এদিন দেখনি। না—না, আমি শুনব না...আমি কিছুতে ছাড়ব না...এগিয়ে এসো...দেখে যাও, মানুষ সব কোথায় গেছে, কি করছে তারা—

[বলভ কথা বলিতেছে, আর মকের আলো কমিয়া আসিতেছে। মক ধীরে ধীরে ঘুরিতে লাগিল। নন্দলাল ঘাড় নাড়িয়া মহা আপত্তি জানায়, কিন্তু বলভ এক-রকম জোর করিয়াই তাহার হাত ধরিয়া আগাইয়া চলে। ক্রমশঃ নন্দ-দার দলটি পিছনে চলিয়াছে। ক্রমশঃ আলো নিভিল। বলভের কথা অস্পষ্ট হইতে হইতে ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল।]

আবার যখন আলো জলিল, তখন তাহার বাঁধের অনেকটা কাছাকাছি আসিয়াছে। দূরে আধ-অন্ধকারে দেখা যাইতেছে, ছায়ামূর্তির মতো অসংখ্য লোক বাঁধের কাজ করিতেছে। বলভের কথা অস্পষ্ট হইতে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল।

বলভ। দেখ নন্দদা...তোমরাও সব দেখ-যারা ফুল-শাখা বয়ে নিয়ে যাচ্ছ। কত বড় বাঁধ হয়েছে...দৈত্যের মতো বড় বড় লক গেট। দিনের পর দিন এই সব মানুষ গড়ে তুলেছে। দেখে বুক ভরে ওঠে না? কাল-ভৈরব বানের জলে সব ভাসিয়ে নিত, মানুষের হা-কারে আকাশ চোচির হয়ে যেত...এবার কেমন জ্বল! জলের ঢেউ বাঁধের গায়ে মাথা খুঁড়ছে—যেন মাঝাকরা কাঁদছে...শুনতে পাচ্ছ? যাও—ফুলটল মালিকদের হাতে দিয়ে চলে যাও। ওদের সঙ্গে খাটিতে না পার, মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে একটিবার দেখে এসো।

[মহেশ প্রভৃতি পুরুষেরা হাতের ফুল ইত্যাদি মেয়েদের হাতে দিতে গেল। কিন্তু তাঁহারা ঘাড় নাড়িয়া ফিস-ফিস করিয়া কি বলিলেন, কেহই লইলেন না। কৃষকদের সকলেই বাঁধের দিকে আগাইয়া চলিল।]

নন্দ। সত্যি চললে তোমরা? সবাই চললে?

মহেশ। কি করব, মশাই, বড় রউকে তৎপর করি এত করে, তা এরাও বীথি দেখতে বাবে বলছে।

নন্দ। কেউ যাবে না? থুকা দিদি তোমাদের নিজের হাতে খাওয়াবেন বলে উয়গ করে আসছেন, রাণীমা ঘর-বার করছেন। আমল মজুমদারের মৃত্যুদিন আজ—প্রজাদের ভালর জন্ত চিরদিন তিনি খেটে গেছেন—আর আজ কোন প্রজা যাবে না, ভাববে সে কেউ একটা ফুল দেবে না।

বল্লভ। ফুল দিলে পড়বে পাথরের মেয়ে, মালা ঝুলিয়ে দিতে হবে চুপের দেওয়ালের উপর। মহেশ মোড়ল, নিমাই সন্দার, মা লক্ষ্মীরা সব যাও—দেখে এসে আগে—তারপর ভালবেসে ফুল দিতে হয়ত দিও-ওই সব মানুষকে, যাদের কোদাল একটা অকল বাঁচিয়ে দিল। ফুলের মালা দিও রামেশ্বর রায়কে যিনি ভৈরবের জলে জলের মত ঢাকা ঢালছেন।

[কৃষকদের সকলেই বাঁধের দিকে চলিল নন্দ আন্তরিকতা চোঁচাইয়া উঠিল।]

নন্দ। যেও না...সবাই যেও না। মা-লক্ষ্মীরা তোমরা অন্তত শোন আমার কথা।

মহেশ। (মুখ ফিরাইয়া)। এরা বলছে, বীথি দেখে তারপরে না হয় যাবে।

[তাঁহারা সকলে দৃষ্টি বাহিরে গেল। নন্দালীল বল্লভের হাত ধরিল। অপমানে তাঁহার সর্বদেহ কাঁপিতেছে বল্লভকে লইয়া সে একনিকে দাঁড়াইল।]

নন্দ। মরা মানুষকে বেইজ্জত করতে একটুখানি সন্মত হল না, বল্লভ?

বল্লভ। কে মরা মানুষ? কাকে বেইজ্জত করলাম?

নন্দ। আমল মজুমদার—পনের বছর আগে এই এত

বড় মহাল যার মুঠোয় ছিল। ইন্ডর-ডব্বা তাঁকে প্রজা-বন্ধ বলে পূজা করত। আজকে যে মালা-তারা ই নাম করে নিয়ে এসেছিল এই প্রজারা, তাই তুমি দিতে বললে রামেশ্বর রায়ের গলায়? লাম্পট, মাতাল, জেল-ফেরত পথের কুকুর একটা!...বেইজ্জত নয়? এর চেয়ে মালা গাঙের জলে ছুঁড়ে ফেলতে বললে না কেন, বল্লভ?

বল্লভ। ঠাণ্ডা হও, নন্দা! রায়মশায়ের বদনামটাই শুধু শুনেছ—কিন্তু এই যে অত-বড় কাজটা হচ্ছে, কি স্বার্থ তার? এরা কেউ তার প্রজা-পাটক নয়, আপনার জন নয়...এত বড় পৃথিবীতে তার আপনার জন কেউ নেই। শুধু ছাটীলোক—খামি আর নির্ধন গিয়ে জুটেছি। আব তাই বা কদিন? কিন্তু কি বিশ্বাস—আমাদের কথার উপর জলের মত ঢাকা ঢালছে। কেউ পারে?

নন্দ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার নয়—চুরি-ডাকাতির টাকা। এ অমন সবাই পারে।

বল্লভ। চুরি-ডাকাতি...তা বটে। রাতের আধারে টিপিটিপি যে লোক ঘটি-বাটি সরিয়ে—তাই বেচে সকা-বেলায় চাল কেনে, সে চোর। ধরা পড়লে জেলের ঘাম ঘুরিয়ে মরতে হবে তাকে। আর তার আগে যে লোকটা তাকিয়া ঠেস দিয়া দিনের পর দিন জোঁকের মতো সর্বদা শুবে সেই লোকটাকে চোর বানিয়ে দিল—তার কোন দোষ নেই, সে হল সাধু ভালমানুষ, তোমাদের মাথার মণি। তাব লাখ টাকা থেকে দৈবাৎ যদি দশ টাকা দান করে বসে, সে হবে দাতাকর্ণ। তাই বটে। এই যে আসছেন রায়মশায়। খালি পায়ে বীথি তদারক করতে গিয়েছিলেন। তোমাদের তিন পুরুষের প্রজা সব কয়দিনে এমন বশ হয়ে গেল...কেন, তা দেখে যাও নন্দা।

[রামেশ্বর রায় আসিলেন। রূক্ষ ভাবাবহ চোঁচাইয়া। হৃদ্যন্ত, অসংযত জীবনের ছাপ ঘের মুখের উপর আকিয়া গিয়াছে। গায়ে একটা আধময়লা কামিজ—তাছাড়া বেশ-বার্জলা নাই। কথাবার্তা, চালচলন, হাসি প্রভৃতির ধরণে এ লোককে মানুষ না বলিয়া পশু বলিতে ইচ্ছা হয়। রামেশ্বর বল্লভের দিকে চাহিয়া তারপর নন্দবালীর আপাদ-মস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তারপর হা হা করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া উঠিল।]

রামেশ্বর। তুমি যে বড় মাথা নিচু করলে না।...একে বলভ?

বলভ। নন্দলাল। আমরা এক ওস্তাদের কাছে লাঠি-সড়কি শিখেছিলাম। এখন সড়কি চালায় না—কলম চালায়। মজুমদার এষ্টেট নন্দ-দা একাই একরকম চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

রামেশ্বর। তুমি নন্দলাল? নাম শোনা আছে বটে। তোমরা ত সবাই মিলে বিরামবাড়ি আমার ঘাড়ে গছিয়ে দিলে। বেশ...তোমায় দেখে খুশি হ'লাম। তারপর... বলভ, কথাবার্তা হয়েছে নাকি কিছু? কত চায়?

নন্দ। রায় মশায়, আমাকে কোন চাকরী-টাকরীতে বহাল করতে চান নাকি?

রামেশ্বর। না। চাচ্ছি, পায়ের গোড়ার তোমার ঐ পাকা চুলে ভরা মাথাটা নিচু করতে! বিরামবাড়ি ত কিনলাম—এখন এরা বলছে, কেনা যখন হ'ল, তখন ভদর হয়ে সেখানে মাথা গুঁজে থাকতে হবে। সে হবে না—আমার কুস্তিতে তা লেখে না। তবু...এরা বলছে—চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু এই রকম সবাই দেমাক দেখিয়ে মাথা উচু করে বেড়াবে, এ ত আমি চোখে দেখতে পারব না।

নন্দ। একটা মাথাও উচু থাকবে না, এই আপনি চান?

রামেশ্বর। না, একটা মাথাও উচু থাকবে না... তোমার না, তোমার মনিবদেরও না। উচু মাথা আমি দেখতে পারিনে।

নন্দ। তবে এখানে আপনার থাকা হবে না রায় মশায়! আমার কথা ছেড়ে দিন...কিন্তু আমাদের খুকী দিদি—নিতান্ত ছেলেরাম্ভ একটা মেয়ে, তার মাথাটা আগে নোয়ান দিকি—

রামেশ্বর। আমার টাকা আছে, লোকজন রয়েছে... আর শুনেছ ত আমি নিজেও একবারে ঋষি-তপস্বী নই—

নন্দ। তাতে মাথা নিচু হবে না—

রামেশ্বর। জোর করে বলা যায় না কিছু। বুঝলে হে নন্দ? যখন ঢুকে পড়েছি একবার, কোনদিন হয়ত দেখবে

তোমাদের গোটা এষ্টেটই রামেশ্বর রায়ের মূঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। তখন?

নন্দ। তখনও নয়। ঐ সব শিরদাঁড়া ইম্পাত দিয়ে তৈরী। কাঁধ থেকে কেটে ফেললেও মাথা নিচু হয়ে পড়বে না কোনদিন।

[নন্দলাল বিরক্তভাবে চলিয়া গেল। তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর বিকট হাসি হাসিতে লাগিল]

রামেশ্বর। ভাল লোক...একেবারে নিরেট সাধু ব্যক্তি, নিতান্ত বশব্দ-ভৃত্য! এর কথা বলছিলে বলভ, কি হবে এই রকম পানসা লোক দিয়ে? কেবল সত্যযুগের বিস্তর ভাল ভাল কথা আওড়াবে। আমি শয়তান মানুষ, তুমি শয়তান বোম্বটে, আর নির্মলও কম শয়তান নয়—শয়তানিতে স্বদেশী প্রলেপ দিয়ে সে তোকা রং ধরিয়েছে। দিব্যি মিলে গেছি আমরা। তার মধ্যে এই বেহুরোটাকে আনতে চাও? উহ—ভাল কেটে যাবে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—কারা? কি চায় এরা? হাতে ওসব কি?

[মহেশ প্রমুখ সেই নরনারীর দলটি বাঁধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাদের দেখিয়া রামেশ্বর জ্বকুটি করিল। সে বিরক্ত হইয়াছে, বোঝা বাইতেছে। মহেশ মোড়ল আগাইয়া আসিয়া বলভের কানে কানে কি বলিল।]

বলভ। রায় মশায়, এরা বলছে—বাঁধ বেঁধে আপনি এদের ধন-প্রাণ, বাড়ি-ঘরদোর বাঁচালেন। এরা তাই—

রামেশ্বর। দল বেঁধে এই রকম ঘেরাও করে দাঁড়িয়েছে। যেতে বলে দাও। তুমি আর নির্মল বাঁধ করে দিতে বললে, তাই দিয়েছি। তাতে ধন-প্রাণ যদি বেঁচে থাকে, সেজন্য আমি দায়ী নই। যাও।

মহেশ। অনেক দূর থেকে এসেছি হজুর। হু-তিন ক্রোশ পথ ভেঙ্গে এসেছি।

বলভ। যাচ্ছিল মজুমদারের ওখানে। এসে আপনার ঐ বিরাট কীর্তি দেখে ওদের মতলব ঘুরে গেছে—

রামেশ্বর। কীর্তি ত বিরাট দেখছ। কত টাকা লাগছে খবর রাখছে? টাকা ছিল, তাই টাকা ঢালছি।

তোমরা ত বাইরে থেকে দেখছ, খুব কীর্তি করছি। আরে ক'টা কীর্তির খবর রাখো বাপু? সরকার বাহাদুরের খাতা খুলে দেখোগে—এত কীর্তি করা গেছে, সমস্ত ভৈরবের জল ঢেলেও তা ধোওয়া যাবে না।

মহেশ। আমরা ছজুর, আপনার কেনা গোলাম হয়ে রইলাম। ভক্তি আর ভালবাসা বুক চিরে ত দেখান যাবে না। শ্রীচরণে শুধু একটা করে গড় করে যাব—এই দরবার জানাচ্ছি। ‘না’ বললে আমাদের বড্ড কষ্ট হবে, ছজুর।

রামেশ্বর। কথাগুলো বেশ মধুর শোনাচ্ছে হে?... তা হলে মোড়ল আমি এই শ্রীচরণ পেতে দাঁড়িলাম...একে একে এসো। তারপর—ঐ থেয়াঘাট দেখা যাচ্ছে—থেয়া পার হয়ে সব বাড়ি চলে যাও। কিন্তু শ্রীচরণ অবধি—উপরে নজর তুলো না, খবরদার। শ্রীমুখের দিকে নজর পড়লে সহ হবে না, ভিঁমি লেগে যাবে—ভজি মার ভালবাসা যতই থাকুক।...বুঝলে বল্লভ, যশোর জেলে যেদিন প্রথম গোলাম—একটা ওয়ার্ডার আমার মুখের দিকে চেয়ে বাবার বলে টেঁচিয়ে উঠেছিল।

[সকলে প্রণাম করিয়া পায়ের গোড়ায় ফুল রাখিয়া যাইতে লাগিল। শেষ কালে কেহ কেহ গলায় মালা দিল। একটি মেয়ে শঙ্খ বাজাইল।]

অ্যা—অ্যা—এত কথা ছিল না। উৎপাত শ্রীচরণের উপর দিয়েই চলবে। একি বল্লভ, কণ্ঠস্থাস উপস্থিত হল যে!

[কৃষকদল চলিয়া গেল।]

ভক্তি আর ভালবাসা...বেশ জোরালো আরক হে, নির্জলা ছইস্তির চেয়েও। সবাই দেখে শুনে ফুল-টুল দিয়ে দিব্যি চলে গেল। বল্লভ, ব্যাপারটা কি বলত? বলি, সংকীর্্তি করে মুখে আমার জোলুখ খুলল নাকি? মেয়ে-বউগুলো পর্যন্ত নির্ভয়ে মালা পরিয়ে দিয়ে চলে গেল, কেউ অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়ল না। নিজের পরে ঘেরা হয়ে যাচ্ছে যে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগছে।

বল্লভ। আমার প্রণাম আছে, রায় মশায়।...দেখি—হাতটা দেখি একবার—

[বল্লভ প্রণাম করিয়া রামেশ্বরের আঙ্গুলে একটি আংটি পরাইয়া দিল।]

রামেশ্বর। তুমিও ছাড়বে না? মহা হাদ্গামা। মালা দিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে আংটি পরিয়ে একেবারে বর পাত্তোর সাজিয়ে তুললে।...এ যে ভাল আংটি—দামী মাল।

বল্লভ। আমার দাম লাগেনি রায় মশায়।

রামেশ্বর। সেটা বুঝতে পারছি। দাম দেওয়ার রেওয়াজ থাকলে কি রামেশ্বর রায়ের তাঁবেদার হতে পারত—না রামেশ্বরের টাকার যদি দাম থাকত, তাহলে এমনি করে জলের মধ্যে সে টাকা ঢালতে পারত?...কিন্তু বল্লভ, মারা বাই যে।

বল্লভ। কি হল?

রামেশ্বর। ঘাস-পাতা একগাদা গলায় পরিয়ে দিয়ে গেল, গলা ফুটফুট করছে—

বল্লভ। এসব অভ্যেস করে নিতে হবে, রায় মশায়। এখন এইখানে যখন স্থিতি হল, দশজনে আসবে। সবাই চিনবে, জানবে, মানসম্মত হবে—

রামেশ্বর। আমি পালিয়ে যাব একদিন রাত্রি বেলা। এ সহ্য হবে না। উ-হ-হ—দূর—দূর—জেলে গলায় কাঠের তক্তা ঝুলিয়ে দেয়, সে বেশ ভারি জিনিষ, মন্দ লাগে না। এ সব কি?

[রামেশ্বর মালাগুলো ছিঁড়িয়া ফেলিল। আংটিটাও খুলিয়া ছুঁড়িতে বাইতেছিল, বল্লভ নিবেদন করিল]

বল্লভ। আংটিটা থাক,

রামেশ্বর। বেচলে কিছু আসবে? তুমি নাও।...গয়না পরে জ্বীলোকে। আমার আঙ্গুল টনটন করে উঠেছে।

বল্লভ। জ্বীকেই দেবেন, রায় মশায়। ঘর যখন হয়েছে, ঘরশীও হবে। রেখে দিন—তাকে পরিয়ে দেবেন।

রামেশ্বর। সে মতলবও হচ্ছে বুঝি! তা বটে...পালকি হলে বেহারা চাই, বন্দুক হলে গুলি চাই, আদালত হলে আসামী চাই...আর ঘর হলে ঘরশীও চাই...হাঃ—হাঃ—হাঃ—কিন্তু পারবে না, বুঝলে হে বল্লভদাস, ঐ কাজটা পেরে উঠবে না। বিরামবাড়ি কিনেছ, নেহাৎ ইট-কাঠের ঘর—মুখ নেই, তাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। কিন্তু এই শ্রীমৎ রামেশ্বরের শ্রী দেখে বিয়ের কনে পিড়ির উপর

মুচ্ছা যাবে, বিয়ে যে হবে, তার মস্তার পড়বে কি করে?
হাঃ—হাঃ—হাঃ—। বলা—

[বঙ্গভূমি রামেশ্বরীর সঙ্গে ছুঁপা গিয়া গিছন ফিরিয়া
মালাগুলার অবস্থা দেখিল]

বঙ্গভূমি। আহা কত কষ্ট করে নিয়ে এসেছিল। মালাগুলি
খুলে পড়ে রইল...

নীলাধর। তা কি করব? মীরা যাব নাকি?

বঙ্গভূমি। ওরা এনেছিল শ্রীমল মজুমদারের নাম করে।
শেষে আপনাকে দিয়ে গেল।

রামেশ্বর। দিয়ে ভুল করল। বেশী চলো না...
আমরাই বরং ওগুলো সেখানে দিয়ে আসিগে।

বঙ্গভূমি। আপনি যাবেন সেখানে? না রায় মশায়, গিয়ে
কাজ নেই। মোটে লোকজন হয়নি... মেয়েমাছেরা
কাদাকাটা করছেন।

রামেশ্বর। মেয়েমাছের কায়া। বল কি, বিনিময়চায়
এমন মজা—তবে ত যেতেই হবে। চলো... চলো... বিরাম-
বাড়ি কিনলাম, সেটা একবার চোখে দেখে আসি।

[রামেশ্বর ও বঙ্গভূমি চলিল। মঞ্চ ঘুরিয়া নতন দৃশ্য
আসিল]

(ক্রমশঃ)

পরলোকে গুরুজী

ব্রজচারী মোক্ষেন্দ্র নাথ বিশ্বাস

ষষ্ঠ শ্রেণী (ক) বিভাগ

ছু—টিল গগন বিদীর্ণ করি' একি হাহাকার ধ্বনি।

স—হসা জগৎ স্তব্ধ হইল মহা বিস্ময় মানি'।

গু—রুজী মোদের নাই, ওরে নাই, কেঁদে কহে যত লোক ;

লি—খিল কি ঘোরে বিধি নাহি জানি কপালে এ হেন শোক ?

জী—বন-প্রদীপ নিভিল সহসা পথ মাঝে একা ফেলি,

স—ত্যা পথের হে বীর সারথী, তুমি গেলে আজ চলি'

সকল দ্বন্দ্ব দূর করি' দিয়া জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি'

হা—তে হাত ধরি' পূজিলে মায়েরে জাতিভেদাভেদ ভুলি'।

শা—কা, যা তুমি করিলে হরণ, মাঠে শুনালে গানে ;

দা—ক্ষ করিলে লক্ষ জনেরে কক্ষ-চেতনা দানে

গা—হিল বিশ্ব তব জয়গান' যেদিন মহোৎসাহে,

আ—শার আলোকে নামিবে আশার জানিত না কেহ তাহে।

*ব্রজচারী প্রবর্তক স্বর্গীয় শ্রীগুরুদয় দত্ত, আই. সি. এস. মহোদয়ের।

মহাপ্রস্থানে গত ২৬শে জুলাই, ১৯৪১ তারিখে লিখিত। St. Barua-
bas H. E. School Magazine হইতে উদ্ধৃত।

মহিলা সমাচার

মহিলা পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী

তিন চার বৎসর ব্যাপীয়া যে মন্ত্রিমণ্ডলী বাঙ্গলার শাসন ভার পরিচালিত করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবর্তন গত নভেম্বর মাসে ইইয়া নতুন সর্বমতাবলম্বী এবং শক্তিশালী জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। মাননীয় কজলুল হক সাহেবই প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঢাকার নবাব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোঃ সামসুদ্দীন আহমদ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বর্মান, খাঁ বাহাদুর আবদুল করিম ও খাঁ বাহাদুর হাসেম আলী খাঁ অত্রাঙ্গ মন্ত্রী নিয়োজিত হইয়াছেন। বাঙ্গলার আসন্ন বিপদকালে এই প্রকার শক্তিশালী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হওয়াতে বাঙ্গলার সমগ্র নর-নারী সুখী হইয়াছেন।

ভারতীয় শাসনবিধি অনুসারে আইন সভার সভ্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক মন্ত্রীর জন্ত একজন করিয়া পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবার নির্দেশ আছে। তদনুসারে মিসেস হাসিনা মুরসেদ এম্. এল, এ, এম, বি, ই মহোদয়া পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনিই বাঙ্গলা সরকারের প্রথম মহিলা সেক্রেটারী হইলেন।

রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষায় মহিলার দান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মদিন শ্রদ্ধার সহিত চির স্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর ১০০ এক শত টাকা মূল্যে একটা স্বর্ণপদক প্রদান করিবার ইচ্ছা শ্রীমতী সুলতা কর প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্ণপদকটি যে প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার কোন বিষয়ে সৃষ্টিত প্রবন্ধ লিখিবেন তাহাকেই প্রদান করা হইবে। সুলতা দেবীর গুরুদেবের প্রতি ভক্তির ইহাই প্রকৃষ্ট নিদর্শন; এই পদক প্রদানের জন্ত স্থায়ীভাৱে যদি দাতৃ স্থাপনা করিয়া দেন তাহা হইলে তিনিও চিরস্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হইয়া থাকিবেন।

নিখিল ভারত মহিলা মহাসম্মেলন

গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজ প্রদেশের কোকনদা নগরে উক্ত মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবারের অধিবেশনে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর ভূতপূর্ব মহিলা মন্ত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সভানেত্রী হইয়াছিলেন। তিনি কেবল প্রস্তাব পাশ করিয়া ও বক্তৃতা দ্বারা অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। প্রতি প্রদেশে মহাসম্মেলনের শাখা সারা বৎসর যাহাতে কার্য করে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং প্রদেশে প্রদেশে যাইয়া সমস্ত কার্য পরিদর্শন করিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। নিখিল ভারত মহিলা মহাসম্মেলনের উপর অনেক ভরসা এদেশের নারী সমাজ করিয়া থাকেন।

এ, আর, পি তে মহিলাদের কর্তব্য

জাপানীরা অতর্কিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মালয় উপদ্বীপ দখল ও রেঙ্গুন নগরে বিমান আক্রমণ বেপরোয়া ভাবে চালানতে বাঙ্গলার দ্বারেই এক রকম রণবিভীষিকা দেখা দিয়াছে। এমন সময় বঙ্গনারীর গৃহকোণে বসিয়া থাকা কর্তব্য নয়। দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইবার দায়িত্ব পুরুষ অপেক্ষা নারীর কম নহে।

কলিকাতা নগরীতে প্রত্যাশয় শত্রুর বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় কলিকাতাবাসী কয়েক লক্ষ লোক নিজ নিজ বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপাততঃ নিরাপদ স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য নারী ও শিশুদের এমন বিপদ আশঙ্কায় কলিকাতা হইতে ৫০৬০ মাইল দূরে থাকায়ই কর্তব্য। এখন রমণীদের বীরজায়া ও বীর জননীর স্মারক হিবে চিত্তে চিন্তা ও কাজ করিতে হইবে। স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে থাকিবার জন্ত মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে। শত্রুর জলে-স্থলে বিমানের আক্রমণের সময় নারী যদি ভীড় না করে পুরুষ আত্ম-রক্ষার জন্ত অনেক সুবিধা পাইবে।

কলিকাতা বা অন্য কোন স্থানে বিমান আক্রমণের সঙ্কেত ধ্বনি হইবামাত্র সকল নারীর প্রধান কর্তব্য শিশুদের গৃহের অভ্যন্তরে জমায়ত করা। তৎপরে বিজলী বাতির প্রধান সরবরাহের স্থানের সুইচ বন্ধ করিয়া দেওয়া। প্রত্যেক গৃহের মধ্যস্থলের একটি ঘরের ছাদ অধিকতর অবলম্বন লাগাইয়া আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিয়া রাখাই কর্তব্য। সাইরেন ধ্বনি শুনামাত্র সেখানে উপস্থিত হওয়াই সকল নারীরই কর্তব্য। ছেলে মেয়েও নিজের কর্তব্য বিবরে গ্রীসারীনে ভিজিয়া তুলা গুজিয়া রাখা, সমস্ত কাচের জানালা খুলিয়া কাঠের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়াই প্রয়োজন।

বোমা দুই প্রকার আঘেয় ও বিফোরক। আঘেয় বোমার মধ্যে কাঠ কয়লা, পেট্রোল, লোহার ধারালো টুকরা, কাচ খণ্ড থাকে। বোমা যদি সরাসরি কোন বাড়ীতে উপর পড়ে তাহা হইলে পরিত্রাণ নাই। যদি বাতীর সন্নিকটে পড়িয়া কাটিয়া যায় তাহা হইলে তাহার মধ্যে লৌহ টুকরাগুলি তীব্রবেগে ছিটকাইয়া যাইয়া মানুষকে খুন, জখম, অঙ্গহীন করিয়া দেয়। সেই মারাত্মক দ্রব্যগুলি আট দশ ফুট উচু পর্যন্ত ছিটকাইয়া যায়। তাই অভ্যন্তরে আশ্রয় স্থলে বা গড়খাই মধ্যে আব্রাগোপন করা প্রয়োজন। আর ঘরে আগুন লাগিলে জল ও বালি ছিটান—পুড়িয়া গেলে মাখন, নারিকেল তৈল, ওলিভ অয়েল প্রলেপ দেওয়া কর্তব্য। নারী পুত্র সন্তানাদির প্রতি সদাই লক্ষ্য রাখিবেন।

ষত দূরে—যেখানেই হোক

পাঁচশোরও বেশি চায়ের গাড়ি আজ গ্রেট ব্রিটেনের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এই রকম একখানা চায়ের গাড়িতে চড়ে বিলেতের একজন সাংবাদিক সম্প্রতি লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে এসেছেন। ভয়াবহ বিমান আক্রমণের মধ্যেও চায়ের গাড়িগুলো জনসাধারণের জন্ত যা করছে এই সাংবাদিক তার একটি রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়েছেন। নিচে তার থেকে আমরা খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

“প্রথমেই আমাদের গাড়ি গিয়ে থামলো এক বিমানধ্বংসী কামানের অভ্যুত্থান। এই মাঠের মধ্যেই আগে ছেলেপিলেরা খেলা করতো; আজ সেখানে বিমানধ্বংসী দল তাদের কামানের পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কালো কালো কামানগুলোর পাশে মৃগ হাজে করে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে এরা আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিলো। চায়ের গাড়িকে এরা সবাই চেনে; সন্ধ্যার আক্রমণ শুরু হবার আগেই ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিত সময়ে এ-গাড়ি তাদের কাছে উপস্থিত হয়।

“গাড়িটার পাশের একটা পাল্লা নামিয়ে দেওয়া হলো। দেখা গেলো খোলা পাল্লায় সাজানো রয়েছে নানা রকম খাবার জিনিষ। আর পিছন থেকে শোনা যেতে লাগলো ফুটন্ত চায়ের কেটলির শৌ-শৌ আওয়াজ। একজনের পর একজন লোক এসে পরস্পর ফেলতে লাগলো আর নিয়ে যেতে লাগলো তাদের পেয়লা চায়ে কানায় কানায় ভর্তি করে।

“গাড়ির কম চারিটি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, ‘সন্ধ্যার সময় যে-কাণ্ডটা হয় তার জন্ত যে টুকু অতিরিক্ত শক্তি দরকার তা এরা চা থেকেই পায়’। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিলো। গরম গরম চা-খেয়ে এরা কেমন করে তাজা হয়ে উঠছিলো তা বেন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিলো।

“মাঠের কিনারে আমরা আবার গিয়ে থামলাম সেখানকার গ্রহরীকে চা দিতে,—তাকেও তো আর বাদ দেওয়া যায় না! এদিকে আমাদের পিছনে বিমানধ্বংসী কামানের আওয়াজে তখন কানে তাল লাগে যাবার যোগাড় হয়েছে।

“এর পর আমরা গিয়ে থামলাম এক বোমা-বিধ্বস্ত এলাকায়—সেখানে যে সব বিমান আক্রমণের রক্ষা এবং পুলিশ মোতায়েন রয়েছে—তাদের চা দেবার জন্ত। গোলোন্দাজদের মত চা খেয়েই বেন তাজা হয়ে উঠল।

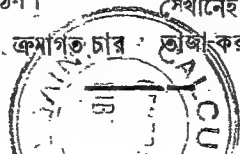
“তারপর এলো দমকলের লোকদের পালা। ক্রমাগত চার তাজা করা গরম চা খেতে পাচ্ছে।

পাঁচ ঘণ্টা আগুনের সঙ্গে লড়াই করে আবার গিয়ে কাজ শুরু করার আগে তা’রা একটু দম নিচ্ছে। জলে ভিজ়ে জুতো-গুলো তাদের চক্‌চক করছে আর মুখ হয়ে গেছে ধূলা বালিতে মলিন; এর মধ্যেও চায়ের গাড়ির মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তা’রা হাসে তারপর চায়ের জন্ত পকেট থেকে একটা পেনি বার করে ছায়। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, ‘চায়ে কিছ সতিই খুব উপকার হয়’। যে রকম করে এরা চা খায়, দেখে মনে হয় এদের গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে। জল-খাবারের মধ্যে একমাত্র চা-ই এরা পায়; একমাত্র চা-ছাড়া আর কিছুই এরা চায় না। এক পেয়লা গরম চা খেয়ে নিয়ে এরা না কর্তে পারে এমন কাজ নেই।”

বিলেতে চায়ের গাড়ির এই সব কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করে দক্ষিণ ভারতের “প্লান্টার্স ক্রনিকল” ৭ই জুন তারিখে লিখেছিলো :

“বিলেতে চায়ের গাড়ির সংখ্যার আশ্চর্য প্রসার হচ্ছে ১৯৪০ সালের একটা মন্ত ব্যাপার। চায়ের গাড়ির এ জন-প্রিয়তার কারণ হচ্ছে, এরা যে ভাবে জনসেবা করে বেড়ায় তার মূল্য খুবই বেশি। তাছাড়া এদের টাকাকড়ি বহু বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনিই আসে বলে লোকের কাছে এর আকর্ষণটাও খুব নতুন আর অদ্ভুত। ট্রেইড ইউনিয়ন কংগ্রেসও এতে স্বেচ্ছায় টাকা ছায় আবার আমেরিকার অ্যানালিড রিলিফ ফাণ্ড থেকেও এর টাকা আসে। তা ছাড়া কত বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কত লোক যে এতে ইচ্ছে করে টাকা জোগায় তার ইয়ত্তা নেই। প্রথম প্রথম তো চায়ের ব্যবসাদাররা টাকা দেওয়ার ফলেই অল্প জায়গা থেকেও টাকা খাস্তে শুরু হয়েছিলো।”

বিলেতের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ডও এখন ভারতীয় সৈনিকদের জন্ত কতক গুলি চায়ের গাড়ির বন্দোবস্ত করেছেন। এ চায়ের গাড়ি গুলো যে কেবল ভারতে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেই চা বিতরণ করছে তা নয়, ভারতের বাইরে যে সব ভারতীয় সৈন্য আছে এরা তাদের মধ্যেও কাজের উদ্যোগ করছে। ভারতের সৈন্যদের জন্ত এরকম একটা বন্দোবস্ত হওয়ার মধ্যে যথেষ্ট নতুনত্ব আছে। আজ যেখানেই ভারতীয় সৈন্য আছে, সেখানেই ভারতের সেই বীর সন্তানেরা এক পেয়লা চমৎকার

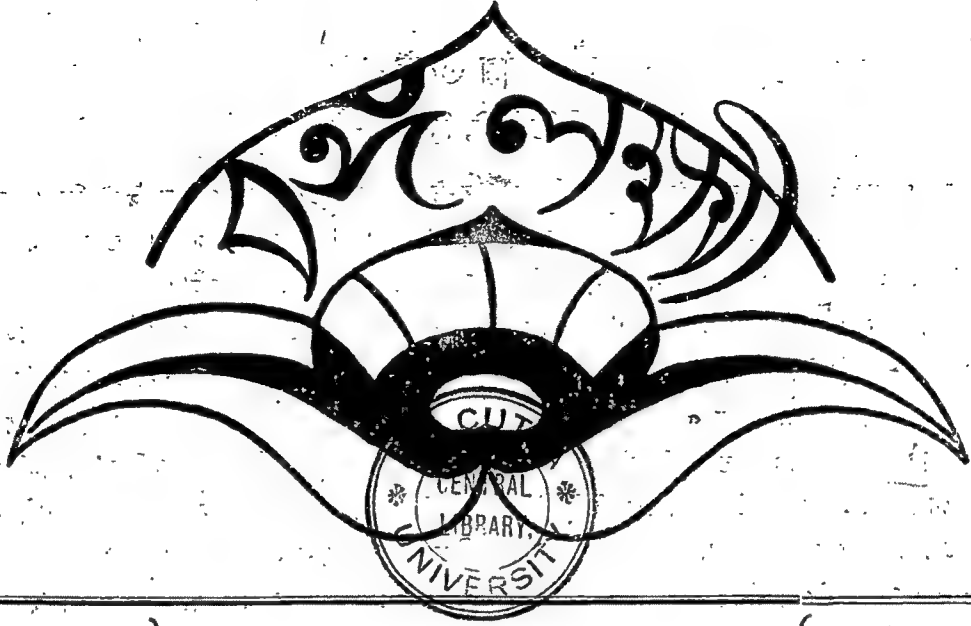


বঙ্গলক্ষ্মী



কুমারী মৌরী

[শিল্পী—লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ।



সপ্তদশ বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩৪৮

৪র্থ সংখ্যা

চিন্ময় সত্তা

শ্রীকালিদাস রায় (কবিশেখর)

দেহ মোর ভস্ম হয়ে পঞ্চভূতে যবে স্থান পাবে

সহস্র জীবনে মনে সত্তা মোর মিলাইয়া যাবে।

কারো রক্তে, কারো ধ্যানে, কারো জ্ঞানে

কারো বা ভাষায়।

কারো কৃতজ্ঞতা মাঝে, কারো স্বপ্নে কাহারো আশায়।

কারো স্নিগ্ধ করুণায় কারো প্রেমে কাহারো স্মৃতিতে

কারো পুণ্য অনুতাপে রয়ে যাবে এই ধরণীতে।

আমার নামাক্ত তায় কিছুদিন র'য়ে যা'বে অঁকা

তাহাও মিলাবে ক্রমে, কালস্রোতে পড়ে যাবে ঢাকা।

লভিবে আমার সত্তা নামহারা রূপ রূপান্তর

চিন্ময় সত্তার মোর মূর্ত্যু নাই, তাহা যে অমর।

বাঁচবার উদ্দেশ্য

শ্রীদীপ্তি দেবী, বি-এ বি-টি

জন্মেছিলুম আমি জমিদারের ঘরে। বাবা ছিলেন জমিদার, তবে ছোট খাট। দাদামশাইকে সকলে রাজা বলেই জানত। মা ছিলেন তাঁর একমাত্র সন্তান। বিয়ের পরও মা বেশীর ভাগ সময় থাকতেন বাপের বাড়ী। আমি জন্মাবার আগে যদি বা মা মাঝে খুশুরবাড়ী গিয়ে থাকতেন, আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সেটিও বন্ধ হয়ে গেল। বাবা খুব বেশী আপত্তি করতেন না কারণ দাদামশাইয়ের বিশাল সম্পত্তি একদিন তাঁরই সন্তানদের হাতে এসে পৌঁছবে, এ আশা তাঁর ছিল তবে তিনি নিজের খুশুর বাড়ীতে কোনদিন থাকেন নি। ঘর জামাইয়ের অগ্নিবাদ তাঁকে কেউ দিতে পারি নি কোনদিন।

জন্মেছিলুম আমি মামার বাড়ীতে এবং মানুষও হচ্ছিলুম সেখানেই। অবশ্য মানুষ তৈরী হচ্ছিলুম কি অথ কিছু তা' বলা শক্ত। আমার পরিচর্যার জন্য দাসদাসীরা যে অভাব ছিল না তা' বলা বাহুল্য। শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা যে একেবারে ছিল না তা'ও নয় তবে কোনরূপ শিক্ষা হচ্ছে কি না তা' দেখবার ছিল না কেউ। বাংলার মাষ্টার, ইংরাজির মাষ্টার, গানের মাষ্টার কিছুই অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু প্রাণের। মাষ্টার আসেন শেখাতে, আমার ইচ্ছা হয় শিখি, ইচ্ছা না হয় শিখি না। আমার উপর শাসন খাটত না কার, দাদামশাইয়ের কড়া হুকুমে।

সাধারণ বড়লোকের ঘরে যে বয়সে মেয়ের বিয়ে হয় তার তুলনায় আমার বয়স বোধ হয় একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল কারণ দাদামশাইয়ের মনোমত পাত্র পাওয়া মুস্তিলের কথা। যা' হক যার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়, তাকে পছন্দ করেছিলুম আমি নিজেই। তাকে ভাল লেগেছিল কারণ সে ছিল আমারই মত খামখেয়ালী। আমারই মত কারও শাসন সে মানে নি কোনদিন।

মার মত আমি বিয়ের পর থেকে যাই নি মামা বাড়ী। স্বামীর ঘরেই বাই চলে। দিনগুলি মন্দ কাটিত না। কেউ কাউকে কোন বিষয় দিতুম না বাধা। পরস্পরকে আমরা যে

যতটুকু দিতে প্রস্তুত ছিলাম, সে ততটুকুই নিত। তার বেশী কেউ কারো কাছে করত না দাবী। তাই আমাদের জীবন-সত্যার মধ্যে কলহের স্থান ছিল না।

খোকা এসে কিন্তু আমার উপর দখল বসাবার চেষ্টা করল। তাকে মানুষ করেছিল অবশ্য দাস দাসীতে কিন্তু তবু খোকার কতকগুলি দাবী আমাকে মেনে নিতেই হ'ত। খোকা যে কেন অমন হ'ল তা' জানি না। আমি ত' কোনদিন আমার উপর কোন দাবীই করি নি। মার উপর দাবী করার যে কিছু ছিল তাই বুঝি নি কোনদিন।

খাকিতাম আমরা স্বামীর দেশের বাড়ীতে। স্বামীও ছিলেন প্রায় দাদামশাইয়ের মত বড় জমিদার। প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। লোক লঙ্করে ঠাসা গাদা। আসবাব পত্রগুলো ক' পুরুষ আগে-কার তা' জানি না। কাচের আলমারী গুলো ঠাসা ছিল খেলনা রূপের হাতীর দাঁতের চন্দন কাঠের। প্রতিদিন চোখের সামনে একটি করে খেলনা যেত সরে, স্বামীও বলতেন না কিছু, আমিও না। যা' যায় থাক,, যা' থাকে থাক এই ছিল বোধ হয় আমাদের মনোভাব।

হঠাৎ স্বামীর খেয়াল হ'ল থাকবেন গিয়ে কিছুদিন কোলকাতায়। কলকাতার সঙ্গে আমাদের বড় বেশী ছিল না সম্পর্ক। মামা বাড়ীতে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে যেতুম বেড়াতে কোলকাতায়। শীতের সময়, কিন্তু গরম পড়তে না পড়তে আসতুম ফিরে দেশে। অনেক সময় আমি দাসদাসীদের নিয়ে থেকেই যেতুম দেশে, শীতের সময়ও যেতুম না কোলকাতায়। এবার কি জানি কেন কোলকাতার দিকে টানছিল মন। স্বামীর প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গেই দিলাম মত।

কোলকাতায় এসে খেয়াল হলো, কোলকাতার আলোক প্রাপ্ত সমাজকে কোরব আমি জয়। আমি মোটা ছিলাম না তবে ক্যাশানের মাপ কাটিতে ওজন করিলে দেহ ভার কয়েক পাউণ্ড বেশীর দিকেই ছিল। গেলুম পরামর্শ নিতে "বিউটি স্পেশালিষ্টের"। 'টার্কিস বাথ, ফোম বাথ, আইওডিন বাথ,

ম্যাসাদ, প্যাটিং সব কিছু করে বেরিয়ে এলুম বাতাসের মত হালকা তনুখানি নিয়ে। ‘আই ব্রাও প্লাক’ করিয়ে, হাতের নখগুলো শিকারী পাখীর মত সূচ্যগ্র করে আধুনিকাদের দলে লেখালুম নাম।

‘পাটিও দিতুম আমি সেই রকমই। আমার বাড়ীতে যখন যে সময় কেউ আসত, ভোজ্য ও পানীয়র অভাব সে বোধ কোরত না কোনদিন। সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আধুনিকেরা এই নবগতটিকে ভাল চোখে পারেন নি দেখতে। কয়েকজন নামজাদা স্কলারীদের ভয় হয়েছিল পাছে তাদের মাথার মুকুট মস্তক চ্যুত হয়ে এসে পড়ে আমারই মাথায়। মেয়েরা ঠিক করল তাঁরা আমাকে করবে ‘বয়কট’। ছুত্থের বিষয় তাঁদের পুরুষ বন্ধুরা কিন্তু দেন নি এতে মত। তাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণের জন্ত থাকতেন হয়ে উদগ্রীব। অনেক সময় বিনা নিমন্ত্রণেও এসে হ’তেন হাজির। মেয়েরা দেখলেন আমার ‘বয়কট’ করে হ’ল না সুবিধা। জীয়া ভাবলেন ব্যাপারটা কোথায় কতদূর গড়ায় তা’ নিজের চোখে দেখাই ভাল, তাই নাবালক ছেলের অভিভাবিকার মত তাঁরা এসে যোগ দিতে লাগলেন আমার পাটিতে। পুরুষ শিকার করা যাদের ব্যবসা তাঁরা ভাবলেন দূরে থেকে লাভ নেই তাই আমার উপর থেকে উঠে গেল নিষেধাজ্ঞা। শীঘ্রই আমার পাটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। আমার পাটিতে আসবার জন্ত রীতিমত ভীড় হতে লাগল নিমন্ত্রণ পত্রের।

আলোকপ্রাপ্ত সমাজের যা কিছু করবার সবই করেছিলেম, বাকী ছিল শুধু একটি ‘বন্ধু’ সংগ্রহ করা। আমার ‘বন্ধু পদ’ প্রার্থীর সংখ্যা কম ছিল না তবে সবাইকে আমার লাগত না ভাল। একজনকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারতাম কিন্তু করি নি কেবল খোকার জন্তে। খোকার উপর রাগ হ’ত। ঐটুকু এক রত্তি ছেলে, আমিই দিলুম তাকে জন্ম আর ওই কিনা শেষ পর্যন্ত করলে আমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ।

ঠাণ্ড স্বামী বলেন—“চল যাই ফিরে দেশে।” সহরের রস তখন আমি পান করেছিলুম আকণ্ঠ। অকণ্ঠও হয়ে এসেছিল। যাবার কথায় তাই আপত্তি তুলুম না। কোলকাতার আলোক প্রাপ্ত সমাজের আকাশ থেকে একটি উজ্জল তারকা গেল খোসে। সকলে এক বাক্যে বলতে লাগল—

“এবার কোলকাতা গেল হয়ে অন্ধকার, কে’ই বা দেবে ‘মুন-লাইট পিকনিক, কে’ই বা চাঁদের আলোর মিক্সড বেদিং” এর বাবস্থা করবে। কে’ই বা কথায় কথায় স্যানপেল চালবে, আর কে’ই বা অন্ধকার ‘বল-কমে নাচের কোরবে আয়োজন।”

এবার দেশ ছেড়ে এলুম জমিদারির কাছারিতে। কোথায় কোলকাতার কোলাহল, আর কোথায় এই নির্জন গ্রাম! কয়েক ঘর ছোট জাতের প্রজা ছাড়া এখানে ছিল না কোন ভদ্রলোকের বাস। কার সঙ্গে কথা বার্তা বলবার উপায় নেই। ছোট বাড়ীখানি, ছাদ তার টিনের। সামনে একটা ছোট নদী। দূরে জঙ্গল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলর কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো পাহাড় গ্রহরীর মত। তখন ছিল বৈশাখ মাস। প্রতিদিন সন্ধ্যায় উঠত ঝড়। আমি এসে বসতাম বারাণ্ডায়। ঝড়ের বেগে নদীর জল আঁছড়ে এসে পড়ত আমার বারাণ্ডার সিঁড়ির উপর। মাঝে মাঝে জলের ছিটে এসে লাগত আমার পায়ের। মনে হ’ত নদী যেন কাল-বৈশাখীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছে আমার কাছে। পাহাড়ের গায়ের কালো মেঘ দেখে প্রথম প্রথম হ’ত মনে ভয়। আবার বিছাৎ যখন হিংস্র জন্তুর মত আকাশের বুক চিরে চিরে দিত তখন ভয় হ’ত আরও। কিন্তু দেখতে দেখতে সবই গেল সরে।

আমি এক এক সময় ভাবতাম আমার নিজের কথা। আমার জীবনটা বেশ মজার। মাঝামাঝি কিছু নেই। কোথায় কোলকাতার কোলাহল, আর কোথায় এই জমাট নিস্তব্ধতা। কোথায় দেশের আগা গোড়া মার্বেল পাথরের রাজ প্রাসাদ আর কোথায় এই ছোট কুটির। একটা ঘটনা পড়ে গেল মনে। তখন চলেছিল পূজোর আয়োজন। দেশে আমাদের হ’ত পূজো খুব ধুমধামে। কোলকাতা থেকে থিয়েটার পার্টি এসেছিল প্রজাদের মনরঞ্গনের জন্ত। রান্না মহলে পড়ে গিয়েছিল ভিয়েনের ধুম। সন্ধ্যা তখন প্রায় হয়ে এসেছে। আমি বসেছিলুম ছাদে। চারিদিকে আবার ছড়িয়ে দিয়ে স্বর্ষ্যদেব তখন গা ঢাকা দেবার চেষ্টায় ছিলেন একটা মেঘের পিছনে। রান্নাবাড়ী থেকে নানা রকম সুখাদ্যের গন্ধ বয়ে আনছিল বাতাস। সেখান থেকে মাহুঘের কলরব এসে পৌঁছল আমার কাণে। একটু দূরে দেখি লোক

লোকারণ্য। সকলে এসেছে ঠাকুরের প্রসাদ পাবার আশায়। ঠাকুরের ভোগ তখন বোধ হয় সব নামূলিল। একটা কথা যেন সকালে কাণে এসেছিল যে এবার একশ' এক রকমের রান্না হবে। আমার খাওয়া তখনও হয়নি তার জন্তে আমি ছিলামও না ব্যস্ত। শরীরটা খারাপ ছিল তাই খাবার কথা মনেও পড়ে নি। হঠাৎ খোকা এসে আমার কাছে দাঁড়াল। মুখখানা তার শুকিয়ে হয়ে গিয়েছিল এতটুকু। বড় বড় চোখ দুটো তার জলে ভরা। অভিমানে-ঠোট দুটো তার কাঁপছে থর থর করে। বললে সে—“আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না? আমাকে এখনও কেউ ভাত খেতে দেয় নি—” বোলা তখন প্রায় পাঁচটা। ওদিকে একশ' এক রকম রান্না হচ্ছে, এদিকে আমার একজন সন্তান ক্ষিদে জ্বালায় করছে ছটকট। প্রাচুর্যের মাঝে একি দৈন্য? সম্ভবত হাতে দুটো চাল ডাল ঠোঙে ফুটিয়ে সেদিন খাইয়ে ছিলাম আমার অভুক্ত সন্তানকে। তাই ভাবি সব রকমের আশ্বাদ ত পেয়েছি আর কিসের জন্যে বাঁচা? খোকা এখন বড় হয়েছে। তার সঙ্গে আমার কোন দিন সম্পর্ক ছিল না বেশী। আমি ত বরং দূরে দূরেই থাকতে চাইতুম, খোকা কিন্তু আমার দূরত্বকে জোর করেই সঙ্কীর্ণ করে নিত।

মাঝে মাঝে খোকাকার কথারান্ধা গুল আমার কাণে কেমন কেমন ঠেকত। আমার দাদামশাইয়ের, আমার বাবারও খোকাকার নিজের বাবার এই তিনজনের সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ভবিষ্যৎ মালিক যে খোকা, এ কথা দাসী চাকরের কুণায় খোকা বেশ ভাল করেই বুঝেছিল। ওর মনে একটি ধারণা জন্মিয়ে যাচ্ছিল যে ওর ইচ্ছাতেই বুঝি পৃথিবীটা চলছে। একদিন কি একটা বিষয়ে খোকা অসম্ভব রকম জেদ ধরেছিল। কেউ ওকে বাগ মানাতে পারছিল না। সাধারণতঃ এ সব ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতুম না কিন্তু কি জানি আজ আমি খোকাকে

নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বল্লম—“খোকা, আমাদের ইচ্ছায় কিছু হয় না, ভগবানের ইচ্ছাতেই সব হয়। ছুপুরবেলা তুমি নদীর ধারে মাছ ধরতে যাবে বলছি। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা যদি না হয় ত ঐ বারাগু পর্যন্তও যেতে পারবে না।” কথাগুলি কাণে যেতেই উঠলুম চমকে। এ যেন ভূতের মুখে রাম নাম! খোকা তাকিল্যের হাসি হেসে বললে—হ্যাঁ তাই বই কি, বারাগু কেন, আমি উঠন পার হয়ে দেউড়ি পর্যন্ত এখনি চলে যাচ্ছি, দেখি কে আমার বন্ধ করতে পারে—আমি কিছু বললাম না। খোকা দর্পভরে পা ফেলে বারাগু পার হয়ে গেল। উঠনের কাছে আসতে সাঠু বেয়ারা একটা টিরা পাখী এনে খোকাকে বোলে—“খোকাবাবু তুমি যে একটা পাখী পুতবে বলেছিলে, এই দেখ একটা পাখী পেয়েছি। মায় কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে এস ত বাবু—“খোকা উল্লসিত হয়ে দাঁড় শুদ্ধ পাখীটিকে ধরে গট্ গট্ করে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে আমার কাছে একটা টাকা চাইল। আমি একটু হেসে বল্লম—টাকা না হয় দিলুম কিন্তু তুমি যে বলেছিলে উঠন পার হয়ে দেউড়ি পর্যন্ত যেতে পারবে, তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না, তার কি হ'ল? দেউড়ি পর্যন্ত যেতে পেরেছিলে? বড় বড় নিষ্পাপ চোখ দুটো আমার মুখের উপর রেখে খোকা বললে—“না মা পাখীটা দেখে যাবার কথা সব ভুলে গেলুম যে। তারপর নিজেই সে বলল—হা হক যাওয়া ত আমার হল না—তবে কি তোমার কথাই ঠিক মা, আমরা সত্যিই যা ইচ্ছা তা করতে পারি না?” খোকাকে নিবিড় ভাবে আমার বুকের উপর চেপে ধরলুম। কোনদিনও খোকাকে এমনি কোরে আদর করেছিলুম কি না মনে পড়ে না। মধ্যাহ্নের জলন্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইলুম। এই বার বোধ হয় আমি বাঁচবার উদ্দেশ্যে পেলুম খুঁজে।

বাঁধ ও বন্যা

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীমদ্রাজ বসু

বিরামবাড়ির ঘর, যেখানে শ্রামল মজুমদার খুন হইয়া ছিলেন। এখন শ্রামলের ছবির চারিদিকে ফুল দিয়া সাজানো হইয়াছে; ধূপ ও দীপ জলিতেছে; মেজেতেও কিছু ফুল ছড়ানো।

রামেশ্বর ও বল্লভ প্রবেশ করিল। বল্লভ হাতের মালাগুলি দেয়ালে টাঙাইয়া দিতে লাগিল। সুরমা মনে করিয়াছে, ইহার মহালের প্রজা। তাহার মুখ উজ্জ্বল হইল।

সুরমা। তোমরা দু'জন এই এলে বুঝি। কেউ ত বিশেষ এলনা, প্রজারা আজ তাদের প্রজাবন্ধুকে ভুলে গেছে। তোমরা তবু মনে করে এসেছ। চলে যেওনা, থেয়ে যেতে হবে। কত আয়োজন করেছিলাম, সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।

[এই সময় নন্দলাল বাহির হইতে প্রবেশ করিল]

নন্দ। এখানে এসেছ বল্লভ? তোমাদের চেষ্টার ফল কতদূর, তাই দেখতে এসেছ?

সুরমা। (জুড়স্বরে) তুমিই বল্লভ? যাও এখান থেকে। আমার বাবার মরণ-আর্তনাদ একদিন এই ঘরের রক্ষে রক্ষে ধ্বনিত হইছিল, আজ আবার তোমার এখানে দেখে শান্তি লোকে তাঁর হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, আমি বুঝতে পারছি।

আমার বাবাকে যে খুন করেছে, তুমি তার আপনার জন, তোমরা একদলের শয়তান—

রামেশ্বর। খুনী কে, জানতে পারা গেছে নাকি?

সুরমা। খুনী রামেশ্বর রায়—

নন্দ। কি বলছ খুঁকী-দিদি?

সুরমা। সত্যি কথাই বলছি। আর যে চূপ করে থাকতে পারছি না, নন্দ-দা, মার কাছে শুনে অবশি আমি চোখের সামনে, বারবার রক্তাক্ত ছবি দেখতে পাচ্ছি। রামেশ্বরকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার মতো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি রটে—

নন্দ। ইনিই যে রামেশ্বর রায়—

সুরমা। Sorry, আপনাকে চিনতাম না—

রামেশ্বর। তা বুঝছি। চিনলে ঐ মধুর বাক্যগুলো জিভে আটকে থাকত—বেরতো না।

সুরমা। অন্তত ভদ্রতার সহিত, কিন্তু এক হিসেবে তাই হয়েছে, মিঃ রায়। শ্রাবকের রচা মিষ্টি কথা শুনে শুনে কান আপনার পচে গেছে। আজ নিজের কানে শুনে গেলেন, লোকে আপনার সম্বন্ধে মনে মনে কি ভাবে—

নন্দ। আপনি রাগ করবেন না রায় মহাশয়। একেবারে ছেলেমানুষ—পাগল।

রামেশ্বর। আরে ছিঃ! রাগ করার কি আছে। আমি পদ্য লিখিনে; আর মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করাও আমার অভ্যাস নয়। লোকের মনের খবরে আমার গরজটা কি? আমি শুনি মুখের কথা। আর রামেশ্বরের সামনে যারা আসে, বেশ ভালো করে মহলা দিয়ে কথাগুলো মিষ্টি রসে রসিয়ে নিয়ে আসে। আমি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু খুশি হই। যারা না বলতে পারে, দরকার হ'লে তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারি। তুমি কি বল বল্লভদাস, পারিনে?—সেই যে জাণ্ডলগাছিতে মল্লিকদের মেয়েটা তুমি ত সব্দে ছিলে হে!

[বল্লভ অস্পষ্টভাবে কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু রামেশ্বরের কথাবার্তায় অপর দুইজন শিহরিয়া উঠিল]

রামেশ্বর। ধরো এই বিকেলবেলা, দিব্য ফুটফুটে ঘরখানা, ফুরফুরে চরের হাওয়া আসছে,—কি নাম তোমার হে?

সুরমা। সুরমা দেবী।

রামেশ্বর। হ্যাঁ...শোন সুরমা, যদি দৈবাৎ আমার মনে কাব্যভাব জেগে ওঠে যে, এইখানে এখনি তোমায় প্রেমদী বলে একেবারে টপ করে বুকের উপর তুলে নেব—হাঃ—হাঃ—হাঃ—তা তোমার মনের মধ্যে যতখানি আগুন জমে থাক না কেন, কিংবা ঐ নন্দলাল বড়ই চোখ কটমট করুক না কেন, কিছুতেই মানাবে না—তোমরা কেউ ঠেঁকাতে পারবে না।

নন্দ। কিন্তু জীবন দিতে পারব—

রামেশ্বর। তা হয়ত পারবে। জীবনহীন দেহ ভৈরবের

স্রোতের তটানে ভেসে চলে যাবে, আমাদের প্রেমচর্চার বিশেষ ব্যাঘাত হবে না।

সুরমা। (কম্পিত কণ্ঠ—আর্তনাদের মতো স্বর) আপনি কি সত্যি সত্যি অপমান করতে এসেছেন?

রামেশ্বর। কিছু না...কিছু না। আপাতত সে মতলব নেই। ওসবো অকুচি হয়ে গেছে। কত দেখলাম! প্রথমে চৌচামেচি, আর্তনাদ—বাপরে বাপ! পরে বলি-দেওয়া পাঠার মতো একদম নিঃসাড়। তারও পরে আচ্ছা! তখন দশ রকম বায়নাঙ্কা, ফাঁক পেলে টাকা-পয়সা সরাবার মতলব। তখন আমার লাগি মেরে বেড়ে ফেলবার পালা। এই এক মজা চলছে আজ এত-বছর। এখন এক নতুন মজা জুটিয়েছে বল্লভ আর নির্মলচন্দ্র। আমার নতুন নতুন বিশেষণ জোগাড়ের জন্ত এরা উঠে পড়ে লেগেছে। লোকে বলছে—দাতা রামেশ্বর, অতি মহৎ রামেশ্বর, নররূপী দেবতা রামেশ্বর। আবার মেয়ে-পুরুষ দল বেঁধে ঘেরোয়া করে মালা পরিয়ে দিয়ে যায়, ভয় পায় না। তার উপর নির্মল নিরন্তর ভরসা দিয়ে বলছে—যাবড়ে যাবেন না, চাই কি, সরকারি খেতাব মিলতে পারে। হাঃ—হাঃ—হাঃ। আজ যেন বেশি বেশি রকছি, মদের মাত্রা বেশি হয়ে গেছে। তা যাই হোক, বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে, বল্লভ। এসে যখন পড়েছি, আর যাচ্ছি নে, ...এখানেই থাকব।

নন্দ। সে কি রায়মশায়, নির্মলের মারফত আপনি কথা দিয়েছিলেন, আরও তিনদিন আমাদের এ বাড়িতে থাকতে দেবেন।

রামেশ্বর। কথা দিয়েছিলাম, মুখের কথা। আদালতে হলপ বলিনি, রেজেষ্ট্রি দলিল করেও দিইনি। কথা দিয়ে থাকি এখন আবার নতুন কথা বলছি—তিন দিন নয়, তিন ঘণ্টা। আচ্ছা, সামনের এই ঘরগুলো ছেড়ে দিয়ে তোমরা পিছনে থাক না।

সুরমা। আপনার সঙ্গে থাকব এক বাড়িতে?

রামেশ্বর। ভয় হচ্ছে?

সুরমা। না...ঘৃণা হচ্ছে। ভয় আমার নেই। জন্ত-জানোয়ারের সঙ্গে এক বাড়িতে মাহুষ থাকে না।

নন্দ। (তাড়া দিয়া উঠিল) কি হচ্ছে খুকী দিদি, ও ঘরে যাও। [সুরমা গুম হইয়া একপাশে সরিয়া গেল। নন্দলাল

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অল্পনয়ের সুরে বলিতে লাগিল] রায়মশায়, কি হবে? কোথায় লোকজন, কোথায় কি! সুখ-আধারী রাত—

রামেশ্বর। সেই ত ভালো। মহামানী শ্রামল মজুমদারের মেয়ে-বউ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, কেউ দেখতে পাবে না।

নন্দ। আকাশে যেখ জমে আছে, বৃষ্টি নামবে এখুনি।

রামেশ্বর। রাত্তার মাহুষজন থাকবে না, দিবি ছাতা মুড়ি দিয়ে চলে যেও। চলো হে বল্লভ, ঘুরে ঘুরে আর আর ঘরগুলো দেখে আসি—

[উহার চলিয়া যায় দেখিয়া নন্দলাল আবার কাতর আবেদন জানাইল]

নন্দ। দয়া করুন রায় মশায়। অন্তত একটা দিন। এখন এই সন্ধ্যা বেলা...জিনিষপত্রের আঙুল নিয়ে উপায় নেই।

রামেশ্বর। না। দয়া করে সাধু সজ্জনে। জন্ত-জানোয়ারের কি দয়া থাকে?

নন্দ। ও একটা পাগল নিতান্ত ছেলেমানুষ, ওর উপর রাগ করবেন না, রায়-মশায়।

রামেশ্বর। ছেলেমানুষ—কিন্তু প্রাজ্ঞ প্রবীণেরা যা যা বলে থাকেন, কথাগুলো ত অবিকল তাই বলে গেল। সবাই বলে—রামেশ্বর রায় মাহুষ নয়, রামেশ্বর রায় সমাজের অভি-শাপ, রামেশ্বরকে ঘৃণা করতে হয়। সেই কথাগুলো ঠিক ঠিক বলে গেল, একটা হেরফের হ'ল না।...ছেলেমানুষ ভুল করে বললে ত পারত, রামেশ্বর রায়ের কেউ নেই, রামেশ্বর পথে পথে বেড়ায়, রামেশ্বরকে কেউ ভালবাসে না। বলতে বলতে ভুল করে ছেলেমানুষ এক ফোঁটা চোখের জল ত ফেলতে পারত!

ছেলেমানুষ! পাগল! পাগল না হাতী!

[রামেশ্বর চুপ করিল। সকলে নিস্তব্ধ। বেশ।

দেব—তিনটে দিনেরই সময় দেব। তুমি সামনে এসো।

সুরমা। তুমিই বলবে। বেশ করুণ করে গলা কাঁপিয়ে

কাঁপিয়ে যেমন থিয়েটারে বলে। “আমি ভালবাসি।” হৌক

অভিনয়, তবু দেবো। হাঃ হাঃ হাঃ—

আলো নিভিল। মঞ্চ ঘুরিয়া নতুন দৃশ্য আসিল।

ভৈরবনদের কূলে দিগন্ত-বিসারী বালুচর। দূরে নৌকার
কোন মাঝি ভাটিয়াল সুরে গান ধরিয়েছে, চরের উপর একলা
বসিয়া নির্মল সেই সুরে বাঁশী বাজাইতেছে—

গান

“ভালবাসি...ও কত্না, তোমায় আমি ভালবাসি—”

গাঙের পাড়ে গাঁয়ের ছেলে বাজায় বাঁশের বাঁশী।

“বালুর চরে তুমি কত্না শুকাও ভিজা চুল,

চিকণ যে চুল হইতে খসে সাদা টগর ফুল।

কুলের সঙ্গে খসে পড়ে চন্দ্রমুখের হাসি;

সেই হাসি কুড়াব বলে গাঙের কূলে আসি ॥

সেই হাসি ঐ গাঙের টানে জোছনা হইয়া ঝিলিক হানে;

সেই হাসি ঐ হাওয়ার সনে গান গাহিছে ধানের বনে।

কুলের উপর চেউ হইয়া যে উছলে হাসির রাশি,

সেই হাসি কুড়াব বলে গাঙের কূলে আসি।”

[গান থামিতে সুরমা এক রকম ছুটিয়াই সেখানে
আসিল]

সুরমা। বাঁশী শুনে ছুটে এসেছি। বুঝলাম, তুমি
এখানে।

নির্মল। বটে! অবস্থা গুরুতর। বৃন্দাবনের রাই-
বিনোদিনীর দশা—

সুরমা। ঠাট্টা নয়, ঠাট্টার সময় নেই নির্মল দা।

নির্মল। কি হয়েছে?

সুরমা। রামেশ্বর বিরামবাড়ি গিয়ে বসেছে, আমায়
অপমান করল।

নির্মল। সে অপমান গায়ে নিও না, সুরমা। এখনো
সে মালুম নয়। একদিন মালুম করে তুলব সেই আশা রাখি।

সুরমা। রামেশ্বর বলেছে, আজ থেকেই ওখানে থাকবে।

নির্মল। বেশ ত, সে থাকবে একটা কি ছোটো ঘর নিয়ে
অত বড় বাড়ি ...ঘরের ত অভাব নেই—

সুরমা। এক বাড়িতে একসঙ্গে থাকতে বলছ?

নির্মল। পারবে না? এই ভরসা নেই, তবে তুমি
গ্রামে থেকে গ্রামের কাজ করতে চাচ্ছ, পারবে কি করে?

কলকাতায় ত বেশ অতগুলো জানোয়ার নাচিয়ে বেড়াতে!

সুরমা। তাঁরা ছিল নিতান্ত নিরীহ আজীবন। আর এ
যে ভয়ানক—

নির্মল। বিষাক্ত গোখরো সাপ? ভুল.....চিনতে
পারো নি সুরমা। ঐ কুলোপানা চকোরই আছে। নইলে
হামেশ্বরের মতো অসহায় এই জগতে আর একটা নেই।

সুরমা। আজই অমনি একটা কথা বলছিল, এমন করে
বলছিল যে কষ্ট হয়। এত অপমান করেছে, কথা শুনে তবু
কই ভুলিল।

নির্মল। আমাকেও একদিন অমনি বলেছিল, আমারও
কষ্ট-তল। শিক্ষা, সংস্কার, লোকনিন্দা—সমস্ত অগ্রাহ করে
সেইদিন থেকে ওর সঙ্গ নিয়েছি। আমাকে ও প্রাণ দিয়ে
ভালবাসে। ভালবাসার একটা অবলম্বন পেয়ে ও মনুষ্যত্বের
পথে এগিয়ে যাচ্ছে—সে খবর আর কেউ জানে না, আমি
জানি। নইলে—কোথাকার কি—এখানে বাঁধ বাঁধবার জন্য এক
কথায় এত টাকা ঢালতে পারে! তাই বলছি সুরমা, থাকে
থাকুক ঐ বাড়ীতে—করুক না হতভাগা একটুখানি আয়েস
আরাম। আর আমি থাকছি—তোমাদের ভয় কি?

সুরমা। তুমি থাকবে, তা হলে থাকতে পারি। দেখ,
প্রথম যখন কলকাতায় বসে নন্দদা'র কাছে তোমার কথা শুনি
আমাদের বিরুদ্ধে দল পাঁকাচ্ছ, তখন বড্ড রাগ হয়ে গেল।
তারপর কথানা পুরাণো চিঠি হাতে এল। তোমার বাবা আর
আমার বাবা ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। (হাসিতে হাসিতে)
ওঁদের মনে অনেক রকম ইচ্ছে ছিল। তাই বাবা তোমাকে
প্রাণের মতো ভালবাসতেন।

নির্মল। আমিও পাঁচটা তাঁর মেয়েকে ভালবাসছি।
এই এক মাসে আশা করি তাতে আর সন্দেহ নেই। অতএব
আমি কৃতব নই। এবং মেয়েটো নিতান্ত নির্দয় নয়। যেহেতু
সেও মনে মনে—

সুরমা। চুপ! মেয়েদের মনের কথা মেয়েরা জানে,
তুমি কি বলবে—

নির্মল। তা বটে! তবে কুলোকে রটার যে আমি
ঐ গাঁয়ের গরিবদের ভালবাসি, তাদের ভাল করতে চাই বলে
মহামহিম মহিমার্ণব জমিদার শ্রীমতী সুরমাও ইদানীং চাষ-
ভ্রমোর বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন, তাদের স্বখ-দুঃখের খবরাখবরও
নিচ্ছেন, তাদের ভালবাসছেন।

সুরমা। ঈশ! কুলোকে রটনা নয়, এ তোমার

নিজেরই অহঙ্কার। প্রজাবন্ধু শ্রামলনাথের মেয়ে প্রজাদেরই বন্ধু হবে। কারো খাতিরে নাকি ?.....কিন্তু শোন গাঁয়ের, এই কাক্সকর্ষ ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে নির্মল-দা।

নির্মল। সেই পাঁচ হাজারের যোগাড় হল বুঝি !

সুরমা। টাকা কি হবে ? যার হাসির এক এক টুকরোর দাম পাঁচ পাঁচ হাজার, সেই দোদুঁড় প্রতাপ নিশারাগী দেবী বলেছেন !...না—না, ঠাট্টা নয়—তোমাকে সত্যিই যেতে হবে। তুমি যদি না যাও, আমাকে জোর করেই কলকাতায় নিয়ে যাবে, এই সোনার গাঁয়ে আর আসতে দেবে না। মা বলেছেন, তোমার সঙ্গে আর আমার কোনদিন—কক্ষণো দেখা হবে না।

নির্মল। আমার অপরাধ ?

সুরমা। বাবাকে যে খুন করেছে—

নির্মল। সে কি আমি ?

সুরমা। না—রামেশ্বর রায়। তুমি তার বাহন।

নির্মল। মিথ্যা কথা। শ্রামলনাথ যখন খুন হন, তখন রামেশ্বর রায় জেলের ঘানি ঘোরাচ্ছে...গভর্নমেন্টের দপ্তরে তার প্রমাণ রয়েছে।

সুরমা। আর জেলে যদি নাও থাকত, সে যে খুন করেছে

তার কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু কে শুনবে সে কথা ! মার আর অত রাগ আমি কখনো দেখিনি।

নির্মল। রাগের কারণ আছে। আমি তা জানি। তিনি তোমার মা নন—শত্রু।

সুরমা। ছি-ছি ! রাগ করে যা-তা বোলো না নির্মল-দা। মা—আমি যার বুকের রক্ত, নিষাদের বাতাস—তিনি হবেন আমার শত্রু !

নির্মল। মা হয়েছে কি মেয়ের বুকখানা কেউ মাড়িয়ে চুরমার করে দিতে পারে ?

সুরমা। তিনি আমার হিতার্থী। তাঁর কত বুদ্ধি—কত দূর ভেবে চিন্তে কাজ করেন। হয়ত এতে আমার ভাল হবে।

সুরমা। কিন্তু পারবে—পারবে তা সুরমা ?—কষ্ট হবে না ?

সুরমা। কি জানি এখন বুঝি তাই ঠিক করে বলা যায় ?

নির্মল। আশ্চর্য্য ! এমন সময়েও হাসি আসে ? যদি না পার, তখন ?

সুরমা। বাঁধ দিয়েছ, তা বলে ভৈরবের জল ত শুকিয়ে যাচ্ছে না নির্মল-দা ?

[আলো নিভিল। মঞ্চ ঘুরিয়া নূতন দৃশ্যের উদয় হইল]

(ক্রমশঃ)

অন্ন বহু কুবর্জিত

শ্রীকালিদাস রায় (কবিশেখর)

দরিদ্রের করে শুক মুষ্টি ভিক্ষা হোকনা প্রচুর,

অক্ষুরিত নাহি হয়, দিনান্তের ক্ষুধা করে দূর।

দারিদ্র্য সংহার দান যাচকেরে শস্যমুষ্টি দান,

মিলি শ্রমজল সাথে যাহা করে ভবিষ্য সংস্থান,—

যে অন্ন হয় না বহু, যেই দান প্রাণ নাহি পায়,

বিস্তার লভেনা ক্রমে—তাহা ব্যর্থ নিষ্ফল ধরায়।

ফলদীপিকা

শ্রীগণপতি সরকার

চন্দ্রক্রিয়া ফল—ভাগফলের সংখ্যাসমারে ফলকথিত হইতেছে, যথা—১ স্থানভ্রষ্ট, ২ তপস্বী, ৩ পরমুত্তিরত, ৪ দ্যুতকারী, ৫ হস্তিমুখ্যাক্রান্ত, ৬ সিংহাসনস্থ, ৭ নরপতি, ৮ শক্রনাশকারী, ৯ দণ্ডনেতা, ১০ গুণী, ১১ নিম্পাণ, ১২ ছিন্নমূর্ত্তা, ১৩ হস্তপদে ক্ষতবিশিষ্ট, ১৪ বন্ধনস্থ, ১৫ বিনষ্ট, ১৬ রাজা, ১৭ বেদপাঠী, ১৮ নিদ্রালু, ১৯ সূচরিত, ২০ ধর্মকর্তা, ২১ সঙ্কশজাত, ২২ নিধিয়ুক্ত, ২৩ বিখ্যাত-কুলীন, ২৪ ব্যাখ্যাকারী, ২৫ শত্রুহন্তা, ২৬ রোগী, ২৭ শত্রু দ্বারা পরাজিত, ২৮ দেশত্যাগী, ২৯ ভৃত্য, ৩০ বিনষ্ট ধন, ৩১ আস্থানী (অর্থাৎ সভাপতি), ৩২ সূক্ষ্মদানাতা, ৩৩ পরমহীভর্তা, (অর্থাৎ পত্নীদার, ইজারাদার, রিসভার, ট্রাষ্টী প্রভৃতি), ৩৪ ভাধ্যাযুক্ত, ৩৫ হস্তী দ্বারা ভীত, ৩৬ যুদ্ধে ভয়প্রাপ্ত, ৩৭ অতিভীত, ৩৮ লীন (ছদ্মবেশী), ৩৯ অন্নদাতা, ৪০ অগ্নিগ, (অগ্নির নিকট অবস্থানকারী), ৪১ ক্ষুধার কাতর, ৪২ প্রস্তুত অনভোজী, ৪৩ ভবঘুরে, ৪৪ মাংসাশী, ৪৫ অন্নক্ষত, ৪৬ (অতি) বিবাহকারী ৪৭ কুস্তাস্থধারী (পাঠান্তরে কন্দুকধারী) ৪৮ দ্যুত ক্রীড়াশক্ত, ৪৯ নৃপতি, ৫০ দুঃখিত, ৫১ শয্যাশায়ী ৫২ শত্রু সম্মানিত, ৫৩ বন্ধুযুক্ত, ৫৪ যোগী, ৫৫ ভাধ্যাযুক্ত ৫৬ মিষ্টান্নসেবী, ৫৭ ছদ্মপায়ী, ৫৮ পুণ্যকর্মী, ৫৯ সূস্থ, ৬০ স্ত্রী ॥১৩-১৫।

চন্দ্রাবস্থাফল—১ স্বস্থান হইতে প্রবাসী, ২ শ্রেষ্ঠরাজার হিতকারী অথবা ঐরূপ রাজার দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত, ৩ দাসত্বের নিমিত্ত প্রাণহানি, ৪ ভূপালত্ব, ৫ স্ববংশের উপযুক্ত গুণযুক্ত, ৬ রোগী, ৭ আস্থানবস্ত্র বা সভাপতিত্ব, ৮ ভয়াতুরত্ব, ক্ষুধাতুরত্ব, ৯ যুৱতি বিবাহকারী, ১১ উত্তম শয্যার আসক্তি, ১২ মিষ্ট ভোজিত্ব—এইগুলি চন্দ্রের অবস্থার নিয়মবশতঃ ফল, ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ॥ ১৬।

চন্দ্রবেলাফল—১ মস্তক রোগ, ২ আনন্দ, ৩ বজন, ৪ স্তম্ভেস্থিতি, ৫ চক্ষুরোগ, ৬ স্থখিতা, ৭ বনিতা বিহার, ৮ উগ্রজ্বর, ৯ স্বর্ণলঙ্কার ব্যবহার, ১০ ক্রন্দন, ১১ বিষপান, ১২ নিধুবনপ্রিয়তা, ১৩ উদর রোগ ॥ ১৭।

১৪ জলক্রীড়াকারী, ১৫ হাস্যমুগ্ধ, ১৬ চিত্রবিলেখনকারী, ১৭ ক্রোধী, ১৮ নৃত্যকারী, ১৯ স্বভোজী, ২০ নিদ্রালু, ২১ গীতকারী, (পাঠান্তরেদানকারী) ২২ দন্তরোগী, ২৩ কলহ-করী ২৪ প্রয়াণ (গমন) কারী, ২৫ পাগল, ২৬ জলসন্তরণকারী, ২৭ বিরোধ ॥১৮।

২৮ স্বেচ্ছামূরূপ আনকারী, ২৯ ক্ষুধাভীত, ৩০ শাস্ত্রলাভ, ৩১ মৌরগোষ্ঠী (গোপনে বা স্বেচ্ছামতসভাকারী) ৩২ বোদ্ধা, ৩৩ পুণ্যকর্মকারী, ৩৪ পাপাচরণকারী, ৩৫ ক্রুর কর্মী, ৩৬ আনন্দিত। এই ৩৬টি চন্দ্রবেলাফল, ইহা পণ্ডিতরা নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৯।

এই চন্দ্রক্রিয়া, চন্দ্রাবস্থা ও চন্দ্রবেলা এই তিনটি জাতকের শুভকার্যে এবং প্রমুখবিচারে সম্যক ফলদায়ী সূত্রাৎ এইগুলি বিশেষ বিচার করিবে ॥ ২০।

চন্দ্রের পক্ষবলকে বিশেষ বল বলিয়া জানিবে। অগ্রগ্রহের স্থানবলই বিশেষ বল। এই বলের সহিত অগ্রবলের যোগে ক্রমশঃ বলাধিক্য হয়; অগ্রবলবিধ বল একত্রীভূত হইলে এই বলের সমতুল্য হয় ॥২১।

রবি বলবান্ সাড়ে ছয় রূপে; চন্দ্র ছয় রূপে; মঙ্গল ৫ রূপে; বুধ ৭ রূপে; বৃহস্পতি রবিরন্যায় ৬০ রূপে, শুক্র ৫০ রূপে বলবান্ হয় ॥২২।

শনি ৫ রূপে বলবান্। এইরূপে বড় বলের যোগে গ্রহগণ ঐ প্রকার রূপ পাইলে বলবান্ আর না পাইলে দুর্বল হয়। এই প্রকারে গ্রহগণের সবলত্ব ও দুর্বলত্ব জানিয়া সম্যক ফল বলিবে ॥২৩।

লগ্নাদিভাগের অধিপতির পিণ্ডকে রূপে আনিয়া ভাবের দিগ্বল এবং ভাবের দৃষ্টিবল যোগ করিলে ভাবের বল লিপ্ত হয়, তাহাই ভাববল নামে কথিত হয় ॥২৪।

ইতি—

চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রহ ও ভাবের বল নির্ণয়

বিষয়ে উপদেশ

গ্রহকার গ্রহের ষড়বল নির্ণয় করিয়া গ্রহের বলাবল স্থির করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ১ম শ্লোকে ষড়বল কি কি তাহা বলিয়াছেন, যথা—

(১) কালজবল (২) চেষ্টাবল (৩) স্বেচ্ছজবল (৪) দীঘল (৫) অয়নবল এবং (৬) স্থানবল।

ঐ ১ম শ্লোকেই কালজবল কি তাহাও বলিয়াছেন, যথা :—

কালবল=(১) নতোনত বা দিব্যাজবল

(২) অক্ষবল বা বর্ষাধিপবল

(৩) পক্ষবল (৪) মাসাধিপবল এবং

(৬) হোরাবল বা দণ্ডপতিবল।

২য় শ্লোকে চেষ্টাবল, স্বেচ্ছজবল, দীঘল ও অয়ন বল বলিয়া ৩য় শ্লোকে স্থানবল বলিয়াছেন।

স্থানবল=(১) বর্গজবল (ক্ষেত্র, হোরা, ত্রৈকোণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ এই ষড়বর্গবল) (২) কেন্দ্রাদিবল (৩) পুংস্ত্রীযণ্ডবল (৪) নৈসর্গিক বল।

এই গ্রন্থমতে—

স্বেচ্ছজবল=(১) তুঙ্গ (২) নীচ (৩) মূল ত্রিকোণ, (৪) যুদ্ধ (৫) অন্ত (৬) নৈসর্গিক মিত্র-সম-শত্রু।

[গ্রহান্তরে ষড়বল—(১) কালবল (২) চেষ্টাবল (৩) দীঘল (৪) স্থানবল (৫) দৃঘল এবং (৬) নিসর্গবল।]

এই গ্রন্থমতে উচ্চবল ও অয়নবল স্থলে গ্রহান্তরে দৃঘল ও নিসর্গবল ধরিয়াছে। এ গ্রন্থে নিসর্গবলটি স্থানবল মধ্যে ধরিয়াছে। গ্রহান্তরে উচ্চবলটিকে স্থানবল মধ্যে ধরিয়াছে। এ গ্রন্থে দৃঘল (বা দৃষ্টিবল) ধরা হয় নাই।

এই গ্রন্থে ঘেরূপ আছে সেই ভাবেই বল নির্ণয় উদাহরণ সাহায্যে দেখাইতেছি। একান্ত একটি উদাহরণ কোণ্ডীর সহায়তা লইতেছি। তাহা এই :—

একটি মহিলা ১৩২৬ সালে ১০ই বৈশাখ বুধবার বেলা ৪টা ২৬ মিনিটের সময় (জগলিতে) জন্মিয়াছে। ইংরাজি ২৩শে এপ্রেল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ বা শকাব্দ ১৮৪১।০।২৭।১৫।৫৮ লগ্ন কন্যা রাশি। মেঘে রবি মঙ্গল। বুধে শুক্র কেতু। মিথুনে বৃহস্পতি। কর্কটে শনি। বৃশ্চিকে রাহু। মকরে চন্দ্র। মীনে বুধ।

গ্রহক্ষুণ্ট :—

গ্রহ	রাশি	অংশ	কলা	বিকলা
রবি	০	২	২২	৪৪
চন্দ্র	২	২	৫	৪৪
মঙ্গল	০	১৩	২৪	৮
বুধ	১১	১৮	১	২৬
বৃহস্পতি	২	১৭	২	১৭
শুক্র	১	১৪	৩৬	২২
শনি	৩	১৮	৩৭	৩০
রাহু	৭	১৩	১	৩২
কেতু	১	১৩	১	৩২

ভাবক্ষুণ্ট :—

লং ভাব	৫	১০	৩২	১০
২য় ভাব	৬	১২	৩৭	৩০
৩য় ভাব	৭	১২	৩৭	৩০
৪র্থ "	৮	১৩	৩৭	৩০
৫ম "	৯	১৪	৩৭	৩০
৬ষ্ঠ "	১০	১৪	৩৭	৩০
৭ম "	১১	১৩	৩২	১০
৮ম "	০	১২	৩৭	৩০
৯ম "	১	১২	৩৭	৩০
১০ম "	২	১৩	৩৭	৩০
১১শ "	৩	১৪	৩৭	৩০
১২শ "	৪	১৩	৩৭	৩০

অয়নাংশ ২২ অংশ ৪৩ কলা ১০ বিকলা। এখানে মেঘ রাশিকে ০ শূন্য রাশি ও মীন রাশিকে ১১ রাশি বলিয়া গণনা করার রীতি। কারণ মেঘ প্রথম রাশি বলিয়া উহার ৩০ অংশ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এক রাশি বলা যায় না। যেমন এখানে রবি ০ রাশি অংশ ২ অংশ ২২ কলা ৪৪ বিকলা অর্থাৎ মেঘ রাশির ২ অংশে ২২ কলায় ৪৪ বিকলায় অবস্থিত।

বিদ্যাসুত্র জ্যোতির্ভাষণ জাতিকপ্রভাকরোপাধিক শ্রীগণপতি সরকার কর্তৃক অনূদিত মন্ত্রেশ্বর বিরচিত ফলদীপিকা গ্রন্থের গ্রহবল নিরূপণ নামক চতুর্থ অধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

হাজারীবাগের চিঠি

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

[১৩২৭ শালের পৌষমাসে লেখককে কিছুদিন হাজারীবাগ-শহরে রাস করিতে হইয়াছিল। তখন হাজারীবাগে লেখকের বড়দাদা শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ডাক্তারী করিতেন। সেই প্রবাস-যাত্রায় লেখকের সঙ্গী ছিল লেখকেরই শিশুপুত্র শ্রীমান দিলীপ দাশগুপ্ত। সেই সময়ে লেখকের নিকট হইতে তাহার পিতা, পূর্ববঙ্গের আদি-নাট্যকার, মহেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পর পর কয়েকখানি চিঠি পান। তাহারই একখানি চিঠি 'ঘরের কথা' নামে প্রকাশিত হইল।]

ঘরের কথা

ইংরাজা মতে 'হা-ডু-ডু' বলিয়া হাওসেক করিলেই মেহ-প্রীতি-প্রদর্শনের চূড়ান্ত হয়, তার উপর মুচ্-কি-হাসি হইলে তো সোনায় সোহাগা! বাঙ্গালী, বিশেষতঃ 'বাঙ্গাল', আমরা আপন জন পাইলে সর্বপ্রথমেই প্রাণ খুলিয়া ঘরের কথার বিনিময় করি। পাশ্চাত্য সভ্যতায় নাম-ধাম জিজ্ঞাসা অসভ্যতা। আমরা সেই সভ্যতার অত্মকরণে মাতৃভূত ছাড়িয়া খাজীর পূজ গলাধঃকরণ করিতেছি! নিতান্ত আত্মীয়-স্বজনেরও অনাদরের দৃষ্টান্ত বুঝাইতে একসময়ে এদেশে বলা হইত—'নাম-ধামটাও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না!' স্বজন-গৃহে 'রামচিনটা' খাইবার, কিংবা—

'তাল তেআঁঠা, পিরে নয়টা,

বাট পিরে তার আঁঠি কয়টা?'—

ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার, আশঙ্কা থাকিলেও, যে-দেশের অধিবাসী শৈশবাবধি—'তোমার নাম কি, ধাম কোথায়, পিতার নাম কি, কাহার পৌত্র, পুত্র বলি কারে'—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর শিখিয়া বৎসরে ছয়বার স্বজন-বাৎসল্যের পরিচয় দিতে ছুটাছুটি করিয়া গৌরব বোধ করিত, আজ সে-দেশে নাম জিজ্ঞাসা অভদ্রতা! এখন আমরা 'হা-ডু-ডু' বলিয়াই সমস্ত আত্মীয়তার সমাপন করিতে চাই। কাজেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অতিথি-অভ্যাগতের প্রাণখোলা আলাপন ও উচ্চ হাসির রোল শুধুমাত্র ঠোটস্থ হইয়া এখন উপরেই ভাসিয়া রাইতেছে! ফলে, চাপা হাসির মত অনেক কথাও চাপাই থাকিয়া রাইতেছে—কে কাহার ঘরের কথার প্রোজ রাখে?

প্রবাসে স্বজনের সাক্ষাৎ পাইয়া প্রথমেই পরস্পরের রসনা ঘরের কথায় ভরিয়া উঠিল। বড়দাদা কুরাণী আহাৰ্য্যের জোগাড়ে রান্নাঘরে ছুটিয়া গেলেন। বড়দাদা মেহাশীষমূলক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মেজদাদা—'ওরে প্রশ্নাম করলি না? গুরুজনকে প্রশ্নাম করতে হয়—প্রশ্নাম কর, প্রশ্নাম কর'—ইহা বলিয়া ক্রাতুপুঞ্জের ভক্তি-প্রণতি আদায় করিয়া লইলেন। মাউই মাতা অশীতিবর্ষ-বয়স্কা, একদিন দুপুরে শুইয়া পরদিন প্রাতে বিছানা হইতে উঠেন, তিনিও লেপ টেলিয়া হাসিমুখে ছুটিয়া আসিলেন। নাতনী খুকুমণি তাহার কাকামণি দিলীপের প্রতি আমাদের ক্রৌড়হল-দৃষ্টি হানিতে লাগিল।

ঘরের কথা জমিতে না-জমিতে মেজদাদার প্রশ্ন হইল—'নবান্ন কবে?' মেজদাদার পূজা-পার্কণের তিথি-নক্ষত্র কখনও বিস্মরণ হয় না। তাঁহার ও আমাদেরও বাল্যকালে আমাদের বহুজন-পরিবেষ্টিত পল্লীগৃহ বার মাস তের পার্কণের উৎসব-আমোদে মুগ্ধরিত থাকিত। শৈশব-স্মৃতি এখনও তাঁহাকে যথাসময়েই সেই সমস্ত পূজা-পার্কণ-স্মরণে সহায়তা করিতেছে। তাই 'কুলাই-থাগুড়া'র ত্রতের চিড়ার 'চাকের' আশ্বাদও তিনি অদ্যাপি বিস্মৃত হন নাই। প্রতি পূজা-পার্কণের পূর্বেই তিনি 'কত আমোদ মোদের বাড়িতে'—এই ধূয়া টানিয়া দিবারাত্রি স্বরচিত পদাবলী গাইতে থাকেন। তাই যখন প্রমোত্তরে জানিতে পারিলেন দুইদিন পরেই নবান্ন, তখনই নবান্নের গান তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। দুইটি দিন দিবারাত্রি নবান্নেরই কথা, ভোরের বেলায় কাক বলির ছড়া—'দাঁড়কাউয়ারে আহ্বান কর্যা'র—আবুতি। নবান্নের দিনক্ষণের সন্ধান পাইয়া মেজদাদার মুখে নবান্নের গান চলিতে লাগিল—



‘আস্চে শুভ নবায়।

তোমরা নতুন ধান ভানো ॥

চাউলের গুঁড়া, নারকেল-কোড়া, আউথি-গুড় দিয়া ছানো ॥
(কহে) বিপিন দাশে নৈলান রসে চাউল-মাখা রসে ভালো,—

মরি হায় হায়রে,—

(তাই) ডাবের জলে (আর) রসে গুলে কয় বাটি দিবে আনো ॥

একে স্বজন-সাক্ষাৎ, তার উপর পূজা-পার্বণের পিঠাপায়সের স্মৃতি,—মেজদাদা আনন্দে আত্মহার! স্বভাবতঃই মেজদাদা ভোলানাথ—অর্দ্ধপাগল, অর্দ্ধচেতন, আত্মানন্দে নিত্য-বিতোর, আত্মপর ভেদ নাই, ডাকিলেই আশুতোষ, ধ্যানভঙ্গে রুদ্ধকঠোর, জাহবীর প্রক্ষিপ্ত ধারা উত্তমাসে চিরসঞ্চারিত, উদাসীনের সংযম-বহি মদন ভ্রম করিয়া কামিনী-কাঞ্চনে নিরাসক্তি জন্মাইয়াছে,—সদাশিবেয় মূর্ত্যু ছবি আর কি হইতে পারে? একদিন ইহার দেহে স্বয়ম্ভুর কন্দর্প-কাস্তি বিদ্যমান ছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এখন সে কায়ার ছায়ামাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু উহাও যেন আশানচরী মহাদেবেরই সমাধিময় স্ফুটন। ঘরের মেজেতে ইহার হাতের বাজনা ডমরু-ধনিরই শ্রাব্য গুরুগম্ভীর। বহির্দৃষ্টিতে যাহাই হউক, শরীরের এ মৃত্তিকে আমি বারংবার প্রণাম করি। *

বড়দাদা সরকারী ডাক্তার। সংপ্রতি পাটনা-টেম্পল-মেডিক্যাল-স্কুল হইতে বদলী হইয়া হাজারীবাগ-সদর-হাসপাতালের আগন্তুক রোগিগৃহের ভার লইয়াছেন। কিছুদিন হইতে ইনি আয়ুর্বেদোক্ত বায়ু-পিত্ত-কফ-স্বকীয় গবেষণায় লিপ্ত আছেন। ইহার মতে প্রাণিদেহের মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাবতীয় পদার্থের অস্তিত্ব আছে এবং সৃষ্টিপ্রকরণ ও স্বর্গমর্ত্য-পাতালের উপকরণের মূলেও এই প্রাণিবিজ্ঞান। যোগশাস্ত্রও এই মতেরই পরিপোষক। ‘শিবসংহিতা’র দ্বিতীয় পটলের প্রারম্ভে উল্লিখিত আছে—

‘দেহেশ্বিন্ বর্ততে মেক সপ্তদীপসমম্বিতঃ।

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥ ১ ॥

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।

পৃণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্তন্তে পীঠদেবতাঃ ॥ ২ ॥

* আমাদের এই মেজদাদা (বিপিনচন্দ্র দাশগুপ্ত) এখন আর ইহলোকে নাই। তাঁহার পবিত্র স্মৃতিতে এখনও আমাদের চিত্ত ভরপুর।

সৃষ্টিসংহারকর্তারো ভ্রমন্তো শশিভাস্করৌ।

নভো বায়ুশ্চ বহিষ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ ॥ ৩ ॥

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ।

মেকং সংবেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ, ‘এই মনুষ্যশরীরে সপ্তদীপসমাকীর্ণ জ্বলন্ত-পর্বত, নদনদীগণ, সমুদ্রসমূহ, শৈলসকল, ক্ষেত্রসমূহ, ক্ষেত্রপালগণ, ঋষিসমূহ, মুনিবর্গ, নক্ষত্রকুল, গ্রহবর্গ, পৃণ্যতীর্থ-সকল, পীঠস্থান-সমূহ ও পীঠদেবতাগণ অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১-২ ॥ বিশেষতঃ এই শরীরে সৃষ্টিনাশকারী রবিশশী সর্বদা ভ্রমণ করিতেছেন। ব্যোম, বায়ু, বহি, তেজ, মলিল ও মেদিনী এই সকলও এই শরীরে রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ফলকথা ত্রিলোকী মধ্যে যে সকল দ্রব্য যেভাবে আছে দেহেও তৎসমুদয় সেইরূপ মেক অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করতঃ স্বীয় স্বীয় কর্ম নির্বাহ করিতেছে ॥ ৪ ॥

‘ষট্চক্রনিরূপণম্’-শীর্ষক গ্রন্থভাগে উল্লিখিত ‘শিশুঃ সৃষ্টি-কারী লসদেববাহনু খাণ্ডোজলক্ষ্মীশ্চতুর্ভাগবেদঃ’ (৭), ‘পীতাম্বর-প্রথমবোবনগর্ভধারী শ্রীবৎসকৌস্তভধরোদ্ধতবেদবাহনঃ’ (১৭) ‘তিনেত্রঃ পঞ্চাসো...ব্যাসচন্দ্রাধারঃ সদাপূর্বো দেবঃ শিব ইতি’ (৩০) শ্লোকাংশসমূহে দেহমধ্যে যথাক্রমে ব্রহ্মা, নারায়ণ ও মহাদেবের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত বহু দেবদেবীর আবাসস্থান ও পৃণ্যতীর্থও যে প্রাণিদেহ তাহা তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে; এমন কি, ‘শিব-সংহিতা’র ১৩৭ ও ১৪০ সংখ্যক শ্লোকে স্বপ্না, পিঙ্গলা ও ইড়া নাকী সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গা বলিয়া কীর্ণিত হইয়াছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত শারীর-বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য করিয়া বিচার করিলে পুরাণাদি-বর্ণিত দেবদেবী, দৈত্যদানব, স্বর্গমর্ত্য সকলই প্রাণিদেহে দেখিতে পাওয়া যায়। বড়দাদার মতে আয়ুর্বেদোক্ত বায়ু পিত্ত কফ ও নীতিশাস্ত্রের সত্ত্ব রজঃ তমঃ নামক ত্রিগুণ অভিন্ন, এবং উহাই পুনরায় ধর্মশাস্ত্রের বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব নামে কথিত। পাশ্চাত্য-চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লিখিত জনন, ক্ষয় ও সমঞ্জস-শক্তি জড়জগৎসম্বন্ধে সক্রিয় ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুরই নামান্তর। ইহাই ‘চতুর্ভূত’ অর্থে পুরুষের বক্ষ্যে বরাভয়দাত্রী, দানবনাশিনী, লোলজিহ্ব প্রকৃতি। চামুণ্ডার এক হস্তে সৃজন, অপর হস্তে সংহার ও মুক্তিরদান তৌলদণ্ডের পরিমাপক-স্বত্বের শ্রাব্য এতদ্ব্যয়ের সামঞ্জস্য সূচিত হইয়াছে। চণ্ডীর ‘নমস্তসৌ নমস্তসৌ’ প্রমুখ প্রসিদ্ধ স্তবমালায় এই

শক্তিই যে ‘সর্বভূতেষু’ ‘বুদ্ধিরূপেণ’, ‘নিদ্রারূপেণ’, ‘ক্ষুধারূপেণ’, ‘শক্তিরূপেণ’, ‘তৃষ্ণারূপেণ’, ‘কান্তিরূপেণ’, ‘দয়ারূপেণ’, ‘ভূষ্টিরূপেণ’, ‘শান্তিরূপেণ’ ‘সংস্থিতা’, তাহা স্পষ্টতই পরিকল্পিত হইয়াছে। চণ্ডীর দেবাস্থরযুদ্ধ রোগবীজাণুর সহিত শরীরের স্বাভাবিক শক্তির ক্ষয়ের রূপক ব্যতীত কিছুই নহে। ‘বিষুকর্ণমলোদ্ভূতো’ ‘মধুকৈটভো’ মলসজ্জাত রোগকীটগুরই রূপক ব্যাধ্যা ও রক্তবীজের শোণিতবিন্দু হইতে ‘পুরুষা জাতা-স্তবীৰ্য্যবলবিক্রমাঃ’ কুপিত ব্রহ্মেরই প্রকৃতি-বিচার বলিয়া নির্ধারণ করা যাইতে পারে। অস্থিসমূহ ভূত্বেরই তুল্য প্রাণিদেহের ভিত্তিহীনীয় ; রক্তবিন্দুর স্বেতকীট অস্থিমধ্য হইতে অধিকতর সজ্জাত হইয়া রোগবীজাণু-বিনাশে সহায়তা করে, এই জ্ঞাত অস্থরসংহারে গিরিরাজকন্যা দুর্গার পরিকল্পনা। হিন্দুশাস্ত্রে ইন্দের সহিত চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিসম্বাদ ও বিচারে ইন্দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যে উপাখ্যান আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় ইন্দ্র মস্তিষ্কেরই নামান্তর। মস্তিষ্কের সংস্থান এবং তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্মকোষ ও কোষপ্রাচীরের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে সহস্রাক্ষ, সহস্রলোচন ইত্যাদি নামের ইতিহাসও পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক মেঘবর্ণ ও মেঘের ত্রায় তরঙ্গসমূহ বলিয়া ইন্দের অপর নাম মেঘবাহন। ‘ইন্দ্রিয়’ শব্দের মূল ইন্দ্র,—বৈদিক ভাষায় আদিদেবের ব্যক্তিক্রম ঘটে নাই,—ইন্দ্রিয় ও ইন্দের যোগাযোগের রহস্যের মূলও তাই মস্তিষ্কের মধ্যে দেবরাজ ইন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। দশেন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব-বিষয় গ্রাহ্য হয় এবং দশেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তড়িৎপ্রবাহে মস্তিষ্কে পরিচালিত হইয়া বিষয়ানুভূতি জন্মায়, ইহাই ইন্দের চর দশ-দিকপালের অস্তিত্বের ও ইন্দের বজ্রীসংজ্ঞার নিদান। বায়ুকীর শিরে পৃথিবীর কল্পনা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত মেরুদণ্ডের আকার হইতে গৃহীত। উহাই পুনরায় শিবশক্তির প্রিয় সর্প ও ধূস্তুর-পুষ্প এবং অঙ্গবিভেদে দেবহস্তের শঙ্খ চক্র-গদা পদ্ম। ‘শারীরমাদ্যং খলুধর্মসাধনম্’ এই নীতিবাক্য শারীর-ধর্মকেই সর্বধর্মের মূল বলিয়া নির্দেশ করে। দাশরথী রায়ের গান—‘হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি’—কৃষ্ণ-লীলাকে হৃদয়াভ্যন্তরে স্থান দিয়াছে। এই সকল প্রমাণ বড়দাদার

মতেরই সমর্থক। আমারও মনে হয় ধর্মার্থধর্ম, দেবদানবলীলা, ধর্মমর্ত্যপাতাল আমাদের দেহ-মন্দিরেই নিত্য-বিরাজিত। যোগশাস্ত্রে মনন-শক্তির স্থান সর্বোপরি। বড়দাদার মতানুসারেও শারীর ও ধর্মসাধনের মূল—মানসিক শক্তির প্রজাগরণ। এই মানসিক শক্তিকে সংযত ও সংস্কৃত করিতে পারিলেই কুটস্থ ব্রহ্ম সর্বেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়। দর্শনশাস্ত্র বাস্তব-জগতকে মনোজগতের প্রতিচ্ছবি বলিয়া স্বীকার করে,—মনন-শক্তির পূর্ণ জাগরণে ইহা সর্বগ্রাহ্যই অনুভূত হয় এবং উহার প্রভাবে যোগী নখদর্পণে ভূতভবিষ্যৎ-বর্তমান প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

মনন-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমই নিজেকে জড়জগতের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে অহরহ দুইটা শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে। প্রবৃত্তিমার্গের পরিচালনায় উহার একটিকে ভোগমার্গ ও নিবৃত্তির অহুশীলনে অপরটিকে মুক্তিমার্গ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। ভোগমার্গে মানুষ ও পশু সমান, রিপু-সমূহের মুক্তলীলা ইহার লক্ষ্য; মুক্তিমার্গে মানুষ কর্তব্য ও ধর্মের উদ্দেশ্যে সংযম করিয়া আত্মশুদ্ধি লাভ করে ও মনন-শক্তির বিকাশে নরদেহেই দেবশক্তি ধারণ করে। মহাত্মা গান্ধীর ‘সত্যগ্রহ’ ও ‘নৈযুজ্য’ ধর্মের মূলস্বত্র এইখানে। যিশু-খৃষ্টের আত্মত্যাগ ও নিত্যানন্দপ্রভুর উক্তি—

‘মেরেছ কলসির কাণা,

তাই বলে কি প্রেম দেব না!’—

মুক্তিমার্গে মনন-শক্তির চরম পরিণতির পরিচায়ক।

* * *

মাঝে মাঝে বড়দাদার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা ও রাজনৈতিক কথাবার্তা চলে। বড়দাদা চরমপন্থী, জগতের সঙ্গে ভাল রাখিয়াই চলিতেছেন। ‘রায় বাহাদুর’ ‘খান বাহাদুর’ সকলেরই এখন এক লক্ষ্য—মুখে যিনি যাঁহাই বলুন না, কিংবা স্বার্থের খাতিরে মায়ামুগ্ধ হইয়া কণেক লক্ষ্য-লভে হউন না কেন! ‘পেটে দিলে পিঠে সয়’; কিন্তু যেখানে পেটে ও পিঠে উভয়ই টান, সেখানে মানুষ কাজেই চরমপন্থী হইয়া পড়ে।

প্রাচীন ছড়া

মোসাম্মাৎ রাহাতুলেচ্ছা খাতুন

* ডালিম গাছে কুটুম (১) নাচে,
চাকরী পাবে বলে ভাই, সিলেট (২) চলে গেছে।

দাদার গলায় তুলসি দানা,

বৌ পালাইচে চাঁদাই কোণা।

দাদা তোমার পায়ে পড়ি,

এটু এ্যাটভা বৌ এনে দাও খেলা করি।

এটু টুক ঘরখানা বেতের বাঁধুন ; (৩)

তারই মধ্যে বসে থেকে ময়না বিবির কামুন। (৪)

আর কেঁদ না ময়না বিবি, বেলা হ'ল শেষ ;—

বাপ-মায়েকে সেলাম দিয়ে চল আপন দেশ।

ডালিম গাছে মোরগ ডাকিতেছে, ইতিমধ্যে ডাক পিয়ন আসিয়া পত্র দিয়া গেল, পত্র খুলিয়া দেখা গেল—শ্রীমতীর ভাইএর শ্রীহট্টে চাকরীর ডাক পড়িয়াছে। এই শুভ খবরে তিনি শ্রীহট্টে চাকরীর জন্ত চলিয়া গিয়াছেন। দাদা (বড়ভাই) বিদেশে যাওয়ার পরই ভ্রাতৃ-জায়া চাঁদাই-কোণা তাহার (স্ত্রীর) পিত্রালয় পালাইয়া গিয়াছে। ছোট ভগিনীকে বাড়ীতে একাকী থাকিতে হয়—তাই দাদার নিকট সিলেটে তাঁহার স্ত্রীর পলায়নের সংবাদ জানাইয়া বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অল্প একটি—তারই মত ছোটমেয়েকে বিবাহ করিবার জন্ত আবদার জানাইতেছে। কিছুদিন পত্রের প্রতীক্ষায় থাকিয়া যখন ভ্রাতা ভগিনীর কথার জবাব দিলেন না, তখন নিজেই বাধ্য হইয়া সন্দেশ লোক লইয়া ভ্রাতৃ-জায়াকে তাহার পিত্রালয় হইতে আনিতে রওয়ানা হইল।

* এ অঞ্চলে (পাবনা জেলায়) হাড়ি-চাচা (কুটুম-পক্ষী) যে বাড়ী ডাকিয়া থাকে সেই বাড়ী সেই দিন আত্মীয় কুটুম আসিয়া থাকে, ডালিম গাছে কুটুম নাচা ও ডাকা একটা শুভ লক্ষণ।

(১) কুটুম। (২) শ্রীহট্ট

(৩) বাঁধন (৪) কাদা

ভায়ানী (ভাই-এর স্ত্রী) যখন দেখিল, তাহাকে স্বামী-গৃহ হইতে লইবার জন্ত তাহার নন্দ নিজেই আসিয়াছে, স্বামী-গৃহে যাইতে হইবে ভাবিয়া বেতের বাঁধা একখানা ছোট গৃহে 'শ্রীমতী ময়নামতি' কাদা স্তর করিয়া দিল। নন্দ (স্বামীর ভ্রাতা) তখন ভায়ানীকে (বৌ দিদি) সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছে—(একটু রহস্যভরে) ময়না বিবি, আর বুঝা কন্দন করিও না ;—বহুদূর যাইতে হইবে পিতামাতার নিকট হইতে শীঘ্র বিদায় হইয়া, সেলাম দিয়া, নিজ দেশে চল।

কাতলা উঠিয়া বলে,—“আমরা দু'টা ভাই, রাজকন্যা বাড়ী ভানে, আমরা গান গাই।”

আমুলি উঠিয়া বলে,—“আমি সকলের বড়, আমি না থাকিলে ঢেকি চেতর (১) হ'য়ে পড়।”

মোনাই উঠিয়া বলে,—“আমি সকলের বড়,—আমাকু দিয়া গৃহস্থের ধান-চাল শুঁড়া কর।”

ঢেকি উঠিয়া বলে,—“আমি সকলের বড়, আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করে পার ?”

সাপটা * উঠিয়া বলে—আমি সকলের বড়, আমাকু দিয়া ধান-চাল (২) ব্যাড়া পরিকার কর।”

চ্যারার (১) মাটি দলা দলা;

* কুকরা নাচে কদম (২) তলা;

ঝি-বৌএর কি এমন জালা;

ঝি বৌএর কি এমন জালা।

* বড় বা বাঁধুন। (১) চিং, উবুড়ের বিপরীত। (২) (rice). চাউল।

(১) কেঁচো। (২) কদমবৃক্ষ।

* মোরগের উক্তি ঝি-বৌএর প্রতি ও সহানুভূতি হৃদয়।

যুধুর বিয়ে

যুধু-মলো যুধু-মলো

আলো (১) চাল খায়া (২)

যুধুর বিয়ায় যাব আমি—

লাল সাড়িখানু ফিন্দা (৩)

মায়ে দিল তেল-সিন্দুর

বাপে দিল বিয়া

পরের ব্যাটা (৪) ধরে নিল,

মাল-কোঁচা দিয়া।

মাওই ও পুত্রীর প্রণোত্তর

প্রঃ—মাওই! তাওই গ্যাছে কোণে?

উত্তর—বাঁশ বাড়ার হাটে,—

প্রঃ—ঘরখান ক্যা নড়ে?

উঃ—বাবুই ঠালা পারে।

প্রঃ—কান্চিত (১) কি?

উঃ—সজ (২) বু নৈছি।

প্রঃ—সজের মধ্য কি?

উঃ—বেজী পুজেচি—বেজীর দল্লতে (৩) আমি নাচন
শিখেচি।

ছেলে-সোহাগ

বাবা এ্যাদিন ছিল কোনে?

হলুদ গাছের গোড়ে।

ছখিনী মার হুং শুনে আইচি তোমার কোলে।

• হোলো, হোলো মাণিক রে—

কে ক্যাললো (১) পানিত (২) রে—

এত রাতে বাঘের ভয়,

তাও মাণিক জাল বয়,

নিভরে (৩) ভিজিল গাও, (৪)

মাণিক তুল্যা (৫) কোলে ল্যা ও। (৬)

(১) আতপ। (২) খাইয়া। (৩) পিন্দিয়া, পড়িয়া।

(৪) ছেলে।

(১) ঘরের পিছন দিক।

(২) ধুনে

(৩) (দৌলতে), সাহায়ে।

(১) কেলিল। (২) জলে। (৩) শিশির। (৪) গা,
শরীর। (৫) তুলিয়া। (৬) লও।মাঝি (জলে) পাড়ার মেছোনীরা ছেলেকে এইপ্রকারে
সোহাগ দিয়া থাকে। আমি ছোটবেলায় তাহাদিগকে এই
ছড়া বলিতে শুনিয়াছি।—লেখিকা।

মালের (১) ফুল তিলের ফুল জামাই গ্যালা (২) কতদূর?

জামাই এল ঘামিয়া, ছাতা ধর টানিয়া,

ছাতার উপর জোমলা, দেখে বিবির কমলা,

এনহান বিবির খাড়া পায়,

জামাই দেখে নিবার চায়।

আতা গাছের পাতা,

বৌ, কওনা কেন কথা?

কথা কইব কোন ছলে?

কথা কইতে গা জলে।

যখন কথার যোগ্য হব,

কথায় কথায় তর্ক দিব।

ছোট ছোট করল্যার ফুল,

দামাদ যাবে কত দূর?—

দামাদ (১) এল ঘামিয়া,

ছাতা ধর হানিয়া।

বার (২) বাড়ী গুথার গাছ করড় মরড় করে,

তারি তলে বসে দামাদ অধিরাস করে।

খালি দিলাম, বাসন দিলাম, তাও দামাদ গোসাই
করে!

(৩) জামাই। (২) বাহির বাড়ী।

একখান (৩) কুঞ্চি হ্যাঁকা-ব্যাঁকা,

ফুল ধরিছে ঝোঁপা ঝোঁপা,

কোন্ কামারে গড়াইছে,

সোনা দিয়া মোড়াইছে,

বাবুর বাড়ী বৈঠকখানা,

পান বানাইছে—রঙ্গদানা,

(আমি) সাধ করে বানাই'ছি (২) পান

(তুমি) মান করে কান্ (৩) খাওনা?

কোন্ কামেলী করছে মান,

তুমি খুলে কেন বল না?

(১) শস্যার ফুল, শর্ষপ। (২) গেল।

(৩) একখানা। (২) তৈয়ারী করিয়াছি। (৩)

কেন।

পান-গুবাকের কথা

প্রশ্ন—পান খাও পানত্যা ভাই কথা কও ঠাড়ে,

পান-চুণ-সুপারীর জন্ম কি প্রকারে ?

পান খাওয়ার পর যদি না কও কথা,

ছাগ (১) হয়ে মুড়ে খাও সড়া গাছের পাতা।

উত্তর—গুয়া (২) ধরে খোপা খোপা,

পান ধরে বরে (৩)—

সেই পান লিয়া (৪) ব্যাচে (৫) সহর বাজারে,

পানের উৎপত্তি কথা যদি কৃষ্ণ কয়,

দিনে দিনে বারে পুত্র যত বৃষ্টি পায়,

সভার মধ্যে কৃষ্ণ কথা কয়,

পান শুদ্ধ হয়।

গাছে ডালিম পাকছে, টিয়া বসে খাচ্ছে,

ছোটগ ঠাকুর তুমি যেও না বিদেশে।

ছুঃখের কাহিনী আমি কব কার সাথে ?

ছোটগ ঠাকুর তুমি যেও না বিদেশে।

আগে হাঁটে, প্রসাদ বাঁটে, নৌকার ধরে হাল, (১)

বিয়ার যে ঘটকালী করে তার বাপে খায় গাল।

প্রশ্ন—কুটুম-পক্ষী (১) কুটুম-পক্ষী * বাড়ী যাবা কবে ?

উত্তর—সাম (২) গুজ্বারে, বাজার-খরচ করে থুছি (৩)

মেজ-মামার ঘরে, মেজ-মামার-বোঁ (৩) যেন কেমন
কেমন করে।

(১) হাঁড়ি-চাঁচা। * যেদিন সকালবেলা হাঁড়িচাঁচা

যে বাড়ীতে ডাকে সেদিন সেই বাড়ীতে কুটুম আসিয়া

থাকে। সুতরাং সেইজন্য হাঁড়িচাঁচা পক্ষীর নাম “কুটুম-

পক্ষী” হইয়াছে। পাবনা জেলার প্রায় লোকেই হাঁড়ি-
চাঁচাকে “কুটুম-পক্ষী” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

(২) সামনের, সম্মুখের। (৩) থুইয়াছি, রাখিয়াছি।

(১) ছাগল। (২) গুবাক, সুপারী। (৩) বরজ।

(৪) লইয়া। (৫) বিক্রয়।

(১) হাইল।

গাবতলা গেছিলাম, টিয়া পাখী পাছিলাম,

মা তুমি কাঁদ ক্যা, সোণার গলা ভাঙ্গ ক্যা ?

টাকা দিব বাজায়া, (১) বোঁ আনবো (২) সাজায়া। (৩)

* ছোটগ গাছের ঢেউ, বড় গাছের ঢেউ।

এ টু-টু ছুঁড়িরা জমিদারের বোঁ।

কলা বুনল্যাম (১) সারি সারি, মধ্য বুনল্যাম জিড়া,

ভাসুর (২) দেখ্যা বোঁ পালাল, তসর গেল ছিড়্যা। (৩)

* আতা গাছের পাতা (১) এনো,

দীঘল গাছের গোটা (২) এনো,

চুল ধরে তিন বাড়ি (৩) এনো,

বিনে দুধের দৈ (৪) এনো।

(১) বাজাইয়া। (২) আনিব। (৩) সাজাইয়া।

অধিকাংশ বাল্য-বিবাহ ধনী লোকের মধ্যেই

সংক্রামিত। উহাই দর্শন করিয়া (ইহা প্রযুক্ত হইয়া)

একটা দরিদ্র যুবতী (উপযুক্ত বয়স্কা) প্রতিবাদী জমিদার

গৃহিনীকে (বিবাহিত বালিকা) লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত

ছড়াটি বলিতেছে।—লেখিকা।

মন্তব্য * সর্দার বিল পাশ হইলে বাল্য-বিবাহ রহিত

হইবে। বাল্য-বিবাহের বিষয় ফল দেশময় ছড়াইয়া

পড়িয়াছে, ইহার আশু প্রতীকার সর্দার-বিলের

মারফতে হইলে দেশরক্ষা হইল। নচেৎ দেশ যে

তিমিরে, সে তিমিরেই।

(১) বুনলাম, পুতলাম। (২) স্বামীর বড় ভাই,

(বড়ঠাকুর) (৩) ছোড়া।

* স্বামী হাটবারে-হাটে যাইতেছেন, স্ত্রী স্বামীকে হাট

হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনিতে ফরমাইন (ফার্দ)

দিতেছে সংক্ষেপে,—পূর্বে (সেকালে) স্ত্রীগণ স্বামীকে

এইরূপে বুদ্ধি পরীক্ষা করিত।

(১) পান, (২) সুপারী. (৩) চিংড়ী (ইচামাছ) তিনটি।

(৪) চুণ।

(ক্রমশঃ)

কৈশোর জীবনের স্মৃতি

শ্রীমুরেশচন্দ্র দেব

গুরুসদয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় কৈশোর ও প্রথম যৌবনের। আজ প্রায় বিশাল্লিখ বৎসরের পূর্বে শ্রীহট্ট গবর্ণমেন্ট স্কুলের এন্ট্রান্স পরীক্ষা (বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন) দিবার জন্ত আমরা প্রস্তুত হইতে ছিলাম। তার তিন বৎসর পূর্বে গুরুসদয় আসিয়া বোধ হয়, চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। পর্যাল্লিখ বৎসরের খুঁটিনাটি সব কথা এখন মনে করা কঠিন। তবুও মনে হয়, সে ১৮৯৭ ইংরেজী জুন মাসের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের বৎসরই সে আমাদের ক্লাশে ভর্তি হয়। সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করে। তখনকার দিনে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা বাংলা ভাষা ও গণিতে তাঁদের সহপাঠীদের হারাইয়া দিতেন; ইংরেজী ভাষায় তারা সাধারণতঃ অপ্রেক্ষাকৃত কাঁচা থাকিতেন। যখন গুরুসদয় আমাদের ক্লাশে ভর্তি হইল, তখন আমরা মনে করিলাম যে আমাদের এই ধারণা অস্বাভাবিক নূতন ছাত্রটি সম্বন্ধে বেশী কিছু ভাবিবার নাই। বাংলা ভাষা ও গণিতে তার নিকট হারিয়া গিয়া, ইংরেজী ও ইতিহাস-ভূগোলে তার শোখ করিতে পারিব। কিন্তু এই ধারণা ভাঙিতে আমাদের বেশী দিন লাগে নাই। বার্ষিক পরীক্ষার ফল দেখিয়া আমাদের অনেকের টনক নড়িল। এমন চোখের ছেলের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয় লাভ হয়। সে প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়া আমাদের বহুদিনের ধারণা অগ্রমাণ করিয়া দিল।

তখন শ্রীহট্ট গবর্ণমেন্ট স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন ৬৬র্গা কুমার বসু। এই ছোট-খাটো মানুষটি শ্রীহট্টের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় তিন পুরুষের শিক্ষক ছিলেন। যেদিন এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফিস দাখিল করিয়াছিলাম তখন এই বলিয়া এই অল্পভাবী লোকটি তাঁর স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়া ছিলেন—“তোমার বাবাকে পাঠাইয়াছিলাম পরীক্ষা দিতে, আজ তার ছেলেকে পাঠাইতেছি।” গুরুসদয়ের শক্তির পরিচয় পাইয়া শিক্ষক সম্প্রদায় সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতেন, পড়া-শুনায় সাহায্য করিতেন। বিশেষতঃ সেকেন্ড

মাষ্টার ৬বিধূভূষণ মজুমদার। তিনি গণিতের শিক্ষক ছিলেন। ক্লাশের পড়া ছাড়া বিশেষ করিয়া তিনি জ্যামিতির নানা প্রব্লেম সমাধানে গুরুসদয়কে সাহায্য করিতেন। ইংরেজী পড়াইতেন দুর্গাকুমার বাবু। নিত্য পাঠ শিক্ষা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; যে বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবি-কাটি এই ভাষার সাহায্যে হস্তগত করা যায়, তৎ-সম্বন্ধে কোন বিশেষ উৎসাহ তাঁর নিকট পাওয়া যাইত না। স্মরণ্য এই বিষয়ে আমাদের নিজেদের প্রকৃতির প্রেরণায় চলিতে হইত। বরং অনেক সময় ইংরেজী রচনা ইত্যাদিকে ভাষার ঝঙ্কার তুলিবার চেষ্টা করিলে তাঁর নিকট ভৎসনা লাভ করিতে হইত। দুই এক-দিনের অভিজ্ঞতার পর এই বিষয়ে আমাদের সকলেই সাবধানে চলিতাম। গুরুসদয় এই বিষয়ে একটু বেশী সাবধানী ছিল বলিয়া মনে পড়ে।

আমাদের স্কুল ও আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে গুরুসদয় বাস করিত। সেই সময়ে ৬হুলালচন্দ্র দেব মহাশয় সরকারী উকীল ছিলেন শ্রীহট্টের। তাঁর বাড়ীর প্রকাণ্ড হাতায় অনেক বিদ্যার্থী বাস করিতেন। গুরুসদয় ইহাদের একজন ছিল। হুলালবাবুর দেশের বাড়ী ছিল করিমগঞ্জ সাবডিভিসনে। করিমগঞ্জের অনেক ছাত্রেরাই তাঁর অভিভাবকত্বে থাকিয়া শ্রীহট্টের স্কুল কলেজে পড়াশুনা করিত। গুরুসদয়ের সঙ্গে হুলালবাবুর কোন আত্মীয়তা ছিল কিনা আমি জানি না। তার জন্মস্থান বীরশ্রী গ্রাম করিমগঞ্জের মধ্যে গণনীয় স্থান। সেই সম্বন্ধের জেরে গুরুসদয় হুলালবাবুর সাহায্য লাভ করে। আমাদের পাড়া হইতে এতদূরে বাস করার স্কুলের সময় ছাড়া গুরুসদয়ের সঙ্গে মেলামিশি করিবার সুযোগ বেশী হইত না। তার কর্তব্যনিষ্ঠ, ছক-কাঁটা জীবন-যাত্রা সময়ের অপব্যবহারের একরূপ সুযোগ বা প্রশ্রয় দিত না। স্কুল কলেজে তখন বর্তমানের মতন সামাজিক অহুষ্ঠানাদির বাহ্য ছিল না। সরস্বতী পূজা ও পুরস্কার বিতরণী সভা ছাড়া আনন্দ-কোলাহল করিয়া, মিলিয়া মিশিয়া, দল বাধিবার

আমাদের সঙ্গে বাস করিতেন। গুরুসদয়কে আমাদের এই সামাজিক জীবনের মধ্যে খুব কমই উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছি। তার এই অল্পপস্থিতি আমাদের মধ্যে, শ্রীহট্ট গবর্ণমেন্ট স্কুলের তার সহপাঠীদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া যখন সে আমাদের মধ্যে দাঁড়াইল, তখন আমরা তার অসামাজিকতার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। তবুও এই আনন্দের মধ্যে আমাদের মনে কোথায় যেন একটা অভাব থাকিয়া গেল। অবিনাশের কথায়বার্তায় এই অভিমানে ধ্বনি শুনিতে পাইতাম। ইংরেজ কবি টেনিসনের In Memoriam কবিতায় এই ব্যবধানের কথা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গুরুসদয় যখন বিলাতে গেল Civil Service পরীক্ষার্থীরূপে তখন অবিনাশের দুঃখের কথা আরও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল।

আমরা কলিকাতায় রহিলাম। তখন বাংলার মরা গাঙ্গে

বানের জল ঢুকিয়া কলধ্বনি আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের কানে তাহা বাজিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, উপাধ্যায় ব্রহ্মবাক্য ভগিরথের মতন শঙ্খধ্বনি করিয়া এই প্রলয় পয়োধি জলের মহাশ্রোতের গতি নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা সে শ্রোতে ভাসিয়া গেলাম। গুরুসদয়ের জীবনের সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ হইল। সেই ব্যথা অনেক দিন ছিল। অবিনাশ দেখিয়া বাইতে পারিল না গুরুসদয়ের জীবনের পরিণতি। যে পরিণতি ভিন্ন পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাদের দেশের সেবার মহাসঙ্কমে মিলিত হইয়াছিল। আজ অবিনাশ নাই, গুরুসদয় নাই। তাবের কৈশোরের এক-প্রাণতার সাক্ষীরূপে আমি আছি। বিচ্ছেদের ও ব্যবধানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবন কিরূপে সার্থকতা লাভ করে—তার আর একটি প্রমাণ আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে পাইয়া, তাহা স্মরণ করিবার স্মরণ পাইয়া, আজ ধন্য হইলাম। সহপাঠী ছুঁজনের স্মৃতি তর্পণ করিয়া আজ প্রসাদ লাভ করিলাম।



স্বর্গতা সরোজনলিনী দত্তের মাতামহ স্বর্গত রাখালচন্দ্র বসু মহাশয়ের
অন্তরঙ্গ বন্ধু কর্ণবীর ও দানবীর স্বর্গত রামগোপাল সাহা

যে নদী মরুপথে হারাল ধারা

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীসরলা বসু রায়

দ্বিপ্রহর। বেলা বারোটা বেজে গেছে, গলির ভিতর ছোট একতলা বাড়ী, সম্মুখে মাটির অগ্রশস্ত্র উঠানে একটা নীচ জাতিয়া স্ত্রীলোক বাসন মাজিতেছে, উপরে রোয়াকের উপর একটি কুড়ি বাইশ বছরের তরুণী বসিয়া রান্না করিতেছে এবং সুমিষ্ট গুণ গুণ করে গান করিতেছে। তাহার হাতের খুস্তি, হাতা, হাঁড়ী, কড়ার উপর এমনই অভিনব কৌশলে চলাফেরা করিতেছে যে তাহার দ্বারা এক চমৎকার বাজনার সৃষ্টি করিয়া তাহার গানকে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে। কিছুদূরে একটা ছোট সতরঞ্চ একটি ছয় সাত বৎসরের বালক বই, খাতা, পেন্সিল লইয়া পাঠচর্চায় রত ছিল। মাতা সময়ে সময়ে বালকের উপর নজর দিতেছিল, প্রয়োজন মত বুঝাইয়া দিতেছিল কিন্তু বালক ক্ষণে ক্ষণে অচমনক হইয়া মায়ের গান বাজনার তরঙ্গে তলাইয়া মুগ্ধ, বিম্মিত, প্রতিভাষিত চোখের দৃষ্টি মায়ের উপর রাখিয়া শুক হইয়া বাইতেছিল।

এমন সময় তিন চারিটা তরুণীর সুমিষ্ট কণ্ঠের হুঁ হু গুঞ্জন এবং খুট খুট জুতার আওয়াজ আসিয়া মাতা পুত্রকে সচকিত করিয়া তুলিল। কারণ এ বাড়িতে কেহ বড় একটা বেড়াইতে আসে না। যদিও এটা পল্লীগ্রামের মত, পরস্পর পরস্পরের বাড়ি বেড়ান, আলাপ পরিচয় করার প্রথা থাকিলেও স্বধার কাছে কেহ আসে না কারণ সে কখন কাহারও বাড়ী ধাওয়া বা মেশামিশি করে না। কারণ সে যে ভাবে মানুষ হইয়াছে, যে ঘরে জন্মিয়াছে, যে ভাবের লোকদের সহিত মেলামেশায় পরিচিত এখন তার আত্মমর্য্যাদায় বাসে তাদের সঙ্গে মেশার কল্পনা করতেনও। আর সে ছিটকে যেখানে এসে পড়েছে, এদের সঙ্গে তার কোথাও মেলে না কাজেই ত্রিশঙ্কর মত মাঝখানেই সে ঝোলে। না এদের, না ওদের, কারো সঙ্গে মেশার প্রবৃত্তি তার হয় না। তাছাড়াও আর একটা প্রধান কারণ এই যে মানুষের মনের যে সরস অবস্থা থাকলে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিশে “দিতে” এবং “নিতে” পারে, সে অবস্থা স্বধার নেই; কাজেই মানুষের সঙ্গ তার পক্ষে বিশেষ বিরক্তিজনক।

কাজেই অতিক্রান্ত কয়েকটা সুরূপা সুরেশা তরুণীর আগমনে স্বধা রীতিমত সমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পরক্ষণেই আনন্দ চকল সুরে বলে উঠল—“রুবি, লিলি, শিউলী, কণা, তোরা? আমি এ কি দেখছি, তোরা কোথা থেকে এলি ভাই?”

তরুণীরা সকলেই প্রায় একসঙ্গে আনন্দিত স্বরে বলে উঠল, “কি করে যে এসেছি সে শুনলে কিন্তু আমাদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারিবে না ভাই। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন যে করে, এও কতকটা তাই।

কণা বলল—ভবে তোমায় এই পচা গলির ভিতর থেকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব একমাত্র রুবীরই। এর কৰ্ত্তাটা তিন মাস হতে চলল জ্যেষ্ঠ ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে এই সহরেই বিরাজ করছেন। এই রুবি ও তিনি লাইব্রেরীর প্রায় কাছাকাছি গঙ্গার উপর বাড়িটায় থাকেন ও প্রত্যহ প্রাতে যুগলে গঙ্গার নির্মল বায়ু সেবন করতে বেরোন। সেই তোমার ঐ ছোট্ট ছেলেকে রোজ লাইব্রেরীতে হাজির হতে দেখে এবং ছেলের হাতের বইয়ের নিষ্ঠটা দেখে, ঠিক করেছেন ও ছেলে তোর না হয়েই যায় না। তারপর অনুকোষারী শেষ করে চাপরাশিকে তোর ছেলের অলক্ষ্যে তার পেছা নিয়ে বাড়ির নিশানা করে আসতে বলে তারপর আমাদের খবর দিয়ে সদলবলে তোমার বাড়ী আসার কীৰ্ত্তি রুবীরই। কিন্তু স্বধা তোর কি ভাই একেবারেই আমাদের ভুলে যেতে হয়? আমরা তো তোকে একটুও ভুলতে পারি নি। তোর ঠিকানা জানি না তবু তোকে খুঁজে খুঁজে হস্তরাণ। আমরা সবাই সকলের খোঁজ খবর রাখি, শুধু তোর ছাড়া। তোর এমন সৃষ্টিছাড়া প্রকৃতি কেন হল ভাই? সখেদে কণা এই কথা বলল।

স্বধা পরিহাস তরলকণ্ঠে বলল, “আরে যে জিনিষ যত জুস্তাপ্য হয়, মানুষের তার তত ব্যকুলতা। এ আমার অনেক কিছু খেয়ালের একটা যে তাদের মনের মাঝে আমি থাকব, বাহিরের কাজে নয়। দেখছিস তো, এই সব ছেলে-

দের আমায় মাহুস করতে হবে। তোর। তো এ রসে প্রায় বঞ্চিত, আগে ছেলের মা হও তারপর বুঝব আড্ডা দেওয়ার সময় কত পাও। কিন্তু রুবীর আমায় আবিষ্কার বেশ একটু অদ্ভুত। লাইব্রেরীতে বই আনতে কত লোকই ত যায়, তা দেখেই আমার ছেলে বলে সন্দেহ হল, এর মানে ? না লিটে আমার হাতের লেখা চিনে ?

রুবী বলল, “না ভাই হাতের লেখা আগে কি করে দেখব। আগে সন্দেহ, তবে হাতের লেখা তারপর বাড়ি এই সব অল্পসন্ধান করেছে। রোজই দেখি একটা ছোট ছেলে একথানা বই হাতে নিয়ে ঘড়ীর কাঁটার মত লাইব্রেরীতে হাজির হয়, ঠিক আটটায়। একদিনও এর ব্যতিক্রম দেখলুম না। উনি বলেন, আমি লক্ষ্য করেছেছি ছেলেটা একটা লিটে আর বইখানা লাইব্রেরীয়ানের হাতে দেয় ও বলে ছাপ দেওয়া খানা থাকে যদি দিন, নয়তো ওর মধ্যে যেখানা হয় দিন। তারপর বই নিয়ে কোনদিন বা চলে যায়, কোনদিন বা এটুকু ছেলে গঙ্গার ধারে বসে পড়তে আরম্ভ করে দেয়। এটুকু ছেলে এমন গম্ভীর ভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়ে যে দেখলে হাসি পায়। কাল ঐ রকম পাঠরত তোমার পুত্রকে দেখে কোঁতুলের বশবর্তী হয়ে গেছন থেকে দেখলুম বইখানার নাম কি ? দেখি “রাক্ষসীর রাণী” ওরে বাবা এটুকু ছেলে “রাক্ষসীর রাণী” পড়ে, ওর মায়ের বাপের নাম কি জানা দরকার। জিজ্ঞাসা করা মাত্র সন্দেহ সত্যে পরিণত হল। তখনি চাপরাশীকে বললুম, “ওর অলক্ষে ওর পেছ পেছ রাড়ী দেখে আয়। তারপর এদের সব খবর দিয়ে সঙ্গে করে এই আসছি, সেই চাপরাশীটাকেই সঙ্গে নিয়ে।”

সুধা বলল “হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেম বটে। সাহেবের চেয়ে এককাঠি দড়, গোয়েন্দাগিরি করে লোককে তাক লাগিয়ে দিতে পারবি বটে। কিন্তু কবি এখানে কোথেকে জুটলি রে ? উকীলবাবুটা কি এই চুঁচড়া কোর্টেই প্র্যাকটিস করছেন নাকি ? কোনখানটায় থাকিস্ তোরা ? চারটাতে এক সঙ্গে জুটলি কি করে ?”

কথা বলল, “আমার তিনি আলিপুরেই প্র্যাকটিস করেন, সেখানেই থাকি আমি। এখানে সম্প্রতি আমার দ্বাদ্দা এসেছেন বদলী হয়ে। তারই কাছে কদিনের জন্ত বেড়াতে এসেছি। দাদার সঙ্গে রুবীর সাহেবটির বিলক্ষণ ভাব, কাজেই দেখাশুনা

হয়ে গেল। আর লিলিই যে আমার বৌদির পদ নিয়েছেন, এ খবরটা তুই রাখিস না বোধ হয় ? আর শিউলি ভাই এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে—হুদিনের জন্ত রায়সাহেবের বাড়ীতে অর্থাৎ এখানের বর্তমান জজসাহেবের বাড়ীতে কারণ তার মেয়ে রিণার সঙ্গে শিউলির বেজায় ভাব। শিউলির বর সলিল আই, সি, এন্স পাশ করে এই আটদিন মাত্র সাগর পারের দেশ থেকে দেশের মাটিতে পা দিয়েছেন, সাত ঘাটের জল খাবার কাজে নিযুক্তও হয়েছেন কিন্তু তার আগে একবার অর্থাৎ নতুন জীবন সুরু করার পূর্বে বন্ধুবর্গের সঙ্গে দেখা করে আনন্দ দিয়ে ও নিয়ে যাবে না তাই। তা তাকে যখন চাক্ষুষ দেখবার সুবিধা আমাদের হল, তখন ওবেলা সদলবলে আমাদের সবাকার তিনিদের সঙ্গে নিয়ে আসব তোর সঙ্গে আলাপ কববার জন্তে, চেনে, শুধু দেখেনি।”

শিউলি বলল, “ভাই সুধা আমার চেয়ে রুবী কিন্তু ঢের চালাক, তা আমি আমাদের এই আনন্দিত মঞ্জলিশে কায়মনো-বাক্যে স্বীকার করছি। আমারই তোমায় আবিষ্কার করার কথা, তা না হয়ে রুবীই সে যশ লাভ করলে।”

সবাই বলে উঠল, “রুবী কি রকম, শুনি কি রকম আমাদের কিছু বলিস নি শিউলি ?”

শিউলি উত্তর দিল “কি আর বলব বল, নিজের নির্বুদ্ধিতা কেউ কি সহজে প্রকাশ করে। আমার খবুর এখানে তিন বৎসর ছিলেন। এই তো সম্প্রতি বদলী হয়েছেন। তা আমি ত এখানেই থাকতুম। খবুরের ঐ একটি মাত্র ছেলে ; ও যখন সাগরপারে বিদ্যালয়ের জন্ত যেতে বাধ্য হল তখন খবুর, শাশুড়ি তাদের সবটুকু আদর স্নেহ দিয়ে আমার ঘিরে রাখলেন তবে খবুরের সব কথাই আমার সঙ্গে হত।

যেদিন আমরা চলে যাব এখান থেকে তার আগের দিন থেকে খবুরের আমার শরীরটাও ভাল ছিল না। তিনি প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গার ধারে অনেকটা রাস্তা একলা বেড়াতে যেতেন। সেদিন আমি বললুম “আজ বেড়াতে যাবেন না শরীর যখন ভাল নেই আসুন না বাবা, আমরা বসে একটু গল্প করি বাবা। তিনি বললেন কিন্তু কাল যে চল যেতে হবে মা, আমি বললাম “তাতে কি, আপনার আসা-যাওয়া ত অভ্যাস হয়ে গেছে বাবা। কারো সঙ্গে কি আপনি দেখা করতে চান ? তিনি ইতঃপ্ততঃ করে হেসে বললেন, ও আমার একটা ক্ষুদে বন্ধুর

সঙ্গে। একথা শুনে তোমরা হাসবে মা, কিন্তু মানুষের মন বিচিত্র জিনিষ জানো ত মা? আমি একজন বিশিষ্ট কমিশনার সাহেব, ছটা জেলার কর্তা, আমি রাস্তা চললে, দুধারে সেলাম করে লোকে সমস্তমে রাস্তা ছেড়ে দেয়, সেই আমার সঙ্গে একটা কার না কার ছোট ছেলের বন্ধুত্বের কথা একটু বিস্ময় বটে; কিন্তু বন্ধুত্বটা কি ভাবে আরম্ভ হল তবে। শোন, “প্রথম যেদিন তাকে দেখি তখন তার বয়স বড় জোর তিন কি বড় জোর সাড়ে তিন, ঝিয়ের কোলে চড়ে চলেছে, হাতে একটা বই, ঝিটা এসে লাইব্রেরীর সামনে তাকে ছেড়ে দিল, সে লাইব্রেরীতে ঢুকে সেই বই, ও একটা কাগজ লাইব্রেরীয়ানের হাতে দিল, লাইব্রেরীয়ান লিষ্ট দেখে তাকে বই দিল, সে বেরিয়ে আবার ঝিয়ের কোলে চড়ে ফিরে গেল। পরদিনও লক্ষ্য করলুম সে ঝিয়ের কোলে হাতে বই আসছে, আমার দেখছে বেশ লক্ষ্য করে, তখনও তেমন রোদের জোর হয়নি, গঙ্গার হাওয়া মাথায় লাগাবার জন্ত টুপি খুলে আমি হাতে রেখেছিলুম, সে সেটা লক্ষ্য করে নিজের টুপিটাও খুলে হাতে নিল, ছেলেটির মধ্যে একটু যেন স্বাভাবিক আমি লক্ষ্য করলুম। পরদিন দেখি সে ঝিয়ের কোলে মহা গোলমাল সুরু করেছে, এই বলে আমার ছেলে দে, ছেলে দে, তারপর বিষম পা ছুঁড়ছে বুট জুতো শুদ্ধ, অগত্যা ঝি তো কোল থেকে নামিয়ে দিল, সে তখন আমার পাশে এসে নিঃসঙ্কোচে আমার মতন তালে তালে পা ফেলে ফেলে চলতে লাগল, তার বেশভূষাও আমারই মত থাকীর, তার পায়ে বুট ও মাথায় ছাটী; আমি একটু জোরে চললে, পরিচিতের মত বলে উঠলু দাঁলাও, অত ভোলে কেন যাচ্ছ, অগত্যা তার সুবিধাজনক ভাবে আমার চলতে হল, আমার সঙ্গে সমানে পা ফেলে ফেলে সে কী চলবার কারদা, আমি কোতুক বোধ করছিলাম বেশ, তারপর লাইব্রেরীর সামনে গিয়ে আমার বলল, “তুমি দাঁলাও” অগত্যা সেখানেই আমি প্রায় চারি করতে লাগলুম, সে বই নিয়ে বেরিয়ে এসে ঠিক তেমন করে আমার সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে ফেলে এসে একটা গলির মুখে এসে ঝিয়ের কোলে উঠে বাড়ী ফিরে গেল।

সেই তিন সাড়ে তিন বছরের ছেলে এখন ছয় সাড়ে ছয় বছরের বালক, যা তার বুদ্ধি, যা তার কথা, শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আমাদের এখন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, এখন আমরা অনর্গল

কত কথা বলি, তার শেষ নেই, প্রত্যহ সবাই দেখে ছেলেটা আমার হাত ধরে বকতে বকতে চলেছে, এবং সে লাইব্রেরীতে ঢুকলে, আমি দরজায় প্রায়চারি করছি, সমস্ত লাইব্রেরীয়ান তার মায়ের লিষ্টে দাগ দেওয়া বই অথবা আমার সেই লিষ্টে পেন্সিল দিয়ে মার্কী দেওয়া বই দেয়, সেই বই এনে আমার হাতে দিয়ে ছেলেটা আমার হাত ধরে চলতে থাকে, আমি প্রায়ই ঐ বই পড়তে পড়তে আসি, তারপর সেই মুখে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়, এমনি আজ তিন বৎসর চলছে, একদিন ব্যতিক্রম নেই। আমি প্রায়ই গলির মুখে এসে ছেলেটাকে লোভ দেখাই তুমি আমার বাড়িতে চল চকোলেট দেব। অনেক—সে বলে “মা রাগ করবে, কার বাড়ি যেতে নেই তুমি চলনা মাকে বলবে।” অগত্যা নিরস্ত হই, তার কাছ থেকে তার মায়ের বাপের নাম জেনেছি, কাল তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তার বাপ কোথায় কাজ করে? বলতে পারল না। পদস্থ ভদ্রলোক, তা ছেলের চাল চলন, শিক্ষা, প্রতিভা দেখলেই বোঝা যায়, তবে আশ্চর্য, আজ তিন বৎসর যাদের ছেলের সঙ্গে অজ্ঞাত: একঘণ্টা আমি একত্র কাটাই, সকলেই জানে আর তার বাপ, মা কি জানে না, কিন্তু একবারও ভদ্রতার খাতিরেরও আমার সঙ্গে দেখা করল না, বা আমার নজরে পড়ার চেষ্টা করল না, কাল আমি তাকে বলেছিলুম, আমি কাল দেশ থেকে চা'ল যাচ্ছি, তুমি বড় হয়ে আমার মনে করে দেখা করবে তো, ভুলে যাবে না? সে খাড় নেড়ে বলল হাঁ! আবার জিজ্ঞাসা করল, “কাল আসবে না তবে আবার কবে আসবে?” কি উত্তর দেব আমি, বললুম আজ বিকেলে, তুমি তোমার মা বাবাকে নিয়ে আমার বাড়িতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে, তোমার মাকে একথা গিয়ে বলগে, সে বলল, আমি রোজ মাকে তোমার কথা বলি, তুমি চল না আমাদের বাড়ি।” আমি বললুম তুমি বিকেলে আমার আনতে যেও, এখন আমি চললুম, সে বলল কোথায় তোমার বাড়ি, মাকে বলব। আমি বললাম আমার বাড়ি ও নাম তোমার মা চেনেন।” তা কই এল না তো কাল, আজ একবার ঐ রাস্তাটা শেষবারের মত বেড়িয়ে ও বন্ধুটিকে দেখে আসি। কিন্তু দেখ মা ঐ ছেলেটির বাপ মা কিন্তু বেশ অদ্ভুত। তুমিই বল না আজ তিন বৎসর আমি লাইব্রেরীর নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছি, তবেই না

ওর মা, তার লিষ্ট মাফিক নতুন নতুন বই পড়তে পেয়েছে, নচেৎ ওতো জানা কথা, লাইব্রেরীয়াানের অজুহাত, “যে এ সব বই বেয়িন্নে গেছে,” যেটা আজ চাইবে, তিনমাস পরে যদি সেটা মেলে, আমাদের দেখেই সমস্তই বই জুগিয়ে এসেছে, এবং আমি সুপাঠ্য নানা বই পছন্দ করে মার্কা দিয়ে দিতুম; এত খানি সুবিধা যার জন্ত ভোগ করল, তার কাছে একটু কৃতজ্ঞ হওয়া কি উচিত নয়?”

তারপর তাঁর ডায়রীতে তাদের নাম দেখলুম, তবু আমি এমনি বোকা যে বুঝতে পারিনি, যে ঐ অদ্ভুত ব্যবহার সুখা ভিন্ন আর কার হতে পারে না; এ সুখা আমাদেরই সুখারানী। আর কুবী ওর চেয়ে হালকা নিশানাতেই তোকে আবিষ্কার করল।”

লিলি এতক্ষণ চুপ করে সুখার দিকে চেয়ে শুধু দেখছিল তাকে, কথা বলেনি, এতক্ষণে বলল, “ভাই সুখা তোর সঙ্গে দেখা না হওয়াই ছিল ভাল, এ তোকে কি দেখলুম ভাই, এ তোর কী হাসি, এ তোর কী পরিবর্তন যে আমাদেরও তুই এড়িয়ে চলিস।” আমাদের মাঝে যতদিন ছিলি, আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বও তোকে আমাদের মাঝে মিশে যেতে দেয়নি, চিরদিনই একটা স্বাতন্ত্র্য তোর ছিল যার কাছে আমরা বরাবর নত, আর আজ আমাদের থেকে তুই কতদূরে চলে গেছিস ভাই, আমাদের সুখের সংসারের মাঝে তোর স্থিতি কতখানি আমাদের বিমনা করে দেয় যদি বুঝতিস।”

সুখা হেসে উত্তর দিল “লিলি ভাই, তুই তো চিরদিনই কবি, ভাই এমন মিষ্টি করে আমার বর্ণনা কচ্ছিস তোর সেই ‘ব্যক্তি বিশেষটা’ তোর ঐ কবিত্বের প্রভাব মুগ্ধ হয়েই না তোর কাছে ধরা দিয়েছিলেন, এ সব খবর কি আমি রাখি না মনে করিস? তবু কণা মিথ্যে দোষ দিচ্ছে যে তাদের বিয়ের ব্যাপার আমার অজানিত।”

লিলি বলে বসল “আচ্ছা সুখা আমায় তো খুব বলছিস, কিন্তু আসল কবির যে কিছুই খোঁজ খবর আমরা পাই না, ব্যাপার কি, তুই কি আজকাল সাহিত্য চর্চাও করিস না নাকি? দিবা তো হাতা, বেড়ী, খুন্তী, নিয়ে অভিনব বাজনার তালে গান চলছিল, আমরা কি শুনি নি মনে করেছিস? আসল কবি না হলে সবেদ ভেতরই কবিত্ব দেখতে পায় কি?

শুন না হয় তোর বন্ধ হয়েছিল তাড়াতাড়ি, কিন্তু বিদ্যার অনুরাগ, আর মাষ্টার পণ্ডিতের ঘটা এ সবেদ তো তোর দিকে ক্রটি ছিল না, তবে ওদিকে বিরাগের কি কারণ? তুই দারুণ দুর্বোধ হয়ে উঠেছিস; আমি কিছুতেই তোকে বুঝে উঠতে পারছি না ভাই, ওরা যতক্ষণ পরমানন্দে তোর সঙ্গে কথা বলে চলেছে, আমি ততক্ষণ নির্বাক তোকে লক্ষ্য করে চলেছি, দেখছি তোর সেই অদ্ভুত প্রতিভা, যা দ্বারা তুই মুগ্ধ করে তুলিয়ে দিবি আমাদের আসল উদ্দেশ্য কি?

এবার সুখা একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, “বল তোরা কি চাস আমার কাছে?”

সকলেই প্রায় ছাড়া ছাড়া এক একটা কথা বলে উঠল, “আপাততঃ তোর সঙ্গে গল্প গাহা করতে, তোর সঙ্গে সুখ ভোগ করতে, তারপর আমাদের নিয়েই তো শুধু আজকাল সম্পূর্ণ হয় না কোন কাজ আমাদের অর্দ্ধাঙ্গকে বাদ দিয়ে, কাজেই তোমাকে আমাদের মজলিসে এখন থেকে প্রত্যহই যোগদান করতে হবে, যে ক’দিন ভগবান একত্রে থাকবার সুযোগ দেন। কি অপরাধে তুই আমাদের পরিত্যাগ করেছিস বলতো? শিউলি আরম্ভ করল, “চিঠি দাওনা, দেখা দাও না, ঠিকানা পর্যন্ত লুকোও, এমন কি প্রতি কাগজের পৃষ্ঠায় আমরা উৎসুক দৃষ্টিতে তোমার অস্তিত্বকে খুঁজে ফিরেছি তোমার পাই নি, কেন? সংসারে ভাগ্য বিপর্যয় তো অনেকেরই হয় ভাই, তাকে আবার এমন অভিনব রূপ দেবার চেষ্টা করে কেউ, তা তো শুনি নি। এই ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান ঐ কার্পেটেতে উল দিয়ে লিখে রেখেছে কে? নীচে নামটা কি সুখারানীই নয়, তবে? বলে আবৃত্তি করে চলল;—

ভাগ্য আমার করবে কি ছাই,

যতই খটাক মন্দ;

গাইব আমি মহোন্মাদে,

আমার গানের ছন্দ।

ঘটবে যতই দুর্ঘটনা,

করব ততই সুর রচনা,

জানি জানিই রাত্রি শেষে,

হাসবে আবার ‘চন্দ্র’ ॥

সবাই বলে উঠল, সুন্দর অতি সুন্দর।

তারপর সুখাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোকে যখন অতি

কষ্টে পেয়েছি ভাই, আর ছাড়ি না, এটা ঠিক। তখন সকলে একযোগে সুমিষ্ট গান গেয়ে উঠল “কত আরাধনা করে পেয়েছি তোমারে ছেড়ে তো দিব না আর।” আর লিলি গলা জড়িয়ে ধরে বলল “আর রাখিব করিয়া গলার হার।”

সুখার চোখে জল মুখে হাসি, সে বলল “আমি কথা দিচ্ছি ভাই আজ থেকে, সাহিত্য চর্চার চেষ্টা করব, শুধু তোদের উৎস্রুত্যা স্বরণ করে, আমার সান্নিধ্য অহুতব করবি তোরা—আমার লেখা, গান, গল্প, কবিতার মধ্য দ্বিমে, আমি সমালোচকের গালাগালি, পাঠকের টিটকারি, আর সম্পাদকের দিক্‌দারি, এসব কিছুতেই বৈধাচ্যূত হব না। কেবল তোদের কথা মনে করে, আমার কিছুই সাহিত্য চর্চার অহুকুল নয়, কেবলমাত্র মন ছাড়া। আমার হাই ভল লেখাও তোদের আনন্দ দেবে এই আমার লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য ও সাঙ্গনা থাকে।”

রুবী বলল, সুখা ভাই তোর কথাগুলো তো বেশ সুবিধের নয়, মনে হচ্ছে এ যেন সেই বিয়োগান্ত নাটকের মহলা দিচ্ছি। তুই, কেন তোর সঙ্গে কি আর জন্মে দেখা হবে না, ভাই তোর লেখা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে?”

সুখা ম্লান হাসে বলল “ঠিক ভাই, হয়তো কখনও হতেও পারে কিন্তু সে তো অনিশ্চিত।”

রুবী বলল “মানে? এই ছ’পাতকিতে তো তুই আমি বাস করি, দেখা আর হবে না কি-রকম, রাড়ি ঢুকতে না দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিবি বুঝি?”

সুখা বলল “না ভাই কথায় কথায় আসল কথাই তোদের বলতে ভুলে গেছি, আজই পাঁচটা কম মিনিটের মধ্যে আমরা এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যাচ্ছি, এটা তো ভাড়া বাড়ি কিনা “উনি” কয়দিন হল বদলী হয়ে গেছেন; এখন থেকে আমরা সব দেশেই বাস করব, আবার যদি কখন এখানে বদলী হন তবেই এ দেশে আসব, আজ আমার দেওর এসে আমাদের নিয়ে যাবে, সবই ঠিক।

সবাই একসঙ্গে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠল—সেকী, সে কী, সে আবার কোন দেশ, কোথায় তোমার স্বস্তির বাড়ি? গাঁয়ের কি নাম কি ঠিকানা? সুখা বলল কেন, তোরা যাবি নাকি সেখানে, ভাই অত ঠিকানার খোঁজ, সে আরামবাগে নেমে

পাঁচ-ছয় কোশ গরুর গাড়ি করে যেতে হয়, শুনলেই মুচ্ছা যাবি, কি হবে সে গোপীনাথপুরের নাম ঠিকানায়-তোদের ভাই শুনি?”

সবার মুখের হাসি নিভে গেল, ম্লান মুখে সজল চোখে খানিক চুপ করে রইল, রুবী বলল “তবে ভাগ্যে আজই এসেছি সন্ধান পাবামাত্র, না হলে আর দেখাই হত না বল?”

সুখা বলল, “হ্যাঁ আজই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে দেব, এক জন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের দখলে কাল থেকে এ বাড়ি যাবে এই আমাদের ব্যবস্থা হয়ে আছে।”

তখন সকলে একটু ইতঃততঃ করে সুখাকে প্রশ্ন করল, “হ্যাঁ ভাই তোর সেই অজ পাড়ারগীয়ে যেতে মন লাগছে, সেখানে থাকতে তোর কষ্ট হবে না?”

সুখা বলল “না হয় না; ছায়া ঢাকা, প্রাণী ডাকা রবিবারের পল্লীবাটীটি পড়িস্ নি তোরা, ভাই ও কথা জিজ্ঞাসা করছিস্?”

কিছুক্ষণ কারুর মুখেই কথা নেই, পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রুবী বলে উঠল, “আর ভাই চারটে বাজে প্রায়, এতক্ষণ সে ভদ্রলোকটা উৎকণ্ঠিত চিন্তে বাড়িতে ফিরেছে, আমাদের এই মিলনানন্দের গল্প শোনবার জন্তে, এবং আজ আমাদের আনন্দে মজলিসে আমাদের প্রিয় বান্ধবীকে কেন্দ্র করে “ফিরে পাওয়া” উৎসবের বিরূপ উদ্দেশ্য আয়োজন করতে হবে, তারই জন্ত বৃথা মাথা ঘামাচ্ছেন এবং মনে মনে চেনা লোকটা আজ চোখের দেখায় রূপান্তরিত হবে কতক্ষণে, তবে উৎকণ্ঠিত চিন্তে অপেক্ষা করছেন, কারণ “প্রিয়ের প্রিয়” বড় মিষ্ট। কিন্তু আমি তাকে কি বলব? বিশেষতঃ তাকে আবিষ্কার করার সে ভদ্রলোকের কত সাহায্য নিতে হয়েছে।”

তখন সকলেই বলে উঠল “ঠিক আমাদের বাড়িতেও ভাই, সকলেই সুখাকে দেখতে, আলাপ পরিচয় করতে উৎসুক।”

সুখা ধীরে ধীরে বলল “তা যে হবার নয় ভাই কিছুতেই, তোরা ভাইদের প্রীতি সম্ভারণ জানাবি এবং আমার কথা বলবি যে “দেখার চেয়ে চেনার মূল্য অনেক বেশী।”

সবাই শুরু হয়ে রসে রইল।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের কথা

ত্রিজ্যোতিষ চন্দ্র বোষ
(পূর্বস্মৃতি)

“উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ধুমায়ৈ থেকো না আর,
অজ্ঞান তিমিরে তব স্তম্ভভাত হল হের।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব বাস্তবিক-প্রতিভা দেখাইতে পুনর্বার ॥”

সার্থক লিখিয়াছিলেন বাঙ্গালার পুত চরিত্র প্রতিভা-
বান সন্তান স্মার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—যখন
তিনি রবীন্দ্রনাথের বাস্তবিক প্রতিভা নাটকের অভিনয়
দেখিয়াছিলেন। তিনি সগর্বে আরোও লিখিয়া-
ছিলেন—

“হের তাহে প্রাণভরে, স্থখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
যুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
‘মণিময় ধূলি রাশি’, খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বঙ্গ জননীর মুখ
উজ্জল করিয়া দিয়াছে। দেশ বিদেশে তাঁহার সধর্মনার
বিবরণ পাঠ করিলে তাঁর জীবন কথা শ্রবণ করিলে
বাঙ্গালীর বুক দশ হাত হইয়া যায়। সেই জন্ত তাঁর
মহান জীবনের কথা যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করা হইতেছে।
গত ছয় সংখ্যায় তাঁর ৭৩ বৎসরের কথা বলা হইয়াছে।
অবশিষ্ট ৭ বৎসরের কথা এখন বলা হইবে তাঁহার
কর্ম ও প্রতিভার প্রবাহ স্থির ও মন্দা হইয়া আসিলেও
যেমন উজ্জল তেমনই গৌরবময়। আমুরণকাল বাণীর
সাধনা যে একটি মহামানব কত করিতে পারে, তারই
দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে যখন বোম্বাই ভ্রমণে
গমন করেন বঙ্গের মহিলা-কবি সরোজিনী নাইডু তাঁহার
স্থখ স্থবিধা দেখিবার যাবতীয় ভার নিজহস্তে লইয়া ধরা
হইয়াছিলেন। রিগেল থিয়েটারে ও কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর
হলে রবীন্দ্রনাথ The challenge of judgement এবং
“The price of Freedom” নামে দুইটি বক্তৃতা

ইংরাজিতে দিয়াছিলেন। ২রা ডিসেম্বর ভারতীয় বণিক
সঙ্ঘ এক উদ্যান-সম্মিলনে, পার্শ্বী যুবক সম্মিলন এক
শ্রীতি সম্মিলনে এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্
চ্যান্সেলার এক শ্রীতি ভোজে রবীন্দ্রনাথকে আপ্যায়িত
করিয়াছিলেন। বোম্বাইতে শান্তি নিকেতনের ছাত্র-
ছাত্রীরা ‘শাপমোচন’ ও ‘তাসের দেশ’ অভিনয় করে।
কবি দ্বয় উপস্থিত থাকিয়া পরিচালনা করিয়া ও পরামর্শ
দিয়া অভিনয় সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছিলেন।

৩রা ডিসেম্বর বোম্বাই হইতে ওয়ালটেরার যাইয়া অল্প
বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত
শ্রব কৃষ্ণস্বামী আয়ার বক্তৃতা প্রদান করেন। বিজয়ানা-
গ্রামের মহারাণীর সাহসনয় নিমন্ত্রণে বিজয়ানাগ্রামে
একদিন বিশ্রাম করেন। নিজাম সরকারের আমন্ত্রণে
হাইদ্রাবাদে গমন করেন। ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে
Message of Truth নামে একটি বক্তৃতা প্রদান
করেন। ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সম্মানে একটি
উদ্যান সম্মিলন ও প্রধান মন্ত্রী একটি রাজকীয় ভোজ
অনুষ্ঠান করিয়া করিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ২২শে ডিসেম্বর,
মিনেটহলে রামমোহন রায় শতবার্ষিক সভায় কবি অভি-
ভাষণ পাঠ করিয়া মহাত্মার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি ও নব
বাঙ্গালার কৃতজ্ঞতাঞ্জলি প্রদান করেন। সেই সময় কলিকাতার
টাউনহলে ‘নিখিলভারত মহিলা মহাসম্মেলনের’ যে বিরাট
মেয়েদের সভা হয় তাহাতে তিনি ভারতের নানা প্রদেশের
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শ্বী রমণীদের অপূর্ব সম্মেলন,
নানা বিচিত্র বেশভূষায় অনিন্দিত স্তম্ভরীদের সমাবেশ,
গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী,
বাঙ্গালী, ব্রহ্মী, গোয়ানীজ, সিদ্ধি, কাশ্মিরী
নানা ভাষা ভাষী মহিলাদের ঐক্য মনোভাব দেখিয়া
আনন্দিত হন এবং কবি উৎসাহ বাণীদ্বারা তাঁহাদের

আপ্যায়িত ও উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। সমবেত রমণীরা যখন কবিরই গান ‘জনগণ’ গাহিয়া মাতৃপূজার সহিত তাঁহার পুরোহিতেরও পূজা ও পুষ্পবৃষ্টি করে, তখন যে অপূর্ব দৃশ্য হইয়াছিল তাহা যে দেখিয়াছে সে জীবনে ভুলিতে পারিবে না।

১৯৩৪ সালের ১৯শে জাহ্নবীরী মাসে, কবি রাষ্ট্রপতি জহরলাল ও তাঁহার সহধর্মিণী কমলা দেবীকে শান্তি নিকেতনে সম্বর্ধনা করেন। এই মে তিনি সিলোন যাত্রা করেন। কলকাতাতে তিনি ৯ই উপস্থিত হন। তৎপর দিন কবি রোটারী ক্লাবে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১১ তারিখে ভারতীয় বণিকসভা এবং ১৪ই পৌরসভা রবীন্দ্রনাথকে সমাদরে সম্বর্ধনা করে। শান্তি নিকেতনের শিল্পীগণ রিগলেরদ্বন্দ্বকে ‘শাপমোচন’ অভিনয় করেন, কবির উপস্থিতিতেই অভিনয় হইয়াছিল। ১৭ই মে ওই এম সি এ এর সভায় তাঁহার বাদলা কবিতার আবৃত্তি স্বয়ং করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। কাণ্ডি, অলুরাধাপুর, জাফনার প্রাচীন ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন স্থাপত্য ও শিল্প সম্ভার দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ২৩শে জন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার নব প্রণীত ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসটি বরানগরে অধ্যাপক প্রশান্ত মহালানবীশ মহাশয়ের বাটীতে পাঠ করেন। তখন সেই পাঠ সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদের শুনিবার পৌভাগ্য হইয়াছিল। যেমন মধুর তেমনই উদ্দীপক সে সব বাণী।

কবি বিশ্রাম কাহাকে বলে জানিতেন না। যেমন অফুরন্ত তাঁহার লিখন, তেমনই অবাধ তাঁর ভ্রমণ। অক্টোবর মাসেই তিনি মাদ্রাজ চলিলেন, মাদ্রাজের পৌরবাসীদের পক্ষে মাদ্রাজ সরকারের প্রধান মন্ত্রী বোবিলীর রাজা তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন। ২২শে অক্টোবর, মাদ্রাজের পৌরসভা তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিল। ২৪শে কংগ্রেস হাউসে তাঁহার ও শান্তি নিকেতনের রূপদক্ষদের চিত্রের এক মনোরম প্রদর্শনী উদ্বোধন হইয়াছিল। ‘গভর্নমেন্ট হাউসে মাদ্রাজের মহামাতা গভর্নার স্যার জর্জ ষ্ট্যানলী ও লেডী ষ্ট্যানলী রবীন্দ্রনাথকে উদ্যান-সম্মিলনে অভ্যর্থনা করেন। কবির উপস্থিতিতে মাদ্রাজেও ‘শাপমোচন’ অভিনয় হয়।

কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পথে ২রা নভেম্বর কবি ওয়ালটেয়ারে অবতীর্ণ হইয়া ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাগীর অতিথিরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। এই নভেম্বর অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ৮ই নভেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

আবার ২৯শে নভেম্বর বেনারসে যাইয়া “রাজঘাট মন্টেনরী স্থল” এর নূতন গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়া আসেন।

১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, বাদলার গভর্নার স্যার জন এণ্ডারসনকে শান্তিনিকেতনে অভ্যর্থনা করিয়াই পুনরায় বেনারসে রওনা হন। ৮ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ পাঠ করেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে ডি, লিট্ উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

বেনারস হইতে মোটর গাড়িতে এলাহাবাদ গমন করেন। ১২ই তারিখে মিনেট হলে একটি বক্তৃতা করেন। ১৩ই তারিখে লাহোর যাত্রা করিয়াছিলেন। ১৫ই পাঞ্জাবী ছাত্র মহাসম্মেলনে অভিভাষণ পাঠ করেন। গুরুদ্বার দেখিয়া, ওই-এম-সি-এতে নিজের কবিতা আবৃত্তি করিয়া লাহোরবাসীদের ধন্য করেন। ১লা ও ২রা মার্চ লক্ষ্মীতে আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় দুইটা বক্তৃতা প্রদান করেন।

শান্তিনিকেতনেও ১২ই মে, কলিকাতায় সাহিত্য পরিষদে কবিকে তাঁর পঁচাত্তর বৎসর জন্মোৎসব উপলক্ষে সম্বর্ধনা করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মি হিসাবে তাঁহার নিকট পরিষদের পক্ষে যে একটা ‘বরণী কলম’ উপহার দিবার প্রস্তাব যখন শ্রীযুক্ত অমল হোমের সহিত করি, তিনি সানন্দে তাহা গ্রহণ করিবার সম্মতি প্রদান করেন এবং পেলিক্যান পেনই তাঁর প্রিয় এই ভাব প্রকাশ করেন। পরিষদ মন্দিরে তাঁহাকে আনিবার ভার লইয়া যখন যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন মহামতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর সদ্য-কৃত মোটরে রবীন্দ্রনাথকে আনিবার জন্ত আমায় সঙ্গে লইয়া গমন করিয়াছিলেন।

শরৎ তাঁহাকে আনিতে আসিয়াছে দেখিয়া কবি

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিয়াছিলেন “তুমি যে মণি-কাঞ্চন যোগ করিয়া ফেলিলে। শরতেরও শতায়ু কামনা করিবে ত, তোমাদের প্রার্থনার ধূমে হয়ত বা আমরা যমকে কিছুদিন ফাঁকি দিয়া থাকিতে পারিব। কি বল শরৎ!” শরৎ বাবু হাসিয়া উঠিলেন কবির কথায়।

২১শে জুলাই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রড চিত্তে ব্যথ পাইয়াছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর গানের স্বর যোজনার এক প্রধান উপাসক।

নভেম্বর মাসে জাপানের প্রধান কবি ইয়োনী নোগুচী শান্তিনিকেতনে গমন করেন। কবি এমনই অন্তর দিয়ে তাঁহাকে সন্মিলন করেন নোগুচী একেবারে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন এমন তৃপ্তি জীবনে আর কোথাও উপভোগ করেন নাই।

ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় যখন ‘রাজা’ অভিনয় হয় তখন কবি ঠাকুরদার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করেন। তাঁর অতি বুদ্ধ বয়সেও এমন সতেজ অভিনয় দেখিয়া সকলে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) পঞ্চাশ বাৎসরিক স্মরণ জয়ন্তী উৎসবে কবি উদ্দীপনাপূর্ণ একটি বাণী পাঠাইয়াছিলেন।

১৯৩৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় কবি “শিক্ষা সপ্তাহ”র উদ্বোধন উপলক্ষে সিনেট হলে বাঙ্গলায় অভিভাষণ পাঠ করেন। মার্চ মাসে নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে কবির উপস্থিতিতে ‘চিত্রঙ্গদা’ নৃত্য-নাট্য অভিনীত হয়। ১৫ই মার্চ পাটনায় গমন করেন। রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে বিরাট জনসঙ্ঘ কবিকে ষ্টেনে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। পাটনার অধিবাসীগণ বিরাট জনসভায় ১৭ই মার্চ তাঁহাকে অভিনন্দন ও “অর্থলী” প্রদান করিয়াছিল।

তৎপরে তিনি এলাহাবাদ, লাহোর ও দিল্লী ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ২৫শে দিল্লীতে যখন মহাত্মা গান্ধী ও কস্তুরীবাই কবির সহিত দেখা করিতে আগমন করেন তখন কবি বিপ্লবাতীত অভাব মোচনের জন্ত এই বৃদ্ধ

বয়সে অর্থ-সংগ্রহ করিতে দেশে দেশে ঘুরিতেছেন অবগত হইলেন; তাহাতে ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর এক ভক্ত মহাত্মাজীর ইচ্ছিতে ৬০,০০০ ষাট হাজার টাকার চেক কবির হস্তে প্রদান করেন। কুইনস্ উদ্যানে দিল্লিবাসীরা বিরাট সভায় কবিকে অভিনন্দন প্রদান করেন। ২৯শে মার্চ, স্বাধীন ভুরস্কের ভূতপূর্ব স্থলতান ও ক্রমের বাদসার কচ্ছা, হাদ্রাবাদ নিজামের পুত্র বধু প্রিন্সেস নীলউফার দিল্লির হাদ্রাবাদ হাউসে কবির সম্মানে এক মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। মটোরে গীরাটে গমন করেন, সেখানকার পৌরসভা ও জিলাবোর্ড তাঁহাকে সন্মিলন করিয়া অভিনন্দ পাঠ করেন।

১৫ই জুলাই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বিরোধী মহাসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে টাউনহলে গমন করেন। ২৯শে জুলাই ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করা হয়। অস্বস্থতাবশতঃ সমাবর্তন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ৫ই সেপ্টেম্বর (World Peace Congress at Brussel) ব্রুসেলসে পৃথিবীর শান্তি বৈঠকে তিনি যে শান্তির বাণী (that the strong must cease to be greedy and the weak must learn to be bold.) প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাও পাঠে পৃথিবীর শান্তিকামী মনীষীগণ এক নূতন প্রেরণা পাইয়াছিলেন। সেই বাণী বিশ্বের সকল জাতির ও ভাষার সংবাদপত্রে বিধোষিত হইয়াছিল।

১০ই ও ১১ই অক্টোবর ভবানীপুর আশুতোষ হলে ‘পরিশেষে’ নৃত্য-নাটকটি অভিনীত হয়। কবি রঙ্গমঞ্চে বসিয়া মাঝে মাঝে আয়ুতি করিয়াছিলেন। আশুতোষ মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল! শুঁড়ায় শ্রীযুক্ত অনিল দেব উদ্যোগে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষাট বছর বয়স হওয়ায় যে সাহিত্যিকদের বিরাট উৎসব সভা হইয়াছিল কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহা গৌরবান্বিত করেন এবং অভিনন্দনটা পাঠ করিয়াছিলেন। কবিকে সান্নিধ্যে পাইয়া বলিয়াছিলাম “আপনি ত স্বয়ং শরৎদার শতায়ু কামনা করিলেন—আমরা আর কি করব!” কবি হাসিয়া বলিলেন “তোমরা দোয়ারকী হও।”

১২ই অক্টোবর এলবার্ট হলে বঙ্গের মহিলা কবিদের বিরাট সভায় দীর্ঘকাল (প্রায় দেড় ঘণ্টা) মুখে বক্তৃতা দিয়া মেয়েদের মনে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছিলেন।

১৯৩৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমার্বর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলায় অভিভাষণ পাঠ করেন। বৃটিশ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমার্বর্তন সভায় এই প্রথম প্রাদেশিক ভাষায় বক্তৃতা পাঠ হইল। চ্যান্সেলার বাঙ্গলার গভর্ণার-স্যার জন এণ্ডারসন সাহেব পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পাঠ শ্রবণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথমবার বাহিরের বিশিষ্ট ব্যক্তি সমার্বর্তন সভায় ছাত্রদের সম্ভাষণ করিবার প্রথা প্রথম প্রবর্তিত করিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম বক্তা, বাঙ্গলা ভাষাতে অভিভাষণ পাঠও এই প্রথম।

২১শে ফেব্রুয়ারী চন্দ্রনগরে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ইহার সভাপতি। কবি রবীন্দ্রনাথ নৌকাযোগে চন্দ্রনগর গমন করেন এবং সম্মিলন উদ্বোধন করিতে যাইয়া দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। নৌকায় প্রত্যাবর্তনের সময় কবি আমায় বলিলেন “বাপু আর বুড়োটাকে তোমার সাহিত্য পরিষদে—আর টানাটানি করিয়া যেয়ে ফেলো না—তোমায় দেখিলেই আমার ভয় হয়। কেমন ভবানীপুরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল ত! এখন ছাড়।”

৩রা মার্চ কলিকাতার টাউনহলে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিক উৎসবের সংশ্লিষ্ট বিশ্বধর্ম মহাসভায় (Parliament of religion) সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শান্তি নিকেতনে চীনা ভবনের দ্বার উন্মোচন সভায় ভারত ও চীনের মধ্যে সন্ধুৎ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারত ও চীনের মধ্যে যে নিগূঢ় সাংস্কৃতিক সন্ধুৎ আছে তাহাই প্রকাশ করেন। গ্রীষ্মের সময় এবার আলমোড়ার শৈলনগরে বাস করেন।

২৪শে জুলাই অল্পদেশীয় বিদ্যাসভা ভারতীর্থ রবীন্দ্রনাথকে ‘কবি স্মরণ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ‘বর্ধামঙ্গল’ গীতাভিনয় হয়, কবি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অভিনয় পরিচালনা করেন। ইহার

পরই শান্তিনিকেতনে কবি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। এমন কি জীবনের আশঙ্কা হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কংগ্রেসের এক কার্যকারী সভার বৈঠক কলিকাতায় চলিতেছিল। কবিকে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্ত ১২ই সেপ্টেম্বর আনা হয়। শ্রুর নীলরতন চিকিৎসা করিতেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতাগণ কবিকে দেখিতে যান।

১৯৩৮ সালে জানুয়ারী মাসে লর্ড লুথিয়ান শান্তি নিকেতনে গমন করেন! এবং ফ্রেব্রুয়ারীমাসে লর্ড ও লেডী ব্রেবোর্গ শান্তিনিকেতনে গমন করিয়াছিলেন। কবি দুইজন অতিথিকে সমাদরে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। মার্চ মাসের ১লা ও ৩য়মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডি, লিট উপাধি দান করেন। অবশ্য কবি অসুস্থতা রশতঃ সমার্বর্তন উৎসবে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। ১৮, ১৯ ও ২০শে মার্চ ছায়া রঙ্গমঞ্চে ‘চণ্ডালিকা’ অভিনয় হয়। শেষ দিনে কবি রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। ২২মার্চ মহাত্মা গান্ধীর সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয়। গ্রীষ্মের সময় কালিম্পং ও মঙ্গপুতে অবস্থান করেন। লণ্ডন সহরে ক্যালম্যান গেলারীতে লর্ড জেটল্যাণ্ড (ভারত সচিব কবির চিত্রের একটি প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিবার সময় কবির প্রতিভার ভূয়সী প্রসংসা করেন।

১৯শে ডিসেম্বর ভারতের ভাইসরয় পত্নী লেডী লিন লিথগো ও তাঁর কন্যা লেডী এন্নে হোপ শান্তিনিকেতনে গমন করিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৯৩৯ সালের ২১শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু শান্তিনিকেতনে গমন করিলে কবির উপস্থিতিতে তাঁহাকে বিপুল জনসভায় সম্বন্ধনা করা হয়। ৩১শে জানুয়ারী জহরলাল নেহেরু শান্তিনিকেতনে যাইয়া হিন্দী ভবনের দ্বার উদ্বাটন করিয়া আসেন। ৭ই ফ্রেব্রুয়ারী বিশ্বভারতী সম্মিলনী সভার উদ্বোধন করিতে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আগমন করেন। ‘স্ভামা ও চণ্ডালিকা’ অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন।

৫ই এপ্রিল, কলিকাতায় মহামতি রেঃ সি এফ্ এণ্ড্ জু সাহেব ইহদাম ত্যাগ করিয়া যান। কবি সে সংবাদে অত্যন্ত ব্যথা পান।

এপ্রিল মাসের শেষে কবি উড়িষ্যা কংগ্রেসী সরকারের আমন্ত্রণে পুরী গমন করেন। ২ই মে, তাঁর ৭৭ বৎসর জন্মোৎসব উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী বিষ্ণুনাথ দাসের পৌরহিত্যে মহাসমারোহে অল্পস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সর্বোজনলিনী সমিতির পরিচালিত 'বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রম' পরিদর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হন এবং তাঁহার প্রধান অনুষ্ঠাত্রী তাঁহারই ভ্রাতৃপুত্রবধু শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর প্রশংসা করিয়া বলেন 'আমি যে একটা কাজ করতে পারি নাই, তা তুমি করছ দেখে সুখী হলেম'। এবারেও গ্রীষ্মের সময় কালিম্পং ও মঙ্গলপুতে বিশ্রাম করেন। ১৯শে আগষ্ট স্ত্রীভাষ্যচন্দ্র বসুর আহ্বানে "মহাজাতি সদন" এর ভিত্তি স্থাপন এক বিরাট জনসভার মধ্যে করিয়াছিলেন। পর দিন যখন বিষ্ণুভারতী সন্মিলনের অধিবেশন জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা হলে হইতেছিল জহরলাল নেহরু চীন যাইবার পথে কবির সঙ্গে দেখা করিয়া যান। পূজার সময় মঙ্গলপুতে অবস্থান করেন। ১৫ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের দ্বার উদ্বাটন করিয়াছিলেন।

১৩৪০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজী সন্ত্রিক শান্তি নিকেতনে কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ২১শে নিউডীতে বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনীর দ্বার উদ্বাটন করিয়াছিলেন। মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ বাকুডা গমন করিয়া সেখানে মাতৃসদন ও শিশু মঙ্গল মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসেন।

৭ই আগষ্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি নিকেতনে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসব সভা অনুষ্ঠান করিয়া কবিবরকে ডি, লিট্ উপাধি প্রদান করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাজুয়েট ভারতের ফেডারেল কোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার মরীশ গাওয়ার, জাস্টিস হাওয়ারসন ও স্যার সর্বপল্লী রাধা কিম্বের উপর এই উপাধিদানের ভার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ অর্পণ করিয়াছিলেন! এইরূপভাবে একজন ভারতের কবিকে পৃথিবীর অতি প্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান করাতে বাঙ্গালী মাত্রই গর্বিত ও আনন্দিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র না হইয়াও নিজ প্রতিভা, বুদ্ধি, জ্ঞান গরিমার দ্বারা বিশ্বের সমগ্র বিদ্যাজ্ঞান মধ্যে সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। চাণক্য বাক্য "বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে" কবিতে সফল হইয়াছে। কবির উপাধি ঐশ্বর্য তাঁহারই প্রতিভার ভায়ই বিরাট—

স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কে, টি,
নোবেল প্রাইজ;

ডি, লিট্. (কলিকাতা)

ডি, লিট্, অক্সফোর্ড, ডি, লিট্ (ওসমানিয়া),

ডি, লিট্, (বেনারস) ডি, লিট্ (ঢাকা)।

কবি সার্বভৌম (সংস্কৃত কলেজ), কবি স্মরণ (অন্ধভারতীর্থ)
Order of the star (Greece Govt.)

ভারত ভাস্কর, (ত্রিপুরারাজ)।

১৯শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং যাত্রা করেন। ২৭শে কালিম্পং এ ২৭শে অক্সফোর্ড হইয়া সন্নিহিত হারান। কলিকাতায় কবিকে আনা হয়। কলিকাতায় তাঁহার অক্সফোর্ড উদ্দেশ্যজনক হইয়া উঠে। ধীরে ধীরে কবি আরোগ্য লাভ করেন। ডিসেম্বরের প্রথমে শান্তি নিকেতনে গমন করেন। ২ই জিজ্ একমেলেকী তাই—টী—তাও (President of yvan of the Chinese National Government) কে অক্সফোর্ড শরীরে অভ্যর্থনা করেন। কবি যদিও রোগশয্যায় শায়িত তথাপি তাঁর লেখার বিরাম নাই। শুইয়া শুইয়া তিনি নব-জাতক (কবিতার বই), মানাই (কবিতাবলী), ছেলেবেলা (বাল্য-জীবনী), তিন দপ্তী (তিনটি গল্প) রোগ শয্যা (কবিতাবলী)। আরোগ্য (কবিতা : সংগ্রহ) লিখিয়া গিয়াছেন।

১৯৪১ সালে ১৪ এপ্রিল; ১৩৪৮, ১লা বৈশাখ শান্তি নিকেতনে তাঁহার আশী বৎসর পূর্ণ জন্ম-উৎসব সম্পন্ন হয়। তিনি "সভ্যতার সঙ্কট" নামে যে বাণী উচ্চারণ করেন তাহা সমস্ত ভারতবাসীকে নব অনুপ্রেরণা প্রদান করে। বিশ্ববাসী প্রবীণ কবির মনের সতেজতা দেখিয়া স্তম্ভিত হয়। ৮ই মে, ২৫শে বৈশাখ সমগ্র ভারতে কবির আশীবর্ষ জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অল্পস্থিত হয়। তদুপলক্ষে ত্রিপুরাধিপতি কবিকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন কবি রোগ শয্যায়—তথাপি তাঁহার লেখার বিরাম নাই। রচনা তখন নিজে আর সব লিখিয়া উঠিতে না পারায় বলিয়া যাইতেন, তাঁহার সম্মুখেই লিখিত হইত, এই প্রকারেই 'জন্মদিন' এর কবিতাগুলি এবং 'গল্প-সল্প' এর গল্পগুলি রচিত হয় এবং তিনি তাহা পাঠ ও সংশোধন করিয়া দিতেন।

তার পরই ভারতের গগন আধার করিয়া বঙ্গের গৌরব-রবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—তাঁহারই জন্ম ভীটা, ৬নং জোড়াসাঁকোর পৈতৃক ভবনের দ্বিতলের এক কক্ষে, ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ, ১৯৪১ সালের ৭ আগষ্ট, ১২টা ১০ মিনিটের সময় অন্তিমিত হইয়া গেলেন।

ব্যথার শেষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীহীরলাল সরকার বি, এল,

(১৪ অধ্যায়)

রাগুর বিবাহ হইয়াছে—এক ডাক্তারের সহিত। নাম স্নেহেন্দু দেব, এম্ বি। তাহার পিতা কান্তি চন্দ্র দেব একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। দার্জিলিংএ খুব পশার জমাইয়াছেন, স্নেহেন্দু কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম্ বি, পাশ করিয়া সম্প্রতি পিতার নিকট থাকিয়া ব্যবসা করিতেছে। তাহারও বেশ সুনাম বটে। স্নেহেন্দু চোখের চিকিৎসাই বেশী করে এবং হাত ও পাকিয়াছে বেশ। আগামী ফাল্গুন মাসে বিলাত যাইবে স্থির হওয়ায় পুত্রকে বিলাত যাইবার পূর্বে বিবাহ দেওয়া যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন এবং দার্জিলিংএ হরিপদ বাবুর জনৈক বন্ধুর চেষ্টায় রাগুর সহিত স্নেহেন্দুর বিবাহ সম্পন্ন হয়—অগ্রহায়ণ মাসের পাঁচ তারিখে।

রাগুও স্নেহেন্দু বেশ মিলিয়াছে। দুইটিই যেন এতদিন লুকোচুরি করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল,—কেহ কাহাকে পায়নি কেবলই ঘুরিয়া মরিয়াছে। আজ শুক্লাষ্টমীর মহেন্দ্রক্ষেণে ছ’টি বেন ছ’দিক হইতে আসিয়া মুখোমুখী হইয়া গেল। কেউ কথাটি বলে না—নিরীক, চুষক লোহবৎ উভয়কে আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাসর ঘরে যখন স্নেহেন্দুর প্রথম দেখা হইল রাগুর সঙ্গে নিরালয়, স্নেহেন্দু তার নিখুত সন্দের নিটোল মুখখানা উঠাইয়া বলিল, এতদিন কোথায় ছিলে? রাগু তাহার হাত খানার উপর যোনোদগত গোলাপি আভাযুক্ত ভরা গাল খানার দ্বিষৎ চাপ দিয়া বলিল—তোমার ধ্যানে, ‘তাই নাকি’ বলিয়া স্নেহেন্দু নববধূকে বুকের আরও কাছে টানিয়া আনিয়া প্রেম পরশে রাঙ্গিয়ে দিল তার রাঙ্গা চোঁট।

সেই মিলন আজ কোথায়, কতদূরে আসিয়া পৌছিয়াছে, কেহ কাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না। স্নেহেন্দু রোগী দেখিবার জন্ত বাহিরে যায়; কাজের ভিড়ে কর্তব্যের প্রেরণায় যাইতেই হয় কিন্তু প্রাণের একান্ত আপন অতি আদরের অত্যন্ত সোহাগের সেই মুখখানা অনবরত ভাসিয়া উঠে তার নয়ন পথে। তার প্রতি শিরায় হৃদয়ের

প্রতি পরতে পরতে রাগু মিশিয়া আছে। আর রাগু স্নেহেন্দু বাহির হইলেই উন্মুখ হইয়া চাহিয়া থাকে তার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায়। গৃহের কাজ-স্নেহেন্দু ছাড়া তার ভাল লাগে না, ছটফট করিয়া মরে, উন্ননা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, বার বার শাসি ফাঁক করিয়া চায় আবার আসে আবার চায়—এমনি করিয়া কাটে তার সময়। স্নেহেন্দুর গাড়ী আসিলেই বুকের মধ্যে আনন্দ হিল্লোল বহিয়া যায়।—কান পাতিলে হাতুড়ীর শব্দ শোনা যায়। অভিমানের ভাণ করিয়া, কখনো বা ছুই মির হাসি হাসিয়া-পাশের খাটে শুইয়া থাকে—আসিলে বলে “কেন এত দেরী হল?”

স্নেহেন্দু গাড়ী থামিলেই কালবিলম্ব না করিয়া দোতলায় উঠিয়া যায় প্রিয়ার দরশনে। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র রাগু তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, আর একটু আগে বুঝি ফেরা যায় না? তার সমস্ত চোঁটে হাসি লাগিয়া আছে—মুখে গোলাপি আভা কি সন্দের! তাকে বুকের কাছে আনিয়া স্নেহেন্দু আদর করে—তার কাল কুচকুচে কোঁকড়ান চুলের এলোমেলো গুচ্ছগুলি কানের পাশে তুলিয়া দেয়, সংযত করিয়া রাখে। রাগু জুতার ফিতা খসায় জামা ছাড়াইয়া দেয় সেগুলি নিকটে আনিয়া দেয়—পেণ্ট খোলা হইলে ধুতি আনিয়া কাছে ধরে—তার মুখের ঘাম নিজ আঁচলে মুছিয়া দেয়, মাথায় হাত বুলায় ইত্যাদি।

এত আদর যত্ন হইতে নিজকে বঞ্চিত করিতে স্নেহেন্দুর মন যায় না স্ততরাং তাহার বিলাত যাওয়া আর হইয়া উঠিল না—রাগুর বিরহ তার সহিবে না তাই প্রিয়াকে কাছে রাখিয়াই-লক্ষ্মীর উপাসনায় মন দিল। লক্ষ্মী প্রসন্নাই ছিলেন—সুপ্রসন্না হইলেন। পুরুষের ভাগ্যে জন, স্ত্রীর ভাগ্যে ধন, এ ক্ষেত্রে স্নেহেন্দুর ভাগ্যে বধীদেবীর রূপা এখনও না হইলেও রাগীর ভাগ্যে ধনের খুবই সমাগম হইতে লাগিল।

একদিন নৈশ ভোজনের পর যখন সব নিশুন্ধ—প্রকৃতি দেবী পৃথিবীর উপর মায়াবী তুলি লাগাইয়া আরাম প্রদান

করিতেছেন, পাশের কয়েকটি ফুল বৃক্ষ হইতে মুহূ হাওয়া হাসনাহানার গন্ধ বহিয়া আনিয়া সারা ঘরটা আমোদিত করিতেছে, আর সুখেন্দু একটি নূতন ইজি চেয়ারের পা ছড়াইয়া দিয়া আরাম করিতেছে, মুখে একটা বর্শা চুমট। অদূরে একখানা বেতের স্তম্ভের চায়ায় উপবিষ্টা রাণু—তার সম্মুখে ভেলভেটের কাপড় মোড়ান একটা টেবিল তাহারই উপর নিজ বহুই স্থাপন করতঃ স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুচকি হাসিতে ঠোঁট মাখিয়া বাক্যলাপ করিতেছে এবং উভয়ে উভয়ের পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া রূপস্থাপান করিতেছে—এইরূপে হাস্য কৌতুকে কিছু সময় অতিবাহিত হইলে সুখেন্দু ডাকিল “রাণু” রাণু বলিল—“বল”

সু—কাছে এস।

রা—কাছেই তো আছি।

সু—আরো কাছে চাই।

রা—বেশ এই তো বল, বলিয়া রাণু বাস্তবতার পিছনে দাঁড়াইয়া ত হার গলার ছ’পাশে হাত দিয়া চিবুক ও গলে নিজ কোমল কচি অঙ্গুলির পরশ দান করিল আর সুখেন্দু পশ্চাতে দুই বাহু বাড়াইয়া প্রিয়ার কেশ বিস্তৃত কাল মাথাটি নিজের কাঁধের উপর আনিয়া মুখের সন্নিকটে স্থাপন করতঃ প্রাণভরে প্রেমোপাসনার অধর স্পর্শ পানে তৃপ্ত হইল। ছ’এক মিনিট এই ভাবে কাটিলে আবার পূর্বের তায় গল্প চলিতে লাগিল—সে গল্পের শেষ নাই, অক্ষরান্ত। প্রেমের এমনি গুণ—এমনি তার টান—ইচ্ছা হয় চির দিন চিরকাল প্রিয়তমের সহিত প্রেম স্পর্শ পান করি।

কথায় কথায় সুখেন্দু বিজয়ের কথা উঠাইয়া বলিল—বিজয়দা বিয়ে করেন না। এত বয়েস হ’ল বিয়ের নামটি নেই, অক্ষয় চোঁটা মশায়ই বা কেমন বুঝি। আচ্ছা রাণু—আমি যদি একটি ভাল মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করে দিতে পারি? তোমরা তো পারলে না, দেখবে। এবার আমি কি করি। যেমনি টুকটুক দাদা বৌদিটিকেও আনবো ঠিক তেমনি টুকটুক, রাণু তাহার কথায় বাঁধা দিল না নীরবে শুনিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস শ্রবণ করিয়া সুখেন্দু উহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল রাণুর হাসি-মিলাইয়া গিয়াছে, মুখ বেদনা মাখান। তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সুখেন্দু আশ্চর্য হইয়া বলিল—

“তুমি অমন হ’য়ে গেলে যে রাণু?”—“কিছু নয় অমনই। বলিয়া সে সুখেন্দুর কোল হইতে নামিয়া বলিল “রাত হয়েছে চল শুয়ে পড়ি।” সুখেন্দু কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না, হাত ধরিয়া পুনরায় তাহাকে নিজ কোলে স্থাপন করিয়া বলিল,—“না, শুতে দিব না, কেন হঠাৎ অমন করলে বল, বল, লক্ষ্মীটি!” তাহার মুখে উদ্বিগ্নের চিহ্ন, সুরে দরদ মাখান। রাণু স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—বসে বসে আর ভাল লাগে না, তাই শুতে চেয়েছিলাম, শুয়ে শুয়ে সব বলবো, সেই ভাল না? সুখেন্দু তাহার চিবুক ধরিয়া কুচকুচে রক্তা ঠোঁট দুটীতে একটি ছোট্ট চুম দিয়ে বলিল—“চল”।

বিছানায় যাইয়া রাণু বলিল,—“তুমি বিজয়দার বিয়ের কথা বলছিলে না, জাননা তাই, তিনি বিয়ে করবেন না। জেঠা মশায় অনেক চেষ্টা করেছেন, যখন বুঝলেন তখন আর কিছু বলেন নি। সেই দিনই রাণী বিজয় ও অর্চনার সমস্ত কথা পতির নিকট ব্যক্ত করিল, তৎপর অর্চনার কথা উঠাইয়া বলিল, বিয়েই ছিল তার সমস্ত হৃৎকের অন্তরায়। অর্চনা কি বলে জান?—সে নাকি বৌদিকে বলেছে, সে বাইরের দিকে বিধবা হলেও অন্তরে সে সম্পূর্ণ সখ্যা কারণ সত্যিকারের বিয়ে তার যার সঙ্গে হয়েছে পাঁচটা মন্ত উচ্চারণ না করলেও তিনিই তার স্বামী এবং তার কোলে মাথা রেখেই অর্চনা পৃথিবীর মমতা ত্যাগ করবে।

সুখেন্দু এই প্রেমিক প্রেমিকার করুণ কাহিনী একান্ত মনে নিবিড় ভাবে শ্রবণ করিতেছিল এবং যতই শুনিতেছিল ততই শুনিবার স্পৃহা বাড়িয়া যাইতেছিল, রাণু যখন তাহার কথা শেষ করিয়াছে তখনও সুখেন্দু নির্বাক,—নিপ্পন্দ। এই নির্দারুণ কাহিনী বলিতে বলিতে রাণুও উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিল—আহা তাহার শৈশবের সেই সেই আজ কেমন করিয়া কত হৃৎখে দিন কাটায়—রাণুর চোখ জলে ছলছল হইয়া আসিল। সুখেন্দুকে একেবারে নির্বাক দেখিয়া তাহার আনমনা ভাব কাটিয়া গেল, ভাল করিয়া নজর দিয়া দেখিল পতির দুই গুণ বহিয়া শেষ রাত্রির শিশির বিন্দুর তায় সমবেদনার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে—স্বামীর অবস্থা দর্শনে তাহার ছলছল আঁখি ও আর বাঁধ মানিলনা—অবিরল ধারে ডাংগর চোখের দুই কোল বহিয়া ঝরণার জলের তায় বারি-ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

উভয়ে নির্বাক কেউ কোন কথা বলেনা—যেন যে যার ভাবে বিভোর। এমন হয়। করুণা বিগলিত যার চিত্ত— পর ব্যথায় ব্যথিত যার আত্মা—মন যার ফুল-কলিটির ন্যায় কোমল তার চক্ষু পরের দৃংখ্র অবগে বাধা মানিবে কেন? সে কাদিবেই!

কয়েক দিন কাটিয়া গিয়াছে। দুপুরে ঘরে কেহ নাই—সুখেন্দু ও বাহির হইয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে, আধার যখন এই পৃথিবীকে বুকে টানিয়া লইবে—সেও ঠিক তেমনি সময়ে পত্নীর আশ্রয় লইবে। রাণু আজ অর্চনাকে একখানা পত্র লিখিবে স্থির করিল। অনেক দিন তার কোন খোঁজ নাই। কেমন আছে জানিবার জন্য মন তার আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিল।

দেয়ালে একখানা বড় আয়না টাঙ্গান—সম্মুখে ভেলভেট মোড়ান একখানা ছোট টেবিলে টেবুলের উপর দুইটা কাঁচের দোয়াত—একটিতে কাল কালি অপরটিতে লাল,—তাহারই সম্মুখে কয়েকটা লাল, নীল বিবিধ বর্ণের হেঙুল। টেবিলে ডান-দিকে কয়েকটি লিখিবার প্যাড। বসিবার জন্য মাঝে একটা স্প্রিং চ্যায়ার। রাণু চ্যায়ারে বসিয়া একটা বড় প্যাড টানিয়া চিঠি লিখিতে বসিল।

সই অর্চনা—

অনেক দিন হ'ল তোমার কোন সংবাদ পাচ্ছি না। তুমি হয় তো ভাব তোমাদের সুখেন্দু বাবুকে পেয়ে আমি অন্যসব একেবারে ভুলে গিয়েছি, অতঃপর তাকে ছেড়ে অন্যচিন্তার অবসর খুবই কম কিন্তু তা বলে কাউকে ভুলিনি, এ কথা সত্য! বিশেষ করে তোমাকে আর বিজয়দাকে—কেমন করে ভুলবো তাতো জানিনা—তাকে পেয়ে সুখী হয়েছি খুব তাই কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না—তবু মনে হয় তোমরা যদি কাছে থাকতে তাহলে আরও ভাল লাগত—আনন্দ হত।

একটা বিষয়—ক্ষমা করতে হবে। একদিন আমাদের সব ইতিহাস মায় বিজয়দা ও তোমার সমস্ত করুণা তাকে বলে ফেলেছি, এজন্য অপরাধ নিওনা—ক্ষমা করো।

বিজয়দা নাকি ওকালতিতে বেশ নাম করছেন। শুনে গর্ব অনুভব করছি, ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন—ইহাই কামনা।

তোমার শরীর কেমন আছে। অন্যান্য সব খবর দিও। পূজ্যপদে প্রণাম জানাবে, তুমি আমার ভালবাসা লও। ইতি—

তোমার—রাণু—

ঠিকানা লিখিবার সময় একটা বড় খটকা লাগিয়া গেল। পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণীদের বাড়ীর ঠিকানাই দিল; এই সঙ্গে তাহার মাকেও একখানা চিঠি দিল।

১৫ অধ্যায়

গ্রীষ্মকাল। বাংলাদেশে অতিরিক্ত গরম পড়িয়াছে। দেশে অবস্থান করা অতিশয় কষ্টকর বিধায় নন্দপুরের জমিদার নবীন রায় সস্ত্রীক দার্জিলিং আসিয়াছেন। তাঁহারা মটরে করিয়া প্রত্যহ সকালে ও বিকালে বাহির হইয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করেন। এক দিন ভ্রমণের পর বাসায় প্রত্যাবর্তন করিবার সময় ড্রাইভারের অসাবধানতার দরুণ জমিদার বাবুর গাড়ীখানা রাস্তার গ্যাস পোস্টের সহিত ধাক্কা লাগিয়া উহার অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং নবীন বাবু মাথায় ও চোখে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হাসপাতালে গমন করিলেন,—সেখানে সপ্তাহ খানেক চিকিৎসায় শরীরের অন্যান্য স্থানের ঘা শুকাইল বটে কিন্তু চোখের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ সারিল না। তিনি বাসায় ফিরিয়া সুখেন্দু বাবু ডাক্তারকে ডাকাইয়া চোখের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন—সুখেন্দু তাহার শুশ্রূষা করিবার জন্য একটা নাস ও ঠিক করিয়া দিলেন।

এই নাসটির সহিত সুখেন্দুর আলাপ অল্প দিনের। কিন্তু তাহার আচার ব্যবহার ও শুদ্ধতা দেখিয়া সুখেন্দু তাহার রোগীদের নাস বা ধাত্রীর আবশ্যক হইলেই—উহার জন্য সুপারিস করে। ইনি নূতন হইলে ও বেশ নিপুণতা ও যত্ন সহকারে রোগীর সেবা করিয়া থাকেন; মনে হয়, রোগীর সেবা—যেন ইনি ধর্মের অঙ্গস্বরূপ মনে করেন—এবং প্রাণ ঢালিয়া রোগীর সেবা করিবার জন্যই যেন ইনি ইচ্ছা করিয়া এই ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

নবীন বাবুর জন্য উভয়কে অনেক দিন এই বাড়ীতে আসিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছে। কার্য্য সূত্রে এত অধিক দিন এমনি ভাবে মিলিত হইবার সুযোগ ইতি পূর্বে আর হয় নাই। এখানেই উভয়ে উভয়কে ভাল করিয়া চিনিতে পারিল।

একদিন সুখেন্দু তাহাকে বলিল—“আচ্ছা এখানে সকলেই আপনাকে “কুইন” বলে ডাকে, আমিও সেই নামেই ডাকি বটে—কিন্তু আপনার আসল নামটি এখনও জানা হয়নি। কিছু

মনে করবেন না, অবশ্য আজকাল নাম জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতার বিরুদ্ধে—কিন্তু আপনার সহিত এতটা মিশেছি বলেই ভরসা পাচ্ছি। আপত্তি না থাকে তবে—হাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই নাম বলিল, মানুষকে চিনবার জেই একটা নাম ব্যবহার করা হয় “কুইন” বলিল কি আমার চেনা যায় না? যদি অসুবিধা না হয় তবে আর অন্য নামের আবশ্যকতা কি? অবশ্য আমার আর একটা নাম আছে এবং সেটা আপনাকে বলতে ও আপত্তি নেই তবু কোন কারণে সেটা আমি বাইরে প্রকাশ করতে চাই না। সুধেন্দু—কি এমন কারণ থাকতে পারে যে কোন অপকার হবে না জেনেও মানুষ নাম বলতে ভয় পায়?—কথাটা সুধেন্দু একটু প্লেসের সুরেই বলিল, নাম—রাগ করবেন না ডাক্তার বাবু—এটা আমার দুর্বলতাই বলুন, খেয়ালই বলুন, যাহাই বলুন না কেন, শত চেষ্টায়ও মন আর পুরুষকে বিশ্বাস করতে চায় না—যদিও পুরুষ মানুষ দ্বারা আমি বহুভাবে উপকৃত হয়েছি এবং এখনও হজ্জি তবু তাদের’পর সকল সময় নিঃসঙ্কোচে আস্থা স্থাপন করতে পারি না।

সুধেন্দু—কেন?

নাম—কেন? সে অনেক কথা, যদি আপনি আমার কাহিনী শ্রবণ করেন, আপনিও পারবেন না। নিজেদের কীর্তি শ্রবণে নিজেই লজ্জার মুখ ঢাকবেন এবং নিজেদের’পর বিশ্বাস হারাবেন।

সুধেন্দু—বলুন না কি। ভূমিকাই যে আপনার ফুরায় না—বলবেন কি?

নাম—হাঁ বলছি—আর ভূমিকা না। এবারে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

সু—কি?

না—একথা কাহারো নিকট প্রকাশ করবেন না আপনার স্ত্রীর নিকটও নয়—বলুন করবেন না? সুধেন্দু—ঠিক অতটা নয় তবে আপনার যেখানে অপকার হওয়ার সম্ভব সেখানে বলবোনা।

পাঠক পাঠিকা জানিয়া রাখিবেন এই যুবতী নামটি যিনি এখানে “কুইন” নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন সে আর কেহ নয় আমাদের অভাগিনী লাবণ্য—যাহাকে আমি খুশুর পিতা ইত্যাদি বিনা দোষে বিনা বিচারে বাড়ী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিল—যাহাকে অক্ষয় দত্ত কলিকাতার একটি নারী আশ্রমে পাঠাইয়া

অবলার মর্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিলেন। লাবণ্য যে ছুঃখ লইয়া আশ্রম-জীবন গ্রহণ করিয়াছিল অদ্য পর্য্যন্ত ও সে তাহা ভুলিতে পারে নাই।

অক্ষয় বাবুর নির্দেশ মত যথাসম্ভব গুরুভাবে থাকিয়া এই যুবতী প্রাণপণে শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। পিতার আদেশ মত বিজয় তাহাকে সর্বদা দেখা শুনা ও তত্ত্বাবধান করিতেছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিল। পাশ করিয়া কিছু দিন কলিকাতায় চাকুরী করিবার পর দার্জিলিং এ তাহার চাকুরী হয় ‘এর’ সেখানেই সুধেন্দু ডাক্তারের সহিত তাহার আলাপ। সুধেন্দুর ব্যবহারে লাবণ্য তাহাকে ভক্তি করিত।

একদিন বেলা প্রায় ১২টার সময় সুধেন্দু লাবণ্যের বাসায় প্রবেশ করিয়া দেখিল সদর খোলা অথচ লাবণ্য নাই। এদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিবে মনে করিতেছে এমন সময় বাড়ীর ঝি “ডাক্তার বাবু প্রণাম, চলে যাচ্ছেন কেন? বসুন” সুধেন্দু বলিল—খালি বাড়ীতে বসে কি হবে? তোমার মাইজী কোথায়? ঝি—তিনি তো বাড়ীই আছেন, আহুন বলিয়া ডাক্তারকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মাইজীকে দেখাইয়া বলিল “পূজা করছেন”—

সুধেন্দু একটা জানালার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিল—লাবণ্য একান্ত মনে মুদ্রিত নয়নে ধ্যানরতা। সম্মুখে তাহার আরাধ্য দেবতা—পাশে অক্ষয় বাবুর ছোট একটি কুঠো, তাহার পরম আরাধ্য দেবতার চরণে কয়েকটি টাটকা পবিত্র ফুল, তাহার চরণ-সুবাস চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মনে হয় লাবণ্য তাহার প্রাণমন সমর্পণ করিয়া যাহার ধ্যানে নিমগ্না যাহার সারিধোর অন্ত সে ব্যাকুল ও উন্মুখ সে বুকি অতি কাছে—তাই চারিদিক এমন মধুর স্নিগ্ধতা পরিপূর্ণ শান্ত—সুন্দর—নিশ্চল আর ধ্যানরতা নারী ধীর স্থির সাম্য। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া সুধেন্দু ভাবিল এ নারী সামান্তা নন—ইনি দেবী।

প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পর লাবণ্যের ধ্যান শেষ হইল। তাহার যাহা কিছু সবই অনুষ্ঠান শূন্য—অন্তরিকতাময় শেঘান্তে আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গুরু অক্ষয় দত্তকে প্রণাম করিল এবং আশীর্বাদ স্বরূপ একটি ফুল ঠাকুরের চরণ হইতে নিজ মাথায় স্থাপন করিল।

ক্রমঃ

দ্রাবিড় দেশ

শ্রীকমলা দেবী

(৪)

কাঞ্চীপুর

বেলা ছয়টার কিছু পরে কাঞ্চীপুর স্টেশনে আমাদের গাড়ী এসে পৌঁছল। “কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা”—কাশী হয়েছে, কাঞ্চী দর্শন হ’তে যা’চ্ছে, অবন্তী কবে হবে জানিনা, কিন্তু আমাদের দেশের এত বড় তীর্থে সশরীরে এসেছি ভেবে মনটা ভারি খুসি হয়ে গেলো। দক্ষিণের লোকেরা বড়ই নিরীহ, ওদেশের পাণ্ডারাও যাত্রীর উপর তেমন উৎপীড়ন করতে সাহস করেনা বা জানেনা, আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির বন্দোবস্ত করচি, আমার স্বামীর পরিচিত তামিলদের এক ধর্মশালায় উঠবো বলে ঠিক করেছি এমন সময়ে কতকগুলি পাণ্ডা আর পাণ্ডার চাকর এসে অতি বিনীতভাবে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের পাণ্ডা কেউ আছে কিনা আর যদি না থাকে তো আমাদের পাণ্ডার দরকার হবে কিনা। আমাদের সঙ্গে এরা কথা কইলে ইংরিজি আর হিন্দিতে। তীর্থস্থানে একজন পাণ্ডার আশ্রয় নেওয়া ভাল। বাপের বংশে আর খশুরের বংশে কেউ কখনও কাঞ্চীপুরে এসেছিলেন কিনা আমার জানা ছিল না কাজেই আমাদের নূতন পাণ্ডা নিতে হল। পাণ্ডাদের মধ্যে দেবলগোপাল আয়ার্যার বলে ভদ্র দেখতে একটা আধা বয়সী ব্রাহ্মণ বেশ ভাল হিন্দিতে আমাদের সঙ্গে কথা কইলেন আর আমাদের পরিচিত কলিকাতার দু’একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের নাম করলেন তাঁর বজ্রমান বলে ; আমরা তাঁকেই কাঞ্চীর পাণ্ডা ঠিক করলাম। আমাদের টাকাতে পাণ্ডাজীও চড়ে বসলেন, আর তাঁর কথাতে আমরা তামিল ধর্মশালায় না গিয়ে মারওয়াড়ী নারায়ণ দাস মেহতা ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। এই ধর্মশালাটি ছোট কিন্তু বড় রাস্তার উপরে আর বেশ পরিষ্কার। পাণ্ডা দরোয়ানকে দিয়ে উপরের ঘর আমাদের জন্য খুলিয়ে দিলে। হিন্দুস্থানী দরোয়ান আমাদের হিন্দি বলিয়ে উত্তর ভারতের লোক দেখে, আর বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলে বুঝতে পেরে কিছু বকশিশের আশায় তাড়াতাড়ি

এসে ঘরের জানলাগুলো খুলে দিলে, আমাদের জিনিষপত্রগুলো সব উপরে তুলে দিলে। আমাদের পাণ্ডাকে আমরা বললাম যে শিবকাঞ্চী আর বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করবো আর দর্শনের সঙ্গেই যা পূজা দেবার দেবো। পাণ্ডার কথা মত এখানে সর্ব তীর্থ বলে এক মস্ত বড় পুকুর আছে সেখানে একটা ভুজ্জি দান করবো। পাণ্ডা তখনকার মতন বিদায় নিলেন। আমরা নাওয়া টাওয়া সেরে নেবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম।

কাঞ্চীপুর তামিলদের দেশের একটা অতি প্রাচীন নগর। শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, সব সম্প্রদায়ের পীঠস্থান। বছ দিন ধরে এখানে শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের কাম কোটি মঠ স্থাপিত ছিল, সেটাকে প্রায় দুশো বছর হলো আরও দক্ষিণে কুম্ভকোণ নামে আর একটা তীর্থস্থানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক সময়ে এখানে নাকি একশো-আটটি শিব মন্দির ও আঠারোটি বিষ্ণু মন্দির ছিল। এখনও শৈব, শাক্ত, আর বৈষ্ণব, সকলেরই তীর্থ। কাঞ্চীপুরের বাহিরে একটা ছোট গ্রামে জৈনদেরও তীর্থ আছে।

এখনকার কাঞ্চীপুর সহর দুভাগে বিভক্ত। শিবকাঞ্চী বা বড়কাঞ্চী আর বিষ্ণুকাঞ্চী বা ছোটকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীর প্রধান পীঠস্থান হচ্ছে একান্ননাথ বা একান্নেশ্বর মহাদেবের মন্দির আর কামাক্ষী মাতার মন্দির। কৈলাসনাথ মহাদেবের মন্দির পল্লব রাজাদের আমলে তৈরী, আমার স্বামী বললেন, এখন থেকে প্রায় ১৩০০-১৪০০ বছর আগেকার তৈরী। তাঁর উৎসাহে এটাও আমার দেখা হয়েছিল। দক্ষিণ দেশে মহাদেবের পাঁচটা বিখ্যাত মন্দির আছে, তার এক এক জায়গায় ক্ষিতি বা মাটি, অপ্ বা জল, তেজ বা আগুন, মক্ষ বা বাতাস, আর ব্যোম বা শূন্য, এই পঞ্চভূতের এক একটিকে নিয়ে শিবের পূজা হয়। একান্ননাথে যে মহাদেব আছেন তিনি হচ্ছেন ক্ষিতি মূর্তি, তাঁর দর্শন এবার হয়েছিল,

পরে এ যাত্রায় জম্বুকেশ্বরে মহাদেবের অপ্ মূর্তির দর্শনও ঘটে ছিল, আর তিনটার দেখা এখনও ভাগ্যে হয়ে ওঠেনি। বিষ্ণুকাঞ্চীতে শুটী সাতেক বড় বিষ্ণু মন্দির আছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে বরদরাজ বিষ্ণু মন্দির।

নেয়ে টেয়ে আমরা তোয়ের হয়ে নিলাম। পাণ্ডাঠাকুর এলেন, বাসা থেকে বেশী দূর নয়, সর্ব্বতীর্থে গেলাম। বিস্তার ওদেশীয় যাত্রী তীর্থের পাথর বাঁধান-ঘাটে ও সিঁড়িতে বসে শ্রদ্ধা করছে। তখন বেলা প্রায় নয়টা, মস্ত বড় পুকুর, — নীল আকাশ, ঝলমলে রোদ্দুর; বেশীর ভাগ যাত্রী, কি-ময়ের কি পুরুষ, চমৎকার রঙ্গিন রেশমের কাপড় চাদর পরেছে, লাল বেগুনে হলদে; তার উপর শুদ্ধভাবে উচ্চারিত মন্ত্র, জিনিষটা ভারি স্বন্দর লাগছিল। আমাদের পাণ্ডার নির্দেশ মতন অল্প একজন ব্রাহ্মণ ভুজ্জি উজ্জুগুণ্ড করিয়ে দিলেন। তারপর পাণ্ডা আমাদের নিয়ে গেলেন একাত্রনাথ শিব মন্দিরে। এ মন্দির খুব উঁচু নয় কিন্তু অনেকটা জায়গা

নিয়ে। ইতিমধ্যে সূর্য্যদেব মাথার উপর এসেছেন, চড়চড়ে রোদ্দুরে সব খুঁটিয়ে দেখবার উৎসাহ আর আমার নেই, খালি দেব দর্শন হয়ে গেলেই আমি খুসি হই। পাণ্ডা পূজার জিনিস কিনে নিলেন, এদেশে ঠাকুর পূজায় নারিকেল দিতেই হয়, তাই একটা বুনা নারিকেলও নিলেন। ক্ষিতি মূর্তি মহাদেব, মাটির বদলে বালী দিয়ে তৈরী শিবমূর্তি, এই বালীর শিবলিঙ্গে জল দিয়ে পূজা হয় না, তেল দিয়ে পূজা হয়। মন্দিরের ভিতরে পাণ্ডা গিয়ে পূজা করে এলেন, আমরা বাহির হইতেই দেখলাম। একাত্রনাথ নাম কেন হলো, সে সম্বন্ধে একটা গল্প আছে যে পার্ব্বতী এই কাঞ্চীপুরে বেগবতী নদীর ধারে শিবের জন্ত তপস্যা করেছিলেন, আর এখন যেখানে মন্দির সেইখানে একটা আম গাছ ছিল তার তলায় শিব এসে পার্ব্বতীকে দেখা দেন। পাণ্ডার সঙ্গে তার পরে আমরা কামাঞ্চীদেবীর মন্দিরে গেলাম, কিন্তু আমাদের

ভাগ্য মন্দ, দর্শন হল না, বেলা হয়ে যাওয়ার মন্দিরের দ-জা বন্ধ হয়ে গেছে। শুনলাম, এখানে কামাঞ্চীদেবীর পূজা হয় মন্দিরের মূর্তিতে নয়, দেবীর বাঁজ-মস্ত্র লেখা যন্ত্রে। এ মন্দিরটাও বেশ বড়, সেই পাথরের থামওয়ালা বড় আটচালা, সেই ফটক বা গোপুরম, সেই বড় বড় পাথরে বাঁধা উঠান, সেই থামে আর গোপুরমে পাথরের মূর্তির ঘটা।

ইতিমধ্যে বেশ বেলা বেড়ে গেছে, আমরা বাসায় ফরিলাম পাণ্ডা বিকালে এসে বিষ্ণুকাঞ্চী নিয়ে যাবেন ঠিক রইল। সঙ্গে চাল ডাল সব ছিল, ধর্ম্মশালার দরওয়ান একটা লোহার উত্তুন দিলে, তাতে খিচুড়ী চড়িয়ে দিলাম। বরাবরই আমার বাজার করতে খুব ভাল লাগে, আমাদের বাসার রাস্তার উপরেই বাজার দেখেছিলাম, শাক শবজী কি পাওয়া যায় দেখবার ইচ্ছা হলো, সমলে বাজারে এলুম, খিচুড়ির সঙ্গে চলবে ভাল: বলায় স্বামীর কথামত ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা, আলু, লেবু, বিণ নিলুম; আর নিলুম কালো জাম, আর একটা কুঁজো। এই বাজার করতে বেশ লাগছিল, আমার স্বামীকে বলে দিলাম যে ও দেশের ভাষা তিনি যেন না বলেন—“ওক, হেও, হুতু, নানু” না বলে, “এক, দুই, তিন চার” বলে আর ইসারা করে কেনা-কাটা করলাম, শাক ও ফলওয়ালীরা তো হেসেই অস্থির। বাসায় ফিরে এসে ছপুরের সেবাটা ভালই হলো। কাঞ্চীপুরে আবার কবে আসবো জানিনা, শুয়ে থাকতে ইচ্ছা হলো না, আমরা দুজনে বেরিয়ে গড়িলাম। এক বাসনের দোকানে একটা কাঁচার বড় বাটা নিলুম, ও দেশের গড়ন, এদিকে ওরকম পাওয়া যায় না। বড় রাস্তার ধারে দেখলাম অনেকগুলি রূপার গয়নার দোকান। বেশীরভাগ দোকানের মালিক ওদেশের মুসলমান, কিন্তু কারিগরেরা হিন্দু। নানাদেশের বাসনের মতন নানা দেশের সোনা রূপার গয়নার নক্সা বিশেষতঃ একটু সেকেলে হলে, তার সংগ্রহ করার আমার একটা বাতিক আছে। সেবার আগ্রা আর মথুরা দেখতে গিয়ে ঐ অঞ্চলের কারিগরদিগের তৈরী রূপার পাঁচ জোর সাঁকড়ী প্রভৃতি কিছু কিছু এনে ছিলাম। এবার তামিল দেশের দু'একটা নমুনা কেনবার জন্ত এ দোকান ও দোকান ঘুরলাম। দুতিনটা দোকান থেকে দুজোড়া পাঁচজোর আর রূপার ছোট্ট একটা গণেশ মূর্তি, একটা নাভুগোপাল মূর্তি আর একটি শিব নিলুম। গয়নার নক্সা ওদেশের মত এদেশে করতে পারে না। ঠাকুর তিনটি আঙ্গুলের এক পাউয়ের চেয়েও ছোট, কিন্তু কি স্বন্দর কারিগরি। দোকানদাররা কি হিন্দু কি মুসলমান খুব ভদ্র আর সং বর্লে মনে হলো।

বিকাল সাড়ে-তিনটার দিকে পাণ্ডা ঠাকুর এলেন; বিষ্ণুকাঞ্চী নিয়ে যেতে। টাঙ্গা বা বটকা করে যেতে হলো। পথের ধারে এক জায়গায় একটা খড়ের চালার তলায় একটা

বিরাট কাঠের রথ রয়েছে। রথের গায়ে কাঠে খোদাই অনেক মূর্তি রয়েছে। আমার স্বামী বলেন, বিষ্ণুকাঞ্চী তামিল দেশের রামানুজী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের একটা প্রধান কেন্দ্র, এই অঞ্চলে ছেলে বুড়ো সকলেরই কপালে মন্ত রামানুজী তিলক—এই তিলককে এরা “নামম” বলে—ইংরেজি বড় হাতের U অক্ষরের মত, এই U চিহ্নর সমস্তটা সাদা আর মাঝে লাল একটা দাঁড়ি থাকে। অনেকগুলি ছেলেকে দেখলাম মাথায় এই নামম পরা। এদের মুখগুলি ভারি সুন্দর আর বুদ্ধিমান; আমার স্বামী বলেন, এরা রামানুজী ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে। তাঁর কাছে আর একটা মজার কথা শুনলাম। এদেশে রামানুজী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের ছটা দল আছে। এক দল সংস্কৃত ভাষায় লেখা বেদকেই সব চেয়ে প্রামাণিক শাস্ত্র বলে মানে, বেদ আর অত্র শাস্ত্রের পরে এরা তামিল ভাষায় লেখা ভক্তদের বিষ্ণুভক্তি বিষয়ের পদ বা গানকে স্থান দেয়—এদের মধ্যে ব্রাহ্মণই বেশী, এরা মাথায় যে নামম বা তিলক পরে সেটার বর্ণনা আগেই করেছে, এটা ইংরেজি বড় হাতের U অক্ষরের মত, এদের বলে—“রড্‌গলে” উত্তর দেশের দল। দ্বিতীয় দলের নাম “তেঙ্গলে” অর্থাৎ দক্ষিণের দল, এরা সংস্কৃত বেদের চেয়ে তামিল ভক্তদের পদ বেশী মানে, এরা কপালে যে তিলক পরে সেটার আকার ইংরেজি V অক্ষরের মত। তৃতীয় দল গাঁড়া বৈষ্ণব, মাছ, মাংস, ডিম ছোয়না, জীব হিংসা করে না। কিন্তু আপষের মধ্যে হিংসাটা খুব ছিল; এই তেঙ্গলে আর বড়গলে অর্থাৎ V, U আপনা আপনি মাথা ফাটাফাটি করত পুলিশ এসে কোন উৎসব হলে এদের দাঙ্গা থামাত, ঠিক করে দিত কাদের রথ বা মিছিল আগে যাবে।

বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দির—সেও এক বিরাট ব্যাপার, সেই রকম বড় বড় গোপূরম, সেই রকম পাথরের মূর্তির ছড়াছাড়ি। একটা মন্ত বড় পাথরের থামওলা মণ্ডপ আছে, তার এক কোণে এক জন বুড়ো ব্রাহ্মণ কতকগুলি ছেলে নিয়ে একটা পাঠশালা খুলে সংস্কৃত পড়াচ্ছেন, মন্দিরের মধ্যে এই দৃশ্য বড় ভাল লাগলো। আগে মন্দির খালি ধর্মের জন্ত ছিলনা, মন্দিরে বিদ্যার চর্চা হত। স্বামী আমাদের দেশের মন্দিরের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। সে সব কথা আমি শুধিয়ে লিখতে পারবোনা, কিন্তু এই সব মন্দির যে আমাদের

সেকালের জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, আমাদের জীবনে যে এই রকম মন্দিরের দরকার ছিল, একথা আমি কিছু কিছু অনুভব করতে পারলাম।

বিষ্ণুকাঞ্চীতে আমাদের পাণ্ডাকে ছেড়ে দিলাম। পরে সন্ধ্যায় ধর্মশালায় এসে ব্রাহ্মণ তাঁর খাতায় আমার স্বামীর নাম আর তাঁর সই লিখে নিয়ে গেলেন।

যৎকিঞ্চিৎ আমরা তাঁকে দিলাম, ব্রাহ্মণ তাতেই খুশী!

আমার স্বামী রকমারী পথ চলতি লোকের সঙ্গে অলাপ জমিয়ে নিতে সর্বদা তৈরী, তেমনি পুরোনো মূর্তি মন্দির নিয়ে মাতামাতি করতে। কাঞ্চীপুরের যে তিনটি মন্দির—মহাদেব, জুর্গা আর নারায়ণ এখনও পূজা পাচ্ছেন, সে তিনটি ছাড়া মহাদেবের একটা পুরোনো মন্দির আমরা দেখতে গেলাম। আগে আমার স্বামী যখন এখানে একবার এসেছিলেন, তখন এই মন্দিরটা তাঁর দেখা হয়নি। এটা হচ্ছে কৈলাসনাথ শিবের মন্দির। সহরের বাইরে খানিকটা দূর গিয়ে মাঠের মধ্যে পাথরের দেয়ালে ঘেরা এই মন্দিরটা। আমরা ঝটকা করে ধানের ক্ষেতের মধ্যে রাস্তা দিয়ে যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সূর্য্য ডুবু ডুবু। মন্দিরটা আজকালকার তামিল দেশের বড় বড় মন্দিরের তুলনায় খুব ছোট কিন্তু গড়নটি খুব ভাল। এই ভাঙ্গা মন্দিরে আর নিয়মিত পূজা হয় না এটি এখন সরকারের হাতে। একজন দরওয়ান এখন এই ভাঙ্গা মন্দিরের তদারক করে। তাকে ডাকিয়ে আনিয়ে চাবি খুলিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। প্রায় বারো তেরোশো বছর আগে এই মন্দির তোয়ের হয়েছিল, তখন তামিলদের দেশে পল্লববংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। এঁরা ছিলেন শিবের ভক্ত, নানা জায়গায় এঁদের কীর্তি অনেক শিবের মন্দির দেখা যায়। মহাবলীপুরম-এর পাথরের কাজ এঁদের গৌরবের চিহ্ন কিন্তু মহাবলীপুরম দেখে যতটা অল্পত আর সুন্দর লেগেছিল, মনে যে রকম একটা উদার ভাব এসেছিল, কৈলাসনাথে তা হলনা। পাথরের কাজ প্রায় সব জায়গায় ক্ষয়ে গিয়েছে, আর তার উপরে চুনকাম করে আর বালীর কাজ করে সব আরও খারাপ করে দিয়েছে। আমি ভোঁ এর সৌন্দর্য্য কিছু বুঝলাম না, আর এর ইতিহাসও জানিনা। কিন্তু আমার স্বামী সহজে ছাড়বেন না, তিনি হাতে ইংরেজী গাইড-বই নিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, আর আমাদেরও দেখান, এইট উমা আর কার্তিকের সঙ্গে

শিবের-মূর্তি, এটি চার-মুখ ব্রহ্মা, এটি নারায়ণের অনন্তশয়ন, এখানে মহিষমর্দিনী দুর্গা, আর এখানে পল্লব রাজা অম্বকের কি নাম বললেন মনে নেই, অভিষেক হচ্ছে, রাণীদের সঙ্গে রাজা সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসে আছেন। বেশীর ভাগই ছবি মন্দিরের দেয়ালে পাথর কেটে তৈরী; নূতন যখন ছিল তখন নিশ্চয়ই মহাবলীপুরমের মূর্তির মতন সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন বাণী চুণের পলস্তারা দিয়ে সব জোবড়া করে ফেলেছে। আমার স্বামীর উৎসাহের অন্ত নেই, কিন্তু এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে, তাঁর গবেষণা শেষ করতে হলো। ধর্মশালায় ফিরে এসে সকালের খিচুড়ি গরম করে খাওয়া গেলো। কাঞ্চীপুরে যা দেখবার ছিল মোটামুটি তা একদিনে এই ভাবে দেখে নিলাম। রাজ্যে আর সেখানে থাকবার ইচ্ছা হলনা। মালপত্র বেঁধে স্টেশনে গেলাম, সেখান থেকে আবার চেন্নলপটে

এসে উপস্থিত হলাম। টিকিট কৈনার হালদা নেই। রাত সওয়া দশটায় দক্ষিণে যাবার গাড়ি পাওয়া গেলো। উনি স্থির করে ছিলেন যে মার্চ রাত্রিতে চিদম্বরম স্টেশনে নামবেন, এটি দক্ষিণের একটি বিখ্যাত তীর্থ স্থান, এখানে শূত্র মূর্তি শিব আছেন, নট রাজ শিবের এটি পীঠস্থান; এর কাছেই কুম্ভ কোণম্ বলে আর একটি বড় তীর্থ আছে, সেটিকেও দেখাবার তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি বড়ই ক্লান্ত ছিলাম বলে তিনি স্থির করিলেন যে রাজ্যে আর কোথাও না নেমে ভোরে একে বারে ত্রিচিনোপলীতে নামবে। ত্রিচিনোপলীর পাশেই শ্রীক্ষেত্রময়ের বিরাট নারায়ণ-মন্দির, আর জম্বুকেতুরের শিব-মন্দির। ত্রিচিনোপলী জাবিড় দেশের একটি অতি প্রাচীন স্থান, আর আজকালকার একটা বড় নগর। আমার জুর্ভাগ্য-ক্রমে চিদম্বরম্ কুম্ভকোণম্ আর তাজোর এই কটা বড় জায়গা দেখা হলনা!

বিস্ময় জাগে বিশাল বিশ্ব দেখি,—

মাঘ শেষে এল পাতা ঝরাবার দিন

কচি কিশলয়ে করিছে কে লেখালেখি

অশোকে পলাশে আঁকে আদরের চিহ্ন ;

সবই চলে সেই পুরাণো—নূতন ছাঁদে

কে যেন কোথায় হাসে, হাসে আর কাঁদে ।

ফাল্গুনী

ভাবী জননী

(গল্প)

শ্রীমুখাংকুমার রায়চৌধুরী

অরুন্ধতির ছেলে হইবে সংবাদটা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে পাড়ায় ওপাড়ায় এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। নববিবাহিতা মেয়েরা, বধূরা, বয়সী আধাবয়সী মহিলারা একে একে আসিয়া বধু অরুন্ধতিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া দিয়া গেল। এই সব কলকোলাহলের মধ্যে অরুন্ধতি লজ্জার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। এত শীঘ্র জানাইয়া কাজটি যে সে ভাল করে নাই এতক্ষণ তাহাই বুঝিতে পারিল। বেচারী বড়ই বিপদে পড়িয়াছে।

ছেলে হওয়ার বয়স পার হইতে বলিয়াছে বলিয়া বাড়ীময় একটা বিবাদের ছায়া পড়িয়াছিল। এতদিনের মধ্যে ছেলে না হওয়ায় তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অন্ত নাই। যে যেখান হইতে পারিয়াছে নানা দেবদেবীর কবচ মাহুলিতে ভরিয়া অরুন্ধতির হাতে বাঁধিয়া দিয়াছে। শ্বশুরবাড়ী এবং বাপের বাড়ীর তরফ হইতে ক্রমাগত নানা দেবদেবীর আশীষবাণী আসিয়াছে ও আসিতেছে। ছোট-বড়, রূপা-দোণার নানাবিধ মাহুলিতে তাহার একহাতে ভরিয়া উঠিয়াছে। স্থানান্তরে আর একহাতে আশ্রয় লইতেছে। এতগুলি মাহুলি ধারণ করা এবং স্নানান্তে সেইগুলি ধোয়া জল খাইতে খাইতে বধু বেচারী হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছে। যাক—এতদিনে তাহার বিপদ কাটিবার হুচনা দেখা দিল।

নির্দিষ্টে দ্বিতীয়মাস কাটিয়া গেল। তৃতীয় মাসের দিনকতক গেলে পরে অরুন্ধতি বুঝিতে পারিল তাহার অন্তরে স্বস্তির উপলব্ধি হইয়াছে। গাটা ক্ষণে ক্ষণে পাক দিয়া উঠিতেছে। শরীরটা যেন কি রকম কি রকম করিয়া উঠে। অস্বস্তি বোধ হইলেও মনে তাহার আনন্দই জাগে বেশী করিয়া। কিছুদিন হইতে বাড়ীর সকলের যে উপেক্ষা ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল এখন আর তাহা নাই। এই ঘটনার পর হইতে সারা বাড়ীখানা আনন্দ-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কল-

উচ্ছাসের আর শেষ নাই। অরুন্ধতি মুগ্ধ বিষ্ময়ে এই পট পরিবর্তনের কথা ভাবিতে থাকে।

অরুন্ধতির শরীরের ভার ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে, আগেকার মত সে লঘুচ্ছন্দাগতি তাহার আর নাই। পীণপয়োধর জৈব্য নমিত ও শ্রোণীভারে তাহার গতি ক্রমে ক্রমে মধুর হইয়া পড়িতেছে। শরীরের পুষ্টিনাভ দেখা দিলেও দুর্বলতা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আহা! রুচি কমিয়া আসিতেছে এবং বমির প্রাবল্যে তাহাকে যেন বিপন্ন করিয়া তোলে।

স্বামী আসিয়া খোঁজ লইয়া যায়। প্রায়ই চিঠি লেখে। শাশুড়ি বধুর জন্ত সর্বদা উৎকণ্ঠায় থাকেন। নন্দ সব সময় বৌদির কাছে কাছে থাকিয়া সেবাস্বত্বের ক্রটি করে না। বাপের বাড়ী হইতে নিয়তই চিঠি আসিতেছে। অরুন্ধতির মা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বেয়ানকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন; মেয়েকে যেন এখানে পাঠান হয়। প্রথম পোয়াতি। মায়ের কাছে গোপন কথা যাহা বলিতে পারে শাশুড়ীকে তাহা বলিতে পারে না। স্বতরাং এদিকে পাঠানর যেন আর কাল বিলম্ব না হয়। শাশুড়ী ভাবেন, বউ তাহার কত আদরের তাহারই এই সংসার, তাহার জন্ত সে করিতে পারেনা এমন কি আর আছে। আদর যত্নের ক্রটি হইতে পারে এ বিশ্বাস তাহার মোটেই নাই। বেয়ানের প্রত্নতত্ত্বের একথা লিখিলেও আবার তেমনি ধারা চিঠি আসে। আর আসে সজল চোখের কাতর প্রার্থনা।

অগত্যা ছয়মাসের মধ্যেই অরুন্ধতিকে তাহার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। যাইবার সময় তাহার শাশুড়ি বারবার করিয়া বধুকে আদর করিয়া কত উপদেশ দেয়। মুখ চুশন করিয়া সোহাগ জানাইয়া শরীরের প্রতি যত্ন রাখিতে বিশেষ খাওয়া দাওয়ার যেন অনিয়ম না হয়। উপর নীচে যেন বেশী যাওয়া আসা না করে। মন যেন ফুর্জিতে থাকে। ভাবনা চিন্তা মোটেই করিবে না। ওসব ভাবিবার কিছুই নয়, ভগবান

নির্বিষয়ে প্রসব করাইয়া দিবে। সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যাইবার সময় অরুন্ধতি নিজের ঘরটি পরিপাটি করিয়া গোছাইয়া রাখিল। স্বামী আসিলে যেন তাহার অভাবে কোন অসুবিধায় না পড়িতে হয়। নন্দ ছলছল চোখে বৌদিকে বিদায় জানায়। এপাড়ার ওপাড়ার বহু মহিলার আবির্ভাব হইয়াছে একে একে। যথাযোগ্যক্বে প্রণাম ও নমস্কার জানাইয়া অরুন্ধতি পাকীতে উঠিল। গ্রামেই টেবণ। দশ মিনিটের বেশী দেবী হয় না।

অরুন্ধতি আসিয়াছে। তাহার ছেলে, হইবে। এপাড়ার ওপাড়ার অনেকেই আসিয়া দেখা দিল। বাড়ীর বড়মেয়ে এবং এতদিন পর্যন্ত ছেলে না হওয়ায় ইহাদের হৃদয়স্তর সীমা ছিল না। এতবড় বাড়ীতে পৌত্র পৌত্রীদের সঙ্গে দৌড়ি দৌড়িতী হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে না থাকিলে বুদ্ধবৃদ্ধার মন ভাল থাকে না। বহুদিন পরে অরুন্ধতি সে অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছে। সকলেই আসিয়া অরুন্ধতির খবর লইয়া যায়, নানা উপদেশ দিয়া যায়। গিন্নীবান্নিরা অরুন্ধতির মাকে নানারকম তাকতুক করিতে বলে। কুদৃষ্টির তো অভাব নাই! তিনি ভাল মানুষ। যে বাবা বলে তিনি তাহাই পালন করিয়া যান নিজের উপর দিয়া। অরুন্ধতি অতশত পারে না বলিয়া মাঝে মাঝে হাঁকাইয়া দেয় মাকে। মা বেচারী সর্বদা মেয়েকে লইয়া তটস্থ থাকেন। ওদিকে যাইবে না। সন্ধ্যার সময় এলোচুলে থাকিবে না। রাত্তার ভিথরী ইত্যাদির সামনে যেন কদাচ বাহির না হয়। খুতু নোংরা জিনিষ ছেঁড়া ত্রাকড়া ও নানাবিধ তুকতাকের জিনিষ যেন কখনও ডিক্কাইয়া না যায়। খুব সাবধান হইতে পাড়াপড়শিরা সর্বদা নানা উপদেশ দিয়া যায়। অরুন্ধতি যতদূর সম্ভব সাবধানে থাকে। অরুন্ধতি বাপের বাড়ী আসিয়াছে প্রায় একমাস হইল। এ পর্যন্ত তাহার স্বামী একবারও আসে নাই। দেশে প্রতি সপ্তাহে যে বাড়ী যায় এখানে আসিতে পারে না সে কেন? সপ্তাহে না ইউক মাসে একবার করিয়া খোঁজ খবর লইতে আসা নিতান্তই উচিত।

পর পর কয়েকখানা চিঠির পর অরুন্ধতির স্বামী আসিয়াছে। জামাই আসিয়াছে স্তত্রাং শ্বশুরবাড়ীতে যেটুকু আনন্দ উৎসব হওয়া উচিত তাহার অভাব ঘটে নাই।

বিকালের দিকে আসিয়া অবধি এত জনারতের মধ্যে অরুন্ধতিকে তাহার কচিং চোখে পড়িয়াছে নিতান্ত অবগুষ্ঠিতা অবস্থায়।

রাত্রে সকলেই নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। অরুন্ধতি তাহার ঘরে আসিয়া দেখিল তাহার স্বামী ওপাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। ঘুমাইতেছে অথবা তাহাকে দেখিয়া ঘুমাইবার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে নিশ্চল অবস্থায়। অরুন্ধতি পালঙ্কে উঠিয়া তাহার স্বামীর গায়ে হাত দিয়া দেখিল। গায়ে হাত দিতেই সে বুঝিতে পারিল, স্বামী ঘুমাইবার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে কথা ভাবিলেও সে আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল—“ওগো শুনচো, ওগো ঘুমুলে নাকি? ওগো”—বার কয়েক ডাকাডাকির পর স্বামী অস্পষ্ট সাড়া দিয়া নড়িয়া চড়িয়া শুইল। অবশেষে অরুন্ধতির কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়া স্বামী বেচারী আর পারিল না। সাড়া দিয়া নড়িয়া চড়িয়া শুইল। অরুন্ধতি আবার ডাকিল—“এরই মধ্যে যে বেশ ঘুমিয়ে পড়েছ।—হু—” “এদিকে ঘুরে শোও।” স্বামী যেন অন্তরঙ্গ করিয়া পাশ ফিরিল! — “রাগ করো নাকি? আমার অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া অরুন্ধতী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তারপর আরও অনেক কথা হইল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। যখন অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে, স্বামী বেচারী ক্রটি স্বীকার করিয়াছে সেই সময় অরুন্ধতী বলিয়া বলিল—“এ জন্য তোমার দোষ দেবো এত বড় অকৃতজ্ঞ আমি নই। কোন পুরুষই এ অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে শ্বশুর বাড়ী আসে না।

—“নাও শুয়ে পড়, শরীর তোমার ভাল নয়। বেশী রাত জাগলে শরীর খারাপ করতেও পারে” বলিয়া স্বামী পাশ ফিরিয়া শুইল।

অরুন্ধতি আর কিছু না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। এ কয়দিন হইতে তাহার পেটটা খুবই মোটা হইয়া যাইতেছে। শুইতে গেলে, হঠাৎ নড়িতে চড়িতে গেলে বিশেষ অস্বস্তি বোধ হয়।

একদিন থাকিয়া অরুন্ধতির স্বামী আবার কর্মস্থলে চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় সে বার বার উপরোধ, অনুরোধ ও শাসন বাক্যে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, শরীরের প্রতি যেন কদাচ অনিয়ম না হয়।

আট মাস পার হইতেই অরুন্ধতির মা আরও স্তর্ক হইয়া উঠিলেন। উপরে গেলে সহজে নীচে আসিতে দেয় না এবং নীচে আসিলে সহজে উপরে উঠিতে দেয় না পাছে পড়িয়া যায়। বিশ্বাস ত নেই, পা পিছুলাইতে কতক্ষণ! সপ্তাহে সপ্তাহে দাই আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যায়। অবস্থা ভাল বলিয়া তাহাকে ও তাহার মাকে আশ্বাস দিয়া যায়। এ পাড়ার বৃদ্ধা আসিয়া অরুন্ধতিকে দেখিয়া যায়। ভাল আছে, প্রসবে বেগ পাইতে হইবে না বলিয়া প্রবোধ দিয়া যায়।

কিন্তু অরুন্ধতি দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। হাত, পা শীর্ণ, মুখের রং ফ্যাকাশে এবং ক্ষীত উদরে-সে ক্রমে ক্রমে মুহূর্ত্তান হইয়া পড়িতেছে। শরীরে অবসাদ আসিয়াছে। চোখের কোণে কালিন্দা দেখা দিয়াছে। কতদিনে যে নিশ্চিন্ত হইবে জানে না। কেবল গা পাক দিয়া উঠে, বসি হয়। আয়নার কাছে দাঁড়াতেই সে শিহরিয়া উঠে। সরু বোটা একেবারে কালো ও মোটা হইয়া উঠিয়াছে।

নড়িতে চড়িতে হাঁক ধরিয়া যায়। হঠাৎ পারের তলার নজর দিতেই সে যেন শিহরিয়া উঠিল। পাতা দুইটি যেন অনেকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। টিপিলে গর্ত্ত হইয়া যায়। হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, সন্তানের জননী হইতে গেলে এতও হয়। এত দুর্ভোগও তাহাদের পোহাইতে হয় অথচ জনকগোষ্ঠী নিশ্চিন্তে বিনা আয়াসে জনকস্বের দাবী করিয়া বসে।

নয় মাস পড়িতেই অরুন্ধতির “স্বাদভক্ষণের” আয়োজন আরম্ভ হইল। একটা ভাল দিন দেখাইয়া দশজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া এই উৎসব করা দুই পক্ষেরই একান্ত ইচ্ছা অরুন্ধতির স্বপ্নের বাড়ী হইতে তত্ত্ব আসিয়াছে। তাহার স্বামীর আসিবার কথা কিন্তু লজ্জায় হোক বা যে কারণে হোক জানাই আসিতে পারে নাই। বাড়ীতে মহা সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। ওপাড়ার মহিলা মহলের আনাগোনার অন্ত নাই। সবাই একবার করিয়া দেখিয়া যায় অরুন্ধতিকে। লজ্জায় মুখ চোখ লাল করিয়া বেচারী কোণ লইয়াছে। বিশেষ সাড়া শব্দ করে না। টুকটকে লালপাড় একখানা গরদের-সাড়ী পরিয়া

সাদভক্ষণে বসিয়াছে। সাধবা-বয়নী বাক্সবো ও বধূরা তাহাকে ঘিরিয়া অদরে আবদারে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। সনারোহে স্ত্রী আচার সম্পন্ন হইয়া গেল। নিমন্ত্রিতরাও থাইতে বসিয়াছে। বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিয়াছে।

অরুন্ধতির বাপ, মা, ভাইবোনেরা সকাল হইতে কাজকর্মে ব্যস্ত। লোকজনও যথেষ্ট থাইয়াছে। সমস্ত দিন খাটিয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার অন্নক্ষণ পরেই যে বাহার ঘরে শয্যা লইয়াছে। অরুন্ধতিও কম ঘোরাক্ষেপ করে নাই। এত গোলমাল হটগোল ও অন্নপরিশ্রমেও বৈকাল হইতে তাহার শরীর ম্যাজ ম্যাজ করিতেছিল। বৈকালে খাট হইতে গা ধুইয়া আসিয়াছে পাড়ার যত মেয়েদের সঙ্গে। সন্ধ্যার দিকে সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাড়ীর কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। উৎসবশেষে সকলেই ক্লান্ত। কে কাহার খোঁজ রাখে! অরুন্ধতির পেটটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। চাংকার করিয়া আর্তনাদ না করিয়া আর পারিল না। অনেকক্ষণ আর্তনাদের পর তাহার মা জানিতে পারিয়া হেঁচু করিয়া উঠিল। সকলে উঠিয়া একে একে আসিয়া দাঁড়াইল। দাই আসিল কিন্তু অরুন্ধতির প্রসব বেদনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

সমস্ত রাত্রি ভীষণ যন্ত্রণা সহ করিয়া ভোরের দিকে অরুন্ধতি সন্তান প্রসব করিল। “কি ছেলে, কি ছেলে?” চারিদিক হইতে প্রশ্ন উঠিতে দাই করুন সুরে জানাইল— “ছেলে যাই হোক না কেন সে আর নাই।” এত করেও তাকে রাখতে পারলাম না।” এই কথায় সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। সকলেই হা হতাশ করিতে লাগিল। আজ এই উৎসব মুখর দিনের শেষে এই বিষাদ পট ভূমিকার মধ্যে সৃষ্টি যে হইতে পারে তাহা কেহই ভাবিতে পারিল না।

ওদিকে অরুন্ধতি মুখ নীচু করিয়া তখন কুঁকড়াইয়া আর্তনাদ করিতেছে। রক্তে তাহার সর্ব শরীর ভিজিয়া গিয়াছে। এতদিনকার ফলাফলের অপেক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া থাকিবার শক্তি তাহার আজ আর নাই। কেবল ধুকিতেছে আর আর্তনাদ করিতেছে, তাহাও সজ্ঞানে নয়।

মহিলা-সম্মাচার

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ

স্বাগতম্ ম্যাডাম্ চিয়াং কাইশেক্—বর্তমান মহারণের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয় মহাচীনে। আজ সার্বিক চারি বৎসর দুর্ভিক্ষ জাপানীদের সহিত মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও গোয়ব রক্ষার নিমিত্ত চীনা যোদ্ধারা সাহসিকতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে তার মূলে রহিয়াছে ম্যাডাম্ চিয়াং কাইশেকের অল্পপ্রেরণা।

সেই মহিষী মহিলা ও তাঁর স্বামী চীনের ভাগ্য বিধাতা মার্শেল চিয়াং কাইশেক সহ ২ই ফেব্রুয়ারী ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। বিমান যোগে দিল্লীর পথে কলিকাতায় অবতরণ করিয়া এই মহানগরী দখল করিয়াছেন। দিল্লীতে তিনি জহরলাল নেহেরু আদি দেশ নায়কদের সহিত আলাপ ও আলোচনা করিয়াছেন।

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো দিল্লীর লাট প্রাসাদে ভারত শাসন পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে তাঁহাদের সাদর সম্বাদনা করিবার সময় বলিয়াছেন—

“যুদ্ধের এই বিপদের মধ্যে ভারতে আসিয়া চীন ও ভারতবর্ষের প্রাচীন বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিবার জন্য মার্শেল ও ম্যাডাম্ চিয়াং কাইশেক যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি পরিষদবর্গের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে ভৌগলিক ব্যবধান রহিয়াছে একথা ঠিক। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত এক

মূল ভাব এবং যে স্বাধীনতা মানুষের আত্মাকে বাঁচাইয়া রাখি যাচ্ছে তাহা এই ব্যবধানকে অস্বীকার করিয়াছে। সুদূর অতীত কাল হইতে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে ধর্ম, রাজনীতি এবং সংস্কারের বাঁধনকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।”

সোভিয়েটদের সাহায্যে নৃত্য শিল্পী বঙ্গ-বালা :—শ্রীমতী লক্ষ্মী সেন গুপ্ত কেশ্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুওর গ্র্যাডুয়েট। তিনি কেশ্বিজ বেডফোর্ড মহিলা কলেজে ছাত্রী। তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর। তিনি সোভিয়েট সাহায্যকারী সমিতির অন্ততম সদস্য। তিনি স্বয়ং প্রাচ্য-নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবার জন্য কয়েকটি অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। প্রচুর অর্থ তাঁর নৃত্য প্রদর্শনে সংগৃহীত হয়। তিনি সমস্তই রাশিয়ার দুর্গতদের দুঃখ নিবারণে প্রদান করিয়াছেন।

এক রাত্রির অনুষ্ঠানের অন্তে রাশিয়ার ভূতপূর্ব রাজদূত স্যার রাফোর্ড ক্রোপ্স তাঁহার নৃত্য দেখিয়া প্রচুর প্রশংসা করেন। তিনি আরো বলিয়াছেন—“সোভিয়েটদের সাহায্যকল্পে আপনাদের সমিতি যে সেবাকার্য্য করিয়াছেন তাহা স্বাধীন ভারতেরই উপযুক্ত। আমি আশী করি, ভারত স্বাধীন হইবে এবং বিজয়ী সোভিয়েটের প্রতিভার উন্মেষে বিশ্ব মানবের যেমন পরম কল্যাণ হইবে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সৌহৃদ্যও তেমনই দৃঢ় হইবে।

কেন্দ্র সমিতির কথা

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী কেন্দ্র সমিতির মহিলা কর্মী শ্রীযুক্তা স্বরোধ বালা ঘোষ জলনীন (ঢাকা) গমন করেন। তথায় ৫ই ফেব্রুয়ারী আত্মোদ্ধার সেবাশ্রমে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। গভর্নমেন্টের শিশুমঙ্গল ও মাতৃ-মঙ্গলের লেডী সুপারেন্টেন্ডেন্ট ডাঃ শ্রীযুক্তা স্ববর্ণ স্মিত্র, এম. বি. ডি. পি., এইচ, সভানেত্র্য করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা ঘোষ সভায় মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল এবং বর্তমানে নারীদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহাতে সকলেই অভিভূত হইয়া পড়েন। সেখানে তখনই একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা ঘোষকে তথায় বাইতে অহরোধ করেন এবং গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতির যে একান্তই দরকার তাহা তাঁহারা বলেন।

কেন্দ্র সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত সুধীরলাল সরকার বি-এ, বর্তমান মাসে বর্ধমান জেলার খওরায় প্রভৃতি

ছয় সাতটি গ্রামে গমন করেন। সমস্ত স্থানেই মার্জিক লর্ডন সহযোগে বর্তমান মহিলাদের কর্তব্য ও সম্ভবত্ব ভাবে কার্য্য করার এবং ঘরে বসিয়া অর্থ উপার্জন দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। সে অঞ্চলে বহুলোকের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসে সোণাটিকারী (হুগলী) প্রদর্শনী উপলক্ষে কেন্দ্র সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ শাস্ত্রী মহাশয় তথায় গমন করেন। প্রদর্শনীর কয়েক দিন তথায় উপস্থিত থাকিয়া মহিলাদের বর্তমানে কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভার সকলেই ইহার মর্ম উপলব্ধি করেন।

দিনাজপুর মহিলা সমিতি একটি প্রদর্শনীতে নিজেদের হস্তে প্রস্তুত রহবিধ দ্রব্য পাঠান। তথায় একটি সভা একখানি ছবি প্রস্তুতের জন্য ৫০ পুরস্কার পাইয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা

রবীন্দ্র কাব্য ত্রয়ী পরিকল্পনা:—শ্রীসরসী-
লাল সরকার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
২নং কলেজ স্কোয়ার। পৃ: ১২৮, মূল্য—১৮ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা গানের মর্মন তাল ও সুর
সহ গতির ছন্দে লিখিত। গ্রন্থকর্তা রবীন্দ্র কাব্যের এই
বিশেষত্বটি বহু কবিতা উদ্ধৃত ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।
তাঁহার ছন্দের উত্থান পতন তাঁনের গতি এবং ভাবের মধুরতা
উপলব্ধির নানা পথ দেখাইয়াছেন। লেখক রবীন্দ্রনাথের অনেক
কবিতাতেই প্রথমে তাল, পরে গান ও তাহার পর গতির ইঙ্গিত
পর পর যে আছে, বহু উদাহরণে তাহাই দেখাইয়াছেন।

কবি যে অবচেতন মন হইতে কবিতা লিখিতেন, তিনি
কখনও ভাবিয়া চিন্তিয়া চেষ্টা করিয়া লিখিতেন না তাহা সরকার
মহাশয় তাঁর গ্রন্থে দেখাইয়া রবীন্দ্র কাব্য পড়িবার সুবিধা
করিয়া দিয়াছেন। তাল, গান ও গতির ত্রয়ী পরিকল্পনার
ভিত্তর দিয়া কবির কবিতার মর্মকথা উপলব্ধি করা এবং গভীর
রসের আশ্বাসন পাওয়া যায় তাহাই এই পুস্তকের নানা অধ্যায়ে
ব্যক্ত হইয়াছে। প্রেমাস্পদের প্রেম আলোকরূপে কবির
প্রাণে যে বাণী প্রেরণ করিল, তাহাই গানের রূপ ধারণ করিয়া
উৎসারিত হইয়াছে তাহাও লেখক বিশ্লেষণ করিয়াছেন।
কবি সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধি করিয়া যে সব কবিতা
লিখিয়াছেন তাঁরও মর্মকথা এই পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া
বাইবে।

গোধূলি—শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র কুশারী, প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্র
নাথ নিয়োগী। ৭ মুরলী ধর সেন লেন। মূল্য ১০ আনা।

ক্ষুদ্র উপন্যাসটিতে লেখক দেশ প্রীতি ও সাম্যবাদ বর্জ-
মানের যুবকদের চিত্র কতটা দখল করিয়াছে তাহাই তিনি তাঁর
উপন্যাসের প্রধান নায়ক তপনকে সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন।
গতাত্মগতিক প্রেমের বিকাশ না আঁকিয়া লেখক আধুনিক
যুগের মেয়েদের প্রেমাস্পদের জন্য স্বার্থ ত্যাগের মহিমা ও
শক্তি দুইটি স্ত্রী চরিত্র শীলা ও তৃপ্তির মধ্যে প্রস্ফুট করিয়াছেন
তাহা বাস্তবিক আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি পথ্যায়ভূক্ত হইবে। লেখ-
কের ভাষা ও বিচার বুদ্ধি শুদ্ধ, সরল ও সংযমী।

সঙ্গোপনে—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী। প্রকাশক
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং ৪৪১ কলকাতা স্ট্রিট। মূল্য ১০ আনা।

লেখিকা রেলওয়ে কর্মচারীদের সংশ্রবে আসিয়া এবং
রেলওয়ে কলোনীতে বাস করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-
ছেন তারই অনেক স্মৃতি ছাংয়ের কাহিনী এই পুস্তকে দ্বাদশটি
গল্পের মধ্যে অধিকাংশের মধ্যে ফুটাইয়াছেন। এক শ্রেণীর
মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যে অভাব অনটন বাঙ্গালা সমাজকে পীড়ন
করিতেছে তাহাদের ছবি এই গল্প গুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে।
শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিচালিত

টিকই লিখিয়াছেন—“কল্যাণীয়া অন্নপূর্ণার এই গ্রন্থের গল্পগুলি
আকারে যেমন ছোট, প্রকারেও তেমনই ঐশ্বর্যে পূর্ণ।
হয়ত সর্বত্র সর্ব জিনিষের যথাবিন্যাসে, কিঞ্চিৎ ক্রটি কোথাও
রহিয়াছে—নবীন লেখিকার পক্ষে সেগুলি অবশ্যস্বাভাবী এবং
তেমন মারাত্মক নয় বলিয়া উপেক্ষণীয়। ছোট গল্প যে কি যখন
লেখিকা ধরিতে পারিয়া বলিবার ভঙ্গিটো আয়ত্ত করিয়াছেন,
তখন অল্পশীলনের ফলে অচিরে তিনি যে একজন নিপুণ শিল্পী-
রূপে পরিগণিত হইবেন, ইহা অকুণ্ঠিত চিত্তে ভবিষ্যৎ বাণী
করিতে পারি।”

অন্নপূর্ণার রচনায় প্রধান গুণ তাঁর সৃষ্টি কাহিনীর অনায়াস
সরলতা ও স্বাধুর্য্য; গল্পের অঙ্গ সজ্জার ভঙ্গীমা অপেক্ষা প্রাণ
শক্তিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁর কল্পন, সমিতি,
সঙ্গোপনে গল্পগুলি বড়ই প্রাণম্পর্শী।

ডাঃ সেন (উপন্যাস) শ্রীস্বধাংশু কুমার, রায় চৌধুরী
প্রণীত ও চিত্রা পাবলিশিং কোং ১২, কানাই ধর লেন,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বধাংশু বাবু ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি
লাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে বহু গল্প,
প্রবন্ধাদি লিখিয়া রসিকমহলে যথেষ্ট রস পরিবেশন করিয়াছেন।
বর্তমান উপন্যাসখানি তাঁহার সে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে
বলিলে সঙ্গতই হইবে।

ডাঃ সেনের চরিত্র আলোচনা এই উপন্যাসের মূল বিষয়
বস্তু। একক চরিত্রের ভিতর উপন্যাসখানির গতিপথ যেভাবে
চলিয়াছে তাহাতে প্রধানতঃই ডাঃ সেনের কর্মদক্ষতা, স্বপ্ন বুদ্ধি
এবং কার্য পরিচালনার কূটবুদ্ধি দেখা যায়। ব্যবসায়ী হিসাবে
তিনি কলিকাতায় যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তিলাভে যত্নবান।
কিন্তু কি ভাবে ব্যবসা জগতের প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন তাহা
লেখক স্থনিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। বর্তমান সমাজতন্ত্রবাদের
যুগে এই শ্রেণীর নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানবের কর্মদক্ষতা যেভাবে
কুটিল্য বাহির হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালী কেরানী ক্রমের চক্ষু
সজ্জল হইয়া আসে। নিষ্ঠুর বলিয়া ডাঃ সেনের যে উপন্যাস আছে
তাঁহা সরস করিবার ভঙ্গি তিনি আধুনিক তরুণীকুলের
প্রতি স্নেহের দিতে আগ্রহের মাত্রা যেন ছাড়িয়া
ফেলিয়াছেন। ডাঃ সেনের মত বহু বাঙ্গালীর জীবন
এইভাবে আমাদের চোখে পড়ে। তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর
কথাধাত করিয়া লেখক যে চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার
ভিতর হইতে জানিবার অনেক কিছুই থাকিতে পারে।

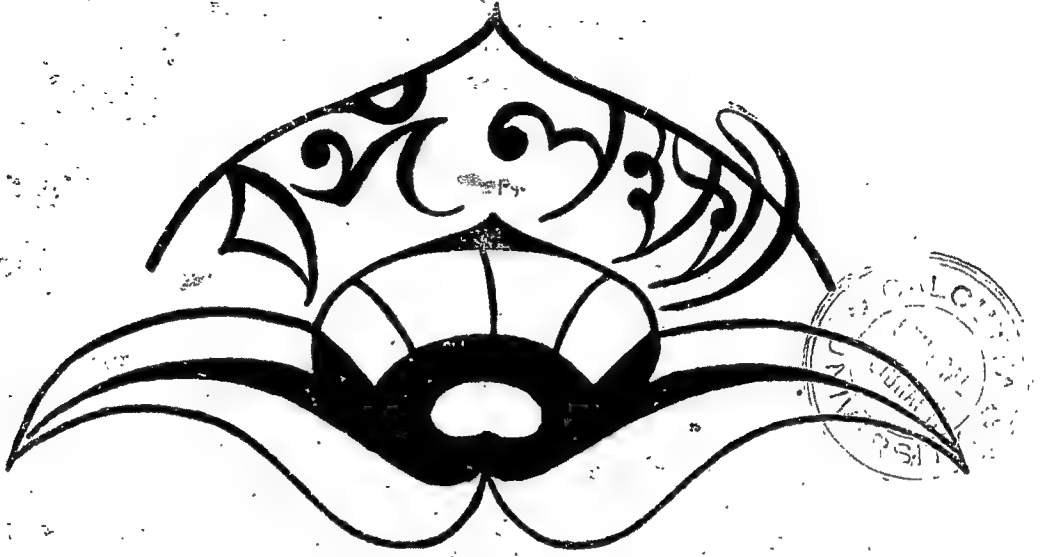
স্বপ্ন স্থানের মধ্যে বিষয়বস্তুর আধিক্য উপন্যাসখানি সজীব
হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গি চমৎকার
লাগিল। ছাপা, বাঁধাই ও গেট-আপ নিখুঁত হইয়াছে বলিলে
মোটের অতিশয়োক্তি করা হয় না। আমরা স্বধাংশুবাবু
উত্তমোত্তম প্রিয় কামনা করি। **শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ**

বঙ্গলক্ষ্মী



‘পদ্মবনে’—





সপ্তদশ বর্ষ

চৈত্র, ১৩৪৮

৫ম সংখ্যা

সৃষ্টি যাবে কি হারি ?

ভয়ে আতঙ্কে হ'ল যে তোমার
রক্তবিন্দু জল,
দৈবের হাতে নাহি কি অস্ত্র
নাহি কি দিব্য বল ?
দৈব আসি কি পারে না তুলিতে
মহা প্রলয়ের ঝড়,—
বিশ্বের ভিত উখাড়ি ফেলিতে
উচ্ছেদ করি জড় ।
হৃদৈবের দর্প নাশিতে নাহি কি
শক্তি তার,
ফুৎকারে সে কি পারে না উড়াতে
ক্ষিপ্তের হুঙ্কার ?

দৈব-অধীন মানুষ,—সে যদি
এতই শক্তি ধরে ।
মহা অঘটন করিতে ঘটন
নাহে কি দৈব বরে ?
ধ্বংসের মুখে, ভাস্কর বুকে
ছিটায় অমৃত বারি,
দৈব-শক্তি সফল করিতে
সৃষ্টি যাবে কি হারি ?
মৃত্যু আসিয়া দাঁড়াল শিয়রে
করিল সাক্ষ্য দান,
দৈব-শক্তি নামিল, সবারে
করিল চক্ষুগ্ধান ।

কথ্য কুমারিকা দর্শনে

ডাঃ ত্রীপঞ্চানন নিয়োগী

এইত সেই কন্যা-কুমারিকা—ভারতের সর্বদক্ষিণ সীমান্ত বিন্দু। ইহার দর্শন-ইচ্ছা বহুকাল পরে আজ প্রৌঢ়-বাক্কিকোর সন্ধিক্ষেপে পূর্ণ হইল। কিম্বদন্তী, পুরাণ, ইতিহাস, ভৌগলিক অবস্থান, স্বভাবের অনন্ত সৌন্দর্য মিলিত হইয়া ইহাকে অপূর্ণ ত্রীতে মণ্ডিত করিয়াছে। হিন্দু নদ-নদী-সঙ্গমস্থলকে পূত বলিয়া পূজা করিয়া থাকে, সেইজন্য গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ হিন্দুর মহাতীর্থ। কন্যা-কুমারিকা ক্ষুদ্র নদনদীর সঙ্গমস্থল নহে; এখানে আছে তিন মহাসাগরের নিবিড় সঙ্গম। ইহার এক পার্শ্বে বঙ্গোপসাগর, অপর পার্শ্বে আরব সাগর, সম্মুখে বিশাল ভারত মহাসাগর। এই বিশাল বারিধির নিবিড় মিলন যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং উহাদের মিলিত জল-কল্লোলোচ্ছ্বাস একবার স্বকর্ণে শুনিয়াছেন তিনিই নিজেকে ধন্য মনে না করিয়া থাকিতে পারেন না। সঙ্গম বিন্দুতে দক্ষিণাস্য হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম বহুদূরে সুনীল নভোমণ্ডলের দিক্‌চক্রবালরেখা সাগরের ততোধিক নীলায়িত সলিলের উপর অর্ধচন্দ্রাকার রচনা করিয়া শোভা পাইতেছে।

এই স্থান কেবল ত্রিসাগরেরই মিলনস্থল নহে, ইহার পশ্চাৎ দিকে দুই পার্শ্বের স্থলভাগে বৃক্ষরাজি স্ত্রশোভিত পর্বতমালাও দৃষ্ট হইতেছে। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের দ্বাররক্ষী স্বরূপ বহুযোজন বিস্তৃত পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্বতমালাও ইহার উত্তরে মিলিত হইয়াছে। উহাদের প্রান্তর স্থূপের উপর সাগরের উর্ধ্বনিচয় অবিরত আঘাত খাইয়া খাইয়া যুগপৎ কলোল ও শুভ্র ফেনরাজি স্বজন করিতেছে। একজন পাণ্ডা অঙ্গুলি নির্দেশে

দেখাইল—ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপর দিনের পর দিন বসিয়া থাকিয়া বাদ্গালা ও বাদ্গালীর গৌরব, ভারতের নব জন-জাগরণের অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের দুঃখ দৈন্ত্য দুর্দশা নিরাকরণের উপায়নিচয় চিন্তা ও নির্ধারণ করিয়াছিলেন।† বিবেকানন্দের পদরজ স্পর্শে পূত প্রস্তর খণ্ডের পাদদেশে সুনীল জলরাশির আঘাত নির্ঘোষ বিবেকানন্দের অমর বাণী যেন কর্ণকুহরে পঙ্ছছাইয়া দিতেছে—ভারত ছুৎমার্গ পরিত্যাগ করুক, জগতে অস্পৃশ্য মানব কেহ নাই, দরিদ্র নারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ঠ দান, দেশাত্মবোধই একমাত্র ধর্ম। এখনও দক্ষিণাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছি—ভাবিতেছি বিবেকানন্দের তিরোধানের পর তাঁহার বাণী ভারতের দ্বারে দ্বারে কীর্তিত হইয়া ভারতবাসীর কুস্তকর্ণের নিদ্রা কতক পরিমাণে ভাঙাইতে সক্ষম হইয়াছে।

সদ্য সাগরাস্থচুসনশীতল যুত্মন্দ সমীরণ আমার ভ্রমণ-ক্লেশ অপনোদন করিয়া দিল। দুই হাত দিয়া ইহার মাধুর্য অনুভব করিলাম। শরীর শীতল হইল ত বটেই, মন শীতল হইল তদপেক্ষা বেশী। অগতঃ দুই নিমিষের জন্ত সংসারের অনন্ত অশান্তি ভুলিয়া মন ছুটিল অনির্দিষ্টের সন্ধানে। ঐহার কণ্ঠের এক ক্ষুদ্রকণার নিদর্শন স্বরূপ অনন্ত বিশাল বারিধি, পর্বতমালা, মানব, স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার চরণপ্রান্তে মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়িল। বৈজ্ঞানিক কখনও নাস্তিক হইতে পারে না, একথা আমি অনেকবার অনেকস্থলে শুনাইয়াছি; সে যে অহর্নিশ জগৎস্বামীর অনির্বচনীয় সৃষ্টিচাতুর্ধ্য তাহার আবিষ্কৃত যজ্ঞাবলীর মধ্য দিয়া দেখিতে প্রায় এবং তজ্জন্ত মুহমূহ আশ্চর্য্য, বিশ্বয় ও আনন্দে আশ্লুত হইয়া

* ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজে Indian Science Congressএ উপস্থিত হইয়া দ্বিতীয় সপ্তাহে দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিবার সুযোগ পাই। সেই সময় কথ্যকুমারিকা দেখিতে যাই।

† বিবেকানন্দের এই স্থানে আগমনের দ্যোতক স্বরূপ রামকৃষ্ণমিশন এখানে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন।

থাকে। বিশাল সমুদ্র, এবং পর্বত মালার অপূর্ণ সমন্বয়ের সৌন্দর্য্য বৈজ্ঞানিক তাহার পরীক্ষাগারের গভীর মধ্যে সচরাচর দেখিতে পায় না, সেই জন্ত স্বদূর বঙ্গদেশ হইতে আগত একজন অখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির এই অপূর্ণ মিলন-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ও সর্বদা দ্বারা উহা অল্পভব করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করতঃ ধৃত হইয়াছে।

এই কল্পা-কুমারিকাতে প্রাতে সমুদ্রগর্ভ হইতে উখিত সূর্য্যের উদয় ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের অস্তগমন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের পূর্বোপকূলের স্থান সমূহ হইতে সমুদ্রে সূর্য্যোদয় ও পশ্চিম উপকূলে সূর্য্যাস্ত দেখা যায়, কিন্তু সমুদ্রে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কল্পা-কুমারিকাতেই প্রত্যহ দৃষ্ট হয়। নাতিতীক্ষ্ণ অগ্নিগোলকসদৃশ সূর্য্যের উত্থান ও অস্তগমনের চিত্তবিনোদনকারী দৃশ্য উপভোগ করনোচ্ছুর নিকট এই স্থান অতি প্রিয় ও রম্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রকৃতির অনির্বচনীয় বিবিধ শোভাসম্পদ কতক দর্শন ও কতক চিন্তা করিতে করিতে ঐ স্থানে নিশ্চিত একটি ছোট মঞ্চ উপবিষ্ট হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে তথাকার সমুদ্রগর্ভোৎকৃষ্ট শঙ্খ প্রবাল সমুদ্রফেন, নানারঙ্গের ক্ষুদ্র বৃহৎ বরাটিকা লইয়া তথাকার ধীবররমণীগণ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইল এবং ঐগুলি ক্রয় করিবার জন্ত আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কতক কতক কিনিলাম। তাহার মনের আনন্দে সঙ্গীত আরম্ভ করিল এবং তাহাদের অবাধ্য ভাষায় আমাকেও তাহাদের সঙ্গীতে যোগদান করিতে অনুরোধ জানাইল। কতকক্ষণ সঙ্গীত শুনিলাম, সাগর সঙ্গীতের সহিত তাহাদের সঙ্গীত মিলিয়া আমার কর্ণকূহরে তৃপ্তি দান করিতে লাগিল। তারপর এখানেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পশ্চাতে কল্পা-কুমারিকার মন্দির। এখানে জগজ্জননী

কুমারীবিশেষ যুগযুগান্তর হইতে শিবসাধনা করিতেছেন! কত কিম্বদন্তী এই কুমারী জগজ্জননী সম্বন্ধে পাণ্ডা ঠাকুররা বলিয়া থাকেন। একদা অনন্ত যৌবনসম্পন্ন ও অপূর্ণ সৌন্দর্য্যবতী এক কুমারী কল্পা সপ্ত সখী পরিবৃত্তা হইয়া বনে শিবের তপস্শায় রত ছিলেন। দৈত্যরাজ বাণাসুরের কতিপয় চর দেখিতে পাইয়া কুমারীর রূপ-যৌবনের কথা প্রভুকে বিজ্ঞাপিত করে। দৈত্য বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়া কুমারীকে লাভ করিবার জন্ত তাঁহাকে প্রথমে স্ত্রুতি ও পরে আক্রমণ করে। কুমারী তখন প্রবল বিক্রমে দৈত্যরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভূত করেন এবং পরে চক্রাযুধ দ্বারা তাহাকে নিধন করেন। তদনন্তর কুমারী শিবের উদ্দেশে পুনরায় ধ্যানস্থ হন। কৈলাস পর্বতে শিব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে বহুযুগ ধরিয়া তাঁহার তপস্যা করিতে হইবে—উপযুক্ত সময়ে তিনি কুমারীর পানিপীড়ন করিয়া তাঁহার মনকামনা পূর্ণ করিবেন; তাই জগজ্জননী বহুদিন হইতে এখানে কুমারী-ভাবে দক্ষিণ হস্তে দিব্য পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া শিবের ধ্যানে রত আছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি—সমুদ্রসৈকতস্থিত মঞ্চের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি বাঙ্গালী। জগজ্জননীর মাতৃমূর্ত্তি দেখিতেই আমরা অভ্যস্থ। বাঙ্গালা দেশে তিনি শিবজায়া, দৈত্যনাশকারিণী দশভূজামূর্ত্তিতে তিনি বৎসরান্তে দেখা দেন, সঙ্গে সন্তান-সন্ততি—লক্ষ্মী, সরস্বতী, কীৰ্ত্তিকেয় এবং গণপতি। স্বপ্নে দেখিলাম—জগজ্জননীর এই কুমারীভূত উদযাপিত হইয়াছে; এখন তিনি শিবজায়া। দাক্ষিণাত্যের কুমারী বঙ্গদেশের দশভূজা মাতৃমূর্ত্তিতে পরিবর্তিত হইয়াছেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে অল্পভব করিলাম। স্বপ্ন ও সেই সঙ্গে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

কক্ক ও লীলা

শ্রীমতী কমলা দেবী, এম-এ

আজ আপনাদের যে গল্পটি বলতে চাই আপনারা সেটা আগেও হয়ত শুনে থাকতে পারেন। তবু, পুরাণো গল্পও বার বার শুনেই ইচ্ছা হয়—তার রস-মাধুর্যের জন্য। গল্পে বর্ণিত ব্যক্তির কল্পিত মানুষ নন। এ গল্পে একটা জিনিষ আপনারা লক্ষ্য করবেন যে তিনশো চারশো বছর আগে আমাদের অম্মদার এবং জুদয়হীন সমাজের সংকীর্ণতার মধ্যেও ছ'একজন স্বভাবতঃ আশ্চর্য উদারহৃদয় মানুষের দেখা পাই। আজকের দিনের আধুনিক শিক্ষার আমরা যতই গর্ব করি না কেন আমরা সামাজিক আচরণে আমাদের পিতামহগণের থেকে যে আসলে খুব এগিয়েছি তা বোধ হয় না।

বিপ্রপুর গ্রামে গুণরাজ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল বসুমতী। তাঁরা বহুদিন পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। অনেক দিন পরে তাঁদের একটি পুত্র জন্মে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাঁরা ছেলেটিকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। মা ছেলের নাম রাখেন কক্ক। কিন্তু ভাগ্য এই ব্রাহ্মণ দম্পতীর অন্ধে বাদ সাধে। ছেলেটি যখন সবে মাত্র ছ'মাসের তখন মায়ের হয় মৃত্যু। বাপই তখন মায়ের মতো করে শিশু পুত্রকে লালন পালন করতে থাকেন। কিন্তু স্ত্রীর শোকে তিনি ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়েন ও প্রায় পাগলের মতো হয়ে যান। কিছুদিন যেতেই তাঁরও মৃত্যু হয়। তখন সেই ছুথের ছেলেকে দেখবার আর কেউ থাকে না। পাড়া প্রতিবেশীদের কাঁরও ভরসা হয় না 'মা-বাপ-থেকে' ছেলেকে নিজেদের বাঁড়ীতে নিতে। মুরারি নামে একটি নিম্ন জাতির লোক বাস করত ঐ গ্রামে, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল কৌশল্যা। কৌশল্যার ছেলে হয় নি। সেই যাতৃ পিতৃহীন ব্রাহ্মণ শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে কেউ যখন এগোয় না তখন মুরারী সেই অসহায় শিশুটিকে বুকে ধরে নিজের কুটীরে নিয়ে এসে কৌশল্যাকে দেয়। কৌশল্যা তো মল্লিকা ফুলের মতো দিব্বি ফুটফুটে থোকাটিকে পেয়ে মহা খুসি। তারা স্বামী স্ত্রীতে প্রাণ দিয়ে এই শিশুকে পুত্রাধিক স্নেহে পালন করতে থাকে।

মহুযায়ে মহৎ কিন্তু সমাজের চোখে যারা হীন সেই দরিদ্র কৌশল্যা মুরারীর ঘরে কক্ক চন্দ্রকলার মতো বাড়তে থাকে। এমনি করে পাঁচ বছর কেটে যায়। কিন্তু কক্কর এমন কপাল যে হঠাৎ সামান্য অসুখে মুরারী মারা যায়; কৌশল্যা স্বামীর শোকে কাতর হয়ে পড়ে, অনাহারে অনিদ্রায় তার দিন কাটে এবং একদিন শিশু কক্ককে একলা ফেলে রেখে স্বামীর পথে যাত্রা করে। এখন, পাঁচ বছরের শিশু কক্কর অবস্থা যে কী শোচনীয় তা কল্পনা করা যেতে পারে, কেননা, সে একে অপরা তাতে আবার চণ্ডালের অঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। নদীর তীরে যেখানে কৌশল্যার দেহের শেষকৃত্য হয়েছে সেইখানে সেই পঞ্চম বর্ষীয় শিশু একলা বসে মা মা করে অঝোরে কাঁদতে থাকে। নির্ভর সংসারে তার এমন কেউ নেই যে তাকে সেই শ্রাণ থেকে তুলে নিয়ে যায়। এমনি করে ছ'দিন কেটে যায়। এতদিনে বোধ করি বিধাতা কক্কের প্রতি প্রসন্ন হন। ঐ গ্রামেরই দূরপল্লীর এক সদাশয় ব্রাহ্মণ দৈবক্রমে ঐ পথ দিয়ে কোথায় চলছিলেন। তাঁর নাম গর্গ। তিনি দেখতে পান জনহীন নদীতীরে শ্রাণানে একটি সুদর্শন স্নকুমার বালক অনাহারে শীর্ণ অবসন্ন ক্লান্ত ভাবে একলাটি রোদন করচে। তিনি একটুও অপেক্ষা কিংবা ইতস্ততঃ না করে কক্কর হাত ধরে তুলে তাঁর উত্তরীয় দিয়ে রোদ্রে শুকিয়ে পড়া ফুলের মত তার সুন্দর মুখখানি মুছিয়ে দিয়ে সজ্জ করে বাঁড়ী নিয়ে গেলেন। তাঁর পত্নী গায়ত্রী খুসী মনেই এই শিশুটিকে কোলে টেনে নেন এবং সহজেই তাকে নিজের ছেলের মতোই আপন করে নেন। গায়ত্রী আদর করে কক্কর নাম রাখেন গোপাল—এবং মা যশোদার মতো কক্ককে লালন পালন করতে থাকেন। এঁদের একটি মাত্র ছ'তিন বৎসরের ছললী মেয়ে ছিল; তার নাম ছিল লীলা। কক্ক হয় তার খেলার সঙ্গী। এই স্নেহশীল ব্রাহ্মণ দম্পতীর নিকট পুত্রের মতো এবং লীলাকে খেলার সাথী পেয়ে কক্কর শিশু হৃদয়ে আর কোন অভাব থাকে না। পরমানন্দে তার দিন কাটতে থাকে—

(তার পালক মা-বাপ) কৌশল্যা মুরলীর কথা ক্রমে স্মরণ হয়ে আসে তার মনে।

কঙ্কর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাবের সৌন্দর্য্য বিকশিত হ'তে আর তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পেতে থাকে। স্ততরাং ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত গর্গ তাকে লেখাপড়া শেখাতে যত্নবান হন— শুভদিনে তার হাতে খড়ি দেন।

পুরাকালের মুনি ঋষিদের আশ্রমের মতো গ্রামের এক প্রান্তে নদীতীরে গর্গের কুটীরখানি ছিল শান্তির নিলয়। গর্গ নিজের পড়াশুনা আর তাঁর টোলের ছাত্রদের পড়ানোর কাজ নিয়ে ডুবে থাকেন। শিষ্যেরা আসে তাঁর কাছে নানা শাস্ত্রের পাঠ নিতে। কঙ্কও কঁক পেলেই গর্গের কাছে গিয়ে লেখাপড়া শিখে। সুরভি নামে তাঁদের যে গাভীটি ছিল সকাল বেলা তাকে নিয়ে যায় মাঠে চরাতে এবং বৃন্দাবনের 'গোপালের' মতোই মধুর স্বরে বাঁশী বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে। এমনি করে পরম নিশ্চিন্তে তার দিন যায়।

কিন্তু কঙ্কর এমনি কুক্ষণে জন্ম যে একটানা সুখ বেশীদিন তার ভাগ্যে সয় না। কঙ্কর বয়স যখন বছর দশেক তখন গায়ত্রী দেবী বসন্ত রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। এই দ্বিতীয়বার কঙ্ক মাতৃহীন হয়, তবে এবারে এইটুকু ভাগ্য যে গর্গ পত্নীশোকে তাঁর অহুগামী না হয়ে পৃথিবীতেই রয়ে যান। সাত বছরের মেয়ে লীলা মাকে হারিয়ে একেবারে কাতর হয়ে পড়ে। কোমল হৃদয় কঙ্ক নিজের দুঃখ থেকে লীলার দুঃখ অনুভব করে। সে বন থেকে সুন্দর সুন্দর ফুল, সুমিষ্ট ফল এনে লীলাকে দেয়। সন্ধ্যা বেলায় রূপকথা শুনিয়ে, বাঁশী বাজিয়ে লীলাকে খুসী করতে চেষ্টা করে। লীলাকে খুসী করাই তার হয় একমাত্র কাজ। লীলা ও কঙ্কর স্নেহ ও আদরে তার অহুগত হয়ে পড়ে। কঙ্ককে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে চায় না। কঙ্কর বাড়ী ফিরতে দেবী হলে সে অস্থির হয়ে ওঠে। দুজনই দুজনকে না দেখে থাকতে পারে না। এমনি করে তাদের বাল্যের অবসান হয়।

তারপর আসে তাদের কৈশোর। তখন তাদের বাল্যের স্নেহ কৈশোরে পরিণত হয়। কঙ্ক যে তার শৈশবে চণ্ডালের ঘরে পালিত হয়েছে সে কথা তার অজানা নেই। যখন বয়সের সঙ্গে তার বুদ্ধি বাড়ে তখন লীলার সঙ্গে তার সামাজিক ব্যবধান অনুভব করতে থাকে এবং লীলার সঙ্গে তার মিলন যে

অসম্ভব এটা সে বুঝে নেয় তার মনে মনে। তাই লীলার সঙ্গে যে ঘটনা সম্ভব এড়িয়ে চলতে থাকে। উদার হৃদয় ব্রাহ্মণ গর্গের—তার নিরাশ্রয় শৈশবের আশ্রয়দাতার, যিনি পিতার মত স্নেহে যত্নে তাকে পালন করেছেন তাঁর কোন সামাজিক অমর্যাদা ও মনোকষ্টের কারণে সে কিছুতেই হবে না, এই তার দৃঢ় সংকল্প।

সে বিদ্যার্জনে দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে যায় এবং অল্পকালের মধ্যে সে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে ওঠে। কঙ্কর নিজের মধ্যে ছিল কবিত্ব শক্তি, সেটাকে সে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে থাকে এবং তাতেও সফল হয়। চারিদিকে তার কবিত্বের খ্যাতি পড়ে ছড়িয়ে।

লীলা কঙ্কর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সে দেখে কঙ্কর জীবনের ধারা গেছে বদলে। লীলা আর যেন তার নাগালই পায় না। তার দিন আর কাটতে চায় না। বাপের সেবা যত্ন করাই ছিল তার প্রধান কাজ, সেই কাজে সে আরো বেশী করে মন দেয়—কিন্তু মন তার ব্যাকুল হয়ে থাকে কঙ্কর জন্তে—তাকে তার সকল কথা বলা যে চাই। কিন্তু কঙ্কর দেখা ত তার মেলে না। শেষে সে মনে মনে স্থির করে, তাদের এ প্রণয়কে ব্যর্থ হতে দেবে না সে। মানবে না সে সমাজের বাধা—কঙ্কর জন্ত প্রতীক্ষা করে থাকবে চিরদিন। তাই তার সুকুমার হৃদয়ে পূজার ফুলের মত তার এই পবিত্র প্রেমকে সযত্নে রক্ষা করতে থাকে। কাউকেই তার মনের কথা জানতে দেয় না।

গর্গ আছেন তাঁর পুঁথি পত্র-ছাত্র নিয়ে। কঙ্ক আছে তার শাস্ত্র ও কাব্য চর্চা নিয়ে, বোচারা লীলার আছে কেবল বাল্যকালের মুক সঙ্গী সুরভি। এমনি করে দিন কেটে যায়।

তারপর একদিন কঙ্কর কবিত্বের খ্যাতি গর্গের কাণে পৌছে। তাঁর আনন্দ আর ধরে না। যাকে পুস্তকিক স্নেহে লালন পালন করে, বড় করে তুলেছেন তার গৌরবে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। তার মত বিনীত, বিখ্যাত, শিক্ষিত ভদ্র যুবককে ব্রাহ্মণ বলে সমাজে গ্রহণ করবার জন্তে তিনি ব্রাহ্মণদের কাছে প্রস্তাব করলেন। তিনি তাঁদের বলেন যে কঙ্ক ব্রাহ্মণের ছেলে। ভাগ্য বিড়ম্বনায় অতি শৈশবে চণ্ডালের ঘরে কিছুদিন মাহুষ হয়েছে; স্ততরাং তাকে ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত

করাই বিধি সম্বত। কিন্তু গর্গের মত উদার হৃদয় ও বহু শাস্ত্রে পণ্ডিত তো-আর সবাই নয়। কাজেই এক তুমুল বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। তারা সকলে বলতে থাকে গর্গ কঙ্ককে ব্রাহ্মণ বলে গ্রহণ করতে পারেন—কিন্তু সমাজকে ছেড়ে। তারা যুক্তি দেখায়—ফুল মাটিতে পড়লে সেই-ফুলে কি আর দেবতার পূজো হয়? এমনি কত কি বলে কুতর্ক করতে থাকে। তারা এমন কথাও জানায় যে চণ্ডালের অন্ন যে গ্রহণ করেছে তাকে ব্রাহ্মণ বলে যিনি স্বীকার করেন তিনিও ব্রাহ্মণ নন। কিন্তু নির্ভীক গর্গ কারো কোনো কথাতেই কণপাত করেন না। কঙ্ককে তিনি ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেন। গর্গের অসামান্য প্রতিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ বিচার শক্তিতে তর্কে পরাস্ত হয়ে কেউ-কেউ তাঁর মতে সায় দেয় বটে, কিন্তু শেষে তারা গোঁড়াদের দলেই যোগ দেয় ও কঙ্কের যাতে সর্বনাশ হয় সেই ফন্দি আঁটতে থাকে।

আগেই বলেছি, কঙ্কের মনটা ছিল উদার। কোন ধর্মের প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল না। সকলের সঙ্গেই সে মিশত। একবার তাদের গ্রামে এক মুসলমান ফকির আসে। সে কঙ্কর বাঁশী শুনে মুগ্ধ হয়, আর কঙ্কও এই ফকিরের ব্যবহারে আকৃষ্ট হয় এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। তারা সর্বদা এক সঙ্গেই বিচরণ করতে থাকে। গ্রামের গোঁড়ার দল সুযোগ বুঝে এই ফকিরের সঙ্গে কঙ্কের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়ে পাড়ায় রাষ্ট্র করে যে কঙ্ক মুসলমান হয়েছে। কঙ্ক তাতে একটুও বিচলিত হয় না। তবে গর্গ এই সংবাদ পেয়ে প্রমাদ গণেন। এই ছুঁট রচনা করেই গোঁড়ার দল নিরস্ত হয় না। তারা চরম অস্ত্র প্রয়োগ করতে একটুও সংকোচ বোধ করে না। কঙ্ক ও লীলার সম্বন্ধে কুৎসিৎ ইঙ্গিত ক'রে তাদের ইতর-মনের জ্বালা মেটায়।

এতদিনে, সরল হৃদয় গর্গ ছুঁট লোকের চক্রান্তে পড়ে নিজের হিতাহিত জ্ঞান হারান। নির্বাক মৌন হয়ে থাকেন, কার সঙ্গে কোন কথা বলেন না; হুদিন পাগলের মত ঘুরে বেড়ান এবং মনে মনে সংকল্প আঁটেন যে কঙ্ক ও লীলার প্রাণনাশ করে পরে নিজে আত্মহত্যা করে তাঁর সকল জ্বালা জুড়োবেন।

পিতার এই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে লীলা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়—কোন কথা তাঁকে সাহস ক'রে জিজ্ঞেস করতে

পারে না। একদিন গর্গ লীলাকে নদী থেকে জল আনতে বলেন। লীলা তক্ষুনি কলসী নিয়ে জল আনতে বেরোয়। হঠাৎ লীলা পিছন থেকে পিতার কঠোর তীক্ষ্ণ আঁহানে চমকে উঠে—তিনি মেয়েকে জল আনতে বারণ করেন। লীলা কিছুই বুঝতে পারে না, সে ফিরে আসে। তারপর গর্গ নিজেই নদী থেকে জল নিয়ে আসেন;—নিজহাতে ঠাকুর ঘর ধুয়ে মুছে, মেয়ের তোলা ফুল দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে পূজায় বসেন।

লীলা অপেক্ষা ক'রে আছে অন্তদিনের মত পূজো হয়ে গেলে গর্গ লীলাকে ডাক দেবেন। আর লীলা সামনে বসে পিতাকে খাওয়াবে। কিন্তু আজ লীলা দেখে, গর্গ ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে একটা কোটো খুলে কি-একটা জিনিস কঙ্কর ভাতে মিশিয়ে রেখে অনাহারেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। এই দেখে লীলা ভয়ে কাঁঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কঙ্ক স্বান ক'রে খেতে আসে। লীলা তখন কঙ্কর ভাত সামনে নিয়ে বসে নীরবে কাঁদছে। কঙ্ক তো এই বাপার দেখে অবাক। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। লীলার চোখে জল দেখে তার চিত্ত বিচলিত হয়ে ওঠে। সে বার বার ক'রে লীলার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে। লীলার মুখে কোন কথা সরে না—যেন তার বাকবোধ হয়েছে।

তার কোন অপরাধ হয়েছে কি না জানাবার জন্য কঙ্ক লীলার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাতে থাকে। শেষে, অনেক অমুনয়ের পর লীলা কঙ্ককে তার পিতার আচরণের কথা বলে।

শাস্ত-সংঘত ভাবে কঙ্ক সকল কথা শোনে এবং গর্গের ক্রোধের কারণও বুঝতে তার বাকী থাকে না। তখনই সে লীলাকে বলে, “পিতা ছুঁট লোকের কথায় এই কাজ করেছেন। তিনি মহাপুরুষ, দেবতুল্য, তাঁর পক্ষে এ কাজ অসম্ভব।” সে আরও বলে যে, কিছুদিন পরেই তাঁর এ ভুল ভেঙ্গে যাবে। স্মরণে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞাসমুহু হ'লে চলবে না। তারপর সে লীলাকে বলে যে এখন সে কিছু দিনের মতো দেশ ভ্রমণে যাবে, গর্গের রাগ পড়লে আবার ফিরে আসবে। লীলা তখন তার কথায় শাস্ত হয় এবং বলে সেও কঙ্ককে এই কথাই বলতে চেয়েছিল।

কঙ্ক যাবার আগে লীলাকে বারবার করে জানায় যে সে যেন তার পিতার উপর কোন রকম অবিচার না করে। পিতা

যদি কোন অজ্ঞায় আচরণও করেন তা'হলেও পিতার উপর
অভিমান বশতঃ যেন কোন রকমে তাঁর প্রাণে ব্যথা না দেয়।

কারণ কঙ্ক বোঝে যে গর্গ তাঁদের উপর কোনমতেই বেশিদিন
রাগ করে থাকতে পারবেন না। তা ছাড়া, সে জানত যে
তাঁদের দিক থেকে কোন অপরাধ হয়নি।

তারপর বিদায়ের সময় আসে। কঙ্কর আশৈশবের সুখ-
শান্তির নীড় গর্গের এই গৃহ ছেড়ে চলে যেতে হবে। মনে
পড়ে তার একে একে সেই সব পুরানো দিনের কথা—স্মৃতির
জন্তু তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। তার যেন কোন অবস্থা না হয়
সে সম্বন্ধে সে লীলাকে বার বার ব'লে দেয়। এই কুটীরের
প্রত্যেকটি জিনিষের সঙ্গে প্রত্যেকটি ভরলতার সঙ্গে তার যে
অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে, বিদায়ের মুহূর্তে সে প্রাণে প্রাণে তাঁর
টান বুঝতে পারে। আর যাব জন্তু সে সকল সুখ বিসর্জন
দিতে পারে সেই লীলাকে সে আর চোখের দেখাও দেখতে
পাবে না। যাবার সময় লীলাকে শুধু বলে, সে যেন কঙ্ককে
অভাগা বলে মনে রাখে।

কঙ্ক চলে গেলে লীলা পড়ে থাকে তার ঘরে, দীর্ঘ বিনিদ্র
রাত্রি সে কাটিয়ে দেয় চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। পরদিন
সকালে পাগলের মত ফিরে আসেন গর্গ। মনে তাঁর দৃঢ়
সঙ্কল্প মেয়েকে আর এ জগতে থাকতে দেবেন না। কিন্তু
বাড়ীর চেহারা দেখে গর্গ শিউরে উঠেন। তাঁর মনে হয়
যেন কতদিন এ বাড়ীতে কেউ পা দেয় নি। তাঁকে আসতে
দেখে স্মৃতি কাতরে ডাকতে থাকে।

বাড়ীর এই ক্রীতদাস দশা দেখে তাঁর সঙ্কল্প শিথিল হ'য়ে
পড়ে। মেয়ের দিকে তিনি চাইতে পারেন না। শেষে মন
স্থির করবার জন্তে বসেন গিয়ে তাঁর পূজোর জায়গাটিতে।
কঙ্কর কথাই সত্যি হয়। তিনি আশু আশু বুঝতে পারেন
যে কঙ্ক ও লীলা নির্দোষ, নিষ্পাপ। আর যাকে পুত্রাধিক
স্নেহে মাছুষ করেছিলেন সেই কঙ্ককে তিনি হত্যা করেছেন
মনে ক'রে নিজের ও তারই সঙ্গী হবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু
তিনি পরে জানতে পারেন যে সব ন্যাশ এখনও হয়নি—

কঙ্ক এখনও জীবিত আছে। তাই আবার পাগলের মত
বেরিয়ে পড়েন কঙ্ককে খুঁজতে—কিন্তু কোথাও পান না
তাকে। কেউই তার সন্ধান দিতে পারে না। ফিরে আসেন
বাড়ীতে। তারপর তাঁর ছুটি অনুগত ছাত্রকে ডেকে কাতরে
অনুরোধ করেন কঙ্ককে খুঁজে ফিরিয়ে আনতে। তারা দুজন
সাধ্যমত খোঁজ করে নানা স্থানে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।
গর্গ তাঁদের একলা ফিরতে দেখে হাহাকার করে ওঠেন, আর
লীলা শয্যা গ্রহণ করে। গর্গ তখন আরেকবার তাঁদের
অনুরোধ বিনয় করে ডেকে পাঠান। কঙ্কর উপর তাঁর যে
এতটুকুও অবিশ্বাস নেই, কঙ্ক ছাড়া তাঁর গৃহ যে অরণ্য সমান
হয়েছে এই সব তারা যেন কঙ্ককে বুঝিয়ে বলে। তাঁর নিজের
দিনও যে শেষ হয়ে এসেছে একথাও যেন তারা বলতে না
ভোলে—সে কথা বারবার করে বলে দেন। আবার তারা
কঙ্কর খোঁজে বেরোয়।

এদিকে জনরব শোনা যায় যে কঙ্ক আর বেঁচে নেই,
দৈবদ্রুতপাকে জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে। যে দুজন তার
খোঁজে বেরিয়েছিল তারাও সেই একই খবর পায়। স্মরণ
আর বুখা সময় নষ্ট না করে তারা গ্রামে ফিরে আসে; কিন্তু
কেউ সাহস পায়না গর্গের সঙ্গে দেখা করতে। বাহোক,
যখন গর্গকে সব কথা জানায় তখন তিনি বজ্রাহতের মত বসে
পড়েন। তাঁর হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে যায়। লীলাও ঘরের
ভিতর থেকে এই সংবাদ শুনতে পায়। এ আঘাত সে আর
সহ্যে পারে না। তার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হয়।

এমনি করে অনুদার সমাজের নিষ্ঠুরতার অকালে দুটি
নির্মল শূন্য জীবনের সমাপ্তি হয়।

‘কান্ত’ কবির ভাষায় তাদের সম্বন্ধে বলা যায়—

“ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে।

মরমে মরে গেল মুকুলে ঝরে গেল

প্রাণ ভরা আশা সমাধি-পাশে।” *

* কলিকাতা অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে কথিত।

হিন্দ পতন

ত্রিবেণী লাহিড়ী

আজ কয়েকদিন হলো যুথীর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। বিকেল বেলায় দিকে সে তাদের বাগানের একটি মাধবীলতার কুঞ্জে বসেছিল। ক্রান্ত শরীরের সাথে তার মনটাও হয়ে উঠেছিল শ্রান্ত। আজ বাঙ্কবী শুক্রার বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল কারণ তার দাদা শীগগির বিলেত চলে যাবে বলে তারা আজ এই আয়োজন করেছেন। কিন্তু যুথী সেটা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কী তার এ সব সমাজে চলাফেরা করতে ভাল লাগত না। সেই বন্ধ ড্রয়িং রুমের মধ্যে বসে ছোট্ট সিনেমা ও ফ্যাশানের গল্প করে স্বন্দর বিকেল আর সন্ধ্যাগুলো কাটিয়ে দিতে তার মন যেন কেমন করে উঠতো। তার চেয়ে এই উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে ছদও কাটিয়ে দিলে শরীর ও মন দুই-ই তাজা থাকে। তার অবস্থা অনেক বন্ধুই ‘সোসাইটি বাটারগ্লাই’ নামে অভিহিত ছিল কিন্তু যুথীর আজ মনে হচ্ছিল তার এসব কৃত্রিমতার কোন প্রয়োজন নাই। ছ’ বছর ধরে সে এই আবহাওয়ার মধ্যে ইঁপিয়ে উঠেছে, এবার সে একটু মুক্তি চায়।

একটু পরে যুথীর বাবা মিঃ রায় একটি মোটা সিগার নিয়ে মেয়ের পাশে এসে বসলেন। তিনি রোজই এমনি সন্ধ্যার সময় বাগানে এসে বসেন, তাই তাঁর বসবার জায়গা আগের থেকেই ঠিক ছিলো। মুখের থেকে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি কতটুকু প্রশংসা করলেন—“রাণু, খোকন ওদের যে আজ পাশের বাড়ীতে কে একজন গান গাইতে আসবেন। পাড়ার সব ছোট ছেলেমেয়েরা গেছে, সকাল থেকে বায়না ধরেছে যাব, তাই জন্তে মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মিঃ রায় আবার বলেন “কিন্তু তোমারও তো একজায়গায় নেমতন্ন ছিল, গেলে না ত মা?” যুথী একটু অধীর হয়ে বলেন, “না বাবা থাক আজ আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু তুমি আমার শিলং যাবার কবে ব্যবস্থা করছ? মাসীমার তো চিঠির পর চিঠি আসছে, তুমি বোধ হয় দেখনি, আজও একখানা এসেছে।” মিঃ রায় একটু চিন্তা করে বলেন “পরীক্ষার পর কোনও চেঞ্জ

গেলে শরীর অবস্থা ভাল হয়, কিন্তু এ সপ্তাহে তোমাকে এক জায়গার থেকে যে দেখতে আসার কথা আছে। এইমাত্র তোমার মায়ের সাথে এই কথাই হচ্ছিল, তিনিও এফকনি আসছেন এখানে।” এই দেখতে আসাটা যে কি সে কথা যুথী খুব ভাল করেই জানতো। এতে যে অন্তরটা একটু বিদ্রোহী হয়ে না উঠলো তা নয়, কিন্তু বাঙ্কবী হিন্দু ঘরে জন্মে সে বিদ্রোহ প্রকাশ করে কোনও লাভ হবে না। প্রকাশ্যে সে কোনও কথা না বলে চুপ করে রইলো। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মিঃ রায় বলেন—“অবশ্য দেখতে এলেই যে বিয়ে হয়ে যাবে এমন তো কোনও কথা নেই, তবে ওদের যখন কথা দেওয়া হয়েছে—” তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন—“সে তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে বাবা, তবে তোমার একটা কথা বলব, বিয়ের নামে ঐ যে বাচাই করা—ওটা আমার একটুও ভালো লাগে না বাবা, ওতে কি মনে হয় জানো? আমরা যেন ঠিক ‘শো’ কেশের পুতুল। মিঃ রায় বলেন—“সে কথা ঠিক মা। আমিও তোমাদের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু আমাদের সমাজে এমন অনেক জিনিস শিকড় গেড়ে বসে গেছে, যে সেগুলিকে তুলে ফেলা ভীষণ কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এর পরিবর্তে যখন ভাল প্রথা দেখা যাচ্ছে না তখন বর্তমানে এটাকেই কি মেনে নেওয়া উচিত নয়?” যুথী বুঝলে একথা, আরও বুঝলে যে সমাজে বাস করে, সামাজিক বিকলচরণ করে কোনও লাভ নেই। আচ্ছা ও যদি এখন বিদ্রোহ করে বলে না, সে বাজারের ক্রেতার সামনে পুতুলের মত গিয়ে বসতে পারবে না—তা’হলে কি হবে? সে কি এ বিদ্রোহে জয়লাভ করবে? না-না এতে পিতামাতা ভয়ানক কষ্ট পাবেন। বিদ্রোহ করার শক্তি আছে, সাহস নেই। ভাবছি একটু সাহস থাকলে বোধ হয় ভাল হ’তো কারণ সমাজের তাতে বোধ হয় একটু চেতনা হত। মনের মধ্যে অনেক কথা জড়পাকিয়ে উঠছিল কিন্তু সেগুলিকে ভাল করে প্রকাশ করার পূর্বেই তার মা এসে বসলেন সন্ধ্যার

আঁধার তখন বেশ ভালভাবেই বনিযে এসেছিল। বাবা মা আবার যখন সেই বিয়ের কথা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলেন তখন যুথী ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল।

কয়েকদিন পরে যুথীকে দেখতে বরানগর থেকে সত্যি কয়েকজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। ভোর না হ'তেই যুথার মা অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যুথী ভাবলে প্রতি-দিন প্রভাত হয় এবং মানুষও তার সাথে সাথে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হয় কারণ এ রকম পরীক্ষার সম্মুখীন তার জীবনে কখনও হতে হয় নি। অবশ্য এ পরীক্ষার যদি সে জয়লাভ করে তবে সে জয়ের আনন্দের অধিকারী তার বাবা ও মা। রূপের দিক দিয়ে যুথীকে অপছন্দ করার মত কিছুই নয় যদিও একথা সকলেই জানেন যে রূপের কাছে রূপের মূল্য নিতান্তই কম। ভদ্রলোকেরা যুথীকে কয়েকটি মামুলি প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা মা, তুমি কি লেখাপড়া কিছু করেছ?” যুথী উত্তরে বললে যে সে এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। “বি-এ পরীক্ষা দিয়েছ?” ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল তিনি যেন কিছু বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর আগের উৎসাহ যেন কমে এল, একটু ইতস্ততঃ করে বললেন— “তা আমাদের ঘরে এত লেখাপড়ার কি প্রয়োজন? অবশ্য তোমরা যদি মানিয়ে নিয়ে ঘর করতে পার, তবে সেটা তোমার পক্ষেই গৌরব।” এবার যুথীর বাবা মিঃ রায় বললেন— “হ্যাঁ বি-এ এম-এ পাশ করলেই যে ঘর করতে পারবে না, এ একটা মস্ত ভুল ধারণা। যদি সেখানে যেমন তেমন করে মানিয়ে নিয়ে ঘর করতে না পারবে তবে আর প্রকৃত শিক্ষার সার্থকতা কি রইল?” এবার একজন বলে উঠলেন “হ্যাঁ এই ঠিক বলেছেন, পুঁথিগত বিদ্যাই তো আর আসল বিদ্যা নয়—তার সাথে চাই সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করা।” যুথীর একলা ঘরের মধ্য থেকে এসব কচুকি আর ভাল লাগছিল না। জিনিষ যাগাই করতে এসেছ, জিনিষ যাচাই কর, অত বক্তৃতায় কি প্রয়োজন? এটা তো আর কলেজ নয়? তাদের হয়তো পরীক্ষা করার আরও ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পাশ করা মেয়ে জেনে পেছিয়ে গেলেন। যা হোক কিছুক্ষণ পরে যুথীকে সে যাত্রার মত মুক্তি দেওয়া হ'লো।

এর কয়েকদিন পর মিঃ রায় অফিস থেকে ফিরে এলে যুথীর মা জিজ্ঞেস করলেন— “হ্যাঁ গো, তারা কি কিছু খবর

দিলে?” মিঃ রায় টাই খুলতে খুলতে বললেন “হ্যাঁ দিয়েছে ওখানে বিয়ে হবে না।” ব্যস্ত হয়ে যুথীর মা বললেন “কেন মেয়ে পছন্দ হ'লোনা না কি?” তাঁকে খামিয়ে দিয়ে মিঃ রায় বললেন— “আরে না গো না; ওরা বলেছে মেয়েটি আমাদের পছন্দ হয়েছে, কিন্তু বি, এ, পাশ মেয়ে আমরা আনতে পারব না।” যুথার মা স্বামীর কোট হ্যান্ডারে রাখতে রাখতে আশ্চর্য্যে বললেন— “বল কি, মেয়ে এখনও পাশ করে নি, তারপর ভদ্রলোক নিজে লেখাপড়া শিখে কি করে এমন কথা বললেন আর সব চেয়ে বড় এই যে ছেলে তো মুখ নয়, সেও লেখাপড়া শিখে চাকরী করছে।” মিঃ রায় হেসে বললেন— “আরে ছেলের মতামতের কি মূল্য আছে!—আব কোনও বিষয়ে না হলেও এই একটা বিষয়ে তারা যে বাপের হাতের পুতুল।” যুথীর মা আর কোনও প্রশ্নের উত্থাপন না করে ধীরে ধীরে নিজের কাজে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি একটু হুঃখিত হয়েছেন। আর মিঃ রায় কন্ঠার ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেলেন। যুথীও সমস্ত কথা শুনলে কিন্তু সে নিজে নিরুপায়। এর পরেও তার অনেক বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল কিন্তু সকলেই একটা না একটা আপত্তি তুলতে লাগলেন; কেউ হয়তো অনেক টাকার দাবী করেন, অথচ ছেলে হয় তো এমন কিছুই নয়, আবার কেউ হয়তো আসল অস্ত্র ছুঁড়ে বলেন— “না পাশ করা মেয়ে আনবো না।” ইত্যাদি। বিয়ের বাজারে তাদের পাশ করা মেয়ে যে এমন বিপদ হয়ে দাঁড়াবে সে কথা কি যুথীর বাবা মা স্বপ্নেও ভেবেছিলেন? যাক সে সব কথা।

সেদিন যুথীর মনটা মোটেই ভাল ছিল না। তার বহু দিনের এক পুরানো বন্ধু পাঞ্জাবে থাকতে আজ সকালে খবর এসেছে সে মারা গেছে। রাজি সাতটা বাজতেই সে নিজের ঘরে শুয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জেলে একটি উপস্থাসে মন দিতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বই আর পড়া হলো না—মত মঞ্জুর চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে সে আলোটা নিভিয়ে দিলে। ঠিক সেই সময় সে শুনতে পেল খুব সুন্দর অথচ করুণ এক বাঁশীর সুর। এই সুর-শিল্পী যে কে সে কথা খুব ভালো করেই জান্তো। অদ্যধারণ তার বাঁশী বাজাবার ক্ষমতা। সে তন্ময় হয়ে শিল্পীর বাঁশী শুনতে

লাগল। কোথায় গেল তার মৃত বান্ধবীর চিন্তা, আর কোথায় গেল কি! যুথী ভাবলে,—না : নিজে নিজে বাজিয়ে কোনও সুখ নেই। যতক্ষণ না একজনকে শোনান যায় ততক্ষণ যেন বাজনার কোনও সার্থকতাই থাকে না। কিন্তু ঐ ছেলেটির মন কি স্বপ্নেও জানে যে এই কোলাহল মুখরিত মহানগরীর একজন অতি ক্ষুদ্রতম মানুষ তার সুর-ঝঙ্কার রোজ শোনে, ও মুগ্ধ হয়ে মনে মনে তার প্রশংসা করে? বাম্ বাম্ করে কিসের শব্দ হ'তে যুথী চেয়ে বসলো শিল্পী এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। স্মিতবাক্যে সে বললে—“আমার বাঁশীর যে তুমি একজন মস্ত বড় সমঝদার সে কথা আমি খুব ভাল করেই জানি আর সেইজন্যই তো বাঁশী বাজাই।” যুথীও মধুর হেসে বললে—“সত্যি, তোমার মত বাঁশী কেউই বাজাতে পারে না। তুমি যে সুরের বর্ণা তোল তার থেকেই বোঝা যায় যে তুমি সকলকার থেকে আলাদা।” শিল্পী হাতের বাঁশীটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে—“কিন্তু আমি যখন বাঁশী বাজাই তখন কি মনে হয় জানো? যুথী ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে জানে না। শিল্পী বললে—“তখন আমার মনে হয় তুমি যদি এর সাথে গান কর, তাহ'লে আমার বাঁশী বাজান সার্থক হয়। তোমার গানও যে আমি শুনতে পাই। তোমার কণ্ঠে বায়োঙ্কোপের অতি খার্ড ক্লাশ গানগুলোও স্বন্দর হয়ে উঠে।” সলজ্জ হেসে যুথী বললে—“ও সব আশা, কল্পনা করেই স্নখ—শিল্পী বাস্তবে কি আর সে দেখা যায়? কত মেয়ে কত গান বাজনা, কত লেখাপড়া শেখে সকলে কি আর ঠিক সেই রকমের হাতে পড়ে? ক'টা সংসারে তুমি সেটা দেখতে পাবে?” শিল্পী একটু চিন্তা করে বললে—“তা সত্যি।” তারপর একটু ছুঁছুঁমীর হাঁসি হেসে বললে—“কিন্তু ভয় নেই যুথিরানী। তোমার মাকে বলে দেব, এমন লোকের সাথে বিয়ে দিতে যে তোমার গুণের আদর করবে—এই সময় যুথীর তক্তার ঘোরটা কেটে গেল, পাশের ঘরে মা ও বাবা কথা বলছেন। যুথী স্পষ্ট শুনলে, মা বলছেন—“তা এখন কি হবে বল? তুমি বলছ যুথীর সাথে বেমানান হবে। মিঃ রায় একটু অধীর হয়ে বলেন—“তুমি কেবল পরসার দিকটাই দেখছ, অথচ ছেলেটা যে তেমন লেখাপড়া জানে না, এদিকে যুথী চায় যে লেখাপড়া জানা, এককথায় শিক্ষিত লোকের সাথে ওর বিয়ে হোক।” মা

বলেন—“কিন্তু ছেলে যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এই ছেলেই কি ভাল নয়? আর আজকালকার বাজারে ডিগ্রীর মূল্য কি? তুমি কোথায় মেয়েকে এসব কথা বোঝাবে না তুমিও ওর সাথে লাগছ। মেয়েরা একটু লেখাপড়া শিখলেই অমনি রলে থাকে কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎটা তো আমাদের দেখতে হবে?” মিঃ রায় আর কিছু বললেন না। মনে মনে ভাবলেন, তবুও শিক্ষিত যতটা শিক্ষার আদর করবে অশিক্ষিত কি আর ততটা করবে? প্রকাশ্যে বললেন—“কিন্তু আমার মনে হয়, এর কম হ'লে যেন বড় অমিল হয়; যাক্ সে কথা, কাল সকালেই তা'হলে ওদের সাথে কথাবার্তা ঠিক করি।” যুথীর মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—“হ্যাঁ তাই কর, আর দেবী করো না, যুথী যদি কিছু অমত করে সে ভার আমার ওপর, মেয়ের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।” তিনি চলে গেলেন খাবার ব্যবস্থা করতে।—এদিকে মিঃ রায় ভাবলেন—দেখা যাক্ কি হয়, বিয়েটা তো একটা লটারি গোছের—কার ভাগ্যে কখন কি ওঠে বলা যায় না।

তার কয়েকমাস পরের কথা বলছি। যুথীর সাথে কলকাতার বিখ্যাত “স্টীল মার্চ্যান্ট” অরুণ চৌধুরীর ছেলে বরুণ চৌধুরীর বিয়ে হয়ে গেছে। বরুণের বিদ্যার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে, তবে পাকা ব্যবসাদারের যেমন হওয়া উচিত সে অনেকটা সেই রকম গোছের। মা বাক্‌দেবীর কৃপা যে তার পরে এককণাও নেই, তারজ্ঞ তার কোনও দুঃখ নেই। কথা উঠলে সে গর্ক করে বলে “লক্ষ্মী” সরস্বতী কখনও এক জায়গায় থাকেন না।” বিছবী স্ত্রীর সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করলে বলে—“টাকার জ্ঞানই বাবা বিয়ে দিয়েছেন, নয়তো আমাদের ঘরে অত লেখাপড়ার কি প্রয়োজন?” সঙ্গে-সাথে মোসাহেব থাকে, তাদের মধ্যে কেহ হয়ত সায় দিয়ে বলে, “আর লেখাপড়া শিখেই বা কি? সেই তো হাঁড়ির কাণ ধরতে হবে ইত্যাদি।” পড়াশুনা ছিল বরুণের ছ' চোখের বিষ, যুথীকে যখনই সে কাগজ কলম নিয়ে দেখতো তখনই তার গা জলে উঠতো। যুথীর ছোটবেলার থেকে গল্প প্রবন্ধ লেখা অভ্যাস ছিল। স্বামী অপছন্দ করতেন বলে যখন তিনি বাড়ী থাকতেন না, তখন কাজগুলো সেবে নেবার চেষ্টা করতো।

সেদিন সকালবেলা যুথী চায়ের পদ শেষ করে কয়েক-

খানা শাড়ী ও ব্লাউস স্ট্রটকেসের মধ্যে গুছিয়ে নিচ্ছিল। কথা আছে, তার বাবা আজ অফিসের ফেরৎ তাকে তুলে নিয়ে যাবেন। মনের আনন্দে সে অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া একটি অতি পুরানো গান গুণ্ গুণ্ করে গাইছিল—

চুপে চুপে সুন্দর সে—

দূর হ'তে অগিমেষে, মোহ অঞ্জন পরাল এসে,

কি জানি কি রস আবশে।”

ক্রিং ক্রিং করে অফিস ঘরের টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। তার মিনিট পাঁচ পরেই বরুণ এসে ঘরে প্রবেশ করলো। একটু চড়া গলায় বলল—“এফুনি কোন এক কাগজের সম্পাদক তোমায় ডাকছিল। আমি বলে দিয়েছি; তুমি এখন ব্যস্ত আছ—” হাতের কাজ হাতে রেখে তার কথার মাঝেই যুথী-জিজ্ঞাসা করলে—“কোন কাগজের সম্পাদক কিছু নাম বললেন কি? বরুণ বলল—“নাঃ নাম ধাম অত শত জিজ্ঞেস করিনি—তবে কাগজটার নাম বুঝি ‘আরতি’। বললে আমাদের এখান থেকে একটা নূতন কাগজ বার হচ্ছে, মিসেস চৌধুরীকে বলবেন একটা ভাল গল্প লিখে রাখতে আমি আসছে সপ্তাহে গিয়ে নিয়ে আসব। ছোকরার সাহস দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। হুকুম জারি করার জায়গা পাননি যেন?”

যুথী স্বামীর মুখের ভাব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল আর কোন কথা জিজ্ঞেস করার তার প্রবৃত্তি রইল না। শুধু মনে মনে ভাবলে পৃথিবীতে ডিগ্রীটাই সব নয়, তার থেকে আরও অনেক মূল্যবান জিনিস আছে। এ লোকটা কি সে সব থেকেও বঞ্চিত? অথচ একেই নিয়ে তার সুদীর্ঘ জীবন পথে চলতে হবে। বরুণ আবার বললে—“তা তোমায় বলে দিচ্ছি, ওদের যদি অত দরকার থাকে তবে সেসব যেন চিঠি পত্তরে লেখে।” যুথী এবারও কোন বাদ প্রতিবাদ করলো না, ছোট ‘ড্রেসিং কেসটার’ মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পুরে নিতে লাগল। বরুণ যেমন এসেছিল, তেমনি চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে—“তা তুমি যাবে ত সন্ধ্যায়, এখন থেকে এত গোছ-গাছ করবার মানে?” চোখ না তুলে একটু উদাস ভাবে যুথী বলল—“কি করবো বল, আমাদের এসব কাজ তো আর চাকরে করতে পারে না, আমাদের নিজেরাই কর্তব্য হয়। আর তাছাড়া বাবা অফিসের ফেরত আসবেন, সেই ক্লাস্ত

অবস্থায় তাঁকে বেশীক্ষণ বসিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয় না। “বরুণ এ বিষয়ে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে চলে গেল।

আজ প্রায় দেড়মাস হ'লো বরুণের বাবা অরুণবাবু শরীর অসুস্থ হওয়ার জন্য হাওয়া বদলাতে পুরীতে বেড়াতে গেছেন। বরুণ বলেছিল বউকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য কিন্তু তিনি বলেছিলেন—“নাঃ বৌমা গেলে সংসার দেখবে কে? আর তাছাড়া আমি তো শিগ্গিরি ফিরে আসব।” সেদিন সন্ধ্যা বেলা—বরুণ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ‘এম্পায়ারে’ উদয় শঙ্করের নাচ দেখতে চলে গিয়েছিল। এবাড়ীর মেয়ে বউরা কখনও ‘সিনেমা’ বা থিয়েটার দেখে না—তাই বাড়ীর ছেলেরাই সকলে গিয়েছিল। সংসারের সমস্ত কাজ শেষ করে যুথী এসে নিজের ঘরের ‘ইজি চেয়ারে’ বসলে। শরীর মন দুই-ই ক্লান্ত। নীচের বাগানে অসংখ্য রকমের ফুল ফুটে উঠেছে তাদেরই গন্ধ বাতাসে ভেসে এসে তাকে মাতাল করে দিতে লাগলো পাশের ফ্ল্যাটটার থেকে মৃদুগুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। flatটা তার ঘরের এত কাছাকাছি যে ওদের ঘরের থেকে কথা বলে যুথীর ঘরের মধ্যে বসে সমস্ত শোনা যায়। সেদিন যে নূতন ভাড়াটেটা এল, তাদের মুহূর্ত্ত আলাপন যুথীর কাণে ভেসে আসতে লাগলো। ‘স্বামীটি’ অফিস থেকে এসে জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললে, আজ উদয়শঙ্করের দুটো টিকিট কিনে আনলাম বিকেলে তো আর যাওয়া হবে না, ৯টার শোতে গেলেই চলবে, কেমন?” বউটা তখন স্বামীর খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত ছিল, ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল—“সে ভালই করছে, এখন গেলে মর্টু বড় জ্বালাতন করতো। রাত্তির বেলা ঝিটার কাছে বেশ থাকবে।” স্বামী খেতে বসলেন, বউটা ‘টিপয়ের’ উপর সমস্ত খাবারগুলি সাজিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে একটা চেয়ারে বসলে। বলল—“জানো, আজকে আমার সেতারের মাষ্টার কি বলেছেন?” স্বামী বললেন “তুমি না বললে কি করে জানব বল?” বউটা একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলল—“উনি বলছিলেন এবার আমাকে সুরবাহার ধরাবেন, সেতারে নাকি আমার হাত ভালো হয়েছে।” স্বামীটি অত্যন্ত খুসী হয়ে বললেন—“সে তো খুব ভাল কথা, তা তুমি ঠুকে না হয় সুরবাহারটা বাজাতে দিও।” খাওয়া তখন শেষ হয়ে গিয়েছে, মর্টু তখন এসে বাবার কোলে চড়ে বসেছে। বউটা একটু ইতস্ততঃ করে বলল—“কিন্তু

আমার মনে হয় আমি যা শিখেছি সেই যথেষ্ট, আর—” তার কথায় বাধা দিয়ে মণ্টুর বাবা বলেন—“তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কবে।” তারপর মেয়েকে তিনি আদর করে বলেন—“তুমি যখন বড় হবে তখন খুব ভাল করে বাজনা বাজিয়ে আমায় শুনিয়ে, কেমন?” তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বউটা খুব ভাল করে জাতি যে তার স্বামী তার বাজনা শুনতে ভালবাসেন এবং তাঁরই উৎসাহে সে আজ পর্যন্ত গানবাজনার চর্চা রাখতে পেরেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে—মণ্টুকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে সে যা হবার হবে, এখন তুমি বারান্দায় বসবে এস, তোমাকে সেই সুরটা আমি শুনিয়ে দি।” মণ্টুকে ঝিয়ের কাছে দিয়ে তারা দু’জনে এসে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসলে। বউটা তার সেতারে একটা অতি সুন্দর পুরবী রাগিনীর বাক্সের তুললে। ভারী সুন্দর সুরটা। সন্ধ্যার স্নানালোকে নিজের ঘরে বসে যুথী সে সুর-

বাক্সের শব্দে লাগলো কিন্তু এয়ে তার অতি পরিচিত সুর!! কোথায় শুনেছে সে? স্থিতির খাতার পাতাগুলি সে একের পর এক উল্টে যেতে লাগল। ওঃ! এটা সে প্রায় সন্ধ্যার সময় বাজাত। যুথীর মনটা ছুটে চলে গেল সেই শত সহস্র স্থিতি বিজড়িত বাঁড়ীটাতে। আজ বেশী করে তার সেই স্বপ্নটির কথা মনে পড়তে লাগলো। আর তার সাথে তার বাবা মিঃ রায়ের “এ রকম হলে বড় অমিল হয়।” এই কথাটা কেবলই কাণে বাজতে লাগল। এ বাঁড়ীতে এসে সে কোনও দিন চোখের জল ফেলেনি, নিজেকে সে সব সময়ে সংযত করে রাখত। আজ কি জানি কেন তার চোখ দুটা অশ্রুসঞ্জল হয়ে উঠলো।

সমস্ত বাঁড়ীতে শব্দধ্বনি হয়ে সন্ধ্যার আগমন বাতী দিলে। সন্ধ্যার আলোকে যুথী দেখলে, বউটা তখনও ভাবে বিভোর হয়ে সেতার বাজিয়ে চলেছে আর স্বামীটির মুখে যেন ভগ্নমুখের ভাব।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় ১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে বঙ্গলক্ষ্মী সপ্তদশ বর্ষে পদাৰ্পণ করিয়াছে। ষোড়শ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা হইতে (বৈশাখ ১৩৪৮) ষাঁহারা বঙ্গলক্ষ্মীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রদত্ত বার্ষিক চাঁদা বর্তমান ১৩৪৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় শেষ হইয়া যাইবে। অতএব গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট বিনীত অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন অল্পগ্রহ করিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর বার্ষিক চাঁদা আগামী ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম সংখ্যার মধ্যে মনিঅর্ডার যোগে আমাদের আফিসে পাঠাইয়া বাধিত করেন। বঙ্গলক্ষ্মী চৈত্র সংখ্যা প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে যদি আমরা গ্রাহক গ্রাহিকাদের নিকট হইতে বার্ষিক চাঁদা বা তাহাদের কোন মতামত না পাই তাহা হইলে আমরা বুঝিয়া লইব যে ভিঃ পি করিয়া বঙ্গলক্ষ্মী পাঠাইলে সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকারা উহা গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। আশা করি সকলেই বার্ষিক চাঁদা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর বহল প্রচারে সাহায্য করিবেন।

কোন কারণবশতঃ কেহ ভিঃ পি গ্রহণে অনিচ্ছুক বা অক্ষম থাকিলে ১০ই বৈশাখের মধ্যে পত্র দ্বারা জানানইলে আমরা আর তাঁহাদের কাছে ভিঃ পি পাঠাইব না।

ভিঃ পিঃ গেলে উহা ফেরৎ দিয়া কেহ নারীমঙ্গল সমিতিতে অনর্থক ক্ষতিগ্রহ করিবেন না। ইতি—

২৩১ বালীগঞ্জ স্টেশন রোড
পোঃ বালীগঞ্জ
কলিকাতা

বিনীত
ম্যানেজার
বঙ্গলক্ষ্মী

ব্যথা :

ঐরাধিকানাথ সাহা কিশোরী

নখর দেহ ও মন লইয়া মানব জীবনের খেলা। কেহ না জানে ইহার পরিসমাপ্তি কোথায়। তবু মায়া—এত মায়া ঐ সূখ হুঃখ ভরা জীবনের উপর, যেন ধারণা করিতে পারা যায় না—ইহার পরিণতি—পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যাওয়ার কথা। দেহের যেমন অল্পভূতি মনের দ্বারা উপলব্ধি হয়—পরমাশ্রা যাহাকে আমরা প্রাণ বলি তাহার অল্পভূতিও বাহিরের আবরণ দেহ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। আত্মার অল্পভূতিই দেহে ক্রিয়া করে। নতুবা অন্তরে আঘাত পাইলে যে ব্যথা অনুভব করা যায় সে ব্যথায় দেহ অবসন্ন হয় কেন? মানব প্রকৃতিতে আন্তরিক অল্প আঘাতেই ব্যথা অনুভূত হয়। রক্ত মাংসে গড়া শরীরে অন্তঃকরণের অল্পভূতি আছে বলিয়াই আঘাতে ব্যথা লাগে—সে ব্যথা অন্তরেও বাজে। কাজেই দেখা যায় দেহ ও মনের পৃথক পৃথক ক্রিয়া থাকিলেও সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। শরীরে ব্যথা লাগে আঘাতে—যে ব্যথা লাগে আঘাতে—সে ব্যথা জ্বালাময় যন্ত্রণা। আর অন্তরে ব্যথা বাজে—কথায়, কাজে, অভাবে ও নৈরাশ্যে সে ব্যথা অব্যক্ত, অসহনীয়—ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। এই অন্তরের অর্থ খুঁজিয়া পাই শুধু মন, হৃদয় কিন্তু উহার স্বরূপের কোন নিদর্শন নাই। শুধু লোকে বলে অন্তর মানে মন, অন্তর মানে পরমাশ্রা কিন্তু ভাবিয়া পাই না কি সে জিনিষ, তাহার আকার কিরূপ? অথচ অনুভব করা যায় বুকের ভিতর যেন কিছু আছে—যাহার সহিত আমাদের পরিচয় হয়—যখন অন্তরে ব্যথা পাই অথবা উল্লাস লাগে।

জীবাত্মা শরীর আশ্রয় করে। সুতরাং শারীরিক আঘাতে অন্তরাশ্রা হাহাকার করিয়া উঠে। শুধু তাহাই নহে, শারীরিক আঘাত ছাড়াও অন্তর কঁাদে, ব্যথা পায়—সে ব্যথা বাজে অপ্রিয় কথায়; বাহিরে আঘাতের চিহ্ন নাই কিন্তু দেহান্তরে ক্ষত বিক্ষত, জর্জরিত হয়। ক্রমে অবসাদ আসে—অশ্রুর উৎস বন্ধ হয়—জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মে। আর ব্যথা বাজে—

অভাবের তাড়নায়—শেল সম সব রকমের অভাব—ধন, জন, রূপ ঐশ্বর্য। যখন যেন কোনদীর অভাব অনুভূত হয়, বুকের মাঝে অন্তর বলিয়া সে জিনিষ আছে—উহা হইতে দীর্ঘশ্বাস উত্থাপিত হয়। মর্ষ যাতনা প্রকাশ পায়। এই ব্যথার দীর্ঘ-শ্বাস বুকে যাহার নিরন্তর বিধিয়া থাকে তাহার আর আশা নাই, ভরসা নাই—যদি না সে প্রাণ ভরিয়া কঁাদিতে পায়—যদি না সে ব্যথার কথায়, অশ্রুর বন্যায় সমুদ্রখীকে ভাসাইতে পারে; কিন্তু সে কয়জন পারে—যে পারে সে অমরত্ব লাভ করে—স্বর্গের সন্ধান পায়।

অন্তরের ব্যথা, মনের হুঃখ—ভাষায় এতদূর্যের অর্থ একই প্রকার ধরিয়া লওয়া যায়। কারণ অন্তর মানে মন এবং হুঃখ মানে ব্যথা, বেদনা। কিন্তু অন্তর ও মনের পার্থক্য আমরা বুঝি না বা বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা বিশেষতঃ আমার নাই। কিন্তু ব্যথা ও হুঃখের অনুভূতি আমাদের আছে। তুলনা করিলে দেখা যায় হুঃখ ব্যথা অপেক্ষা লঘু। হুঃখ দূর হয় আর ব্যথার উপশম হয় কিন্তু স্থিতি পথে সর্বদা দীপ্যমান থাকে। যখনই কোন নূতন করিয়া অন্তরে ব্যথা বাজে তখনই পুরাতন ব্যথার স্থিতি হইতে বেদনার অনুভূতি দ্বিগুণিত ভাবে লাগে।

দ্বিতীয় ভাগে পড়িয়াছি “কটু বাক্য বলা অহুচিত” তখন তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। বাক্যটি কিন্তু আমার ধারণা সবারই মনে গাঁথা থাকে। কত শত উপদেশ বাক্য পড়া হয় সবগুলি কি মনে থাকে? যে বাক্যে বিশেষত্ব আছে সেইগুলিই কি শুধু মনে থাকে? মানব জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে হইলে মহাজন বাক্য গুলির সাহায্যে আমরা জীবন যাত্রার ভালমন্দ পথ খুঁজিয়া লইবার সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু মানব চরিত্র অনুশীলন করিলে দেখা যায়—ভিন্ন ভিন্ন রুচি লইয়া ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র পঠিত। কেহবা অপরকে কঁাদাইয়া নিজে সূখ অনুভব করে আর কেহবা কঁাদিয়াও অন্যকে সূখী করে। কটু কথা বলিলে প্রাণে ব্যথা বাজে—এ কথা বলিলে

প্রাণে ব্যথা বাজে—একথা সকলেই জানে, অনুভব করে তবু বলে। তাহারা জানে না সে কটু বাক্য প্রয়োগের কি পরিণাম! আঘাতের প্রতিবাদ আছে। ব্যথা দিলে ব্যথা পাওয়াই ভাগ্য নিয়ন্ত্রার বিধান। আজ হটক কাল হটক—একদিন তাহার প্রতিক্রিয়া হইবেই হইবে।

বাদ্য যন্ত্রে সুর সংযোগ করিলে মার্জিত আঘাতে আঘাতে ঝঙ্কারিত হয়। সেইরূপ হৃদয় যন্ত্রও আঘাতে আঘাতে উদ্বেলিত হয়। অমার্জিত আঘাতে বাদ্য যন্ত্র যেমন বেস্থরে বাজিয়া উঠে, কাঁদিয়া উঠে তার সুরে ভুবন ভুলাইতে না পারিয়া—তেমনি কাঁদিয়া উঠে হৃদয়—আঘাতের বেদনায়—লঘু-গুরু ভেদে। মানুষের দেওয়া আঘাতের ফলে যখন ব্যথা বাজে—আর সেই ব্যথার ব্যথা বুঝিবার ক্ষমতা যখন

ঈশ্বর দত্ত তখন তাহার গতিরোধ করিলে জনসমাজের কি ক্ষতি হয়? জানি, অন্ধকার না থাকিলে আলোর আলোক অনুভব করা যায় না, ছুঁথ না পাইলে সুখ উপলব্ধি হয় না, কিন্তু ভগবানের দেওয়া অপরিহার্য ছুঁথ শোক তাহা অপার আনন্দের আশ্বাদ পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানুষে পশুতে তারতম্য কোথায়? মানুষের ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। পশুর যে জ্ঞানের অভাব। স্ত্রীর মানুষকে মানুষ না'মের ঘোগ্য হইতে হইলে সেই ক্ষমতা পরিচালনা করা কর্তব্য। মানুষ মানুষকে আঘাত করিয়া ব্যথা না দিলে কি জগৎ সংসার সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয় না যখন সকলেই মনে প্রাণে অনুভব করে ব্যথার ক্রিয়া যার ফলে ব্যর্থ হয় মানব জীবনের চরম সার্থকতা।

আমারি প্রেরিত

শ্রীপ্রমোদবালা সেন

মানবের হৃনিবার অদৃষ্টের স্রোত
চলে যদি প্রতিকূল পথে,
আপনা হারিয়ে হায়! দুর্ভাগা মানব
আর তারে পারে কি ফিরাতে!
বার বার শত বার সাজাই যতনে
আশা ভরা স্বন্দর ভবন,
জানিনা অলক্ষ্যে থাকি কে তুমি নিষ্ঠুর
ভাঙ্গ মোর শান্তি-নিকেতন।
সারাদি রজনী জাগি আঁকিলাম চিত্র
শুভ্র স্নিগ্ধ চাঁদিমার আলো
নিমেষে আসিয়া কেগো! মুছে দিয়ে গেলে
রেখে গেলে কালো শুধু কালো
পুরিবে না আশা যদি মায়া-মরিচীকা
মাঝে মাঝে কেন ভাসে চোখে
নিদাঘ সরসী হেরি যাই ছুটে যাই
ফিরে আসি তুষাতুর বৃকে;
সংসার সাগর বৃকে সহস্র মানব
এক-সাথে দিতেছে সাতার,

কেহ বা অকূলে পড়ি হারায় জীবন
কেহ লভে মুক্তার হার।
মিছে কি, মিছে কি তবে শ্রম আরাধনা
নিয়তিই চির দিন জয়ী?
নীরবতা ভেদি ওই কার সুধা বাগী
শুনিতেছি, কেগো স্নেহময়ী!
কে তুমি বলিছ ডেকে, শোন্ বাছা শোন্
আমি আশা, আমিই নিরাশা,
প্রচণ্ড নিদাঘ তাপে দহিয়া ভুবন
পুনঃ সৃজি শীতল বরষা
সুখ বলি চির দিন চাও যারে তুমি
মদিরা সে বিশেষ ভরা জান,
অচেতন মানবের চেতনা জাগায়ে
ছুঁথ সাথে অনন্ত কল্যাণ।
সুগভীর সহিস্কৃতা কর্তব্যের নীতি
মানবের শিখাইতে হিত
মঙ্গল আশাষ মোর হোয়োনো অধীর
ছুঁথ সেও আমারি প্রেরিত।”

মহাকালের ইঙ্গিত

শ্রীপুরঞ্জয় রায়

আজ মনে পড়িতেছে বাংলা জীবনের এক অধ্যায় ! কাশীদাসী মহাভারত শেষ করিবার অদম্য ইচ্ছায় ছই বন্ধুতে দিনের পর দিন স্রব করিয়া পাঠ চালাইতেছি। মহাভারতীয় বীরদের বীরত্ব বর্ণনা পাঠে সে কী উদ্দাদনা ! ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অর্জুন এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি—পাঠ অন্তে কেবলই মনে হইয়াছে হায় আমি যদি এসেই যুগে জন্ম লইতাম !—আজ আবার নব যুগের জন্মলাভ হইতেছে। নব জন্মের সে বেদনার ইতিহাস থাক।

কবির ভাষাতেই বলি—

‘কণ্ট আমার কন্ঠ আজিকে বাঁশী সঙ্গীত হারা !’

আর এক দিকে দৃষ্টিপাত করি ! ভীত ভ্রম নরনারী চলিয়াছে বোমার ভয়ে গ্রামের পথে ! কে জানে কবে কোন মুহূর্তে হৃদয় শত্রু অতর্কিতে আসিয়া—‘এই সাজান বাগান’ শ্মশান করিয়া তুলিবে ! ইহা কল্পনা নহে অতিরঞ্জন নহে ! প্রতিদিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইলেই নজরে পড়িতেছে, আজ অমুক নগরীর উপর বোমা পড়িয়াছে, এত লোক হতাহত, অমুক বিখ্যাত অটালিকা ধ্বংস হইয়াছে !—

মৃত্যু স্থনিশ্চিত ! তবু মানুষ চায় মৃত্যুকে এড়াইয়া এই স্মরনী ধরণীকে ভোগ করিতে ! সে তৃপ্ত নয় উদার আকাশে, অব্যাহত প্রান্তরে, সীমাহীন সাগরের অপরূপ সৌন্দর্যে ! বিশ্ব-স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টিতে তাহার মন সাড়া দেয়, অভিভূত হয় কিন্তু শেষ হয় না ! তাই তাহার চাই নিজের সৃষ্টি ! এই সৃষ্টির সার্থকতা লাভ করিতে সে জন্ম দিয়াছে সভ্যতার—তাহারই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিতে—অমর হইতে ! এই সৃষ্টির মহিমাই তাহাকে করিয়াছে কবি, দার্শনিক, প্রেমিক, বীর, চিত্রকর রাষ্ট্র ধুরন্ধর ! তাহাকে ঘিরিয়া সৃষ্টির কার্য চলিয়াছে নব নব রূপে, নব নব প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গিমায় !

মানুষ আজ ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে আরও এই আশঙ্কায় যে, আজ তাহার নিজের সৃষ্টিরই ধ্বংস যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেকেই মনে মনে জপ করিতেছে, হে মহাকাল আমার

জীবন আছতি লইয়া আমার সৃষ্টিকে রক্ষা কর প্রভু ! কিন্তু মহাকালের রথচক্র চলিয়াছে ঘর্ঘর রবে সকল কিছু তুচ্ছ করিয়াই !

নগরীর মোহ, নগরীর মায়া তুচ্ছ করিবার নহে বা উড়াইয়া দিবার নহে। মানুষের সৃষ্টিশক্তি বিরাট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে মহানগরীকে কেন্দ্র করিয়া। তাই যত চীৎকার উঠিয়াছে Back to village পল্লীর বুকে ফিরিয়া যাও—মানুষ তাহাতে সাড়া দিতে চাহে নাই ! কিন্তু কঠিন বাস্তব তাহাকে তাহার সাধের স্বর্গ হইতে পল্লীর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। রোগে শোকে অভাবে দারিদ্র্যে মুক অসহায় পল্লী আজ আশ্রয় দিতেছে নগরীর স্নেহ পুষ্ট আদরের ছায়ায়। সুদিনে যাহারা মুষ্টিভিক্ষা দেয় নাই, শুধু দিয়াছে ঘৃণা ও অবজ্ঞা আর অতি মূল্যবিশিষ্ট উপদেশ, আজ তাহারা আশ্রয় লইতেছে, সেই মশক দংশন কাতর, ম্যালেরিয়া ভীত, কটিবাস সম্বল, নিরাভরণা পল্লীমাতার স্নেহচ্ছায়ায় ! অদৃষ্টের পরিহাস—না মহাকালের ইঙ্গিত ! একি পুনর্গঠন না প্রায়শ্চিত্ত !

মনে আশা করিকের দুঃস্বপ্ন বুঝি রাত্রি শেষেই মিলাইয়া যাইবে ! এ হৃদ্বিনের আয়ু অত্যন্ত ! কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে—আশার রেখাও ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে।

পল্লীর অসুবিধা অস্বভূত হইতেছে পদে পদে ! লোক নাই, জন নাই, সুপেয় পানীয় নাই ! ‘আহা বাছারা আমার হৃদয়ে কি কালোই না হয়ে গেছে !’ সাতদিন খুঁজিয়া যদি বা ঝি আসিল, তিন দিন না যাইতেই সে পলাইল কারণ এই তিন দিনেই অন্ততঃ তিনশত বার তাহার কাণে আসিয়াছে ‘কি খোঁরাক বাবা, তিন দিনেই আমাদের ফেল করবে !’ ফলে নিজেদের বাসন পর্যন্ত মাঝিয়া লইতে হইতেছে। পয়সা ফেলিলেই সব হয় ধারণা ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছে ! অন্ন-যোগের আর সীমা পরিসীমা নাই !

কিন্তু উপায় কি ! ধনী তাহার কৃপণের মুঠি কোনদিন

থলে নাই। রাষ্ট্র কোনদিন পল্লীর ব্যথা স্মরণ দিয়া অনুভব করে নাই! আজ শুধু অনুযোগে তাহার প্রতীকার হইবে কী?

শিক্ষিতা নারীরা কেহ কেহ পল্লী উন্নয়নের কথা চিন্তা করিতেছেন। গ্রামের বৃকে কিছু করিবার জ্ঞানও প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু না—জিনিষটা মোটেই অত সুলভ নহে।

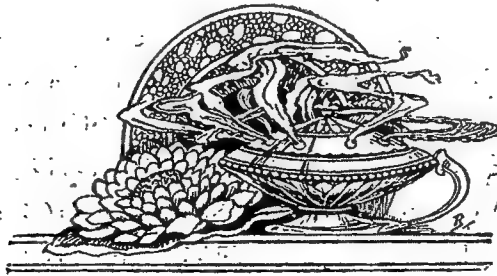
জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে কি বাধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে অতিক্রম করা আজও যে কী দুর্লভ সমস্যা তাহা গ্রামের বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়া কাঁচা না করিতেছেন তাঁহারা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবেন না!

শিক্ষিতা নারীর প্রয়োজন আজ গ্রামের বৃকে যে কত বেশী তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব! কিন্তু তেমন কঠিন মেয়ে কয়জন আছেন জানি না! পল্লী অন্তঃপুরের বিস্তীর্ণ ইঙ্গিতকে তুলু করিয়া তাহাদেরই কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা যে সত্যই কত কঠিন তাহা বুঝান হুঙ্কর! তাহারা ভাবে সহরের শিক্ষিতা যেয়েরা বুঝি সকলেই অপচরিত্রা তাহারা ভালো ভালো বাক্য বিস্তার শিখিয়া আসিয়া তাহাদের স্বামী পুত্রের মাথা খাইতে আসিয়াছে। এই ত সত্যকার পরিস্থিতি! ইহাকে অতিক্রম করিয়া কাঁচা করিয়া যাওয়া যে কত কঠিন তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? শুধু দু'এক দিন উপদেশ দিলেই হইবে না দিনের পর দিন তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদেরই স্নেহে দুঃখে তাহাদের একজন হইয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নব ধরণের অভ্যাস

করা কথার কথা না! এই দৃঢ়তা, এই tenacity of purpose কয়জন নারীর মধ্যে আছে জানি না! শুধু জানি দু'জন থাকিলেও তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এমন একটা সদা জাগ্রত জগদ্ধিতায় নারী সংঘ গড়িয়া উঠিবে বাহার শক্তির কাছে সকলেই মস্তক অবনত করিবে। অন্তঃপুর হইতে যদি আবর্জনা দূর না হয়—তবে বাহিরের আসবাব যতই মূল্যবান চাকচিক্যময় হউক না তাহাতে অস্বাস্য্য দূর হইবে না। সামাজিক অস্বাস্থ্য যখন সারা দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে তখন বিজ্ঞ জনের বাঁধা বলি, কপচাইয়া দেশের কি সত্য উপকার হইবে?

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে এই শ্রানিকর পরিবেষ্টনীর মধ্যে কাঁচা করা সম্ভবপর কি? পূর্বেই বলিয়াছি এজ্ঞা চাই কঠিন মেয়ে। তবে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি কিছুদিন ধরিয়া ত্যাগ ও সত্যকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হইলেই একদল সত্যানুরাগী ভক্তেরও অভাব হইবে না। উদ্বেগ স্থির ও পরিশ্রুট হওয়া চাই! কোনও কিছু ভাসা ভাসা হইলে চলিবে না; সে শিক্ষাদান, রোগীর সেবা, মাতৃমঙ্গল যাহাই হোক না কেন!

মহাকালের ইঙ্গিত আসিয়াছে! আমরা যদি তাহাতে সাড়া না দেই যদি তাহার পরিপূর্ণ স্বেচ্ছা গ্রহণ না করি তবে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে আমাদেরকেই, বুঝা কাহাকেও দোষ দিয়া লাভ নাই।



কাশীতে বাঙ্গালীর অবদান

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখার্জি একজন সেই প্রবাসী বাঙ্গালী যাহারা উত্তর ভারতে আধুনিক শিক্ষার বৃত্তিকা বাহ্যক তাহাদেরই অন্ততম। প্রথম জীবনে যখন চিন্তামণি বাবু শিক্ষকতা করিয়া উপলব্ধি করেন যে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি কেবল মুখস্থ বিদ্যা, ইহাতে ছাত্র ছাত্রীর স্বাতি শক্তির অপব্যবহার হয় মাত্র, প্রকৃত মানবধর্ম ও সংসার বাতীর অনুপযুক্ত তখনই তিনি ইহার প্রতিবিধানের জন্য বিশেষ যত্নবান হন। প্রবাসী স্বজাতির কল্যাণে এবং প্রকৃত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। মাতৃভাষা বাহন বিনা প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া যে কত কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ তাহা তিনি প্রবাসী বাঙ্গালীদের চিত্তে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

ছয়টি মাত্র আশীষের পুত্রগণ নইয়া তিনি বাঙ্গালা শিক্ষাদিবার জন্য বেঙ্গলী প্রতিষ্ঠান ১৮৯৮ সালে বারানসীধামে বাঙ্গালী-টোলায় গোড়া পত্তন করেন। তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতির গুণে এবং অন্তান্ত ত্যাগে প্রবাসী বাঙ্গালীরা আকৃষ্ট হইলেন। ক্রমশঃ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু অর্থভাবে

শিক্ষাকেন্দ্রটির প্রসার সহজ সাধ্য হইল না। সেইজন্য চিন্তামণি বাবু এক একটি করিয়া পয়সা সংগ্রহ করিতে তাঁহার শক্তি নিয়োগ করিলেন। এই প্রকারে এক পয়সা করিয়া ভিক্ষার দ্বারা ১৯১৯ সালে তাঁহার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি রীতিমত স্কুল পরিণত করিলেন।

১৯১১ সালে নভেম্বর মাসে এই বিদ্যালয়টি আইনত রেজিষ্টারী হইয়াছিল নিজ বাটী নির্মাণের নিমিত্ত অর্থভাণ্ডার সংগৃহীত করিবার প্রস্তাব চিন্তামণিবাবু করেন। ১৯১৫ সালে এই বিদ্যালয় ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে বাঙ্গলা ভাষায় সাহায্যে শিক্ষা দিবার সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত হয় এবং ১৯১৬ সাল হইতে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, ১৯১৯ সালে এই স্কুল মাট্রিকুলেশন বা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিবার জন্য ছাত্র পাঠাইবার অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।

বিদ্যালয়টি ক্রমশ সরকার ও সাধারণের এমনই প্রিয় ও বিশ্বাসযোগ্য হইয়াছে যে ১৯৩৮ সালে আই এ, ও আই এস সি পঠন পাঠন ও পরীক্ষা দিবার সরকারী অনুমোদন পাইয়াছে। কলেজে প্রায় আড়াইশত ছাত্র এবং স্কুলে প্রায় ছয়শ ছাত্র পড়িতেছে।



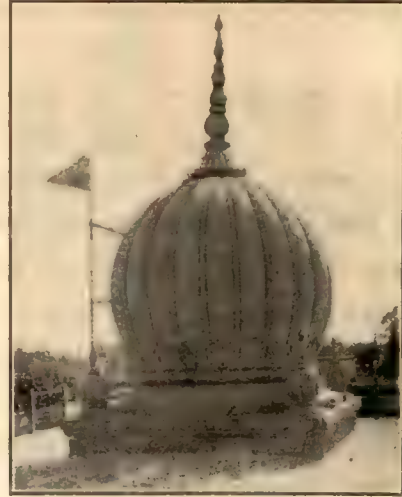
কাশী এঙ্গলো-বেঙ্গলী কলেজ

এই বিদ্যালয় প্রায় ৮।২ একর (২৬ বিঘা) জমির উপর অবস্থিত। এই জমি মহামান্য কাশী-নরেশ বিনামূল্যে দান করিয়াছেন। এই বিস্তৃত ভূমির উপর সুদৃশ্য অট্টালিকা ৮০,৬২০, ব্যায়ে নির্মিত হইয়া বাঙ্গালীর এক অপূর্ব কীর্তি বাঙ্গলার বাহিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২৫,০০০ ব্যয়ে কুটার শিলালয় ও রসায়নাগার (ল্যাবরেটরী) নির্মাণ হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের গৃহ নির্মাণে মোট ১,০৫,০০০ একলক্ষ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়, তাহার মধ্যে ৩৭,৮৬২ সরকারী সাহায্য অর্থ বাদে সমস্তই বাঙ্গালীর অর্থে নির্মাণ হইয়াছে।

স্বপ্নের কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষা দিয়া ছাত্রদের জীবিকা-নির্বাহের পথ সুগম করিয়া দিয়া এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ মঙ্গল করিতেছেন। এই শিল্প শিক্ষালয়ে যে সমস্ত কাঠের নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব প্রস্তুত হইতেছে তাহা এই প্রতিষ্ঠানেরই পরম উপকারী। প্রধান অধ্যক্ষ সরোজেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য অধ্যাপকগণ প্রতিষ্ঠাতা অশীতিবর্ষ চিন্তামণিবাবুর অনুপ্রেরণাতেই অল্প পারিশ্রমিকে সানন্দে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দিয়া বাঙ্গালী জাতির পরম উপকার করিতেছেন।

এই প্রতিষ্ঠান এমনই জনপ্রিয় হইয়াছে যে বহু অবাকালী ছাত্র এখানের কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু দশহাজার টাকা স্থায়ী ভণ্ডার অভাবে এখনও ইহার স্থায়ী অহমোদন লাভ করিতে পারিতেছেন না।

কাশীর শিবালয় মহল্লায়, হুম্মান খাটের উপর, কাশীর চৌখাখা অঞ্চলের স্মৃতিটুলীর মহাজন স্বর্গীয় ভবানীশঙ্কর ঘোশী



চন্দ্র মৌলীশ্বর শিবের মন্দির—কাশী

মহোদয় এক বিরাট শিবালয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপত্য যেমন অভিনব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রমৌলীশ্বর বিগ্রহের সেবাও নূতন রকমের। সেবার ভার এক দক্ষিণাত্যের পুত্র চরিত্র আবিড়ব্রাহ্মণের উপায় ন্যস্ত। তিনি ও প্রতিষ্ঠাতার পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোশী মহোদয় এই শিবালয়ে বুদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব শাক্ত সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণকে সাধন ভজনের সমানভাবে অধিকার ও সুযোগ দিয়া থাকেন। বর্তমান যুগে এই রূপ মিলন ক্ষেত্রই বিশ্বমানব কল্যাণের উপযুক্ত।



যে নদী মরুপথে হারাল ধারা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসরলা বসু রায়

কেবল লিলি বলে উঠল, “ভাই স্বধা বুঝতে সবই পারছি, তবে তুমি আমাদের অনেক উপরে, তোমায় আর কি বোঝাব, তবে বিদ্যাতার মহাদান যে ছুঃখ, তাকে মাছুষ যখন হাসিমুখে জয় করে, তখনই সে মাছুষের চোখে দেবতা হয়ে ওঠে এবং ছুঃখের পশরা যাদের মাথায় দেওয়া হয়, তাঁরাই নির্বাচিত অমৃতগ্হীত; যার তার সে সৌভাগ্য হয় না ভাই। এখন একটা গান করে, আমাদের বিদেয় দে স্বধা, অনেক দিন তোর গান আমরা শুনিনি। আর কখন শুনতে পাব কিনা জানি না।”

স্বধা বললে, “ভাই অনভ্যাস হয়ে গেছে, বহুদিন ওসবে আর যাইনি। ঐ একটু গুণ গুণ যা শুনলি, ওর বেশী সাইস নেই। গান শুনিয়ে যে তাঁদের আনন্দ দেবো, সে যোগ্যতা আর নেই।”

তবু সকলে বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তখন স্বধা বলল, “আচ্ছা, এক মিনিট অপেক্ষা কর সব, আমি আসছি ওঘর থেকে।

তারপর খানিক পরে স্বধা এসে গান ধরল। যেমনি তার প্রাণ ঢালা স্মৃষ্টি হয়, তেমনি তার কথা। স্বধা গাইল—

যুম ভাঙল গান গেয়ে;

কোন দরদী মধুর রাতি

ভোর করিল মুখ চেয়ে।

মন ভরাল কোন দিয়ে

কোন আলেয়ার রঙিন আলো

ভুলিয়ে নিল মোর হিয়ে।

যুরিয়ে দিয়ে রথ চাকা

ছুটিয়ে দিলে কোন সে গানে

স্মৃতি যাহার “মনে রাখা।”

ধন যাহার নিশি শেষে

ফিরিয়ে দেবে নিজ দেশে

গন্ধ যাহার আকুল করে

রাখবে সদাই ছেয়ে ॥

সকলে অনেকক্ষণ ওর গানে মগ্ন হইয়া চুপ করে থাকল। লিলি জিজ্ঞাসা করিল “ভাই স্বধা এটা বোধ হয় তোর স্ব-রচিত? কি স্বন্দর তুই গাস্ ভাই।”

স্বধা বলল “নিশ্চয়ই, এবং এইমাত্র এটা রচনা করলাম যে, এটা তোদের ‘আগমনী’ ভাই; তোরা যে এত কষ্ট করে

আমায় আবিষ্কার করলি, সেই স্মৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারে আমার মর্শ্ব-নিঙড়ান এই গানটি জমা থাক ভাই।”

সবাই ছল ছল চক্ষু বসে রইলো, কেবল কণা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল, বলল “ভাই স্বধা একবার এক ঘণ্টার জন্তেও কি তুই আমার সঙ্গে যেতে পারিস্ না ভাই, আজ শনিবার। আজ দুটার ট্রেনে কলকাতা থেকে আসবে। এতক্ষণ এসে পৌছতে নিশ্চয়। এদের সবার চেয়ে যে আমিই জিতেছি, এটা তাকে না দেখালে যে আমার সাধ মেটে না ভাই, আর ‘সে’ বড় মেয়েদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে। তাকে একবার দেখিয়ে সে ভুলটা ভেঙ্গে দিতে চাই। একটা দিন মাত্র আমার কথা কি রাখতে পারবি ভাই।”

স্বধা হেসে বলল, “কি পাগলামী করিস্ ‘কণি’, আমাদের টিকিট পর্যন্ত কেনা হয়ে গিয়েছে, এখনই বেরুতে হবে। সেখানে আবার শাণ্ডড়ির অমুখ, তারপর এই বাড়িটায় কাল আবার সেই ভদ্রলোকেরা আসবে। এমন অবস্থায় সব উল্টে দিয়ে তোদের সঙ্গে আনন্দে মাততে যাব, এমনই কি আমি স্বাধীন মনে করিস্?”

কণা ম্লান মুখে চুপ করে রইল, উত্তর দিলে না কিছু। স্বধা পরিহাস তরল কণ্ঠে বলে উঠল, কণার হাত ধরে গানের সুরে “তুমি উকীলের বধু, পলে পলে লোট মধু, কি সাধ্য আমার ভব পুরাইতে আশ।”

সবায়ের মুখে করুণ স্বন্দর হাসি ভেসে উঠলো। এইবার সকলে উঠে পড়ল। বিদায় নিয়ে, স্বধার ছেলেকে সবাই আদর করে নিজ নিজ নামাক্তিত আংটি তার কচি আঙ্গুলে বুখাই পরা-বার চেষ্টা করে হাতে দিয়ে বলল, “আমাদের নাম লেখা এই আংটি আমাদের ‘স্মৃতিচিহ্ন’ স্বরূপ রেখো। আশা করি বড় হলেও তুমি যেখানেই যেভাবে থাক, স্বধার ছেলে বলেই এমনি তাতেই ভোঁমায় চিনে নিতে পারব আমরা।”

পরদিন কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি রুবী সেই চাপরা-নীকে একবার এই বাড়িটায় পাঠিয়েছিল। সে এসে বলল “অনেক ডাকাডাকিতে একটা বুড়ী মেয়ে এসে বলল, কাল তাঁরা এখান থেকে চলে গেছে; এখন আমরা এটা ভাড়া নিয়েছি। এরপর রুবী রোজই তার স্বামী রঞ্জিতকে তাড়া দিত, এ জায়গাটা ভাল লাগছে না, তুমি বদলীর চেষ্টা কর।”

রঞ্জিত যুঃ হেসে আশ্বাস দিত, “হ্যাঁ করব।”

ফলদীপিকা

শ্রীগণপতি সরকার

গ্রহের বল নির্ণয়

গ্রহের বল নির্ণয় করিবার জন্ত সকল বল গণনা স্থলে “স্থানবল” নিম্নোক্ত অংকে দ্বারা প্রথমে “স্থানবল” গণনা দেখান যাইতেছে। ঐ স্থানবলের প্রথমেই ষড়বর্গ গণনা। উহার জন্ত তাৎকালিক “মিত্রামিত্র চক্র” (২য় অধ্যায় ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) স্থির করিবে। “তাৎকালিক মিত্রামিত্র চক্র” দেওয়া হইল উহা উদাহরণ ইহা করিতে আবার “নৈসর্গিক শত্রু মিত্র” (২য় অধ্যায়

২১ এবং ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) দেখিতে হয়। সহজ বোধার্থে নিম্নে উভয় চক্রই দেখান হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে “নৈসর্গিক শত্রু মিত্র চক্র” সকল কোণীতেই ব্যবহার হইবে; আর “তাৎকালিক শত্রু মিত্র চক্র” যে কোণীর জন্ত তৈয়ারী হয় কেবল তাহাতেই ব্যবহার হয়। এখানে যে “তাৎকালিক মিত্রামিত্র চক্র” দেওয়া হইল উহা উদাহরণ কোণীর জন্ত প্রযোজ্য :—

নৈসর্গিক “শত্রু মিত্র চক্র”

গ্রহ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
মিত্র	চ, ম, ব	র, ব	র, চ, ব	র, শু	র, চ, ম	ব, শ	ব, শু
শত্রু	শু, শ	°	ব	চ	ব, শু	র, চ	র, চ, ম
সম	ব	ম, ব, শু, শ	শু, শ	ম, ব, শ	শ	ম, ব	ব

“তাৎকালিক শত্রু মিত্র চক্র” (উদাহরণ কোণী হইতে)

গ্রহ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
মিত্র	ব, শু, শ	ম	ব, শু, শ	ম, ব	শ	ম, ব	ব
অধিমিত্র	চ, ব	র, ব	চ, ব	র, শু	র, ম	ব, শ	শু
শত্রু	°	ব, শু, শ	°	শ	°	°	°
অধিশত্রু	°	°	°	°	°	চ	চ
সম	ম	°	র	চ	চ, ব, শু	র	র, ম, ব

বল অর্থে একরূপ বল বা পূর্ণবল বা চারপাদ বল যথা [৪ অং ৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য] :—

উচ্চগ্রহের—পূর্ণ বা ১ রূপবল = ৬০ কলা

মূলত্রিকোণগ্রহের—ত্রিপাদ বা ৩ রূপবল = ৪৫ কলা

স্বক্ষেত্রগ্রহের—অর্দ্ধ বা ২ রূপকলা = ৩০ কলা

অধিমিত্র গ্রহের— = ২২ কলা ৩০ বিকলা

মিত্র গ্রহের—পাদ বা ১ রূপবল = ১৫ কলা

সম গ্রহের— = ৭ কলা ৩০ বিকলা

শত্রু গ্রহের— = ৩ কলা ৪৫ বিকলা

অধিশত্রু গ্রহের— = ১ কলা ৫২ বিকলা ৩০ অল্পকলা

নীচগ্রহের—শূন্যবল = ০

অন্তর্গত বা দক্ষ গ্রহের—শূন্যবল = ০

স্থানবল গণনা

ইহার প্রথম ষড়বর্গবল। [৩ অধ্যায়ে বর্গ নির্ণয় প্রণালী দেখান হইয়াছে।] উদাহরণ কোষ্ঠীর ষড়বর্গবল দেখান যাইতেছে :—

গ্রহ	ক্ষেত্র	হোরা	দ্রেকাণ	নবাংশ	দ্বাদশাংশ	ত্রিংশাংশ
র	ম	র	ম	বু	চ	শ
	সম	স্বীয়	সম	মিত্র	অ, মি	সম
	৭।৩০	৩০	৭।৩০	১৫	২২।৩০	৭।৩০
চ	শ	চ	শ	বু	ম	বু
	শত্রু	স্বীয়	শত্রু	শত্রু	মিত্র	মিত্র
	৩।৪৫	৩০	৩।৪৫	৩।৪৫	১৫	১৫
ম	ম	র	র	র	বু	বু
	স্বীয়	সম	সম	সম	সম	অ, মি
	৩০	৭।৩০	৭।৩০	৭।৩০	৭।৩০	২২।৩০
বু	বু	র	চ	বু	শু	বু
	মিত্র	অ, মি	সম	মিত্র	অ, মি	মিত্র
	১৫	২২।৩০	৭।৩০	১৫	২২।৩০	১৫
র	বু	চ	শু	বু	বু	বু
	সম	সম	সম	স্বীয়	স্বীয়	স্বীয়
	৭।৩০	৭।৩০	৭।৩০	৩০	৩০	৩০
শু	শু	চ	বু	শু	শু	বু
	স্বীয়	অ, শ	অ, মি	স্বীয়	স্বীয়	মিত্র
	৩০	১।৫২।৩০	২।৩০	৩০	৩০	১৫
শ	চ	র	ম	বু	শ	বু
	অ, শ	সম	সম	মিত্র	স্বীয়	মিত্র
	১।৫২।৩০	৭।৩০	৭।৩০	১৫	৩০	১৫

রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি
যোগফল = ২০।০	৭।১।১৫	৮২।৩০	২৭।৩০	১১২।৩০
শুক্র	শনি			
১২২।২২।৩০	৭৬।৫২।৩০	ইহাই ষড়বর্গ যোগফল।		

গ্রহ কোন গ্রহের ক্ষেত্রাদি কোন বর্গ আছে তাহা প্রথমে লিখিবে। তাহার নীচে “তাৎকালিক শত্রু মিত্র চক্র” হইতে বর্গগত গ্রহের সহিত গ্রহটির মিত্র অধিমিত্র প্রভৃতি কোন সম্পর্ক তাহা লিখিবে। তাহার নীচে মিত্রাদি অবস্থা অনুসারে প্রাপ্ত বল লিখিবে। শেষে ছয়টি বর্গে প্রাপ্তবল যোগ করিলে ষড়বর্গ যোগফল পাওয়া যাইবে। যথা,—উঃ কোষ্ঠী হইতে, রবি মঙ্গলের ক্ষেত্রে আছে, ঐ মঙ্গল (তাৎকালিক শত্রু-মিত্র চক্রানুসারে) রবির সম, সূত্রাং রবির বল ৭ কলা ৩০ বিকলা।

ঐরূপ রবি স্বীয় হোরায থাকায়, রবির হোরা বল ৩০ হইল। রবি মঙ্গলের দ্রেকাণ থাকায় রবির সম হওয়ায়, রবির দ্রেকাণ-বল ৭।৩০, রবি বুধের নবাংশে থাকায় ঐ বুধ মিত্র হওয়ায় রবির নবাংশ বল ১৫। ঐরূপ রবি চন্দ্রের দ্বাদশাংশ থাকায় রবির দ্বাদশাংশ বল ২২।৩০; রবি শনির ত্রিংশাংশে, ঐ শনি সম হওয়ায় রবির ত্রিংশাংশ বল ৭।৩০ হইল। ইহাদের যোগফল ২০ কলা, ইহাই রবির ষড়বর্গবল। এইরূপে অন্ত গ্রহের বল কথিবে।

[সঙ্কেত :—অ, মি অর্থাৎ অধিমিত্র।

অ, শ অর্থাৎ অধিশত্রু

২। কেন্দ্রাদি বল :—

কেন্দ্রে (১, ৪, ৭, ১০) পূর্ববল অর্থাৎ ১ রূপ বা ৬০ কলা ;
পঞ্চক্রে (২, ৫, ৮, ১১) অর্দ্ধবল অর্থাৎ ৩০ কলা ;
আপোক্লিমে (৩, ৬, ৯, ১২) পাদবল অর্থাৎ ১৫ কলা ।

উদাহরণ কোষ্ঠিতে,—

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল এবং শনি পঞ্চক্রে সেইজন্ত উহাদের
প্রত্যেকের অর্দ্ধবল অর্থাৎ ৩০ কলা ; বৃহ ও বৃহস্পতি কেন্দ্রে
থাকায় উহাদের প্রত্যেকের পূর্ববল অর্থাৎ ৬০ কলা ।

শুক্র আপোক্লিমে থাকায় তাহার পাদবল অর্থাৎ ১৫ কলা ।

৩। পুংস্ত্রী যগু বল :—

পুংস্ত্রী গ্রহ (র, ম, বৃ) যে রাশিতে থাকে তাহার আদিতে
অর্থাৎ প্রথম দ্রেকাণে অর্থাৎ ১০ অংশ মধ্যে থাকিলে বলী
হয় ।

জ্যৈষ্ঠ (চন্দ্র ও শুক্র) অবস্থিত রাশির অন্তর্ভাগে অর্থাৎ
তৃতীয় দ্রেকাণে অর্থাৎ ২০ অংশের পর ৩০ অংশ মধ্যে থাকিলে
বলী হয় ।

যগু অর্থাৎ নপুংসক গ্রহ (বৃহ ও শনি) স্থিত রাশির
মধ্যস্থলে অর্থাৎ দ্বিতীয় দ্রেকাণে অর্থাৎ ১০ অংশের পর ২০
অংশ মধ্যে থাকিলে বলী হয় ।

এই বল ১৫ কলা ।

উদাহরণ কোষ্ঠিতে,—

রবি পুংগ্রহ বলিয়া স্থিত রাশির ১০ অংশ মধ্যে থাকায়
তাহার বল ১৫ কলা ।

চন্দ্র জ্যৈষ্ঠ বলিয়া স্থিত রাশির ১০ অংশ মধ্যে থাকায়
কোন বল পাইল না, স্তত্রাং শূন্য বল । মঙ্গল পুংগ্রহ হইয়া
স্থিতরাশির ২য় দ্রেকাণে অর্থাৎ ১০ অংশের পর ২০ অংশ মধ্যে
থাকায় উহার বল শূন্য হইল । বৃহ ক্লীব বা নপুংসক গ্রহ হইয়া
স্থিতরাশির দ্বিতীয় দ্রেকাণে অর্থাৎ ১০ হইতে ২০ অংশ মধ্যে
থাকায় উহার ১৫ বল হইল । এইরূপে দেখা যাইতেছে যে,—

র চ ম বৃ শু শ
১৫ ০ ০ ১৫ ০ ১৫
বল পাইয়াছে । এই পুংস্ত্রী যগু বলকে “দ্রেকাণ বল” ও
বলে ।

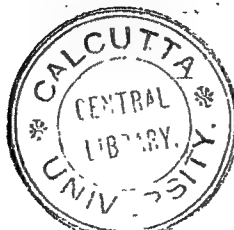
৪। নৈসর্গিক বল :—

শ, ম, বৃ, শু, চ, র পরপর বলবান । এই বল গণনার
নিয়ম হইতেছে যে, ৬০কে ৭ দিয়া ভাগ দিলে যে ভাগফল হয়,
তাহাই শনির বল, ঐ শনির বলে ভাগফল যোগ করিলে
মঙ্গলের বল, এইরূপ পর পর যোগ করিয়া পর পর গ্রহের বল
স্থির হয় । যথা :—শনির ৮১৩৪, মঙ্গলের ১৭১২, বৃহের
২৫৮৩, বৃহস্পতির ৩৪১৭, শুক্রের ৪২৫১, চন্দ্রের ৫১২৬
এবং রবির ৬০১০ কলাদি-বল । ইহা স্বাভাবিক বা নৈসর্গিক
বল বলিয়া সকল কোষ্ঠিতেই এই বল সমান থাকিবে ।

স্থানবল

গ্রহ	র	চ	ম	বৃ	শু	শ
যদুবল	২০।০	৭১।১৫	৮২।৩০	৯৭।৩০	১১২।৩০	১২৯।২৩
কেন্দ্রবল	৩০।০	৩০।০	৩০।০	৬০।০	৬০।০	৩০।০
পুংস্ত্রী যগুবল	১৫।০	০	০	১৫।০	০	১৫।০
নৈসর্গিক বল	৬০।০	৫১।২৬	১৭১২	২৫৮৩	৩৪১৭	৪২৫১
স্থানবল সমষ্টি	১২৫।০	১৫২।৪১	১২৯।৩২	১২৮।১৩	২০৬।১৭	১৮৭।১৪

(ক্রমশঃ)



ব্যথার শেষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীহীরালাল সরকার বি, এল,

পূজা অন্তে জানালার দিকে নজর পড়িতেই ডাক্তার বাবুকে দেখিতে পাইয়া বলিল—“এ কি আপনি এখানে?” সুখেন্দু বলিল, “মনে কিছু করবেন না, চলোঁ বাচ্ছলাম,—আপনার ঝি দেখিয়ে দিলে, বড় ভাল লাগলো তাই দেখার লোভটা সম্বরণ করতে পারলুম না। মাপ করবেন। লাভণ্য লজ্জা পাইয়া বলিল—“নানা, আপনার মত এক জনকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি”—বলিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বাহির হইয়া ডাক্তার বাবুকে বসিবার ঘরে লইয়া গেল, খানিকক্ষণ কথোপকথনের পর সুখেন্দু তাহাকে নবীন বাবুর ঠিকানা দিয়া সেখানে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া গেল।

ঐ দিবস হইতেই সুখেন্দু লাভণ্যকে চিনিলা এবং মনে মনে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল। কেবলই ভাবে কি অপূর্ণ দৃশ্য। সাধারণতঃ নাস' কথাটা শুনিতেই এই দেশীয় লোকের মনে একটা ক্লেশের ঊর্ধ্ব উঠে। সেই সর্ব গুণী হইতে পূর্ব হইতেই সুখেন্দুর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল আজ উহা আরও বিশেষ-রূপে বর্ধিত হইল। যাহারা এমন করিয়া আত্মের সেবা করিয়া জীবন অতিবাহিত করে,—যাহাদের হাতের প্রলেপে ব্যাধিতের ব্যথা দূরে যায় তাহাদের স্থান অনেক উচ্চে, আমরা যে উহাদিগকে ছোট্ট করিয়া দেখি ইহা কেবল আমাদের কুসংস্কারেরই ফল, ইয়োরোপ খণ্ডে কেহই উহাদেব এত হীন চক্ষে দেখে না। তারা স্বাধীন দেশের মানুষ—তারা জানে সেবার মূল্য কত।

জমিদার নবীন বাবুর অসুখের সময় লাভণ্য তাহাকে এত যত্ন সহকারে শুশ্রূষা করিয়াছে যে মনে হয় একমাত্র তাহার সেবা যত্নেই যেন তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন—ঔষধ উপলক্ষ মাত্র। একদিন নবীন বাবুর বিশেষ অনুরোধে ডাক্তার বাবু ও নাস' উভয়েই তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে উপস্থিত হইলে নবীন বাবু বলিলেন—আপনাদের জন্যই এখানকার রক্ষা পাইলাম, আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ—এতটা যত্ন চেষ্টা করে যদি আপনারা না দেখিতেন তবে.....সুখেন্দু

তাহাকে শেষ না করিতে দিয়াই বলিল—নবীনবাবু এতটা বলিলে নিশ্চয়ই লজ্জা পেতে হয়। আমি তো বলি আপনার টাকাকুলিই সব করেছে—আপনি যদি জলের মত অর্থরাশি ব্যয় না করতেন আমরাও আসতুম না এবং ‘এত করা’ যা নিয়ে আপনি আমাদের এত অধিক প্রশংসা করছেন তার কিছুই হতনা—আমাদের টিকিটিও হয়তো আপনি দেখতে পেতেন কিনা, আপনার জলের মত টাকাকুলিই না আমাদের এখানে টেনে এনেছে—বলিয়াই সুখেন্দু হাসিতে লাগিল, লাভণ্যও তাহার হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল—ডাক্তার বাবু ঠিকই বলেছেন—আমরা তো ভাড়াটিয়া গাড়ী—যে টাকা খরচ ক’রে ডাকবে সেখানেই যাব, যে ভাড়া দিবে না তার গাড়ী চড়াও হয় না—না? সুখেন্দুর দিকে চাহিল।

তাহাদের কথায় নবীন বাবু যেন একটু আশ্চর্য ও আহত হইয়াই বলিলেন—ডাক্তার বাবু টাকা খরচ করিলেই কি সব সময় সব কাজ ষোল আনা মিলে, না টাকা দিলেই সকলে আশ্রয় চেষ্টা যত্ন সহকারে কাজ করে? অস্তুর কথা জানিনা তবে নিজের জীবনে এটা বেশ লক্ষ্য করিছি যে জলের মত টাকা খরচ করেও মনের মত কাজ পাই নাই। তার কারণ দু’টা হ’তে পারে, হয় যিনি কাজ করবেন বলে এলেন তিনি কার্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, না হয় তিনি জেনেও ফাঁকি দেন। কিন্তু এবার নিশ্চিতভাবে দেখতে এবং প্রাণ দিয়ে অনুভবও করলাম যে ষোল আনার স্থানে আঠার আনা আদায় হ’ল, তার জন্তই এই কৃতজ্ঞতা। সুখেন্দু নবীন বাবুর প্রাণের এই কথা কয়টি আর ঠেলিয়া ফেলিল না—কিন্তু গম্ভীরভাবে বলিল,—আমার দিক দিয়ে হালফ ক’রে বলতে পারি যে আঠার আনা দূরে থাক ষোল আনাই ঠিক মত করতে পেরেছি কিনা ভগবান জানেন; পরে লাভণ্যকে দেখাইয়া বলিল—অবশ্য এর বিষয় স্বতন্ত্র। ডাক্তারি জীবনে অনেক নাস' নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয় কিন্তু এমন প্রাণ দিয়ে শুশ্রূষা করতে আমি খুব কমই দেখেছি;

একারণেই আমি অনেক রোগীকে ইহাকে নিযুক্ত করতে অনুরোধ করি। এটাও খুব সত্য নবীন বাবু যে ঔষধের চেয়ে রোগীর গুণ্ধ্যা তার সেবা যত্ন এ সকলই প্রধান। রোগীর বার আনা নির্ভর করে গুণ্ধ্যার উপর। কিন্তু আমাদের দেশে উল্টো নিয়ম। এ দেশের লোক মনে করে ডাক্তার বাড়ি থাওয়ালেই রোগী আরোগ্যলাভ করে। রোগী মৃত্যু শয্যায় পড়ে যাতনায় ছটফট করে—মা, ভগ্নি, স্ত্রী ইত্যাদিকে দেওয়া গেল তার সেবা করতে আর তারা কিনা লেগে গেলেন হাউ হাউ করে কাঁদতে, রোগীর প্রাণে বাঁচবার শেষ আশাটুকু গেল উবে। এমনি ক'রে অনেককে হার্টফেল করতে দেখেছি। অথচ এই সামান্য বুদ্ধিটুকু যদি তাদের থাকতো যে রোগীকে সর্ব সময় প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করা উচিত কারণ তাতেই সে রোগের ধ্বংসাভাব তা'হলে হয়তো অনেকেই মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পেতো। গুণ্ধ্যাই প্রধান, কাজেই আপনি যদি আঠার আনাই পেয়ে থাকেন তবে সেটা পেয়েছেন ইহারই গুণে এবং প্রশংসাটাও প্রাপ্য ইহারই, আমার নয়, বলিয়াই লাভ্যের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল, মুখখানা তাহার গোরবের দৃষ্টিতে উজ্জল হইয়া উঠিল।

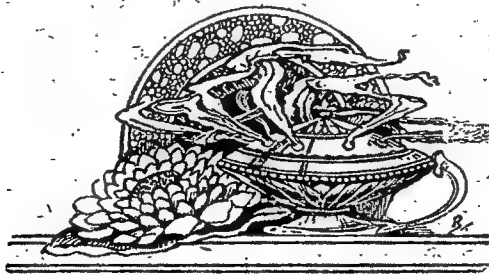
লাভ্যা এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই বলে নাই কেবলই চুপ করিয়া উভয়ের আলোচনা শ্রবণ করিতেছিল। এইবারে প্রশংসার বহর সহ্য করিতে না পারিয়া ধীরভাবে বলিল—ডাক্তার বাবু কি আমার উপর বোঝা রেখে রেহাই পেতে চান? তা হবেনা, আমি অত বোকা নই। দিনরাত নিজে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে মরলেন আপনি, আর প্রশংসা বইবার বেলায় দেখিয়ে দিচ্ছেন আমাকে? বেশ লোক বটে। না,

অতটা আমার সহ্য হবেনা। নবীনবাবু পাকা লোক এ পর্যন্ত খাটিয়েই এসেছেন পাটেন নি, তিনি বেশ বুঝেন কার কি প্রাপ্য। লাভ্যা আবার বলিল আপনি গুণ্ধ্যার কথা বলছিলেন না? আমাদের তো ঐ কাজ এবং তার জন্তে লোক আমাদের টাকা দিয় ডাকে; তাও যদি একটু গুছিয়ে না করি তবে আপনাবাই বা ডাকবেন কেন আর এসেই বা লাভ কি? এতে কৃতজ্ঞতারই বা কি আছে আর প্রশংসারই বা আবশ্যকতা কোথায় তা তো বুঝি না। যাক এসব কথা। নবীন বাবু আগামী পরশু তারিখই তা'হলে আপনি দেশে যাচ্ছেন? নবীন বাবু—হ্যাঁ সে রকম তো মনে করছি, এখন ভগবানের হাত।

সুধেন্দু—আপনাকে আর কি বলবো—আপনি তো সবই বুঝেন; তবু ডাক্তারি পেশা যখন করি তখন হু' একটা ডাক্তারি উপদেশ দেওয়া অবশ্যই উচিত। আপনি অন্ততঃ ছুটা মাস খুব সাবধানে থাকবেন। চোখের উপর যাতে বেশী স্ট্রেস না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। চোখের কাজ না করলেই ভাল হয়, পারফেক্ট রেইট, এ সমস্ত রোগে অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর নির্ভর ক'রে চলতে হয় তবেই আস্তে আস্তে সমলে উঠবেন। আর একটা কাজ করবেন, স্নানের পূর্বেই পায়ে তলায় খানিকটা সরষের তৈল মাখবেন—চোখের উপর খুব ভাল কাজ করে।

আরও আলোচনার পর আহালাদি সমাপন করিয়া উভয়ে বিদায় গ্রহণ করিল।

(ক্রমশঃ)



হাজারীবাগের চিঠি

[পূর্ব-প্রকাশিত 'ঘরের কথা'র জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ সালে লেখকের পিতার নিকট লিখিত অন্তিম একখানি চিঠি ।]

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

শহরের কথা

প্রাচীন ভূগোল অনুসারে হাজারীবাগ যাহাদের বাসভূমি হওয়ার কথা, বিহারী, বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীদের পেটের দায়ে তাহাদিগকে পিঠটান দিয়া দূরে থাকিতে হইতেছে। ফলতঃ, প্রাচীন সঁওতাল-পরগণার এই অংশে সঁওতালদের যে আধিপত্য থাকিবার সম্ভাবনা, শহরের মুখে পা দিয়াই তাহার অভাব লক্ষিত হয়। বাণিজ্যক্ষেত্রে মাড়োয়ারীর প্রভাব সর্বত্রই অধুনা অপ্রতিহত; সুতরাং স্থানীয় অধিকাংশ ব্যবসায়ের ভার যে মাড়োয়ারীর হস্তগত হইয়াছে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি! কিন্তু বিহারী ও বাঙ্গালীরাও এবিষয়ে একেবারে পশ্চাৎপদ নহেন। স্থানীয় 'ইণ্ডিয়ান মোটর-কোম্পানী'র মালিক দিগ্‌বাবু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। অক্ষয়বাবু নামক এক বাঙ্গালী বৈদ্য ঠিকাদারী কার্য করিয়া অতুল বিত্ত-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন; শহরের ভদ্র গৃহস্থের বাসোপযোগী বহু ভাড়াটে বাড়ীর মালিকও তিনি। সতীশবাবু নামক এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ 'হাজারীবাগ ক্যারিও কোম্পানী' নামক ভাড়াটে গাড়ীর আড্ডার স্বত্বাধিকারী। জ্ঞানবাবু ও অপর এক বাঙ্গালী বাবু জুতার ব্যবসা করিতেছেন। শহরে বাঁকড়াবাসী এক মোদকের মিঠাইয়ের দোকান আছে। এইরূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু ব্যবসায়ক্ষেত্রেই বঙ্গবাসী লিপ্ত আছেন। একদিন জনৈক বৃদ্ধ বাঙ্গালীর সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল; তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই শহরের অধিবাসী; তখন এদিকের যাতায়াতের রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম থাকায় তিনি বর্তমান বানপথ-নির্মাণের কার্যে ব্যাপ্ত ছিলেন। সেই সময়ে এদেশে বাঙ্গালী, বিহারী বা মাড়োয়ারীর সংখ্যা এত অধিক ছিল না; সুতরাং বাঁহারা এদেশে আসিতেন তাঁহারা সহজেই আচরিত হইয়া উঠিতেন এবং সংখ্যায় অল্প ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রগাঢ় ছিল। বস্তুতঃ, তৎকালীন বাঙ্গালী প্রবাসীরা সর্বক্ষেত্রেই শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া মৃত্যুর পরেও নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

অধুনাও বাঙ্গালীদের প্রভুত্ব বহু ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। উকীলের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালী, এমন কি সরকারী উকীল ও মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানও বাঙ্গালী। বে-সরকারী ঔষধালয়ে এবং ডাক্তারী ও কবিরাজী চিকিৎসাক্ষেত্রেও বাঙ্গালীদের প্রভাব যথেষ্ট। চাকুরীক্ষেত্রেও ডেপুটী, মুন্সেফ, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি উচ্চদস্ত কৰ্মচারী বঙ্গবাসী। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এইস্থানে স্থায়ীভাবে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া পুরুষ-পরম্পরায় বাস করিতেছেন। শহরের ও শহরোপকণ্ঠের সুরম্য বাগলোগুলির মালিক ইহারা। শহরের বায়ু-কোণের একটা মহলা এইরূপ বাঙ্গালী-গৃহের শোভায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই বাংলা বলিতে কিংবা বুঝিতে পারে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের কথা ভাষায় প্রচলিত বাংলার বহু শব্দ, বিশেষতঃ সমাপিকা ক্রিয়া, অনেক স্থলে আশ্রয় লইয়াছে। তঁু কাল ঢাল দিলে, (তুই কাল ঢালিয়া দিলি), তোর বাপ কাঁহা গেল'উ (তোর বাপ কোথায় গেল), ইত্যাদি বাক্য এইরূপ ভাষার উদাহরণ। একদিন আমাদের প্রতিবেশী জনৈক নিরক্ষর মিস্ত্রী কোনও ক্রীলকের সঙ্গে বিবাদের সময়ে একটা বাংলা প্রবাদ-বাক্য আবৃত্তি করিয়াছিল। কথা ভাষায় বাংলা বা বাংলার তুল্য শব্দের ব্যবহার, হয় ইহাদের বহুদিবসাবধি বাঙ্গালী-সংসর্গের ফল, নয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মূল ধাতুরূপের সাদৃশ্যের নিদর্শন।

স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অধিক। ইহারা প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী হইলেও, খাদ্যাখাদ্য-বিচারে অনেকাংশে শাক্তাচারী। একদিকে যেমন 'ম'কারের সাধনায় ইহাদের আপত্তি নাই, অন্যদিকে প্রতি পর্কোপলক্ষে ইহারা দলে দলে শ্রীক্ষেত্রধামে তীর্থযাত্রায় অভ্যস্ত। আচার ও ধর্মমতের এইরূপ সংমিশ্রণ শূদ্রবংশীয় 'লাল'দের মধ্যেই অধিক দৃষ্ট হয়। মুসলমানদের 'মহরম'-উৎসবে স্থানীয় হিন্দু-সম্প্রদায় পরম উৎসাহ-সহকারে যোগদান করে এবং উভয় সম্প্রদায় সম্মিলিত কর্তে

‘জয় কালীমার্জি কি জয়’—‘হাসান হোসেন হাসান হোসেন’—বলিতে বলিতে বুক চাপড়াইতে থাকে। এইরূপ উৎসব স্থানীয় বালক-বালিকার শৈশব-ক্রীড়াগুণ স্থান পাইয়াছে। শহরের পশ্চিম-প্রান্তে ‘গাঁওদেও’র এক ‘খোলা’ আছে। সেখানে বৎসরে একবার ধুমধাম-সহকারে দেবতার পূজা হইয়া থাকে। বর্তমানে একটা অর্দ্ধরক্ত ও অর্দ্ধশ্বেতবর্ণ পতাকা দেবস্থানের প্রতিভূ-স্বরূপে বিরাজ করিতেছে। এই ‘গাঁওদেও’ হাজারীবাগ-শহরের রক্ষাকর্তা বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এইরূপ এক-একটা নিশান, নিয়ন্ত্রণীর অনেক গৃহস্থের গৃহ-সম্মুখে প্রোথিত। সন্ধ্যাবেলা ধূপধূনা জ্বালাইয়া উহার তলায় টুনীর মত ছোট পাখী বলি দেওয়ার রীতি আছে। এই সকল গৃহ বা গ্রাম-রক্ষক দেবতার কোনও প্রতিমূর্তি নাই। এদেশে প্রতিমা-নির্মাণ-কার্যে দক্ষ কোনও সম্প্রদায়ের পরিচয়ও পাওয়া যায় বা এবং স্থানীয় অনেক প্রাচীন মন্দিরে দেবতার মূর্তিও দৃষ্ট হয় না। শহরের মধ্যে যে কয়েকটা হিন্দু-মন্দির বর্তমান, তাহা সমস্তই আধুনিক বলিয়া মনে হয়। ঐ সকল মন্দিরে প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের ও শিবলিঙ্গের প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ভূঁইয়াটুলী নামক এক মহলার সন্নিকটস্থ একটা মন্দিরে খণ্ড-প্রস্তরে খোদিত পদ্মধারী দ্বিভুজ এক মূর্তি আছে; ইহা সূর্যের নামে পরিচিত, কিন্তু সবিভূদেবের লক্ষণাক্রান্তবলিয়া মনে হয় না। এই মন্দিরটিতে এবং অপরাপর শিবমন্দিরে দৈনিক পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও, মন্দিরভ্যন্তরে কিংবা চতুর্পার্শ্বে আশীর্বাদী পুষ্পের অস্তিত্ব কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। ষ্ণুগলমূর্তির মন্দিরগুলির মধ্যে বোডমবাজার নামক মহলায় জৈনক তেলীজাতীয় ধর্মীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির শ্রেষ্ঠ। এখানে প্রত্যহই ধুমধাম-সহকারে পূজা, আরতি, ও একতান-মূলক স্তোত্রপাঠ হইয়া থাকে। মন্দিরটি চারিটা চূড়াবিশিষ্ট; উচ্চতায় উহার প্রত্যেকটাই গগনস্পর্শী; কিন্তু দেবমূর্তির মূল বেদীপীঠ ও পার্শ্ব-বর্তী শিবলিঙ্গের গর্ভ-গৃহ অত্যন্ত নিম্ন ও ক্ষুদ্রপরিসর; ফলে বহির্দৃষ্টিতে এই মন্দির-সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহা দূর হয়। শহরের অগ্নিকোণে, তিনমাইল দূরবর্তী এক স্তব্ধ অস্বকাননে, নরসিংহদেবের এক মন্দির আছে; মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবতার নামান্তরে ঐ স্থল ‘নরসিং-ধান’ বলিয়া পরিচিত। কান্তিক-মাসের পূর্ণিমাতিথিতে এইখানে প্রকাণ্ড মেলা হয়। সেই মেলা-উপলক্ষে শহরের বাবসায়ীরা স্থানীয় দোকানপাট বন্ধ

করিয়া নরসিং-ধানে চলিয়া যায়। ফলে, সেদিন শহরের অবস্থা উপকথার নিজীব নগরীর স্তায় হইয়া পড়ে। নরসিংহদেবের মূল মন্দিরটি প্রাচীন স্থাপত্য-রীতিতে শিবমন্দিরের প্রণালীতে গঠিত; উহা ইষ্টকনির্মিত; প্রতি বৎসর নিয়মিত উহার সংস্কারও হইয়া থাকে। মন্দিরের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ; উহার তিনদিকে ষাড়ীদের বিশ্রামোপযোগী তিনখানি গৃহ আছে। সদর দরজা উহার একখানি গৃহের মধ্যস্থলে, স্তূতরাং মূল মন্দিরের পশ্চিম-প্রান্তে, নির্মিত। মন্দিরের সীমামধ্যে কাহারও বাসের ব্যবস্থা না থাকায় দেবগৃহ পূজার সময় ব্যতীত দিবারাত্রি তালাবদ্ধ থাকে। শুনা যায়, ৩০০ বৎসর পূর্বে দামোদর মিশ্র নামক গয়ার জৈনক পাণ্ডা এই নরসিংহমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ মোদী, বাদল, ও রামগড় রাজসরকার হইতে বাইশ মোজা ‘খয়রাৎ’ দেওয়া হইয়াছে। দামোদর মিশ্রের অধস্তন দশম স্থানীয় বংশধরেরা বর্তমানে মন্দিরের, স্তূতরাং খয়রাতী মৌজারও, স্বত্বাধিকারী এবং নরসিংহদেবের পূজক। মন্দিরভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরখণ্ডে খোদিত নরসিংহ, গৌরীশঙ্কর ও সূর্যের মূর্তি এবং নবগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। নরসিংহের চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ক্ষুদ্র মূর্তি, ক্রোড়-দেশ শূন্য; মন্দিরাধিকারী মূর্তীটিকে বস্ত্র পরাইয়া তাহার দুই অংশ পাকাইরা হিরণ্যকশিপুর নাড়ীর মত করিয়া নরসিংহ-দেবের হাতে বাঁধিয়া দিয়াছেন। সূর্যের মূর্তিখানিও পূর্কো-ল্লিখিত সূর্যামন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবমূর্তির ন্যায়। এই সকল মূর্তি যে প্রস্তরখণ্ডে খোদিত তাহা আলুনা ও তেরচাভাবে দেওয়ালের গায়ে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। মন্দিরে প্রত্যহ মিঠাই ও ফলদ্বারা দেবভোগ দেওয়ার বিধি আছে। দেব-দর্শনে গিয়া আমরা মন্দির-মধ্যে ঘট বা পুষ্পাদির অস্তিত্ব দেখিতে পাই নাই,—শুধুমাত্র দেবতার চরণামৃত স্ফুরেখায় বহির্গত হইয়া দৈনন্দিন দেবপূজার সাক্ষ্য দিতেছিল। বিহার ও তন্নিকটবর্তী প্রদেশ বৌদ্ধভূমি; এস্থলে বহু বৌদ্ধমন্দির ও বুদ্ধমূর্তি হিন্দুদেবতার নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের আলোচ্য প্রস্তর-মূর্তির ইতিহাসের মূলও বৌদ্ধপ্রভাব প্রচ্ছন্ন আছে কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদের বিচার্য। শহরের মধ্যে পুকুরিয়াবাগী জৈনক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত এক কালীমূর্তি আছে। প্রতিষ্ঠাতার অধস্তন তৃতীয়

পুরুষ দেবীর পূজারী। এতদ্দেশীয় এক রাজা দেবপূজার সাহায্যার্থে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি দান করিতেছেন। প্রতিষ্ঠাতার স্বকীয় সাধন-ভজনের সহায়তাকল্পে স্থাপিত বলিয়া কালিকাদেবীর পূজায় তেমন সমারোহের ব্যবস্থা নাই।

বাঙ্গালীদের বারোয়ারী-উৎসব-নির্বাহের উদ্দেশ্যে শহরের উত্তরাংশে এক চণ্ডীমণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর এইস্থানে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা ও তরুণলক্ষ্মী-যাত্রাগান ইত্যাদি হইয়া থাকে। কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতে কুস্তকার আনাইয়া দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এই মন্দির-সংলগ্ন নাটগৃহে হিন্দীভাষীদের পাঠশালার কার্য চলিতেছে। বিহারপ্রদেশে দেবীমূর্তির সাধারণ নাম কালী-মাজি; এই মন্দিরও তাই স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট ‘কালী-মাজি’ কি মন্দির বলিয়া পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে দেব-প্রতিমা মাত্রকেই পুংলিঙ্গবাচক ‘ঠাকুর’ শব্দে বিশেষিত করা হয়। এইস্থানেও তদনুরূপ ভাষায় দেব-দেবীকে ‘ঠাকুর’ এবং তদনুরূপে গৃহস্থ জীলোককেও ‘মা-ঠাকুর’ বলিয়া সম্বোধন করার প্রথা।

স্থানীয় অধিবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী যদি সামাজিক জীবনের আংশিক প্রতিচ্ছবি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উহাতে তেমন বিশিষ্টতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। শহরে আদিম অধিবাসী সাঁওতালের সংখ্যাধিক্য না থাকিলেও, শহরোপকণ্ঠের ও পল্লী-গ্রামের অধিকাংশ স্থল ইহার অধিকার করিয়া আছে। আকৃতি-প্রকৃতিতে সাঁওতালের হায় অল্প এক শ্রেণীর লোকও এখানে সচরাচর দৃষ্ট হয়; বোধ হয় ইহার পিতৃ বা মাতুল-সম্পর্কে সাঁওতালদের সহিত ঘনিষ্ঠ শব্দের জাতিবিশেষ। এই উভয় শ্রেণীর লোকই দলবদ্ধভাবে যাতায়াত ও বসবাস করিতে অভ্যস্ত। সাধারণতঃ ইহার মটির দেওয়াল-বিশিষ্ট খোলার ঘরে বাস করে। ইহাদের বসতিগৃহ একতল এবং প্রয়োজনানুসারে এক বা ততোধিক কামরাবিশিষ্ট। অধিকাংশ স্থলেই ইহার শয়নের নিমিত্ত দড়ির খাটিয়া ব্যবহার করে। ইহাদের প্রধান খাদ্য ভাত বা রুটি। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর জীলোকদের বাহ ও নাসিকা উন্মিচিত; গাত্রে ও পরিধানে স্থানীয় অধিবাসীর তৈয়ারী ‘গিলেপ’ নামক বস্ত্রের কাঁচুলি ও সাদা

বা লাল পাড়যুক্ত মোটা থান; গলায় হাঁসলা ও পুঁতির মালা; হাতে সাধারণ ধাতুনির্মিত বা কৃষ্ণবর্ণ হাড়ের বা কাচের অনন্ত চুড়ি ও বালা; হস্তপদাঙ্গুলিতে একাধিক অঙ্গুরীয়; কানে সাধারণ ধাতু বা টীন নির্মিত একাধিক মাকড়ি কিংবা ছিপির ঞায় মোটা নলের বা গাছের পাতার অলঙ্কার। প্রত্যহ নিয়মিত দাঁতন বয়ে বলিয়া জীপুরুষ ছেলেমেয়ে সকলেরই দাঁত অত্যন্ত পরিষ্কার। একবস্ত্রে একাদিক্রমে বহুদিন থাকা ইহাদের অভ্যাস। দারিদ্র্যপ্রযুক্ত কেশ তৈলহীন এবং স্নেহ-পদার্থের অভাবে রুক্ষ ও ক্ষুদ্র; খোঁপাধায়া ইহাদের তেমন রুচি আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতির মুক্ত বক্ষে লালিত বলিয়া জীপুরুষ সকলেই মুক্ত স্বাধীন, স্ততরাং হাটবাজারে পথে-ঘাটে জীলোকদের অবাধ গতি। বিলাসাদৃশ্যহীন বলিয়া ইহাদের প্রকৃতিও সরল ও অনাড়ম্বর। ‘পরদেশী’র সাহায্য-কল্পে ইহার অনলস ও হিতব্রতী; সময় সময় যখন ইহাদিগকে পথঘাটের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে, তখন ইহার আমাদিগকে অঘাচিত অনুগ্রহ করিয়া অর্দ্ধ বা একমাইল দূরবর্তী গন্তব্য স্থানেও পৌছাইয়া দিয়াছে। বিলাতী হাওয়া যাহাদের হাড়ে লাগে নাই, এই ইতিহাস অবশ্য তাহাদেরই জীবনের এক অধ্যায়। ভারতের বিশেষত্বের মূলে যে উপাদান নিহিত, আমরা ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রগৃহস্থ বিলাতের অনুকরণ-প্রচেষ্টায় দিনদিনই তাহা হারাইয়া ফেলিতেছি। চর্বির খাইয়া চর্বির আলো জ্বালাইয়া, চর্বির-বিতানের শয্যা আশ্রয় করিয়া এই জাতীয় নিম্নতম শ্রেণীর চন্দ্রজীবীর বিলাসোপকরণের ভাগ কমাইয়া যে সরল অনাড়ম্বর ও শান্তিময় জীবন যাপন করিতেছে আমরা কয়জনে তাহার অধিকারী? তবে হৃৎথের বিষয়, নেশা-রিষের অবাধ বাণিজ্যে এই শ্রেণীর ভারতবাসীও দিন দিন সর্বনাশের পথে বসিতেছে!

হাজারীবাগের সাধারণ ভাষা, ধর্ম ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মূলে যে রহস্য বর্তমান, স্থানীয় পৌরাণিক ইতিহাসের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বিদ্বদন্তী, এই স্থানটিতে মহারাজ জরাসন্ধের কারাগার ছিল। জরাসন্ধের রাজধানী রাজগিরির সহিত দূরত্বের সম্পর্কে কেহ কেহ রোটাসগড়কে জরাসন্ধের কারাভূমি বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু অধিকাংশের মতানুসারে হাজারীবাগই জরাসন্ধের কারাগার বলিয়া স্বীকৃত। হাজারীবাগের ভৌগোলিক সংস্থান

বিচার করিলেও এই কথার যৌক্তিকতা মানিতে হয়। বৃত্তাকার শৈলশ্রেণীবেষ্টিত এই ভূখণ্ড এক বিস্তৃত অধিত্যকার বক্ষে বিরাজমান। প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া দাবী করিতে পারে এমন কোনও জাতির অস্তিত্ব যেমন এখানে পাওয়া যায় না, তেমনই ভাষাগত ও ধর্মগত বিশিষ্টতার হিসাবে স্থানীয় ভাষা ও স্থানীয় ধর্মের ইতিহাসও হ্রস্বাপ্য। অধিকন্তু, এস্থলে অতি পুরাতন মসজিদ বা দেবমন্দিরের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না; এবং জরাসন্ধের অভিশাপানুসারে টিকটিকির মুখ চির-নীরব। ‘পাণ্ডব-বর্জিত’ এইরূপ স্থলে প্রকৃতির কড়া পাহারার মধ্যে রাজশ্রবণকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা মগধরাজ হয়তো অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিয়া থাকিবেন। এই স্থানের প্রান্ত-সীমাবর্তী শৈলশ্রেণীর অনেক স্থানে এখনও নাকি তৎকালীন প্রাচীন ইতিহাসের ভগ্ন-স্থাপত্য-নিদর্শনও আছে।

ইংরেজ-আমলের আদিযুগে এস্থলে গোলা-বারুদের প্রকাণ্ড কারখানা ছিল এবং তরুণলক্ষে শহরের একাংশে পল্টনের ছাউনি ছিল; অধুনা তাহার চিহ্ন নাই। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া শহরে ঔপনিবেশিকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির দামও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থানীয় এক বিখ্যাত জমিদার-দেখী সওয়া দুই বিঘা জমির সমান। পূর্বে ঐরূপ এক বিঘা জমির দাম ২০ টাকার বেশি ছিল না, এখন প্রায় ২০০ হইয়াছে। জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তানুসারে কিংবা খাসমহলের মধ্যে জমারন্দী হিসাবে কেনা যাইতে পারে।

পার্বত্যভূমি বলিয়া হাজারীবাগ ও তমিকটবর্তী স্থান-সমূহের বাহ্যদৃশ্য প্রকৃতই নয়নরঞ্জনক। মোটরপথে হাজারীবাগ-শহরে আসিতে এক-একস্থলে শৈলবৃক্ষরাজির দিগন্তবিস্তৃত তরঙ্গায়িত শোভা ও শৈলস্তূপ দেখিয়া অন্তরে স্বতঃই অনির্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয়। শহরে পৌঁছিয়াও ঐরূপ প্রাকৃতিক শোভার অভাব বোধ করিতে হয় না। স্থানীয় রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী প্রভৃতি সর্বস্থানেই পার্বত্যীয় দৃশ্য বর্তমান। শহরের অদূরপ্রান্তে কানারী, মারহট্টা, বামনবেগ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলখণ্ড বিরাজমান; উন্মুক্ত মাঠে তরাইয়ের পূর্ণ লক্ষণ; এক-একস্থানে বিস্তৃত কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমি; তাহারই পার্শ্বে আবার রক্তবর্ণ মৃত্তিকা-স্তূপ; স্থানে স্থানে শালের বন, শিশুর বন, বনকেয়ার বন, আর মাঠে মাঠে সর্বত্রই নানাবর্ণের পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ঝাড়। প্রায় রাস্তাই সরল ও দুই পার্শ্বের

সারিবদ্ধ নানাজাতীয় বৃক্ষের ছায়ায় শিথল-শীতল; অধিকন্তু, ইহা প্রায়শঃই জন-বিরল। শহরের উত্তর-পার্শ্বে কয়েকটি হ্রদ আছে। উহার একটি হ্রদ হইতে জল পাম্প করিয়া জেলখানায় ও তৎসংলগ্ন স্থানসমূহে নেওয়া হয়; এইজন্ত একটি বৃহৎ যন্ত্র হ্রদের তীরে সংস্থাপিত। মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে আছে বলিয়া হ্রদের জল অনাবিল। ভ্রমণ-বিলাসীর পক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই হ্রদের তীরে বায়ুসেবন যেমন হিতকর তেমনই ক্ষুদ্রিকায়ক। শহরের পশ্চিমাংশেও একটি অগভীর ঝিল আছে; উহা নানাবিধ জলচর পক্ষী ও জলপুস্পের শোভায় চিরসুন্দর। পুষ্করিণী ও দীঘির সংখ্যাও অল্প নহে; অধিকাংশ জলাশয়ই নির্মল বারির্পূর্ণ;—একটি দীঘির জল এত পরিষ্কার যে উহা ‘মিঠাতালাও’ নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল দীঘি-পুষ্করিণীর জল অধিকাংশ স্থলে শুধুমাত্র পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ কূপের জল গৃহস্থের ব্যবহার্য। অধিকাংশ স্থলে গৃহস্থের বহির্বাটীতে এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রকাশ্য পথিপার্শ্বে কূপ খনিত। অনেক ভাড়াটে বাড়ীতে কূপের অস্তিত্ব না থাকায় ভাঁড়ীর সাহায্যে দুই টান জল এক পয়সা দরে আনা হইয়া গৃহস্থকে গৃহকাঁথাদি নির্বাহ করিতে হয়। পানীয় জল ও সাধারণ ব্যবহার্য জলের দরে তারতম্য আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কূপ হইতে উহা সংগৃহীত হয়। স্ত্রীলোকেরা ভাঁড়ীর কার্য করে না এবং গৃহকাঁথ্যে ব্যাপৃত চাকর দ্বারাও সহজে এ কার্য করান যায় না; স্ততরাং ইহার জন্য পৃথক লোক চাই।

শহরের দক্ষিণভাগে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যদেশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে। উহা ‘নাল’ নামে পরিচিত। শহরের পাকা ড্রেনগুলি ও ময়লা-নিকাশের প্রণালী এই নালার সঙ্গে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র খালের মুখে মিশিয়াছে; আবর্জনা ফেলিবার স্থানও উহারই সন্নিকটস্থ একটি কাঁচা রাস্তার পাশে। স্থানে স্থানে গ্রাম্য সাকো বা পাকা পুল নালার বক্ষে নির্মিত হইয়া পল্লীবাসীর চলাচলের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। কদমা, নালাপাড়া ইত্যাদি গণগ্রামগুলি এই নালার তীরস্থ এবং সুরতানা, ক্ষীরগাঁও প্রভৃতি পল্লীগুলি অদূরবর্তী। নালার গর্ভে ও পার্শ্ববর্তী বহুস্থলে প্রচুর অল্প পড়িয়া রহিয়াছে। হাজারীবাগের অন্তঃপাতী কোডারমা নামক স্থান অল্প ও কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। (ক্রমঃ)

বাঁধ ও বন্যা

(পূর্বানুষ্ঠান)

শ্রীমদোজ বসু

বিরামবাড়ি কাছারিঘরের বারাণ্ডা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়, ঘরের মধ্যে ফরাসের উপর ত্রিলোচন ম্যানেজার নিবিষ্ট ভাবে খাতাপত্র লিখিতেছে। রামেশ্বর ও বল্লভ ঘুরিতে ঘুরিতে সেই বারাণ্ডায় আসিল। ত্রিলোচন পেনের কলম কানে শুঁ জিয়া শশব্যস্তে বাহিরে আসিল। সে তটস্থ হইয়া রামেশ্বরের পায়ে প্রণাম করিল, আর উঠিতেই চায় না।

রামেশ্বর। তুমি কে ?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে...অধীন শ্রীত্রিলোচন ম্যানেজার। কোলিক পদবী পাকড়াশি। রাজরাজ্যেশ্বর হুজুরের শ্রীচরণের দাসাঙ্গদাস।

রামেশ্বর। বিনয়টা একটু কম করো হে ত্রিলোচন, তাতে রাগ করব না। ম্যানেজার বললেন—কাদের ম্যানেজার, কোন এজেন্টের ?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হুজুরের—

রামেশ্বর। কিন্তু হুজুর ত কিছু খবর রাখেন না—

ত্রিলোচন। আজ্ঞে, রাখবেন বই কি...নিশ্চয় রাখবেন। বাড়ি কেনা হয়েছে যখন, ম্যানেজার ত ম্যানেজার।—ইট-কাঠ দরজা-জানলা উঠানের আমগাছটার অবধি খবর নিতে হবে—

বল্লভ। মজুমদারেরা এই বাড়ি করার পর থেকেই তুমি চাকরিতে আছ ?

ত্রিলোচন। ভিত বসানোর দিন থেকে—

রামেশ্বর। এইবার কিন্তু চাকরিটা খসল, ম্যানেজার।

ত্রিলোচন। সে কি হুজুর, ঘোড়া কিনতে বাধল না, চাবুকে আটকে যাবে ?

বল্লভ। ধরো, মজুমদারদের মস্ত বড় মহাল ছিল—পোষাতো। রায় মশায়ের মাত্র এই একটা বাড়ি—

ত্রিলোচন। শুধু বাড়ি কেন হবে ? এর সামিল দশ বিঘে জমি—

বল্লভ। হ'ল তাই। তার জন্ত গোটা দুই মালি রেখে দিলেই হবে।

ত্রিলোচন। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) মালির কাজ আমিও জানি হুজুর। গাছপালা যা দেখেছেন, সমস্ত আমার হাতের। রামেশ্বর। মালির কাজও করতে হ'ত, ম্যানেজার ? আর কি কি করতে ?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে মামলা-মোকদ্দমার তহির-তাগাদা, খাতাপত্র লেখা—ঘর বাঁট দেওয়া, এখানে বাবু এলে রান্না করা, জল তোলা—

বল্লভ। বাবুর মাথায় ছাতি ধরা, পায়ের জুতো এগিয়ে দেওয়া—

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা-ও করতে হ'ত।

রামেশ্বর। ম্যানেজারের ডিউটি ত অনেক দেখছি। মাইনে কত ?

ত্রিলোচন। তিন টাকা। তা-ও তিন বছর দেয় নি, বিষয় বেচে ফেলছে, ও আর দেবে না। মারা গেল।

রামেশ্বর। পোষাতো ?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ.....তা পুঁথিয়ে যেত একরকম করে। দু-এক পয়সা এদিক সেদিক আছে কিনা ! তবে আশীর্বাদটা চাই। ঐ হল আসল কিনা.....হুজুর, ঐটে যেন সর্বদা থাকে—

রামেশ্বর। তা হলে চাকরি আমার করবেই ?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ.....নইলে আমিই বা চাকরি পাব কোথায় ? আর আপনিই বা ম্যানেজার পাবেন কোথায় ?

রামেশ্বর। কিন্তু তোমার পুরাণো মালিকের মতো চলবে না.....আমার কাছে অসুবিধা বিস্তর।

ত্রিলোচন। তা ঠিক.....বিস্তর অসুবিধা।

রামেশ্বর। এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছ ? কি অসুবিধা দেখলে, বলো ত।

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হুজুর এই এক নম্বর দেখুন না.....
খাতা পত্রে মালিকের নাম ছিল—সন্ধ্যারানী দেবী, কেটে
করতে হল রামেশ্বর রায়। দিগ্গজ এক যুক্তাক্ষর.....ই-কার
আ কার...হাঙ্গামা কত!

রামেশ্বর। বটে। নাম কেটে খাতায় নতুন নাম বসানো
হয়ে গেছে এর মধ্যে? আচ্ছা নিয়ে এসোত দেখি।

[উৎফুল্ল মুখে ত্রিলোচন ঘরে ঢুকিয়া খাতাপত্র খুঁজিতে
লাগিল।]

বল্লভ। লোকটা বড় জুরোচোর রায় মশায়।

রামেশ্বর। তা না হলে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি আসবেন,
এখানে তিন টাকা মাইনের ম্যানেজারি করতে?

বল্লভ। টাকা পেলে ত্রিলোচন পাবে না, এমন কাজ
নেই।

রামেশ্বর। বটে! আমার টাকা আছে, টাকা দিতে
পারব। তা হলে কাজ পাওয়া যাবে, কি বল?

বল্লভ। আপনি সত্যি সত্যি চাকরি দেবেন না কি রায়
মশায়? ওকে যে মোটে বিশ্বাস করা যায় না।

রামেশ্বর। বিশ্বাস করব না.....কিন্তু চাকরি ওকে
আমি দেব।

[ত্রিলোচন খাতা পত্র লইয়া আসিল, রামেশ্বরকে দেখাইতে
লাগিল]

নতুন খাতা তৈরি হয়ে গেছে দেখছি। তুমি খুব
করিৎ-কর্মী লোক। চাকরি আমি তোমাকে দিলাম,
ম্যানেজার।

[ত্রিলোচন তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িয়া আবার প্রণাম করিল]

বল্লভ বলছে, টাকা পেলে তুমি পার না এমন কাজ নেই।

ত্রিলোচন। (মাথা চুলকাইয়া) আজ্ঞে হুজুর, বল্লভ
আমায় অনেক দিন থেকে জানে কিনা!

রামেশ্বর। টাকা আমি দিচ্ছি। এই একমাসের মাইনে
বখশিস।—

[রামেশ্বর জামার ভিতর হইতে তিনটি টাকা বাহির
করিয়া দিল। ত্রিলোচন আদেশের প্রতীক্ষায় রহিল]

রামেশ্বর। আমি বলে দিয়েছি, বাড়ির অন্তত এই ঘরগুলো
এখনই আমার চাই। ইচ্ছে করে ত ওরা পিছনে আস্তাবলের

দিকে গিয়ে থাকতে পারে। জিনিষ-পত্র সরাজে না, কি করছে
ওরা—বুঝতে পারছি না। আমি আর যেতে চাই না।
একটা ডানপিঠে মেয়ে আছে...বড্ড ট্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক কথা
বলে—

ত্রিলোচন। সে কি হুজুর, তাঁবেদারেরা রয়েছে—আপনি
যাবেন কেন?

রামেশ্বর। আমার এমন লেটেল বল্লভদাস—তারও
উৎসাহ দেখছিলেন। মেয়েটার ভয়ে সে-ও মুসড়ে গেছে।

বল্লভ। রায় মশায়, মেয়েদের মাথায় লাঠি মারা যায় না;
কিন্তু তাদের কথা এসে শুলের মতো বেঁধে। ওরাই জিতে
যায়।

রামেশ্বর। সেই জেঠা মেয়েটা যদি কিছু বলে ত্রিলোচন,
তারই সামনে জিনিষপত্র উঠানে ছুঁড়ে ফেলবে। পারবে?

ত্রিলোচন। আলবৎ। আমার কাছে মেয়ে-পুরুষ নেই—

[ত্রিলোচন চলিয়া গেল]

রামেশ্বর। (সহাস্তে) ও পারবে।

[হঠাৎ পকেট হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া রামেশ্বর
ঢকঢক করিয়া খানিকটা গিলিল]

মঞ্চ ঘুরিয়া পরবর্তী দৃশ্য আসিল।

বিরাম-বাড়ির ভিতরের দিককার একখানা খোড়ো আট-
চালা। কয়েকটি মুটে ঘর হইতে জিনিষ-পত্র বাহির করিয়া
সেখানে স্তুপীকৃত করিতেছে। হেরিকেন হাতে নন্দলাল
তদারক করিতেছে। সন্ধ্যারানী উত্তেজিত ভাবে দাঁড়াইয়া
আছেন।

সন্ধ্যা। নিলাম ঠেকাবার দরকার নেই, নন্দলাল। বিক্রি
হয়ে যাক, সমস্ত বিক্রি হয়ে যাক। জিনিষ-পত্র বিষয়-আশয়
কিছু রাখব না, এ-দেশের মুখে লাগি মেয়ে মেয়ে নিয়ে
কলকাতায় চলে যাই। কোনদিন আর আসব না।

নন্দ। দশ-বিশ জন লোক খারাপ থাকতে পারে, রাণীমা।
গোটা দেশ কি দোষ করল?

সন্ধ্যা। হাঁ—দেশটাই খারাপ। চোরের দেশ, শয়তানের
দেশ, খুনের দেশ। এসে একবার তোমাদের মতলবে বিরাম-
বাড়ি বিক্রি করলাম, আবার মেয়ের গয়না বিক্রি করে নিলাম
ঠেকাতে বলছ। সে টাকাও সরিয়ে নেবে। দেখছ না,

একটা মাসে মেয়ে আমার কাছ থেকে সরে সরে কতদূরে চলে গেছে। কলকাতার এরিষ্ট্রোক্রাট সমাজে যে স্বরমার নাম ধরে না—সে এখন একটাই ধূলো মেখে দিনরাত চাষা পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। বোঝ দিকি ব্যাপারটা।

নন্দ। বাপের গুণ পেয়েছে রাণী-মা, বাবুও এই রকম করতেন।

সন্ধ্যা। কেন করে? তোমরা জান না নন্দলাল, কিন্তু মায়ের চোখ কাঁকি দেওয়া যায় না। আমি জানি। নির্মল এই করে বেড়ায়—সে খুশি হবে, তাই করে।

নন্দ। আমরা বুঝি, নির্মলের পরে আপনার অত আকোশ কেন?

সন্ধ্যা। তোমরা বলা, মেয়ে দিয়ে নির্মলকে হাত করতে। অসম্ভব। মেয়েকেই তারা হাত করে নেবে। করছে-ও। ডাকাত রামেশ্বর খুন করল বাপকে, জুয়াচোর নির্মল কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েকে।

নন্দ। কিন্তু প্রমাণ নেই, রাণীমা।

সন্ধ্যা। আমি নিঃসন্দেহ।

নন্দ। তাতে দশজন বুঝবে না, আদালতের হাকিম বুঝবে না।

[স্বরমা আসিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইল]

সন্ধ্যা। প্রমাণ আমি জোগাড় করবই। রামেশ্বরকে ফাঁসিতে ঝোলাবো, নির্মলের কবল থেকে আমার মেয়ে আমি বাঁচাবোই। খুকী, এদেশে আমরা আর থাকব না।

স্বরমা। এদের আমার বড় ভাল লাগে মা। জুর্ভাগা গরিব প্রজা—এরা আমাদের সন্তান।

সন্ধ্যা। প্রজা আর থাকবে না। এষ্টেট নির্লাস হয়ে যাবে। আমরা চলে যাবো। মেয়ে আমার পর হতে দেবো না।

স্বরমা। মা—মা!

[মা ও মেয়ে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। হৃ-জনেরই চোখে জল।]

সন্ধ্যা। তুই ছাড়া আর আমার কেউ নেই খুকী। তোকে আমি ছাড়ব না—কিছুতে না। এই চোরের দেশ, জোচ্চরের দেশ, খুনের দেশ থেকে আজই আমরা চলে যাব।

[ত্রিলোচন প্রবেশ করিল]

ত্রিলোচন। আজ্ঞে, আজ না গেলেও হবে। আস্তাবলে গিয়ে থাকতে পারেন। তবে জিনিষ-পত্র সরিয়ে সব খালি করে দিতে হবে। এসুনি—

সন্ধ্যা। তুমি—

ত্রিলোচন। ঠিকই চিনেছেন। দাসাহুদাস শ্রীত্রিলোচন ম্যানেজার। মৌলিক পদবী পাকড়াশি।

নন্দ। রামেশ্বরের ম্যানেজারি শুরু করেছে এর মধ্যে?

ত্রিলোচন। ভায়া, চাকরি হল তালগাছের ছায়া। সকাল বেলা একদিকে—হুপুরে আর একদিকে। এদিন মজুমদার-হুজুরের হুকুম তামিল করেছি। এখন রায়-হুজুরের হুকুম তামিল করতে এসেছি।

নন্দ। হুকুমটা কি শুনি?

ত্রিলোচন। মালপত্র এসুনি খালাস করো। নইলে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

নন্দ। এত বছর মজুমদারের হুন খেয়েছ—পারবে?

ত্রিলোচন। কেন পারবো না? টাকা পেলে ত্রিলোচন ম্যানেজার পারে না, এমন কথ্য নেই। এই যে পাড়াগাঁয়ের নড়বড়ে এই পুরানো বাড়ি—গায়ে ছুড়ে মারলেও কেউ নেয় না—আমি নির্মলকে ভুজুভাজাং দিয়ে চার হাজার টাকা রায়-হুজুরের ঘাড়ে গছিয়ে দিলাম...পারি নি?

সন্ধ্যা। টাকা পেলে তুমি সব করতে পার, ত্রিলোচন?

ত্রিলোচন। নিজের মুখে জাঁক করব না, রাণীমা—

সন্ধ্যা। আমি তোমায় টাকা দেবো—অনেক টাকা দেবো—

[হঠাৎ দূরের কোন ঘর হইতে বেহুবা পিয়ানো বাজিয়া উঠিল।]

স্বরমা। ঐ-রে পিয়ানোর ঢাকনি খুলে এসেছি বুঝি... কুকুরটা উঠে নাচানাচি করছে। না—তাতেই বা এমন হবে কেন?

[স্বরমা ছুটিয়া চলিয়া গেল]

সন্ধ্যা। অনেক টাকা দেবো, ত্রিলোচন। এ বাড়ির বর্ত্তাকে খুন করেছিল রামেশ্বর রায়। তার সহকারী নির্মল, বলভ—এরা সব। কিন্তু তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে।

ত্রিলোচন। না থাকলেও তৈরি করা যায়, রাণীমা। টাকা পেলে ত্রিলোচন ম্যানেজার আকবর বাদশার আমলেরও দলিল বানাতে পারে।

নন্দ। মিথ্যে কিছু কর ত, খুন কবে ফেলব। যা সত্যি, তাই চাই।

সন্ধ্যা। টাকা চাও? আসি—

সন্ধ্যারাণা তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে গেলেন। মঞ্চ ঘুরিয়া পরের দৃশ্য আসিল।

[বিরাম বাড়ির একটি ঘর। একপাশে পিয়ানো আর এক পাশে গদি-আটা স্প্রিংয়ের খাট। রামেশ্বর টুলের উপর বসিয়া বিস্তীর্ণকম বেতাল। সুরে মহানন্দে পিয়ানো বাজাই-তেছে। অগ্নিসূক্তিতে সুরমা ঘরে ঢুকিল।]

সুরমা। আমার পিয়ানোয় হাত দিয়েছে কোন উল্লুক শুনি? ..কে?

[রামেশ্বরকে দেখিয়া সুরমা একটু অপ্রতিভ হইল]
আপনি? ঘরের জিনিষ পত্র হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করেছেন...একি অত্যাচার?

রামেশ্বর। উহ...অত্যাচার হবে কেন! বাজাচ্ছি। ভাল না লাগে, তুমি বাজাও।

[পিয়ানো ছাড়িয়া রামেশ্বর দরজা আটকাইয়া দাঁড়াইল]
—বাজাও।

সুরমা। বাজাব না...পথ দিন, বেরিয়ে যাচ্ছি।

[রামেশ্বর হাসিতে লাগিল]

হাসছেন? আপনার মতলব কি?

রামেশ্বর। মতলব ভালোই। আমি মত পরিবর্তন করেছি, সুরমা।—

সুরমা। তার মানে?

রামেশ্বর। ভেবে দেখলাম, এই আঁধার রাত্রে বর্ষা-বাদলার মাঝখানে বাড়ি থেকে পথে বের করে দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কাজ হবে। তার চেয়ে বসে বসে ছোটো মিষ্টি গানই শোনা যাক।

সুরমা। হিংস্র জন্তুর সামনে গান হয় না।—

রামেশ্বর। ভয় হয়?

সুরমা। না, ঘৃণা হয়। একশোবার বলছি আমি ভয় করি নে। সরে যান। এখনই বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি। আমা-
দের পথই ভালো—

রামেশ্বর। কিন্তু পথেও হিংস্র জন্তুর অভাব নেই। বেশ ত...না হয় হৃদয় পরেই যেও। নির্যাস...আম্বক...বরঞ্চ একটা আলো-টালো ধরে এগিয়ে দিয়ে আসবে। আর এই ফাঁকে।—কি বললে ওর নাম? পিয়ানো...ঐ পিয়ানোর একটা সুর দাও ত শুনি। মাইরি, ঠাট্টা করছি না। বড় খাসা বাজনা। আমি কোনদিন এ শুনিনি।

সুরমা। আপনার উদ্দেশ্য কি, রায় মশায়? ভেবেছেন আমি একলা।—অগহায়। ঐদিকে নন্দ-দা আরও আট দশজন রয়েছে—চীৎকার করলে ছুটে আসবে—

রামেশ্বর। আর তুমিও বুঝি ভেবেছ, আমি একলা। [রিভলভার বাহির করিলেন] এই যে সঙ্গে রয়েছেন। এঁরা পাঁচজন।—পাঁচটা চেয়ারে শুনি ভর্তি রয়েছে। অতএব চীৎকার না করে পিয়ানো বাজিয়ে বেশ টেঁচিয়ে একখানা ভাল-বাসার গান গাও—

সুরমা। (চমকিয়া) রিভলভার?

রামেশ্বর। আমার ভালবাসা আদায়ের যন্ত্র। জমাখরচ লেখা যে আমার আসে না।—তা হলে দেখতে ভালবাসার পাত্রী আমার একটির ছুটি নয়। অবশ্য খরচ সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেছে।—যতক্ষণ রিভলভার, ততক্ষণ ভালবাসা। বলো, ভালবাসি—বলো, বলো—One...Two...

[রিভলভার সুরমার মুখের সামনে ধরিল]

সুরমা। ভালবাসি—

রামেশ্বর। হাঃ—হাঃ—হাঃ [বিকট হাসি হাসিল।
হাসিতে হাসিতে মনের ভুলেই রিভলভার পিয়ানোর ধারে ফেলিয়া রামেশ্বর খাটের উপর আসিয়া বসিল]

বিছানা এত নরম—বাপরে বাপ—যেন গিলে থাকে। ভয় করে, রাক্ষসের মতো গ্রাস করে ফেলে বুঝি...খাসা গদি ত। মদের চাইতেও বেশী নেশা ধরায়।

সুরমা। আপনার এত টাকা...গদির দামও এমন কিছু নয়। ইচ্ছে করলেই ত—

রামেশ্বর। কিনতে পারি। তা পারি অবশ্য। টাকা দিয়ে গদি কেনা যায়, আর মুখের সামনে রিভলভার ধরে প্রেমের স্বীকারোক্তিও আদায় করা যায়। কিন্তু মুক্তিলাভ এই, শেষকালে আর গদি পেতে দেবার মাছ পাওয়া যায় না।...সত্যি সুরমা, আমার একটা গদি কিনবার সখ হচ্ছে। নেশার ঘোরে সখ

হচ্ছে, নেশা কাটিলে কি হবে জানি না। ইচ্ছে হচ্ছে—একটা মানুষ পেতাম, যে আপন ইচ্ছায় ঝেড়ে বুড়ে গদি পাতবে, আর—রিভলভারের ভয়ে নয়, আপন ইচ্ছায় বুকের ভেতর থেকে বলবে ‘ভালবাসি’। খুঁজে পেতে দিতে পার ? হাঃ—
হাঃ—হাঃ [খানিকটা হাসিয়া হঠাৎ চুপ করিল] তুমি পারবে না, কেউ পারবে না। পৃথিবী খুঁজেও সে মানুষ মিলবে না—
সুরমা। পৃথিবীটা ছোট জায়গা নয় রায় মশায়, তার সমস্ত অঞ্চলটা কে খুঁজে দেখেছে বলুন—

রামেশ্বর। কিন্তু রায়মশায় যে আয়নার তাঁর মুখশ্রী বেশ প্রাণধান করে দেখেছেন! এই মনোহর কন্দর্প-কান্তি, তার উপর দেশব্যাপী এমন সুনাম—মেয়েমানুষ কি বলো, এদিনে একটা কুকুর পর্যন্ত বশ করতে পারলাম না—নিজের ইচ্ছেয় কাছে আসে না, দূরে দাঁড়িয়ে যেউ যেউ করে—শেষ কালে শেকল বেঁধে টেনে আনতে হয়। ...সে যাকগে, নিজের ইচ্ছেয় না হোক—পরের ইচ্ছে বলে একটা বস্তু ত আছে। একটা গান গাও, সুরমা দেবী। রামেশ্বর রায় বিশ্রাম স্থখ উপভোগ করছেন—তাঁর ইচ্ছেয় ঐ পিয়ানো বাজিয়ে মধুর করে একটা গান গাও। (বজ্রকণ্ঠে) গাও—

[সুরমা গান ধরিল]

গান

এত হাসি আর এত ভালবাসা—ধরা এত সুন্দর!

ও পথিক, তুমি নিঃশ্বাস ছেড়ে চলেছ তেপান্তর।

আমার খোপার ফুলটি দিলাম হাতে—

ফুল হাতে নিয়ে বসো না বন্ধু অভিনাতে।...

এত তারা জলে, বাকমক করে সুন্দর নীলাকাশ।—

পথিক, তোমার পথ আঁধার—একা ফেল নিঃশ্বাস।

আমি জানালায় প্রদীপ ধরেছি তুলে—

এ আলোর আজি—হাসো ও বন্ধু

মন খুলে।

[গানের শেষে রামেশ্বর খাটের উপর উঠিয়া বসিল]

রামেশ্বর। তুমি সুরমা, বড্ড যে দোমাক করতে আমাকে ভয় করো না। আজ ? আজকে কি হল ? ভয় পাও নি, তবে গান করছ কেন হে ?

সুরমা। ভয় পেয়ে নয়, রায় মশায়। আপনার রিভলভার

২৬—৫

এই পিয়ানোর উপর পড়ে আছে। ‘দয়াকর হ’লে আমিই ঐ দিয়ে ভয় দেখাতে পারতাম।

রামেশ্বর। তাইতো হে! তা বটে!...কিন্তু যখন বলেছিলে ‘ভালবাসি’—রিভলভারের নলের সামনে কাতর কোমল কণ্ঠে বললে—‘ভালবাসি’। কেন বললে ?

সুরমা। ভয়ে ? না—ও হতে পারে রায়মশায়, ভাল হয়তো বাসিই।

রামেশ্বর। মিথ্যা কথা। ও আমি বিশ্বাস করিনে। রামেশ্বর রায়কে কেউ ইচ্ছে করে ভালবাসে ? এই কুৎসিত ইতর জানোয়ারকে মানুষে ভালবাসতে পারে ?...তুমি ভয় করেছিলে—...সকলে ভয় করে, তুমিই বা এমন সৃষ্টিছাড়া কেন হবে ? কেন ভয় করবে না শুনি ?

সুরমা। আপনার ভয় দেখানোর মধ্যে কান্না ফুটে বেরোয়—

... রামেশ্বর। বলো কি !

সুরমা। ‘ভালবাসি’ বলাবার যন্ত্র থাকে রিভলভার দেখাতে হয় সে অতি হতভাগা—দয়ার পাত্র—

রামেশ্বর। এ নতুন কথা বলছ, সুরমা।

সুরমা। সত্যিকথা।

রামেশ্বর। এমন ক’রে কেউ কোনদিন আমায় বলে নি। পনের বছর পথে পথে বেড়িয়েছি—...একটা মানুষ দেখলাম না, নিভয়ে যে কাছে আসে। কেবল এসেছে নিশ্চল আঁব বস্ত্রভ। এসেই বলল, ‘বীথ বীথব, টাকা দেও।’ ওরা কাছে আসে, পরামর্শ করে, সহজভাবে আলাপ করে। এতে আমাব আত্মসম্মানেও লাগে—

সুরমা। আত্মসম্মানে লাগবার কি আছে রায় মশায় ?

রামেশ্বর। মনে হয়, সত্যি আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। রামেশ্বর নিশ্চলের কথা ধরিনে—...ওদের জাত আলাদা—গবর্ণমেন্টের জুকুট যে গ্রাহ্য করে না, রামেশ্বরকে সে ভয় করতে যাবে কেন ? আর বস্ত্রভ হ’ল ডাকাত লেঠেল—তার কথাও না হয় ছেড়ে দিলাম।...কিন্তু তুমি এক ফোঁটা মেয়ে—তুমিও ভয় পাও না, ...আমার রাগের মধ্যে কান্না খুঁজে পাও। বলোতো, এতে মনে দুঃখ হয় না ?

সুরমা। (অন্ত প্রসঙ্গ পাড়িল) রায় মশায়, গদির উপর দিবি দেখাচ্ছে আপনাকে। গদি পাতবার মানুষ আমি

মিলিয়ে দেব। বিরামবাড়ি কিনেছেন,—এবার মৌটির গাড়ি কিনুন। এই যে দিয়ারি একটা আংটিও কিনেছেন..... ঘড়ি কিনুন, শাল-দোশালা কিনুন—

রামেশ্বর। আগে এনে দাও সেই মানুষ.....সব হবে। এই আংটি আমার মানায় না, সরমা। বলন্ত বলন্ত, যাকে ভাল লাগে তাকে দিয়ে দিতে। দিতে ত পারি, কিন্তু নেবে কে? জোর করে পরিয়ে দিলেও শেষকালে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা রিভলভার উঁচিয়ে ত সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারব না?.....তুমি নেবে সুরমা এই আংটি? তুমি আমার ভয় করো না.....নিঃসঙ্কোচে কাছে এসে নিজের ইচ্ছায় আঙুলে পরতে পারো সরমা?

(সুরমা হাসিমুখে কাছে আসিয়া আংটি পরিল)

সাবাস! নির্মল লোভ দেখায়, এই বাধ দিয়ে দিচ্ছি, তাতে নাকি দেশ-বিদেশে আমার নাম-ডাক হবে...সরকারি খেতাব মিলবে.....লোকে শ্রদ্ধা করবে, সম্মান করবে..... দেবতা বলে পূজা করবে। আরো কত কি। আমি এসব চাইনে।.....তোমাদের মতো সামান্য সাধারণ মানুষ করে নিতে পারো আমার? দশজনকে কাছে আসবে, হাসবে, সুখ-দুঃখের কথাবার্তা বলবে.....আর, বড়ো হয়ে গেছি সুরমা,

চিরকালের মতো যেদিন চোখ বুজব, সেদিন শিয়রের কাছে বসে অন্ততঃ একটা মানুষ একটুখানি চোখের জল ফেলবে—
সুরমা। আপনার বুঝি কেউ কোথাও নেই।

রামেশ্বর। হয়ত ছিল.....বেন স্বপ্নের কথা। তারপর মরে গেলাম, মরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লোকে দেখে, রামেশ্বর ভয়স্কর, রামেশ্বর সর্কনাশা, রামেশ্বর টাকার পাহাড়। আর গভীর রাত্রে তোমরা সবাই যখন ঘুমাও রামেশ্বরের ভূত না ঘুমিয়ে অবিরাম পাগচাচি করে বেড়ান... ভাবেন, পায়ের নীচে একটুখানি মাটি পেতাম, অতি-জীর্ণ একটা ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে ছটো কথা বলব।.....সে থাকগে, তোমরা সুখী মানুষ—এসব বুঝবে না কোনদিন।

[রামেশ্বর হাসিয়া ফেলিল]

ছত্তোর। আজ আমার হল কি? নেশার ঘোরে বড্ড ঘুম ধরেছে, আমি ঘুমোব।

(রামেশ্বর ওইয়া পড়িল)

সুরমা চলিয়া গেল। আলো নিভিল। মঞ্চ ঘুরিতেছে। এই সময়ে আধ-অন্ধকারে দেখা গেল, সুরমা ফিরিয়া আসিয়া সঘন্থে নীলাধরের গায়ে একখানি চাদর ঢাকা দিয়া বাইতেছে। আলো জ্বলিলে দেখি, পরবর্তী দৃশ্য আসিয়াছে।

(ক্রমশঃ)



পুস্তক পরিচয়

মহাত্মারত্নী—শ্রীযুক্ত কান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত।
মূল্য - ৮০। প্রকাশক—এ, মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স, ৭ কলেজ
স্টোর, কলিকাতা।

মহাত্মারত্নের সমস্ত আখ্যান বস্তু ১১০ পৃষ্ঠায় সরল ও
মনোহারী ভাষায় শ্রীযুক্ত কান্তিকচন্দ্র দাস মহাশয় ছেলেদের
ও মেয়েদের যেন গল্প শুনাইয়া চলিয়াছেন। এই পুস্তকখানি
শিশু সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ বলা যাইতে পারে।

এখন বাঙ্গলার শিশু সাহিত্য আর শিশু নাই—এই প্রকার
ভারতের সংস্কৃতি পরিবেশনের আসরগুলি শিশুদের মনো-
বিকাশের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। পুস্তকখানি মহাত্মারত্নের আঠার
পর্কেরই নামে ১৮টি অধ্যায়ে লিখিত, প্রত্যেক অধ্যায়ের মর্মকথা
বুঝাইবার জন্য এক এক পর্কে সুন্দর চিত্র ও গ্রন্থকার সম্মিলিত
করিয়া পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্কুল বিশেষতঃ
বালিকা বিদ্যালয়ে এই প্রকার পুস্তক পাঠ্য হওয়াই প্রয়োজন।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

উৎসবে পদকপ্রাপ্তী ছাত্রী

গত ১৬ই ফাল্গুন সিনেট হলে—বিশ্ব রণ উদ্‌যাদনার মধ্যে
কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব হয়। মহিলারাও
পদক গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহামান্য চান্সে-
লার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত
মহিলাগণ বর্তমান বৎসরে পদক পাইয়াছেন।

“জগৎ-তারিণী”—স্বর্ণপদক—শ্রীমতী মানকুমারী বসু
(শ্রেষ্ঠ মৌলিক বাঙ্গালা পুস্তক জ্ঞাত)।

“ভুবনমোহিনী”—স্বর্ণপদক—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী
(মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মৌলিক রচনা)

“মৌকন্দা সুন্দরী”—স্বর্ণপদক—কমলা দেবী, এম.এ.; মেয়ে
গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বাঙ্গলাতে (রমেশ দত্ত) জীবনী রচনার জন্য;
ইনি এই পদক পূর্বে ছুইবার পাইয়াছেন।

“নলিনী সুন্দরী”—স্বর্ণপদক—শরদিন্দু দেবী (মেয়ে
গ্রাজুয়েটদের মধ্যে জীবনী সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য)।

“নাগার্জুন”—স্বর্ণপদক—অসীমা মুখার্জি, এম.এস.সি,
(রসায়ন গবেষণার জন্য স্বর্ণপদক ও ৫০০০)।

“কমল রাণী”—স্বর্ণপদক—উমা সাম্যাল এম, এ, (শ্রেষ্ঠ
হিন্দু মহিলা এম, এ গ্রাজুয়েট)

“যোগমায়া”—স্বর্ণপদক—পারুল দাসগুপ্ত বি, টি,
(বি টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ)

“রমা”—সুঁরবালা কর্মকার এম, বি, (সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু
মহিলা, এম, বি)

“বন্ধিমচন্দ্র”—নমিতা ঘোষ বি, এ (বি-এ পরীক্ষায়
সর্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা রচনা)।

“গঙ্গামণি”—স্বর্ণপদক—বাণী বসু (বি, এ পরীক্ষায় মনস্তত্ত্বে
শ্রেষ্ঠ ছাত্রী)

“পদ্মাবতী”—স্বর্ণপদক—অমিতা রায় বি-এ, বি-এ
পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ছাত্রী)

“সুজাতা”—স্বর্ণখচিত রোপ্য—রেণুকা নাগ বি-এ
বি-এ, পরীক্ষায় বাঙ্গলা রচনার শ্রেষ্ঠ ছাত্রী

“বন্ধিম চন্দ্র”—রোপ্য পদক—ছবিরানী দাস বি-এ

“বন্ধিম চন্দ্র”—রোপ্য পদক—ইলা ঘোষ বি-এ

“শান্তমণি”—সুনোয়া গ্রেগরী বি-এ, সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী

বর্তমান সমাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী সুসমা মিত্র এম, এ,

পি, এচ, ডি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি প্রথম মহিলা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এচ, ডি।

অমলা নন্দীর বিবাহ

“সাত সাগর পারের” লেখিকা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী অমলা নন্দীর বিবাহ বিখ্যাত নট শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর চৌধুরীর সহিত ৮ই মার্চ সম্পাদিত হইল। একই শিল্পের ও সংস্কৃতির সাধক ও সাধিকার পরিণয় পরম উপযোগী।

করেছিলেন, সেই অনুরোধে এই বঙ্গবালার সহচাৰ্য্য পান। তারপর অমলা উদয় শঙ্করের সত্য হইতে চলিয়া আসিয়া লেখাপড়ায় মন দিয়া আশুতোষ কলেজ হইতে দুই বৎসর পূর্বে বি-এ পাশ করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে অমলা তাঁর নৃত্য



(উদয়শঙ্কর ও শ্রীমতী অমলা নন্দী চৌধুরী)

অমলা নন্দী তাঁর পিতার সহিত দ্বাদশ বৎসর বয়সে কোশলও প্রদর্শন করিতেন। বৎসরাবধি পুনরায় উদয়-
প্যারিসে গমন করেন। সেই সময় উদয় শঙ্কর অমলার পরিচয় শঙ্করের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।
পাঠিয়া তাঁহার ইরোপেব যে নৃত্যকলা প্রদর্শনের অভিযান আলমোড়ায় এই শুভ মিলন সজ্জ্বিত হইয়াছে।



ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট

শ্রীশান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যিক যারা তাঁরা এই জগতেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করে যাচ্ছেন, প্রকাশক আর সমালোচকে মিলে তাঁদের উপর যে অত্যাচার করেন তার বাড়া আর নেই—নরকেও। একটা আশ্বাসের কথা তাহলে যে, তাঁদের মরে নতুন করে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না।

সাধারণ বুদ্ধিমানেরা ভাবেন তাঁদের বাড়া আর নেই। নিজেদের লেখা দেখে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে যান—ভাবেন এ লেখা অপৌরুষেয় divine, এমনটাই আর কেউ পারতো না। আদর এর হবে নিশ্চয়, সকালে জেগে যে প্রভাত দেখবো সে প্রভাত প্রশংসামুখর, হাস্যময়। আদর তার যদি সম্যক না হয়, তাহলে বুঝতে হবে পৃথিবীর লোকগুলোর অগ্নিমান্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান্দ্যও ঘটেছে।

আর যারা সত্যিকারের স্বজনীশক্তি সম্পন্ন তাঁদের লেখা দেখে তাঁরা নিজেরা আশ্চর্য হন না—আশ্চর্য হয় অপরে।

ভাষা ও জাতীয় চরিত্র :—Language is the expression of our inner self. আমাদের চিন্তবৃত্তির অভিব্যক্তিই হলো ভাষা; তা যদি হয় তবে আমরা যে কোন ব্যক্তি বা জাতির সাহিত্যে সেই ব্যক্তি বা জাতির willing, feeling and action এর পরিচয় পাব। জাতীয় চরিত্র সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে; সাহিত্যিকেরা জাতীয় চরিত্র ও সংস্কৃতির রূপকার। আবার সাহিত্যের উপর জাতীয় চরিত্রের প্রভাবও কম নয়। সাহিত্যের সঙ্গে জাতির বৈশিষ্ট্যের এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সাহিত্যের কথা বাদ দিয়ে কেবল ভাষা নিয়ে দেখলেও আমরা এই একই সত্য দেখতে পাব। বাংলা ভাষায় বাক্যের কর্তৃপদ থাকে আগে এবং মাঝখানে বিশেষণাদি পদ, যাদের কাজ কেবল অপ্রয়োজনের অর্থাৎ কর্তৃ এবং কর্তৃ নিরপেক্ষভাবে ভাষাকে পল্লবিত করে তোলা। সব শেষে ক্রিয়াটি—যেন ক্রিয়ার দীর্ঘস্থত্বতার জন্তে দায়ী কর্তা নয়, দায়ী মাঝখানের আড়ম্বর সজ্জা। সাতমহলা বাড়ীর উপর তালায় কর্তা ক্রিয়াপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে, সে সোজা

উপায় যাবে না, যেমন ইংরাজী কর্তা যায় ঠিক যেন লিফ্টে চড়ে—কর্তার পরেই ক্রিয়া—সে যাবে সাতমহলা বাড়ীর অন্তঃপুরের বিবরণ নিয়ে—অতি মন্থর গতিতে বিশ্বাসের ভঙ্গীতে। কাজ শেষ হওয়ার সম্পর্কে আমাদের তেমন ঔৎসুক্য নেই—সে বিষয়ে ইংরাজদের সবচেয়ে তৎপরতা।

যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তার ব্যঙ্গনা 'ন একবিধঃ'—অর্থাৎ একরকম মাত্র নয়। নানা জনে লয় তার নানা অর্থটানি।, বিজ্ঞানের সম্বন্ধে যা একরকমেই সত্য, সাহিত্যের সম্বন্ধে তা বহুরকমে সত্য। বিজ্ঞানের সত্য শুদ্ধ একরকম; তার মধ্যে সজ্জা আছে কিন্তু বৈচিত্র্য নেই। সাহিত্যের সত্য বিস্তৃত এবং বিচিত্র; নানা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নানা স্থান থেকে প্রত্যক্ষ করলে সেই বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্য পুরাপুরি ধরা পড়ে; কিন্তু তা এত বিচিত্র যে কোন পাঠক বা সমালোচক তা ধরে ফেলেছেন বা তার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য তাঁর অমুভূতির সীমার বাহিরে আর নাই—একথা বলতে পারেন না। কারণ, যদি তাই হয়, কাব্যরস সেইখানেই শুকিয়ে যায়। কাব্যরস হচ্ছে নৈব্যক্তিক ব্যঙ্গনা, অর্থাৎ তা ব্যক্তি নিরপেক্ষ এমন কি বিষয় নিরপেক্ষ বটে, তবে হৃদয়ের সঙ্গে রসের গভীর সম্বন্ধ; কিন্তু “ভিন্নরুচিহি লোকঃ—কেবল রুচির দিক থেকে নয় অন্তরের দিক থেকেও এক মানুষ আর একজন মানুষের থেকে বিভিন্ন। সেজন্য, যদি কোন সমালোচক দাবী করেন রবীন্দ্রনাথ আমার মগনে বা হৃদয়ে ধরা পড়েছেন তবে তার এ দাবী খাতিয়া হবে না; কারণ রবীন্দ্রনাথ তো একজন নন, বাস্তবের রবীন্দ্রনাথ হয়ত একজন, কিন্তু সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ যে অনেক এবং তা পরস্পর থেকে বিভিন্ন। আমি যখন রবীন্দ্র সাহিত্য পাড় তখন আমার মনের মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথ বাসা বাঁধেন, সে রবীন্দ্রনাথ আমার সৃষ্টি, তিনি একান্ত আমারই এবং সেজন্যই আপনার বা অন্য কার'র রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন।

কোন গ্রামে দেবপ্রতিষ্ঠা হলে, যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছে তারই নয় আরও পাঁচজন গ্রামবাসীর অধিকার তাতে জমা হয়ে

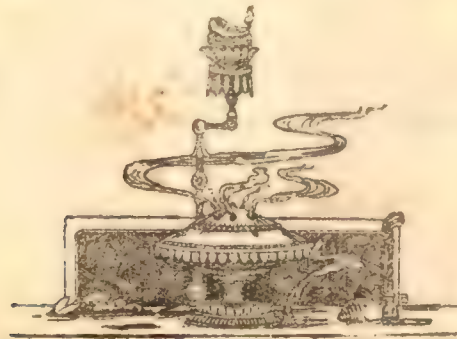
ওঠে। তেমনি কোন ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে সে হয়ে দাঁড়ায় সমাজের সকলের—তখন তাকে তার সংসার বেঁধে রাখতে পারবে না। সে হয়ে দাঁড়ায় সমাজের দেবতা ও সেইসঙ্গে সমাজের লোক।

এক জাতির লোক আছেন যাহারা সব কিছুই হইতে পারেন—তাহারা কবি ও সাহিত্যিক। কখনও দেখিবে তাঁহাদের প্রেমিক, উচ্ছ্বাল, প্রতীক্ষাকাতর, কখনও ত্রয়োত্তীর্ণগীত ব্রহ্মচারী; কখনও দীন দরিদ্র-অসহায়, কখনও অতুল ধন সম্পদশালী ধনীরা ছল্লাল, কখনও মাতা জায়া কন্যারূপে, কখনও পিতামহী ও পুত্ররূপে; কখনও বিদ্রোহী, কখনও শাস্তিহাণক। তাহারা কি না হইতে পারেন? এই বহুরূপীর বিদ্যা তাহারা অর্জন করিলেন কোথা হইতে? কে তাহাদিগকে এই বিদ্যা শিখাইয়াছে!

এ রূপ তাহাদের দরদভরা অন্তরের নিকট হইতে পাওয়া। তিনি বিশ্ববাসীকে দরদ দিয়া ভালবাসেন, তাই তিনি বিশ্ববাসীর রূপ ধারণ করেন। জাননা কি বিশ্বরূপ ভগবানের সৃষ্টির তুলিকা তাহাদের হাতে আর রূপ ও রঙের বাস্তু তাহাদের অন্তরে।

Realism এর উদ্ভবকে বর্তমান সভ্যতার আঘাতে আমাদের বিশ্বাস শক্তির আসের ফল বলিয়া মনে করিতে

পারি। সভ্যতা ও জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানিতে পারিয়াছি আমাদের শক্তির সীমা কোথায়—আমাদের অযুত বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে—আমরা আর অলৌকিকে বিশ্বাস করি না। এই মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে আমরা সাহিত্য থেকে ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, দেব-দৈত্য, অমরা ও কিম্বর, করতক ও পক্ষিরাজ সকলকেই বিদায় দিয়াছি। এখন আর কল্পনাময় জগৎ সৃষ্টি করি না—বর্তমানের গল্পে রূঢ় বাস্তবের উচ্ছ্বাস ও কদম্বতা ফুটিয়া উঠিতেছে। জীবনের প্রতিক্রিয়াই এখনকার সাহিত্য। এখনকার রাজকুমারের পক্ষে পক্ষিরাজে উড়িয়া রাজকুমারীর পক্ষে নিদর্শন দেওয়া সহজ হইয়া উঠে না—এখনকার দেখাসাক্ষাৎ ও মিলন উভয়ের গভীর বাহিরে অর্থাৎ গৃহ জাতি, ধর্ম ও সমাজ-গভীর বাহিরে, অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যে ও বিবময় পরিণতিতে। তাহাদের গমনাগমন পক্ষিরাজে নয় বরং নিতান্ত বাস্তব ও অস্বন্দর উপায়ে। পথে হীরামণিমুক্তা জহরতের গাছ পড়ে না; বরং বেকার যুবকের সঙ্গে প্রেমের ভার অসহ্য হইয়া উঠে ও সমস্ত জীবন কলিকাতার রাস্তায় ও অফিসের দোর গোড়ায় উমেদারি করিয়া শেষ হয়—মধ্যে পাছকা ছুটি নিঃশেষে পদত্যাগ করিয়া পা ছুইটিকে অকূল শূন্যতায় ফেলিয়া পথের ধূলায় অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাই আধুনিক প্রেম বা আধুনিক রূপকথা ও আধুনিক realism.



সরোজনলিনী স্মৃতি-উৎসব

প্রার্থনা সভা :—১৯শে জানুয়ারী সকালে ৯টার সময় সরোজনলিনী সমিতির নব নিশ্চিত গৃহে (গুরুসদয় স্মৃতি মণ্ডপে) স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্তের আত্মার কল্যাণ কামনায় একটি প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্ত নীরপ্রভা চক্রবর্তী প্রার্থনা সভার নেতৃত্ব করেন। ৬ সরোজনলিনী এবং ৬ গুরুসদয় দত্তের প্রতিকৃতি ছবিখানি এই উপলক্ষে পত্র পুষ্প দ্বারা সজ্জাভিত করা হয়। শ্রীমতী রেণুকা কর সমরোপযোগী সঙ্গীত দ্বারা সভার উদ্বোধন করার পর শ্রীযুক্তা চক্রবর্তী একটি সুন্দর মূল্যবান প্রার্থনা করেন।

মৃত্যুবার্ষিকী সভা :—ঐদিন অপরাত্ ৫টার সময় উক্ত “গুরুসদয় স্মৃতি মণ্ডপে” স্বর্গীয়া সরোজনলিনীর সপ্তদশ মৃত্যু বার্ষিকী সভার অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, সি-আই-ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নাধীপ এবং যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যেও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর রচিত একটি কবিতা পাঠিত হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন যে শ্রীযুক্তা সরোজনলিনী দত্ত এক বিরাট আদর্শের বিষয় চিন্তা করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার সেই আদর্শ হইতেছে এই যে, যদি নারী-জগৎ তাহাদের লুপ্ত অধিকার ফিরাইয়া পাইতে চায় তবে নারীদের নিজেদের চেষ্ঠা দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি আজ সত্তর বৎসর যাবৎ এক মহান কার্য সাধন করিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে দশজনের সহায়ভূতি ও সাহায্যে ইহা আরও মহত্তর কার্য সাধন করিবে।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের অকাল মৃত্যুতে সমিতি কিরূপ গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া সমিতির বর্তমান অবস্থা, কর্মপদ্ধতি এবং পরিচালনার গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে একটি সুন্দর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং সমাগত ব্যক্তিবর্গের সহায়ভূতি ও সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত ডি, পি, ঠৈতান, ডাঃ এ, সি, উকীল, রায়বাহাদুর টি, সি, রায়, শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়, জে, পি, আগরওয়ালা সমরোপযোগী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত আগরওয়ালা দরিদ্র ভোজনের জন্য সমিতির হস্তে একাদ টাকা

দান করেন। সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয়ের শিক্ষাব্রিত্তী ও ছাত্রীগণ কর্তৃক “সাক্ষী সরোজনলিনী” সঙ্গীতটি গীত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির আবেদন

বর্তমান পরিস্থিতিতে পল্লী অঞ্চলে নারী-উন্নয়ন
কার্য

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি, এইচ-ডি; পি-আর-এস নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করিয়াছেন :—

“বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য সহস্র সহস্র মহিলা কলিকাতা সহর পরিত্যাগ করিয়া পল্লী অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাদের অনেকেই সুশিক্ষিতা। এই সকল শিক্ষিতা মহিলারা আজ পল্লীর সেবা করিবীর—বিশেষ করিয়া তাঁহাদের পল্লীবাসিনী ভগিনীদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ প্রচেষ্টার অপূর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। এই সময়ে তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে বা সহরে “মহিলা সমিতি” গঠন করিয়া মহিলাদের নানাবিধ কুটীর শিল্প শিক্ষা, বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কার্য, বাস্তুতন্ত্র প্রচার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি এইরূপ মহিলা সমিতি গঠন ও পরিচালনে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং পূর্বে চারিগত মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই কার্যের জন্য নারীমঙ্গল সমিতির পুরুষ ও মহিলা প্রচার-কর্মী এবং শিক্ষাব্রিত্তীগণ রহিয়াছেন। বর্তমানের প্রয়োজনাভুসারে বিভিন্ন স্থানে প্রচারক ও শিক্ষাব্রিত্তী পাঠাইয়া মহিলা সমিতি গঠন ও সূচীশিল্প, সেলাই, ছাঁটকাট, তাঁতবোনা, কার্পেট ও সতরঞ্চির আসন বোনা, চামড়ার উপর নক্সার কাজ, পিতলের উপর নক্সার কাজ ইত্যাদি শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মফঃস্বলের মহিলা সমিতির সভ্যাগণ মহিলাই হইবেন, তবে তাঁহাদের পুরুষ আত্মীয়গণ পরামর্শদাতারূপে এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বঞ্চে সাহায্য করিতে পারেন। এ বিষয়ে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রধান কার্যালয় ২৩১ বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে সাধারণ সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।”*

* উল্লিখিত আবেদন সমস্ত ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ফলে বহু স্থান হইতে সাড়া পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গের বহু পল্লী ও সহর হইতে মহিলা সমিতি গঠন করিবার উদ্দেশ্যে প্রচারক ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য অস্থায়ী শিক্ষাব্রিত্তী পাঠাইবার আবেদন আসিতেছে এবং সরোজনলিনী সমিতির কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা করিতেছেন। কেন্দ্র সমিতি এই সকল শিক্ষাব্রিত্তীর বেতন বহন করিবেন এবং মফঃস্বল সমিতি শিক্ষাব্রিত্তীগণের আহাৰ ও বাসস্থান এবং বাতায়নের ব্যবস্থা করিবেন। শিক্ষাব্রিত্তীগণ একস্থানে একমাস এবং প্রয়োজন হইলে দুমাস পর্য্যন্ত থাকিয়া বিভিন্ন শিল্প শিক্ষা দিবেন।

যদি বোমা পড়ে

বোমা যদি পড়েই, তাহলে আপনার মনের অবস্থা কেমন হবে ভাবতে পারেন? বোমা পড়লে ব্রিটিশ জনসাধারণের উপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়, লণ্ডনের সুপরিচিত চিকিৎসক এন্টনি ওয়েমাথ তাঁর একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। উক্তর ওয়েমাথ লিখেছেন:

“লণ্ডনে বিমান আক্রমণের যখন সবে, স্বয়ং, তখন একটা রাত্রির কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমি আমার ক্লাটে মেঝের উপর শুয়েছিলাম। আমার নিজের পরিবার—ছ’টি বড় বড় মেয়ে আর পনের বছরের একটা ছেলে ছাড়া আমার ছ’জন অতিথি, ছ’টি শিশু, তখন ঘুমোবার চেষ্টা করছিলো; এর আগের রাত্রে বোমা পড়েই এদের বাড়ি ভেঙে গেছে। বাইরে তখন চলছিলো তুমুল কোলাহল—ক’ মিনিট অন্তর অন্তরই নাৎসি বিমানের বর্ষা শব্দ, বোমাবর্ষণের বিকৃত ধ্বনি আর তার পরেই ভয়াবহ এক একটা বিস্ফোরণ।

“খাদিকক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থাহীন রসিকতা করেই আমাদের সময় কাটলো। এদিকে শুনতে পেলান এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমাদের জানালার নতুন লাগানো খড়খড়িগুলো উড়ে গেছে। তখন আমার এক মেয়ে বলে যে এখন এক পেয়লা চা খেলে নিশ্চয়ই আমাদের সকলেরই খুব ভালো লাগবে। আমরা সকলেই সে কথা সায় দিলাম। তারপর সার বেঁধে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকে আমরা চা তৈরি করতে লেগে গেলাম। এর আগে আর কখনো এক পেয়লা চা খেতে এত ভালো লাগে নি, আর চা খেয়ে এতখানি জোরও আর কখনো পাইনি।

“এক পেয়লা চা! বিপদে আপদে এ ক’টি কথার মতো আর কী ই বা এখন জীইরে তুলতে পারে! প্রায়ই তো শুনতে পাওয়া যায়, বোমার আহত লোকদের উদ্ধার করার পর, তাদের প্রথম অনুরোধই হয় এক পেয়লা চায়ের জল। চা যে কেবল আহতের মনে ফুটি আনে তা নয়, তার মনে আত্মপ্রত্যয়ও সঞ্চার করে।

“লোকে কেন চাকে এত উঁচু আসন দেয় তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। কয়েকদিন আগে একটি উদ্ধারকারী দল একটা ছোট বাড়ির ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখতে পেলো একজন বৃদ্ধা বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘরের ছাদের প্রায় অর্ধেকটা ভেঙে তাঁর বৃকের উপর চেপে

পড়েছে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর এরা বৃদ্ধাকে ভগ্নস্থাপ থেকে বার করে নিচে এনে আঁধুলেলে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেলো। আঁধুলেলে শোয়ানো অবস্থাতেই ভদ্রমহিলাকে এক পেয়লা চা খেতে দেওয়া হলো। এক চুমুক দিয়েই ভদ্রমহিলা কথা বলে উঠলেন—আহত হবার পর সে-ই তার প্রথম কথা বলা।”

“এই সেদিন একজন বিমান আক্রমণের ওয়ার্ডেনের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিলো। বিমান আক্রমণ শুরু হবার সময় থেকে এ-লোকটি লণ্ডনে কাজ করত। এই কাজে তার শরীর মনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছে কি না এবং রাত্রির পর রাত্রি সে কেমন করেই বা কাজ চালাচ্ছে এই ছিলো আমার জিজ্ঞাসা।

“আমি তাকে বললাম—আচ্ছা, যখন কোনো বিয়ম কাজে আপনাকে বেরিয়ে যেতে না হয় তখন আপনি কি করেন? সে বলে, চা খাই।

বতরুণ বিমান আক্রমণ না হয় ততক্ষণই বা আপনি কি করেন?

লোকটি হেসে বলে—আরো চা খাই।

আপনার মনে করতে পারেন এই রকম একজন লোক হয়ত কত রোমাঞ্চকর গল্পই না বলতে বসবে। আমি কিন্তু বড় জোর তাকে এইটুকু বলতে শুনেছি—‘কাল রাত্রিরটা একটু খারাপই ছিলো বটে’।

এই রকম সব ছোটো ছোটো ঘটনা থেকে বোঝা যায়, আজকের দিনে ইংলণ্ডের জনসাধারণের আত্মশক্তিকে জাগ্রত রাখতে চা কী করেছে, আর তাদের মনে কত সাহসনাই বা চা আজ এনে দিচ্ছে।

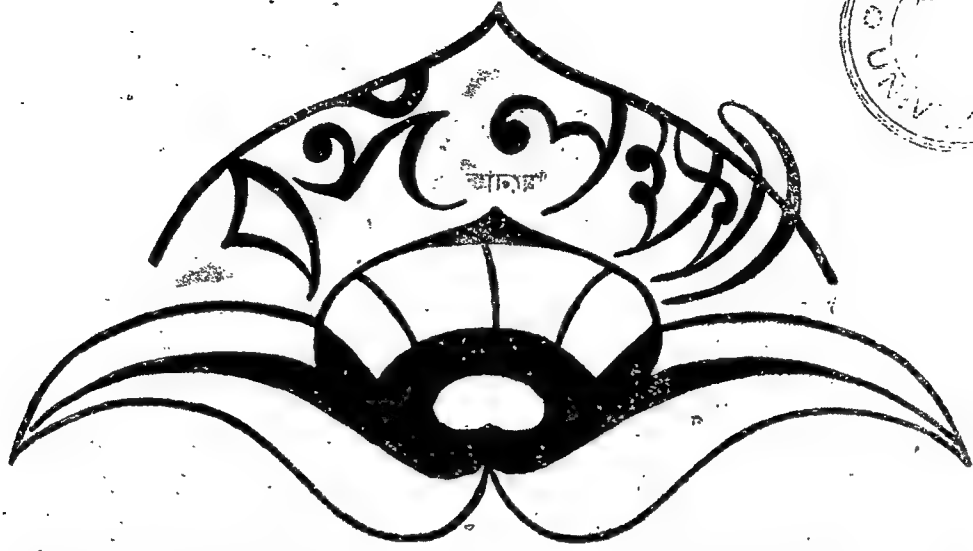
ইংরেজদের জীবনে চা আজ যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, তার প্রকৃত মূল্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেই ব্রিটিশ খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী লর্ড উল্টন কিছুদিন আগে বলেছিলেন:

“ব্রিটেনে চা কেবল একটি পানীয় মাত্র নয়, তার চেয়ে ঢের বড় জিনিষ। একজন পুরুষ বা নারী যদি যখন ইচ্ছে তখনই এক পেয়লা চা পেরতে পারে তাহলে বেন তার বাস্তব জীবনকে অনুভব করতে সমর্থ হয়, জীবনের এ-বিভীষিকা বেন মুহূর্তে অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। চা যে কেবল উষ্ণ করে তোলে তা নয়, মনের উপরও চায়ের ক্রিয়া অসাধারণ।”

বঙ্গলক্ষ্মী



বাঁশরী—



সপ্তদশ বর্ষ

বৈশাখ, ১৩৪৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

অনন্ত-শয্যা

ভগবান !

হে আমার জীবনের আনন্দ প্রধান,
শুকাইতে নাহি দিলে জীবনের মূল
অকূলে ভাসায়ে তবু মিলাইলে কূল ।
আমার অস্তিত্ব গাঁথি তোমার সত্তায়
স্থান দিলে মোরে তব অনন্ত-শয্যায় ;
আকাশ ভরিয়া তাই তব ভালবাসা
রাত্রিদিন প্রাণে মোর করে যাওয়া আসা ।
ত্রাসে নাহি ত্রাস মানে—না মানে সংহার
সুন্দরের বশে আনে সকল সংসার ।
ক্ষিপ্ত শিশু খেলি যায় আগুনের খেলা
অন্ধকারে তুমি তারে ঢাক সন্ধ্যাবেলা ।
শত শত সর্বনাশ শত ক্ষতি ক্ষয়
অনন্ত শয্যার পাশে মুহূর্তে বিলয় ।
অগ্নি দিয়ে অগ্নি জালি ভাঙ্গি ফেলি গড়
সৃষ্টিতে অনর্থ বীজ নাহি রবে জড় ।

দাবানলে দগ্ধ হল দিনের দুর্ভাগ্য
সার্থক প্রলয় বহ্নি দিল তার সাক্ষ্য ।

পুরী

বাঁধ ও বন্ধ্যা

শ্রীমদ্রাজ বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিরাম বাড়ির সেই খোড়ো আটচালা। - হেরিকেন লইয়া এখনও মুটেরা জিনিষপত্র বাহিরে লইয়া যাইতেছে। এখন আটচালা প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যারাগীও খুব ব্যস্তভাবে তদারক করিতেছিলেন। আনন্দ-চঞ্চল সরমা প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা। তৈরি হয়ে নাও সরমা। আধ ঘণ্টার মধ্যে! চারখানা নৌকো করেছে নন্দলাল। আমরা এখনি চলে যাবো—

সরমা। আর যেতে হবে না, মা, রামেশ্বর রায়কে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এলাম!

নন্দ। চিরকালের মতো ঘুমোয় নি। জেগে উঠে আবার ঐ রকম অপমান স্বীকার করে।

সন্ধ্যা। ঠিক হয়ে গেল, এষ্টেট নিলাম হয় হোকগে। তার দরুণ যা পাওয়া যাবে, আর এই সব জিনিষপত্রের বিক্রির টাকা—সমস্ত নিয়ে নন্দলাল দু-এক মাস পরে যাবে। এ অভিশপ্ত দেশে আমরা আর আসছি নে।

সরমা। ভয় পাচ্ছ কেন? জেগে উঠেও রামেশ্বর আর কিছু করবে না। মস্ত পড়ে শয়তান বশ করে এসেছি। এই দেখ, গান শুনে তিনি আমাদের আংটি বখশিস দিয়েছেন।

নন্দ। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আংটির দিকে তাকাইল)
আংটি চেনা লাগে যেন! দেখি, দেখি—

[আংটিটা নন্দলাল হেরিকেনের কাছে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল]

সন্ধ্যা। কিন্তু শয়তান ত একটা নয়। বরঞ্চ যে শয়তান মুখোশ পরে ভয়লোক হয়ে থাকে, সে আরো ভয়ানক।...নির্মল তোকে গ্রাস করেছে—অজগর যেমন শিকারকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করে আনে।

আমি চোখের সামনে দেখছি। হাত-পা বাঁধা, অসহায়—দেখে শুনেও কিছু করতে পারছি না।...না, না, থুকাঁ, আমি এ সহিতে পারব না—তোকে যেতে হবে—

[নন্দলাল উত্তেজিতভাবে ইহাদের মধ্যে আসিল]

নন্দ। রাণী মা, ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না,...কিন্তু আপনার কথা ষোল আনাই সত্যি। শুধুন—

[নন্দলালের ভাব দেখিয়া সন্ধ্যারাগী তখনই তাহার সঙ্গে চলিলেন। তারপর একবার মুখ ফিরাইয়া স্বরমাকে বলিলেন]

সন্ধ্যা। তৈরি হয়ে নাও থুকাঁ, দেরি না হয়। আমি আসছি—

স্বরমা। মা, মা, আমি যেতে পারব না। বাবার এই স্বতিষেরা জায়গায় কয়েকটা দিন আমায় থাকতে দাও। ক্ষমা করো—

সন্ধ্যা। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন)
তর্কাতর্কির সময় নেই, সরমা!

[সন্ধ্যারাগী ও নন্দলাল চলিয়া গেল]

স্বরমা। ওমা!

[ক্রন্দনাতুর ভাবে সে বসিয়া পড়ি। একটু পরে নির্মল প্রবেশ করিল]

নির্মল। এই যে, রয়ে গেছ তা হলে? কিছু ভয় নেই, রায়মশায়কে বলে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। কোথায় যাবে!

স্বরমা। যেতেই হবে নির্মল-দা! জোর করে নিয়ে যাবে, নৌকো এনেছে। এখনি নিয়ে যাবে। এ জবরদস্তি...অত্যাচার। আমি চাষীদের ছেলেমেয়ে নিয়ে ইঞ্চল করেছি, নতুন ডাক্তারখানা খোলবার বন্দোবস্ত

করছি—সব পড়ে রইল, কিছু হল না। কলকাতার খাঁচায় নিয়ে আমায় পুরে রাখবে, আর কোনদিন আসতে দেবে না।

নির্মল। রামেশ্বর রায়ের ভয়ে?

স্বরমা। তার চেয়েও বেশি ভয় তোমার। তুমি আমায় গ্রাস করছ...তোমার সাথে যাতে আর দেখা না হয়, সেই মতলব। নির্মল-দা, আমায় আটকে রাখ, আমি যাবো না। আমার হাত ধরে টেনে রাখো—ওদের নিয়ে যেতে দিও না—

নির্মল। জোর করে বলো, 'যাবো না'—কারও সাধ্য নেই, নিয়ে যায়। তোমার বয়স হয়েছে, আর নাবালিকা নও—এই এন্টের সম্পূর্ণ মালিক তুমি—

স্বরমা। তা পারি না নির্মল-দা। মা—আমার মা—সামনে দাঁড়িয়ে হুকুম করবেন, আমার সাধ্য কি, কথা না শুনে চুপ করে থাকি।

নির্মল। এমন ভীতু?

স্বরমা। তুমি জান না...হয় ত অভাগিনী মা চোখের জল ফেলবেন। আমি সহিতে পারব না। রামেশ্বর রায়কে ভয় করিনে, কিন্তু মা'কে বড় ভয় নির্মল-দা। তুমি আমায় জোর করে ঘরের মধ্যে তালীচাবি দিয়ে রাখ। আমি দরজায় মাথা খুঁড়ব...কাঁদব যে মারি সঙ্গে আমায় যেতে দাও। তবু ছেড়ো না। মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়ে যাবে—তবু না।

নির্মল। পাগল!

স্বরমা। পারবে তো?

নিকল। তা কি হয় স্বরমা? এটা বিংশ শতাব্দী, ইংরেজের রাজত্ব। স্বভদ্রার যুগ কিম্বা উপজ্ঞাসের দেশ ত নয়।

স্বরমা। মা'র হুকুমের উপর চলে যেতে পারিনে বলে ভীতু বলছিলে...তুমি কি নির্মল-দা? তুমি কাপুরুষ—আশ্রয়ার্থী একটা মেয়েকে রক্ষা করার ক্ষমতা তোমার নেই—

[মঞ্চ ঘুরিয়া নূতন দৃশ্য আসিল]

বিরামবাড়ির সেই ঘর, যেখানে রামেশ্বর চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। অতি সন্তপনে নন্দলাল আসিল।

এদিক ওদিক চাহিতে পিয়ানোর উপরে রাখা রিভলভারটা তার নজরে পড়িল। দেখিয়াই তাহার মনে এক মতলব হইল। রিভলভার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, গুলিভরা আছে। টিপি-টিপি অগ্রসর হইয়া সে রামেশ্বরের দিকে তাক করিল। এমন সময়ে স্বরমা ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল।

স্বরমা। এ কি নন্দ দা?

নন্দ। সরো...সরে যাও খুকী দিদি, শেষ করে দিই। ঘুম থেকে আর না উঠতে পারে।

স্বরমা। ছি-ছি—

নন্দ। তোমার বাপকে খুন করেছে এই শয়তান—

স্বরমা। মিথ্যা কথা।

নন্দ। যে আংটি তোমাকে দিয়েছিল, ও তোমার বাবার জিনিষ। মরবার সময় শ্রামলনাথের হাতে ছিল... খুন করে ওরা ঐসব নিয়ে পালিয়ে যায়। আংটি আমি স্পষ্ট চিনেছি।

স্বরমা। ও তোমার রাগের কথা নন্দ-দা। তাড়িয়ে দিচ্ছিল বলে রাগ হয়েছে। রাগলে কি নজর ঠিক থাকে?

নন্দ। আরও প্রমাণ আসছে। একজন লোক প্রমাণের পাহাড় জোগাড় করে দেবে। এখন সরে যাও, খুকী দিদি। এমন স্বযোগ আর আসবে না।

স্বরমা। প্রমাণ পাও, থানা-পুলিশ কর নিয়ে। ক্রান্ত অসহায় মানুষটি নিঃশব্দে ঘুমুচ্ছে, আমি এ হাতে দেবো না। রাখো রিভলভার—রাখো-রাখো—

[ইহাদের ধস্তাধস্তির ফলে হঠাৎ রিভলভারের একটা গুলি সশব্দে বাহির হইয়া দেয়ালে লাগিল। সেই শব্দে ও গোলযোগে রামেশ্বর জাগিল; মুখের চাদর সরাইয়া চাহিয়া দেখিল]

রামেশ্বর। কি? কি?...আরে দিব্য চাদর ঢাকা দিয়েছে কে? তাইতো আয়েসের ঘুম আর ভাঙতে চাইছিল না। গুণগোলটা কিসের হে?

স্বরমা। (হাসিয়া অতি মধুর কণ্ঠে বলিল) কিছু না, আপনি ঘুমোয়। আমরা যাচ্ছি কিনা...নন্দ-দা আমাকে ডাকতে এসেছে—

রামেশ্বর। না—না...তোমাদের যেতে হবে না নন্দলাল। তোমরা থাক, আমি চলে যাচ্ছি।... রিভলভার নন্দলালের হাতে? একটা আওয়াজও শুনলাম।

স্বরমা। নন্দদা নেড়ে চেড়ে দেখছিল, কি রকম জিনিস—

রামেশ্বর। তা থাকুক। তুমিই রাখো নন্দলাল। আরও গুলি আছে কিন্তু...সাবধান। আমার আর দরকার নেই।

স্বরমা। আপনি বুঝি খালি হাতে বেড়াবেন! না-না...সে হবে না। লোকে আপনাকে পছন্দ করে না জানেন?

রামেশ্বর। একটা রিভলভার থাকলেই বুঝি করবে স্বরমা দেবী? মিছে বোঝা বওয়া। এতে আমার দরকার নেই।

স্বরমা। (উত্তেজিত ভাবে) আমার আছে। রেখে দিন বলছি—

[স্বরমা নন্দলালের হাত হইতে রিভলভার লইয়া রামেশ্বরের হাতে দিল। রামেশ্বর মস্ত-চালিতের মতো লইল। রুগ্ন মুখে নন্দলাল চলিয়া গেল।]

রামেশ্বর। আমি এবার যাই স্বরমা, তোমাদের আর ব্যাঘাত ঘটাব না।

[রামেশ্বর গমনোদ্যত হইল।]

স্বরমা। সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন যে! এই অন্ধকার রাত—বর্ষাবাদলের মধ্যে—

রামেশ্বর। কিছু না, কিছু না। এই টুকুতে কি হবে আমার? এই বয়স অবধি কত বড় আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে জানো? [স্বরমা পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল।] তোমার মতলব কি?

স্বরমা। আপনার যাওয়া হবে না। কোথায় ফেলে যাবেন আমায়? [কাঁদিয়া ফেলিল।] এরা ষড়যন্ত্র করেছে, আমায় ঘরে নিয়ে যাবে। নিয়ে কলকাতার খাঁচায় চিরজন্মের মতো আটকে রেখে দেবে, আর কোনদিন এখানে আপনাদের কাছে আসতে দেবে না। আমায় বাঁচান—

রামেশ্বর। তোমায় বাঁচাব আমি...এদের হাত থেকে? এ তুমি কি বলছ, স্বরমা?

স্বরমা। হাঁ, আপনি। কেবল আপনিই বাঁচাতে পারেন আমায়—সে শক্তি আছে আপনার। মা যখন ডাকবে, আমায় ছাড়বেন না—জোর করে ঘরে শিকল দিয়ে রাখবেন, মাথা খুঁড়ে মরলেও শুনবেন না। আমি থাকব, চলে যেতে পারব না।

রামেশ্বর। ছেড়ে যেতে পারবে না?...আমার মাথায় গোলমাল গোলমাল লেগে যাচ্ছে, স্বরমা। তখন ঠাট্টা করে বললে, আমাকে ভালবাস; আবার এই রকম ঠাট্টা করছ। নিন্দা, গ্লানি, অপবাদ আমি সহিতে পারি, এ রকম ঠাট্টা আমার বরদাস্ত হয় না।

স্বরমা। ঠাট্টা নয়। ভালবাসি—আপনাকে আমি ভালবাসি রায় মহাশয়।

রামেশ্বর। (সম্প্রোহিত ভাবে) ভালবাসো? নতুন কথা...একটা মেয়ে নিজের ইচ্ছেয় বলছে, আমায় ভালবাসে...আমায় ছেড়ে সে যাবে না। দেখ...ভাল করে চেয়ে দেখ। মুখের উপর বলি রেখা...কাটা-কাটা দাগ...কয়লার মতো পোড়া চামড়া...বীভৎস অস্বপ্নের মূর্তি। আগে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ আমার দিকে।

স্বরমা। দেখেছি। অপমানের আঘাত...লাঞ্ছনার কটক মুকুট...জীবন যুদ্ধের শত-সহস্র ক্ষত-চিহ্ন। সেই যুদ্ধে বিজয়ী বীর আপনি—

[স্বরমা রামেশ্বরের পায়ে প্রণাম করিল।]

রামেশ্বর। তুমি থাকবে স্বরমা, কেউ নিয়ে যেতে পারবে না—

[নন্দলাল প্রবেশ করিল।]

নন্দলাল। (গম্ভীর কণ্ঠে) খুকী-দিদি, রাণী-মা বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকছেন। ভাঁটা হয়েছে—এখনি পানসি ছাড়বে।

রামেশ্বর। যাবে না—

[রামেশ্বর এক হাতে স্বরমাকে বেঁধে রাখিয়া রিভলভার উদ্যত করিল।]

স্বরমা আমায় ভালবাসে—ভালবাসে।

নন্দ। একে জোর করে আটকে রাখবেন নাকি?... এমন দুঃসাহস!

রামেশ্বর। হাঁ—রাখব।

নন্দ। এ অপমান আমরা চূপ করে সহিব না, রায় মশায়। এ দুর্বুদ্ধি ছাড়ুন। সর্বনাশ হয়ে যাবে। এটা কোম্পানির রাজস্ব—মনে রাখবেন।

রামেশ্বর। রামেশ্বর রায় ঈশ্বরের এলাকারও বাইরে—কোম্পানি কি করবে? বেরোও—

[রামেশ্বর রিভলভার উচু করিয়া আগাইয়া আসিল। নন্দলাল ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

স্বরমা। থানায় চললো, নন্দলা।

রামেশ্বর। যাকগে। ফাঁসি হলেও মাহুষের মতো ফাঁসি কাঠে গিয়ে উঠব। আমি মাহুষ হবো। স্বরমা—আর জানোয়ার থাকব না, তুমি দেখো।

[নির্মল আসিল। ইহাদের এইভাবে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। রামেশ্বর তাহাকে ডাকিল]

যেওনা নির্মল, শোন...স্বরমা আমায় ভালবাসে, আমি ওকে বিয়ে করবো, আমি তোমাদের মতো মাহুষ হবো।

নির্মল। স্বরমা দেবী বলেছেন নাকি?

রামেশ্বর। বলেছে নয় ত কি বানিয়ে বলছি? জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।

[রামেশ্বর হাসিয়া উঠিল]

স্বরমা। কেন ভালবাসব না নির্মল? রায়মশায় বীৰ্য্যপত্র—কোম্পানি তাঁকে ভয় দিতে পারে না। তিনি অর্থপত্র—ওঁরই টাকার বলে তোমাদের এই সমস্ত দেশব্রত।

নির্মল। নিতান্ত অন্ধ কষার মত শোনাচ্ছে স্বরমাদেবী—হতে পারে আমি কাপুরুষ, আমার মন নেই—

স্বরমা। মহাপ্রাণ শ্রান্ত ক্লান্ত স্নেহ বুড়ু রায় মশায়কে, আমি সত্যিই ভালবাসি নির্মল-দা।

[নির্মল রুষ্ট চোখে চাহিয়া চলিয়া যাইতেছিল। রামেশ্বর তাহাকে ডাকিল]

রামেশ্বর। নির্মল, বলভকে একটিবার ডেকে দিয়ে যেও।

[নির্মল চলিয়া গেল]

আঃ—সব জিনিষ আজ আমার কাছে এমন ভাল লাগছে স্বরমা...আমি পাগল না হয়ে যাই।

[বলভ আসিল]

শোন বলভ, ওরা চলে গেছে—তুমি এই বাড়ি থেকে এফুনি স্বরমাকে নিয়ে যাও। কোথায়...বুঝেছ ত?

[বলভকে ইঙ্গিতে কি বলিল]

বলভ। (সবিস্ময়ে) গোপন করে রাখতে হবে?

রামেশ্বর। হ্যাঁ...হ্যাঁ—পরে বলব। আমি চাই কাজ, কথা নয়। যাও এফুনি। বাঁকরে বাঁকরে স্বরকর; পরে...পরে...সব বলব...আমি চাই—কাজ আগে। তারপর গুণগোল মিটে গেলে, শুভদিন শুভক্ষণ দেখে—কি বলো স্বরমা?

[স্বরমা হাসিল, রামেশ্বরও হাসিল]

টিপিটিপি চলে যাও।...আর শোন, জন পঞ্চাশ মাহুষের বন্দোবস্ত করো। আপাতত এদিকে সেদিকে চূপচাপ বসে থাকবে। রাগের বশে ওরা একটা হাদ্জামা করতে পারে। আজ থেকে রামেশ্বর রায়ের জীবনের মূল্য হয়েছে—আর কেও-কেটা নয়; বুঝলে হে...স্বরমা দেবী আমাকে ভালবাসে। হাঃ হাঃ হাঃ—

হাসিতে হাসিতে রামেশ্বর খাটের উপর বসিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

—বিরাম—

পশ্চিম বঙ্গের ভাড়াগার গীতি

শ্রীকান্তনী মুখোপাধ্যায়

আজকাল পল্লীর অখ্যাত কবিদের কবিতা ও ছড়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে—ইহা আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কত যে মনি-মুক্তা এই অজ্ঞাত কবিগণ ভাষার ভাঙারে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এই সমস্ত গান ও ছড়া সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণ ও প্রচার করার চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে বালিকাগণ যে সুর সহযোগে এই সব ছড়া আবৃত্তি করে তাহা অতিশয় মধুর। বালিকাদের সরল স্মৃতিষ্টে এই ছড়াগুলি যখন গীত হয় তখন মনে যে কি অপূর্ব আনন্দ হয় তাহা যিনি না শুনিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন না।

ব্রতচারী অধিনেতা-গুরুসদয় দত্ত মহাশয় জারী গান ও সারি-গান সংগ্রহ করিয়া ব্রতচারী বালিকাদের শিক্ষণীয় করিয়াছেন; কিন্তু আমার মনে হয়, এই সব ছাড়াগান গুলিকেও তিনি ব্রতচারী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিলে বাঙ্গালার আর একটি নিজস্ব ধারা রক্ষিত হয়। রেডিও কর্তৃপক্ষ যদি মাসে একদিন অন্ততঃ এইরূপ গ্রাম্য গানের আসর বসান তবে সহরের ইট-কাঠের অধিবাসিবৃন্দ একদিন পল্লীর স্থললিত সঙ্গীত শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারে।

এই গানগুলি সাধারণতঃ দুই তিনজনে মিলিয়া গাওয়া হয়। পল্লীর অনেক গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট কথা হয়ত ইহার মধ্যে আছে কিন্তু তাহা আমরা অনায়াসে বাদ দিয়া লইতে পারি।

শ্রাবণ মাসের শেষ সংক্রান্তির দিনে পশ্চিম-বঙ্গের প্রতি পল্লীতে বালিকাগণ ভাড়া পূজা করিয়া থাকে। ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভাদ্র মাস তাহারা প্রতি সন্ধ্যায় ভাড়া গায় ও ভাদ্র মাসের শেষ দিনে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ভাড়া গান করিয়া প্রভাতে ভাড়া-প্রতিমা বিসর্জন দেয়। ইহাই ভাড়া-জাগরণ।

ভাড়া মূর্ত্তি কতকটা শ্রীরাধিকার মূর্ত্তির মত কিন্তু বালিকাগণ ঐ মূর্ত্তিতে সতী, সীতা, রাধিকা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতির দেবীকে আরোপ করিয়া ছড়া গান করে। এই ছড়াগুলি সমস্তই পল্লীর মেয়েদের রচিত। কবে কাহার দ্বারা ইহা রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। পুরাতন প্রচলিত ছড়াগুলি বহুস্থানে বিকৃত হইয়াছে, বহু নূতন কথা তাহাতে লাগানো হইয়াছে, তথাপি পরিষ্কার বোঝা যায় যে,

এগুলি মহিলাদের রচিত এবং তাহাদেরই আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সুখদুঃখের কাহিনী।

ছড়াগুলিতে ছন্দের ও মিলের বহু ক্রটি পরিলক্ষিত হইলেও যখন উহা সুর সহযোগে গীত হয় তখন কোনরূপ অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে না। ইহার সুরও অতিশয় সহজ এবং প্রাণস্পর্শী।

সতীর পিতৃ গৃহে আগমন, রামের বনবাস, সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি পৌরাণিক কথামূলক ভিত্তি করিয়া পল্লীবালা যে স্থললিত ছড়া রচনা করিয়াছেন, এখানে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“ভাদ্র মাসে ভাড়া আনলুম চন্দন-কাঠের চৌদলে
ভাড়া যদি কৃপা করে রাখবো সোণার মন্দিরে।
সারা ভাদ্র পূজলাম ভাড়া, মা বলে তো ডাকলে না।
যাবার সময় বায়না নিলে—“মা-ছাড়া মা থাকবো না।”

এখানে পল্লীবালা তাহার ভাড়া কে কতখানি দেখিতেছে। কতাকে স্বস্তুর বাড়ী পাঠান মাতার পক্ষে কষ্টকর তথাপি কত্যা চলিয়া যায়—

“তারা তারা সন্ধ্যাতারা শয়তানের মালি;
অবশেষের ভাড়া ফেলে পানালি।”

পল্লী-বালিকা তাহার ভাড়া কে স্বস্তুর বাড়ীতে পাঠাইবে। মেয়েকে পাঠাইবার আয়োজনের কথা নিয়ে ছড়াটিতে সুস্পষ্ট—এই গানটি গাহিবার সময় প্রতি দুইচরণ অন্তর একটি ধূয়া গাহিতে হয়। ধূয়াটির অর্থও পরিষ্কারঃ—

“কৃষ্ণফুলে গেঁথেছি মালা
মালা কেউ করোনা অন্হেলা রে.....
সাঁঝের বেলা ভোগের বেলা ভোগ নাও গো মা জননী
এখনও দুখ আনলোনাকো কোশল্যা গোয়ালিনী।
আঁচিরে পাঁচিরে পদ্ম, পদ্ম কেন ফোটে না
ভাড়ুর হাতে ঘোড়া পদ্ম, ভ্রমর কেন জোটে না।
বাড়ীর নামো নারকেল গাছটি নারকেল কেন ধরে না
একটি নারকেল ধরলে পরে ভাড়ুর সঙ্গে পাঠাব।
আয়রে ময়রা ধরবে বাঁজরা দেরে চিনির পাঁক করে
ভাড়া যাবে স্বস্তুর বাড়ী জামাই আছে রাগ করে।
জামাই আদর বড় আদর তিন দিন বই আর থাকে না
আরও তিন দিন থাক জামাই খেতে দিব ছাঁচি পান।
বসতে দিব শীতলপাটি ভাড়া মনি করবো দান।

জামাই ভাড়া লইতে আসিয়াছে, তাই জামাইএর এত সমাদর। অতঃপর বালিকা তাহার ভাড়া সাজাইতেছে। এই ছড়াটির মধ্যেও কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

“পাচকাটাতে বাধলো ঝুঁটি—যুঁই ফুলেরই আঁটনা,
সোণার প্রজাপতি লাগা উড়বে লো মদনবামা।
সোণার সীথি মোতিবুরল ঝাড়ু, বুমকো মাকড়ী কাণে
অনন্ত তাঁবিজ বাউঠা যশম দিব গড়াইয়া।
পা-পদ্ম মা চললে ফোটে আঙুল ঘুঙুর তার সনে
চরণে চরণে রাজে তুপুয়েই বাঁজন।
আসমানতারা নয়নতারা গোলবাহারের বালিচুড়
আর কি কাপড় নিবি ভাড়া, কি কাপড় সাধ আছে তোর।
ফুলের কাশা বাটি-খটি সিন্দুক ভর্তি বাসন নাও
শশা-কলা পটল-বেগুন ভায়ে ভায়ে ভার সাজাও।
ডাকলো জেলার হাকিম নকিম, ডাকলো পাড়ার বৌ-বিটি
পাঁচ বাথলের সখ রেখে রে ভাড়াধন বিদায় দিচ্ছি।
(ধুরা) অতি যতন করে গেঁথেছি মালা;
মালা কেউ করোনা অনুহেলা রে...।

এইরূপে ভাড়া লইয়া পল্লী বালিকা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষার কথাগুলি ব্যক্ত করে। আবার ঐ ভাড়াতেই সত্যি ও মনকার চরিত্র অরোপিত করিয়া সে গান করে :—

“দক্ষরাজা যজ্ঞ করছেন দক্ষালয়ের মাঝেতে
নিমন্ত্রণে যাও হে নারদ সকল দেবতাদিকে ;
নিমন্ত্রণ হয় না যেন কৈলাসেরই শিবকে।”

এই স্থানে দক্ষ-পত্নীর কণ্ঠা-বিরহের কথা উক্ত হইয়াছে :—

ওমা আমার, সবাই এল সতী আমার এল না
সতী আমার কোলের ছেলে পাছে যজ্ঞে আসে না !
কিন্তু সতী আসিলেন, অমনি মাতা বলিতেছেন :—
কে এলে মা, কে এলে মা, কে এলে মা সুন্দরী,
বহুদিন দেখি নাই মাগো আয় একবার কোলে করি !

কিন্তু অভিমানিনী সতী কোলে আসিলেন না, বলিলেন :—

চাপবো না মা, চাপবো না মা, চাপবো না মা কোলেতে
পিতা আমার যজ্ঞ করছেন দেখে আসি লয়েতে।
আকাশ পাঁতাল ডাকলে মাগো শিবকে তো ডাকলে না,
আমার গরীব স্বামী মাগো তাই বলে মান রাখলে না।

কখনও বা ভাড়া শ্রীকৃষ্ণরূপে কল্পনা করিয়া যশোদারূপিনী পল্লীবালিকা তাহার-মাতুলের ক্ষুধা মিটাইয়া থাকে :—

“আমার কৃষ্ণর জর হয়েছে পড়ে আছে একধারে
নড়ে নাই চড়ে নাই কৃষ্ণ মা বলে নাই কাল হতে।
মা বলো বাপ যাক্ষমণি, মা বলো কি ফুরালো,
ননী দে ননী দে বলে এখনি বাপ কাঁদছিল।

আমার কৃষ্ণ পথ্য করবে কি কি করবো তরকারী
মুগ মুগুরী পটলভাজা মাগুরমাছের ঝোল করি।”

মাতুলের পিপাসা বন্ধ বালিকার হৃদয় কখনও বা তাহার ভাড়া রামচন্দ্রের মূর্তিতে কল্পনা করিয়া নিজের কৌশল্যার ব্যথা অনুভব করে :—

“রামের মা কৌশল্যারানী ধূলায় পড়ে অচেতন
উঠ কৌশল্য কর মা চেতন আসছে গো তোর রামরতন।
রামের মা কৌশল্যারানী লাভা দিতে জানে না
নারী বলে গাল দিওনা নারীর বড় যন্ত্রণা।
একশ’ টাকার জাম কিনলাম রামকে দিলাম জল খেতে
এমন রামের মলিন দশা আবাম জলে যায় ভেসে।
ও রামের মা, ও রামের মা, রাম কি দিয়ে ভাত খেলে
আমমুগুরী পটলভাজা মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে।
ও রামের মা, ও রামের মা, রামের নাকি অধিবাস
চৌকাঠেতে লেখা আছে চৌদ্দ বছর বনবাস।”

আমাদের পৌরাণিক ইতিকথাগুলি এইসব ছড়ায় এমন মধুরভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পৌরাণিক চরিত্রগুলি পল্লীনারীর অন্তরে আজও দেবতার আসন অধিকার করিয়া আছে। সহর ছাড়িয়া যে সমগ্র বঙ্গদেশ তাহার প্রত্যেকটা নারী-হৃদয় আজও তাই বাঙ্গালীর বহু শতাব্দী সঞ্চিত কৃষ্টিধারা বহন করে ; এখনও তাই পল্লী-জলানীর মেহশীতল অঞ্চল-ছায়ায় আমরা এতখানি শান্তির সন্ধান পাই।

পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া যেসব সাধারণ ছড়া ভাড়ুর সম্মুখে গান করা হয় তাহার কয়েকটি নমুনা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

“উড়কীধানের মুড়কী দিব কালিয়াধানের থৈ,
রাত বারটা বেজে গেল ভাড়া এল কৈ ?
আম খেতে সাধ করেছিলাম কানাই কুঞ্জের বাগানে
আম খেয়ে আম ফেলবো আঁটি শ্যামসায়রের চার কোণে
শ্যামসায়র যেওনা ভাড়া চারকোনা পুরে আছে
চার-নয়নে হৈরে দেখ জবা ফুল ফুটে আছে।
জবা ধরে থবা থবা তেঁতুল ধরে বাঁকা গো,
এ কখনো শুনি নাই মা নাড়ের হাতে শাখা গো।”

অনেক সময় প্রতিবেশিনীর ভাড়ুর সহিত ছড়া কাটাকাটি চলে। ইহাকে পূর্ণা দেওয়া বলে। এই ছড়াগুলি একটু গ্রাম্যতা দোষহীন, তাই বাছিয়া কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম।

“বটলগায়ে কাপড় এল আমার ভাড়া দর করে
ওদের ভাড়া গরবাখাকী নেড়ে চেড়ে জল করে।
সড়পধারে ঘর করিলাম দুপাশাডী লোক চলে
আঁচল পেতে পয়সা নেব করবউরী ডাল ধরে।

করবউরী খেয়ে মরি—শিমুলফুলের বাথড়া
আর যাবনা তোদের পাড়া ভাছ কেঁদে হয় সারা !
নদীর ধারে ঘর করিলাম আয়না বসা ঝরকা
পান খেয়ে যা মুখ দেখে যা ওরে গাঁয়ের গোমস্তা !
চা বাগানে কেরে তুই চা বাগানে কে ?
ভাছুর মুখে যাম পড়েছে ছাতা ধরে দে ।
কে কাঁটা দিলিরে লেবুর বাগানে
গোলাপ গাছে এত কাঁটা কেন কে জানে !
ঘোড়ার গাড়ী টম্ টম্ বাবুর বাগানে
কি ফুল ফুল কি ফুল ফুল চাটুজের কানে !”

গ্রামবালিকাগণ তাহার ভাছকে বীরাঙ্গনা স্মৃতিতেও
দেখিতে চায় । নিম্নের ছড়াটিতে ভাছুর সাহসের কথা ব্যক্ত
হইয়াছে :—

“গাঁয়ে এল গোরা পণ্টন আমার ভাছ দাঁড়াল
ওদের ভাছ গরবাথাকী আঙড় ভেঙে পালাল ।

আবার—

পদ্মপুকুর টলমল জামতলার লোক পালাল
ভাগ্যি ছিল আমার ভাছ সায়েব নিয়ে দাঁড়াল ।
সায়েব দিল সোজা সড়ক বিবি দিল ঘোড়গাড়ী
ঘোড়গাড়ীতে চেপে যাব দেখবো রাজার রাজবাড়ী ।
রাজা আছে রাজমহলে রাণী আছে অন্তরে
ঐ রাণীকে শুধুই এগো ভাছ রাখবো কোন ঘরে !

রাণীর উত্তর—

রাখ্‌গা লো রাখ্‌গা কপাটকোনে
একশ' টাকার ভাছলো, জলে দিব কেমনে !”
ভাছুর সাধারণ ছড়া—
ভাছমনি ঘুমঘুমানি সপতে দেমা আলাতে
যেতে যেতে নিবে গেল বড়বাবুর বাংলাতে !

চার সখীতে জলকে গেনাম মাঝের ভাছ যায় চুরি
হেই ছুট্‌ঠাকুর পায়ে পড়ি বাড়ীতে দাও জরনী !

কদম গাছে চাপলে ভাছ কাঁচা কদম পোড়ো না
পাকলে পরে সবাই খাবে কেউ তো মানা করবে না !
তিন ভাছতে জলকে গেল কোন ভাছটি আমার গো
উকি আঁকা কোমর বাঁকা ঐ ভাছটি আমার গো !
চল ভাছ চল লো যেঘে এল জল
দামী কাপড় ভিজ গেল গেবে গেল মল !

এইরূপ শত সহস্র ছড়া গানে বাঙ্গলার পল্লীগগন ভাছের
সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ; ছড়াগুলি আমরা সংগ্রহ করিয়া
ছাপিতে পারি কিন্তু উহার সুরটি ধরিয়া রাখিবার শক্তি
আমাদের নাই । তাই মনে হয়—ব্রতচারী বালিকাগণ এবং
অত্যাশ্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বালিকাগণ ইহা শিক্ষা করিলে দেশের
একটা প্রাচীন ধারা সুরক্ষিত হয় । এই সময় হইতে ইহা
শিক্ষা না করিলে আর কিছুদিন পরে হয়ত এই সব স্মরণ
সঙ্গীত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ।



বৈদিক সংস্কারে কত্যা ঃ পুংসবন

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

বৈদিক ক্রিয়াকলাপে পুত্রের থেকে কত্তার স্থান অনেক নীচে, এ-ধারণা লোকের বদ্ধমূল হয়ে আছে। এ যে ভুল, তা সংক্ষেপে দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পুংসবন সংস্কারে কত্যা কে আমরা কোন্ আলোকে দেখতে পাই, তাই শুধু এখানে বিবৃত করব।

গর্ভাধান থেকে আরম্ভ করে জাতকর্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সব সংস্কারে পুত্র ও কত্তার প্রতি সমান যত্ন, তাদের সমান মঙ্গলাচ্ছাদন, সমান কল্যাণ কামনা ও সন্তোষ বিধানের ব্যবস্থা ভারতীয় ঋষিরা ক'রে গেছেন। অধিকাংশ ঋষির মতে পুংসবন ক্রিয়া গর্ভাধানের পরে তৃতীয় মাসে সম্পাদন করা হয়।^১ এ ক্রিয়ার সময় ভাবী পিতা জননীর দক্ষিণ নাসিকায় কিছু বঁটপাতার গুঁড়া দিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র-পাঠ করেন। বিভিন্ন বৈদিক শাখায় এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদনের নির্দেশ আছে। এ পুংসবন ক্রিয়া সম্পাদনের দুটো উদ্দেশ্য—(১) ইচ্ছামত পুত্র বা কত্যা প্রাপ্তি, (২) জননীর কল্যাণ সাধন। সাধারণতঃ, সকলের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল আছে যে শুধু পুত্র প্রাপ্তির জন্ত এ ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। কিন্তু তা নিতান্ত ভুল। পুংসবন নামক সংস্কার “পুং” অর্থাৎ, কেবল পুত্র-প্রাপ্তির জন্ত ক্রিয়া বোঝায় না, ইহা জনক-জননীর অভিপ্রেত পুত্র বা কত্তার প্রাপ্তির জন্ত ক্রিয়াবিশেষ। এই অর্থ ই মনুদের অভিপ্রেত। অত্যান্ত অনেকগুলি সংস্কার

ভাবী জননীর প্রতি গর্ভ সময়ে সম্পাদন করতে হয় না; কিন্তু পারস্কর^২, বোধায়ন^৩ প্রভৃতি মহর্ষিরা বলে গেছেন যে সন্তানের (অর্থাৎ) পুংর) জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করাও এ সংস্কারের অঙ্গীভূত বলে এবং সে হেতু প্রতি ভাবী সন্তানের প্রাপ্তির জন্ত মাতা-পিতার উহ ব্যবহার প্রয়োজন বলে পুংসবনক্রিয়া প্রতিবারই সম্পাদন করতে হয়।^৪ আবার সন্তানের ভেতরও ভিন্ন পর্ধ্যায়ের,—যেমন হৃহিতার বেলা পণ্ডিতা হৃহিতা, বা পুত্রের বেলা বীর পুত্র বা পণ্ডিত পুত্র ইত্যাদি—পুত্র বা কত্যা তাঁরা কামনা করতে পারেন। তা নিয়ন্ত্রণের জন্ত বিশেষ করে উহ ব্যবহার প্রয়োজন এবং প্রতি গর্ভে পুংসবন-ক্রিয়া সম্পাদন আবশ্যক।

পরবর্তী যুগের টীকাকারদের মধ্যে কেও কেও সময়ের স্রোতের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে “পুং”র অর্থ পুমান্ পুত্র করেছেন। কিন্তু এ অর্থ শ্রুতকারদের অভিপ্রেত নয়।

পুংসবনের অন্তর্গত পুং কথার অর্থ কেবল ছেলে নয়, ছেলে এবং মেয়ে দুইই। গৃহস্থত্রের সর্বত্র পুংলিঙ্গের দ্বারা জ্ঞীলিঙ্গও বিবক্ষিত। যেমন লৌগাক্ষি কাঠক-গৃহস্থত্রে বলছেন, ‘পুত্রে জাতে নামে ধীরতে’। এখানকার অর্থ এ নয় যে কেবল পুত্র হলেই নাম দেওয়া হবে, কত্যা হলে তার নাম রাখা হবে না। কাঠকগৃহস্থত্রের টীকাকার আদিত্যদর্শন বলছেন নামকরণ ক্রিয়া সমভাবে উভয়েরই হবে।

১ গোভিলগৃহস্থত্র, ২, ৩, ৬, খাদির গৃহস্থত্র, ২. ২ ১৭, পারস্কর গৃহস্থত্র, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মাসে; বারাহগৃহস্থত্র, ১৬. ৫, কুমারিলের মতে প্রথম গর্ভ সময়ে চতুর্থ মাসে, অন্যান্য বারে তৃতীয় মাসে। জৈমিনিগৃহস্থত্র ১. ৫, কুমারিলের একই মত; ভারদ্বাজ-গৃহস্থত্রে, ১. ২২, তৃতীয় মাস অথবা চতুর্থ মাসের প্রারম্ভে; সংস্কার-রত্ন-মণ্ডিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮১১; সংস্কারময়ুখোক্ত বৈজবাপ-গৃহস্থত্র, পৃঃ ২০, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়; জাতুকর্য্য, ঐ পুস্তকে উদ্ধৃত, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ইত্যাদি। বৈখানসগৃহস্থত্র, ৩. ২, চতুর্থ মাসে। চতুর্থ

মাসেরও পরে কাঠকগৃহস্থত্র, ৩২. ২; আপস্তম্বগৃহস্থত্র, ১৪. ২; বোধায়নগৃহস্থত্র, ১. ১০. ১; প্রভৃতি।

২ গৃহস্থত্র, বোধে সংস্করণ, ১৯১৮, ১৪৫ পৃঃ; সমস্ত টীকাকারদের মতও এক। এবং সংস্কার-পদ্ধতি, পূনা, ১৯২৪, ৫১ পৃঃ, ৩ পংক্তি।

৩ গৃহস্থত্র, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ২৯ পৃঃ।

৪ মন্ত্রে ভাবী পিতা বলেন—দশ মাসে সূত্র প্রজননের জন্য আমি (পত্নীকে) দশ আসনের দ্বারা স্পর্শ করছি। ভারদ্বাজ গৃহস্থত্র Solomonর সংস্করণ, Leiden, ১৯১৩, পৃঃ ২২, পংক্তি ১৫।

আখ্যায়নগৃহ্যসূত্রে জাতকর্মের প্রকরণে আছে কুমার যখন জন্মগ্রহণ করবে, স্তব্ধমিশ্রিত জল দিয়ে নবাগতের অভ্যর্থনা করতে হবে। হরদত্ত চীকায় বলেছেন, “লিঙ্গস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ কুমারী অপি প্রাপ্নোতি”, অর্থাৎ কুমার শব্দের লিঙ্গ (পুংলিঙ্গ) বিবক্ষিত নয়, তাই এখানে কুমার ও কুমারী দুইই কুমার শব্দের দ্বারা অভিপ্রেত। এ রকম গৃহ্যসূত্রের সবত্র পুংলিঙ্গের দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গও অভিপ্রেত। কেবল মেয়েদের জন্ত যেখানে কোনও বিশেষ বিধান করতে হয়, তখন সূত্রকারগণ মেয়েদের জন্ত বিশেষ সূত্র করেন। যেমন জাতকর্মের অধ্যায়ের শেষের দিকে বোধায়ন সূত্রে বলেছেন মেয়ের নাম অযুক্তাকর, (এক, তিন, পাঁচ অক্ষরবিশিষ্ট, যেমন স্মিত্রা) ; তার পরেই বলেছেন অমুগ্নৈ এবং অমুগ্নৈ স্বতীতি। এখানে অমুগ্নের মানে অমুগ্নে এবং অমুগ্নে দুই-ই পুত্র ও কন্যা উভয়েই। পুত্র ও কন্যা দুজনের জন্ত স্বস্তি উচ্চারণ করতে হবে।

কন্যার বিনিময়ে কেবল পুত্রের প্রাপ্তির জন্ত একটা আলাদা সংস্কারের বিধান করতে ঋষিরা যাবেনই বা কেন? কন্যা মাতাপিতার কম অনভিপ্রেত বা কম কাম্য—এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তো তাঁরা বলেন না। তাঁরাই তো নির্দেশ করেছেন যে কন্যালাভের জন্ত মা ও বাবা দ্বিতীয় বিবাহের সময় বর বধূর অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন সমস্ত অঙ্গুলী স্পর্শ করেন। ৮ এই অতি সাধের কন্যালাভের জন্তই ভাবী পিতা ভাবী জননীর স্বর্গে প্রথম প্রবেশের অব্যবহিত কাল পরেই তাঁকে ধ্রুব ও অশ্রান্ত নক্ষত্র প্রদর্শন করান। ৯ মা বাবার একান্ত কাম্য—ঋগ্বেদে বলা আছে। ১০ ঋগ্বেদে বহু কন্যার পিতার ভূয়সী প্রশংসা আছে। ১১ তাঁর সেবাকর্মের তুলনা নেই বলে কন্যা মা-বাবার অত্যন্ত আগ্রহের ধন—ঋগ্বেদে বলা আছে। ১২ কন্যাকে

শরীরে সামনে রেখে পিতা পূজা করেন—কোমলতা, পবিত্রতা ও সাধনা প্রভৃতির প্রতিমূর্তি হিসাবে; জন্ম থেকেই কন্যা কোনও না কোনও দেবতার প্রতীক হিসাবে মাতাপিতার স্মৃতি ও সৌভাগ্যের কারণ হন। প্রথম বৎসরে তিনি সন্ধ্যাদেবী, দ্বিতীয় বৎসরে সরস্বতী, এ প্রকারে যৌবনাবস্থা প্রাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন দেবীরূপে তিনি পূজিতা হন। যজ্ঞে হিতকামী ব্যক্তি মাত্রেই প্রতি যজ্ঞের শেষে এ কুমারী পূজার অনুষ্ঠান করেন। ১৩ এ প্রকারে কন্যা কেবল সেবাকর্মাবলম্বিনী গৃহ-তপস্বিনী নন, তিনি পরম দেবতার মূর্ত প্রতীক, সর্ব মঙ্গলের, সর্ব কল্যাণের সৌভাগ্যের প্রজনয়িত্রী, বিধাত্রী, অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পরে পরে ভারতীয় সমাজে এমন অধঃপতন ঘটেছে যে এ-হেন কন্যাও লোকের হৃৎকায়ের কারণ বলে পরিগণিত হয়েছে—এর থেকে অনুশোচনার বিষয় আর কি হতে পারে? কালক্রমে সত্য অর্থ ভুলে গিয়ে লোকে কন্যার অবমাননা-সূলক এক অর্থ সাব্যস্ত করে নিল—পুংসবন অর্থাৎ কেবল পুরুষ ছেলের জন্ত ক্রিয়া এবং কন্যা পিতামাতার একেবারেই কাম্য নয়। কন্যার জন্ম অনাদার দেশের সর্বাঙ্গীন অবনতির কারণ না হয়েই পারে না।

সংস্কৃত সাহিত্যে ১৪ পুং শব্দের পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয় অর্থে প্রয়োগও বহু বহু স্থলে আছে।

সুতরাং গৃহ্যসূত্রকারদের রচনা প্রণালী অর্থাৎ পুংলিঙ্গ দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গেরও কথন-পদ্ধতি, পুংসবনক্রিয়া-পদ্ধতি, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সবত্র কন্যার প্রশস্তিবাদ ও গৌরব ঘোষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে কন্যা পুত্রের মতই বরণীয়া ছিলেন এবং মাতাপিতার ইচ্ছানুসারে পুত্র বা কন্যার জন্ম এবং জননীর কল্যাণ কামনা করাই পুংসবনের উদ্দেশ্য।

৫ ত্রিবেণ্ড্রম সংস্করণ, ১৯২৩, ৬০ পৃঃ, পংক্তি ১৭-১৮।

৬ মহীশূর সংস্করণ, ৩৫ পৃঃ, ১৭ পংক্তি।

৭ গোভিল-পরিশিষ্ট, শ্রীকল্প, কলিকাতা, ১৯০৯, ১৮৭ পৃঃ। পারস্কর-গৃহ্যসূত্র, বোধে সংস্করণ, ৫৩৮ পৃঃ, ২১ পংক্তি, তত্পরি গদাধর চীকা, ১ পংক্তি।

৮ আখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্র, বোধে সংস্করণ, ১৯০৯, ১. ৭. ৪, পৃঃ ২৩, পংক্তি ১১-১২; আগস্ত্য-গৃহ্যসূত্র, মাদ্রাজ, ১৮৯৩, ৪. ১২।

৯ কাঠক গৃহ্যসূত্রের চীকাকার দেবপাল ১৫, ৪৫, পৃঃ ১১৪, পংক্তি ১-২।

১০ ৮. ৩১. ৮। ১১ ৬. ৭৫. ৫। ১২ ২. ৭. ৭।

১৩ ত্রিবেদীর ক্রিয়া-কাণ্ড-পদ্ধতি, কলিকাতা, ১৮৮৭, পৃঃ ১৬০ “...কুমারী-পূজনমহং করিষ্য ইতি কুমারীমানীয় পূজয়েৎ।

১১ বরাহ-মিহিরের বৃহৎ-সহিতা, ভিজিয়ানগরম্ সংস্কৃত সীরিজ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, ৫৩.১ ও ৮৫৫। ভাগবত-পুরাণ, ৮.২৪.৪৮। হেমচন্দ্র, অভিধান-চিন্তামণি, Bohilinkর সংস্করণ, ১৮৪৭, পৃঃ দেখ। ভট্ট গোপীনাথের উপোদ্যাত আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সীরিজ, গ্রন্থাঙ্ক ৯৪, পৃনা, ১৯২৪, পৃঃ ১৮, পৃঃ ১৫, যেনোপদিশ্যতে, ইত্যাদি। পাবিনি, ১২.৬৬-৬৭; সিদ্ধান্তকৌমুদী, সূত্র ৯৩২-৩৩, প্রভৃতি এ রকম বহু।

প্রবাসী—চৈত্র ১৩৪৮

প্রগতির পথে

শ্রীপুরঞ্জয় রায়

প্রগতির যুগ বলিতে আমরা বুঝি সেই বিশেষ অর্থটি যাহা দ্বারা স্থিতিশীল জড় অবস্থাকে একটা টলমল প্রাণ হিল্লোলে সজীবিত করে। বলা বাহুল্য ইহা সমান বিজ্ঞানের একাংশেই ব্যবহৃত হয়। মানুষের আছে জন্ম, যৌবন ও জরা বা মৃত্যু! সমাজেরও আছে ঠিক সেইরূপ জন্ম যৌবন ও জরা বা মৃত্যু! আবার তাহার হয় নব জন্ম আবার চলে নিত্য কালের লীলা নব নব রূপে। যৌবনের আবেগোচ্ছল দিবসে মানুষ ভাবে সেই আনিবে সর্ব সংস্কার যুক্ত নূতন দৃষ্টি ভঙ্গিমা, যাহার বলে সে রাখিয়া যাইবে কালের বুকে একটা শাশ্বত রেখা! কিন্তু হায়, সত্য কথা বলিতে কি প্রগতির যুগ বলিয়া কোন একটা বিশেষ যুগ নাই—ইহা সর্ব কালের সর্ব মানবের!

এষা সনন্তী সনমেব জাতৈষ পুরানী পরি সর্বং বভূব।

মহী দেব্যুসো বিভাতী সৈকেনৈকেন মিশত বিচষ্টে॥

(অথর্ববেদ ১০ কা ৮ সু ১০ম)

‘এই সনাতন নিত্য প্রকৃতি সর্বদাই প্রসিদ্ধ, এই পুরাতন অথচ চির নূতন প্রকৃতি সর্ব কার্যেই পূর্ণভাবে বিরাজমান থাকে। ইহা শ্রেষ্ঠা ও কান্তিময়ী। ইহা কমনীয় পদার্থ সমূহকে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত করে। এই প্রকৃতি প্রত্যেক গতিশীল জীবের সহিত নিজের স্বরূপ ঘোষণা করে। অর্থাৎ প্রকৃতি নিত্য সর্ব কার্যের কারণ এবং জীবের জন্মই সম্ভাব্যতা’

লক্ষ্য করিতে হইবে ‘পুরাতন অথচ চির নূতন প্রকৃতি’! সত্যই এখানে দ্বিমত নাই। সৃষ্টির আদিম প্রাচ্যে প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে স্নেহ প্রেম ভালোবাসা ঘৃণা হিংসা জিয়াংসা প্রভৃতি দেব ও দানব সুলভ যে বৃত্তি গুলি প্রদান করিয়াছেন আজ হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন পৃথিবী সেই গুলিই নব নব ভঙ্গিমায় প্রকাশ করিতেছে মাত্র। আজিকার জ্ঞানে বিজ্ঞানে শৌর্য্যে বীৰ্য্যে প্রতিভা মণ্ডিত মানুষ সেই আদিম দিনটার মতই অসহায়—প্রকৃতির করুণার ভিখারী! আদিম দিনের প্রথম নরনারী আদম ইভকে যে নামেই অভিহিত

করুন না—প্রকৃতির নম্র সন্তান ছুটি তাহার আরণ্য ভূমিতে যে আবেগ যে অনুভূতি লইয়া প্রথম প্রেম নিবেদন করিয়াছিল আজিকার সভ্যতাদীপ্ত মানুষ তাহার সুপরিচরিত সৌধ শিখরে বসিয়া বেশ ভূষা ও সৌন্দর্য্য প্রসাধনে অপরূপ সাজিয়া নিরাল সন্ধ্যায় মার্জিত ভাষার বিস্তারিত যে প্রেম নিবেদন করে তাহা কি সে দিনের চেয়ে বেশী আবেগময়, বেশী অনুভূতি সম্পন্ন?

রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি—

“আজও দেখি সেই কটাক্ষ

জাঁখির কোণে দিচ্ছে সাফা”—

তাই ত দেখি বর্তমান যুগের এক মহাকবি অতীত দিনের মহাকবিকে পরিহাস করিয়া বলিতেছেন, তোমার যুগে জন্ম লাভ করিতে পারি নাই বলিয়া আমার মনে কিছু মাত্রও ক্ষোভ নাই কারণ নিপুণিকা তরুনিকাকে বাণুব চক্রে দেখিবার সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই বটে কিন্তু তোমার লেখনীর স্ননিপুন আঘাতে সেই সকল বালিকা নরনারী মর্ত জীবের মতই আমার কাছে শরীরী! কিন্তু মহাকবি তুমি ত আমার কালের বিনোদিনীকে দেখিতে পাইলে না! কিন্তু ইহাও নিছক পরিহাসই! কারণ নিত্যকারের বিনোদিনী নিশ্চয়ই মহাকবির অপরিচিতা নহেন।

নারী চিত্তের যে চিরন্তন রূপ তাহা কি হাই হিলের চাপে পিষ্ট হয়? হয় না! আর হয় না বলিয়াই যুগে যুগে তাহার অন্তর্নিহিত স্রবমায় বর্ষে গন্ধে নিখিল চিত্তলোকে গভীর রেখা পাত করে। প্রগতির চেউ লাগিয়াছে প্রত্যেক জাতি ও সমাজের বুক তাহার নূতন রূপ নূতন নূতন রস লাভের আশায়! যে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছে বহু দিনের সঞ্চিত ক্রোধ রাশি দূর করিয়া আমরা আনিব নূতন আলোক নূতন প্রাণ সম্পদ যাহার প্রবল প্রভাবে ভাসিয়া যাইবে পুরাতন চিরা চরিত সংস্কার সঙ্কীর্ণতা মানিয়া! তাইত দেখি দুর্জয় সাহসে একটীর পর একটা সম্ভাব্যতা—যথা আধ্য, রোমান, গ্রীক, খ্রীষ্ট, মিশরীয় ব্যবিলোনিয়া ইসলাম সভ্যতা প্রগতির

নব নব পতাকা উড্ডীন করিয়া চলিয়াছে দৃষ্ট ভঙ্গিয়ায় ! কিন্তু না, প্রগতির জাতি নাই দেশ নাই কাল নাই পাত্র নাই—সে সকলেরই উদ্দেশ্য ! যে নদী একবার পর্বতমাত্র ভেদ করিয়া সাগরোদ্দেশ্যে ধাবিত হয় তাহার সাগর সঙ্গমের পূর্বে নিষ্কৃতি নাই ! প্রগতির সাগর সঙ্গম কোথায় ? বৃষ্টি বা কোথাও নাই ! কারণ প্রগতির পরিণতি নাই কারণ চির-পুরাতনই বার বার আসে নূতনের বেশে !

কিন্তু ইহার একটি বাস্তব রূপ আছে, নহিলে ইহার মাদকতা এত বেশী হইত না ! আর এই রাস্তাবতার পশ্চাতে আছে একটি জু-পারিস্ফুট আদর্শ ! বাস্তব, বাস্তবী যদিও অন্তর্নিহিত আদর্শকে আমল দিতে চাহেন না তথাপি সত্যের খাতিরে ইহাকে অস্বীকার করাও চলে না—সেই আদর্শ মানব জীবনের পরিপূর্ণতার পরিণতি ! কাব্যে, ইতিহাসে, দর্শনে বিজ্ঞানে সমাজে রাষ্ট্রে একটি পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ! সত্য কথা বলিতে কি প্রকৃতির ইতিহাসে চরম বা পরম বলিয়া কিছু নাই ! যদিও ধর্ম বা দর্শনের ক্ষেত্রে চরম শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে তথাপি মানবোতিহাসের চলমানতার আজিও পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নাই—অনাগত কোন যুগে পড়িবে কি না জানি না ! শুধু এইটুকু জানি ভবিষ্যৎ আসিবে কেবল অতীতকে পশ্চাতে ফেলিবার পরাজিত করিবার দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা লইয়া ! যদি চ সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ ঘটয়া উঠে না তথাপি এই প্রচেষ্টাই আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে—আর ইহাই প্রগতি ! মানুষ জন্ম লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, তাহার চাই নব জন্ম বা দ্বিজ্ঞান ! প্রতি মানবেরই নব জন্ম লাভ হয় কাহারও বা জ্ঞাতসারে কাহারও বা অজ্ঞাতসারে। সে প্রেরণা যখন জাগে তখন তাহার অধীর আবেগে নিজেই আবাক হইয়া যায়, তাহার বিশ্বয়ের আর অবধি থাকে না। প্রচলিত সংস্কার বাধা ধরা নিয়ম কানুন প্রচলিত আদর্শ ধরা তাহার নিকট ক্ষুদ্র হইয়া যায় ! মহত্বের উচ্চ শিখরে বসিয়া সে যে দর্শন লাভ করে তাহা দেশ কাল জাতি সমাজ সংসারের সকল গড়িকে অতিক্রম করিয়া এক নিধুম জ্যোতি মণ্ডলে অবস্থান করে যেখান হইতে মর্ত্য মানবের কল কোলাহল নিন্দাস্ততি ভাল মন্দকে যে গ্রাহ্যই করে না। তখন, তাহার ভাব সংগৃহীত সংবদ্ধ সংবোধ মনোংসি জানিতাম।

দেবা ভাগ্য যথা পূর্বে সংজ্ঞাননা উপানতে ॥

(স্বপ্নে ১০ ম ১৯১ খ্র ২ ম।)

হে মহত্মা ! তোমরা সকলে এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে মিলিয়া আলোচনা কর, তোমাদের মন উত্তম সংস্কার যুক্ত হউক। তোমাদের পূর্বজ জ্ঞানী পুরুষেরা যেরূপ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন তোমরাও সেরূপ কর।

তবেই দেখা যাইতেছে যে ইহারও একটি আদর্শ আছে। প্রগতির গতিপথে সে সকলকে ডাক দিয়া চলিয়াছে একটি মহত্তর ও বৃহত্তর ক্ষেত্রের পানে যাহা সাময়িক ভাবে ছিল অবরুদ্ধ হইয়া বা যাহার প্রাণ শক্তি হইয়াছিল ক্ষীণতর। প্রাণের অবরুদ্ধ আবেগের মুক্তি-দূতরূপেই ইহার জন্ম লাভ। ইহার প্রকাশ ভঙ্গিমা বিচিত্র হইতে পারে শক্তিমানের অভাবে ইহার পরিচালনায় ইহার দোষ ত্রুটি থাকিতে পারে কিন্তু ইহার শক্তি ইহার মর্যাদা ইহার মহত্ত্ব সর্ব-জন-গ্রাহ্য ! প্রগতিপন্থী বলিতেই আমরা স্বর্ণায় নাসিকা কুণ্ঠিত করি, মনে মনে অভিসম্পাত করি এই বলিয়া যে হায় হায় ইহারা ধর্ম কর্ম সংসার সমাজের বাহা কিছু কল্যাণকর সকলই ধ্বংস করিল বলিয়া ! কিন্তু না, শুধু অপরের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া ব্যাভিচারের শ্রোত বহাইতে ইহাদের জন্ম নয়—ইহার ভিতরেও কল্যাণের রূপ আছে। তাহাকে ঠিক ঠিক মত বুঝা ও খাপ খাওয়াইয়া লইতে কিছু সময় লাগিতে পারে কিন্তু ইহাকে ঠেকাইয়া রাখা কাহারও সাধ্য নহে। কল্যাণের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে তাই দেখি যিহু বা শঙ্করাচার্য্য কেহই তৎসাময়িক প্রচলিত সংস্কার পন্থীদের নির্ঘাতনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই ! মানব মন স্বভাবতঃই রক্ষণশীল বা Conserveative ! কায়েই গতাঃ-প্রগতিক পন্থা ছাড়া ভিন্ন পথে পা বাড়াইবার পূর্বে তাহার সমস্ত ঝুঁকি বা বিপদ অপরের বাড়ি দিয়া Experiment বা পরীক্ষা করাইয়া লয়। যদি সেই Experiment টিকিয়া গেল ত তাহার জয়ধ্বনিতে তাহারাই গগন পবন মুখরিত করিয়া ফেলে নচেৎ বিজ্ঞের হাঁসি হাঁসিয়া বলে ও আমরা আগেই জ্ঞাতাম হে, এর পরিণতি শেষে ওই হবে। Pioneer বা প্রবর্তকদের দুর্দশার কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া স্মলভ-রসিকতায় আসর মাৎ করেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান, সংসারে কিছুই ব্যর্থ যায় না, ব্যর্থতা আসে সফলতার পূর্ববর্তী সোপানরূপে ! তাই তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিরা তাঁহাদেরই আসনে বসিয়া—প্রগতির পথ-পতাকা তুলিয়া ধরেন। পূর্বেই বলিয়াছি ইহার একটি নিজস্ব গতি আছে সে গতিবেগকে অস্বীকার করার বিপদ আছে কারণ-বস্তুর-জলকে রোধ করিতে যাওয়ার অর্থই হইতেছে যে সেই বস্তুর ভাসিয়া যাওয়া ! প্রথম স্রোতাবেগে অনেক আবর্জনা ময়লা কুটা বহিয়া আসে কিন্তু ইহাই ইহার সবটাই নহে। এইটুকু স্মরণে রাখিলেই আমাদের মনের বিতৃষ্ণা অনেকখানি কমিয়া যাইবে। ইহাকে আমরা সহজ ভাবেই গ্রহণ করিতে পারিব। প্রগতির যুগ-সন্ধিক্ষণে যেন সেই পতিতার মত আমাদের আক্ষেপ করিতে না হয় যে—দেবতারে মোর কেহ ত চাহে নি নিয়ে গেল সব মাটির চেলা। দূর দুর্গম মনোবনবাসে পাঠাইল তারে করিয়া হেলা।

কাশী ভ্রমণ

[শান্তিনিকেতন ছাত্র জীবনের এক অধ্যায়]

শ্রীরণজিৎ গুণ

১৩৪৭ সাল। শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব অনাড়ম্বর শেষ হয়েছে। দেশে হর্ভিক্ষের দরুন মেলা বসে নি। নিয়ম রক্ষার জন্ত যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকুই আয়োজন ছিল। গুরুদেব অসুস্থতার জন্ত উৎসবে যোগ দিতে পারলেন না। আমাদের এত আনন্দের উৎসব একাদশীর উপবাসের মতোই শেষ হলো।

এমন সময় খুবর এলো অধ্যক্ষের নিকট হ'তে, যে কলেজের দল ভ্রমণে যাবে কাশীতে। কাশী পূর্বে কখনও দেখি নি, হিন্দুর ছেলে উত্তরাধিকারী স্ত্রে মনের কোথাও যেন বিশ্বের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা গোপন ছিল,—তাই সহজেই মনটা ছুটে চললো ঐ দিকে। কিন্তু সামনেই ছিল Test পরীক্ষা, পাঠ বন্ধ করে এ সময়ে ভ্রমণে বের হতে অন্তর থেকে পূর্ব সমর্থন মিললো না। দো-টানায় পড়ে মন হাঁপিয়ে উঠছিল।

যাই-হোক, সমস্তার সমাধান মিললো যখন অনিল দা (অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনিল কুমার চন্দ) প্রতিশ্রুতি দিলেন যে Test পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দেওয়া হবে। সমস্ত সংকোচ বেড়ে ফেলে, কাশী যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হতে লাগলাম।

রেলের Concession টিকিট আনা, জিনিষ পত্র সংগ্রহ করা ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে টাকা আদায় করা,— প্রভৃতি পর্ব সমাধা করে, আমরা যখন যাবার উদ্যোগ করছি এমন সময় হঠাৎ সংবাদ আসলো, ছেলে অভিজিতির অসুস্থতা নিবন্ধন অনিল দা যেতে পারবেন না, সুতরাং excursion বন্ধ। হরিষে-বিষাদ,—আমাদেরও হৃদ্যোধন এর অবস্থা হবার উপক্রম হ'লো।

ভগবানের অনেক দয়া, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অভিজিত সুস্থ হয়ে উঠলো। আমরাও প্রস্তুত ছিলাম। অনিলদার উৎসাহ ও ভাটিয়ে খায় নি। সুতরাং তল্লি তল্লা বেঁধে, আমরা পঞ্চাশ জন ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যাপক মিলে কাশী ধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম ২৪শে ডিসেম্বর।

পূর্বাচ্ছেই বলে রাখা ভাল, যে গাড়ীতে উঠা নামা করবার সময় মালপত্র বহন করবার জন্ত কুলীর বন্দোবস্ত করা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ। জিনিষ পত্র নিজেদেরই উঠাতে নামাতে হতো।

বর্ধমানে আমাদের গাড়ী বদলে দেয়াতুন এক্সপ্রেস ধরতে হবে। সেখানে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে প্রায় ষণ্ঠা তিনেক। রাত্রির আহার পর্ব আমাদের সমাধা করতে হয়েছিল বর্ধমানেই। সঙ্গে, লুচি তরকারী প্রস্তুত করে আনা হয়েছিল। যথা সময়ে আমাদের কাপ্তেন ভূজঙ্গদা [শ্রীভূজঙ্গ ভূষণ মিত্র, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা বিভাগের কেরানী] আমাদের নেতিয়ে পড়া লুচি ও তরকারী বিতরণ করলেন, আর আমরাও যাত্রা দলের সদস্যদের মতো প্ল্যাটফরমে সার হয়ে বসে সেগুলো পরম তৃপ্তিতে আহার পর্ব সমাধা করলাম।

রাত্রি কাটলো দেয়াতুন মেইলে।...

কাশী ষ্টেশনে গাড়ী পৌছলো পরিদন ভোর বেলায় ষ্টেশনে আমাদের সন্ধান করা আমাদের আশ্রমেরই ছাত্রী শ্রীমতি কমলা তারুয়ে আর ওর জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমাদের থাকবার স্থান কাশী ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ রাজবাট মণ্টেসরী স্কুল পূর্বেই পত্র দিয়ে ঠিক করা হয়েছিল। মেয়েরা এটাচি নিয়ে রওনা হলেন আশ্রমভিমুখে, আমরা রইলাম ষ্টেশনে; —মালপত্র টেনে নিয়ে যেতে হবে।

সে আর এক অভিজ্ঞতা! কোনদিন মুটেগিরি করিনি তাই এ পরিশ্রমের গুরুত্ব জানা ছিল না। সেই দিন সে উপলব্ধি হয়ে গেল। মোট বইতে সব চাইতে বেগ পেতে হয়েছিল মেয়েদের বোঝি গুলো নিয়ে। সে কী ভারি! বিহানা এত ভারি হতে পারে, সে আমাদের ধারণার বাইরে। খোঁজ নিয়ে পরে জানা গিয়েছিল যে মেয়েরা যাতে তাঁদের সাড়ী ও প্রসাদন বস্ত্রগুলি ঠিকভাবে পৌছে, সেই জন্ত ছোট্ট স্ট্রকেশে সেই গুলি ভরে, স্ট্রকেশ গুলো বেড়িয়ে

বেঁধে এনেছিলেন, কারণ এক বেডিং ভিন্ন অন্য কোন ল্যাগেজ কেউ নিতে পারবে না এরূপ আদেশ অধ্যক্ষ মহাশয়ের ছিল। বিষয়টা অবশ্য কোন নির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় নি, তাই এর সত্যতার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ হয়তো যথেষ্ট আছে। যাই হোক, আমরা “অপরোধী” যুটের দল একটু গলদঘর্ম হয়েছিলাম, এ কথা অতি খাঁটি।

সেই দিন দুপুরে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা শ্রীমতি কমলাই করেছিলেন; আমাদের কোন বেগ পেতে হয়নি। রাজঘাট স্কুলের ‘বোডিং হাউস’ আমাদের জন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের জন্ত কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া হলো। মেয়েদের কর্ত্রী হয়ে রইলেন রাণীদি (শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ), আর অন্য অংশে রইলো ছেলেরা। আমরা কয়েকজন আশ্রয় নিলাম দোতলাতে।

দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর রাত্রের আহারের আয়োজন চললো। মেয়েদের কেউ কেউ শীতের পড়ন্ত রোদে পিঠ এলিয়ে তাস পিঠিতে স্নান করলেন। আমাদের আবাসস্থলের প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে আমাদের রান্নার উল্লু প্রস্তুত করতে গেলাম আমরা কয়েকজন।

হাট করতে গেলেন বন্ধু নির্মলানন্দ ঘোষ আর শুভেন্দু দত্ত। হাট নিয়ে ওরা যখন ফিরলো, তখন রাষ্ট্রভাষা ভাষীদের দেশে এসে বন্ধুবর যে বিপদে পড়েছিলেন, তা শুনে না হেসে পারলুম না। বন্ধুবর আলানি কাঠ ক্রয় করতে গিয়ে দোকানীকে জিজ্ঞেস করে বসেছিলেন “ল্যাড্‌কির” দর কত। অর্থাৎ “ল্যাড্‌কি” বিকৃত ভাবে রূপান্তরিত হয়ে ঐ গোল ঝাষিয়েছিল। যা হোক, তথা-কথিত রাষ্ট্র ভাষা প্রচলিত হলে-ভেতো বাঙ্গালীর প্রাথমিক নাকাল-বনার দৃশ্য কিছুটা আঁচ করা গেল।

হাট নিয়ে ফিরলে পর মেয়েরা বসলেন কুটনো কুটতে। আমরা রান্নার আয়োজনে লাগলাম। জানিয়ে রাখা ভাল যে আমাদের দলটিকে, ছোট্ট ছোট্ট খণ্ড দিয়ে ভাগ করে, এক এক দলের উপর এক একটি কার্য্য তার অর্পণ করে, কার্য্যসূচী এর মধ্যেই ঠিক করা হয়েছিল।

এক দলের উপর তার পড়লো বাসন মাজার। অনিলদা এই দলের কাপ্তেন, অর্থাৎ তিনি হলেন সর্দার বাসন-মাজিয়ে। আমাদের দলের উপর পড়লো রান্না ঘরের ভার। আমাদের

পাণ্ডা হলেন রাণীদি। চা প্রস্তুতের ভার পড়লো আর এক দলের উপর। ভিন্ন দলকে দেওয়া হলো পরিবেশনের ভার। হাট করবার তার নির্মল আর শুভেন্দুর উপরই রইলো। ভূজঙ্গদা রইলেন আমাদের ‘জোনাবেল ম্যানেজার’ হয়ে।

নিজেরা মিলে এই সকল কাজ করা যে কত আনন্দের ও কত শিক্ষামূলক তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে লিখে বুঝানো কষ্টকর।

আমাদের পরের দিনের ‘প্রোগ্রাম’ রইলো, রাজঘাট স্কুল ও সন্নিকটবর্তী excavation camp দেখা। প্রথম দিনের কাজের চাপ বেশী হওয়ায় আমরা প্রায় সকলেই ক্লান্ত ছিলাম, তাই এই ছোট্ট কর্মসূচী বহাল রইলো।

রাজঘাট যে স্থানে অবস্থিত সেইখানে সিপাহী যুদ্ধের সময় সাময়িক দুর্গ করা হয়েছিল। তাই কাশীর লোকেরা ঐ অঞ্চলটাকে ‘কিল্লা’ বলে।

Rishi Valley Trust এখানে ৩৩০ একর জমি ক্রয় করে এই স্কুল স্থাপন করেছে। গঙ্গার পার্শ্বে এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর। এই স্কুলের ঘরবাড়ীগুলো, শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী হয়েছে।

এখানকার শিক্ষা Montessori System অনুযায়ী দেওয়া হয়। প্রথমতঃ শিশুদের বোধশক্তিকে উন্মোচিত করাই এখানকার শিক্ষালয়ের প্রধান করণীয়। তারপর এখানকার শিক্ষকদের লক্ষ্য হলো ছাত্রদের মন থেকে ভীতিবোধকে সরিয়ে দেওয়া (Eradication of fear), কারণ এই ভীতিবোধ শিশুর অন্তরের শিল্পীটিকে থব করে দেয়, তার স্বজন শক্তি শিথিল হয়ে যায়।

তাই ওরা বলেন—Fear of anykind inhabits creativeness and dries up the springs of all originality of thought and action.

ছাত্রকে তার শিশু-মনের খেয়াল অনুযায়ী কাজ করতে দিয়ে অন্তর্নিহিত রুচিকে বিভিন্ন ধারায় উদ্বোধিত করে তুলাই এখানকার শিক্ষাপদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা একে একে ওদের সমস্ত বিভাগগুলোই দেখলাম।

রাজঘাটের স্কুল পরিদর্শন অন্তে আমরা সন্নিকটস্থ excavation area দেখতে গেলাম। বহু শতাব্দী পূর্বে নদীর

পার্শ্বে যে সব লোকালয় ঘরবাড়ী ছিল, সেগুলো বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপ্লবে পড়ে তলিয়ে গিয়েছিল কোন অতল গর্ভে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানুষের অল্পসংখ্য দৃষ্টি তাকে এড়িয়ে যায় নি। তাই সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সে সব মাটি খুঁড়ে গবেষণার বস্তু বের করেছেন।

আবাসস্থলে ফিরে এসে রন্ধন আর নানাপ্রকার বৈঠকী-খেলা (Indoor games) দিয়ে আমাদের সেদিনকার হুচী শেষ করা হলো। এমনি আশুন আলিয়ে বৈঠকী আসর দিয়ে আমাদের দিনান্তের কর্মতালিকা শেষ করা হতো।

ভোর না হতেই Rising bell বাজাতেন অনিলদা। একে তো কাশীর শীত, তার উপর শেষ রাত্রের জমাট ঘুম ছেড়ে, লেপ ত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টকর। সব চাইতে কষ্ট হতো বাসন-মাজিয়ে দলের। পূর্ব রাত্রের তৈজসপত্র মেজে না দিলে ভোরবেলায় চা হবে না—তাই এই হিম-শীতল জলে এ্যামেচার বাসন মাজিয়ে সম্প্রদায়ের বেশ একটু কসরৎ করতে হতো।

আমাদের পরের দিনের হুচী ছিল সারনাথ সফর। বেলা আটটায় সারনাথ অভিমুখে যাত্রা করলুম। ছুটি প্রকাণ্ড বাস আমাদের নিয়ে চলো বৌদ্ধ তীর্থে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে সারনাথের প্রসিদ্ধ স্তূপের নিকট আমাদের গাড়ী থামলো। এই সেই সারনাথের বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ যার ছবি আমরা দেখেছিলাম ছোটবেলায় স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে; যার বেদীমূলে রয়েছে যুগ যুগান্তের কত সহস্র বৌদ্ধ ভক্তের অন্তিম অর্ঘ্য।

এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রওনা হলুম বৌদ্ধবিহার দেখতে। বিহারের ভেতরকার মাধুর্য ও তার স্নিগ্ধ আবেষ্টনী উপভোগ করবার কথা ভাবায় ব্যস্ত করবার নয়। এখানে এক খেত প্রস্তরের বৌদ্ধ মূর্তি দেখে গুরুদেবের সেই বাণী মনে পড়ে।

“Budha, my Lord, my master thy birth place is truly here where cruel is the world of men, for thy mercy is to fill the blank of their utter failure, to help them who has lost their faith and betrayed their trust to forget themselves in thee and has forget their malignant day.

উচ্চ খেত প্রস্তরের বেদীর উপর বৌদ্ধমূর্তি স্থাপিত আর তারই চারিপার্শ্বে দেওয়ালে, বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনী অবলম্বনে ফ্রেস্কো (Fresco) চিত্রনিপি অঙ্কিত। বিহার থেকে আমরা চলাম excavated অঞ্চলে দেখতে।

বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের কীর্তিভূমি ছিল এই সারনাথ। শত শত স্তূপ, মঠ ও স্তম্ভ এখানে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিহাসে আজ সেগুলো ভূগর্ভে ডুবে গিয়েছে। সরকার থেকে ইতিহাসের সেই পুণ্য স্মৃতিকে স্মরণ করবার জন্য তখনকার দিনের ভাস্কর্যের প্রতি প্রজ্ঞাজলি নিবেদন করবার জন্য আজ সেগুলো খনন করে বের করা হচ্ছে। এখানে দেখলাম, সেই বিখ্যাত অশোকস্তম্ভ, যার খবর আমরা ছোটবেলায় ইতিহাসে পেয়েছিলাম। স্বচক্ষে তার ভগ্নাবশেষ দেখে আনন্দাবনত চিত্তে বৌদ্ধ সম্রাটের কীর্তির প্রতি প্রজ্ঞাজলি নিবেদন করলাম।

দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করার পর আমরা সারনাথের বাহুবর দেখলাম। খননকালীন যে সব প্রস্তরমূর্তি বা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলো সংগ্রহ করে এখানে রাখা হয়েছে। এই বাহুবরেই অশোক-স্তম্ভের সিংহমূর্তি যুক্ত কিরীটটি রাখা হয়েছে। ভাস্কর্য ও চাকশিল্পের কী অপূর্ব সমাবেশ। আমাদের সঙ্গে রাণীদি, মমতা, [মমতা ভট্টাচার্য্য] শান্তি-নিকেতনের নৃত্য শিল্পী ও কলা বিভাগের বিশিষ্ট ছাত্রী প্রমুখ শিল্পীরা ছিলেন! তাঁরা হয়ত ভাস্কর্যের টেকনিক, ‘টেরা-কোটা’র মাধুর্য্য বিশ্লেষণ করবেন। কিন্তু আমি দেখেছি গত যুগের সেই শিল্পীদের পরাজয়, বিংশ শতাব্দীর এই অল্পসংখ্য মানুষের কাছে। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, আমাদের ফাঁকি দিয়ে তাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের প্রতিভার পরিচয় আমাদের কাছে গোপন থাকবে চিরদিন, কিন্তু তা নয়, তাঁরা আজ আমাদের বক্ষা বাহুবরে বন্দী।

সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা ফিরে এলাম আমাদের আবাসস্থলে।

আমাদের এর পরের দিনের হুচী ছিল, নৌকা করে গঙা পেরিয়ে অনেক দূরে এক বালুর চড়াতে গিয়ে চড়ুইভাতি করা। গঙা বক্ষে নৌকা ভ্রমণ যে না করেছেন, তাঁকে ভাষায় বুকান অসম্ভব যে সে কী এক আনন্দের পরিপূর্ণ। গঙার এক পার্শ্বে সারি সারি বাড়ী আর ছোট বড় শত শত মন্দির আর অল্প পার্শ্বে বিস্তৃত বালুকা রাশি।

ঘাটে ঘাটে স্নানযাত্রীর অপূর্ব সমাবেশ। যাবার পথে পড়লো মণিকর্ষিকার ঘাট। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রায় দশটি চিতা দাউ দাউ করে অজানা জনের নশ্বর দেহ ছাই করে দিচ্ছে, আরও প্রায় দশটা মৃতদেহ সংকারের প্রতীক্ষায় রাখা হয়েছে। আমাদের অনাবিল আনন্দের মাঝে এ দৃশ্য বড়ই বেমানান ঠেকছিল। এরপর দশাঙ্কমেঘ ঘাট। অসংখ্য স্নানযাত্রীর ভিড়। তিলকসাধু কাটা কত সন্ন্যাসী, কত যে নির্বোধ ধর্মপিপাসু লোককে ঠকিয়ে যাঁয়, তার একটা অনুমান মিলে এখানে। সেদিনকার কর্মসূচী আনন্দের মধ্য দিয়েই সমাধা হলো।

পরের দিনের তালিকায় আমাদের ছিল বারাণসী সহর ভ্রমণ। শরীর বিশেষ সুস্থ না থাকায় আমি সেদিন কর্মসূচীতে যোগ দিতে পারি নি। তবে সেদিনই ছপুরে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে Statistical Congress এ যোগ দেওয়ার কথা ছিল এবং সময় মত আমিও এই অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিয়েছিলাম। সেইদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন অস্ত্রে প্রতিষ্ঠাতা মালব্যজীর প্রতি আন্তরিক প্রণাম জ্ঞাপন করে বিদায় নিলাম।

পরদিনও আমাদের সহর ভ্রমণের পালা এবং সেই আমাদের ভ্রমণের শেষ দিন! দর্শনীয় স্থানের মধ্যে আমরা সেদিন কলীর যুগ পূজ্য দেবতা বিষ্ণুস্বরের মন্দির দর্শন করেছিলাম। বিভিন্ন দেব-দেবীর শিলা মূর্তি আর যুগ যুগান্তর হতে তীর্থ-

যাত্রী ধর্ম পিপাসুদের নিকট হতে পুষ্পাজলি পেয়ে এসেছে তাদের দেখে আমি যত বড় নাস্তিকই হই না কেন, অন্তত সেদিনের জন্ত মনে হয়েছিল হিন্দুর দেবতা আছে, সে জাগ্রত, শাস্ত ও অনাদি।

বিশ্বনাথের গলিতে কিছুক্ষণ চললো আমাদের marketing। বাজার করলেন আমাদের সব ছাত্রীরা সব চাইতে বেশী, সাড়ীর দোকানে তাঁরাই হয়তো সেইদিন একটা অবাক রকমের বিক্রি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বনাথের গলিতে ষাঁড় আর বিধবার ভীড় আমাদের বেশীক্ষণ সেখানে থাকতে দেয় নি।

মধ্যাহ্নে আমরা নিমজ্জিত হয়েছিলাম কাণ্ডেন চৌধুরীর বাড়ীতে। ইনি বিশ্বভারতীর একজন সদস্য, তাই আমাদের এই সৌভাগ্য। বলা বাহুল্য সেদিনকার ভূরি ভোজনের কথা আমাদের চিরদিন মনে থাকবে।

পরের দিন পাট উঠিয়ে, বৈকাল ৩ টার ট্রেনে আমরা যাত্রা করলাম শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে বিগত দিন কয়টির আনন্দ-স্মৃতির পূর্ণতা রইলো অন্তরে।

অতি অল্প দিনের এই ভ্রমণ থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি, সেটা আমার নিকট অনাগত দিনের একটা বড় সঞ্চয়। শান্তিনিকেতন আশ্রমের বাইরে কোথাও এরূপ ভাবে শিক্ষার সুযোগ মিলতো কি না আমি জানিনা, কিন্তু যা পেয়েছি তা অতুলনীয়।



ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ

শ্রীউষা মিত্র

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে অগণিত ছোট গল্প চোখে পড়ে। এই সব গল্পের লেখক ও অনেক; কিন্তু পঞ্চাশ, ষাট, বছর আগে এমন ছিল না; তখন মাতৃভাষার নবরূপ গঠিত হ'তে শুরু হ'য়ে গেছে, সম্পূর্ণতা লাভ করেনি।

অত্যাশ্রয় শাখা অপেক্ষা ছোট গল্পের শাখাতেই দৈন্ত ছিল অধিক। বিদেশী ফুলের গুচ্ছের মত অনুবাদ করা গল্প ভাষা-জননীর সাজিখানির অংশ কেহ কেহ সাজিয়ে দিতেন। সে সকল গল্প আপন বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ ক'রে দিত আমাদের অন্তর; বিদেশী বন্ধুদের আমরা শ্রদ্ধা ক'রেছি, বিস্মিত হ'য়েছি তাঁর অপকল্প অবদানে, কিন্তু তাকে বসাতে পারিনি এক আসনে, একাত্মের দাবী করতে পাইনি তার পরে। আর একদিকে মার অঙ্গনে মাটির প্রদীপের মত জোনাকীর পাঁতির মত, ক্ষীণ আলোক দান ক'রতো তখন রূপকথার শ্রেণীর গল্প, তাতে মাধুর্য ছিল, কিন্তু জ্যোতি ছিল না।

এমনি দিনে হ'লো রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। যেন তাঁর অঙ্গুলী ইঙ্গিতে অন্ধকারের আবরণী ধীরে ধীরে অপসারিত হ'য়ে যেতে লাগলো, আর সেই অবকাশ-পথে প্রকাশিত হ'তে লাগলো নিত্য নবরূপ, যা সত্যের সঙ্গে কল্পনায় মিলিয়ে আগতের সঙ্গে অনাগতের সংযোগ রেখে অতীতকেও জীবন্ত ক'রে ছন্দ রেখে জাগ্রত অনুভূতি নিয়ে দাঁড়াল বিশ্বের মাঝখানে। ছোট ছোট ফুলে বহু বিচিত্ররূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে অপকল্প এক-খানি বৈজয়ন্তী মালা বঙ্গভারতীর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন 'কবিগুরু' নিজে হাতে গুঁথে। বাঙ্গলা দেশের হৃদয় হতে ভাষা-জননীকে পরিপূর্ণরূপে বৈভব-সম্পন্ন করে যিনি রূপায়িত করেছেন, আজ সেই অমর পূজকের নাম করতে গর্বের বেদনায় হৃদয় পরিপ্লুত হ'য়ে যায়। শ্রেষ্ঠ মানুষকে আমরা বলি 'স্বার্থকনামা' কিন্তু নামকে এমন করে স্বার্থক বোধ হয় আর কোন যুগে কোন সাধক কখন ও করতে পারেননি। উর্দু আকাশ হতে রবিকর যেমন ছড়িয়ে পড়ে, দিকে, দিগন্তে, জলে স্থলে; প্রত্যেক অণুগেগুতে, তেমনি ছড়িয়ে প'ড়েছে তাঁর সোণার আলো।

রবীন্দ্রনাথের রশ্মি-প্রবাহে আলোকিত হয়ে গেছে প্রাচী হতে প্রাচী নিখিল ভুবন। তাঁর ছোট গল্পের মধ্যেও আমরা ঐ এক অপরায়েয় শক্তি অব্যাহত রূপে উপলব্ধি করি।

তুচ্ছ হ'তে বৃহৎ প্রত্যেকটির পরে ছিল তাঁর সমান অনুভূতি। যে অনুভূতি দিয়ে এই ধরিত্রীর অতি সামান্যকেও তিনি অনুভব করেছেন, সেই সত্যকার উপলব্ধি আর কারো কাছে কোথাও এমন দেখেছি বলে মনে হয় না।

তাই আমরা দেখতে পাই, চঞ্চল, গ্রাম্য মেয়ে মুগ্ধরীকে তাঁর তুলিতে অপকল্প রূপে ফুটে উঠতে।

দ্রুন্ত ছেলে 'ফটিকে'র সামান্য জীবনের একটি অধ্যায় তাঁর কল্প-লোকে স্নেহভরা হৃদয়ের স্পর্শে চিরদিন অক্ষয় হ'য়ে রইলো নিখিল জনের মর্মে মর্মে। কবিতার মধ্য দিয়ে যেমন তিনি অতি তুচ্ছ তৃণকেও হেলা করেন নি, তৃণের উপরের শিশিরবিন্দুটিও স্নেহ পেয়েছে তাঁর কাছে চিরদিন।

আবার অতি বৃহৎ বৃহত্তমকেও রূপ দিতে কার্পণ্য করেননি কোনখানে। ছোট গল্পগুলির মধ্য দিয়েও তাঁর সেই সৃজনশীল সমদর্শী চিত্তের পরিচয় হয় ছত্রে ছত্রে। তাঁর কাব্য, উপহাস, ছোটগল্প এবং তাঁর নিজের জীবন, মনে হয় সমস্তই যেন এক সুরের বাঁধা একখানি বীণা; তাই তাঁর রচনার প্রত্যেক দিকে যে সুর বেজেছে, সবই সে এক শাস্বত ধ্বনী। পদ্মার কোলে নোকায় বসে রচিত হয়েছে তাঁর অনেক ছোট গল্প। সেখানে বাহিরে তিনি ছিলেন দ্রষ্টা; কিন্তু তাঁর ভিতরকার দ্রষ্টা মানুষটী অবিরাম পরিভ্রমণ করতো বাংলার অঙ্গনে। নিত্যকার চোখে দেখা অতি সাধারণ অনিত্য হ'তে তাঁর শিল্পীমন কখন যে খুঁজে নিত সত্যসুন্দরকে, কতরূপে প্রকাশ হ'তো কত অপরূপ-রূপ, হয়ত তিনি নিজেও তাঁর হিসাব রাখেন নি কোনদিন পরশ মণির স্পর্শে কত কি যে কোথায় সোঁপা হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়লো।

সূর্য্যের আলোয় পদ্ম যেমন আপনা হ'তেই শতদল মেলে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, তেমনি তাঁর আলোয় বিকাশ লাভ

তঁার ছোট গল্পগুলির দল। চারিদিক হ'তে বেঁঠন করে বিকশিত হ'য়ে সম্পূর্ণ ক'রে তুলেছে 'লীলা শতদল'।

'ক্ষুধিত পাষণে'র বিরাট শূণ্যতাকে তিনি পূর্ণ ক'রে প্রাণময় ক'রে দিয়েছেন। তঁার কল্প-লোকের বিচিত্র আলোক-পাতে। আবার সে রঙ্গিন স্বপ্ন কখন টুটে যায়, কাণে আসে কার কণ্ঠস্বর? তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুট'। মনে হয় সমস্ত জগৎ চরাচরে এ যেন বিদ্রোহ করে বলতে চায়, "তফাৎ যাও!" অন্তরে তার আসন পাতে চায় অবিনশ্বর সত্যসুন্দরের উদ্দেশে।

'কাবুলী ওলায়' তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ছটা 'অসম বয়সী, অসম ধর্মী' মানুষের অন্তরের অপার্থিব যোগ। আবার এই কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে আমরা দেখতে পাই এক করুণ বিরহী পিতা ও এক সহানুভূতি-ভরা সত্যকার মানবকতায় পূর্ণ পিতার সকল ব্যবধানের অতীত হৃদয়ে যোগ। সাধারণত আমরা চোখে দেখি বিশ্বের একরূপ, বিশ্বকবি সেই বিশ্বকেই দেখার অতীতরূপে দেখেছেন, দেখিয়েছেন তঁার অন্তরের দিব্য-দৃষ্টি সম্পাতে। তাই সীমাবদ্ধ ছোট গল্পের মধ্যে দিয়েও তিনি পরিস্ফুট করে তুলেছেন অসীমের ইঙ্গিত।

কর্তব্যপরায়ণা, আচারনিষ্ঠা, জয়কালী দেবী স্নেহ থাকে জরুর করতে পারেনি কোনখানে তঁারই মধ্যে জেগে ওঠে এক শাস্ত মাতৃমূর্তি অম্পুষ্ট বিভাঙিত শিশুও আশ্রয় পায় তঁার দেবালয়ের অঙ্গনে, মাথারী কুঞ্জের অন্তরালে। "সাক্ষী"গলে তিনি সৃষ্টি করেছেন, রামকানাইকে এমন একটি চরিত্র দিয়ে সে দৃঢ়, অথচ শান্ত ভাবে দাঁড়িয়েছিল অজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, নিজ সন্তানের স্বার্থ যার কাছে তুচ্ছ, সত্য যার সহজাত ধর্ম, কোন অত্যাচারে সে বিচলিত হবার নয়। যদিও তার সত্য কোন মূল্য পেলে না কোন দিক হ'তে, অপ্রত্যাশী চিন্তে কোন আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। সে পরম ধার্মিক, এক বঞ্চিত বিশ্বাসঘাতকের কাছ হতে পেলে প্রতারণার অপবাদ, সংসার পরিত্যক্ত রামকানাইকে বেছে নিতে হ'লো বিশ্বেশ্বরের পায়ে বিশ্রাম। মেঘ ও রোদ্রে তিনি একটা সত্যকার দীপ্তিমান পুরুষ ও একটি সত্যকার পরিপূর্ণ নারীর সৃজন করেছেন, শশীভূষণের চরিত্রের অব্যাহত পৌরুষ সকল অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, প্রদীপ্ত সাহসে আত্মোৎসর্গ করে। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, উভয় পক্ষের হাত হ'তে সে শুধু পেয়েছে নিম্নম আঘাত। সবার শেষে এলো তার পূজা গিরিবালায় কাছ হ'তে। সকাল বেলায় ষ্ঠেপদ্মের মত অপরিপক্ব গুচি, শুদ্ধ, ত্যাগে রিক্ত বেদনায় সিক্ত সেই নারীর নীরব নিবেদন একটি প্রগতি, গুরু দক্ষিণ।

তঁার অতি আধুনিক গল্প বদনামের ভিতর দিয়ে আমরা

পাই তিনটি চরিত্রের পরিচয়, যার প্রত্যেকটি নিজ নিজ ক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্যে অপ্রকাশ।

সকলের চেয়ে প্রাণশক্তি পূর্ণ এই কাহিনীতে সৌদামিনী চরিত্র। কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে, কত প্রতিকূল অবস্থায় তাকে অগ্রসর হয়ে চলতে হ'য়েছে; অথচ কোন কলুষ তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। তঁার শেষ ছোট গল্প "প্রগতি সংহারে" সুরীতির চরিত্রে সমস্ত আধুনিকতার আবরণ-ভেদ করে জেগে ওঠে এক অনাদি কালের সুসংঘতা তপস্বিনী। দেওয়ার আগ্রহে যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে গেলো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, কিন্তু পায়নি কোনও প্রতিদান। না পাওয়ার ক্ষোভ কোনখানে তার বিকৃতি আনলে না। কবিগুরু জান্তেন মেরেদের স্বরূপ কি, কোনখানে তার বিকাশ হয় কি ভাবে, পাত্রাপাত্র বিচার করবার ক্ষমতা তার হারিয়ে গেলেও, সেই চিরন্তনী আপন ঐশ্বৰ্য্যে পরিপূর্ণা, দাক্ষিণ্যে সে দেয় আপনাকে উজাড় করে। সেই অপরাধিতাকে কবিগুরু চিন্তেন, তাই সমতায় সমবেবনায় তাকে তিনি বার বার প্রকাশিত ক'রে অভিনন্দিত ক'রেছেন। যে সব কাপুরুষ নিলজ্জ ক্ষুধায় উচ্ছ্বল বিলাসে শুধু লুণ্ঠন কর্তে শিখেছে, এতটুকু দেবার শক্তি নেই, নিজেদের ও সমস্ত সমাজের সর্বনাশ করছে, তাদেরও তিনি পরিচিত করে দিয়েছেন তঁার তর্জনী ইঙ্গিতে।

কবিগুরু একদা বলেছেন।

"আশি বছর বয়স হবে ঐ যে পিপুল গাছ

এ আশ্বিনের রোদুরে ওর দেখলে পিপুল নাচ

পাতায় পাতায় আবোল তাবোল শাখায় দোলাহুলি

পাগল হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাহুলি"

তিনি নিজেই ছিলেন ঐ পিপুল গাছের মত বিপুল প্রাণ; আশি বছর বয়স তঁারও হ'য়েছিল। তবু প্রতি নিমেষের ঘটনার স্রোতে সুর মিলিয়ে এগিয়ে যাবার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেন নি। তঁার ছোট গল্পগুলির ভিতর দিয়েও তিনি সেই চির নবীনতাকেই প্রকাশ ক'রেছেন। অথচ তার মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন সর্বস্থানে "অনন্তকাল যাহা বাজে, বিশ্বচরাচরের মর্ম্মমারো" সেই বাণীরই সন্ধান গুরুদেব আমাদের জানিয়েছেন প্রতি মুহূর্তে তঁার ছোট গল্পের ছোট বড় বহু চরিত্রের অপূর্ণ বিকাশের লীলায়। একদিন জনবিরল পথে প্রতিভার প্রদীপখানি হাতে নিয়ে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল, সহস্র লোকের ভিড়ের ভিতরেও তিনি সকলের উর্দে থেকে, উচ্চ থেকে জ্যোতির্দান করেছেন জ্যোতির দেবতা। আজ আর পার্থিব শক্তি নিয়ে তঁার সামিধ্য লাভ কর্তে পারবো না আমরা কিন্তু আপন সৃষ্টি ধারায় তিনি আপনাকে ব্যপ্ত ক'রে গেছেন দিকে দিকে। দীপ্তরূপে তিনি থাকবেন তার মধ্যে-অবিনশ্বর হ'য়ে—নিত্য মিলনে সীমার মধ্যে ভ্রমার যোগে।

হাজারীবাগের চিঠি

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীকান্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত

শহরের দক্ষিণ-প্রান্তে উপরি-উক্ত নালার তীরে হিন্দুর মুর্দাখানা অর্থাৎ শ্মশানভূমি, এবং শ্মশানের উত্তরাংশে মুসলমানের গোরস্থান। গোরস্থানের সন্নিকটে ইক্ষুগুড়ের কারখানা। দীঘি, পুষ্করিণী, বিল, হ্রদ ও নালায় জলজীবীর মেলা না থাকিলেও একেবারে 'অসম্ভাব' নাই। হ্রদ ও দীঘি প্রায়ই 'সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত'; নালা ও বিলের পুঁটী-কাঁকড়া মৎস্যজীবীর গ্রাসাচ্ছাদনের ও নাগরিকগণের জীয়েল-আমিষ-সরবরাহের একমাত্র অবলম্বন। সময় সময় সুরেশবাবু ও যতীনবাবু নামক দুইজন ব্রাহ্মণ বড় মাছের চালান আনাইয়া শহরবাসীর আহ্বারের আমিষোপকরণ জোগাইয়া থাকেন। মালারটুলী নামক এক মহলায়ও ক্ষুদ্র মাছ বিক্রয় হয়। মেছো ও মেছুনীরা মাঝে মাঝে গৃহস্থের বাড়ীতে এইরূপ মৎস্যের পসরা লইয়া আসে। মাংস হুস্ত্রাপ্য না হইলেও স্থলভ নহে। মাংসের জন্ত ছোট ছোট পাখীও কিনিতে পাওয়া যায়। এই পাখা ধরিবার কৌশল অতি আশ্চর্যজনক। ছোট গাছপালা দিয়া একটি কৃত্রিম ঝোপ তৈয়ার করিয়া ব্যাধ-তাহার পশ্চাতে নিজেকে গোপন করিয়া রাখে এবং একটি স্থল নলের মাথায় আঁচী মাথাইয়া উহার সঙ্গে একটি পক্ষী মাঠের মাঝে রাখিয়া দেয়। বহু পাখী পালিত পাখীর কাছে আসিবামাত্র নলটিকে ঘুরাইয়া উহার মাথার আটার আটকাইয়া পাখীটিকে ধরা হয়।

শহরের পূর্বাংশে উন্মুক্ত ময়দানে কসাইখানা। এইখানে গৃহজাতীয় সাদা একপ্রকার বড় পাখী দলে-দলে বিচরণ করে। স্থানীয় লোক উহাকে গুঁধু বলে। স্থানীয় গরুগুলি আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, দুধও দেয় কম, কাজেই অনেকগুলি গরু না পোষিলে প্রয়োজনানুরূপ দুগ্ধাদি পাওয়া হুস্কর। দরিদ্র গৃহস্থের গৃহে রাইসরিবার স্বর্ণাভ খাঁটি তৈল প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। মাছ ও তরিতরকারী শীতকালে অপেক্ষাকৃত স্থলভ ও সস্তা, অত্যাশ্রয় স্বভূতে উহা স্থলভ। তরকারীর মধ্যে মূলা, কপী, সিম, লাউ, আলু প্রভৃতি বাবতীয় দ্রব্য অস্বাভাবিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কুমড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়; উহা আকারে যেমন বৃহৎ, আঁশ্বাদে তেমনই মিষ্ট। স্থানীয় চাউল সাধারণতঃ মোটা ও কাঁকর-মিশ্রিত। প্রধান

শস্যাদির মধ্যে চাল, দাল, সরিষা বেশি উৎপন্ন হয়। আখের ও তরিতরকারীর চাষও মন্দ নহে। রোয়া ধানের ক্ষেতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চতুর্দিকে আলবিশিষ্ট, ক্রমশঃ নিম্নপথে বিস্তৃত—দূর হইতে উহার সমষ্টি একখানি বিস্তীর্ণ সোপান-পথের স্তায় দৃষ্ট হয়। শহর-সীমার মধ্যে যথাতথ্য ইকুলিপটাস্-গাছ বর্তমান; এই গাছ ও মস্তণ শ্বেতাভ; উহার পাতাগুলি আকৃতিতে তেজপাতার স্তায় কিন্তু সরু; এই পাতা হইতেই ইকুলিপটাস্ অয়েল তৈয়ার করা হয়। এদেশে পাটের চাষ মোটেই নাই। একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছের দ্বারা এবং গাছের ছাল ছেঁচিয়া দড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করা হয়। অনেক গৃহের ছাদ খোলার, কড়ি-বড়গা পার্বত্য কাঠের ও বাঁশের, দেওয়াল মাটির কিংবা চূণ বা সিমেন্টের তলে মাটির আন্তরবিশিষ্ট ইষ্টকের। শহরে পাকা ও অগৃহবিধ রম্য গৃহের সংখ্যাও অল্প নহে, তবে অধিকাংশ গৃহই একতল। বাঁশ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় গৃহনির্মাণ-কার্যে উহার অভাব হয় না এবং বাঁশের ঝুড়ি, সাজি, চাটাই ইত্যাদি সস্তা দরে পাওয়া যায়। আম, জাম, কাঁঠাল, বেল, পেয়ারা, প্রভৃতি ফলের চাষ যথেষ্ট আছে, কিন্তু মাটির দোষে উৎকৃষ্ট ফল জন্মে না। সুপারি ও নারিকেল গাছ স্বভাবতঃ এখানে জন্মে না; নারিকেল তাই হুস্ত্রাপ্য। খেজুর ও তাল গাছের অভাব নাই; খেজুর-পাতার একপ্রকার স্থলর চাটাই পাওয়া যায়, উহার দরও বেশি নহে। তাল ও খেজুর রস প্রধানতঃ তাড়ির জন্ত ব্যবহৃত হয়। পাশীরা প্রত্যহ ভোরে খেজুর রস লইয়া তাড়ির আড্ডায় ছুটে। বহু গৃহে পুরুষ-স্ত্রী-নির্বিশেষে তাড়ি বা দেশী মদ্য পানের নিয়ম আছে। নিয়ন্ত্রণের লোকেরা জীপুরুষে মিলিয়া হুকাই ধূমপান ও 'মাদক' নামক একপ্রকার নেশা পান করিয়া থাকে।

এদেশে পথেঘাটে হাটবাজারে স্ত্রীলোকের প্রভাব সামান্য নহে। মাছ, তেল, লকড়ি, তরিতরকারী, হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতির বিক্রেতা ও ফেরীওয়ালা অধিকাংশ স্ত্রীলোক। স্থানীয় হাট মঙ্গল, বৃহস্পতি, ও শনিবারে, এবং বাজার রবিবারে দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিলে। হাটে পূর্বোক্ত 'গিলেপ'-বস্ত্র ও উহা দ্বারা প্রস্তুত কাঁচুলি যথেষ্ট পাওয়া যায়। 'গিলেপ'-

কাপড় জামা, গায়ের কাপড়, তোষক, লেপ, বালিশ, মাথার পরিধেয় বস্ত্রের জন্ত ব্যবহৃত হয়। উহা স্থানীয় খাঁটি স্বদেশী খন্দর। চেয়ার, তক্তপোষ প্রভৃতি কাঠের দ্রব্য, মোটর-টায়ারের তলায়ুক্ত ক্যানভাসের জুতা, তুলার জামা, ছাঁচে ঢালাই মিশ্রধাতু-নির্মিত হাতা, সের, ইত্যাদি, এদেশে স্থলভে প্রস্তুত হইতে পারে। দর্জির মজুরী যথেষ্ট কম।

রন্ধনকার্যে প্রধানতঃ লকড়ির প্রচলন অধিক। উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁটি পয়সা-পয়সা দরে এবং ‘সগর’-নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র গাড়ী বোঝাই বড় জালানি কাঠ ১২—১৫ মূল্যে বিক্রয় হয়। পার্শ্বত্যা পথে মালবহনের জন্ত এইপ্রকার ‘সগর’-গাড়ী প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। গাড়ীগুলি দেড় ফিটের বেশি উচ্চ নহে এবং উহার চাকা যাতার ঠায় নিচ্ছিন্ন কাঠে নির্মিত। যেমন গাড়ী তাহার বাহক গরুও তেমনি ‘বালখিল্য’ ধরণের গরু ও মহিষের বড় গাড়ীও যে এখানে নাই তাহা নহে। লোকের যাতায়াতের জন্ত পুস্পুস্ ও রিক্সা নামক গাড়ীরই প্রচলন বেশি। পুস্পুস্ পাকীর ঠায় দ্বিচক্রবিশিষ্ট যান।

শাস্ত্যের পক্ষে ইংরেজী নবেম্বর হইতে জুন মাস ভাল; তন্মধ্যে শীতকাল উৎকৃষ্ট। বর্ষাঋতুতে প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টি হয়; তখন যেমন নানাবিধ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় তেমনি সাপের অবাধ গতিবিধিও চলে। এখানে শীতের বিশেষত্ব এই যে, যতই তীব্র হউক না, তাহা শুধুমাত্র গায়ের চামড়ার উপরেই প্রভাব বিস্তার করে। এইরূপ শীতে অগ্রহায়ণমাসে একবিন্দুও শিশিরপাত হয় না, অথচ মাঘমাসে ভুষারও পড়িয়া থাকে।

এদেশে বাঘের উৎপাত যথেষ্ট। নেকড়ে বাঘ ও বন্যশূকর রাত্রিযোগে ‘সফরে’ বাহির হইয়া প্রায়ই অসতর্ক গৃহস্থের অনিষ্ট সম্পাদন করে। বন্য বা নির্জন্ম পথে কাজেই রাত্রিযোগে লোক-চলাচল একরূপ বন্ধ থাকে।

বসতি-গৃহগুলি ফাঁকাহানে ও পরস্পর ব্যবধানে নির্মিত হওয়ায় উহার সংখ্যানুপাতে শহরের প্রসার যথেষ্ট। প্রত্যেক বাড়ীরই হাতায় কিছু না কিছু খোলা জমি আছে।

শহরের কয়েক মাইল উত্তরে হাজারীবাগ-রোডের গায়ে একটি পর্বত আছে। উহার চূড়ায় একটি চৌকী মন্দির দৃষ্ট হয়। পর্বতটী চৌকীমন্দিরের নামানুসারে ‘টাওয়ার-হিল’ বলিয়া পরিচিত। এক সময়ে উহার উপরে শত্রুপক্ষের গতিবিধিলক্ষের একটি প্রধান খাঁটি ছিল।

শহরটী অখনি, বেডমবাজার, বড়বাজার, রাজ-বাংলা, নবাবগঞ্জ প্রমুখ কয়েকটি মহলায় বিভক্ত। উহার এক-এক অংশ পুনরায় অধিবাসীদিগের ব্যবসায়-অল্পসারে ভূঁইয়াটুলী, কুমারটুলী, মালারটুলী, মেথরটুলী ইত্যাদি বহুপাড়ায় বিভক্ত। বোডমবাজার-মহলাটী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। হাট-বাজার, ছোট ডাকঘর, এই মহলায়ই অবস্থিত। বড়বাজার প্রধানতঃ ব্যবসায়-কেন্দ্র; মাড়োয়ারীর সংখ্যা এইখানেই বেশি। কোনও এক অজ্ঞাত পাঠান নবাবের রাজকীয় উপাধি-অল্পসারে নবাবগঞ্জ-মহলার নামকরণ হইয়াছে। এই নবাবের বাড়ী বলিয়া যে স্থান নির্দিষ্ট হয়, সেখানে একটি জঙ্গলাকীর্ণ ছোট প্রাচীর-বেষ্টিত মসজিদ ব্যতীত বাড়ীঘরের অল্প কোনও চিহ্ন অধুনা দৃষ্ট হয় না। রামগড়ের রাজার বাংলা অর্থাৎ কাছারি-ঘরের মর্যাদায় রাজ-বাংলা পরিচিত। রামগড় হাজারী-বাগের ২৮ মাইল দূরবর্তী এক জনপদ। এই স্থানের রাজা ঘাটালের রাজা বলিয়া বিখ্যাত। প্রবাদ, বর্গীদের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার্থ ঘাট আগলাইয়া থাকিতেন বলিয়া ইহার এই নাম। স্থানীয় এবং পার্শ্বত্যা বনভূমির অনেকাংশ ইহার অধিকার ভুক্ত। এই রাজার অধিকারে ত্রিকোণাকার একটি স্থানে ছিন্নমস্তার ক্ষুদ্র এক মন্দির এবং তদুপস্থিত নদী ও অদূরপ্রদেশস্থ দুইটী বরণা দেখিবার যোগ্য। সীতাবেগ-নামক এক পর্বতেও রামসীতা-সম্বন্ধীয় প্রবাদমূলক চিহ্ন বর্তমান আছে।

শহরের দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে সেন্ট. কলাম্বাস্ কলেজ, পুলিশ ট্রেনিং কলেজ, বড় গির্জা, জিলা স্কুল, মিশন-হাসপাতাল, সদর হাসপাতাল, সেন্ট্রাল জেল ও রিফরমেটরী স্কুলের নাম প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য। সেন্ট্রাল জেল ৫৩ বিঘা জমির উপর সংস্থাপিত; উহার সম্মুখভাগে একটি উচ্চ আলোক-স্তম্ভ আছে; প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ইহার উপর একটি উজ্জ্বল আলো জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। সেই আলো বহুদূর হইতে দেখা যায়। রিফরমেটরী স্কুলটী বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মধ্যে প্রকৃতই দ্রষ্টব্য স্থান; ঐ তিন প্রদেশের মধ্যে এমন স্কুল আর নাই। অনূর্দ্ধ পনেরো বৎসর বয়স্ক যে সকল বালক বিশেষ অপরাধে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া চরিত্র-সংশোধনমূলক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তাহাদিগকে এই স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। স্কুলটী যাহাতে জেলখানা বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে সেইজন্য স্কুলে পুলিশ-প্রহরীর ব্যবস্থা নাই; এমন কি, ঐ কারণেই

অভিযুক্ত বালককে যে পুলিশ নিয়া আসে তাহাকেও সদর দরজা হইতেই বিদায় দেওয়ার নিয়ম। স্কুলে বালকদিগকে নানা-বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ও নানাবিধ শিল্প শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বালকগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া স্কুল-সংলগ্ন বিদ্যাগারে লেখা পড়া এবং শিল্পাগারে হাতে-কলমে লোহার কার্য, দড়ি-বেত-কাঠের কার্য, ছাপার ও দপ্তরীর কার্য, চীনের কার্য, মুচির কার্য, তাঁতের কার্য প্রভৃতি শিক্ষা করে। তৎসঙ্গে বাগানের কার্য, ধোবার কার্য, ব্যাণ্ড-বাদনের কার্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ারও বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক কার্যই দক্ষ শিক্ষক বা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। রোগ-শুশ্রূষার শিক্ষা দেওয়ার জন্ত এবং স্কুল-সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের কার্য-নির্বাহার্থ জরৈক সরকারী ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। বালকগণকে বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথকবর্ণের ইউনিফর্ম পরিতে হয় এবং খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-পরা প্রভৃতি প্রত্যেক কার্যে নিয়মাবলী হইয়া চলিতে হয়। স্কুলের কারখানায় যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা বিক্রয়ের জন্ত পৃথক বন্দোবস্ত আছে। পূর্বে ফরমাস দিলেও প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ারী হইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান বালকগণের আহারের বন্দোবস্ত পৃথক। সাধারণতঃ একবেলা ভাত ও একবেলা রুটি এবং সপ্তাহে তিন দিন (মাছের বদলে) মাংস দেওয়ার বিধি। স্কুলটী ৫২ বিঘা জমির উপর স্থাপিত এবং হাসপাতাল, আপিস প্রভৃতি ব্যতীত চারিটা বৃহৎ মহলে বিভক্ত। ঐ মহলের ছাদে সংলগ্ন অসংখ্য শিকা; স্কুলসংশ্লিষ্ট বাগানে যে কুমড়া জন্মে তাহা ঐ শিকায় ঝুলাইয়া রাখা হয়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সংপ্রতি স্কুলটী জরৈক সাহেব সুপারিন্টেন্ডেন্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডাক্তার ও আপিসের অধিকাংশ কর্মচারী বাঙ্গালী। এই স্থানের ধোবাখানার পশ্চাতে একটা বৃহৎ কুপ আছে; উহার মধ্যে নামিবার জন্ত এক সিঁড়ি এবং কুপের জল তোলার জন্য একটা কল আছে। জেলের অধীন পাম্পটির দ্বারা এখানে জল সরবরাহ হয় বলিয়া এই কুপটী অধুনা অব্যবহার্য হইয়া রহিয়াছে। শুনা যায়, ইহার নির্মাণে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। স্কুলের বালকগণকে বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তাহা সামান্য।

সদর জেলা বলিয়া হাজারীবাগে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, বিভাগীয় অন্তান্ত আপিস, পুলিশ-হাসপাতাল, পশু-

হাসপাতাল, রিজার্ভ লাইন, ডেপুটি কমিশনারের আপিস, সিভিল সার্জেনের আপিস প্রভৃতি আছে। ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতিরও অভাব নাই; এবং শিক্ষার সম্বন্ধে বাঙ্গালী ও বিহারী উভয় শ্রেণীর জন্তই পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত আছে। স্থানীয় স্ত্রী-লোকেরাও কেহ কেহ সামান্য লেখাপড়া জানে। বালকদের উচ্চশিক্ষার জন্ত একটা কলেজ ও দুইটা স্কুল আছে; উহার একটা স্কুল স্থানীয় খৃষ্টান মিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ঐ মিশনের অধীনস্থ মিশন-হাসপাতাল নামক স্ত্রী-হাসপাতালের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মেথরটুলীতে মিশন-পরিচালিত একটা নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ও আছে। শহরে বাঙ্গালী ও বিহারীদের পরিচালিত দুইটা পৃথক ব্যাঙ্ক আছে। বাঙ্গালীদের মিলনভূমি ইউনিয়ন ক্লাব বা কেশব-হল বোডমবাজার-মহলায় সদর হাসপাতালের নিকটে সংস্থাপিত। ক্লাবে পড়ার, খেলিবার, ও বক্তৃতা দিবার দেওয়ার স্থান ও ব্যবস্থা আছে। সাহেবদের ক্লাব সাহেব মহলায় প্রতিষ্ঠিত। ঐ মহলাটী—যেমন এদেশে হইয়া থাকে—সর্ববিষয়েই কলিকাতার চৌরঙ্গী। ক্লাবের দক্ষিণে প্রশস্ত ময়দান; ময়দানের নিকটে বড় ডাকঘর, মিশন-চার্চ ও বড় গির্জা। সদর হাসপাতালে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের আগন্তুক ও বাসিন্দা রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

সরকারী গৃহাদি ব্যতীত বেসরকারী বহু আবাস ও দর্শনযোগ্য। ছোট শহরে এই সকল দ্রষ্টব্য পদার্থ দেখিতে অধিক সময় লাগে না, কিন্তু সৌন্দর্যের ছাপ অন্তরে সহজে বসে বলিয়া উহার রমণীয়ত্ব হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইতে সহজেই হৃদয়ে ব্যথা লাগে। তাই অল্পদিনমাত্র হাজারীবাগ-প্রবাসী হইয়াও স্বজন ও শহর ছাড়িয়া আসিবার সময়ে মেজদাদার গানটী ফিরিয়াঘুরিয়া মনে আসিতেছিল—

বিদায় বিদায় বিদায় বিদায় !

চলিতে চাহে না চরণ-ছুখানি, কাঁপিছে কাঁদিছে বিদরে হৃদয় !

এসেছিল হেথা দুটি-দিন তরে,

চলে যাব পুনঃ দুটি-দিন পরে,

ভুলো না ভুলো না, রাখিও অন্তরে, ভুলো না ভুলো না

ভুলো না আমায় !

দোষ কার

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

কাকের ডাকে, আর গলিতে ময়লা ফেলার
ঘড়ঘড়ানিতে ভোর না হতেই নীলমণির ঘুম ভেঙে গেল।
আলিস্যি ভেঙে একটু এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়ল।
তারপর বিছানা মাত্র সব গুটিয়ে রাখলে! মগে করে
নীচের চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে মুখ ধুলে। ওপরে উঠে
সে কাপড় ছেড়ে গামছা পরে গঙ্গার জলের ঘটি থেকে
জল নিয়ে, ঘরের চৌকাঠে ছিটিয়ে দিলে। এটি তার
নিত্য কর্ম। গত বছরে গ্রামের স্কুল থেকে পাশ করে,
কলকাতা সহরের মামার বাড়ী থেকে কলেজে পড়ছে!
বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। বাবা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন;
অনেক বলে কয়ে মামার বাড়ী থেকে পড়াশুনার ব্যবস্থা
হয়েছে। গ্রামের জেলায় প্রথম হয়ে দশটাকা বৃত্তি পেয়েছে,
তাতে খরচাটা কোন গতিকে চলে যায়। দ্বিতীয় বার্ষিক
শ্রেণীর ছাত্র নীলমণি, বিদ্যাসাগর কলেজে ফ্রি পড়ে।

মামিমা সব কাজ কর্ম সেরে, অনেক রাত্রে শোন।
ছ তিনটি কচি ছেলে নিয়ে, ভাল ঘুমও হয় না, উঠতে
তাই একটু বেলা হয়। নীলমণি তোলা উলুনে ঘুঁটে
পেতে, পিদিমের তেলে ছ একটা কাঠের কুঁচি ভিজিয়ে
জেলে, বাতাস করে করে উলুন ধরালে। চায়ের জল
চড়িয়ে দিয়ে এসে পড়তে বসল। একটু পরে সিঁড়ি
চাতাল সব ধোয়ার শব্দ পাওয়া গেল। মামিমা উঠেছেন,
বাসি পাট সেরে স্নান করতে যাবেন। হাঁক পড়ল,
“নিলে, ...দেখ, সাড়া নেই। বাবা রোজই কি মনে
করে দিতে হবে! ওরে অ নিলে যারে—

—এই যে মামিমা।

—কাপড় ছেড়েচিস ত? যা আগে পূজোর মিষ্টি নিয়ে
আয়। ঠাকুরের নিত্য পূজার নৈবেদ্যের মিষ্টান্ন।
নীলমণি শুধালে।

—কি আনব?

—কাল কি এনেছিলি, শুভে? আজ ছ’ পয়সার
রসমুণ্ডি আনগে।...ওরে দাঁড়া।

তারপর দুটো পয়সা দিয়ে গলা খাটো করে বললেন,
“এক পয়সার বেগুনি আর এক পয়সার আলুর চপ! এক
পয়সায় চারখানা বেগুনি আনবি, বুঝলি! চায়ের জল
ফুটে গেছে, শীগগীর আসবি।

নীলমণি চারটে পয়সা নিয়ে ছ হাতের মুঠোতে
ঝন্ ঝন্ করে বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

চা খেয়ে এসে পড়তে বসল। কাটল খানিকক্ষণ।
আটটা বাজল। আবার মামিমার সাড়া পাওয়া গেল।
“অ নিলে, অ নিলে, কিরে শুনতে পাচ্ছিস নে?”

নীলু জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে। “যা বাজার যা।”
আটটা বেজে গেছে! নীলু গেঞ্জি পরে চটি পায়ে দিয়ে
নেমে গেল। মামিমা একটা সিকি-বের করে দিলেন।

—আলু নিবি আড়াই পো। বেগুণ আধ পো!
আচ্ছা, না হয় একপো নিস। দেখে নিস ভাল করে।
পরশু একটা কানা বেরিয়েছিল।...হ্যাঁরে, আমড়া আসে
না? এক পয়সার আমড়া আনিস। আর মাছ;
ভাগা ইলিশ আনিস।...একটু তেল চেয়ে নিস না!

—ও চাওয়া টাওয়া চলবে না। বাবা, মেছুনীদের-যা
মুখ!

—ওরে শোন শোন, পাতিলেবু আনবি, আর নটে
শাক আধ পয়সার আর দেখ যদি পয়সায় কুলোয় ত
আধপো পটল নিস। “তারপর আর দুটো পয়সা দিয়ে
বললেন, “কুলোবে না হয় তো। পান নিস এক পয়সার।
ভাল দেখে নিস। বড় ঝাল পান আজকালকার।

ঘেমে নেয়ে নীলু বাজার থেকে ফিরল। সাড়ে নটা
বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি ছ ঘটি জল মাখায় ঢেলে,
কাপড় খানা কোন গতিকে নিঙড়ে শুকোতে দিয়ে খেতে
বসল। আবার এগারটায় ক্লাস। মামার দশটায়

আফিস; বেরিয়ে গেছেন। এঁটো পাত তখনও পরিষ্কার করা হয় নি। ভাল মেখে ভাত খাওয়ার আকাঁ বাকা গোল গোল দাগ গুলো শুকিয়ে উঠেছে। দু' একটা মাছি উড়ছে আবার বসছে। তার পাশে মেঝেয় বসে পড়ল নীলু। গেলাস থেকে জল নিয়ে, সামনেটায় আছড়ে নিলে। মামিমা হাঁড়ি থেকে গরম গরম ভাত বেড়ে দিলেন। “ও মা, পিঁড়ে নিয়ে বসলি নো!” ঝাল দেওয়া আছে তেল সিটিয়ে পড়ছে। গরম গরম মুগের দাল ভাত, জিভ পুড়ে যায়, কোন আশ্বাদ পাওয়া যায় না। হুশ হুশ করে খেয়ে, বই খাতা নিয়ে ছুটল নীলু। ক্লাশে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে, ঘামতে ঘামতে পৌঁছল, তখন অর্ধেক ছেলের নাম ডাকা হয়ে গেছে। ভাগ্যিস নীলমণির রোল নম্বর অনেক শেষে তাই রক্ষে।

কলেজ থেকে নীলমণির ফিরতে প্রায় তিনটে, কোন কোনদিন চারটে বাজে। অনেক খানি পথ হাঁটতে হয়, এসে জামা খুলে শুয়ে পড়ে।

মামিমার ছায়া পড়ল দরজার কাছে। “কিরে ঘুমুচ্ছিস?”

“না, কেন?”

—আজ একবার ‘ডাইয়িং ক্লিনিং’ এ যেতে হবে বাবা!

—আচ্ছা।

মিনিট পনের পরে নীলু উঠল। মুখ ধুলে, গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বারান্দায় কাপড় জড় করা ছিল, পাট করে নিয়ে চলল। মামিমা তখন ঠাকুর ঘর মুক্ত করছিলেন, বললেন, “এই যাঃ, ঐ দিককার গুনো ছুলি? ও যে নোংরা, সাজোকে দেবার জন্ত রেখেছি। যাক্ গে, আর কি হবে! এ বেলা ত চান করবি। এই এদিককার গুনো।”...

নীলু শুজিয়ে কাপড় নিয়ে বেরিয়ে একটু পরে ফিরে এল। “দোকান বন্ধ রয়েছে।”

“তবে আর কি হবে, রেখে দে পাট করে।...নীলে, মুড়ি আনতে হবে রে!—চান করে যাবি।

—কাপড় ছালুম যে।

—ওমা তাইত। তা গামছাটা পরে, কাপড়, ছেড়ে, আর একখানা পর। গেঞ্জিটা কেচে দিস খন।

শুকনো গামছা খানা ভিজিয়ে নিয়ে নীলু কাপড় বদলালে।

—দেখি, এদিকে আয়।

মামিমা গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেন। নীলমণি মুড়ি আনতে গেল।

রোদ পড়লে নীলমণি স্নান করে পার্কে একটু বেড়াতে যায়, মামাত ভাইদের মধ্যে যেটি বড় সেটিকে নিয়ে। রাস্তার আলো জ্বললে ফেরে। মামিমা ততক্ষণে চৌকাঠে জল ছিটিয়ে, শাক বাজিয়ে ধুনা দেন। নীলমণি ল্যাম্প জ্বলে মাতুর বিছিয়ে পড়তে বসে। কিছুক্ষণ যায়। নীলু হয়ত অস্থব কষছে। মামিমা এলেন, মেজ খুঁকি কাঁদছে কোলে করে এনেছেন। “নিলে, ভোলা না রে একটু; এফুনি ঘুমিয়ে পড়বে।.....আমার আবার ময়দা মাখা পড়ে রয়েছে। উছনের আঁচ বয়ে যাচ্ছে। যা' দাদার কোলে যা'।”

নীলমণি না উঠে, হাত বাড়িয়ে খুকিকে নিয়ে কোলে শুইয়ে হাঁটু নাড়া দিতে লাগল। অন্ধের বই খাতা খুলে ইংরেজীর বই খুলে, সেই দিকে চোখ রেখে, হাঁটু নাড়তে আর খুকির মাথা চাপড়াতে লাগল। খুকি ঘুমোলে, পাশের ঘরে শুইয়ে মশারী ফেলে দিয়ে আবার বসল।

এবার খাবার ডাক পড়ল। রুটি আর পটলের বোল ভালনা, আর গুড়। জল বসা পটল,—নীলুর বিশ্বাস লাগে। গ্রামে ঘরে গরীব হ'লেও, টাটকা সজীর অভাব হয় না। তাদের নিজের ক্ষেতের আলু, শাক, মুগ কলাই। মা বড় ভাল রাঁধে। এই ত শীত পড়ে আসছে; ওঃ হালদার বাগানের কপি, পালং শাক! কি তার আশ্বাদ! নদীর চরার পটলের তরকারী কত ভাল লাগে! ছুটিতে যখন দেশে গিয়েছিল, মা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ইয়ারে, সেখানে কি খাস? বড় রোগা হয়ে গেছিস। নীলু বলেছিল, “হঃ কলকাতা সহরে খাবার ভাবনা। এ কী তোমার পাড়া গাঁ; পুঁই শাক জোটে ত মূলো জোটে না! খাবার

আবার কষ্ট কি?” এক বছরের ওপর হয়ে গেছে তবু ভাল মন্দ আশ্বাদের অভ্যাসটা তার যায় নি। নীলু চার খানার বেশি রুটি খেতে পারলে না। মামীমা বললেন, “সে কি রে, খা’ আর ছু’খানা। একটু কোল দেব? ছুটে আনু নে।” নীলু মাথা নাড়িলে। বললে, “আমায় বরং একটু গুড় দিন।”

খেয়ে উঠে পড়তে বসল; তখন রাত দশটা। মন লাগল না। যত রাজ্যের ভাবনা এসে জুটল। আর ত মাস চারেক আছে পরীক্ষার ফল তেমন ভাল হবে না। রাত তখন প্রায় এগারটা, নীলু বিছানা পেতে, মশারী খাটিয়ে শুয়ে পড়ল।

এমনি ভাবে পরীক্ষার সময় কাছাকাছি এল। নীলুর ভোরে ওঠা, উঠুন ধরানো, চায়ের জল চড়ান, বাজার যাওয়া, খাবার আনা, মামাতো ভাইবোনেদের এক আধটু দেখা শোনা করা সমানে চলেছে; পরীক্ষার আর দিন চারেক বাকী। ছোট ভাইয়ের অস্থখ করেছে। সন্ধ্যার সময় মামীমা ওষুদ আনতে বললেন; আমার যে তিন দিন বাদে পরীক্ষা; মামা তো বাড়ী রয়েছেন, বলুন না একটু।” মামি মা কিছু না বলে ও ঘরে গেলেন, মামাকে বললেন, “ও-যেতে চাইছে না, বলছে ওর পরীক্ষা।” “হ্যাঁ: পরীক্ষা তো কি হয়েছে। ঘরের ছেলের মত রয়েছে, গেলে কি ওর মান ক্ষয়ে যাবে। আমার ছেলে হলে যেত না?” মামি মা এসে আস্তে আস্তে বললেন, “নীলু বেরিয়ে গেল।

পরীক্ষা শেষ হ’য়ে গেল। তার পরদিন ছ’ একটা জিনিষ তৈরী কেনাকাটা করে, তার ছোট টিনের তোরঙ্গটি গুছিয়ে মূর্টের মাথায় চাপিয়ে ষ্টেশনে যাবার বাস ধরতে যাবে, মামি মাকে যখন নীলমণি প্রণাম করলে, তাঁর চোখ ছুটি ছলছলিয়ে এলো। হাত বাড়িয়ে চুমু খেয়ে বললেন, “আবার আসিস নীলু। মামিকে ভুলে যাবি ত না রে?”.....

নীলু যাত্রা করলে; মামি মা ওপরে এসে প্রতিবেশিনী বধূটিকে বললেন, “এতদিন ছেলেটা ছিল। পড়াশুনা শেষ হল, মার ছেলে মার কাছে গেল। কমদিন ত নয়, ছু’টি বছর। আহা বেঁচে থাক!.....মায়ী পড়ে গেছে। বধূটি বললেন, “আহা তা’ পড়বে বৈ কি! লোকে একটা কুকুর বেড়াল পুষলে মায়ী পড়ে, তা’ এত ভাগনে! পর নয় ত গা!

মাস তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় নীলমণির মামা এসে বললেন, “খবর বেরিয়েছে, নীলে পাশ করেছে।

মামীমা উৎসাহ ভরে বললেন, “পাশ করেছে! বেশ হয়েছে!”

ই্যা. সেকেণ্ড ডিভিশনে।

আহা, সেকেণ্ড ডিভিশন হল। যাক বাপু, তবু পাশ ত করেছে। ফেলই তো বেশি করে। আমাদের ললিত ছু ছবার ফেল করে, তিনবারের বার পাশ করল।

ছুদিন পরে খবর গেল দেশে। নীলমণির বাবা বকলেন খুব, বললেন, “কলকাতায় গিয়ে ঘাড় হ’য়ে হুঁয়ে বেড়িয়েছো তার হবে না তো কি? এখানে আমি ছিলাম, চাপ ছিল তাই হয়েছিল। জলপানি না-ই বা পেলে ফাষ্ট-ডিভিশনটাও হল না তা’ বলে! “নীলু চুপ করে রইল, তার সারা বুকটা ধাক্কা দিয়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল।...

ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে হাতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। বাবা উবু হয়ে বসে কলকেতে হু দিয়ে তামাক খেতে শুরু করলেন। পোষ্ট কার্ডখানা মেঝেতে গড়াগড়ি যেতে লাগল। মা দরজায় কাঁট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, দেয়ালে ঠেঁশ দিয়ে রোয়াকে বসলেন। তাঁর চোখের ঝাপসা দৃষ্টি দূরে নারকেল গাছে আবদ্ধ রইল, সারা বাড়ীটা যেন থমথমিয়ে উঠল।



ফলদীপিকা

[পূর্বানুবর্তি]

শ্রীগণপতি সরকার

কালজবল।

(১) বর্ষপতি (বা অঙ্ক) বল, (২) মাসাধিপতি বল, (৩) দিব্যাধিপতি বল, (৪) দণ্ডপতি (বা হোরা) বল, (৫) পক্ষবল, (৬) দিব্যরাতি (বা নতোন্নত) বল। এই কয়টি লইয়া কালজবল।

বর্ষপতির বল ১৫ কলা ; মাসাধিপতির বল ৩০ ; দিব্যাধিপতির বল ৪৫ ; দণ্ডপতির বল ৬০। অত্র ছটির পূর্ববল ৬০।

১। বর্ষাধিপতিবল :—

“জাতকর্ণব” গ্রন্থে বর্ষাধিপতি নির্ণয় করিবার যে নিয়ম দিয়াছে তাহা সকল নিয়ম অপেক্ষা সহজ হওয়ার তাহা দেখান হইতেছে। যথা :—

শকাব্দার অঙ্কে ৩ দিয়া গুণ করিবে। প্রাপ্ত গুণফলের সহিত ২ যোগ করিবে। ঐ যোগফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিবে। পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, রবি হইতে গণনায় তাহাই বর্ষাধিপতি হইবে, অর্থাৎ ১ অবশিষ্ট থাকিলে রবি, ২ থাকিলে যথা—চন্দ্র, ৩ থাকিলে মঙ্গল ইত্যাদি। উদাহরণ কোষ্ঠিতে ১৮৪১ শকাব্দ।

$1841 \times 3 = 5523 + 2 = 5525 \div 7 = 2$ সুতরাং চন্দ্র বর্ষাধিপতি, এজ্ঞ চন্দ্রের বল ১৫ কলা।

২। মাসাধিপতিবল :—

শকাব্দার অঙ্ক হইতে ১৪৬৪ বিয়োগ করিয়া অবশিষ্টকে ১২ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলে, বৈশাখ হইতে যত সৌরমাস গত হইয়াছে, তাহা যোগ করিবে। উহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলে ৩ যোগ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই রবি হইতে গণনায় মাসাধিপতি, অর্থাৎ ১ থাকিলে রবি, ২ থাকিলে চন্দ্র, ৩ থাকিলে মঙ্গল ইত্যাদি।

(জাতকর্ণব)। যথা—উদাহরণ কোষ্ঠি— $1841 - 1464 = 377 \times 12 = 4524$

বৈশাখ জন্মমাস হওয়ায়, মাস শেষ হয় নাই বলিয়া ১ যোগ হইল না। এজ্ঞ—

$4524 \times 3 = 13572 + 3 = 13575 \div 7 = 2$ সুতরাং চন্দ্র মাসাধিপতি। চন্দ্রের বল ৩০ কলা।

৩। দিব্যাধিপতি বল :—

যে গ্রহের বারে জন্ম হয়, সেই গ্রহই দিব্যাধিপতি হয়।

উদাহরণ কোষ্ঠিতে জন্মদিন বুধবার বলিয়া বুধ দিব্যাধিপতি হইল এবং বুধের বল ৪৫ কলা হইল।

৪। দণ্ডপতি (বা হোরা বা কালহোরাধিপতি) বল :—

অহোরাত্র ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টা।

৬০ দণ্ডকে ২৪ ভাগ করিলে প্রতিভাগ ২৥ দণ্ড অথবা ২৪ ঘণ্টাকে ২৪ ভাগ করিলে প্রতিভাগ ১ ঘণ্টা। এই ২৪ ভাগের অর্দ্ধেক দিব্যভাগ ও অর্দ্ধেক রাত্রিভাগ। এই প্রতিভাগের এক একটি গ্রহ অধিপতি হয়। সুতরাং দিব্যভাগের

১২টি এবং রাত্রি ভাগের ১২টি অধিপতি। প্রত্যেক দিনেই অধিপতির ভিন্ন ভিন্ন হয়। সহজ বোধার্থে নিম্নে প্রতিভাগের প্রতিদিনের ও প্রতিরাত্রের অধিপতির চক্র দেওয়া হইতেছে :—

দণ্ডপতি নির্ণয় চক্র

	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
১।	র	চ	ম	বু	বু	শু	শ
২।	শু	শ	র	চ	ম	বু	বু
৩।	বু	বু	শু	শ	র	চ	ম
৪।	চ	ম	বু	বু	শু	শ	র
৫।	শ	র	চ	ম	বু	বু	শু
৬।	বু	শু	শ	র	চ	ম	বু
৭।	ম	বু	বু	শু	শ	র	চ
৮।	র	চ	ম	বু	বু	শু	শ
৯।	শু	শ	র	চ	ম	বু	বু
১০।	বু	বু	শু	শ	র	চ	ম
১১।	চ	ম	বু	বু	শু	শ	র
১২।	শ	র	চ	ম	বু	বু	শু
১৩।	বু	শু	শ	র	চ	ম	বু
১৪।	ম	বু	বু	শু	শ	র	চ
১৫।	র	চ	ম	বু	বু	শু	শ
১৬।	শু	শ	র	চ	ম	বু	বু
১৭।	বু	বু	শু	শ	র	চ	ম
১৮।	চ	ম	বু	বু	শু	শ	র
১৯।	শ	র	চ	ম	বু	বু	শু
২০।	বু	শু	শ	র	চ	ম	বু
২১।	ম	বু	বু	শু	শ	র	চ
২২।	র	চ	ম	বু	বু	শু	শ
২৩।	শু	শ	র	চ	ম	বু	বু
২৪।	বু	বু	শু	শ	র	চ	ম

উদাহরণ কোষ্ঠিতে জাত দণ্ডাদি ২৭।১৫।৫২।৩০ ; দিবামান দণ্ডাদি ৩১।৫৪।১০ ; এই দিবামানকে ১২ ভাগ করিলে দণ্ডাদি ২।৩৯।৩০।৫০ হয়। সুতরাং ১১ ভাগে জন্ম। বুধবারে দিবসে জন্ম হওয়ায় বুধবারের কোটায় ১১ সংখ্যায় বৃহস্পতি থাকায়, ঐ বৃহস্পতিই দণ্ডপতি বা কালহোয়াধিপতি এবং ৬০ কলা বল।

৫। পক্ষ বল :—

শুভ গ্রহ (চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র) শুক্রপক্ষে বলবান্। পাপগ্রহ (রবি, মঙ্গল ও শনি) কৃষ্ণপক্ষে বলবান্।

শুক্রপক্ষের প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন ৪ কলা করিয়া শুভগ্রহের বল বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণিমাতে সম্পূর্ণ ৬০ কলা বল হয়। আবার কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে শুভগ্রহের বল ৪ কলা করিয়া হ্রাস হইয়া অমাবস্যাতে শূন্য বল হয়। ঐরূপ পাপগ্রহের বল কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে ৪ কলা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া অমাবস্যাতে ৬০ কলা বল হয় ; আবার শুক্রপক্ষের প্রতিপদ হইতে ৪ কলা করিয়া হ্রাস হইয়া পূর্ণিমায় শূন্য বল হয়। সহজ বোধার্থে নিম্নের চক্র দ্রষ্টব্য :—

পক্ষবল নির্ণয় চক্র

তিথি	সংখ্যা	শুভগ্রহ পক্ষে কলা বৃদ্ধি ও হ্রাস	পাপ গ্রহ পক্ষে কলা হ্রাস ও বৃদ্ধি
শুক্র প্রতিপদ	১	৪	৫৬
„ দ্বিতীয়া	২	৮	৫২
„ তৃতীয়া	৩	১২	৪৮
„ চতুর্থী	৪	১৬	৪৪
„ পঞ্চমী	৫	২০	৪০
„ ষষ্ঠী	৬	২৪	৩৬
„ সপ্তমী	৭	২৮	৩২
„ অষ্টমী	৮	৩২	২৮
„ নবমী	৯	৩৬	২৪
„ দশমী	১০	৪০	২০
„ একাদশী	১১	৪৪	১৬
„ দ্বাদশী	১২	৪৮	১২
„ ত্রয়োদশী	১৩	৫২	৮
„ চতুর্দশী	১৪	৫৬	৪
„ পূর্ণিমা	১৫	৬০	০
কৃষ্ণা প্রতিপদ	১৬	৫৬	৪
„ দ্বিতীয়া	১৭	৫২	৮
„ তৃতীয়া	১৮	৪৮	১২
„ চতুর্থী	১৯	৪৪	১৬
„ পঞ্চমী	২০	৪০	২০
„ ষষ্ঠী	২১	৩৬	২৪
„ সপ্তমী	২২	৩২	২৮
„ অষ্টমী	২৩	২৮	৩২
„ নবমী	২৪	২৪	৩৬
„ দশমী	২৫	২০	৪০
„ একাদশী	২৬	১৬	৪৪
„ দ্বাদশী	২৭	১২	৪৮
„ ত্রয়োদশী	২৮	৮	৫২
„ চতুর্দশী	২৯	৪	৫৬
„ অমাবস্যা	৩০	০	৬০

উদাহরণ কোষ্ঠিতে—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে (সংখ্যা ২৩) জন্ম বলিয়া, চক্র দৃষ্টে শুভ গ্রহদিগের বল ২৮ কলা এবং অশুভ গ্রহগণের বল ৩২ কলা পাওয়া গেল। সুতরাং শুভগ্রহ চ, বু, বৃ, শু প্রত্যেকের বল ২৮ হইল; আর পাপ গ্রহ র, ম, শ প্রত্যেকের বল ৩২ হইল।

৬। দিব্যরাত্রি বল :—

দিবাবলী—রবি, বৃহস্পতি, শনি।

রাত্রিবলী—চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র।

সর্বদাবলী—বুধ।

বুধ সর্বদাবলী হওয়ায় দিব্যরাত্রি সর্বদাই উহার বল ১ রূপ বা ৬০ কলা।

দিবাবলী গ্রহরা দিবা জন্ম স্থলে ৬০ কলা বল পাইবে; রাত্রিবলী গ্রহরা এ স্থলে শূন্য বল পাইবে।

রাত্রিবলী গ্রহরা রাত্রি জন্ম স্থলে ৬০ কলা বল পাইবে, আর দিবাবলীরা এ স্থলে শূন্যবল পাইবে।*

সুতরাং উদাহরণ কোষ্ঠিতে দিব্যরাত্রি জন্ম হওয়ায় র, বু, শ প্রত্যেকের ৬০ বল। আর বুধের ৬০ কলা বল।

* ইহা স্থল গণনা—এই স্থল গণনাই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া অনুমান হয়।

স্মৃতি

শ্রীপ্রভাত হালদার

—গল্প—

আবার সেই ইষ্টারের ছুটি এলো। আমিই বা কোথায়—আর লুয়াই বা কোথায়—! স্মন্দরী লুয়া, হাস্য চপলা লুয়া—আজ কতদূরে? আপনারা হয়তো লুয়াকে চিনবেন না, তবে বলি শুধুন তার কাহিনী।

এমন এক ইষ্টারের ছুটি। লণ্ডনের মোহ তার বন্ধনে আমাকে বাঁধতে পারছিল না। তার উপর আকাশ বেশ পরিস্কার, এমন দিনে কার ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছা হয়? বন্ধুর দলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তারাও বেড়াতে যাবে তবে আমার কথায় কেউ রাজি হ'লনা বরং আমাকেও তাদের সঙ্গে লণ্ডনেই আমোদ প্রমোদে এই ছুটিটা কাটাতে অনুরোধ করলে।

বন্ধুর দল থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী এসে কাপড় জামা গোছাতে সুরু করলাম। গৃহকর্তৃ এসে প্রশ্ন করলেন—কত দূর যাওয়া হবে ব্যানার্জি?

—কতদূর যাব কিছু ঠিক করতে পারিনি মিসেস্ উভ্! তুমিই বলত'! এমন স্মন্দর দিন কোথায় গেলে ভাল কাটিবে?

মিসেস্ উভ্ সোজা বলে বসলো—কেন? আইল অব ওয়েটে যাও। আমি একখানা চিঠি লিখে দেবো—আমার বোনের বাড়ী আছে একেবারে সমুদ্রের উপর বলেই চলে। তার বাড়ী গিয়ে তুমি থাকবে, কোনও কষ্ট হবে না তোমার।

মিসেস্ উভ্কে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, যাক্! বাঁচালে তুমি যাকে বলে ঝিঝুক কুড়ুতে গিয়ে মুক্তা পাওয়া। তুমি চিঠি লেখ আমি তৈরী হ'য়ে নিচ্ছি।

চিঠিখানা পকেটস্থ করে যখন স্টেশনে এসে পৌছলাম—তখন ট্রেন ছাড়ার মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি অথচ যে ভাবে লোক দাঁড়িয়েছে তাতে ঘণ্টা খানেকের আগে টিকিট পাওয়া যাবে না। অগত্যা যারা টিকিট কিনছিলেন তাঁদের স্বরণ নিলাম। যাক্ আমায় রক্ষা করলেন এক তরুণী।

টিকিটের টাকটা তার হাতে তুলে দিলাম; মিনিট দশেকের মধ্যে তরুণীটি এলো আমার কাছে—এই যে আপনার টিকিট।

ধন্যবাদ দিয়ে টিকিটখানা নিলুম।

তরুণীটি আমার দিকে তাকিয়ে বলে,—ট্রেনের ভ' বেশী দেরী নেই চলুন না উঠে বসা যাক।

আমার পোর্টারের মাথায় তার হুট্ কেশটাও তুলে ট্রেনের দিকে গেলাম। মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলে,—আমার বরাত ভাল, লণ্ডনের বাইরে একা ত' বার হইনি তবু একজন গাইড পেলাম।

আমি হাসতে হাসতে জবাব দিলাম,—গাইড ত' বোলেন কিন্তু এই গাইডকেও মাঝে মাঝে পথ চিনিয়ে দিতে হয়, না হ'লে হু'চার মাইল বাজেও ঘুরতে হয়।

—সত্যি! বিষয়ে তরুণীটি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

ট্রেনের কামরায় গিয়ে বসলাম। মালপত্রের জন্তা তাবনা নেই, সেগুলো যথাস্থানে পৌছাবে, আমরা এখন পৌছাতে পারলেই হ'ল। তরুণীটি গায়ের ওভার কোর্ট খুলে হুকে টানিয়ে আমার পাশে এসে বসলো। আমি বাইরের স্টেশনের দিকে তাকিয়ে ব'সে ছিলাম; ট্রেন ছাড়ার আর বেশী দেরী নেই। অগণিত লোক নানাস্থানে যাবার জ' ট্রেনের অপেক্ষা করছে। তরুণীটি আমায় ডাকলে মিঃ?

—আমায় ডাকছেন? আমি তার দিকে তাকালাম।

—হাঁ ডাকছিলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল, কিন্তু, কি বলে ডাকবো আপনাকে? আমাকে আপনি লুয়া বলেই ডাকবেন।

—সত্যি কথা, আমায় ডাকার অসুবিধা হ'তে দেব কেন? আমায় আপনি মিঃ ব্যানার্জি বলেই ডাকবেন। ব্যানার্জি আমার উপাধি।

লুয়া প্রশ্ন করলে—আপনি থাকবেন কোথায়? আমার কিন্তু থাকবার কিছু ঠিক করতে পারিনি। একটা যাত্রী-নিবাস দেখে নেওয়া যাবে'খন। কি বলুন?

পকেট থেকে মিসেস্ উভের চিঠিখানা বার ক'রে বললাম এই আমার থাকার ব্যবস্থা।

—বাঃ ? পাকা কাজ করে রেখেছেন দেখছি, কিন্তু আমার একটি ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

এমন করে লুরার সঙ্গে আমার পরিচয়। ট্রেন ছুটেছে নাচতে নাচতে। হাড়িটা বসে বসেই ঘুমালাম। ঘুম যখন ভাঙলো—তখনও ঠিক ভোর হয়নি, ঘোলাটে রংএর আকাশের পূর্ব দিকে যেন গেরুয়া রংএর ছোপ পরেছে। ট্রেন এসে থামলো, এইবার ষ্টিমারে সমুদ্রটুকু পার হবার পালা। লুরা বসে বসেই বেশ ঘুমাচ্ছিল। আমি ডাকতেই ঝড়মড়িয়ে উঠে বসলো।

—আমরা কোন ষ্টেসনে এলাম ব্যানার্জি ?

—সাঁউদামটনে এসেছি, এখান থেকে ষ্টিমারে যেতে হবে। উঠে পড় আর দেবী ক'রনা, ওভার কোর্টটা গায়ে চাপিয়ে নাও গা'টা বেশ শীত শীত করছে।

লুরা ওভার কোর্টটা গায়ে দিয়ে হ্যাণ্ড ব্যাগটা তুলে নিলে, চল মিঃ ব্যানার্জি। কীটায় পৌছাব বলত ?

—তা বেলা হবে লুরা। প্রাতঃরাশটা ষ্টিমারেই সেরে নেওয়া যাবে'খন—কি বল ?

—সেটা মন্দ হবে না। লুরা বলে।

ট্রেন থেকে দলে দলে লোক নামছে। মনে হ'ল লগুন বোধ হয় খালি হয়ে গিয়েছে। পোর্টারের জিন্সায় মাল পত্রগুলো দিয়ে ষ্টিমার ঘাটের দিকে এগিয়ে চললাম। লুরা আমার হাতটা ধরে বলে, আমার হাত ধরে তুমি চলো। আবার হেসে বলে, আমি পথ চিনি না আমার নিয়ে চলো। তার ছুটামিভরা মুখখানি হাসিতে টলমল করে উঠলো।

লুরাকে বললাম—আমাদের দেশের এক কবি গান লিখেছেন, 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনি না।'

লুরা খিল খিল করে হেসে উঠলো,—মস্ত কবি ব্যানার্জি, আমাদের মনের কথা ত' আগেই লিখেছেন ?

—সত্যিই তিনি মস্ত কবি লুরা, ভগবানের উপর তিনি এমনই নির্ভর করেছেন।

লুরা বলে, ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ, ভারতবর্ষের উপর আমার বড় মায়া, কিন্তু কেন তা' জানি না।

তার কথায় আমি-হাসলাম।

—হাসছো যে ? লুরা বলে।

বললাম—তবু ভাল একটি পরাধীন দেশের উপর স্বাধীন

দেশের লোকের মায়া পড়েছে—আমাদের সৌভাগ্য বলে মনে

নিতে হবে। যাক এখন ষ্টিমারে ওঠো। কথার খেই এইখানেই হারাল।

ষ্টিমারে উঠে লুরা বলে,—আমি কিন্তু এই রেলিংএর ধারে কাটাব।

—বেশ ত' এইখানেই দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে'খন। চা আনতে বলি, কি বল ?

তা আনতে বল আপত্তি নেই ; বিলটা কিন্তু আমি দেব তোমার আপত্তি চলবে না। অন্ততঃ তোমার সন্তে আমি যখন রাজি আশা করি তুমিও আমার সন্তে রাজি ?

রেলিংএর দিকে একখানা বেঞ্চি দখল করে লুরা বসলো, বললে, কি সুন্দর দিন, কি সুন্দর গভীর নীল সমুদ্র, ব্যানার্জি !

—নীল ! আমি তার থেকেও গভীর নীল দেখছি আকাশ ; এর বিশালত্ব সমুদ্রের থেকেও বেশী।

—হ'লনা ব্যানার্জি ! আমি কিন্তু তার থেকেও গভীর নীল দেখছি তোমার চোখ ছাটি ; এর মধ্যে আমার আকাশ আর সমুদ্র সব এক হয়ে আছে।

—তবে যে তুমি বলছিলে গভীর নীল সমুদ্র ? তোমার কি সব মিশিয়ে গেল লুরা ? কিন্তু থাক ও কথা, এস চায়ের সন্ধ্যাবহার করা যাক।

চা খেতে খেতে লুরা বলে, ব্যানার্জি ! তুমি ও কথা চাপা দিলে কেন ?

—তুমি জাননা লুরা আমি প্রেমের কাহিনী রচনা করতে চাই না, আমি চাই এই সুন্দর দিনগুলোকে উপভোগ করতে।

—কিন্তু তোমার চোখের গভীরতাকে ত' তুমি চাপা দিতে পারবে না ব্যানার্জি ?

—কোনও নারীর মুখ থেকে আমার রূপের ব্যথ্যা শুনতে চাই না লুরা। ওতে হয়তো অস্ত্রের মন টলতে পারে কিন্তু আমার মন টলবে না।

—তুমি ভুল বুঝোনা ব্যানার্জি ! তোমাকে ক্লার্ট করতে চাই না। এটা হচ্ছে আমার সাময়িক আনন্দের উচ্ছ্বাস।

—তোমরাও এত ভাবপ্রবন তা' ত' জানতাম না। আমি জানি একমাত্র বাঙ্গালীই ভাবপ্রবন।

—সে কি ? বাঙ্গালীরা ত' দার্শনিক যাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জন্মায় তারা কি যা' তা' লোক নাকি ? ভারতের দর্শন সে-ত' মস্ত জিনিষ। আমার নিয়ে যেতে পারবে তোমাদের ভারতে ?

আমি বুঝলাম না, লুরা কেন একথা আমায় শোনালে? লুরার কথাকে আমায় অল্প দিকে ঘোরাতে হবে এই কথাই ভাবছিলাম। ঈমার চলেছে নীল সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে জল কাটিয়ে। ছ'ধারে ছিটিয়ে পড়ছে সাদা ফেনায় রূপান্তরিত হ'চ্ছে। 'সিগাল' লম্বা লম্বা পাখায় ভর করে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের দিকেই আমি তাকিয়েছিলাম।

—ব্যানার্জি। লুরা ডাকলে।

তার দিকে আমার মুখ ফিরলো। কি বলছো লুরা?

—আচ্ছা ধর—যদি আইল অব ওয়েটে গিয়ে দেখি সব হোটেল, বাড়ী ভর্তি হ'য়ে গেছে তো তা' হ'লে থাকবো কোথায়—?

গুরুতর সমস্যা—। হাসি মুখে জবাব দিলাম—কথাটা ভাববার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা'ও কি সম্ভব?

—অসম্ভব কি'সে? লুরা তাকাল আমার দিকে।

—তবে সেটা আমাদের ভাগ্য, এ ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।

হাসতে হাসতে লুরা বললে, আমি'ত' বলেছি ভারত-বাসীরা দার্শনিক। আচ্ছা, তোমরা ভাগ্যের উপর কেনন করে এতটা নির্ভর কর?

—তুমি এটুকু বিশ্বাস কর লুরা—আমি দার্শনিক নই।

—আমি তোমার কথায় মনে বিশ্বাস আনতে পারি না—। দর্শন তোমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে। তা' ছাড়িয়ে তোমরা যেতে পার না।

লুরার কথার মাঝে লুরার এক বাস্তবী এলো। তাকে বসলাম। লুরা বলল,—তুমি এপাশে বস ব্যানার্জি। লুরার পাশে স্থান করে বসলাম। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। লুরার সঙ্গে এক অফিসেই কাজ করতো। যাবে আমাদের গন্তব্যে।

লুরাকে বললাম, তোমার সঙ্গী ত'পেলে লুরা—এবার আমি যাই।

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, আমি ত' 'এনগেজড' ব্যানার্জি লুরা মেয়ে বেশ ভাল ওর সঙ্গে তোমার দিবা আনন্দে কাটবে। মেয়েটা কটাক্ষ পাত করলে আমার আর লুরার দিকে।

—মিস্ তুমি ভুল করছো—আমি লুরার প্রেমিক নই,

লুরার সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র পথে, কোন ও সম্বন্ধ নেই ওর সঙ্গে। তুমি লুরাকেই প্রেম করে দেখ না।

মেয়েটি একবার ওদিকে তাকিয়ে হাসলে। আমাদের ছ'জনকে কি ভাবলে সে একাই জানে। হয়তো লুরাকে বলবে আমার অন্তঃপন্থিতিতে।

কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সে চলে গেল। লুরা আমায় বললে, ওর ইঙ্গিত নিশ্চয়ই তুমি বুঝেছ? কিন্তু কি মিথ্যা ধারণা হ'ল তোমার আর আমার উপর।

—তুমি ত' প্রতিবাদ করলে পারতে। বললাম লুরাকে—। এই মিথ্যা ধারণার জন্ত হয়তো তোমার স্নানামের ব্যাঘাত ঘটতে পারে লুরা।

—সে বুঝবেনা, তাকে কি বোঝাবার চেষ্টা করবো ব্যানার্জি। আমরা চাকরীর খাতায় যে-দিন নাম লিখি সে দিন থেকেই ত' আমার অপরাধের কালিমা সর্বদা লেপে যায়। যারা সং তারাত বাদ পড়ে না। আমার নিজের জন্ত আমি ভাবি না ব্যানার্জি কিন্তু তোমাকে যেন ও পাপ স্পর্শ না করে। তোমরা ভারতবর্ষের লোক, ভারতবর্ষের উপর আমার বড় শ্রদ্ধা। যাদের সাহিত্যে গীতাঞ্জলী আছে, যাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করে তারা কত মহৎ তারা কত উদার।

—শুধু হয়তো শ্রদ্ধা নেই লুরা তার সঙ্গেও আছে মারাত্মক ভুল ধারণা।

—কিসের ভুল ধারণা ব্যানার্জি?

—যেমন ভারতের যারা বিলাতে পড়তে বা বেড়াতে আসে—তারা সকলেই প্রিন্স। আমি হাসলাম—।

—নয় ত কি? লুরা বললে। তা' না হ'লে এত টাকা খরচ করে কেউ বিদেশে থাকে—?

—তুমি জান না লুরা, আমরা যারা এখানে পড়তে আসি সকলেই প্রিন্স নই, সাধারণ গৃহস্থের ছেলে। ব্যবসায়ীরা যেমন ব্যবসার জন্ত মূলধন ফেলে আমরাও তাই করেছি। এখান থেকে লেখা পড়া শিখে হয় দেশে ফিরে চাকরী করবো আর না হয় ব্যবসা করবো। বাবা মা আমাদের পথ চেয়ে আছে, আমরা টাকা উপার্জন করতে পারলে তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ অন্নের সংস্থান হবে। তোমার ভুল আমি বার বার ভেঙ্গে দিচ্ছি লুরা, আমরা সকলে প্রিন্স নই।

অর্থের দিক দিয়ে হয়তো গ্রিন্স না হ'তে পার, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে ত' নিশ্চয়। এ-ভুল আমার মন থেকে ভাঙ্গবে না।

মনে ভাবলাম কেন ভাঙ্গবে না? যাঁরা এখান থেকে ফিরে গেছেন তাঁরা বার বার বলেছেন ওখানে বন্ধুর সাথে আলাপ রাখবে—বান্ধবীর ধার দিয়ে যেও না। লুরা কি আমার সেই দুর্বলতার সুযোগ নেবে? আমি যেন ক্রমশঃ দুর্বল হ'য়ে পড়েছি।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে লুরা বলে—তুমি চুপ ক'রে কি ভাব বল ত'?

আমার মগজে যেন বুদ্ধি খুলে গেল, লুরার অন্তরকে দুর্বল না করতে পারলে আমার নিস্তার নেই। লুরাকে জবাব দিলাম—

—আমি ভাবি আমার দেশের কথা; আমার মার কথা ভাই, বোন সকলের কথা—তাদের জন্ত মন আমার উতলা হ'য়ে থাকে।

সাম্বন্ধের সুরে লুরা বলে, নিয়ম মত চিঠি পাও ত'। তাদের ফটো আনিয়ে কাছে রাখ না।

—ফটো দুয়ের মাছকে কাছে আনলেও তাদের স্মৃতি মনকে আরও আবুল ক'রে তোলে।

লুরা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, তোমার মনকে অনুমনা ক'রে রাখবার ভার আমায় দাও।

—দিতে পারি কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর যে ক'দিন ইষ্টারের ছুটি থাকবে মাত্র সেই ক' দিনের জন্ত। তার পর আমরা কেউ কাউকে চিনবো না—কেউ কাউকে জানবার চেষ্টা করবো না, কিম্বা এর মধ্যে কারো পরিচয় দেব না। আমাদের পরিচয় থাকবে শুধু আমার হ'জনে প'থের বন্ধ। লুরা যাতে রাজি না হয় এমন ভাবেই বললাম তাকে—

লুরা নিজেও খানিক ভাবলে—তার পর বললে—তুমি ত' আমার পরিচয় জানতে চেষ্টা করবে না? আমাকে কথা দাও। আর একটা কথা কাউকে বলবেনা অন্ততঃ "যে-ক' দিন লগুনে থাকবে।

বললাম—না বলব না, তোমার সঙ্গে বাকি সর্ব ত' সমান। তথাস্ত। প্রতিজ্ঞা হ'ল হু'জনায় হাত ধরে বললাম—যদি

আমরা জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি তাহ'লে ঈশ্বরের কাছে দোষী হব।

একটি চেউ এর পর একটি চেউ এসে পড়ছে এমন করে তারা চলেছে কোন অজানা তীরের দিকে পাড়ি জমাতে। তাদের দিকে তাকিয়েই আমার কিছুক্ষণ কেটে গেল। লুরা আমায় ডেকে বললে,—আমরা কোথায় এসে পড়েছি বল ত'? ওই দেখ পাল তোলা নৌকাগুলো কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—হাঁ—আমরা ত' প্রায় এসে পড়েছি লুরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নামবো।

লুরা আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে—চিঠিখানা ঠিক আছে ত'!

চিঠিখানা—দেখে নিলাম ঠিক আছে কিনা। লুরাকে প্রশ্ন করলাম তোমার থাকার কি ব্যবস্থা করবে?

লুরা তার জবাব দিলে, আগে গিয়ে পৌঁছাই তার পর যা' হ'ক একটা কিছু করা যাবে।

আইল অল ওয়েটে নেমে গাড়ীর ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়ে গাড়ীতে উঠবো, লুরা বলে, তুমি যাও আমি ঘর ঠিক ক'রে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

—না না সে কি হয়। তুমি উঠে এসো আমি তোমার থাকার ব্যবস্থার ভার নিচ্ছি। লুরা উঠে এলো গাড়ীতে।

মিসেস্ উভের বোনের বাড়ী গিয়ে শুনলাম এবার অত্যধিক ভীড় হওয়ায় আইল অব ওয়েট স্থানাভাব ঘটেছে। বাড়ী পাওয়া একরকম দুষ্কর। আমায় মাত্র মিসেস্ উভের খাতিরে একখানা ঘর দিতে পারেন। আর একখানি ছাড়া ঘরও তাঁর খালি নেই। অগত্যা লুরার জন্ত ঘর খুঁজতে বার হলো। কিন্তু মিথ্যা কতক সময় আর অর্থের অপব্যবহার করে নিরাশ হ'য়ে গৃহকর্তৃর শরণাপন্ন হ'লাম।

তিনি বলেন, আমায় যে ঘরটি দেওয়া হ'য়েছে সেট দু'সিটের; আমরা নিজেরা যদি ব্যবস্থা করে নিতে পারি।

কি লজ্জার কথা। লুরাকে বলবো আমি আমার সঙ্গে থাকতে ছি ছি কি মনে ভাববে লুরা? একটি কুমারী মেয়ে অপর এক পুরুষের সঙ্গে এক ঘরে রাজি বাস করবে? বলতে বোধ হয় কোন ভদ্রলোকই পারবেন না। কিন্তু এমন দ্বিপদে উদ্ধার করলে লুরা।

—ব্যানার্জি ! ঘরের মধ্যে একটা পর্দার ব্যবস্থা করতে পার ? মাঠের ওপর তুমিও থাকতে পারবে না, আমিও পারবো না। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

—কিন্তু পর্দা পাব কোথায় ? গৃহকর্তৃ তিনিও বললেন তাঁর কাছে নেই, মনে পড়লো স্ট্রাটকেশে একখানা ধুতি আছে। সেইটাই বার করে লুরার হাতে দিলাম।

—লুরা ধুতিখানা হাতে নিয়ে বলল, বাঃ ! এ-ই চমৎকার জিনিষ। এ কোথা থেকে সংগ্রহ করলে ?

—লুরার কথার জবাব দিলাম—তোমাদের দেশে যেমন ট্রাউজার ব্যবহার করে আমাদের দেশে তেমন এই ধুতি ব্যবহার করে ; এই কাপড় আমরা রাত্রিদিন পরে থাকি।

লুরা হেসে জানালে,—ভারতবর্ষের লোকদের বুদ্ধি সত্যিই অত্যন্ত প্রখর তাই তারা শ্রদ্ধেয়। আমাদের দেশের ট্রাউজার কি এই পর্দার কাজ করতে পারতো ?

আমি হাসলাম মাত্র। শরীর বড় রাস্তা হ'য়ে পড়েছিল—লুরার জন্তে ঘর খুঁজতে সমুদ্রের ধারে অনেক ঘোরা হ'য়েছে। ঘুরে ঘুরে বেজায় থিড়ে পেয়েছিল তাই সমুদ্রের ধারের একটা কাফেতে সে সমস্তার সমাধান করে নিয়েছিল। খানিক বিশ্রাম করে বিকালে বেড়াতে বার হ'লাম। খাওয়া দাওয়া সেরেই বাড়ী এসেছি। বাড়ী ফিরে কাপড়ের আড়ালে বেশ পরিবর্তন করে শোবার আয়োজন করছি এমন সময়ে লুরা এলো আমার কাছে। তার শয্যা ছেড়ে আমার কাছে আসতে আমি একটু বিরক্ত হ'লাম। লুরার যেন কোনও সঙ্কে চের বালাই নেই। বলল—এত তাড়াতাড়ি ঘুম নয় ; বস, খানিক গল্প করি।

আশ্চর্য্য মেয়ে বটে, কিন্তু কি মতবল ওর ? বললাম—তুমি তোমার বিছানায় যাও শুয়ে পড়, কাল ভোরে উঠে দক্ষিণ তীরের দিকে বেড়াতে যাব। কিন্তু তার শুতে যাবার কোনও আগ্রহই দেখলাম না, বরং আমার আরও কাছ বেসে বসলো। মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলল—কি সুন্দর কাল কৌকড়া চুল তোমার ?

লুরাকে পরিহাসের ছলে বললাম,—নিগ্রোদের চুল আরও বেশী কৌকড়া আর সুন্দর। আমি সুন্দর নই। আমাকে যদি তোমার মনে ধরে থাকে তা' হ'লে তুমি সে আশা ত্যাগ করো।

—ও কথা ত' এখন বলার নয় ব্যানার্জি, আমরা দুজনে দুজনকে ভুলে যাব। লুরা বলল।

লুরার কথা ঘোরাবার জন্ত বললাম—তোমায় এ সাজে বড় সুন্দর দেখায় লুরা ! লুরার পরণে ছিল চিলা নাইট গাউন আর মাথায় এক খানা রুমাল বাঁধা।

লুরা বললে,—আমায় সুন্দর বললে ঠকবে ব্যানার্জি !

তা'হ'লে তুমিত' আগেই ঠকেছ ?

—তার মানে ? লুরা প্রশ্ন করলে।

—মানে কিছু নেই, পরে বুঝো—এখন যাও শুয়ে পড়ো।

লুরার চোখ দুটামিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।—আমি যদি আজ রাত্রে তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাই ?

—আমায় ঘুমাতে দেবে না, এই কি তোমার মতলব ?

—তাই যদি হয়। লুরা হাসলে।

কি বিভ্রাট ! অথচ আমি নিরুপায়,—বললাম,—কি ছেলে মান্‌সি তোমার লুরা ?

লুরা জবাব দিলে—কিসে ছেলে মান্‌সি ? তুমি ভুলে যাও তুমি পুরুষ আর আমি নারী—আমরা দু'জনে বন্ধু। এই ত' তোমার আর আমার সম্বন্ধ।

—তুমি কি আমায় পরীক্ষা করতে চাও লুরা ? কিন্তু একথা—তুমি স্বীকার করবে যে মানুষের একটা প্রবৃত্তি আছে—সেটা পশুকেও হার মানায়, সেটা তার আদিম প্রবৃত্তি। আমি পুরুষ আর তুমি নারী, আমাদের দু'জনের সম্বন্ধ যাই ই থাকুক না কেন নীতির দিক থেকে এটা যেমন খারাপ প্রকৃতির দিক থেকে ঠিক তেমনই দোষাবহ। এটা উভয়েই স্বীকার করতে বাধ্য।

লুরা স্পষ্ট জানালে—সব কথা স্বীকার করছি, কিন্তু আমরা দু'জনে বন্ধু আমি তোমার গালে বন্ধুত্বের দাবী জানাতে পারি—এত নীতি বহির্ভূত নয়। লুরা এক রকম জোর করেই বন্ধুত্বের দাবী জানালে।

—যাও, তবে এইবার শুয়ে পড় আমি আর কোনও দুটামির প্রশ্ন দিতে পারবো না মনে রেখ। তোমার আর কোনও উপদ্রব দেখলে বাইরে আশ্রয় নিতে হবে।

পরদিন সকালে লুরা বললে—চল যাই সমুদ্রে স্নান করে আসি। স্নানের পোষাক সে পরেই নিলে, তার উপর অস্ত্র

সাজ করলে। হু'জনে চললাম স্নান করতে সমুদ্র তীরে। আমার একটা জিনিষ পাওনা আছে, আজ আমার দিতে সমুদ্রের ধারে অজস্র ছোট ছোট তাঁবু পড়েছে, অজস্র রঙ্গীন হবে।

ছাঁতা, সৈকতে গড়াগড়ি যাচ্ছে তরুণ, তরুণী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা আর শিশুর দল। মনে হ'ল এরা আনন্দকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করতে জানে বটে। দলে দলে বাঁগিয়ে পড়ছে সমুদ্রের বুকে। এরা যেন সমুদ্র মন্বনের ব্রত নিয়েছে, হাশ্বে লাস্যে প্রত্যেকেই যেন মৃত্তিময়ী। কোনও ভেদাভেদের প্রশ্ন এদের মনে জাগে না। আনন্দ! সেত' সকলেরই জ্ঞান। আমাদের দেশের প্রাচীনরা সে দৃশ্য দেখলে রীতিমত আত্মকে উঠতেন। এক কথায় আমাদের দেশের সামাজিক নীতির দিক দিয়ে দেখতে গেল—যাকে বলে—অঙ্গীল।

আমরাও মেতে উঠলাম এই স্নানের আনন্দে। স্নান সেরে একটা কাঁফতে ঢুকলাম চা আর সামান্য জলযোগ সেরে সুরাকে নিয়ে বার হ'লাম বেড়াতে। এমনি আনন্দে ছুটির দিনগুলো ফুরিয়ে গেল। আবার লগুনে ফেরার পালা। এত আনন্দ আর এত অসীমতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার পর আবার যে লগুনের কৰ্ম-বহুল কেন্দ্রে ফিরে যেতে হবে এ কথা মনেই হয়নি।

লুরা বললে—এক সঙ্গে লগুনে ফিরবে ত'!

আমি জানালাম, না, আমি অল্প পথে যাব।

লুরার মুখখানি স্নান হ'য়ে এলো। যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে বললে,—এর পরে ছুটিতে কোথায় যাবে, একটা ঠিক করে রাখলে ভাল হ'ত।

আমি দৃঢ়ভাবে জানালাম, কোনও প্রয়োজন নেই।

হু'জনে ষ্টীমারে উঠে বসেছি, লুরা বললে—তোমার কাছে

—কি? প্রশ্ন করলাম।

—একটি চুষন। গভীর অনুরাগে লুরা জানালে।

জানালাম, তাই হবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভুলো না লুরা।

সাদামুটনে ষ্টীমার প্রায় এসে পড়েছে, লুরা বললে,—কৈ তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ কর। চোখ তার ছল ছল ক'রে উঠলো। তাকে চুষন করতে তার চোখের মুক্তা বিন্দু ঝরে পড়লো। আমি অল্পদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। জেটতে জাহাজ দাঁড়াতে লুরা বলে গেল—বন্ধু বিদায়।

—বিদায় বন্ধু—আমায় ভুলে যেও, এই আমার অনুরোধ।

লুরা তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমার শেষের কথা হয়তো তার কানে গিয়ে পৌঁছায়নি।

বাড়ী এসে দেখি স্মার্টক্লেস লুরা একখানা রুমাল দিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে একটা কাগজে লেখা 'ভুলনা বন্ধু—লুরা।'

হাসি এলো ওর পাগলামি দেখে, মনে ভাবলাম বাড়ী ফেরার পথে ইংলিস্ চ্যানেলে এটা বিসর্জন দেব, কিন্তু ভুলে গিয়েছি, তারপর মনে হ'ল এটা কাউকে দিয়ে দেব। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। থাক না ক্ষতি কি? সেই রুমাল আজ আবার হাতে পড়েছে তাই শুনালাম তার কাহিনী। আবার সেই ইষ্টারের ছুটি এলো, আমিই বা কোথায় আর লুরাই বা কোথায়?

আরনারা হয়তো আমার লগুনের কাহিনী শুনে বিশ্বাস করলেন, কিন্তু বিশ্বাস করলে ভুল করবেন, আসলে এটা নিছক গল্প—। থাক আজ এই পর্যন্তই।



মংপুতে

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

(মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথন)

“এটা একটু খাবেন? রোজ রোজ আপনাকে কি নিয়ামিষ খাওয়াব ভেবেই পাই নে।” “ও পদার্থটা কি?” “ব্রেইন।” “এই দেখ কাণ্ড, এ ত প্রায় অপমানের সামিল। কি ক’রে ধরে নিলে ও পদার্থটার আমার প্রয়োজন আছে? আজকাল কি আর ভালো লিখতে পারছি নে—বিশ্বকবির কবিত্ব-শক্তি হ্রাস হয়ে আসছে? যাক্, সন্দেহ যখন একবার প্রকাশ করেই ফেলেছ তখন স্তব্ব করা যাক্। কিন্তু একটা কথা, বোমা কি মনে করবেন? তাঁর কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব বল? তিনি যদি বলেন, এত দিন আমি ব’লে ব’লে কিছুতে আপনাকে মাংস খাওয়াতে পেরে উঠছি নে আর যেই ওই কচ্ছট একবার বললে, ওমনি আপনি একেবারে বাধ্য ছাত্রের মত, স্তবোধ বালকের মত—” “মোটাই বোমা তা বলবেন না, আপনি খেলেই তিনি খুশী হবেন।” “তুমি দু-একখানি সাইকোলজির বই সাজিয়ে রেখেছ বটে, কিন্তু তোমার সাইকোলজির জ্ঞান কিছুই হয় নি দেখছি।” “সব মানুষের সাইকোলজি কি এক?” “এ ঠিক বলেছ—তা নয়, বোমার মন খুব উদার। তোমাকে ত খুবই স্নেহ করেন, আর এই বৃদ্ধ শিশুটির ‘পরে ত তাঁর স্নেহের অন্ত নেই। তাই কোনো কালে যা ছিল না এ বয়সে আমার তা হয়েছে। মনটা থোকা হয়ে উঠছে, সর্বদাই মা মা করে। যখন তিনি কোথাও বান চারদিক শূন্য বোধ হয়। ঐ যে তিনি খাবার সময় কাছটিতে এসে বসেন, আস্তে আস্তে বলেন এটা একটু খেয়ে দেখুন, সে শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে। এ রকম কিন্তু আমার ছিল না। মনের দিক থেকে, শরীরের দিক থেকে একেবারে স্বাধীন ছিলুম বরাবর। ছোটবেলায় চাকরদের কাছে মানুষ, হেলাফেলার মানুষ। তাই কোনও সেবাস্বত্ব প্রত্যাশা করি নি বহুদিন। অভ্যাস ছিল সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর থাকবার, অভ্যাস ছিল অস্বত্ব। বাঙালী বাবুদের মত গরমের সময় মেয়েদের হাতের পাখার বাতাস আমার অভ্যাস নয়। কিন্তু ইদানীং এই মা’ট আমায় থোকা ক’রে তুলছেন। বোধ হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার শিশু হয়ে যাচ্ছে।”

এক দিন খেতে বসেছেন, কথা উঠল গল্প-কবিতার। আমি বললুম, “একটা কথা নির্ভয়ে কর?” “সম্পূর্ণ। দেবী। কবে তুমি ভয়ে নির্বাক হয়ে থাকো সে শুভদিন ত আজ পর্যন্ত দেখি নি।” “আচ্ছা তাহ’লে ব’লে ফেলি। গদ্য-

কবিতা আমার ভাল লাগে না।” “তার- অত্যন্ত সহজ কারণ এই যে এখনও তুমি অভ্যস্ত হও নি।” “তা হ’তে পারে, তা হ’লেও একটা প্রশ্ন থাকে, অভ্যস্ত হলুম না কেন? ভালো লাগে না ব’লে পড়ি নে তা ত নয়। কোনোটা কিছু কিছু ভালোও লাগে হয়ত। কিন্তু মিলের কবিতার মত কিছুই নয়। যে কবিতা প’ড়ে রাতের পর রাত কাটান যায়, যে কবিতা উচ্চারণ করে সকল সময় সকল রকম মনের অবস্থায়ই মন মুক্তি পেতে পারে, গদ্য-কবিতায় সে আনন্দ-স্বাদ কোনোদিনও পাই নি।” স্মৃথাকান্তবাবু বললেন, “আমারও তাই মত।” “কি, তোমার তাই মত কি রকম? তুমি ত আজকাল গদ্যকবিতা লেখবার রীতিমত চেষ্টা শুরু করেছ? ওর ওই একটা গুণ আছে জানো, যখন যেদিকে স্তবোধে দেখে সেদিকে জুটে পড়ে।” “আজ্ঞে না, আমি কোনদিন গদ্য কবিতা লেখবার চেষ্টামাত্র করি নি। সে আমার তাই লেখে।” “আসল কথা, সস্তা মিলের মোহ তোমাদের পেয়ে বসেছে।” “সস্তা কি ক’রে বলবেন? বলাকার কবিতায় মিল আছে, তাতে তার দাম কিছু কমছে কি? ‘ছবি’ কবিতাটা মনে এলো বলে গেলুম। এতে মিল থাকতে কি ক্ষতি হয়েছে? এ অর্থের তাৎপর্য গভীরতা কিছু খর্ব হয়েছে কে বলবে। কিন্তু এও ঠিক যদি মিল না থাকত এমন ক’রে অন্তরে প্রবেশ করত না। এর ছন্দোবদ্ধ এমন ক’রে মনে থাকত না।” “না, তোমরা একটা বড় ভুল কর, এ দুইয়ের মধ্যে তুলনা করা চলে না, দুটোর দু-রকম রস। এ দুই জিনিস তুমি যদি গদ্যের সঙ্গে কবিতার তুলনা কর এ সেই রকমই হবে। লিপিকা তোমার কেমন লাগে?” “খুব ভালো।” “দেখ একবার contradiction কি রকম তোমাদের মধ্যে! লিপিকা কেন ভালো লাগে, সে ত গদ্য-কবিতা? বিশুদ্ধ গদ্য কবিতা, লেখাটা গদ্যের ছাঁদে এই মাত্র তফাৎ।” “শুধু “শুধুন বলি ‘পায়ে চলার পথ’ আমার মুখস্থ আছে কিন্তু একটাও গদ্য-কবিতা বলতে পারব না। তা থেকেই বুঝবেন যা বলছি সেটা মনের কথা, কিন্তু কেন যে একটা ভাল লাগে, আর একটা লাগে না, অত বিশ্লেষণ করার কি ক্ষমতা আছে আমার?” “বুঝেছি তাহ’লে হয়ত পড়তে পার না।” “তা খুবই সম্ভব। মনে আছে একবার রবীন্দ্র-পরিষদে আপনি পড়েছিলেন ‘সাধারণ মেয়ে’। সেই প্রথম আপনার মুখে গদ্য-কবিতা শুনি, ভালো লেগেছিল

সেদিন।” “আচ্ছা তাহলে আজ সন্ধ্যা-বেলা পড়া যাবে, দেখি ভালো লাগাতে পারি কিনা।”

সেদিন সন্ধ্যাবেলা চোয়ারের পিছনে বড় আলোটা জ্বলে দিয়ে শ্রামলী, পত্রপুট প্রভৃতি নিয়ে আমার দুই বোন উপস্থিত। বইগুলো উল্টাতে উল্টাতে বললেন, “কোথা থেকে শুরু করব?” ক্রমে সকলে এসে বসলেন। শুরু হোলো পড়া। ‘শ্রামলী’ সম্পূর্ণ পড়া হোলো। ‘পত্র-পুটের’ও অনেকখানি। সেই ‘সাধারণ মেয়ে’ আবার পড়লেন। ক্রমে রাত্রি হয়ে এলো। অরণ্যে বি-বি-গোঁকাদের ক্রিয়াক্রান্ত প্রবলতর হয়ে উঠল। ওঁর খাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। গৃহিণীর কর্তব্য সম্পূর্ণ বিন্যস্ত হয়েছিলুম সেদিন। কত যে ভালো লেগেছিল, সে কথা আজ মনে পড়ে। তবুও ঔদ্ধত্য ত কম নয়—অনায়াসে বললুম, “আপনি পড়লে ত ভালো লাগবেই। সর্বদা আপনাকে পাব কোথায়?” উনি হাসলেন, বললেন, “হেরেও জিতবে এই প্রতিজ্ঞা।”

সন্ধ্যাবেলা এবং প্রায় চার বেলাই উনি যখন খেতে বসতেন, সুধাকান্তবাবু এসে আসর জমাতেন। এক দিন হাতে একখানা কাগজ নিয়ে এসে সুধাকান্তবাবু বললেন, “গুরুদেব, কালকের কাগজে একটা মজার ঘটনা বেরিয়েছে। আমাদের অমুক বাবুর বয়স ত বার্বিক্যে পৌঁছেছে, এই ত সেদিন স্ত্রী-বিরোধ হোলো, এর মধ্যে গিয়েছিলেন একটি ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে। পাড়ার ছেলেরা টের পেয়ে ভারি নাকাল করেছে ভদ্রলোককে।” তখন ভদ্রলোকের সেই নাকাল সম্পর্কীয় আলোচনায় বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম আমরা। উনি চুপ করেই ছিলেন। একটু পরে বললেন, “এ তোমাদের ভারি অভায় সে ভদ্রলোকের দোষটা কি?” “বাঃ দোষ নয় বরং ছেন? এত বয়স, এই সেদিন স্ত্রী-বিরোধ হয়েছে—” “সেই জন্তেই ত আরো দরকার। চিরজীবন যার স্ত্রীকে অভ্যাস হয়েছে, শেষ জীবনে সেই ত বেশী অসহায় হয়ে পড়ে।” “তাই বলে একটি ছোট মেয়েকে—?” “সেই ছোট মেয়ের হয়ত বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না? সে খোঁজ তোমারা কি করে জানবে। এ সব মাহুষের ব্যক্তিগত কথা, বাইরে থেকে তোমরা কি ক’রে বিচার করবে? এই নিয়ে তাই ব্যঙ্গ করা ঠিক নয়।”

তার পরদিন সন্ধ্যাবেলা খাবার টেবিলের কাছে বসে আছেন। জানালা খোলা। বাইরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে গাছের সারি কালো কালো প্রেতমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দুটো প্রকাণ্ড সাত-আট ইঞ্চি চওড়া “মথ” প্রজাপতি ডানা ছুঁপট করে করতে করতে টেবিলের উপরের প্রকাণ্ড আলোটাকে দু-চার বার প্রদক্ষিণ ক’রে আলোর চাইতেও জ্যোতিমান যিনি ছিলেন তাঁর কাছেই আশ্রয় নিল; অত বড় প্রকাণ্ড মথ আমরা পূর্বে কখনো দেখি নি। আমরা

সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। “দেখুন, আপনি কালকে সে ভদ্রলোকের বিয়ে সম্বন্ধে যে রকম মতামত প্রকাশ করছিলেন, তাতেই আমাদের একটু সন্দেহ হয়েছিল, আজ এত লোক থাকতে এত বড় প্রজাপতি দুটো আপনার গায়েই বসাতে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল।” “ওঃ তোমরা বুঝি মনে করছিলে আমার আর কোনো আশাই নেই। অমন ক’রে বয়সের প্রতি ইঙ্গিত করো না, মনে বড় আঘাত লাগে। একেবারে সব সম্ভাবনার বাইরে চলে যাবার মত এমনই কি বয়স হয়েছে!” “আপনি তাহলে মন স্থির ক’রে কেলুন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিই?” “দিয়েই দেখ না, পরের দিন বড় বড় হেড লাইনে এ খবর বেরুবে। আর দেশ-বিদেশ থেকে কত যে ভালো ভালো সম্বন্ধ আসবে—তখন কাকে রাখি তাই ভাবনা হয়ে উঠবে। তোমায় কিন্তু বাছতে দেব না, তাহলে ফল ভালো হবে না মনে হচ্ছে, তোমার যেন ব্যাপারটা পছন্দ নয়।” “আমার কেন অপছন্দ হবে, আপনার গায়ে প্রজাপতি বসছে, আপনি করবেন বিয়ে, আমার ক্ষতি কি তাতে? তবে যত আবেদন আসবে মনে করছেন তত নাও আসতে পারে।” কী, আবার বয়সের প্রতি ইঙ্গিত? সুধাকান্ত বড় অপমান করছে রে। যাক্ পে তোমার চাইতে উচ্চদরের পছন্দর অনেক কত্তা আছেন, এই যা ভরসা।”

“ওগো সীমন্তিনী, জিনিষপত্রগুলো নিয়ে অত ছুটোছুটি করো না, করো না। এই চাকরগুলো আছে কি করতে, ওদের পায়ে যে মর্চে পড়ে যাবে। তার চেয়ে তুমি ওই চৌকিটায় বোসো। কথা বল ঘীর মধুর ভাবে। ওগো ঘীর মধুরভাষিণী, বলো ঘীর মধুর ভাবে—তোমার গোপন কথাটি সখি রেখ না মনে, শুধু আমরা বোলো আমরা বোলো গোপনে—তোমার গোপন কথাটি।”

উনি আমার কাছে তিন দিন থাকবেন ব’লে এসেছিলেন—এ সময় পনের ষোল দিন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। প্রবল বর্ষা নেমেছে সুরেলের অরণ্য অন্ধকার ক’রে, দিন রাত মেঘের ছায়া কুয়াশার আবরণ সামনের সমস্ত আকাশ অবগুষ্ঠিত ক’রে রয়েছে। আমার ভয় করছিল, এই বারে যদি ওঁর মন যাবার জন্ত ব্যস্ত হয়। উনি তখন দিব্যরাত্রি লেখা নিয়ে রয়েছেন। বইটা প্রায় শেষ হয়ে এলো। “বনমালী, তোর জায়গাটা লাগছে কেমন?” “আজ্ঞে, আমার ত ভালই লাগছে—আমার দেশের লোক রয়েছে কিনা।” “তোর দেশের লোক আবার এখানে পেলি কোথায়?” “কেন ওই থুফুর আয়া, এই ওর বাড়ী আর আমার বাড়ী মাত্র একখানি গ্রাম মধ্যখানে।” বনমালী চলে যেতেই

বললেন, “লোকটা রসিক আছে, এমন নইলে আর আমার চাকর হয়! মধ্যে মাত্র একখানি গ্রাম!” স্বধাকান্তবাবু বললেন, “কাল খাবার ঘরে বসে আছি, শুনি বারান্দায় কথাবার্তা, আয়টির আবার মেজাজ ভালো নয়, বোধ হয় রাগ করে খায় নি সে। বনমালী তার খোশামোদ করছে, ‘দেখ তুমি যদি চা ‘না খাও’ আমার মনটা কি রকম হয় বল দেখি?’ ‘সত্যি নাকি? যাঃ তোরা যেন এই নিয়ে আবার ঠাট্টা করিস্ না। ও-বেচারাদের বুদ্ধি আর কোনো soft corner থাকতে পারে না? সে বুদ্ধি সব তাদের একচেটিয়া?’ স্বধাকান্তবাবু, “আজ্ঞে আমার কোনো soft corner-এর বালাই নেই।” “তা জানি; impresson পড়তে পড়তে কঠিন হয়ে গিয়েছে!”

একদিন ভোরবেলা ঘরে ঢুকতেই বললেন, “ওগো গৃহিণী তোমার সুসজ্জিত গৃহস্থালীর মধ্যে কিছু বিপর্যয় ঘটাব?” “নিশ্চয়ই অনায়াসে। কি করতে চান বলুন?” “ওই পাশের ঘরটা ত পড়েই রয়েছে, ওখানে আমার জায়গা করে দাও।” “কেন বলুন ত? এ ঘরটা থেকে ত চার দিক ভালো দেখতে পাওয়া যায়?” “তা ঠিক, কিন্তু ওই দিকটা পূর্ব দিক। সকালবেলা রোদ এসে পড়ে। সেই প্রথম আলোটা আমার বড় দরকার। দেখেছ ত আমার শান্তিনিকেতনে, ভোরবেলা উঠে বসে থাকি, অপেক্ষা করে থাকি কখন আমার আকাশের মিভা আসবেন, আমার আলোর ধারায় স্থান করিয়ে দেবেন। কি করে নামের এ ঐক্য হলো জানি না, আমি যে আলোর পূজারী, স্বর্ঘ্যোপাসক।” আজ মনে পড়ে তাঁর সেই ভোরবেলার শান্তসমাহিত মূর্তি। হুটী হাত কোলের কাছে জড়ো করা, ভোর বেলায় আলো-গায়ে এসে পড়েছে। সামনের সমস্ত দৃশ্যপট ছাড়িয়ে অদৃশ্যে নিবন্ধ দৃষ্টি। সেই সময়ে তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তাঁরা নিশ্চয় অস্বভাব করেছেন কত দূরের মানুষ তিনি। অথচ কিছুক্ষণ পরেই দেখেছি, খুব সঙ্গ ছড়া বলছেন আনন্দে। কত গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন, কত লিখেছেন অথচ সহজ সরল ভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার হাঁশপরিহাস একটুও ব্যাহত হয় নি। সেই মহৎ অনন্তসাধারণ মন নিজেকে পৃথক করে সরিয়ে নিয়ে যায় নি। সকলের মধ্যে থেকেই যে সকলের উদ্দেশ্যে তিনি, সেই তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার আর একটা নিদর্শন।

অতএব স্থির হয়ে গেল ঘর বদল হবে। সন্ধ্যাবেলা ওলট-পালট চলল। অনিলবাবু বললেন, “মৈত্রেরী দেবী লক্ষণ ভালো নয় কিন্তু।” “কি রকম?” “এই ঘর-বদল যেন বদলের স্ফুটনা করে। মনে হচ্ছে এইবার হয়ত যাবার সময় হয়ে এলো আমাদের।” “আচ্ছা আপনাকে

এসব কথা তুলতে হবে না।” “ভয় নেই, আমি তুলব না, একটা warning দিলুম মাত্র।” সেদিন দুপুর বেলা আমার একটু মংপু নামবার প্রয়োজন হয়েছিল। ওকে বললুম চিত্রিতা রইল, যাঁ দরকার হয় ওকে বলবেন। “কিছুই দরকার হবে না নিশ্চিত হয়ে ঘুরে এসো। একটুক্ষণ বিচ্ছেদে বিশেষ ক্ষতি হবে না, বরং উপকার হবার সম্ভাবনা।” “এ যে রীতিমত অপমান।” “ওই দেখ, এমন বদমভাস হয়ে গেছে, কখন সে সত্যি কথা বলে ফেলি ঠিক থাকে না।” মংপু থেকে যখন ফিরে এলুম তখন চারটে বেজে গেছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনি চিত্রিতাকে বলছেন, “ছিঃ ছি এত অবহেলা। বাড়ীতে অতিথিকে বসিয়ে রেখে বেড়িয়ে বেড়ান? যেমন তেমন করে কয়েকটা আপেল এনে এনে দিলেই যত্ন হয়, খাব না এসব, নিয়ে যাও।” চিত্রিতা যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে বলল, “উনি কিন্তু সত্যিই রাগ করেছেন।” “ভালই, মাঝে মাঝে দরকার।” উনি হাসতে লাগলেন, “যাক তোমার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। ঠাট্টা করে আর সঙ্গে ফুটনোট দিতে হয় না যে এটা ঠাট্টা। আগে হ’লে এতক্ষণ ঠিক কাঁদতে বসতে, সেই সেবার শান্তিনিকেতনে—” “সে পুরনো কথা থাক এখন, তার চেয়ে একটা দরকারী কথা শুনুন। আপনাদের ওখানে আপনার জানা কোনো ভাল পাত্র আছে?” “দেখ হে, সীমন্তিনী, আমার জানা একটি মাত্র পাত্র আছে, অতি সংপাত্র বলেই আমার বিশ্বাস, কিন্তু তোমাদের ধারণায় তার একটু বয়স বেশী হয়ে গেছে! কাজেই সে ত হবে না।”

“যদি গৃহিণী হ’তে তাহলে এমন কাজ করতে না।” “কী করলুম আমি।” “গাড়ীখানা ত নষ্ট করতে বসেছ। এই বর্ষায় পাহাড়ে রাস্তায় ছুবেলা ডাক্তারকে নিয়ে ওঠা নাম।” “কিছু ক্ষতি নেই তাতে, গাড়ী ত চলবার জন্তই থাকে।” “তা বটে, কিন্তু তারও ত সীমা আছে—সেখানে তোমার সংসার, ক্ষণে ক্ষণে দরকার পড়ছে আর গাড়ী ছুটেছে। কাল যেই ত্রিফলার দরকার হল অমনি গাড়ী ছুটল, আমি ভেবে দেখলুম উচিত হয় না, তা ছাড়া ডাক্তারেরও ত কত অস্ববিধা হচ্ছে। কোথায় খায় কোথায় থাকে, যাওয়া, আসা।” “কিছুই অস্ববিধা নেই। আপনাকে আর অত ভাবতে হবে না।” “না ভাবতে হবে কেন? কিছুমাত্র ভাবতে হোতো না যদি তুমি একটু চিন্তাশক্তি ব্যয় করত।” “অচ্ছা সে হবে একটা ব্যবস্থা, এখন দিন আজকের কী কর্তব্য আছে?” “ওই যে ওই টেবিলে, তুমি যে দ্রুতগতিতে কপি চালাচ্ছ এখন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতে হবে আমার। তবে তোমার একটা সুবিধে, দেখে দেখে লিখে গেলেই হোলো, আমাকে যে ভেবে ভেবে লিখতে হয়, কাজেই দোষ নেই।” “আপনার আর একটা বই কপি করেছিলাম তার manuscript রয়েছে আমার কাছে, আপনি দিয়েছিলেন।” “ও, এটা ইঙ্গিতে

হোলো, যাকে বলে ইসারা? যাক বুঝে নিলাম কথাটা, কিন্তু কি বই সেটা?" "বাঁশরী।" বাঁশরী আবার কবে কপি করলে?" "কেন দার্জিলিঙে।" "দিও ত একবার দেখব।" "বাঁশরী দেখে বললেন—“দেখ এতে অনেক কিছু আছে যা পরে বাদ দিয়েছিলুম, কিন্তু সেগুলো অত অবহেলার যোগ্য ছিল না। এটা নিয়ে যাই কপি করিয়ে পাঠিয়ে দেব।” “তা

হয় না, দিতে পারব না, কপি করে দেব বরং।” “এত কখন কপি করবে?” “সে আপনাকে ভাবতে হবে না, কতক্ষণই বা লাগবে। কিন্তু আপনার হাতে দেওয়া মানে এ লোকের হাতে দেওয়া, সে হয় না।” “আচ্ছা কর তাহলে তোমার যা আছে কর্তৃত্বগে।”

প্রবাসী—চৈত্র ১৩৪৮

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির আবেদন

বর্তমান পরিস্থিতিতে পল্লী অঞ্চলে নারী-উন্নয়ন কার্য

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি, এইচ-ডি ; পি-আর-এস নিম্নলিখিত আবেদন করিয়াছেন :—

‘বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্ত সহস্র সহস্র মহিলা কলিকাতা সহর পরিত্যাগ করিয়া পল্লী অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাদের অনেকেই সুশিক্ষিতা। এই সকল শিক্ষিতা মহিলারা আজ পল্লীর সেবা করিবার—বিশেষ করিয়া তাঁহাদের পল্লীবাসিনী ভগিনীদের সর্বদ্বন্দ্বী কল্যাণ প্রচেষ্টার অপূর্ব সুযোগ পাইয়াছেন। এই সময়ে তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে বা সহরে “মহিলা সমিতি” গঠন করিয়া মহিলাদের নানাবিধ কুটীর শিল্প শিক্ষা, বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কার্য, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি এইরূপ মহিলা সমিতি গঠন ও পরিচালনে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং পূর্বে চারিশত মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই কার্যের জন্ত নারীমঙ্গল সমিতির পুরুষ ও মহিলা প্রচারকসম্মি এবং শিক্ষয়িত্রীগণ রহিয়াছেন। বর্তমানের প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন স্থানে প্রচারক ও শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া মহিলা সমিতি গঠন ও সূচীশিল্প, সেলাই, ছাঁটকাট, তাঁতবোনা, কার্পেট ও সতরফির আসন বোনা, চামড়ার উপর নক্সার কাজ, পিতলের উপর নক্সার কাজ ইত্যাদি শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মফঃস্বলের মহিলা সমিতির সভ্যাগণ মহিলাই হইবেন, তবে তাঁহাদের পুরুষ আত্মীয়গণ পরামর্শ-দাতারূপে এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। এ বিষয়ে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রধান কার্যালয় ২৩১ বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে সাধারণ সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।”*

* উল্লিখিত আবেদন সমস্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ফলে বহু স্থান হইতে সাড়া পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গের বহু পল্লী ও সহর হইতে মহিলা সমিতি গঠন করিবার উদ্দেশ্যে প্রচারক ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্ত অস্থায়ী শিক্ষয়িত্রী পাঠাইবার আবেদন আসিতেছে এবং সরোজনলিনী সমিতির কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা করিতেছেন। কেন্দ্র সমিতি এই সকল শিক্ষয়িত্রীর বেতন বহন করিবেন এবং মফঃস্বল সমিতি শিক্ষয়িত্রীগণের আহার ও বাসস্থান এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করিবেন। শিক্ষয়িত্রীগণ একস্থানে একমাস এবং প্রয়োজন হইলে দুমাস পর্য্যন্ত থাকিয়া বিভিন্ন শিল্প শিক্ষা দিবেন।

মহিলা-সমাচার

ত্রিভ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ

বিশ্ব বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী

কুমারী উর্শিলা মিত্র গত বৎসর মাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৬ টাকা বৃত্তি পাইতেছেন। এই বালিকা শিক্ষা পরিষদের শেষ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ২০১ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এবং



কুমারী উর্শিলা মিত্র

গুরুদাস পদক পাইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। তিনি গুড়ার স্বর্গীয় বেহারী লাল চন্দ্রের দৌহিত্রী ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যা।

লণ্ডনে বাঙ্গালীর মেয়ের জাতীয় সঙ্গীত

গত ২৬ শে জানুয়ারী ভারত স্বাধীনতা দিবস উৎসব সভার প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের “জনগণ মন” এবং অন্তর্ভুক্ত “বন্দেমাতরম” গান দুইটি গীত হয়। বেড্‌ফোর্ড কলেজের ছাত্রী বাঙ্গালীর মেয়ে কুমারী লক্ষ্মী সেন গুপ্তার পরিচালনায় লণ্ডনের সমগ্র ভারতবাসীদের উৎসবসভায় এই বাঙ্গালারই দুইটি মণীষীর গান হইয়াছিল। তাহার নিমিত্ত বঙ্গভাষাভাষী জনগণ মাত্রই গৌরব অনুভব করিতেছেন।

মহিলাদের আত্মরক্ষা সঙ্ঘ—সম্পত্তি কলিকাতা

উনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে ফাসিষ্টবাদ বিরোধী সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতার পৌরবাসিনীদের এক সভা হইয়াছিল। চীন মহাদেশে ও রুশদেশে ফাসিষ্টবাদী জাপান ও জার্মানদের অমানুষিক অত্যাচারে সেই দেশের জনগণের জীবন ও সম্পত্তি ভয়াবহরূপে ধ্বংস হইয়াছে, তাহার সম্যক পরিচর দিবার জন্ত এই সভা উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই সভা বিদেশীয় যে কোন আক্রমণ হইতে নারীগণকে রক্ষা করিবার জন্ত বেগাম সাকিনা মায়ুজুদ্দা, নাজিমুন্নিসা আমেদ, কুমারী সুখা রায়, কুমারী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গুলী, কুমারী মণিকুন্তলা সেন ও মিসেন্ ইলা রীডকে লইয়া আত্মরক্ষা-সমিতি গঠিত করিয়াছেন।

চীন রাজ্যের কনসল জেনারলের পত্নী ম্যাডাম সি, জে, পাউ, জাপানীরা কেমন অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা চীনের রমণীগণকে হত্যা করিয়াছে, তাঁহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, শিশুগণকে মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া হত্যা করিয়াছে, গৃহ জালাইয়া দিয়াছে তাহার চাক্ষুস বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি আরো বলেন, এই দ্রবুতদের অত্যাচারে চীন রমণীগণ বিচলিত না হইয়া সাহসের সহিত আজ চারিবৎসর সমান চীন বীরপুরুষগণের সহযোগে যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁহাদের চিত্ত ও বিত্ত নিয়োগ করিতেছে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী ও মিসেন পি, দে বলেন যে তাঁহাদের সম্মান, প্রাণ, ধনসম্পত্তি স্বামীপুত্রাদি রক্ষার জন্ত বাঙ্গালার নারীগণকে কঠোর ত্রুত গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের এই দুর্দিনে বাঙ্গালার রমণীরা বিচলিত ও শঙ্কিত না হইয়া দেশবাসীকে দৃঢ়তার সহিত অবগত করান যে বঙ্গরমণীগণ যে-কোন কঠোর বিপদ আশ্রুক, তাহার সততই পুরুষগণকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিবে।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত। মূল্য ১১০ মাত্র, ৫৪১ পৃষ্ঠা, প্রকাশক
এংলো-বেঙ্গলী কলেজ, কাশী ॥

গীতা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রধান উৎস। বহু সহস্র
বৎসর হইতে ভারতের সাধক, মনীষী, স্বধীগণ গীতার মাংসাত্ম্য
কীর্তন করিয়া তাহাদের গভীর জ্ঞানের ও সাধনার পরিচয়
দিয়া অমর হইয়া আছেন।

কাশীর অশীতিবর্ষের প্রধান জ্ঞানী, শিক্ষা ব্রতী, সাধক
চিরকুমার চিন্তামণি বাবু আজীবন গীতারই সাধনায় জীবনপাত
করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কর্মযোগী ও জ্ঞানী। তাঁহার
অর্জিত জ্ঞানালোকের রশ্মি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রতি
শ্লোকের সরল অর্থ ও সারল্যের মধ্যে উজ্জ্বলিত হইয়াছে।
সংস্কৃত না জানিয়া বাঙ্গলা ভাষাতে প্রতি শ্লোকের প্রকৃত গুহ

তত্ত্ব ও ভাব জানিবার পক্ষে এই পুস্তকখানি অত্যন্ত উপযোগী।
চিন্তামণি যে কেবল শ্লোকের অর্থ নিজে যেমন বুঝিয়াছেন
তাহাই লিখিয়াছেন, তাহা নহে। এই পুস্তকে ‘শ্রীঅরবিন্দ’,
‘শ্রীকৃষ্ণানন্দ’, ‘জগদীশ’, ‘হীরেন্দ্রনাথ’, ‘ভবানী শঙ্কর’,
‘তিলক’, ‘গীতানন্দ’, ‘বঙ্কিমচন্দ্র’, ‘প্রসন্নকুমার’, ‘সন্তদাস’,
ভুবনমোহন, প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের মত উদ্ধৃত করিয়া শ্লোক-
গুলির অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

সামান্য মাত্র ভাষাজ্ঞান থাকিলেই পাঠক ও পাঠিকাবর্গ
এই পুস্তক পাঠ করিয়া গীতার মূল মর্ম্ম অনায়াসে গ্রহণ করিতে
সমর্থ হইবেন। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের স্থূল প্রতিপাদ্য
বিষয়গুলি সহজে বুঝিবার জন্য প্রতি অধ্যায়ের শেষে সার অংশ
প্রদত্ত হইয়াছে; এই গীতা-মেয়েরা সহজে পাঠ ও বুঝিতে
পারিবেন।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

কেন্দ্র সমিতি

রাজসাহী নারীমঙ্গল সমিতি

রাজসাহীর নারী-আন্দোলনকে সজীবভাবে পরিচালনা
করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্তা সত্যবতী দেবীর সভানেত্রীত্বে পরি-
চালিত স্থানীয় মহিলা কর্মীবৃন্দের এক সভায় ‘রাজসাহী নারী-
মঙ্গল সমিতি’ নামে একটি স্থায়ী মহিলা প্রতিষ্ঠান গঠিত
হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সুনীতিরানী দেবী সমিতির সভানেত্রী,
শ্রীমতী পঞ্চজ ভট্টাচার্য্য সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা ও শ্রীযুক্তা
অন্নপমা দেবী সংগঠন সম্পাদিকা নির্বাচিত হইয়াছেন। গঠন-
মূলক কার্যের প্রথম পাদক্ষেপ-রূপে সমিতি শীঘ্রই একটি নারী
বিদ্যামন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা
সমিতির ক্রমোন্নতি আশা করি। এই সমিতি সরোজনলিনী
নারী মঙ্গল সমিতির সহিত যুক্ত হইয়াছে।

গুরুসদয় স্মৃতি রক্ষায় কলিকাতা কর্পোরেশন

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি ও
ব্রতচারী সজ্জ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাঙ্গলাদেশের যে প্রভূত উন্নতি
করিয়া গিয়াছেন তাঁহার কীর্তি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার
জন্য তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার ভীটা ৬১ ষ্টোর রোড
ভবনের সম্মুখস্থ রাস্তার নাম ষ্টোর রোডের পরিবর্তে ‘গুরু
সদয় দত্ত রোড’ নাম করন কলিকাতা কর্পোরেশনের পৌর
সভার সভ্যগণ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের
গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার উদ্যম দেশবাসী সাদরে ও
সম্মানে গ্রহণ করিতেছেন।

যারা আজও ভয় জানে না

সম্প্রতি বোম্বাই-এর সচিত্র সাপ্তাহিক “ইলাস্ট্রেটেড উইকলি”তে “যারা আপনার চায়ের পাত্র জোগায়” এই নামে অ্যান্ডাস্ সাদারল্যাণ্ডের লেখা ভারি চমৎকার একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। ভারতীয় চা-শিল্পের স্বচনা, সেই পুরানো আমলে পাশ্চাত্যের ক্রমবর্ধমান চায়ের চাহিদা মেটাবার জন্ত চায়ের জাহাজগুলো ভারতবর্ষ থেকে কত সমুদ্র পেরিয়েই না বিদেশ যাত্রা করতো! সেই সেদিনের পাল-তোলা জাহাজ-গুলোর সঙ্গে একদিকে কত বিচিত্র যাত্রার মোহময় স্থিতি, অত্ৰদিকে চা-শিল্পের শৈশবের কত কাহিনীই না জড়িত হয়ে আছে! পুরোনো দিনের সেই মনোহর ছবিগুলোকে স্মরণ করে’ নিষ্ঠার সাদারল্যাণ্ড লিখছেন :

“সেই যে কবে প্রথম চা-ভর্তি জাহাজ কলকাতা থেকে লগুনের দিকে যাত্রা করেছিলো, তা’ আমি বলতে পারবো না; কিন্তু আজকের দুঃখ-হৃদশাময় দারুণ হুদিনে আমার মন সেই প্রথম জাহাজটির দিকেই ছুটে যায়, আর আমি ভাবি যে সেই জাহাজের কাণ্ডেই যদি আজ হঠাৎ ফিরে আসতো, তাহলে সে কী ভাবতো? সে কি বিশ্বাস করতো যে মাত্র পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ডের জায়গায় ১৯৪১ সালে ব্রিটেন তিরিশ কোটি পাউণ্ড চা খেয়েছে আর পৃথিবীর লোক আজ প্রতি বছর গড়ে ২০০ কোটি পাউণ্ড করে’ চা খাচ্ছে?

“আজকের দিনে অগণিত মানুষ যখন বর্বর বিমান-আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্তে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে, তখনও যে তারা কলনার অতীত দুঃখ ও বিভীষিকা সহ্য করবার মতো

শক্তি চায়ের পেয়ালাতেই খুঁজে পায়, একথা কি সেই কাণ্ডেই আজ বিশ্বাস করতে পারতো?

“ছেলেবেলায়—‘চা’—এ একটি কথা কত উদ্দাম কল্পনা, কত মোহময় ছবিই না মনে জাগিয়ে তুলতো! বড় বড় পাল-তোলা জাহাজ আর ছোটো ছোটো নৌ হুদ; সিংহলের রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্রতীরে গোখুলি-বর্ণা মেয়েরা; ভারতের উত্তপ্ত সমভূমি, আর সুদূর চীনদেশের রহস্য! কিন্তু সেই সঙ্গে আজ মনে আসে নির্ভীক সেই সব ছোটো ছোটো জাহাজের কথা, যারা সমস্ত বিপদের মধ্য দিয়ে মাথার উপরের ও জলের নিচের শত্রুকে উপেক্ষা করে’ সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। রাত্রিতে ডুবো জাহাজ আর দিনের বেলায় বোম্বার্ক বিমান, এবং মানুষের মন মানুষকে মারবার জন্তে আরো বা-কিছু ভয়ঙ্কর জিনিষ আবিষ্কার করেছে, চুষক মাইন ইত্যাদি সেই সব বিপদকে যারা তুচ্ছ করে’ চলে।”

এই রকম আরো অনেক কথার পর লেখক বলছেন :

“আপনি যদি এক লাইনের একখানা চিঠি লিখে দেন তাহলে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় আপনার বন্ধুবান্ধবের কাছে এক প্যাকেট ভারতীয় চা পৌঁছে দেবার যে ব্যবস্থা আছে, যুদ্ধের সময়ও সে-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু দু’দল কঠোর পরিশ্রমী, নির্ভীক লোকের জন্ত। এরা হচ্ছে চা-বাগানের মজুররা—প্রধানত যারা এদেশে চা-য়ের পাতা উৎপন্ন করে, আর নাবিকেরা যারা শত বিপদের মধ্য দিয়েও এই পাতাটি হাজার হাজার মাইল দূরে নিয়ে পৌঁছে দেয়।”

আর ডাক্তারের আবশ্যক নাই

৭ টি

মাত্র নির্দোষ ঔষধপূর্ণ পকেটকেস রাখিয়া গৃহলক্ষ্মীরা পারিবারিক চিকিৎসা করুন। বিনা মূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

ইলেকট্রো আয়ুর্বেদিক ফার্মেসী (স্থাপিত—১৯০২)

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দোতলা) কলিকাতা।

বঙ্গলক্ষ্মী



বুদ্ধদেব সশস্ত্র যুদ্ধরত শাকা ও কৈল গণের মধ্যে অহিংসা মন্ত্র প্রচারে
যুদ্ধ নিবৃত্তি করিতেছেন।



সপ্তদশ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

৭ম সংখ্যা

বুদ্ধ পূর্ণিমা

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু

সমগ্র পৃথিবী আজ হিংসায় উদ্ভূত। কি ভীষণ দাবানল জলে উঠেছে, মানুষে মানুষে হানাহানি কাটাকাটি, হত্যার তাণ্ডব নৃত্য চলেছে, রক্তের শ্রোতে বুঝিবা সমস্ত পৃথিবীর বক্ষই ভেসে যায়।

এই নৃশংস হত্যালীলার মধ্যে, এই নিদারুণ অশান্তির মধ্যে আজ আমরা অহিংসা, করুণা ও মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক শ্রীবুদ্ধদেবের প্রতি আমাদের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতে উপস্থিত হয়েছি। এই হৃৎ তপে দগ্ধ পৃথিবীতে তাঁহার জন্মদিনে। হৃৎ তপে দগ্ধ, মৃত্যু ব্যথার পরিম্লান, নিরাশা হতাশায় জর্জরিত মানুষকে শান্তির পথ দেখিয়ে দেবার জন্য বিধাতা তাঁকে আজিকারই মত এক বৈশাখী পূর্ণিমায় এই পৃথিবীতে এনেছিলেন।

আবার এমনি এক পুষ্যা বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে মানবকে জরা মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার করবার জন্য তিনি যে মহা তপস্যায় রত হয়েছিলেন তাতে সিদ্ধকাম হয়ে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

আবার এই বৈশাখী পূর্ণিমাতেই তিনি নখর দেহ ত্যাগ করে মহাপরিনির্বাণ লাভে অমরধামে অমরদিগের সহিত মিলিত হন।

আজ আড়াই হাজার বৎসর ধরে এই ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে যিনি নতুন রূপ দান করে, তাঁর অহিংসা ও মৈত্রীর বাণীতে ভারতবাসীর চিত্তকে শান্তিতে ভরে রেখেছিলেন,

অশান্তিময় জগতে শান্তি ও মৈত্রীর স্বর্গীয় আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছিলেন, আজ সেই আদর্শ খুলায় নুষ্টিত হতে দেখে আমরা মর্ম্মাহত হয়েছি, আজ মনে হচ্ছে শ্রীবুদ্ধদেবের এ পৃথিবীতে আগমন যেন ব্যর্থ হয়ে গেল।

আজ প্রেমের অবতার শ্রী ঈশা এবং অহিংসা, মৈত্রী ও করুণার অবতার শ্রীবুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে যে নৃশংস হত্যালীলা চলেছে তাতে পৃথিবীতে এক মহা প্রলয় উপস্থিত হয়েছে।

আজ এই মহাবিপ্লবের মাঝে দাঁড়িয়ে আজিকার এই পূণ্য দিনে বুদ্ধের শান্তির বাণী আমাদের প্রাণে অমৃত সিঞ্জন করুক। আজ হিংসায় উদ্ভূত পৃথিবীর হানাহানি কাটাকাটির মাঝে তাঁর সেই ধ্যানরত শাস্ত সমাহিত মুক্তি আমাদের অশান্ত ও হার্ষ প্রাণে অভয় বাণী ধনিত করুক।

এই নৃশংস প্রলয়ের ঝড়বাত্যা হতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা কী মহামঙ্গল উদ্ধৃত করবেন তিনিই জানেন। যিনি এই দেবদুর্ভাগ্যিত ভারতে শ্রীবুদ্ধকে আনয়ন করেছিলেন, তিনি সেই দেশকে ধ্বংস করবেন না, ইহা আজ আমরা বিশ্বাস করি।

বৈশাখী পূর্ণিমা,
বুদ্ধাব্দ ২৪৮৬
(খৃঃ ১৯৪২)

কবীরের সাধন স্থান—বারাণসী ধাম

শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ

যুগ যুগান্তর হতে শত শত সাধক ভারত-সংস্কৃতির উৎস বারাণসী ধামে সাধনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। এই বারাণসীতেই জ্ঞান ও প্রেমের সাধকগণ তাঁহাদের সাধনার ফল পরিবেশন করিয়া ধ্বজ ও গণ্য হইয়া রহিয়াছেন। পুণ্য ভূমির আবহাওয়াতে কত মানবের চিত্ত স্ফুর্জিত ও সিক্তি লাভ করিয়াছে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে এই বারাণসীর এক জোলা তাঁতী পল্লীতে পৃথিবীর এক মহাত্মা আলোক দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব মানবের মধ্যে একই ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া জাতি ও ধর্মের সমন্বয় করিবার পথ সূচন করিয়া দিয়াছিলেন।

সেই মহাত্মা কবীরের জন্ম বৃত্তান্ত অনেক রহস্যজালে জড়ীভূত রহিয়াছে। তাঁহার জন্মদিনেরও কোন সঠিক তথ্য নিরূপিত হয় নাই। তবে তিনি ১৫০৫ সালের কয়েক বৎসর পর গোরক্ষপুর জিলার অন্তর্গত “মগড়” বা মচা গ্রামে তাঁহার নখর দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথা অনেক স্মৃধীগণ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রধান প্রমাণ—কবীরের বিরুদ্ধে তাঁহার মাতা ও স্বদেশবাসীগণ তাঁহার নব ধর্মমত প্রচারের জন্ত সেকান্দার শাহ বাদশাহের নিকট অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। সেকান্দার শাহ এই সময়ে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কবীর মুসলমান তাঁতী গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে তাঁর মাতা একজন হিন্দু বিধবা ছিলেন। তাঁহার মাতার বৈধব্য অবস্থায় এক হিন্দু সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদে কবীর সেই হিন্দু বিধবার গর্ভে জন্ম লাভ করেন। কবীরের মাতা কলঙ্কের ভয়ে সদ্যজাত শিশুকে জোলা পল্লীর প্রান্তে এক বৃহৎ জলাশয়ে কমল বন মধ্যে ভাসাইয়া দিয়া যান। প্রত্যুষে জনৈক মুসলমান তাঁতী তাঁহাকে দেখিয়া নিজগৃহে লইয়া যান এবং তাঁতী সম্প্রতি অপুত্রক থাকায় সানন্দে নিজ পুত্রবৎ কবীরকে লালিত পালিত করেন। কানীর ‘কবীর চৌরা’ মহত্মা হইতে বেনারস ছাউনী (ক্যান্টনমেন্ট)

যাইবার পথ পার্শ্বে “লহরীয়া তাল্লাও” নামক পুষ্করিণীর তীরে এক উচ্চ টীলা কবীরের আবির্ভাব স্থান বলিয়া এখনও কানীর হিন্দু মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন।

কবীর মুসলমান তাঁতীর গৃহে লালিত পালিত হইয়া বয়স বয়স শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বাল্যে ইসলাম ধর্ম অমুশীলন করিতেন। জোলাদের রীতি অনুসারে অল্প বয়সে এক মুসলমান তাঁতী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি বয়স বয়স করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলের ভরণ পোষণ করিয়া যাহা উদ্ধৃত হইত সব অর্থ দীন দুঃখীদের বিতরণ করিয়া দিতেন। স্বয়ং অনাড়ম্বর ও সরল জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

অল্প বয়স হইতে কবীরের চিত্তে ধর্মভাবের উদ্রেক হইয়াছিল তিনি তাঁহার জাত ব্যবসা করিতে করিতে ভগবৎ প্রেমে আকুল হইয়া পড়িতেন এবং সাধন ভজনের জন্ত গুরুর সন্ধানে দিবারাত্র ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন। তিনি সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন। মানুষে মানুষের মধ্যে বে ভেদ ভাব রহিয়াছে, যাহা মানব জীবনের অশান্তির মূল কারণ, তাহার বিনাশ করিবার জন্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। সংস্কৃত লাতিনের জন্ত তিনি সমগ্র বারাণসী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

বারাণসী ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র ভূমি, হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের উৎস, ন্যায় তর্কের প্রধান ক্ষেত্র, বিশ্বনাথের রাজ্য, তথাপি এখানে ভক্তির নদী সবেগে চির প্রবাহিত। তাই কবীরের প্রাণে প্রেম বজ্রা ছুটিল—তিনি আকুল হইয়া ছুটিতে লাগিলেন; পূর্ব্বজন্মের সাধন বলে অচিরে তিনি সঙ্গুকের সন্ধান পাইলেন।

তখন বারাণসী ধামে বৈষ্ণব চূড়ামণি রামানন্দ সাধন ভজন করিতেন। তাঁহার উদারমতি, সর্ব্বজীবে ঈশ্বর অনুমতি,

জাতি বিভেদ জ্ঞান রহিত জ্ঞান দেখিয়া কবীর রামানন্দকে গুরু রূপে গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। কবীর রামানন্দের নিকট দীক্ষা লইতে গমন করিলেন—কিন্তু রামানন্দ যখন কবীরকে দীক্ষা দিতে অস্বীকার করিলেন। এই ভেদ ব্যবহারে কিন্তু কবীরের মন বিচলিত হইল না। উত্তরোত্তর রামানন্দের প্রতি তাঁহার অমুরাগ বৃদ্ধিই পাইল। তিনি রামানন্দের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে বহুপরিকর হইলেন।

কবীর অবগত হইলেন, রামানন্দ এক গ্রহর রাত্রি থাকিতে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে গমন করিতেন। এক শীতের অন্ধকারে রাত্রিতে রামানন্দ যে ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন তাহার সোপানের উপর স্বামিজীর উঠিবার পথ রোধ করিয়া অলক্ষ্যে শুইয়া পড়িলেন। রামানন্দ স্নানের শেষে সোপান শ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া উপরে উঠিয়া আসিবার সময়ে কবীরের দেহোপরি পদার্পণ করিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ইষ্ট মন্ত্র “রাম কহ, রাম কহ” বলিয়া উঠিলেন। রামানন্দের মুখনির্গত এই বাক্যই গুরুর দত্ত ইষ্ট মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কবীর জপিতে লাগিলেন। সেই মন্ত্রের সাধন বলেই কবীর পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ যে মানবধর্মের বিরোধী তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি সর্ব ধর্ম মধ্যে ঈশ্বর লাভের একটি পথই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আজীবন তিনি সর্ব ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সমতাব স্থাপনের ও পরধর্ম প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিপোষণ নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। “রাম রহিম না যুদা করজী”—এই মত প্রচার করিতেন এবং তাহার অনুমোদনে বহু গাঁথা ও গান রচনা করিয়া গিয়াছেন—কবীরের “সাক্ষী”র দোহা গুলি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিবার বিশেষ সহায়তা করিবে।

কবীর মুসলমান হইয়া মালা জপিতেন এবং তিলক ধারণ করিতেন। তাঁহার সাধনায় ও জ্ঞানে আকৃষ্ট হইয়া বহু হিন্দু ও মুসলমান কবীরের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যরা “কবীর পন্থি” নামে পরিচিত। আজও লক্ষ লক্ষ “কবীর পন্থি” সমগ্র ভারতে দেখা যায়। কবীর পন্থীদের উপসনার প্রধান রীতি কবীরের বাণী ভজন, কবীরের ‘সাক্ষী’ পঠন ও নাম কীর্তন। কবীর পন্থীগণকে নিয়মিত মালা জপ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে জাতি ভেদ নাই, তথাপি সকল জাতিরই ব্যক্তি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য পালন করিয়া চলিতে পারেন। বিবাহ অ-গোতলিক প্রণালীতে হইবার রীতি। কটি বদল বা ‘চৌকা আরতি’ করিলেই বিবাহ সিদ্ধ।

বিবাহের পূর্বে বর কনের পরস্পর মত গ্রহণ করা চাই। একটি মস্তিকার বেদী নির্মাণ করিয়া তার চতুষ্কোণে কদলী বৃক্ষ স্থাপন করিয়া, বেদীর উপর মধ্য ভাগে গ্রন্থ রক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। বর ও কণে এই বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই বেদীর সম্মুখে

বসিয়া ভজন ও আরতি করিবার নিয়মকে “চৌকা আরতি” প্রথা বলে।

বারাণসী সহরে ‘কবীর চৌরা’ নামে যে মহাঙ্গা আছে তাহাই কবীরের সাধন ভজন স্থান। বারাণসীর সীমান্তে যে সারনাথে বুদ্ধদেব তাঁহার সাধনার ফল প্রথম প্রচার করিয়া ছিলেন তাঁহার স্মৃতি যেমন বারানসী এখনও বক্ষে ধারণ করিয়া গরীয়ান, তেমনই শঙ্কর, চৈতন্য, ভাস্করানন্দ, ত্রৈলোক্যস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ মৃতি ও মঠ বিরাজিত থাকায় বারাণসী পুণ্য ধাম। তেমনই দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বহু সাধু সন্ন্যাসীর সাধন স্থান, মঠ, মন্দির, ঘাট বারানসীর শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। তেমনই



কবীরের সাধন স্থানের নব নির্মিত মন্দির।

কবীরের সাধন ভজন স্থানে এক বিরাট শুদ্ধ বহু চূড়া সমন্বিত প্রস্তরের কারু কার্য মণ্ডিত শুদ্ধ একটি নতুন মন্দির স্থাপন করিয়া ‘কবীর পন্থি’গণ সেই মহাত্মার স্মৃতি চির জাগরুণ রাখিবার চেষ্টা করিয়া দগ্ধ হইয়াছেন।

বারাণসীর কবীর রোডের উপরিস্থিত কাশীর প্রধান কিং

এডওয়ার্ড হাঁসপাতাল ও ঈশ্বরী প্রসাদ জেনানা হাসপাতালের পশ্চিম উত্তর কোণে 'কবীর চৌরা' অবস্থিত। এক বিরাট প্রাঙ্গন, তাহার চারিদিকে—একতলা বহু কুঠারি বেষ্টিত হইয়া নিশ্চিত। তাহার পশ্চিম অংশে একটি বৃহৎ দালান মধ্যে অতি মনোরম কবীরের চিত্র, পাঠকা, শিরভূষণ ও বৃহৎ জপমালা সংরক্ষিত রহিয়াছে। প্রতি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় এই স্থানে কবীর "সাথী" পাঠ, ভজন ও আরতি হইয়া থাকে। বিস্তৃত প্রাঙ্গনের দক্ষিণাংশে কবীরের উপদেশ দিবার স্থানে



কবীরের বাণী প্রচারের স্থানের উপর নব নির্মিত মণ্ডপ।

নব নির্মিত বিরাট পাথরের মন্দির অবস্থিত। উত্তরাংশে কবীর যে গুহাতে অবস্থান করিতেন তাহা সুরক্ষিত রহিয়াছে। এই গুহার পার্শ্বে কবীরের কয়েকজন প্রধান শিষ্যের সমাধি দেয়া যায়।

স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনই মনোরম। প্রকৃত একটি আশ্রম। বর্তমান মঠাধিপ ১০৮ স্বামী শ্রী রামবিলাস সা অতি সজ্জন ও সরল প্রকৃতির সাধক। তিনি অমুগ্রহ করিয়া প্রাঙ্গনের চারিদিকের কুঠারিতে যেখানে ভক্তেরা অবস্থান করেন, আশ্রমের দক্ষিণ কোণে কবীরের মাতা পিতার ও আশ্রয়ের সমাধি মন্দির, কবীর পন্থীদের বৃহৎ বিদ্যালয় গৃহ ও মণ্ডপ প্রভৃতি স্বয়ং দেখাইয়া দিলেন। গত ২৫ শে পৌষ নব নির্মিত মন্দিরের স্থাপনা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় ৭০ হাজার নর নারী জমা হইয়াছিল এবং প্রচুর প্রসাদ তিন দিন পাইয়া ধস্ত হয়।

আশ্রয়ের বিষয় আমাদের কলিকাতার স্থায় মহানগরীতে একটি বিদ্যাসাগর বিধবা আশ্রম, একটি সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি, একটি হিরন্ময়ী বিধবা আশ্রম, একটি অনাথ আশ্রম পরিচালন করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহে কত বাধা ও কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু এই রূপ ধর্ম উৎসবে কেমন সহজে এক এক দিনে শত সহস্র মুদ্রা ব্যয় ও সংগ্রহ হইয়া থাকে। কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা মন্দির বা মঠ নির্মাণে ভক্তেরা অকাতরে দান করেন। ইহাই ভারতের সাধনার বৈশিষ্ট্য।

কবীর যেমন আজীবন হিন্দু মুসলমানকে সমান ভাবে দেখিয়া গিয়াছেন তাহার দেহান্তে তাহার নখর দেহ তেমনই সমান ভাবে বিভাগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন।

এক কাহিনী প্রচলিত আছে, কবীর বলিয়াছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণ তাঁহার দেহ সমান ভাবে ভাগ করিয়া নিজ নিজ অভিরুচিমত কবর বা দাহ করিতে পারিবে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার দেহ আপাদমস্তক শুভ্র বস্ত্রে আবরিত করিয়া রাখা হয়। যখন হিন্দু ও মুসলমানগণ মধ্যে কে মস্তক অংশ গ্রহণ করিবে, কে নিম্নাংশ গ্রহণ করিবে এই বিষয় লইয়া বাদামুত্বাদ চলিতে থাকে তখন তাঁর প্রধান শিষ্য বস্ত্র উত্তলন করিয়া দেখেন যে কবীরের সমস্ত দেহ স্বৈত পদ্ম স্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার ভেদ জ্ঞান ভুলিয়া মহানন্দে পুষ্পরাশি সমান ভাগ করিয়া লইয়া বান। হিন্দুরা দাহ করেন এবং মুসলমানরা সমাধি প্রদান করেন।

বর্তমান সম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি কবীরের 'সাথীর' বাণী পাঠ করেন, তাহা হইলে এই বিদ্রোহানল নিকাশিত হইবে এবং দেশের উপকার হইবে।

বঙ্গদেশ

শ্রীগণপতি সরকার

কালজবল চক্র

গ্রহ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
বর্ষপতি বল	০	১৫	০	০	০	০	০
মাসাধিপতি বল	০	৩০	০	০	০	০	০
দিবাধিপতি বল	০	০	০	৪৫	০	০	০
দণ্ডপতি বল	০	০	০	০	৬০	০	০
পক্ষ বল	৩২	২৮	৩২	২৮	২৮	২৮	৩২
দিবারাত্রি বল	৬০	০	০	৬০	৬০	০	৬০
কালবল সমষ্টি	৯২	৭৩	৩২	১৩৩	১৪৮	২৮	৯২

উচ্চজবল সাধন

এই উচ্চজবল সাধনে নৈসর্গিক শক্তি মিত্র সম প্রয়োজন। ইহাই গ্রহকারের অভিপ্রায় বলিয়া অনুমিত হয়।

গ্রহের উচ্চ বা তুঙ্গ গৃহে ৬০ কলা বল।

„ মূল ত্রিকোণ „ ৪৫ „ „

„ স্বক্ষেত্রে ৩০ „ „

„ মিত্র „ ১৫ „ „

„ সম „ ৭২ „ „

„ শত্রু „ ৩৬ „ „

„ নীচ „ ০ „ „

গ্রহ অন্তগত বা দক্ষ হইলে ০ „ „

গ্রহ ৪র্থ কেন্দ্রে থাকিলে ১৫ „ „

„ ৭ম „ „ ৩০ „ „

„ ১০ম „ „ ৪৫ „ „

„ লগ্ন „ „ ৬০ „ „

উদাহরণ কোণী হইতে :—উচ্চবল সাধন।

গ্রহ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	শুক্র	শুক্র	শনি
উচ্চ	৬০	০	০	০	০	০	০
মূল ত্রিকোণ	০	০	০	০	০	০	০
স্বগৃহ	০	০	০	০	০	৩০	০
মিত্র গৃহ	০	০	০	০	০	০	০
সম গৃহ	০	৭১৩০	০	০	০	০	০
শত্রু গৃহ	০	০	০	০	৩১৪৫	০	৩১৪৫
নীচস্থ	০	০	০	নীচস্থ	০	০	০
অন্তগত	০	০	অন্তগত	০	০	০	০
লগ্নস্থ	০	০	০	০	০	০	০
৪র্থস্থ	০	০	০	০	০	০	০
৭মস্থ	০	০	০	৩০	০	০	০
১০মস্থ	০	০	০	০	৪৫	০	০
যুদ্ধ	০	০	০	০	০	০	০
যোগফল	৬০	৭১৩০	০	৩০	৪৮১৪৫	৩০	৩১৪৫

যুদ্ধবল—মঙ্গল বৃহ বৃহস্পতি শুক্র ও শনি ইহাদের পরস্পর মিলনকে (অর্থাৎ এক রাশিস্থ হইল) গ্রহ যুদ্ধ কহে । চন্দ্রের সহিত উহাদের মিলনকে সমাগম ও রবির সহিত মিলনকে অন্তঃগমন কহে । গ্রহ যুদ্ধে যে গ্রহের ক্ষুদ্র অধিকাংশ হইবে, সেই গ্রহ উত্তরায়ণচারী এবং জয়ী হয় । জয়ী গ্রহ পূর্ণবল পাইবে । উদাহরণ কোষ্ঠীতে গ্রহযুদ্ধ নাই । তাহা পূর্বেই উচ্চজবল সাধন চক্রে দেখান হইয়াছে ।

দিগ্বল সাধন :—

লগ্ন পূর্বদিক্, ৪র্থ উত্তর দিক্, ৭ম পশ্চিম দিক্ এবং দশম দক্ষিণ দিক্ ।

বৃহ ও বৃহস্পতি লগ্নস্থ হইলে দিগ্বলে বলীয়ান হয় ।

চন্দ্র ও শুক্র ৪র্থস্থ ,, ,, ,, ,,

শনি ৭মস্থ ,, ,, ,, ,,

রবি ও মঙ্গল ১০মস্থ ,, ,, ,, ,,

যে গ্রহ দিগ্বলী হইবে সেই পূর্ণবল পাইবে ।

উদাহরণ কোষ্ঠীতে—কোন গ্রহই দিগ্বল পাইল না । সুতরাং সকল গ্রহেরই দিগ্বল শূন্য ০ কলা ।

অয়ন বল সাধন :—

চন্দ্র, বৃহ, শনি দক্ষিণায়নে অয়নবলী হয় ।

রবি মঙ্গল বৃহস্পতি ও শুক্র উত্তরায়ণে অয়নবলী হয় ।

যে গ্রহ অয়নবল লাভ করে সেই পূর্ণবল পায় ।

রবির মকর সংক্রান্তি হইতে মিথুনের শেষ গমন পর্য্যন্ত (মাঘ মাসের আরম্ভ হইতে আষাঢ় মাসের শেষ পর্য্যন্ত) ছয় মাস উত্তরায়ণ । আর কর্কট সংক্রান্তি হইতে ধনুর শেষ গমন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ শ্রাবণের আরম্ভ হইতে পৌষ মাসের শেষ পর্য্যন্ত) ছয় মাস দক্ষিণায়ন ।

উদাহরণ কোষ্ঠীতে রবি মেঘে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসে জন্ম) একান্ত উত্তরায়ণে জন্ম জানা গেল । সুতরাং র, ম, বৃ, শু মকররাশি হইতে মিথুন মধ্যে থাকায় অয়নবলী ; ইহার প্রত্যেকেই বল ৬০ কলা হইল । শনি কর্কটে বলিয়া ৬০ কলা বল পাইল ।

চেষ্টা বল :—

এই চেষ্টা বল সাধনে গ্রহ কোন অবস্থায় চেষ্টাবল পায় তাহা দেখান যাইতেছে—

চন্দ্র—পূর্ণ চন্দ্রাবস্থায় অর্থাৎ পূর্ণিমায় চেষ্টাবল পায় ।

রবি—উত্তরায়ণে চেষ্টাবল পায় ।

ম, বৃ, শু এবং শনি বক্রী হইলে চেষ্টাবল পায় ।

এখন উদাহরণ কোষ্ঠীতে দেখা যাইতেছে,—

রবি উত্তরায়ণস্থ বলিয়া চেষ্টাবলী ৬০ কলা বল । অন্য কোন গ্রহই চেষ্টাবলী নহে ।

এখন এই চয়টি বল একত্র করে দেখান যাইতেছে, ইহাকেই ষড়বল বলে ।

গ্রহ	র	চ	ম	বৃ	শু	শ
স্থানবল...	১২৫	১৫২।৪১	১২৯।৩২	১২৮।১৩	২০৬।৪৭	১৮৭।১৪
কালবল...	৯২	৭৩।০	৩২।০	১৩৩।০	১৪৮।০	২৮।০
উচ্চজবল...	৬০	৭।৩০	০	৩০।০	৪৮।৪৫	৩০।০
দিগ্বল...	০	০	০	০	০	০
অয়ন বল...	৬০	০	৬০।০	০	৬০।০	৬০।০
চেষ্টা বল...	৬০	০	০	০	০	০

বলপিণ্ড বা যোগাক্ষ ৪৬৭	২৩৩।১১	২২১।৩২	৩৬১।১৩	৪৬৩।২	৩০৫।১৪	২৮৬।১২
রূপবল...	৭।৪৭	৩।৫৩।১১	৩।৪১।৩২	৬।১।১৩	৫।৫।১৪	৪।৪৬।১২

বল পিণ্ডকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া রূপবল পাওয়া গেল । ২২ এবং ২৩ শ্লোক অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, রবি ও বৃহস্পতি ৬।৩০ সাড়ে ছয় রূপের অধিক হওয়ায় পূর্ণবলী । সকল গ্রহ মধ্যে রবির রূপ বল অধিক হওয়ায় রবিই সর্বাধিক বলী গ্রহ ।

এই যে বল নিরূপণ হইল, ইহাতে স্থানবল ব্যতীত অন্য বল সাধনে জটিল অঙ্ক শাস্ত্র পরিহার করিয়া যথাসম্ভব সহজ উপায়ে বল নির্ণয় পস্থা দেখান হইয়াছে । ইহা স্থলভাবে বলকথা হইল । গ্রন্থকারের ২১ শ্লোক হইতে অনুমাণ করা যায় যে এ বিষয়ে মোটামুটি স্থল গণনাই তাঁহার যেন অভিপ্রায় ।

ভাবের বল নিরূপণ

ভাবের বল স্থির করিতে হইলে, ভাবাধিপতির বলপিণ্ডে ভাবের দৃশ্যল এবং ভাবের দৃশ্যল যোগ করিলে ভাবের বল জানা যায়। উদাহরণ কোণী দিয়া তাহা দেখান যাইতেছে,—গ্রহদিগের বল পূর্বেই স্থির করা হইয়াছে, সুতরাং গ্রহবাই যখন ভাবাধিপতি তখন ভাবপতির বল জানা গিয়াছে। এখন ভাবের প্রতি গ্রহদৃষ্টি অর্থাৎ ভাবের দৃগবল স্থির করা হইতেছে,—কোন গ্রহের কোন ভাবে কত দৃষ্টি তাহা হয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে, তদনুসারে “ভাবে গ্রহ দৃষ্টি চক্র” নিয়ে দেখান হইল,—

ভাবে গ্রহদৃষ্টি

লং	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম	১১শ	১২শ	
র ০	৬০	৪৫	৩০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৩০	
চ ৩০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৩০	০	৬০	৪৫	
ম ০	৬০	৬০	৩০	১৫	০	০	০	০	১৫	৬০	৩০	
বু ৬০	৪৫	৩০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	৩০	০	
বু ৪৫	৬০	০	৬০	৪৫	৬০	১৫	০	০	০	০	১৫	
শু ৩০	০	৬০	৪৫	৩০	১৫	০	০	০	০	১৫	৪৫	
শ ৬০	৪৫	৩০	০	৬০	৪৫	৩০	৬০	০	০	০	০	
সমষ্টি	২২৫	২৮৫	২২৫	১৮০	১৬৫	১২০	৬০	১০৪	৪৫	৭৫	২১০	১৬৫
পাপদৃষ্টি	৬০	১৬৫	১৩৫	৬০	২০	৪৫	৩০	৬০	০	৩০	১০৫	৬০
শুভদৃষ্টি	১৬৫	১২০	২০	১২০	৭৫	৭৫	৩০	৪৫	৪৫	৪৫	১০৫	১০৫

পাপদৃষ্টি বিরোগান্তে যোগাক্ষ

+১০৫, -৪৫, -৪৫, +৬০, -১৫, +৩০, ০, -১৫, +৪৫, +১৫, ০, +৪৫

লগ্নে শুভদৃষ্টি ১০৫ কলা, ২য় অশুভ দৃষ্টি ৪৫ কলা ইত্যাদি অর্থাৎ (+) যোগ চিহ্ন দ্বারা শুভ দৃষ্টির আধিক্য এবং (-) বিরোগ চিহ্ন দ্বারা পাপ দৃষ্টির আধিক্য বুঝিতে হইবে।

ভাবের দৃশ্যল

মেঘ, বৃষ, সিংহ, ধনুর দ্বিতীয়ার্দ্ধ (১৫ অংশের পর হইতে ৩০ অংশ) এবং মকরের প্রথমার্দ্ধ (০ হইতে ১৫ অংশ পর্য্যন্ত) হইলে ৪র্থ ভাগ হইতে বিরোগ।

মিথুন, তুলা, কুম্ভ, কন্টা ও ধনুর প্রথমার্দ্ধ হইলে ৭ম ভাব হইতে বিরোগ।

কর্কট, মীন, মকরের দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইলে ১০ম ভাব হইতে বিরোগ।

বিছা রাশি হইলে লগ্ন বা তনু ভাব হইতে বিরোগ।

লগ্নের দৃশ্যল :—

লগ্ন ৫ রাশি ১৬ অংশ ৩২ বিকলা, অতএব কন্টারাশি ; সুতরাং এই লগ্ন ভাবটি ৭ম ভাব হইতে বিরোগ হইবে,

৭ম ভাব . . . ১১।১৩।৩২

লগ্ন ভাব . . . ৫।১৩।৩২

৬। ০। ০

১ রাশিতে দশ কলা ধরিতে হইবে, সুতরাং ৬ রাশিতে (৬ × ১০) ৬০ কলা লগ্নের দৃশ্যল।

২য় ভাবের দিখল :—

২য় ভাব ৬।১২।৩৮ তুলা রাশি, সূত্রাং ৭ম ভাব বিয়োগ ১১।১৩।৩৯—৬।১২।৩৮=৫।০১। পাঁচ রাশি পাওয়া গেল, এজন্ত $৫ \times ১০ = ৫০$ কলা ২য় বা ৩য় ভাবের দিখল।

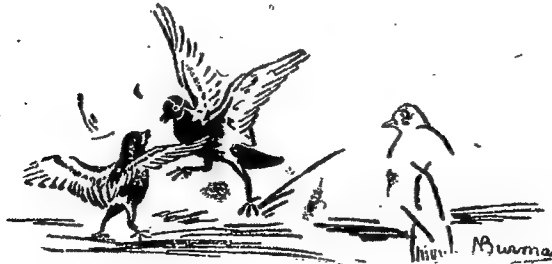
৩য় ভাবের দিখল :—

৭।১২।৩৮ বিছারাশি, এজন্ত লগ্ন ভাব বিয়োগ ৫।১৩।৩৯—৭।১২।৩৮=১০।১১। ছয় রাশির অধিক হইলে ১২ রাশি হইতে বিয়োগ করিতে হইবে, সূত্রাং $১২-১০=২$ রাশি। দুইকে দশ দিয়া গুল (২×১০) করিলে ২০ কলা হইলে ইহাই ৩য় (সহজ) ভাবের দিখল।

এইরূপে ৪র্থ ভাবের দিখল ৩০ কলা। ৫ম ভাবের ২০ কলা। ষষ্ঠ ভাবের ১০ কলা। ৭ম ভাবের ৩০ কলা। ৮ম ভাবের ৪০ কলা। ৯ম ভাবের ৫০ কলা। ১০ম ভাবের ৩০ কলা। ১১শ ভাবের ১০ কলা। ১২শ ভাবের ৪০ কলা দিখল।

ভাব	ভাবপতি বলপিণ্ড রূপ কলা বিকলা	দিখল কলা	দৃখল কলা	—ভাববল
লং	৬। ১। ১৩	৬০	১০৫	=৮।৪৬।১৩
২য়	৫। ৫। ১৪	৫০	—৪৫	=৫।১০।১৪
৩য়	৩। ৪। ৩৯	২০	—৪৫	=৩।১৬।৩৯
৪র্থ	৭। ৪। ২	৩০	৬০	=৯।১৩।২
৫ম	৪। ৪। ১২	২০	—১৫	=৪।৫১।১২
৬ষ্ঠ	৪৪। ৬। ১২	১০	৩০	=৮।২৬।১২
৭ম	৭। ৪। ২	৩০	০	=৮।১৩।২
৮ম	৩। ৪। ৩৯	৪০	—১৫	=৪।৬।৩৯
৯ম	৫। ৫। ১৪	৫০	৪৫	=৬।৪০।১৪
১০ম	৬। ১। ১৩	৩০	১৫	=৬।৪৬।১৩
১১শ	৩। ৫। ১১	১০	০	=৪।৩।১১
১২শ	৭। ৪। ২	৪০	৪৫	=৯।১২।০

দ্রষ্টব্য :—[গ্রহ স্ফুট, ভাব স্ফুট, গ্রহের বল ও ভাবের বল স্বল্পভাবে নির্ণয় করিবার নিয়ম “শ্রীপতি পদ্ধতি” অথবা “বিকল্পতোষণা” ও “সিদ্ধান্ত রহস্য” গ্রন্থে লিখিত আছে। যিনি স্বল্প ও বিশুদ্ধ ভাবে “বল নির্ণয়” শিখিতে বা কথিতে ইচ্ছা করেন, তিনি উপরোক্ত গ্রন্থের সহায়তা লইবেন।]



বাঁধ ও বন্যা

পূর্বাহ্নরস্ত্রি
শ্রীমনোজ বসু

তৃতীয় অঙ্ক

থানার একটি ঘর। টেবিলে স্তূপাকার ফাইল। তার সামনে ইন্সপেক্টর চেয়ারে বসিয়া আছে। তাহার সহকারী কোণে আলমারির ধারে কি খুজিতেছে। সামনের দিককার চেয়ারে জিলোচন ও সন্ধ্যারাপী। নন্দলাল টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

জিলোচন। (সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকাইয়া) ছুয়ারটা বন্দ করিয়ে দিন, হজুর! থানা বলে বিশ্বাস নেই—চেয়ার-টেবিল-ইট-কাঠগুলোরও কাণ থাকে!

[ইন্সপেক্টর মৃদু হাসিয়া সহকারীকে দরজা বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করিল]

উহ... ভাল করে খিল এঁটে দিন। (হাসিয়া) আমি আবার ও পক্ষের ম্যানেজার—তাদের নুন খাই-কি না!

সহকারী। তাই গুণ গাইতে এসেছেন!

জিলোচন। তা সত্যি। আমার অহুতাপ হচ্ছে...

নন্দলাল। তোমার অহুতাপ? হাসালে—

জিলোচন। তাই যেন মনে হচ্ছে, নন্দলাল। সে রামেশ্বর রায় নেই—যেন আর এক মাহুষ। দেখলে কষ্ট হয়। তা বলে আর পেছুবার জো নেই, হজুর! এদেরও আর এক তয়ফা নুন খেয়ে বসা হয়েছে কিনা...

সহকারী। না-না—পেছুবেন কেন? আপনারা অহুতাপ হলে পুলিশের কাজ অচল হয়ে যাবে।

ইন্সপেক্টর। তারপর নন্দলাল, আর কদুর এগুলো

বলো—

নন্দলাল। আমরা আপনার পরামর্শ মতো দিন চারেক গা ঢাকা দিয়ে আছি। সবাই জেনেছে,—কলকাতায় চলে গেছি। ফলও হয়েছে—

ইন্সপেক্টর। হ'তেই হবে। সুরমা দেবীকে বের করেছে?

নন্দলাল। করবে, আজকেই করবে। বলো না জিলোচন।

জিলোচন। আজ্ঞে হজুর, আজকেই করবে—রাত একটার সময়.....

সন্ধ্যারাপী। ইন্সপেক্টর বাবু, নিজে থানায় এসেছি ... লজ্জা করে থাকতে পারলাম না। রাজি একটার লগ্নে রামেশ্বর রায় তাকে রিয়ে করবে। তার আগে আমার মেয়েকে এনে দিন—

ইন্সপেক্টর। আমরা চেষ্টার ক্রটি করছি না রাণী মা, সমস্ত staff নিয়ে খাটছি, তবু কিন্তু সুরমা দেবীর trace হল না। বিয়ের খবর সত্যি ত?

জিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ—

নন্দলাল। বিরাম বাড়ীর মধ্যেই বিয়ে হচ্ছে। ভেবেছে, আমরা চলে গেছি, চারিদিক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর কি! (রুগ্ন কণ্ঠে) চুপ করে বসে আছ—সব চুকে গেলে ধীরে স্বস্থে ঘরে বসে অহুতাপ কোরো—

ইন্সপেক্টর। ম্যানেজার বাবু, আপনাকে কে বলেছে বিয়ের কথা।

জিলোচন। ঐ রায়মশাই বলেছেন—মানে, বলতে বাধ্য হয়েছেন। বললেন—‘ম্যানেজার, পুরুত দেখ,—জিনিষ পত্রের জোগাড় কর—যত পারো ফুল-টুল আনতে বলে দাও। আর তোমার বউ মেয়ে বোন-টোন ধারা আছেন, সবাইকে নিয়ে এসো।’ মেয়ে লোক না থাকলে হয়? কথাটা গোপন রাখতে আমাকে খুব করে বলে দিলেন।

সহকারী। আর শোনামাত্র আপনি ছুটে এসে এদের বললেন।

জিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ। না বললে, গাঁয়ের নন্দলাল আলাকে খুন করত। বুঝলেন না,...আগে যে মাথা খেয়ে রেখেছে।

সন্ধ্যারাণী। তাহ'লে ইন্সপেক্টর বাবু, আমরা সকলে বিয়ের সময় গিয়ে পড়ব ?

ইন্সপেক্টর। তাই যাবো রাণীমা। গিয়েও কত দূর কি হবে, জানি না। আপনার সাবালিকা মেয়ে স্বেচ্ছায় যদি বিয়ে করেন, ঠেকানো যাবে না।.....তবে সামান্যসামান্য জিজ্ঞাসা করা যাবে। তখন যদি তিনি ও পক্ষে বলেন—

সন্ধ্যারাণী। আমার সামনে হরমা কখনো বলবে না।

ইন্সপেক্টর। না বলেন, ভালই।

সন্ধ্যারাণী। আমারই ভুলে এই সর্বনাশ। নিম্নলের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, আমি জোর করে বাধা দিলাম। শেষকালে এই ঘটেছে। নিম্নলের সঙ্গেও যদি বিয়ে হ'ত। রামেশ্বরের মতো জানোয়ার হবে তার স্বামী—তার চেয়ে মেয়ে আমার মরে যাক। এ কিছুতে নিজের ইচ্ছায় হচ্ছে না, আমার মেয়েকে রামেশ্বর জাহ্নু করেছে। তাকে আমি ফাঁসি কাঠে ঝোলাব।

ইন্সপেক্টর। (হাসিয়া) এ অপরাধে ফাঁসি হয় না, রাণীমা।

নন্দলাল। (বজ্রকণ্ঠে) শ্যামল মজুমদারের হত্যার অপরাধে ?

ইন্সপেক্টর। তার প্রমাণ চাই। আপনারা কেবল সন্দেহ করছেন। সন্দেহ আর প্রমাণ এক নয়।

নন্দলাল। ঐ আংটি ?

ইন্সপেক্টর। ও আর কতটুকু ব্যাপার ? কত কৈফিয়ৎ হতে পারে।

নন্দলাল। আরও আছে। শ্যামলনাথ যখন মারা যান, অনেক দলিল-পত্র ছিল একথানা চামড়ার ব্যাগে। খুনি ব্যাগ গুলু নিয়ে যায়। তখন থানায় যে এজাহার দেওয়া হয়, তাতে সমস্ত লেখা আছে। সেই সব দলিল রামেশ্বরের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। কি হে ত্রিলোচন, বলো—

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হ্যাঁ,—সেই ব্যাগটাও রয়েছে। তাতে মজুমদার মশায়ের নাম লেখা। আমি চুরি করে দেখেছি।

সন্ধ্যারাণী। থানা তল্লাস করুন—আরও কত জিনিষ বেরবে !

নন্দলাল। সব চেয়ে বড় প্রমাণ, শ্যামল মজুমদার খুন হবার সময় আমি খুনীকে সড়কি মেয়েছিলাম। সড়কি বুকের বাদিকে এই—এইরকম জায়গায় লেগেছিল। এ কথাও সেই এজাহারে বিশেষ করে লেখা আছে। রামেশ্বর মোটে জামা খোলে না। রলো না ত্রিলোচন।

ত্রিলোচন। রায়মশায় দিন-রাত জামা পরে থাকেন, শোবার সময়ও খোলেন না, সেদিন তেল মাখবার সময়ও দেখি জামা গায়ে রয়েছে।

নন্দলাল। এতে সন্দেহ হয়, জামার নিচে আছে সড়কির দাগ।

সন্ধ্যারাণী। ইন্সপেক্টর বাবু, ওদের ধরে চালান দিন। আপনাদের কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

ইন্সপেক্টর। দেখা যাক।...তবে এই গোলমালে বিয়েটা আজকের মতো পণ্ড হতে পারে—

নন্দলাল। খুনেও ধরা পড়বে। দেখুন এই কাগজ পড়ে—এজাহারের নকলও আছে। পড়ে দেখুন—[ইন্সপেক্টরকে নন্দলাল কতকগুলি কাগজ দিল। তিনি পড়িতে শুরু করিলেন। মঞ্চ ঘুরিল]

বিরাম বাড়ির পিছন দিককার আটচালার বিয়ের আগর হইয়াছে, এক পাশে দালানের রোয়াকের খানিকটা দেখা যায়। পাশাপাশি দু'খানা সজ্জিত সিংহাসন, তার সামনে বিয়ের জায়গা। মাটিতে আলপনা, উপরে চাঁদোয়া, চারিপাশে ফুল চাঁদমালা প্রভৃতি ঝুলানো। অনেক প্রদীপ সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি এখনও জ্বালা হয় নাই। বিস্তর ফুল রহিয়াছে, দু'তিনটি ছোট মেয়ে তাহা সাজাইতেছিল। ত্রিলোচনের স্ত্রী সারদাও আসিয়াছে; সে বিয়ের আবহুসঙ্গিক ব্যবস্থা করিতে ঘর-বাহির করিতেছে। রামেশ্বর প্রবেশ করিল।

রামেশ্বর। এই যে, এঁরা কাজে লেগে গেছেন। বাঃ—বাঃ—। মেয়েরা হলেন লক্ষ্মী—তাদের ছাড়া শুভ কাজ হয়!...খুকীরা ফুল সাজাচ্ছে। [একটি ছোট মেয়ের কাছে আসিয়া রামেশ্বর গালে হাত দিয়া আদর করিল] সাজাও—ফুলে ফুলে আটচালা ঢেকে ফেলো।

কোন খুঁৎ রেখো না।...সিংহাসনও এসে গেছে? তোমার সব দিকে নজর ত্রিলোচন, ভালবাসো কিনা! বায়েরটা স্বরমার, ডাইনেরটা আমার।...একটু বসে দেখব?

[ঘোমটার মধ্য হইতে সারদা মাথা নাড়িল]

ত্রিলোচন। এখন বসবেন না, আগে বসতে নেই—

রামেশ্বর। বসলাম না...কাল ত আর ও কথা বলতে পারবে না! স্বরমাকে নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসব। (হাসিতে লাগিল)

ত্রিলোচন। লয়ের দেরি আছে, রায় মশায়, আপনি একটু শুয়ে থাকুন গে—

রামেশ্বর। থামা! আকল! নির্মল আর বলভ ওদিকে আটকা একলা তুমি খেটে মরছ! বাইরে থেকে এঁরা সব দয়া করে এসেছেন। আর আমি নিজে শুয়ে পড়ব!

ত্রিলোচন। সমস্ত দিন ছুটোছুটি করেছেন, যমুলে শরীরে জুং হতো!

রামেশ্বর। যুম কি কেনা গোলাম, যে বজ্জেই যুম? বুকের মধ্যে আনন্দের তুফান উঠছে। এরকম তোমার হচ্ছে না?

ত্রিলোচন। হচ্ছে হজুর—

রামেশ্বর। আবার হজুর? মানা করে দিইনি?

ত্রিলোচন। অভ্যেস—দোষ—এসো যায়—

রামেশ্বর। হজুর মরে গেছে, ত্রিলোচন। তুমি ছোট কিসে...বয়সেও আমার চেয়ে বড়।—না?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে—

রামেশ্বর। আজ্ঞে নয়—বলো—‘হ্যাঁ’। যাকে

‘হজুর’ বলতে হয়, তাকে ‘আজ্ঞে’ বলে। সে রামেশ্বর নেই। আজ আমি কারো কাছ থেকে দূরে থাকব না।

তোমাদের দশজনের সংসারে আমারও জায়গা মিলেছে...এতকাল পরে। তুমি আমার বড় ভাই ত্রিলোচন—আমি ছোট ভাই। বাহার বহুর বয়স আমার—তবু ছোট ভাই। (হাসিতে লাগিল) ঘড়ি দেখে এসো ত—

ত্রিলোচন। এখনো অনেক দেরি—

রামেশ্বর। অনেক দেরি...মিনিটগুলো মনে হচ্ছে এক-একটা ঘণ্টা। অপেক্ষা করতে পারব—এদিন

পেরেছি, ক’ঘণ্টা পারব না?...ত্রিলোচন, সাবান ঘসে ঘসে চান করিয়ে দিলে, ফুলেন তেল মাথালে—তার উপর আমি কি করেছি দেখ। জর উপরে দুটো পাকা লোম বিলী হয়েছিল...আয়না ধরে উপড়ে ফেলে দিলাম।...দেখ’ত তাকিয়ে, আর আছে কিনা। দেখত চোখের রুক্ষ নজর কোমল হয়েছে কিনা। [রোয়াকের দিকে আয়নার কাছে গিয়া নিজেই দেখিতে লাগিল] স্বরমা আসছে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে—তার মা আর নন্দলালকে উপেক্ষা করে। সে ভয় না পায়!

ত্রিলোচন। (ক্রত কণ্ঠে) রায় মশায়, একটা কথা বলি আপনাকে— [সে থামিয়া গেল]

রামেশ্বর। বলো...থামলে কেন?

ত্রিলোচন। বিয়েটা এখানে না হ’লেই ভাল হয়—

রামেশ্বর। (সুবিম্বয়ে) কেন?

ত্রিলোচন। ওরা যদি খোঁজ-খবর পেয়ে থাকে। তা হ’লে গুণগোল হতে পারে—

রামেশ্বর। ‘যদি’ হ’তে পারে—এই সব সম্মেহের বাত্বিক ছাড় দিকি ত্রিলোচন। মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখো...বুঝলে? শান্তি পাবে। [একটু চুপ করিয়া রহিল] এখানে বিয়ে হবে না, হবে কোথায় শুনি?

ত্রিলোচন। আর কোন জায়গায়। ধরুন—

রামেশ্বর। (হাসিয়া উঠিয়া ঘাড় নাড়িল) কত সাধ করে এঁরা সাজাচ্ছেন। আলপনা দিয়েছেন—আসন, পদ্ম, ঘট, লক্ষ্মীর পা...কোন ভাবনা নেই ত্রিলোচন, নিজেরা এই ক’জন ছাড়া আর কেউ জানে না!...কত বড়লোকের মেয়ে স্বরমা, কত সৌখীন—তাকে কি যেখানে সেখানে নিয়ে বসাতে পারি!...চিরকাল অবিশ্বাস করে এসেছে, ত্রিলোচন এবার পাটোয়ারি বুদ্ধিগুলো ছাড়—মানুষকে প্রাণভরে ভালবাসো—

ত্রিলোচন। (অত্যন্ত ক্রত) তা’হলে রায়মশায়, থুকীরাণী এলেই আপনি শিথিয়ে দেবেন, কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন বলেন—নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে হচ্ছে।

রামেশ্বর। তোমার হ’ল কি, ত্রিলোচন! একি শিথিয়ে দেবার কথা? পরের ইচ্ছেয় বরাবর কত কি হয়ে এসেছে, এবার নিজের ইচ্ছে বলেই না তাজ্জব।

[পুরোহিত প্রবেশ করিলেন]

লগ্নের কত দেরি, ঠাকুর মশায়?

পুরোহিত। আছে একটু—বেশি নয়। (সারদাকে লক্ষ্য করিয়া) ওসব কি করছেন? বরণ-ডালাও গোছানো হয়নি। আসুন...আসুন... (রামেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া) কে সম্প্রদান করবে।

ত্রিলোচন। আমি...আমি করব। খুসীরাণীর বাপের আমলের চাকর—

পুরোহিত। তা হলে বসে যান আসনে। আব্যধিক আরম্ভ করি।

[আরও কয়েকটি মেয়ে আসিয়া প্রদীপ জালিতে লাগিল]
রামেশ্বর। এঁরা কারা, ত্রিলোচন?

ত্রিলোচন। আমার স্বস্তুর বাড়ির সম্পর্কের। মেয়ে দু'চারজন বেশি না হলে জুং হয় না।

রামেশ্বর। বেশ করেছ, বেশ করেছ—[একটি মেয়ে একগাছা মালা আনিয়া রামেশ্বরের গলায় পরাইয়া দিল। মেয়েটির নাম কুমু] আমি স্বস্তুরা দিদির সম্পর্কে বোন হই। ভেবেছেন-চুপি-চুপি কাজ পেরে-সরে পড়বেন? সে হবে না। আমার পরে ভার—কি জানেন? বিয়ের পর আপনার পাকা গোফ সবগুলো উপড়ে তরুণ যুবক করে দেওয়া।

ত্রিলোচন। (আত্মদয়িকের আসন হইতে) পাকা মেয়ে...রায় মশায়কে বলতে সাহস হয়?

রামেশ্বর। বলুক...বলুক। এই সব শুনবার জন্ত রায় মশায় পাগল হয়ে আছেন। ইঁ্যাপো মেয়ে, গান গাইতে পার? সময় যে কাটে না।

ত্রিলোচন। ইঁ্যা...ইঁ্যা—সময় কাটছে, না। গা একখানা, কুমু।

[কুমু হাসিয়া ঘাড় দোলাইয়া রোয়াকে পা বুলাইয়া বসিল। রামেশ্বর নিচে বসিলেন। দুটি ছোট মেয়ে আসিয়া রামেশ্বরকে চন্দন প্রভৃতি দিয়া বর সাজাইতে লাগিল। ওদিকে বিয়ের আত্মদয়িক কাজকর্ম চলিতেছে। কুমু গান ধরিল।]

গান

বন-বিহঙ্গ ফিরে আসে নীড়ে—

নিষ্ঠুর বজ্র, বজ্র, বাদল—

কত না রয়েছে শিরে!

এবার আসিছে ফিরে...
ভাঙা পাখা কাঁপে থর-থর-থর,
গান নেই, শুধু কান্না-ব্যাকুল স্বর

এ সে আসিছে শ্রান্ত, শিথিল...ধীরে, অতি ধীরে।

চুপ! আজ কথা নয়—একটিও কথা নয়—

এ নিশীথ হোক কল্যাণ-মধুময়

মায়ের মতন চাঁদিমা চাহিয়া রয়

যেন ওর নীড়খানি ঘিরে।

[গান শেষ হইবার পর কোন দিক হইতে টং করিয়া ঘড়ির আওয়াজ আসিল। পুরোহিত ও ত্রিলোচন উঠিয়া দাঁড়াইল। ওদিককার কাজ হইয়া গিয়াছে]

পুরোহিত। একটা বাজল...লগ্ন আরম্ভ। এইবার আসা উচিত।

রামেশ্বর। আসিছে—আসিছে—এই এলো বলে—

ত্রিলোচন। বলে পাঠিয়েছেন ত ঠিক করে?

রামেশ্বর। ইঁ্যা—বলভ নিজে গেছে, নির্মল রয়েছে।

ঠিক ঘড়ি ধরে নিয়ে আসবে—

ত্রিলোচন। (সন্দেহে ঘাড় নাড়িল) উহ—

রামেশ্বর। লোক জানাজানির ভয়ে হয়ত অন্তরের

দিক দিগে আনছে...তোমরা ইদিকে ঠিকঠাক করো...

আমি দেখে আসছি—

[পিছনের দিক দিয়া রামেশ্বর চলিয়া গেল। প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দিক দিয়া সন্ধ্যারণী, নন্দলাল;

ইনস্পেক্টর, সহকারীও দুজন কনেষ্টবল প্রবেশ করিল।

পুরোহিত ও মেয়েরা সমস্ত হইল]

পুরোহিত। ইঁ্যা—ব্যাপার কি?

নন্দ। এই যে—আয়োজন হয়ে গেছে। তোমাদের

যজ্ঞি বাড়ী নিমন্ত্রণে এলাম, ত্রিলোচন।

সন্ধ্যারণী কী কনে কই? বর কই?

ত্রিলোচন। প্রণাম হই, রাণীমা—

[গোলমাল বুঝিয়া মেয়েরা সকলেই সরিয়া গেল,

পুরুষও সরিলেন]

সন্ধ্যা। ত্রিলোচন, আসনে বসে পড়েছ...সম্প্রদান

করবে তুমি!

নন্দ। ভুল মন্তোর পড়বে।

ইনস্পেক্টর। সার্জ হচ্চে, তোমাদের কারো থাকা উচিত নন্দলাল, তুমি সেদিকে যাও। রঘুনন্দন সিং, তুমি সেপাইদের সঙ্গে ফটকে থাকোগে। বাড়িতে ঢুকতে পারে সবাই, বিনা ছকুমোঁকেউ বেরতে না পারে। এখানে তেওয়ারী আর ছোট দারোগা বাবু থাকুন।

[নন্দলাল ও একজন কনেষ্টবল যথা নির্দেশ চলিয়া গেল।]

ত্রিলোচন। (সন্ধ্যারাগীর কাছে আসিয়া চাপাগলায় বলিল) রাণীমা, রায়মশায় খুনী নন। দুপুর বেলা জামা খুলে চান করিয়েছি, সড়কির দাগ নেই। হাতের উপর উকি করে ছোটো নায় লেখা। তাই ঢাকাঢাকি করে বেড়ান। (সন্ধ্যারাগী কঠোর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন) ই্যা...ঠিক। মিথ্যে কথা বলছি না। আপনারা গোলমাল করবেন না, চলে যান।

সন্ধ্যারাগী। কদিন থেকেই এই রকম দেখছি। অহুতাপ!

ত্রিলোচন। ই্যা মা, তাই। অজায় করে আমরা পিছনে লেগেছি—

সন্ধ্যারাগী। জীবনে অনেকবার খোলস বদলেছ ম্যানেজার, এবারের এই বদলানোর পাওনা ভালোর জন্ত হল বুঝি।

ত্রিলোচন। ই্যা রাণীমা, পাওনা হয়েছে। খোলস বদলাতে বদলাতে শেষকালে প্রাণের কাছ বরাবর পৌঁচেছে। চমকে উঠবেন না। এতকাল পরে মনে হচ্ছে ত্রিলোচন ম্যানেজারেরও প্রাণ বলে একটা পদার্থ আছে...এত অত্যাচারেও টিম-টিম করছে, একেবারে নিভে যায় নি। তোমার কাছে না, পায়ে ধরে ভিক্ষা করছি, এদের ছেড়ে দাও। আজকের দিনে রায় মশায়কে ছেড়ে দাগা দেবেন না। মরে যাবে—একেবারে মরে যাবে। ঐ আসছেন...আপনারা সরে যান—

[রামেশ্বর আসিল। সন্ধ্যারাগী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন। ইনস্পেক্টর ও সহকারী ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যাঙ্গের দৃষ্টিতে বিষের আয়োজন দেখিতেছিলেন—তাঁহারা এক কোণের দিকে তেওয়ারীর পাশে আসিলেন।]

রামেশ্বর। আসেনি। চারিদিক উকি খুঁকি মেরে দেখলাম...কাকিম্য পরিবেদনা। বলভও ফিরছে না—লয় এসে গেছে—

ত্রিলোচন। (ব্যাকুলভাবে) রায় মশায়, রাণীমা এসেছেন আর...

রামেশ্বর। ও—এসেছেন? খবর পৌঁছে গেছে? সমস্ত বিরোধ ভুলে গিয়ে আজ আপনাকে বসে থেকে শুভকাজ করিয়ে দিবে যেতে হবে। কোন ক্ষোভ মনে রাখবেন না।

সন্ধ্যা। তাই কি সম্ভব রায় মশায়? এত নির্ধ্যাতনের পরে?

রামেশ্বর। নির্ধ্যাতন...তা বলতে পারেন। কিন্তু স্বরমা ত ক্ষমা করেছেন, নিজের ইচ্ছায় আসছেন। তার উপর কথা কি!

ইনস্পেক্টর। তবু মায়ের একটা দায়িত্ব আছে রায় মশায়। No body has any idea of your whereabouts.

রামেশ্বর। আপনি কথা বলবেন না, ইনস্পেক্টর আপনি আইনের চাকর। স্বরমা দেবীর বিয়ে আইনে ঠেকাবে না। আপনাকে ডাকছি না। কথা হচ্ছে স্বরমার মার সঙ্গে। এমন দিনে তিনি মুখ ভার করে থাকবেন, সে আমি কিছুতে হতে দেব না।

সন্ধ্যা। আর কিছু না হোক—স্বরমার আর আপনার বয়সের তফাৎটা ভেবে দেখবেন?

রামেশ্বর। বয়স...বয়স...! বয়স ত ফিরে পাওয়া যায় না—কি করব! তবু পৃথিবীতে যে ক'টা দিন থাকতে হবে, আমি সংসারী হয়ে থাকব, সকলের উপদ্রব হয়ে থাকব না। আমি চাই ঘর, আমি চাই স্ত্রী-পুত্র। আপনার মেয়ে রাজি হয়েছেন।

ইনস্পেক্টর। রায় মশায়, স্বরমা দেবীকে আপনি kidnap করেছেন। ওয়ারেন্ট আছে—তাকে বের করুন। তাঁর কথা তাঁর নিজের মুখে আগে শুনব—

রামেশ্বর। স্বরমা এখানে নেই—

ইনস্পেক্টর। নেই? কোথায় আছেন, বলে দিন।

রামেশ্বর। (সন্ধ্যারাগীর প্রতি) দেখুন, আপনি

মনের দুখে এই সব করেছেন। আপনি ক্ষমা করুন।
স্বরমাকে জোর করে রাখিনি—সে স্বৈচ্ছায় রয়েছে।
আজ হাত জোড় করে ভিক্ষা চাইছি—নতজাহ্ন হয়ে ভিক্ষা
চাইছি—আপনার মেয়েকে আমার ভিক্ষা দিন। আমি
মাহুষ হতে চাই। জানোয়ার রামেশ্বর মরে গিয়ে আজ
মাহুষ রামেশ্বর জন্মাবে—আপনি তাকে আশীর্বাদ করে
যান।

[রামেশ্বর হাঁটু গড়িয়া বসিল]

ত্রিলোচন। মা, মা, দয়া করুন—বুকে দেখুন
ব্যাপারটা। রায় মশায় আপনার সামনে হাঁটু গেড়ে
বসেছেন।

সন্ধ্যা। রায় মশায়, আপনার কি আর বিয়ে হয়নি?
রামেশ্বর। (স্তব্ধ হইয়া একবার চোখ বুজিল) না
...হ্যাঁ...মনে পড়ে স্বপ্নের মতো...কিন্তু সে রামেশ্বর রায়
নয়...তখন সে এরকম ছিল না। আজ তা চুকে বুকে
শেষ হয়ে গেছে, কোন চিহ্ন নেই—সে মাহুষ নেই...সে
রয়স নেই, সে জগৎও নেই—

সন্ধ্যা। জী য়রে গিয়েছে?

রামেশ্বর। হয়ত মরেছে, কিম্বা বেঁচে থাকলেও মরে
আছে কোথাও। তাকে আমি রাখতে পারি, নিঃ
আমার শক্তি ছিল না—

সন্ধ্যা। আপনার জী বেঁচে আছে।

রামেশ্বর। আপনি জানেন তাকে? আপনি চেনেন?
[সন্ধ্যারাণী চুপ করিয়া রহিলেন] আন্দাজ করে কথা
বের করে নিলেন—এই সব বলে স্বরমার মন ভাঙবার
চেষ্টা করবেন! দোষ দেব না। সংসারকে দুঃখ দিয়ে
এসেছি, তারা কি সহজে ছাড়বে—যত রকমে পারে শোধ
নেবে।...কিন্তু ক্ষমা কি করা যায় না।

[ওক মুখে বল্লভ প্রবেশ করিল]

এত দেরি, বল্লভ? কই—আবার কোথায় রেখে
এলে? [বল্লভ চুপ করিয়া রহিল]

লগ্ন হয়ে গেছে। নিয়ে এসো—স্বরমা কোথায়? নির্মল
কোথায়?

বল্লভ। গাঙে বান ডেকেছে, ভৈরব করাল হয়ে

উঠেছে—আকাশ ভরা মেঘ, বড় উঠেছে—বাঁধ ছাপিয়ে
উঠবার মতো—

রামেশ্বর। বাঁধ ভাঙবে না? লোক লাগিয়ে দাও
...রাতটা কীটুক, সকালে দেখা যাবে। টাকাকড়ি সমস্ত
দেব সকলের কল্যাণে। স্বরমা তাই চায়।...টানের মুখে
নৌকো ভাসতে পারে নি বুঝি। তাই দেরি হচ্ছে।

বল্লভ। এমন টান কুটো ফেললেও হুথানা হয়ে
যায়। নির্মলকে বললাম, ভাসিও না নৌকো—পাগল
মরবে যে! নির্মল বলল, আমার জী স্বরমা—তাকে
বলো।

রামেশ্বর। স্বরমা তার জী?

বল্লভ। হ্যাঁ—কাল রাতে নাকি পুরুষ ডেকে তাড়ি
তাড়ি বিয়ে করেছে। স্বরমা দেবী শুনলেন না; লগ্নি
দিয়ে নৌকায় এক ঠেলা দিয়ে বললেন—মরি যদি বল্লভ,
বড় খামলে খুঁজে দেখো হয়ত কোন চরের উপর ছুঁজেন
একদাখে পড়ে আছি—

[কড় কড় করিয়া বাহিরে মেঘ গর্জন হইল]

সন্ধ্যা। ওরা পালিয়েছে?

বল্লভ। হ্যাঁ। নির্মল বলল, রায় মশায়কে বোলো
তার আক্রোশ থেকে বাঁচতে পারব না, জীকে নিয়ে তাই
অনন্ত সাগরে ভাসলাম। আর—

রামেশ্বর। আর কি?

বল্লভ। আর বলল, আপনার সাহায্য না পেলে সে
দিন কারও সাধ্য ছিল না স্বরমাকে এখানে রাখবার।
এঁরা নিয়ে, চলে যেতেন। সে জগ্ন নির্মল কৃতজ্ঞতা
জানিয়েছে।

রামেশ্বর। কৃতজ্ঞতা। ভাল—ভাল—জানোয়ারকে
ভদ্রলোকেরা দয়া করে কৃতজ্ঞতা পাঠাচ্ছেন। আর স্বরমা
দেবী—তিনি কিছু বললেন?

বল্লভ। তিনি বললেন, বাধ্য হয়ে প্রাণের দায়ে
ভালবাসার ছলনা করতে হয়েছিল। তিনি মাপ চেয়েছেন—

সন্ধ্যা। তারা নৌকায় চলেছে এই ঘোর দুর্ঘ্যোগে?

বল্লভ। ছুঁজেনই আনাড়ি। মাঝি পায় নি ক্ষেপা
গাঙ হলোড় করছে।...নির্ধাৎ মৃত্যু—

সন্ধ্যা। ইনস্পেক্টর বাবু, এ সব থাক। আপনার

কনেটবলদের হুকুম দিন। তাঁদের বাঁচাতে হবে। হাজার টাকা বকশিস।

[হঠাৎ বাহিরে একটা কিসের আওয়াজ, কি ভাঙিয়া পড়িল। ইনস্পেক্টর সহকারীকে ইঙ্গিত করিলেন। তীব্র স্বরে বাঁশী বাজাইয়া সে ছুটিল। সন্ধ্যারাগী এবং বন্ধত ও ছুটিল]

রামেশ্বর—বুড়ো, মাছ—রড্ড বেশি লোভ করেছিলাম। তারা মৃত্যুকে বেছে নিল, রামেশ্বরের চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

[রামেশ্বর বেন উমাদ হইয়াছে। চারিদিকের ফুল ছড়াইয়া দিতে লাগিল, চাদমালা ছিঁড়িল, প্রদীপ নিভাইয়া দিল। অবশেষে বাহির হইতে যাইতেছিল, ইনস্পেক্টর বাঁধা দিলেন]

ইনস্পেক্টর। আপনি বেরতে পারবেন না—

রামেশ্বর। প্রাণের ভয়ে? বুড়ো মাছের প্রাণের দাম কি? দেখছ কি এ পৃথিবীতে আমার বাঁচবার অধিকার নেই। পথ ছাড়ো। স্বরমা গেছে, আমার নির্মল গেছে, এত কষ্টের বাঁধ ও ভেঙ্গে যাচ্ছে। কে আর রইল? কি নিয়ে থাকব?

ইনস্পেক্টর। হুঃখিত রায় শশায়, আপনাকে যেতে দিতে পারি না। আপনার বাড়ি সার্চ হচ্ছে। আপনাকে disturb করিনি—

রামেশ্বর। (বজ্র গর্জনে) তবে এখনো কোরো না—

রামেশ্বর জামার নিচে হইতে রিভলভার বাহির করিতে গেল। ইনস্পেক্টর প্রস্তুত ছিলেন, তার আগেই তিনি রিভলভার, রামেশ্বরের সামনে ধরিলেন—তারপর রামেশ্বরের রিভলভার লইয়া তেওয়ারীর কাছে দিলেন।

ইনস্পেক্টর। আমরা জানি কিনা। তৈরি হয়েই এসেছি।

[নন্দলাল, একজন পুলিশ অফিসার ও কয়েক জন কনেটবল ও কয়েকটি অন্ত্র লোক আসিল]

এই যে... খানাতল্লাসী হয়ে গেল? কি, পেলেন কিছু?

অফিসার। ইনি যে শ্যামল লালের হত্যাকারী তাতে সন্দেহ নেই।

নন্দ। এই সেই নাম-লেখা পোর্ট ফোলিও, আর এই দলিল-পত্র—

রামেশ্বর। মিথ্যা কথা—চোপ রও—আমার ওদিকে সর্বনাশ হচ্ছে, আর তোমরা আমাকে আটকে রাখছ রাণীর ঘুম খেয়ে—

ইনস্পেক্টর। সে আদালতে গিয়ে বলবেন—

নন্দ। পাপ আর পাপা চাপা থাকে না। এই হীরের আঁটি... ডবল-ত্রিশূল আঁকা—তুমি দিয়েছিলে স্বরমাকে। এক শ'লোকে সাক্ষী দেবে, ঐ আঁটি বাবু পরতেন।

রামেশ্বর। মিথ্যা... মিথ্যা কথা। ইনস্পেক্টর, সফট-মুহুর্তে খেলা কোরো না। রামেশ্বর রায়েকে arrest করছ, কিন্তু সে মরে নি এখনো; একটি কটাক্ষে সমভূম হয়ে যাবে। (সহসা কল্প কণ্ঠে) না... মরেছে রামেশ্বর। কারো পরে কোনো আক্রোশ নেই। ইনস্পেক্টর, এক মুহুর্তের জন্য ছেড়ে দাও। আমি একবার দেখে আসি, কি হয়েছে। তারপর এসে হাত বাড়িয়ে দেব, তোমরা handcuff পরিয়ে দিও।... দেখে আসি, যদি ওদের ফেরাতে পারি?

উমাদিনীর মতো সন্ধ্যারাগী প্রবেশ করিলেন—

সন্ধ্যারাগী। না, ফিরবে না। বাইরে গুল্যাক্কার... বড়... বন্ধ্যা... নতুন বাঁধ খর খর করে কাঁপছে, খসে পড়ল বলে... লোহার গেট চুরমার হয়ে গেছে তাদের নৌকো... তারা কোথায় ভেসে গেছে—

রামেশ্বর। গেছে? ইনস্পেক্টর, আমি অপরাধী... স্বীকার করছি... ধরো, বাধো, কাঁসী কাঠে তুলে দাও—

ইনস্পেক্টর। নন্দলাল, তুমি হত্যাকারীকে দেখে ছিলে, সনাক্ত করতে হবে—

[স্বরমার কথা শুনিয়া অবধি নন্দলাল অন্যমনস্ক... বার বার বাহিরের দিকে তাকাইতেছে...]

নন্দ। ইয়া করব। মুখোস পরা ছিল, মুখ দেখে না পারি, আমার সড়কির দাগ দেখে ঠিক সনাক্ত করব দেখুন ত ইনস্পেক্টর বাবু, বুকের কাছটায় খোঁচা আছে কিনা... জামাটা তুলে দেখুন—

রামেশ্বর। আছে... আছে... তুলতে হবে না—

নন্দলাল বাহিরে ছুটিয়া গেল

ত্রিলোচন। নেই—

রামেশ্বর বজ্র কণ্ঠে ত্যাগ দিল—

রামেশ্বর। আমি বলছি, আছে। বুকে বড় খোঁচা... রক্ত বরছে—

ইনস্পেক্টর। তাহলে আপনার স্বীকারোক্তি মতে শ্যামল মজুমদারের হত্যাপরাধে আপনাকে arrest করা হল।

তেওয়ারী Handcuff লইয়া আগাইয়া আসিল।

সক্কারাণী (বাধা দিলেন) না—

ইনস্পেক্টর। না? কি বলছেন আপনি?

সক্কারাণী। আমি ছিলাম সেখানে। আমি জানি, সে লোক ইনি নন।

এই সময়ে বাহিরে খুব তোলপাড় হইতে লাগিল, একজন-কনেটবল ছুটিয়া আসিল।

কনেটবল। রঘুনন্দন সিং আরও দু'তিন জন পাঁচিল চাপা পড়েছে। বান ছুটে আসছে। ঘর-বাড়ি কিছু থাকল না, হুড়, মুড় করে ভাঙল—

ত্রিলোচন, ইনস্পেক্টর ও সকল পুলিশ কর্মচারী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রহিল রামেশ্বর ও সক্কারাণী।

রামেশ্বর। শত্রুতা করেছি, তার এই রকম প্রতি-হিংসা নিছক বাঁচতে দেবে না, আবার মরতেও দেবে না?

সক্কারাণী। খুন ত আপনি করেন নি।

রামেশ্বর। না করি... আর ও কত সংকীর্ণ করেছি। আমায় শাস্তি নিতে দাও।

সক্কারাণী। সে শাস্তি যে আর একজনের বুকে গিয়ে পড়ে। আমি ত কোন অপরাধ করিনি। আমি যে মরে যাচ্ছি... আমি দিন গুণছি, তপস্যা করে আছি। সক্কারাণী মুখের কাপড় সরাইয়া দিলেন। আমাকে চিনলে না? আমি মনোরমা—

রামেশ্বর। মনোরমা?

সক্কারাণী। হ্যাঁ, মনোরমা।... দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি—

রামেশ্বর। (আচ্ছন্ন মতো) মনোরমা? এই দেখ দুটো নাম—রাখব আর মনোরমা। জামা তুলিয়া

হাতের উকি দেখাইল... মনোরমা, এক ছদ্মিৎ ভেসে গিয়েছিল, আর এক দুর্ঘ্যোগে ফিরে এলে।

সক্কারাণী। হ্যাঁ—বড় দুর্ঘ্যোগ! এই শব্দ শুনে? বাঁধ ভাঙল... বাহিরের দিকে চাহিয়া—এরাবতের মতো জল ছুটেছে... চলো... চলো... মরতে তোমায় দেবো না, বাঁচতে হবে।

সক্কারাণী রামেশ্বরকে লইয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। ঠিক এই সময়ে নন্দলাল আসিল। সে টেচাইতে লাগিল।

নন্দলাল। ইনস্পেক্টর বাবু, আসামী পালায় যে— এই সময়ে চলিতে চলিতে বন্ড আসিল। তার সর্বোচ্চ রক্তাক্ত, সে নিদারুণ আহত হইয়াছে।

বন্ড। না—পালায় নি। এই যে হাজির। তোমার সড়কির দাগ এই রয়েছে বুকে; আমিই মেরেছি শ্যামলকে। গিয়ে ছিলাম ভাঙতি করতে... দেবায় ভাল কাজ হয়ে গেল। আংটি দলিল-টলিল আমারই দেওয়া। নন্দলাল। বন্ড? এ কি, কি হয়েছে?

বন্ড। বাঁধ ভেঙেছে। হাজার মানুষের কপাল ভেঙেছে। লক গেটে জলের চাপ... আমি ডবল করে হুড়কো লাগাতে গিয়েছিলাম। লোহার ডাঙা পড়ল, যেখানে পড়েছিল তোমার সড়কি... পালাও নন্দলাল। আদালতে আমার শাস্তি দিতে পারবে না, তার আগেই চোখ বুঁজব। পালাও নন্দলাল, বাঁধ আসছে, পালাও— পালাও—

বন্ড শুইয়া পড়িল

নন্দলাল। পালাব এই অবস্থায় ফেলে? তুমি বান ঠেকাবার জন্যে লোহার আঘাত বুকে নিলে, আর আমি তোমায় ফেলে পালাব? আমরা এক গুণ্ডার কাছে লাঠি ধরি নি? আমি তোমার ভাই না?

[দেখিতে দেখিতে প্রবল শব্দে বন্যার জল আসিয়া তাহাদিগকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া চারিদিক পরিপ্লাবিত করিয়া দিল।]

[মঞ্চ ঘুরিয়া পরের দৃশ্য আসিল।]

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যিক ও সাধারণ

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

সন্ধ্যাবেলা শিশুমণ্ডলী ঠাকুর্দা কি ঠাকুমার কাছে এসে বলে ‘দাদামশাই-গল্প’। ঠাকুর্দা শশব্যস্তে হাঁকোর নল, ঠাকুমা যদি হ’ন তো জপের মালা সাবধান করে গল্প বলতে বসেন। তাঁদের সারাদিনের অস্থবিধার অভিযোগ যথা, ঠাকুর্দাকে রামা চাকর যথা সময়ে তামাক দেয় নি; সন্ধ্যাবেলা আফিমের কোটাটি খানিকক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় নি; হাঁকোর নলটি খুকী মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে,—আর ঠাকুমার নানাবিধ সংসার বজ্রাট, কার অস্থখ, কে রাগ করে খায় নি সে বেলা, কার কি দরকার ছিল সে পায় নি তার কথা তারা জানেও না—খোঁজও রাখে না। তাদের গল্পের যোগান তাঁদের দিতেই হবে।

সেই গল্প শুনতে ভালবাসে না, এমন শিশু বিরল এবং বলেন যারা, তাঁরাও চিরকালের মতই সেই ‘নিকামায়’ বা নিকর্ম্মা ঠাকুর্দা-ঠাকুমারা।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে পড়তে ভালবাসেন না, তথা গল্প পড়তে ভালবাসেন না, এমন পাঠক কমই। জনরুচির যোগানদার মাসিকের, সাপ্তাহিকের, বার্ষিকীর সম্পাদক প্রকাশকদল কাকুর কাছে চান চিন্তাশীল প্রবন্ধ, কাকুর কাছে হালকা গল্প, কাকুর কাছে ভারী ওজনের দূর দৈর্ঘ্যের উপস্থাপন। কোন জনের কাছে বা নব্যতন্ত্রের কাব্য। সমস্তা, সমাধান, সাধনা স্বপ্ন তো আছেই।

মানুষের অবসর বিলাসের আনন্দের প্রয়োজন সাধনে সন্ধ্যাবেলাকার নিকামায়ে ঠাকুর্দাদের মত সম্পাদক প্রকাশকের কাছে, সাধারণের কাছে খানিকক্ষণ সাহিত্যিকের আদর বেড়ে ওঠে। তাঁরাও জানেন না, সংসার তাদের কাছে কি চেয়েছিল সারাদিন, আর তারাই বা সংসারের কাছে কি পেল না।

তাদের নিজ নিজ পণ্যের বেসতির যোগান দিতেই হবে।

২

যুগ যুগান্তর ধরে তারা দিনের পর দিন রচনা করে এলো, শুহার গায়ে, লোহার বাটালির ঘায়ে, মূর্ত্তি খোদাই করে,

রংএর আলপনায় লেপনে দেওয়ালের গায়ে, মনের আনন্দের বেদনার তুলি দিয়ে ভূর্জপত্রে, তালপাতায়, বইএর পাতায় পাতায়’ মানুষের, অতিশয় সাধারণ এই মানুষের মহামানব হওয়ার কাহিনী, দেহ অতিরিক্ত ক্ষুধার কাহিনী, প্রাণ অতিরিক্ত প্রাণের কথা। কামনাকে যারা প্রেম করে, কাব্য করে তুললে, অরূপকে যারা রূপ দিলে, দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীতকে যারা আত্মীয় করলে,—মর্ত্তো আসবার আগে “কোনু মা তাদের হাতে খেলাবার বাঁশী” দিয়েছিলেন। যারা হয়ত কাজ কেউই করেন নি, কর্ম্মী নন, বণিক নন; ধনী নন : সমাজের গৌরবের সিঁড়ির ওপর দিকে তাঁরা দাঁড়াতে পেরেছেন মৃত্যুর পর।

কিন্তু কথাটা হচ্ছে এ নয়, হচ্ছে তারপর ?

সেই তারপরটা হচ্ছে, সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণের আর লেখকের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ।

যারা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তাঁদের কথা নয়, এ হচ্ছে সাহিত্যিক সাধারণ সকলের কথা।

কাজের, লোকের ভীড়ের মাঝে সমাজ যাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ওই ও কবিতা লেখে! ওই ওরা অবোধা প্রবন্ধ লেখে। ওরা ওই যারা কাজ করে নি—খালি ফাঁকি দিয়ে গল্প লিখেছে! সমাজের বা সাধারণের ওদের ওপর সন্দেহের সংশয়ের যেন সীমা নেই! এই নিকর্ম্মা দলের সম্মিলন সমাজের বৃদ্ধিমান লোকের কাছে যেন অনেকটা সন্ধ্যার আগে সাধারণ পার্কে বায়ুসেবী প্রৌঢ় বৃদ্ধ সম্মিলন। নয়ত মন্দিরে গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যা আত্মিক ও গল্প পরায়নী ঠাকুমা-দিদিমা সম্মিলন।

এক একবার মনে হয় সাহিত্যিক লজ্জা বা লেখকস্বলভ ‘শাইনেস’ (shyness) বলে যে একটা কথা আছে তার মূলে সাধারণের এই মনোভাবের শঙ্কা নেই কি ?

বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ গোড়াতেই ভাগ্যে সরকারী চাকুরে ছিলেন। নিশ্চয়ই সাহিত্যিকের এই নৈকর্ম্মকারিতার টীকা তাঁকে শুনতে হয় নি। আমাদের আজকের সাহিত্য সাধারণ

অন্ধ্র সভাপতি মহাশয় বুদ্ধিমান লোক, তাঁকে নিকামায়ে দলে ফেলে টাকা করবার সুযোগ তিনি দেন নি। তিনি ‘পেন্সনের পরেই’ এই নৈযুক্ত্য সালোকা পেয়েছেন।

আসলে নতুন সাহিত্যিকরা যেন সমাজের জীভাগ। তাদের মতই যোগাড় দিল সব, যোগান দিল স্বপ্ন, আহরণ করলে উপাদান, দিনে দিনে আপনাকে নিবিষ্ট করে ধ্যানে ডুবিয়ে রাখল সাধনার। যেদিন প্রকাণ্ড করে ইমারত খাড়া করা হবে বলে যন্ত্র এলো বৃহৎ, যন্ত্রী এলো বীর,—সেদিন তারা শুনলে যে তারা শুধু স্বপ্ন দেখেছিল কাজ করে নি! ধন আহরণ করে নি—তারা কর্মী নয়!

ত

লোকে জিজ্ঞেস করে, ছেলেটী কে? (মেয়ের এখনো সাহিত্যিক গিরি কাজ সাধারণ ভাবে হয় নি), জবাব পায়, লেখক বা লেখে।

সে স্কুল পাঠ্য বই লেখে নি। সে পরীক্ষার পাশের নোট লেখে নি। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক লেখে নি। সে শুধু লিখেছে কাব্য, কথা, প্রবন্ধ, তার—বা আর পাঁচজনের কথা!

তারপর? আর টীকার দরকার নেই!

কিন্তু তারও পর আছে। তা’ হচ্ছে দেশে বা বাংলাদেশে তবু সাহিত্য চর্চা করা হয়, মাসিক সাপ্তাহিক বেরোয়, মাঝে মাঝে রস সাহিত্যও পড়তে পাই। আর প্রবাসে একেবারে

নিরস স্বজনহীন দেশে বছরে একবার প্রবাসীদের সাহিত্য সম্মিলন হয়—যখন মাঝে মাঝে আমরা সকলে জড় হয়ে দেখতে পাই যে আমরা বাংলা ভুলে যাই নি—জয়পুর বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর বাঙালী গোসাইদের মত। আমরা এখনো শস্য-শ্রামলা বাংলাদেশের প্রচুর সাহিত্যরস পান করে বাঙালী হয়ে বেঁচে আছি।

তারও পর আছে একটু থানি;—সকলের জন্তে নয়, কতকের জন্তে, হয়ত নির্দিষ্টদের জন্তে—সে হচ্ছে মৃত্যুর পর হয়ত বা কারও জন্তে শোনা যাবে,—

তবু কঁাদ কঁাদ জনমভূমির

সে এক দরিদ্র কবি।

যাক, মিছামিছি এত কথা কওয়া গেল এই জন্তে যে সাহিত্য সম্মিলনে নাকি লেখা না পড়লেও দিতে হয়! (যদিও আমার মনে হয় অনাবশ্যক)।

আর এই এতকথা বলার প্রয়োজন কিছু নেই; মাত্র এর নীতিসার হচ্ছে এই: একবার রবীন্দ্রনাথ একজনের কবিতার বইয়ের সম্পর্কে বলে ছিলেন, ‘এক জিনিষের দুটো দাম চেয়ো না! অর্থাৎ বইএর বা রচনার খ্যাতি এবং বিক্রী দুইই চেয়ো না।

আমাদেরও তাই; এই সার্বজনীন ঠাকুর্দা দিদিমারা সাহিত্যিক খ্যাতি আর কাণ্ডের লোকের সমাদর দুই পেতে পারেন না।



রবীন্দ্র স্মরণে

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী

আজকার এই বিষাদিত আমন্ত্রণের কারণ আপনাদের কাহারও অবদিত নাই। মানুষের এক একটা স্বভাবের বৃত্তি আছে উহা প্রায় অনেক স্থলে একই প্রকার দেখা যায়। মানুষের ধর্ম ও গতি ইহাও। তাহারাই স্বথ বা দুঃখ কিছুই একা ভোগ করিতে পারে না। একা একা হাসি বা কান্নায় যেন সম্পূর্ণতা ঘটে না। তাই বৃষ্টি আজ আমরা এতগুলি প্রাণ মিলিত হইয়া সেই স্বর্গগত মহাত্মার স্বভাবের বেদন্য-হৃদয়ের গভীর তাপের অনুশোচনায় নয়নের অশ্রুবিন্দু দিয়া প্রক্ষালিত করার আশায় একবার ভক্তিনত শিরে যিনি ব্রহ্মাণ্ডের গতি মুক্তির কর্তা তাঁহার চরণে প্রণাম করিতেছি।

আপনারা সকলেই জানেন, যক্ষ ও যুধিষ্ঠির সংবাদ, যক্ষ জিজ্ঞাসা করেন কোন বস্তু, অথবা কি এ পৃথিবীতে সর্কাপেক্ষা আশ্চর্য্য!

মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন যে মৃত্যুই এ জগতের সর্কাপেক্ষা আশ্চর্য্য!! তাবিলে ক্ষণমাত্রের জ্ঞান, আমরা স্তুতিত হইয়া পড়ি। অহর্নিশি যে মৃত্যুলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার জ্ঞান কিন্তু কখনও পরিণামকে, স্মরণের দ্বারে উপস্থিত হইতে দিতে পারি না। যাহা এই সৃষ্টি স্থিতির প্রধান উদ্দেশ্য। জন্ম ও মৃত্যু! ইহাও অনিবার্য্য!! স্বথ দুঃখের লীলা স্থল!! জন্ম যেমন মধুরা আনন্দময় স্বথময়, মৃত্যু ততোধিক ভীষণ, করাল কালরূপি, দুঃখ বেদনাময়!!

শক্র, মিত্র, যেই হউক তাহার মরণ বার্তা কর্ণে পশিলে, যতই কঠিন হৃদয় হউক, একটা ধ্বংস নিশ্বাস তাহার বুকের উপর যে বহিবে না এমন কথা কেহ কী বলিতে পারেন?

আজ আমাদের দেশ, বিদেশে ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপের আকাশ সর্বত্র সর্বব্যাপি শোক মেঘাচ্ছন্ন। নর, নারী, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু, সকলে একবাক্যে ধাঁহার অবসানে বিষাদিত। তিনি কে? এক মহামানব মাত্র! বঙ্গজননীর ক্রোড়ে অশিতিবর্ষ পূর্বে এক শুভ মুহূর্ত্তে ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন!! গীতা বলিয়াছেন, যোগজ্ঞে যিনি, তিনিই শুচি শ্রীমন্ত যের জন্ম লইয়া থাকেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে এই কবি সম্রাট, সাহিত্যগুরু, ভাস্কররূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার রূপজ্যোতি পিতা মাতার রাজস্বে সূর্য্যসম জ্যোতির্মান প্রত্যক্ষীভূত হয় তাই বৃষ্টি রবীন্দ্র নামে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আজ সেই দীপ্তিমান রবি

অস্তাচলে গমন করিয়াছেন!! বর্তমানের সাহিত্য-গগন অন্ধকার! তিনি একাধারে কবি দার্শনিক শিল্পী, ও প্রেমিক ছিলেন, ইহা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। সৌন্দর্য্য জ্ঞান সেই বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারে যথেষ্ট ছিল। এতগুলি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীত বিদ্যা, একথা কেহ বলে না। কাব্য সাহিত্যের অদ্ভুত ক্ষমতার বীজ লইয়াই উক্ত মনীষীর জন্ম হয়। ইহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। কত কবি, কত সাহিত্যিক দার্শনিক ধর্মবেত্তা এই বর্তমান যুগে জন্মিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এই বিশ্বপূজীত মানব স্বদেশ ও ভারতের বাহিরে এত সম্মান লাভ করিয়াছেন কেন? তত্ত্বত্তরে বলিতে হইবে সেই কবিগুরু প্রাণে বিশ্বজনীন প্রেমের সাগর সর্বক্ষণ উচ্ছ্বসিত হইয়া সংসারের মানব হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি এক নগণ্য রমণী। তাঁহার কীর্ত্তির ব্যাখ্যা করা অসাধ্য! তিনি যে সকল অক্ষয়, অমর, দান জগৎকে দিয়া গিয়াছেন উহা চিরকাল দীপ্তি পাইবে। আজকাল নবযুগে রবিকবি ছাড়া আর কোন সাহিত্যের আদর কেহ কল্পনাতে ইচ্ছা করিত না। প্রাচ্য, প্রতীচ্য, হিন্দু মুসলমান বৃত্তান, সকল জাতির সহিত তাঁহার অভেদ জ্ঞান ছিল। একেশ্বরবাদী পিতামাতার সন্তান হইয়া একা মিলনের প্রয়াসী ছিলেন। রাজনীতি ধর্মনীতি, কোন স্থানে কপট কুটিলতার প্রশ্রয় শুনা যায় না। সকল জাতিই তাঁহার গুণে মুগ্ধ। বাঙ্গালার কবি ইয়োরোপের “নোবেল” প্রাইজ অধিকার করিলেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প বা পদ্য সাহিত্যের উপমা এস্থলে দিয়া শেষ হয় না। সামান্য স্মৃতি স্মরণ অবতারণা করিলাম। রবীন্দ্রনাথ দেশ প্রেমে মৌলিক ছিলেন না কৌলিক, সে সকল বিষয় লিপি বদ্ধ করার সময় এস্থলে নয়। রাজনীতি, বা গান্ধিজী সম্বন্ধে তাঁহার মত উদার ছিল। চীন জাপান আমেরিকা পারস্য প্রভৃতি ইয়োরোপের সকল স্থানেই তাঁহার জলন্ত প্রতিভা বিকাশ হইয়াছে তাই আজ নিব্বা গেল। রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রয়োজন দেখিতেন, সেখানে তাঁহার প্রবলভাবে মধ্যাহ্ন কিরণের তায় ভেজ প্রকাশ করিতেন। ভীকৃ কাপুরুষ ছিলেন না। কোন কথা তাঁহার বলা যায়, আর কোন কথা বাদ দেওয়া যায় না। সেই মর্ত্ত্যমান রবির আত্মার প্রতি আমরা সমবেত মহিলাগণ দাঁড়াইয়া শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক শ্রদ্ধাজলি প্রদান করিতেছি। ওঁ

মানব সমাজে নারীর দান

শ্রীপুরঞ্জয় রায়

সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের ক্ষেত্রে পুরুষের দান এতই বেশী যে তাহারই অন্তরালে নীরব ক্ষম্ভধারায় প্রবাহিত নারী সমাজের মূল্যবান দানগুলির স্বীকৃতি বর্তমান সমাজের পক্ষে বেশ একটু কষ্টকর বুলিবা ভুলিবার জ্ঞাত সর্বদাই সচেত্ন। সমাজের বৃকে নারীর সত্যকার মূল্য আজিও নির্ণীত হয় নাই, ভবিষ্যত অনাগত যুগে কোনদিন হইবে কিনা জানি না! মহাবীর ভীষ্ম-অর্জুন হইতে সীতার, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনি, চার্লিস, রুজভেল্ট বা জৈশা, মুশা, বুদ্ধ, শঙ্কর হইতে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ পর্যন্ত প্রতিভাময় জীবনীর অন্তরালে মহীয়সী নারীর নীরব সহস্র দানের কথা আমরা স্বীকার না করিলেও স্বকীয় প্রতিভায় ভাস্বর তেজোময়ী নারীর সংখ্যা সত্যিই অল্প নহে। হৃদয় লেখনীর মনোরম তুলিকাপাতে ইহাদের গৌরব গাথায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা ততোধিক উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে নাই তথাপি সত্যের খাতিরে ইহাদের মূল্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

One thing is true that woman will have a much better time in the future than they have in the past. 'On women' Arnold Benette.

‘অর্থাৎ একটা বিষয় সত্য যে, অতীত দিন অপেক্ষা ভবিষ্যতে নারীগণ অধিকতর সুদিন দেখিবে।

জানি না উহার মূলে কতখানি সত্য আছে। কিন্তু ভবিষ্যতের যবনিকা উন্মোচন না করিয়াও দেখা যায় বর্তমান বা অতীত কোনটাই নারী সমাজের অন্ধকার ছিল না বা নাই। ছোট বড়র প্রবন্ধ তুলিয়া আমি সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিতে চাহি না। যদিও একস্থানে বিখ্যাত লেখক Arnold Benette লিখিতেছেন—It is an advantage of man that they show no desire to be woman. Woman intoxicated with newly revealed possibilities have had a tendency to imagine that

nature has forbidden naught to them. কথাটা রুঢ় হইলেও কতকটা সত্য। এই inferiority complex হইতেই আধুনিক Suffragette আন্দোলনের উদ্ভব। মনো বিজ্ঞানের ছাত্রগণ ইহা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ইহাও অবাস্তব! কারণ প্রকৃতির রহস্যের মূল চাবি কাঁঠি যেখানে সেখানে এ সকল প্রবন্ধ নগণ্য। সত্য কথা বলিতে কি নর ও নারী উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। এই সাধারণ সংজ্ঞাটা মনে রাখিলেই অনেক জটিলতার অবসান হইবে।

যাক্ যে কথা বলিতেছিলাম। সত্যিই প্রতিভা কখনও দেশ কাল পাত্র সমাজ বা কুষ্টির অপেক্ষা রাখে না; আর রাখে না বলিয়াই সমাজের চিরন্তন পরিবেষ্টনীর অধীন না হইয়া ইহা একটা নূতন রূপ দিয়া নবপরিবেষ্টনীর সৃজন করে।

আধুনিক যুগে শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজ সেবায় নারী পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়া নাই। সাহিত্যে সেলমা লাগেরলফ, পল বাক্, সমাজ সেবায় নাইটস্‌দেল হইতে সিষ্টার নিবেদিতা, তুরস্কের মহিমময়ী নারী হালিদা এদিব হানুম, মাদাম চিয়াং কাইশেক, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বিজ্ঞানে মাদাম কুরী ও তাঁহার কন্ঠা, লোকশিক্ষায় মন্টেশরী প্রভৃতি আধুনিক মহীয়সী নারীদের দান আজ জগৎসভায় সর্বজন স্বীকৃত। খেলা ধুলার কথা ছাড়িয়া দিলাম। হৃদয়ের প্রসারতায় লোক হিতৈষণায় ও আর্থিক দানেও আজ ইহারা পশ্চাতে পড়িয়া নাই। রামকৃষ্ণ মিশন মন্দিরে ২টা মাকিণী নারীর দান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হইয়া থাকিবে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলার লেডী অবলা বসু, স্বর্গীয় সারোজনলিনী দেবীর নামোল্লেখ কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

নারীহৃদয়ের কোমল বৃত্তি গুলি আলোচনা কালে আমরা কেবল শিল্পীমনেরই অন্বেষণ করিয়া থাকি ফলে নারী সৌন্দর্যের দেহতত্ত্ব ও প্রেমের কলগুঞ্জেই সাহিত্যের হাটে কোলাহল জমাই। অবশ্য কাব্য ইতিহাসের মূল সূত্র গুলিকে আমি অস্বীকার করিতে চাহিনা বা যুগে যুগে নিখিল চিত্ত লোকে যে আনন্দ মধু সঞ্চয়িত হইয়াছে তাহার মূল্যকে ও

আমি কিছুমাত্র হীন করিতে প্রস্তুত নহি।—তবে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবসর পাইলে তাঁহারাও যে পুরুষের মতই প্রতিভার বিকাশ দেখাইতে পারেন শুধু সেই কথাই আমি জানাইতে চাহিতেছি। সেই কারণেই রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজ্জী এন্জিবেথ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, রাজিয়া, চাঁদমুলতানা, রাণী দুর্গাবতীর নাম উল্লেখ করিতে চাহি। স্বদেশ প্রেমের উজ্জল বতিকা হস্তে লইয়া যিনি জাতির পুরোভাগে দাঁড়াইয়া একদা ফ্রান্সকে রক্ষা করিয়া ছিলেন সেই অপূর্ব মহিষী নারী জোয়ান অব আর্কের নাম ও আমি প্রদ্বার সঙ্গেই স্মরণ করিতেছি।

কিন্তু না, মানব সমাজে নারীর দান এইখানেই শেষ নহে। আধুনিক যুগে বা মধ্য যুগে যাহারা আপন প্রতিভার জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদেরও পূর্বে ভারতের আরণ্য সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতার যুগেও আমরা দেখিতে পাই অপূর্ব ধীশক্তি সম্পন্না জ্ঞানপ্রোজ্জ্বলা হুতিময়ী শক্তিময়ী মহীয়সী নারীগণকে। রাজর্ষি জনকের সভায় দৃষ্ট ভিক্ষিমায় সহস্র সহস্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মবাদিনী গার্গী যেদিন সমগ্র পুরুষ জাতিকে আহ্বান করিয়া জ্ঞানের চরম মীমাংসা সমাধানে নিজ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন সেদিন সেই বিস্মিত জনসভ্যের সম্মুখে একমাত্র মহিষী যাজ্ঞবল্ক্যই কোন প্রকারে পুরুষ জাতির মান রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারও পশ্চাতে ছিল পুরুষের দম্ব অহমিকা ও মর্যাদা রক্ষার আবুল প্রচেষ্টা! গার্গীকে নিরস্ত করিতে তাঁহার শেষ অস্ত্র অভিসম্পাতের ভয় দেখাইতে হইয়াছিল।

আবার দেখিতে পাই জ্ঞানামৃত পানে বিভোর সেই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন জাগতিক ভোগৈশ্বর্য্য বিষ্ঠা মূত্রের দ্বায় পরিত্যাগ করিয়া বনপথে চলিলেন তখন তদীয় সাক্ষী দেবী মৈত্রেয়ী তাঁহাকে সন্ধান করিয়া বলিলেন ‘অমৃতের স্বাদ তুমিই শুধু লাভ কর নাই অর্ঘ্য! নারী হইলেও আমারও উহাতে অধিকার আছে তাই—আমাকে তুমি পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না। সংসার স্নখ তুচ্ছ! ওই আরণ্য ভূমিতে তোমার সঙ্গে থাকিয়াই একত্রে মহৎ স্নখে পরমানন্দে দিনাতিপাত করিব।—একথা মনে করিবে ভুল হইবে ঋষি কন্যার এক অরণ্য হইতে স্বামী সঙ্গে অরণ্যান্তর গমন খুবই সামান্য

কথা। সেই সঙ্গে স্মরণে রাখিতে হইবে দেবী মৈত্রেয়ী মিত্র রাজকন্যা। ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় এই নারীকে আশ্রয় করিয়া এক অদ্বিত্য প্রতিভার সৃষ্টি করিয়াছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাঁহার দান স্মরণ করিয়া এ কথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি।—এতদ প্রসঙ্গে জনক সভায় বালব্রহ্মচারিনী দেবী সুলভার নাম ও উল্লেখ যোগ্য। অনেকেই হয়ত জানেন না যে মিতাক্ষরা শাস্ত্রের টীকাচারিনী একজন নারী তাঁহার নাম লক্ষ্মী দেবী। আজই যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে নারী জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে তাহা নহে অতীত যুগে সত্রাট ভোজরাজের পত্নী লীলাবতী স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। আমরা আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের স্ত্রী সাক্ষী সীতা দেবীকেই চিনি কিন্তু যিনি সেই সীতা দেবীকে তাঁহার বনবাস কালে পাতিব্রত শিক্ষা দিয়াছিলেন সেই দেবী অম্বুহয়াকে অনেকেই চিনি না। বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতির কথাও অনেকেই জানেন। আরও জানেন মহাবীর দশাননের পত্নী মন্দোদরী তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে কেমন করিয়া সেই দুর্দ্বর্ষ স্বামীকে দাবা খেলায় মাৎ করিয়াছিলেন। প্রবাদ দাবা খেলার প্রচলন সেই রাবণ যুগ হইতেই। ব্রহ্মবাদিনী মন্দালসার নাম হয়ত কেহ কেহ জানেন। তিনি তাঁহার তিন পুত্রকে জলে বিসর্জন করেন। চতুর্থ পুত্রকে জ্ঞান দান করিয়া সংসারে পাঠান। আমরা ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ‘লোকোত্তর’ চরিত্র ও জ্ঞানের কথাই আলোচনা করিয়া থাকি কিন্তু মণ্ডন মিশ্র ঘরগী উভয় ভারতী বা বিদ্যাবতী সেই অপূর্ব যোগীকে কিভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন তাহার বিষয় আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করি না। মহাকবি কালিদাসের প্রতিভাই জগৎ বিখ্যাত কিন্তু তদীয় স্ত্রী সুরসিকা বিদ্যোত্তমার বুদ্ধি চাতুর্য্যের সহিত আমাদের অনেকেরই পরিচয় কম।

তেজস্বিনী নারী বিহুলাকে আমরা অনেকেই চিনি না। কিন্তু সেই অতীত দিনে তাঁহার দৃষ্ট বাণীই তৎপুত্র পরাজিত সজয়কে পুনরায় রণক্ষেত্রে জয় তিলক ধারণ করিবার জন্ত পাঠাইয়াছিল।

পরবর্তী যুগে আজমীর রাজকুমারী মোহনার নাম বীরত্ব খ্যাতিতে চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে। মামুদ গজনভী আজমীর আক্রমণ করিলে বীরবালা স্বীয় বাহুবলে আজমীর রক্ষা করেন। গুজরাত রাজপত্নী যুগনয়নার নাম একদিন স্বগায়িকা হিসাবে

গুজরাতের ঘরে ঘরে আলোচিত হইত। ভক্তিমতী মীরাবাই এর নাম জানেন না ভারতে এমন নরনারী কমই আছেন। জয়চাঁদ কত্কা সংযুক্তার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। নিজ মনোমত স্বামীলাভের জন্ত বীর্ষবতী নারীর অপূর্ণ প্রেম কাহিনী ও স্বদেশ প্রীতি আধুনিক যুগের অতি আধুনিকাদেরও ঈর্ষার বস্তু। প্রগতির গতিপথে দেবী সংযুক্তা আদর্শ নারী! অহল্যা বাই, রাণী ভবানী, রাণী স্বর্ণময়ীর বিশদ আলোচনা না করিলেও পাঠক সমাজ ইহাদের গুণাবলীর সহিত অপরিচিতা নহেন। বৌদ্ধ যুগের যে সকল মহিষসী নারী ধর্মের ক্ষেত্রে অসামান্য দানে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই সম্রাট অশোক চুহিতা দেবী সংঘমিত্রার নাম মনে পড়ে। আজ ভারতের দুর্দিন! তাই ভারতের বাণী আজ বিশ্বের দরবারে আর ততটা সাড়া দেয় না কিন্তু আর্ঘ্য সভ্যতার সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগে ভারতের এই নারীই মৈত্রী প্রেম মুদিতার বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং বলা বাহুল্য এ গুরুভার তিনি দুর্বল স্বক্কে বহন করেন নাই; ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগ্য পরিচালিকা বলিয়াই তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তবে একথা স্বীকার্য আর এক মহিষসী নারী সিংহলের রাণী অল্লজা তাঁহার অমুগামিনী হইয়া সেই ধর্ম গ্রহণ না করিলে তাঁহার কার্য অত সহজে সিদ্ধ হইত না। বাহুল্য ভরে আমি এক্ষণে কয়েকটি মহিষসী নারীর নামোজ্জ্বল করিব। বৈদিক যুগ বা আরণ্য সভ্যতার যুগে তাঁহাদের দান বিনা প্রতিবাদে সমাজ মানিয়া লইয়াছিল আর শুধু মানিয়া লয় নাই সত্যি তাহাকে যোগ্যস্থান দিয়াছিল। মাছুষের সভ্যতার চরম বিকাশ বিজ্ঞানে নহে, দর্শনে! এই দর্শনে আজিও কোন সভ্যতা আর্ঘ্য সভ্যতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই দর্শনের ক্ষেত্রেও বৈদিক

নারীর স্থান অল্প নহে। আমি শুধু কয়েকটি নামোজ্জ্বল করিয়া তাঁহাদের মন্তগুলির ইঙ্গিত দিব।

লোপামুদ্রা—বিদর্ভ রাজকন্যা, মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী—

ম১ অলু১৮ স্থ১৭৮। ২টী মন্ত

অপালা দেবী—(অত্রি বংশে জন্ম) ম৮ অলু২ স্থ

২১।

রোমশা বা লোমশা—ম১ অলু১৮ স্থ১২৬। ৭টী শ্লক

বিশ্ববারা—(অত্রি বংশে জন্ম) ম৫ অলু২ স্থ২৮।

৬টী শ্লক

বাক্—(অশ্বিন ঋষির কন্যা) ১০ম স্থ ১২৫। ৮টী

শ্লক (দেবী হুক্ত)

অদিতি—(কাশ্যপ পত্নী, ইন্দ্রাদি আদিত্যগণের মাতা)

৪র্থ ম, ১৮স্থ ৫ম ও ৭ম শ্লক

যমী ১০ম ম, ১০ম স্থ ১, ৩, ৫, ৭, ১১ শ্লক

১০ম ১৫৪ স্থ ৫টী শ্লক

পুরুষবা পত্নী উর্কশীকে আমরা স্বর্গের অপ্সরা বলিয়াই জানি।

কুল শুভ্র নগ কান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা

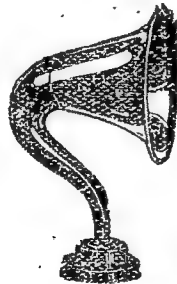
তুমি অনিন্দিতা!

কবির এ উপমা শুধু বাহিরের সৌন্দর্যের প্রশস্তি নয় অন্তরের মহত্তর প্রশস্তিও বটে।

‘ডান হাতে সুধা পাত্র বিধ ভাঙ লয়ে বাম করে’ বিশ্ব বিমোহিনী অনন্ত যৌবনা যে উর্কশী, যাহার কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন আকুল চঞ্চল হইয়া পড়ে সেই বিশ্বের প্রেমসী উর্কশী যে বৈদিক মন্ত্রের সৃজনকারিণী তাহা বিশ্বাস হয় কি? কিন্তু সত্যি তাই—

১০ম ম, ২৫ স্থ। ৭টী শ্লক

এ কথার বাথার্থ্য প্রমাণিত করিবে।



সাহিত্যে জাতীয়তার উৎস

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী

বিশেষ কালের রাষ্ট্র বা সমাজের সমস্যা ও সংস্কারমূলক সাহিত্যকে ছোট করিবার প্রবণতা আজকাল বড়ই বেশী দেখা যাইতেছে। বলা হয়, যাহা চিরন্তন সত্য তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই ধারণার বশে জগত ও জীবন প্রবাহ সম্বন্ধে নব সত্যের আলোকে সাহিত্য রচনা উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখকেরা অনেক সময় আপনাদের লেখনীর অযোগ্য বিবেচনায় জীবনের তরঙ্গাভিঘাত হইতে আপনাদের সরাইয়া রাখিয়া মন ভুলান কল্পনার জগত বা গতানুগতিক সহজ সুবিধাজনক বিষয়ের বদ্ধ পুঙ্করিণীর মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। মত প্রকাশ নিন্দনীয় ভাবিয়া অনেকে আবার সমসাময়িকের কেবল চিত্র দেখিয়াই নিবৃত্ত হইতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাহাতে উহার মর্ম্ম সত্যই অনেক সময় চাপা পড়ে এবং সাহিত্য অন্তঃশূন্য হইয়া দেহ মাত্র সার হইয়া উঠে; লেখকের মনের সংস্কার পক্ষপাত কিন্তু তাহাতেও প্রকাশ পাইয়াই যায়। শুধু পাঠকেরা সে সম্বন্ধে কোন নির্দেশ (guidance) পায় না, বিষয়টিও তেমন প্রাণলাভ করিয়া উঠিতে পারে না।

কোন বিশেষ কালের বা সমাজের সমস্যাই বা কিন্তু কেন উপস্থিত হয়। অবস্থার পরিবর্তন এবং দৃষ্টির পূর্বেকার আবরণ ভেদ করিয়া নব সত্যের প্রকাশের জন্মই নয় কি? সে সত্য ত দেশাতীত, কালাতীত এবং শাশ্বতই। তাহার প্রকাশই মাত্র এতদিন হইতে বাকি ছিল। কাজেই সে বিষয়ের রচনাও কি দেশাতীত কালাতীত সত্যের কথাই নয়? ইহাও শোনা যায় যে পরে ঐ সব জিনিষ নিতান্তই সাধারণ হইয়া পড়ে; তখন আর উহার কোনই বৈশিষ্ট্য থাকে না। সুতরাং উহা ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্পমূল্য। কিন্তু মানব মনের বহু সত্তাবের বিষয় যে রামায়ণ, মহাভারতাদিতে আছে তাহা ভাল বলিয়া মানুষ জানিয়াছে বলিয়াই কি তাহার সার্থকতা নষ্ট হইয়াছে? না, নূতন সত্যের আলোক দিয়া চণ্ডীদাস যে বলিয়াছিলেন “শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই” তাহা এখন মতবাদে অনন্তর মানুষ অনেকটা মানিয়া লইয়াছে বলিয়াই তাহার মূল্য চলিয়া গিয়াছে? সাহিত্যিকই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, “লোকশিক্ষা তেমনি সত্যের প্রকাশও। তাঁহারা যে সত্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি খুলিয়া দেন, প্রথমে চমৎকৃত (এমন কি অনেক সময় ক্রুদ্ধও) হইয়া ক্রমেই সে সম্বন্ধে তাহার বোধ জাগিতে থাকে, আর অবশেষে উহা মানুষের রাষ্ট্র সমাজ বুদ্ধি হৃদয়ানুভূতির

অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। এই ভাবেই ত সভ্যতার সঞ্চয় ও সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

বাস্তবিক দেশকালের অবস্থা লইয়া ব্যতীত সাহিত্য ত হইতেই পারে না। শকুন্তলাতেও সে সময়ের বহু বিবাহ সর্ব্বের মধ্যে গান্ধার্ব বা পাত্র পাত্রীর মনোনয়নে বিবাহ, ইচ্ছামত পত্নীভ্যাগ * ইত্যাদি বহুবিধ সামাজিক আচার বিচারের বিষয়ই জানা যায় না কি? কিন্তু দেশকালের সংস্কারবদ্ধ দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়া দেখিলেই শুধু তাহা দেশাতীত কালাতীত চিরন্তন সাহিত্য হইবে আর দৃষ্টির অন্ধতা দূর করিয়া দেশকালাতীত প্রকৃত শাশ্বত সত্যের প্রকাশ কিছু দেখাইলেই তাহা সাময়িক হইবে? ইহার বিপরীতই কি বরং সত্য নয়? শকুন্তলাদিতে দেশকালের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার বিষয় দেখান হয় নাই তাহাতেই কি উহাদের মূল্য? আর দেখাইলেই তাহা নষ্ট হইত? যেখানেই ঐ বদ্ধতা, সঙ্কীর্ণতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে সেখানে বরং মূল্যের এমন কি সৌন্দর্য্যেরও লাঘবই ঘটিয়াছে। কারণ অসত্য ও অসতে সৌন্দর্য্য নাই।

মুক্তদৃষ্টি না হইয়া সেই সেই কালের সংস্কারবদ্ধভাবে যাহা প্রকাশ পায়, তাহাতেই বরং পরে আর মানুষের মনের উপর প্রতিষ্ঠা থাকে না। তাহা শুধু কৌতূহল তৃপ্তি এবং তখনকার রাষ্ট্রসমাজ, মানুষের মনোভাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্ম ঐতিহাসিকের গবেষনীর মাত্র হইয়া পড়ে। এমন কি অপূর্ব সৌন্দর্য্যম্পৃষ্টির মধ্য হইতেও অনেক সময় একটা শব্দ বা বাক্যই লেখকের মনের স্তর উপলব্ধ হইয়া রসভঙ্গ করিয়া আঘাত দেয়। যেমন রামের সীতাকে বনে পাঠাইবার প্রসঙ্গে রঘুবংশে কালিদাসের “অপি স্বদেশহ্যং কিমুতেন্দ্রিয়াখ্যাং যশোধনাম্ হি যশো গরীয়ঃ—এই শ্লোকংশটীতে ঘটিয়াছে। তবে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি যে চিরকাল ধরিয়া মানুষকে পরমানন্দ দিয়া আসিতেছে তাহার কারণ যে অধিকাংশস্থলেই উহাতে দেশকালের গভী অতিক্রান্ত হইয়া সনাতন সত্য স্বন্দরের মহৎ প্রকাশ হইয়াছে। ইহাও মনে করা উচিত প্রাচীন সাহিত্যে কালের অজ্ঞান স্থানে স্থানে আমাদের

* যথা—দুয্যন্তের শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানকালে শাদরবের উক্তি:—

“তদেষ ভবতর কান্তা ত্যজ বৈনাম গৃহান বা।

উপপন্না হি দারেষু প্রভূতা সর্ব্বতোমুখী ॥”

আঘাত করিলেও লেখকেরা সমসাময়িক মানুষ ও রাষ্ট্র সমাজের বহু উর্দ্ধে ও বহু অগ্রবর্তীই ছিলেন। আর তাঁহারা নিরন্তর মানব সংস্কৃতিকে অগ্রসর করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বর্তমান জ্ঞানগরিমা। সুতরাং সাময়িক অবস্থার মাছিমায়া অনুলেখনাই নয়, তাহার সংস্কার, পরিবর্তন, উন্নতির আদর্শ দানও বিশেষরূপেই সাহিত্যের অধিকার।

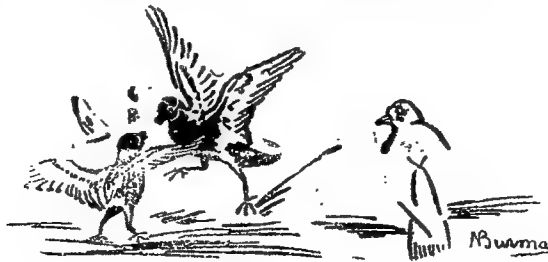
কিন্তু আমাদের সমালোচকেরা একদিকে বলিতেছেন সমসাময়িক বিষয় সাহিত্যে অপাংক্তেয়। অতীতকে বস্তু ও বিকৃত যৌন সাহিত্যে দেশ ও কাগজের পাতা ভিত্তি হইয়া চলিয়াছে। নব্য শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা উভয়তঃই প্রতিকৃদ্ধ। এবং এখন এত যে মহৎ সত্যের দিকে মানুষের মন ও দৃষ্টি খুলিতেছে, হৃদয়ের আকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, আমাদের লেখকদের লেখনীতে তাহা অঙ্গই রূপলাভ করিতেছে। বাস্তবিক ন্যস্তার এত চড়াছড়ি, কিন্তু সত্যই নবীন, মহৎ সত্যাদর্শ সম্বন্ধে আমাদের লেখকদের মত, ধারণা ও আদর্শ কতই অস্পষ্ট ও বিকৃত! আর propaganda (মতপ্রচার) Social reform (সমাজ সংস্কার) তাঁহারা ঘৃণা করেন বলিলেও লেখায় তাঁহাদের মনোভাবে শ্রেষ্ঠ সত্য বা তাহার সুন্দর ও মহদাভাসই শুধু নাই। বস্তু সাহিত্যে ঘৃণ্য হয় এইজন্ত যে তাহাতে ন্যাকার জনক বিষয়ের খেলো বিবৃতিই থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যের বিরাট মানব হৃৎ, মানব হৃদয়শায় আমাদের মস্তকের গভীরে সাড়া জাগাইবার সোনার কাঠি নাই—অনেক প্রখ্যাত পাশ্চাত্য গ্রন্থে বাহার নিদর্শন প্রচুরই রহিয়াছে। যৌন সাহিত্যও এইজন্ত নিরুপ্ত হইতেছে যে, তাহাতে নিরুপ্ত ভাবই মূর্ত হইতেছে। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রসমাজাদর্শের অন্তায়, অপচার দরদের সহিত মহৎ ও সুন্দররূপে স্ফুর্তি পাইতেছে না।—সাময়িক সমস্যা বা নব সত্যের বিষয় বলিয়া নয়।

“রস সাহিত্যে” রসেরই প্রকাশ হইবে একথাও আজকাল খুবই জোরে শোনা যাইতেছে। কিন্তু খালি লিপিতার্থ্য ও নয়, সেই লিপিতে যে ভাব রূপ পায়, তাহাতেই রসের সঞ্চার। সে রস যতই মহত্তাব ও সত্যের অনুকূল ও প্রকাশক হয়, ততই তাহা শ্রেষ্ঠ রস সঞ্চারী হইয়া থাকে। রসের স্তর ভেদ নাই। যে রসে গাড়োয়ানের চিত্তবিনোদন হয় ও সে

রস পাইয়া থাকে, বিশ্বস্তের তাহা অপেক্ষ। তাহাতে রসও তাঁহারা পান না, আহত হন। (অবশ্য গাড়োয়ান বেচারার কাছেও অমৃত রসের পরিবেশন ও তাহাতে তাহার স্বাদ জন্মান সুখীজনেরই কাজ) ইহা যে কেবল স্পষ্টতর খেলো ও অশ্লীল বিষয় সম্বন্ধেই হয় তাহা নয়। যদি কোন লেখায় প্রকৃত গভীর ও মহত্তর সত্য ও অনুভূতিতে আঘাত লাগে বা তাহা চাপা দেওয়া হয়, কিম্বা তাহাকে ভুল রংয়ে দেখান হয়, তাহা হইলেও ঐ রসবোধে বাধা জন্মে। রস সঞ্চার না করিয়া উহাতে মনে আঘাত ও বেদনাই দেয়। কাজেই রস সাহিত্য বলিলেই হয় না; তাহাতে বুদ্ধি, অনুভূতির সম্ভাব মূলক মনের গভীর স্পন্দ তার স্পর্শ করা চাই নতুবা উহা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য পদ বাচ্য হইতেই পারে না।

তবে কোন সত্যকে যতদিন অবধি মানুষ মানিতে চায় না, ততদিনই এই হইয়া থাকে বটে। তাই Uncle Tom's Cabin এ দাসত্বপ্রথা বা Dickens এর উপন্যাসে তৎকালীন বিদ্যালয় ও বাল্য জীবনের অপচার অপচারাঙ্গি সম্বন্ধে যে মানুষের দৃষ্টি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির কি অত্যাশ্চর্য সংস্কারমূলক সাহিত্যের প্রশংসা হইলেও Ibsen এর রচনায় নারীর অবস্থার বিসদৃশতা দেখান হইয়াছে বলিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এখনও নিতাই হইয়া থাকে। তেমনি প্রচলিত সমাজ নিয়মের বিরুদ্ধ বহু বিষয়ই নব্য লেখকদের রচনায় সিংহাসন পাইলেও মেয়েদের মুক্তি প্রসঙ্গেই পুরোক্ত “propaganda” “social reform এর প্রতি বিদ্বেষ এবং “Art for art's sake” ইত্যাদি গাল ভরা বড় বড় কথা বেশী শুনিতে পাওয়া যায়।

সংস্কারমূলক না হইলেই যে সাহিত্য হইবে না, কিম্বা ঐ বিষয়ক হইলেই বাহা কিছুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইয়া উঠিবে এও অবশ্য নয়। কি যে সাহিত্যের বিষয়, আর কি যে নয়, তাহারও বাধা ধরা কোন গণ্ডী নাই। সাহিত্যিক গুণের ঔৎকর্ষ্যের সহিত রচনার ব্যঙ্গনাও যে পরিমাণে মহৎ মানবতার অনুকূল ও উদার সত্যের আভাসক হয় সেই পরিমাণে তাহার শ্রেষ্ঠ ও সাহিত্যত্বে। ইহার যে কোন দিকের ক্রটিই লাঘবতা। লিপিকলাকে সাহিত্যের দেহ আর ভাবাঙ্গীপাকে তাহার মন বলা যাইতে পারে।



প্রেমোৎপল

শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী, সাহিত্য-ভারতী

—১—

কলিকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা। দেখিলেই মনে হয় উহা কোনো ধনীর আবাস-গৃহ। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে সেই অট্টালিকার নিম্নতলস্থ একটি সুসজ্জিত কক্ষে এক তরুণী গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিষমভাবে কি যেন চিন্তা করিতেছিল। তরুণীর সম্মুখে একখানি পুস্তক খোলা ছিল; হয় তো কিছুক্ষণ পূর্বে তাহাই সে পাঠ করিতেছিল; এক্ষণে কিসের চিন্তায় সেই পুস্তকের দিকে তাহার মন নাই। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া তরুণী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস তাগ করিয়া উঠবার উপক্রম করিতেই একটি যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সঙ্গেসঙ্গে উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের প্রতি পতিত হইল। যুবকটি তরুণীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল—‘এ কি! তোমার কি হয়েছে, নন্দিতা? তোমার মুখখানি অমন বিষম কেন? তোমার কি কোনো অসুখ করেছে?’ যুবকের প্রশ্ন শুনিয়া তরুণী যেন চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার চিন্তাক্রান্ত মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া সে উত্তর করিল—‘না, না, আমার তো কিছুই হয়নি।’ কিন্তু মুখে এই সামান্য কথা বলিতে গিয়াই সে অন্তরের ভাব গোপন রাখিতে পারিল না। ‘কিছুই হয়নি’—বলার সঙ্গেসঙ্গেই তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। যুবক তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল—‘তোমার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। কি হয়েছে, আমাকে বলবে না?’ যুবকের সহানুভূতিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া তরুণীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল-ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তাহার পক্ষে সেখানে আর দাঁড়াইবার উপায় রহিল না। সে অঞ্চল দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া দ্রুত সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে যুবকের দিকে একবারমাত্র ফিরিয়া বলিয়া গেল—‘আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার মন বড়ই চঞ্চল। আমি আজ আর পড়তে পারব না।’

—২—

এই তরুণীটি আর যুবকটি কে? পাঠকপাঠিকা হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন তরুণীর নাম নন্দিতা। নন্দিতা বরাহনগরের জমিদার ব্রজবল্লভ রায়ের কন্যা। বরাহনগরের রায়বংশ পুরুষানুক্রমে মহাপ্রতাপশালী ছিলেন। ঐশ্বর্য্যে ও পদমর্যাদায় তাঁহাদের সমকক্ষ সেই অঞ্চলে কেহই ছিলেন না। কয়েক পুরুষ ধরিয়া রায়বংশের এই প্রতাপ অক্ষুণ্ণভাবে চলিতে লাগিল। কিন্তু ব্রজবল্লভের পিতামহের আমল হইতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল। ব্রজবল্লভের পিতামহ ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমনই উচ্ছৃঙ্খল। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে রায়বংশের অতুল সম্পত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। দুই পুরুষ পরে ব্রজবল্লভ যে জমিদারীর মালিক হইলেন তাহার অবস্থা হইল ‘গজভুক্ত কপিথবৎ’। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার মনে রায়বংশের ধনগর্ব ও দান্তিকতা পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান ছিল। ব্রজবল্লভ অল্পবয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার স্ত্রী নন্দিতাকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। পত্নীহারী হইয়া ব্রজবল্লভ আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই। একমাত্র কন্যাকে মাতার ন্যায় যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। নন্দিতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাহার শিক্ষার ব্যবস্থাও করিলেন। এই কন্যাটি ব্রজবল্লভের পত্নী-বিয়োগ-বিধুর হৃদয়ের সান্নিধ্যস্থল হইয়া উঠিল; সুতরাং পিতার অত্যধিক স্নেহে কন্যাও সর্বপ্রকার স্বাধীনতার অধিকার প্রাপ্ত হইল। নন্দিতার সঙ্গে ইতিপূর্বে যে যুবকটির কথা হইতেছিল তাহার নাম স্বপন। স্বপন দরিদ্র যুবক। কলিকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য সে দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিত। তাহার সেই আত্মীয়ের নাম ছিল শিবনাথ চৌধুরী। শিবনাথ ব্রজবল্লভের অন্তরঙ্গ স্নহদ ছিলেন। তার উপর শিবনাথের কন্যা প্রতিমা ছিল নন্দিতার সহপাঠিনী। সেই স্নেহে স্বপনের সঙ্গে নন্দিতার পরিচয় হয়; এবং সময় সময় সে নন্দিতাকে লেখাপড়ায় সাহায্য করিতে থাকে।

ব্রজবল্লভ কন্ঠার জ্ঞাত একজন শিক্ষক খুঁজিতেছিলেন। তিনি নন্দিতার মুখে স্বপনের নাম শুনিয়া এবং শিবনাথের কাছে তাহার সংস্কারের পরিচয় পাইয়া তাহাকে কন্ঠার শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। স্বপন এইভাবে ব্রজবল্লভের পরিবারে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহার বিনয়-মধুর ব্যবহারে নন্দিতা দিনে দিনে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। স্বপনও নন্দিতার সরল ও আত্মীয়তামূলক কথাবার্তায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। ফলে উভয়ে উভয়ের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ পোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া একে অস্ত্রের নিকটে তাহা কখনও ব্যক্ত করে নাই। স্বপন ভাবিত সে দরিদ্র আর নন্দিতা ধনীকন্ঠা। নন্দিতা কিন্তু স্বপনের মুখের দিকে চাহিয়া ধনগৌরব বংশমর্যাদা ও ভুলিয়া বাইত। একদিকে এক মৌন পূজারী নীরবে তাহার হৃদয়ের প্রতিষ্ঠিতা দেবীকে গোপন-ভালবাসার অর্ঘ্য দিত। অতীত একটা তাহার উন্মেষিত জীবনের পবিত্র প্রেম পূজার ফুলটার মতই অজানিতভাবে প্রেমাল্পদের পায়ে উৎসর্গ করিত। ব্রজবল্লভ ইহার কোনোই সন্ধান রাখিতেন না। কন্ঠার বয়স হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার বিবাহের জ্ঞাত উদ্যোগী হইলেন।

—৩—

সংসারে গৃহিণী না থাকিলে অনেক অনর্থ ঘটে। ব্রজবল্লভের গৃহ দাসদাসী পরিপূর্ণ হইলেও একমাত্র গৃহকর্ত্রীর অভাবেই কন্ঠার মনের ভাব পিতার অগোচরেই রহিল এবং সেই সুযোগে স্বপনের ও নন্দিতার অনুরাগ ক্রমশঃ গভীর প্রেমে পরিণত হইল। এই সময়েই ব্রজবল্লভ কন্ঠার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ব্রজবল্লভ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন মাতৃহীন কন্ঠাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনুচ্চ রাখা সমীচীন নহে। কন্ঠাস্নেহে একবার তাহার মনে হইল দরিদ্র-ঘরের কোনো সুপাত্র আনিয়া কন্ঠা-সম্প্রদান করেন এবং জামাতাকে পুত্রের স্থায় নিজ ভবনে স্থান দেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন, ইহাতে তাহার কন্ঠার ও জামাতার উভয়েরই মর্যাদার লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা। স্তবরাং তুল্য গৃহে তিনি জামাতার সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই একটা সুপাত্র জুটিল। জমিদারের পুত্র না হইলেও পাত্রের পিতা ধনবান ছিলেন এবং পাত্রটীও শিক্ষিত হইয়া

উঠিতেছিলেন। এই সম্বন্ধের কথা যখন নন্দিতার কানে উঠিল তখন সে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিল। তারপর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেলে তাহার আর ধৈর্য্য রহিল না। সকলের মুখে আসন্ন আনন্দোৎসবের সংবাদ শুনিয়া সে মনের জুখে একাকী বাসগৃহের নিম্নতলে বসিয়া ছিল। তখনই তাহার বিষন্ন মুখ দেখিয়া স্বপন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্বেই আমরা তাহার পরিচয় দিয়াছি।

—৪—

যথাসময়ে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। অকণোদয়ের সন্দেশেই নহবতের করণ রাগিনী এবং আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের হাঙ্গাম-কলরবে বিবাহ-বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বাহাকে লইয়া এই সমারোহ তাহার মুখে হাসি নাই,—সে যেন একটা বিষাদ-প্রতিমার প্রতিমূর্তি! আজ প্রতিমূর্ত্তে তাহার স্বপনকে মনে পড়িতে লাগিল। সে ভাবিল এই হাস্যকোলাহলের মধ্যে স্বপনের কোলের উপর মুখ লুকাইয়া একটীবার কাঁদিতে পারিলে যেন তাহার যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ উপশম হয়। কিন্তু স্বপন কই? স্বপনের হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল তাহার তরঙ্গাঘাতে সে-ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন নন্দিতার বিষন্ন মুখ দেখিয়া তাহার মনে অজানিত কিসের এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সন্দেহ বাস্তবতার পরিণত হইল যখন নন্দিতার বিবাহের সংবাদ তাহার কানে পৌঁছিল। সন্দেশে তাহার এই ধারণাও হইল যে তাহারই জ্ঞাত নন্দিতাও তাহাকে ভালবাসে এবং এই বিবাহে নন্দিতার মনে সুখ নাই। নিমন্ত্রিত হইয়াও নন্দিতার অস্তরের নিরানন্দ-উৎসবে তাই সে যোগদান করিতে পারিলেন না।

সূর্য্যোদয়ের দিনের শেষে তাহার অবসন্ন দেহভার সন্ধ্যারাগীর শিথিল কোলে ঢালিয়া দিয়াছেন। কুলবধূগণ মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া তাহার অন্তঃগমন-বার্তা প্রচার করিতেছে। বিবাহের লগ্ন উত্তীর্ণ-প্রায়। কিন্তু বর আসিয়া পৌঁছাইতেছে না কেন। এক অজানিত আশঙ্কায় সকলেরই মুখে চিন্তার ছায়া। এমন সময় খবর আসিল মোটর-গাড়ীতে আসিতে আসিতে অর্দ্ধপথে গাড়ী উল্টাইয়া যাওয়ার পাত্রের মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে; তজ্জন্ত মরণাপন্ন অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া

হইয়াছে। এই নির্দারণ সংবাদ শুনিয়া ব্রজবল্লভের মাথা ঘুরিয়া গেল; তিনি বজ্রাহতের ভ্রায় ভুতলে বসিয়া পড়িলেন।

শিবনাথ বিবাহ বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রজবল্লভের নিরাশ-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—‘বল্লভ, এখন কি এত উতলা হ’লে চলে? এই সময়ই তোমার ধৈর্য্য রাখার একান্ত দরকার। তুমি নিজেই অস্থির হ’য়ে পড়লে আজকের সমস্ত আয়োজন যে ব্যর্থ হ’য়ে যাবে। এই বুঝে মনকে শান্ত কর।’ ব্রজবল্লভ ব্যাকুল-নেত্রে চাহিয়া বলিলেন—‘এই মহাবিপদের কথা শুনে আমার মাথার কিছুই ঠিক নেই। কি যে করব তার কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছি না।’ বলিতে-বলিতেই শিবনাথের দুইখানি হাত ধরিয়া হাইমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শিবনাথের মুখ হইতে কোনো সাহস-বাক্য বাহির হইতে না হইতে তিনি বলিলেন—‘শিবনাথ, তুমি আমার সহোদরের অধিক। আজ আমার মেয়ের বিয়ে না হ’লে আমার জাতিকুল মান-সম্মত সমস্তই যাবে। বিশেষতঃ এই পাত্রের যদি কোনো বিপদ ঘটে তাহ’লে অপরা ব’লে আমার মেয়ের কলঙ্কেরও অবধি থাকবে না। আজই যাতে আমার মেয়ের বিয়ে হ’তে পারে তার উপায় কর।’ শিবনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—‘উপায় একটা আছে। তুমি কিছু মনে না কর তো খুলে বলি। স্বপন তোমার পরিচিত। কুলেশীলে বিদ্যাবুদ্ধিতে সে খুবই ভালো। অবশ্য সে দরিদ্র। কিন্তু তোমার বিষয়-সম্পত্তি তো তোমার একমাত্র কন্ডারই প্রাপ্য। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহ’লে স্বপনের হাতে নন্দিতাকে সমর্পণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া এই রাত্রে জানাশুনা স্ত্রপাত্র আর মিলবেই বা কোথায়?’ শিবনাথের প্রস্তাব শুনিয়া ব্রজবল্লভের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া স্নানমুখে বলিলেন—‘আচ্ছা, তাই হোক। এ ছাড়া তো আর কোনো উপায় আমিও দেখতে পাচ্ছি না।’

স্বপন নিজের ঘরে শুইয়া বিমর্ষমুখে আকাশ-পাতাল কত কি চিন্তা করিতেছিল। এমন সময়ে শিবনাথ ব্রজবল্লভকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বপন তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেই ব্রজবল্লভ তাহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন—‘বাবা, আমার ও নন্দিতার মান-সম্মত আজ তোমারই উপর নির্ভর করছে। তাই

এত রাত্রে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি আমাকে বিপদ হ’তে উদ্ধার কর।’ স্বপন ব্রজবল্লভের কথার মর্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ক্যালফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্রজবল্লভ কাতরস্বরে বলিলেন—‘স্বপন, নন্দিতার জন্ত আমি তোমাকে ভিক্ষা চাইছি। তুমি আমায় মহাবিপদ হ’তে রক্ষা কর।’ স্বপন তখনও কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শিবনাথকে বলিল—‘কি ব্যাপার, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে কি করতে হবে, বলুন।’ শিবনাথ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া স্বপনকে বলিলেন—‘নন্দিতাকে তাহার বিবাহ করিতে হইবে। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনিয়া স্বপনের মনে হইল—সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। বিহ্বলভাবে তাই সে নতদৃষ্টিতে ব্রজবল্লভের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজবল্লভ মিনতিপূর্ণ স্বরে আবার বলিলেন—‘আজ আমার বড় বিপদ, বাবা। তুমি বল, নন্দিতাকে গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি নেই।’ স্বপন ব্রজবল্লভের মর্মস্পর্শী কথা শুনিয়া নতস্বরে বলিল—‘আপনার আদেশ-পালনে আমি প্রস্তুত। কিন্তু আমি দরিদ্র-সন্তান; আমার হাতে আপনার কন্ডাকে দান ক’রে আপনি কি সুখী হবেন?’ স্বপন দরিদ্র-সন্তান—এই কথা মনে হইতেই ব্রজবল্লভের মুখখানি নিম্নের জন্ত পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু মুহূর্তপরেই তিনি আত্মসম্বরণ করিলেন—‘তিনি নিজে সুখী হউন আর না-ই হউন, তাঁহার মানমর্যাদা-রক্ষার আর যে কোন উপায় নাই! গর্হিত ব্রজবল্লভ অসহায় দৃষ্টিতে স্বপনের দিকে একবারমাত্র তাকাইলেন, তারপরেই তাহার হাত-দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

—৫—

বিবাহের আনন্দোৎসবের মধ্যেও নন্দিতার মন উদাস ছিল। চারিদিকের সমারোহের ভ্রায় উপস্থিত গোলযোগের সংবাদও তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। বিবাহের আসনে বসিয়াও তাহার দৃষ্টি কোন সুদূরের লক্ষ্যে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু শুভ-দৃষ্টির সময়ে আপনার অগোচরেই সে চক্ষু তুলিয়া যখন সম্মুখের দিকে তাকাইল তখন তাহার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না! নন্দিতা উৎসুক-নয়নে দেখিল—তাহার সম্মুখে তাহারই ধ্যানের দেবতার উজ্জ্বল চক্ষুর শুভদৃষ্টি! অপ্রত্যাশিত আনন্দে সে তখন অভিভূত হইয়া পড়িল।

এই আনন্দেরই আতিশয্যে বাসর-গৃহে গিয়া সে নিজেরই শয্যাপার্শ্বে যখন চিরবাহিত স্বপনকে পাইল তখন আত্মহারা হইয়া স্বপনের বুকের মধ্যে এলাইয়া পড়িল। স্বপন প্রেম-পুলকে উভয় হস্তে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিল। সঙ্গসঙ্গে কৃষ্ণপঙ্কের পক্ষমীর চন্দ্রকলার ছায় উপবাসক্লিষ্ট নন্দিতার অধর দুইখানির উপর সে লুইয়া পড়িল।

—৬—

ব্রজবল্লভ আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে। কিন্তু বিবাহের পরে তাঁহার ধনগর্ষ তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিল। নন্দিতার বিবাহ যে স্বপনের সঙ্গে হইতে পারে, কোনোদিন তিনি কল্পনায়ও তাহা মনে করেন নাই। কল্পনা যখন বাস্তব সত্যে পরিণত হইল, তখন তিনি তাহা বরণ করিয়া লইলেও সেই সত্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

পূর্বেই বলিয়াছি স্বপন দারিদ্রের সন্তান। শৈশবেই সে পিতৃমাতৃহারা। দূরসম্পর্কীয় এক দিদির বাড়ীতে সে মানুষ হয়। উচ্চশিক্ষার সময় সে শিবনাথ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে। নন্দিতার সহিত তাহার বিবাহের সময়ে ও শিবনাথই তাহার অভিভাবকের পদ গ্রহণ করেন। শিবনাথের সঙ্গে ব্রজবল্লভের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় বিবাহের পরও নন্দিতার সঙ্গে শিবনাথের গৃহ পিত্রালয়ের তুল্যই ছিল। যে ভাবে নন্দিতার সঙ্গে স্বপনের হঠাৎ বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে স্বপন নিজের অদৃষ্টকে নিজেই সহসা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তার উপর তাহার দিদির পরিচয়ে নিজের দারিদ্র্য ব্রজবল্লভের সম্মুখে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিতে সে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। কিন্তু যে ভগিনীর যত্নে তাহার বাল্যজীবন গঠিত তাঁহাকে একবার নিজের স্ত্রী দেখাইয়া আনিবার ইচ্ছা দমন করিতেও পারিতেছিল না। একদিন তাই সে ব্রজবল্লভের কাছে প্রস্তাব করিল যে নন্দিতাকে লইয়া সে তাহার দিদির গৃহে বাইতে চায়। ব্রজবল্লভ এই প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমে কোনোই উত্তর করিলেন না। কিন্তু স্বপন যখন তাহার অভিলাষ বারংবার ব্যক্ত করিতে লাগিল তখন তিনি সন্তানের অন্ধ মমতায় রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। ব্রজবল্লভ বিরক্তির স্বরে স্বপনকে বলিলেন—‘তুমি

আমার মেয়েকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও? তুমি কি জান না সে কখনও মাটির ঘরে বাস করেনি? তার উপর তোমার দিদির বাড়ীতে কি ঠাকুর-চাকর আছে যে সে হাত না পুড়িয়ে ছুটো খেতে পাম্বে?’ ব্রজবল্লভের কথা শুনিয়া স্বপন অত্যন্ত ব্যথিত হইল। দারিদ্র্যের অপমান তাহার জীব সম্পর্কেও যে তাহাকে সহিতে হইবে ইহা কখনও সে মনে ভাবে নাই; বিশেষতঃ তাহার বিবাহের সময়ে এ দারিদ্র্য ব্রজবল্লভ উপেক্ষার চক্ষে দেখেন নাই। নিজের দারিদ্র্যের বেদনা নিজের মনের মধ্যেই গোপন করিয়া সেই উত্তর করিল—‘আপনি জানেন তো আমি গরীবের সন্তান। আমার দিদির মাটির ঘরই আমি মানুষ হয়েছি। তার উপর আমার মা-বোনের রান্না খেয়েই আমরা চিরদিন অমৃতের স্বাদ পেয়ে এসেছি।’ ব্রজবল্লভ শ্রবের স্বরে বলিলেন—‘সে রকম অমৃতের স্বাদ নেওয়ার দিন আর এখন নেই, বাপু! আমার বাড়ীতে আমার মেয়ে-জামায়ের অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না। সে অন্নবস্ত্রের সংস্থান অল্পস্থানে তুমি করতে চাও তো তার সঙ্গে ঠাকুর-চাকরের ব্যবস্থাটাও আগে ক’রে রেখো। যে পর্যন্ত সে ব্যবস্থা না হয় সে পর্যন্ত নন্দিতার অন্ত্র যাওয়া অসম্ভব।’ ব্রজবল্লভের কথায় স্বপনের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। সে আর দ্বিধাক্তি না করিয়া ব্রজবল্লভের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

—৭—

পরদিন স্বপন সংবাদ পাইল তাহার দিদির জীবন অমুখ। সে কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ দিদির বাড়ীতে চলিল। নন্দিতাকে সঙ্গে লওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও ব্রজবল্লভের আপত্তি মনে করিয়া তাহাকে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিতে সাহসী হইল না। যাওয়ার পূর্বে নন্দিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—‘দিদির কঠিন ব্যামোর সংবাদ পেয়ে আজই আমাকে দিদির বাড়ী যেতে হচ্ছে। করে ফিরতে পারি ঠিক নেই। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব বড়ই সাধ ছিল; কিন্তু তা হবার উপায় নেই।’ নন্দিতা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে স্বপনের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—‘তোমার দিদির অমুখ বলছ, অথচ তুমি একলা বাড়ী যাবে, কেন? আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে কিসের বাধা?’ ‘বাধা!’—অভিমান-স্বরস্বরে স্বপন বলিল—‘বাধা আমার কাছে কিছুই নেই,

নন্দিতা। ‘আমি দরিদ্রের সন্তান, তুমি ধনীর কন্যা, তোমার পিতার মতে আমার গৃহে তোমার বাস সম্ভব নয়।’ নন্দিতা আশ্চর্য হইয়া বলিল—‘সে কি! তুমি আমার স্বামী—তোমার গৃহ আর আমার গৃহ কি আলাদা?’ স্বপনের ইচ্ছা ছিল না ব্রজবল্লভের কথাগুলি নন্দিতার কানে তোলে। কিন্তু নন্দিতা যখন—‘কি হয়েছে?’—বলিয়া স্বপনকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তখন ব্রজবল্লভের সহিত তাহার যে কথাবার্তা হইয়াছিল বাধ্য হইয়া তাহা আত্মপূর্বক তাহাকে শুনাইতে হইল। তাহা শুনিয়া নন্দিতা অত্যন্ত ব্যথিত হইল। পিতার কথায় স্বামী যে অপমান বোধ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। আবেগভরে স্বপনের কাঁধে মাথা রাখিয়া সে বলিল—‘বাবা হয় তো ভুলে গিয়েছেন তাঁর পরিচয়ই আজ আমার গৌরব নয়, তোমার গৃহই এখন আমার বৈকুণ্ঠ।’

নন্দিতা স্বপনের সঙ্গে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করিলেও স্বপনের অভিমান পিতার অমতে তাঁহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার পক্ষে বাধ্য জমাইল। সে যখন কিছুতেই নন্দিতাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইল না তখন নন্দিতা তাহাকে বলিল—‘মিদি কেমন থাকেন, গিয়েই জানিও; আর তাঁকে দেখে যত শীগগির পার ফিরে এস। আমি কিন্তু বেশিদিন একলা থাকতে পারব না।’

কিছুদিনের মধ্যেই স্বপনের দিদি সারিয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে স্বপন চাকুরীর জন্ত চেষ্টা করিতেছিল। তাহার ফলে এলাহাবাদে তাহার একটা চাকুরী হইল। সেই চাকুরীতে যোগদান করিতে যাইবার সময় সে নন্দিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। নন্দিতা তখন তাহাকে ধরিয়া পড়িল সে-ও তাহার সঙ্গে যাইবে। স্বপনের যে চাকুরী জুটিয়াছিল তাহাতে তাহার বাসস্থানও নির্দিষ্ট ছিল, সুতরাং নন্দিতাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার পক্ষে অসুবিধা না থাকিলেও তাহার প্রধান অন্তরায় এই হইল যে ব্রজবল্লভ তখন জমিদারীর কার্যে মগ্ন:স্থলে গিয়াছিলেন। নন্দিতা স্বপনকে বুঝাইল সে পিতাকে একখানি চিঠি লিখিয়া যাইবে; তাহাতেই তিনি সমস্ত সংবাদ পাইবেন।

নন্দিতার আগ্রহে স্বপনের পক্ষে নন্দিতাকে ছাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হইল না। কিন্তু শুধুমাত্র নন্দিতার

চিঠির উপরেই নির্ভর করিয়া তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে তাহাকে দূর দেশে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে কিনা তাহাও সে ভাবিতে লাগিল। এই বিষয়ে কাহারও পরামর্শ লওয়ার উপায়ও তখন ছিল না; কারণ স্বপনের একমাত্র অভিভাবক শিবনাথ চৌধুরীও গৃহে ছিলেন না; প্রতিমার দিদিমার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সপরিবারে তিনি পূর্বেই শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন।

নন্দিতা স্বপনকে ছাড়িয়া থাকিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। পিতার নামে একখানি চিঠি লিখিয়া সে স্বপনের সঙ্গে চলিল। চিঠিতে সে পিতাকে লিখিল—

‘শ্রীচরণেষু—

বাবা, পিতৃগৃহের ঐশ্বর্য্য দিনরাত আমাকে কণ্টকের দ্বায় বিদ্ধ করিতেছে। আপনি বাঁহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন তিনি দরিদ্র হইলেও তাঁহার গৃহই এখন আমার স্বর্গ। তাঁহার সঙ্গে তাই আমি চলিলাম। আপনার আদেশ লইয়া যাইতে পারিলাম না, সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যেখানে যাইতেছি সেখানে পৌছিয়া ঠিকানা দিব ও সবিশেষ লিখিব।

আপনার স্নেহের—নন্দিতা

এলাহাবাদে পৌছিয়া স্বপন নির্দিষ্ট কার্যে যোগদান করিল। নূতন স্থানে নূতন সংসার গুছাইয়া লইতে নন্দিতার দুই-চারিদিন কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে ব্রজবল্লভকে আর চিঠি দেওয়ার সুযোগ হয় নাই। ইহার পরেই আর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটয়া গেল।

এলাহাবাদে রওনা হওয়ার পূর্বে নন্দিতা ও স্বপন তাহাদের বিবাহিত জীবনের অভীক্ষিত ফললাভের প্রত্যাশায় উৎফুল্ল ছিল। কিন্তু এলাহাবাদ পৌছিবার সঙ্গেসঙ্গেই অনিয়ম ও পঞ্চশ্রাম নন্দিতার সম্ভাবিত মাতৃস্বের আশা-মুকুল অকালে বৃন্তচ্যুত হইল। ফলে রুগ্ন-শয্যায় পড়িয়া নন্দিতা জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইল; এবং তাহাকে লইয়া স্বপন বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। প্রায় একমাস চিকিৎসা ও অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষার ফলে যখন নন্দিতার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা হইল তখন স্বপন ব্রজবল্লভের কাছে সংবাদ পাঠাইল। কিন্তু সে সংবাদ ব্রজবল্লভের কাছে পৌছাইবার পূর্বেই তিনি প্রবাসযাত্রা করিয়াছিলেন।

জমিদারীর কার্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রজবল্লভ নন্দিতার চিঠি পাইলেন। তখন একমাত্র সন্তানের ব্যবহারে তিনি যেমন ক্ষুব্ধ হইলেন, তেমনই সন্তানের বিচ্ছেদ-বাতনায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। গৃহে মনস্থির করিতে না পারিয়া তিনি তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হইলেন। ইহারই কিছুকাল পরে স্বপনের চিঠি তাঁহার নামে আসিল। কাজেই সে চিঠি তাঁহার হস্তগত হইল না।

প্রবাসে এদিক-সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রজবল্লভ এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার বাল্যবন্ধু ডাক্তার অবনীমোহন সরকার থাকিতেন। ব্রজবল্লভ তাঁহারই বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। সেইদিন বৈকালে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ডাক্তার অবনীমোহন ব্রজবল্লভকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন—‘চল হে বল্লভ, তোমাকে আমার ছেলে মেয়ে দেখিয়ে আনি।’ ডাক্তারবাবু চিরকুমার ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ছেলেমেয়ের কথা শুনিয়া ব্রজবল্লভ আশ্চর্য্যাম্বিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন—‘সে কি হে? তোমার আবার ছেলে-মেয়ে এল কোথেকে?’ ডাক্তারবাবু বলিলেন—‘আগে তাদের দেখই না হে।’ একবার দেখলে, আমার কেন, তোমাকেও তাদের ছেলেমেয়ে বলতে হবে। ‘ব্রজবল্লভ জিজ্ঞাস্থনে তে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—‘ব্যাপার কি, খুলেই বল না।’

ডাক্তারবাবু তাঁহার ছেলে-মেয়ের পরিচয় দিতে লাগিলেন—‘আমার ছেলে এখানকার কলেজের এক তরুণ অধ্যাপক, আর মেয়েটি তারই স্ত্রী। এখানে তারা অল্পদিন হল এসেছে। এসেই মেয়েটি এমন রোগে পড়ল যে তাঁর জীবনের আশা ছিল না। তখন রোগীর চিকিৎসার ভার আমার উপর পড়ে। গিয়ে দেখি রোগশয্যায় এক স্বর্ণ-প্রতিমা, আর তারই শয্যাপাশে এক দিব্যকান্তি তরুণ যুবক। তখন সে প্রতিমার বিসর্জনের সময় উপস্থিত-গ্রায়; কিন্তু স্বামীর অক্লান্ত সেবায় ও আত্মত্যাগে তার পুনঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্বামী নিজের দেহের রক্ত একে একে সাত দিন দান করে স্ত্রীর জীবন দান করেছে। মেয়ে আমার এখন বিপদমুক্ত, কিন্তু ভীষণ রক্ত-মোক্ষনে ছেলেটি শয্যাশায়ী। চল, তোমাকে এই রক্ত-ছুটি দেখিয়ে আনি।’ ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হইতেই তাঁহার গাড়ী একটি ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে

আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তারবাবু ব্রজবল্লভকে সেই বাড়ীটি দেখাইয়া বলিলেন—‘এস, এখানেই আমাদের নামতে হবে।’

তখন ভাস্করদেব পৃথিবীকে তাঁহার বিদায়-অভিনন্দন জানাইতেছিলেন। তাহারই শেষ রক্তিমাতার ক্ষীণরশ্মি গবাঙ্ক-পথে কক্ষমধ্যস্থ শয্যাশায়ী এক যুবকের শীর্ণ-বিবর্ণ ওষ্ঠাধরে স্তিমিত আলোকের সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতেছিল। যুবকের শয্যাপাশে এক তরুণী উপবিষ্টা ছিল। যুবকের একপাশে শীর্ণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির মধ্যে শৃঙ্খলিত করিয়া তরুণী মুগ্ধনে তে তাঁহার ওষ্ঠাধরের দিকে তাকাইয়া ছিল।

গৃহের দ্বার মুক্ত ছিল, ব্রজবল্লভকে লইয়া ডাক্তারবাবু সেই দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘এই দেখ, বল্লভ, এরাই আমার ছেলে-মেয়ে।’ ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া স্বপন ও নন্দিতা উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল। নন্দিতা দ্বারের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সম্মুখে ছুটিয়া গিয়া—‘বাবা, বাবা—বলিয়া ছই হাতে ব্রজবল্লভকে জড়াইয়া ধরিল। আকস্মিক বিষয়ে স্বপন ও উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছিল। ডাক্তারবাবু তাহা দেখিয়া দ্রুত তাহার শর্য্যাপাশে ছুটিয়া গেলেন এবং ছই হাতে তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন। ব্রজবল্লভের শ্রায় ডাক্তারবাবুরও বিশ্বাসের পরিসীমা ছিল না। উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে বিমুগ্ধভাবে তাকাইতে লাগিলেন। বিশ্বাসের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে ব্রজবল্লভ স্বপনের শয্যাপাশে বসিয়া ডাক্তারবাবুকে বলিলেন—‘ঠিকই বলেছিলে, অবন, এরা আমারই ছেলে মেয়ে।’

স্বপন ও নন্দিতার মুখে তখন বাক্য সরিতেছিল না। অপরাধীর শ্রায় উভয়ে এই আনন্দ-মিলনের মধ্যেও চক্ষু নত করিয়া রহিল। ব্রজবল্লভ নিজেই বন্ধুকে কত্না-জামাতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া ডাক্তারবাবু তাঁহার উচ্চহাসির রোলে ক্ষীতোদর কাঁপাইয়া ব্রজবল্লভকে বলিলেন—‘বল্লভ, এতদিন এ ঘরে যমে-মাত্মযে টানাটানি চলছিল। এখন আবার ছেলে-মেয়ে নিয়ে তোমার আমার মধ্যে কাড়াকাড়ি চলবে না তো? যা’ই চলুক, এদের জন্ত আর ভয়ের কারণ নেই,—আমাদের যে সাবিত্রীর মত মেয়ে আর যুভূজয়ের মত ছেলে তাতে কার সাধ্য আর এঁদের ছোঁয়।’

প্রজাবংশল রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনারায়ণ বসু

রবীন্দ্রনাথ বাংলার এক খ্যাতনামা জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি নিজেও একজন বড় জমিদার ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিকরূপে তাঁহার খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী। তাঁহার অমূল্য রচনাবলীই তাঁহাকে বিশ্ব-মানবের সহিত পরিচিত করিয়াছে। দেশে ও বিদেশে এখন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ভক্তের অভাব নাই।

কবি, দার্শনিক, মনীষী রবীন্দ্রনাথের সহিত আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিচিত এবং সে পরিচয় আমাদের অন্তরকে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছে। জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের অনেকেরই কোন ধারণা নাই। কাহার কাহারও যে অল্প ধারণা আছে তাহা আবার ভ্রম-পূর্ণ। তাঁহারা কবি রবীন্দ্রনাথ ও জমিদার রবীন্দ্রনাথকে পৃথক চক্ষেই দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে একজন প্রজাবংশল আদর্শ জমিদার ছিলেন, এই বিষয় তাঁহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিজ প্রজাদের সর্বাদ্বীন মঙ্গল সাধনে সদাই অবহিত ছিলেন। তিনি দূরে শহরে থাকিয়াই নিজ কর্তব্য সমাধা করেন নাই। নিজে বহুদিন ধরিয়া প্রজাদের মধ্যে পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তাহাদের দুঃখকষ্ট এবং অভাব অভিযোগের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন—“আমার গত জীবনের আনন্দ, উৎসাহ, সাহিত্য সবই পল্লীজীবনের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি।

যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব, অভিযোগ এবং কত বড় অভাগা যে তারা তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল।”

কবি রবীন্দ্রনাথ অন্তরে বেদনা লইয়া সে সময় নিজেকে আর স্থির রাখিতে পারেন নাই, বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্নিহিত গ্রাম-সংস্কারের আভাস সেই সময় হইতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি সেই সময় সম্পত্তিতে যাইয়া কর্মীদের আনিয়া প্রজাদের মতদেহে প্রাণসঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ধনীর সম্মান, তিনি দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট বুঝেন না—এই যে অভিযোগ, ইহার প্রতিবাদে তিনি আমাদের শুনাইয়াছেন।—“আমি ধনীর সম্মান, দরিদ্রের অভাব জানিনে, এমন কথা আমি মেনে নিতে রাজি নই। আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যা সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতদের জন্ত তা দিয়েছি।”

শুধু নিজ প্রজাবর্গের নয়, দেশের সমস্ত গ্রামবাসীদের স্থায়ী মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে দেশবংশল রবীন্দ্রনাথ “শ্রীনিকেতনে” যে মহাত্মত্বের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়। তাঁহার সে অনুষ্ঠান সার্বক হউক, ইহাই কামনা করি।

প্রজাবংশল জমিদার রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রজারা বিনা বাধায় আসিয়া নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাইত, কোন সঙ্কোচ বা ভয় তাহাদের ছিল না। নিজ কর্মচারীরা যাহাতে প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার না করে সে দিকেও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। কোন অত্যাচার হইলে অন্তরে

বিশেষ বেদনা অনুভব করিতেন এবং সে ক্ষত উপদেশ দিয়া কর্মচারীদের ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান করিয়া দিতে কখনও ভুলিতেন না। প্রজা কোন অত্যাচার করিলে, আদর্শ জমিদার রবীন্দ্রনাথ সে অত্যাচারকে কখনও বড় করিয়া দেখিতেন না, বা তাহার উপর রাগ করিতেন না। তিনি

রবীন্দ্রনাথের মত উদারমনা মহাপুরুষের মুখেই এই বাণী সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারীকে কেবল লাভ লোকসানের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। অসংখ্য প্রজার মঙ্গল-মঙ্গল যে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহা তিনি



মহাকবি রবীন্দ্রনাথ

একখানি বৈষয়িক পত্রে তাঁহার জমিদারীর ম্যানেজারকে লিখিয়াছিলেন।—“আমার প্রজারা নিজের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার জন্ত যখন চতুরতা করে আমার মনে তখন রাগ হয় না—তাঁহাদের বেদনা ও ব্যাকুলতা বুঝিবার আমি চেষ্টা করি।” ঐ পত্রেই আর এক স্থানে লিপিত আছে—“আমি দৈবক্রমে প্রবণ হইয়াছি বলিয়াই যে ক্রোধ পরিতৃপ্তির জন্ত তাহাকে দণ্ড দিব এবং সে তাহা অগত্যা বহন করিবে, এ আমি সঙ্গত মনে করি না।”

কখনও ভুলেন নাই। তিনি আর একখানি পত্রে ম্যানেজারকে লিখিয়াছিলেন—“আমি জমিদারীকে কেবল নিজের লাভ লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারি না। অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদের প্রতি নির্ভর করে। ইহাদের প্রতি কর্তব্য পালনের দ্বারা ধর্মরক্ষা করিতে হইবে।”

উদারতায় কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ আর জমিদার রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই।

সেতু

শ্রীহেমলতা দেবী

প্রিয়তম পৃথিবী আমার !
তোমাতে ছাড়িয়া যাব দূরান্তের পার
ছিল এ সঙ্কল্প মোর, ছিল এ সাধনা ;
এবে দেখি বন্ধু তুমি কাঁধেও বাঁধ না
চিরন্তন ডোরে ; তব গতির পশ্চাতে
নিরন্তর চলি মোরা তব সাথে সাথে ।
শিশু হামি' হামি' চলে, যুবা বাঁধে ঘর
সুন্দর সুন্দরী সাথে মিলনের বর ।
আসে তারা যায় চলি ধরা নাহি থাকে
ছ'দিনের তরে শুধু নাম ধরি' ডাকে ;
সুন্দরের দেয় তারা কিছু পরিচয়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় তারে না করে সঙ্কয় ।

বন্ধু মোর, প্রিয় মোর, অন্তরের ধন,
অন্তরে সঞ্চিত রহ—নিভা নিকেতন
সেথায় তোমার—তব সৌন্দর্য্য-সম্ভার
লুপ্তিত হতেছে সেথা—শ্রেষ্ঠ উপহার ।

হে পৃথ্বী, হে বন্ধু, নহ বন্ধনের হেতু
আমার জীবনে—তুমি পারাপার সেতু ।

পূরী ১৮৫৮২

গ্রন্থি মোচন

শ্রীমৎ.....

যে তপন অন্ত যায় সন্ধ্যার গগনে
তাঁহাই উষায় জাগে প্রদীপ্ত কিরণে ;
যে জীবন ভুবে যায় মৃত্যুর তিমিরে
ভেসে উঠে তাঁহা পুনঃ নূতন শরীরে ;
মৃত্যুরে নাহিক ভয়, যদি এ জীবনে
চেষ্টা কিছু করে থাকি গ্রন্থি মোচনে ।

চৈত্র সংক্রান্তি ।

জাগরুক

(শেলি)

শ্রীসবিতা সেন

স্মর যদি হয় শেষ, থেমে যায় বঙ্কার,
অন্তর পরতে বাজে তবু রেশ তার—
পুষ্পিত ফুলদল স্নানও যদি হয় গো
মনোবনে নাহি তার স্মরতির লয় গো ;
নিপ্রাণ গোলাপের ঝরা পাতা জড়ো হয়,
মরতবাসীর মত প্রিয়জন শয্যায় ।
তেমনি তোমারো কথা, তুমি চলে গেলে প্রিয়া,
মাঝে ভোরে যাবে মোরে অনুরাগে রাঙাইয়া

শৈশবে সদয়

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(২) সদয় কে ?

ঐ যে চৌধুরী বাড়ীর ঘাটে আমার নৌকা লাগার সময় গৌরবর্ণ বসন্ত চিহ্নিত উল্লস শিশুটি মাথায় দুই হাত রাখিয়া এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেই “সদয় বা গুরু সদয়” আর তাহারই পাখের এলোকেশী বালিকাটি গুরু সদয়ের বড় ভগ্নী “মনোরমা”।

সদয় ৮রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তাহার পিতামহ ৮রাজবল্লভ দত্ত চৌধুরী। বীরশ্রী স্কুলের তদানীন্তন সেক্রেটারী ৮রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী মহাশয় সদয়ের ঘোষ্ঠ তাত। ইচ্ছামতীর দত্ত বংশে সদয়ের মাতার জন্ম। পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলই তদ্বংশীয় কুলীন কায়স্থ এবং জমিদার। ইহাদের পদ্ধতি “দত্ত” এবং উপাধি চৌধুরী। পূর্ব হইতে জমিদার না হইলে “চৌধুরী হয় না, ইহা ঐ অঞ্চলের প্রথা। বীরশ্রীর দত্ত বংশ বাদসাহ-আমলের চৌধুরী।

৮রাধাকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী এবং রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী একাম্বুজ সোহদর ভ্রাতা। ৮রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় পূর্বে শিলচরে একাউন্টেন্ট ছিলেন। পরে দেশে ফিরিলে বীরশ্রী স্কুলের সেক্রেটারী, করিমগঞ্জ লোকাল বোর্ডের মেম্বর এবং বীরশ্রী বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হন। বিচারে, আচারে, নামলায়, মোকদ্দমায়, দেশে, বিদেশে সর্বত্রই রাধাকৃষ্ণময়। রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় এতদূর খ্যাতি লাভ করেন যে শ্রীহট্টে ও কাছাড়ের তাঁহাকে লোকে এক ডাকে চিনিত। ৮রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী মহাশয় সংসারের ধার বড় ধারিভেন না। মান-আত্মিক, সন্ধ্যা পূজায়ই তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত। পারসী, সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় তাঁহার সুন্দর জ্ঞান ছিল। সঙ্গীতে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নবদ্বীপ, গয়া, কাশী ও শ্রীবন্দাবন দর্শন করিয়াছিলেন।

ইহারা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কায়স্থ। পাণিশালী ইহাদের গুরুপাঠ। বৈষ্ণব মতাবলম্বী হইলেও ৮রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী ও তাঁহার স্ত্রী ভিন্ন এই পরিবারে সকলেই মৎস-মাংস

আহার করিতেন। তাহা ভিন্ন অন্য কোন মাদক দ্রব্য এই পরিবারের কেহই কখনও সেবন করে নাই। ৮রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলেও প্রচণ্ড শাক্ত প্রকৃতির ছিলেন। আহার বিহারে, চলা ফিরায়, কাজ-কর্মে তিনি একজন বীর চরিত্র সম্পন্ন কার্যদক্ষ শাক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে বীরশ্রী অঞ্চল উজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার অতিশয় সম্মান করিতেন। মূর্থ ব্রাহ্মণ এবং স্বভাব-অলস বৈরাগী তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। চোর-বদমায়েস তাঁহার শাসনে বীরশ্রী অঞ্চল হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি দেহিতে অতিশয় সুশ্রী ছিলেন এবং তাঁহার শরীরে শক্তি ছিল। হিন্দু ধর্মে আস্থা থাকিলেও মূলতঃ তিনি ধর্ম সম্পর্কে উদার মত পোষণ করিতেন। সুচরিত্র এবং বিজ্ঞ হইলে কোনও ধর্মাবলম্বী লোক তাঁহার নিকট ঘৃণাহ হইত না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কার্যে সত্বরতা এবং মহৎ প্রীতি তাঁহার চরিত্রের স্ফুটন্ত দৃষ্টান্ত ছিল।

সদয়ের মা ও জ্যোতিমা আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। চরিত্রের নির্মলতায়, স্বচাক্ষু গৃহিণীপনায়, সুচিকণ কার্যকার্যে এবং চার চক্ষের তত্ত্বতালাসিতে তাঁহারা প্রকৃতই গৃহরাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। তাঁহাদের গুণের কথা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। আর একটা কথা এই স্থানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের ঘর ঘেঁষে সেকালের ছোটখাট ডিসপেনসারী ছিল। ফলপ্রদ টোটকা চিকিৎসা তাঁহারা বিস্তর জানিতেন। তাঁহাদের ঝাঁপিতে প্রচুর পরিমাণে নানা রকম মশলা ও ঔষধ থাকিত। যেমন তেমন ব্যারামের জন্ত পরিবারের কাহাকেও দৌড়াদৌড়ি কবিরাজ বাড়ী বাইতে হইত না। রোগী পরিচর্যায় ও ধাত্রী কধ্যে এতদূর দক্ষতা ছিল যে পাশ করা ধাত্রীরাও তাঁহার নিকট স্থান পাইবার যোগ্য ছিল না।

বিবাহাদি উৎসবের এবং পূজা পার্বণের মাসলিক সঙ্গীতে পরিবারের সকল স্ত্রীলোকই দক্ষা ছিলেন। নিমন্ত্রণের

রক্ষাদি যতই কেন বিপুল হউক না, পরিবারের জীলোক দ্বারাই সমাধিত হইত এবং তাঁহারা এই কার্যে বিশেষ মনোভীতি লাভ করিতেন। সন্তানেরা ছোটকাল হইতে এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট গৃহস্থ হইত। সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট নিম্নাঙ্কিত—তাঁহাদের পূর্বপুরুষ রাঢ় দেশের বটগ্রাম হইতে শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন। কি কারণে এই স্থানচ্যুতি ঘটে, এবং কোথায় বা সে বটগ্রাম তাহার কিছুই তিনি বলিতে পারেন নাই। তৎকালে তাঁহারা শাস্ত্র কি বৈষ্ণব ছিলেন তাহাও তিনি জানিতেন না। তবে এই মাত্র বলিতে পারিয়াছিলেন যে বাহার কৃত জমিদারী তাঁহারা ভোগ করিতেছেন, সেই সদানন্দ দত্ত মর্শিদাবাদের কোন জমিদার মুসলমান নবাবের চক্কে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্যে প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় নাই। তিনি পূর্বের দ্বীপুত্রকে পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া জমিদারীর অঙ্গাংশ দান করেন এবং বাকি অর্ধেক নিজের ভরণপোষণের জন্য রাখেন। করিমগঞ্জের নিকট আশ্রয় থানায় পুরোহিত ঠাকুরদের বাড়ী, পিয়াইপুরে (বীরশ্রীতে) হিন্দু-দ্বীপুত্রের বাসস্থান এবং বাঘের সান্নিধ্যে মুসলমান জীকে নিয়া নিজে থাকিবার স্থান করেন। আমি বীরশ্রী থাকিতে দেখিয়াছি—বিবাহে হিন্দু চৌধুরী বাড়ীতে বাঘের সান্নিধ্যে মুসলমান চৌধুরীগণ সভাস্থ হইতেন এবং মুসলমান চৌধুরী বাড়ীতেও হিন্দু চৌধুরীগণ উপস্থিত থাকিতেন, কাহারও কখন মরণ হইলে পরস্পরে শ্রাদ্ধান্বিত হইতেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হিন্দু

শ্রাদ্ধান্বে মুসলমানের আশ্রয় শাখা নিক্ষেপ করিত, আবার মুসলমানের কবরে হিন্দু মৃত্তিকামুষ্টি প্রদান করিত। ধর্মাস্তরিত হইলেও তাঁহাদের মতান্তর হইয়াছিল না—পরস্পরে জ্ঞাতি স্বীকার করিত। এই স্থানে ইহা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে শ্রীহট্টের অনেক সন্ন্যাসবংশই এইরূপ শোচনীয় ঘটনায় সম্মুখ। পুরোহিত বশিষ্ঠ দেব যেমন অন্তপ্রায় সূর্য্যবংশ রক্ষা করিয়াছিলেন, এই দত্ত বংশের পুরোহিত ঠাকুর ও সেইরূপ এই লুপ্ত প্রায় দত্ত বংশের শিশু বজায় রাখার পন্থা করিয়াছিলেন। এই পুরোহিত বংশের কতিপয় ছেলে আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাহাদের অভিভাবকেরা আমাকে খুব স্নেহ করিতেন।

কুশিয়ারা কুলে যে “সরল খাঁর দীঘি” নামক পুরাতন জঙ্গলা একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দেখা যায়—উহাই উপরোক্ত সদানন্দ দত্তের দীঘি। সদানন্দ মুসলমান হইয়া “সরল খাঁ” হইয়াছিলেন।

বীরশ্রীর দত্তেরা দুই ধারায় বিভক্ত—চৌধুরী ও পুরকায়স্থ। বীরশ্রীর পূর্বের গ্রামের দত্তেরা সকলেই পুরকায়স্থ। জমিদারীতে সকলেই অংশী, জ্ঞাতিত্ব এখন পর্যন্ত অবহেলিত হয় নাই। ইহাদের জমিদারী “বাদে কুশিয়ার কুল।” রাজসাহী, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা জেলার জমিদারীর মত এই জমিদারী বৃহদায়তন নহে—সুতরাং আয়ও তরুণ প্রচুর নহে; কিন্তু সদয় খাজনা খুব সুবিধাজনক। শ্রীহট্টের লোক বহুকাল হইতেই স্মৃতি ও দূরদর্শী।

ভ্রম সংশোধন

১। গত ফাল্গুন মাসের “রবীন্দ্রনাথের কথা” প্রবন্ধে ১৬৫ পৃঃ ২৯ লাইনে “উদ্যোগের” পরিবর্তে “উদ্যানে” হইবে। এই সভাটি রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে হইয়াছিল।

২। গত চৈত্র সংখ্যায় বঙ্গলক্ষ্মীতে ১৯৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত “ব্যথা” প্রবন্ধটির লেখকের নাম “শ্রীরাধিকানাথ নিয়োগী।”

পাঠক পাঠিকাগণ অনুরোধপূর্বক এই ভ্রম দুইটি স্ব স্ব পত্রিকায় সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন।

কেন্দ্র সমিতির কার্য

পাক্ষী নারীমঙ্গল সমিতির পুরস্কার বিতরণ

গত ৩১শে মার্চ পাক্ষী নারীমঙ্গল সমিতির ভবনে উক্ত সমিতির পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে একটি মহতী সভার আয়োজন হয়। বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ের ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ এম, এ, বারি, মিসেস বারি, মহিলা ওয়েলফেয়ার সুপারভাইজার সিষ্টার ই, টোকাম, ডাঃ পি, নিয়োগী, মিস মল্লিক, মিসেস ঘোষ, উক্ত সভার যোগদান করেন এবং বেঙ্গল ও আসাম রেলওয়ের সাবডিভিসনাল অফিসার মিঃ টি, জে, ও'কনেল উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দুইশত মহিলা সভায় যোগদান করেন। সিনিয়র অফিসারের পত্নী মিসেস বারিংটন পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রারম্ভসঙ্গীত গীত হইলে মালাদানান্তে সভার কার্য আরম্ভ হয়। তৎপরে ফটো তোলা এবং বালিকাগণ কর্তৃক ব্রতচারী উপগ্রদর্শন হয়। এই মহিলা-সমিতির চেয়ারম্যান মহোদয়ার স্বামী মিঃ ও'কনেল কর্তৃক সমস্ত অর্ঘ্যের ফটো তোলা হয়।

এই সমিতির সমস্ত বালিকাকেই মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বিচার দ্বারা ভালমন্দ নির্ধারণ করিয়া পুরস্কারের ভারতম্য করা হইয়াছে; মিঃ বারি এবং সিষ্টার টোকাম এই বিচারকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছেন। দুইটি বিশেষ পুরস্কার এবং চারিটি প্রথম শ্রেণীর ও অপর কুড়িটি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

কয়েকটি রৌপ্যপদক এবং অন্যান্য শিল্প-কার্যশিক্ষার ও প্রয়োজনীয় জিনিষের বহুসংখ্যক মূল্যবান পুরস্কার বিতরিত হইয়াছে।

ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী বালিকাদের কর্তব্য ও নারীমঙ্গলকর কার্য সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

এই সমিতির চেয়ারম্যান মিসেস ও'কনেল মহোদয়ার চেষ্টা বস্ত্র ও ব্যবস্থাপনায় এই কার্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছে।

আত্মোদ্ধার সেবাশ্রম

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা কম্রী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ জলসীন (ঢাকা) আত্মোদ্ধার সেবাশ্রমে, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর এম-এ, বি-এল ভূতপূর্ব ময়ুরভঞ্জের দেওয়ান মহাশয় কর্তৃক আহৃত হইয়া তথায় বান। শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল সমিতির সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ মিসেস সুবর্ণা মিত্র এম, বি, ডি, পি, এইচ মহোদয়াও গমন করেন। আত্মোদ্ধার সেবাশ্রম-ভবনে একটি বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদারমণ্ডলী, বহু ভক্তলোক ও মহিলারা সভায় উপস্থিত হন। শ্রীযুক্তা ঘোষ মহিলাদের উন্নতিকল্পে ও শিশুপালনে মহিলাদের কর্তব্য সম্বন্ধে স্বন্দর ও হৃদয়গ্রাহী একটি বক্তৃতা দেন, তাহাতে সকলেই অভিভূত হইয়া পড়েন। তথায় একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং ডাঃ সুবর্ণা মিত্র, 'শিশু মৃত্যুতে নারীদের দায়িত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর মহিলাদের উন্নতিকল্পে গর্ভর্মমেন্টের সহযোগিতায় একটি শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন, সেইজন্য একটি বাড়ীও দান করিয়াছেন। এ মহৎ কার্যে ভগবান তাঁর সহায় হউন।

রামগড়

গত ৪ঠা মার্চ মেদিনীপুর জেলার রামগড় রাজ্যে সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা কম্রী শ্রীসুবোধবালা ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুধীরলাল সরকার বি এ তথায় একটি প্রদর্শনী উপলক্ষে গমন করেন। প্রায় এক হাজার নর নারী তথায় উপস্থিত হন, সেই সভায় শ্রীযুক্তা ঘোষ নারী জাতির বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত সরকার ম্যাজিক লঠন যোগে মহিলারা সমবেত চেষ্টায় কি কি কার্য করিতে পারেন তাহা বুঝাইয়া দেন।

রূপসপুর

গত ৭ই এপ্রিল সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা

কম্বী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জি এডভোকেট মহোদয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া রূপসপুর (বীরভূম) গমন করেন। তথায় একটি মহিলা সভায় শ্রীযুক্তা ঘোষ নারী-মঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তথায় একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত মুখার্জির উদ্যোগে একটি মহিলা শিল্প বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির শিক্ষাপ্রাপ্তা একজন শিক্ষয়িত্রী শিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য বর্তমানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নাকড়াকোন্দা

২ই এপ্রিল নাকড়াকোন্দায় (বীরভূম) শ্রীযুক্তা ঘোষ একটি মহিলা সভায় বক্তৃতা দেন। তথায়ও মহিলাদের মধ্যে খুব উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা তথায় একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়া কাধ্য আরম্ভ করিবেন স্থির করা হইয়াছে।

ধাপের হাট

গত ২রা মে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মহিলা কম্বী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ ধাপেরহাট (রংপুর) গমন করেন। তথায় একটি সভায় প্রায় দুই শত পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত হন। শ্রীযুক্তা ঘোষ তথায় নারীদের কর্তব্য ও মহিলা সমিতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী একটি

বক্তৃতা দেন। তথায় খুবই জাগরণের সাড়া পরিলক্ষিত হয়। তথায় ঐ দিন একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হয় ও কেন্দ্র সমিতির শিক্ষাপ্রাপ্তা একজন শিক্ষয়িত্রী তথায় শিল্প শিক্ষা দিতেছেন।

পলাশবাড়ী

৪ঠা মে পলাশবাড়ীর (রংপুর) স্থানীয় ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণে শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ তথায় যান। স্থানীয় হাইস্কুলে একটি সভা হয়। উক্ত সভায় বহু হিন্দু ও মুসলমান পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত হন। শ্রীযুক্তা ঘোষ তথায় বর্তমানে নারীদের কর্তব্য সম্বন্ধে সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন। তথায় সকলের মধ্যম্নে একটি সাড়া পড়িয়া যায়। মুসলমান ও হিন্দু ভদ্রলোকেরা সকলেই একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত করিয়া কাধ্য আরম্ভ করিবেন, এবং বর্তমান সময়ে হাট যে প্রয়োজনীয় তাহাই বলেন।

সান্তাহার

শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ ১ই মে সান্তাহার (বেলুচিয়া) সমিতি পরিদর্শন করিতে যান এবং আরো বিশেষভাবে যাঁহাতে সমিতি উন্নতিলাভ করিতে পারে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়-দিগের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করেন।



মহিলা-সমাচার

(ত্রিছোতিষ চন্দ্র ঘোষ)

ভারত নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদে প্রীতিসন্মিলন

চারি বৎসর পূর্বে কাকুরী ষড়যন্ত্র নামলার দণ্ডিত শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রসিদ্ধা কংগ্রেস কর্মী শ্রীমতী জুর্গা দেবীকে বিবাহ করেন এবং কয়েক বৎসর স্বামী ও স্ত্রীতে একত্রে কাল্যাত্রিপাত করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি দম্পতি স্কুল তাহাদের মধ্যে বিবাহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার জন্য পরস্পর ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সানন্দে ও পূর্ণ সম্মতি ক্রমে তাহাদের বিবাহ বন্ধন আইনত ও ধর্ম্মত ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহাদের পরস্পর মধ্যে বন্ধুত্ব (কমরেড্ শীপ্) নিবিড় রাখিবার জন্য এক প্রীতি সন্মিলনে বন্ধু, বান্ধব ও দেশের লোককে আমন্ত্রণ করিয়া ভূরি ভোজন করাইয়াছেন।

বর্তমান যুগে সবই নূতন রকম ঘটিতেছে। সেই নিমিত্ত আমরা যেমন বৌ-ভাতের ও বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইতাম—সেই রূপ বিবাহ বন্ধন ছিন্নেরও নিমন্ত্রণ পাইব। ইতর জনের চৈতন্য কম লাভ নহে!

সুলতা কর “রবীন্দ্র স্মৃতিপদক”

শ্রীমতী সুলতা কর “রবীন্দ্রনাথের” বিভিন্ন প্রতিভার বিষয় গবেষণা করিবার জন্য বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে যে “রবীন্দ্র স্মৃতিপদক” প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বার্ষিক ১০০০ প্রদান করিয়াছেন—সেই পদক বর্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে প্রদত্ত হইবে। তিনি কবির মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবেন।

লোক শিক্ষা সংসদের কৃতি ছাত্রী

বিশ্বভারতী যে লোক শিক্ষা সংসদ প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অমরারাগ বুদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন তাহার বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইয়াছে।

এই সংসদ ‘প্রবেশিকা’, ‘আদ্যা’, ‘মধ্য’ ও ‘অন্ত’ চারি প্রকার পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ‘অন্ত’ পরীক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ। বর্তমান বর্ষে ‘অন্ত’ পরীক্ষা প্রথম গৃহীত হইয়াছে। তিনটি পরীক্ষার্থী ‘অন্ত’ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার মধ্যে শ্রীমতী হাসি চক্রবর্তী অন্ততম।

ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগতদের সেবার বঙ্গনারী

যে সমস্ত ভারতবাসী নরনারী জাপ আক্রমণের নিমিত্ত মালয় ও ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন—তাঁহারা পথকষ্টে এবং মনস্তাপে অভিযত আর্ন্ত। তাঁহাদের এই নিদারুণ ক্লেশ কিঞ্চিৎ হ্রাস করিবার জন্য বাদ্দলার নর নারী বৈরুপ আগ্রাণ চেষ্টা করিতেছে তাহা প্রশংসাহ। বাদ্দলার কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীযুত লাভণাপ্রভা দত্তের অধীনে যে সমস্ত মহিলা আর্ন্তের সেবার জন্য সিয়ালদাহ, হাবড়া, এমন কি আসাম হইতে সমগ্র বাদ্দালার রেল স্টেশনে অকাতরে সেবার্থ্য করিতেছেন, তাহা না দেখিলে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা ও উদারতা উপলব্ধি করা যায় না।

পুস্তক পরিচয়

সাহিত্য-কথা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
পৃঃ ১৫৩, মূল্য ১।০, প্রকাশক—দীপালী গ্রন্থশালা, ২২৩।১
আপার সান্দুলার রোড।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন পাকা সাহিত্যিক, তিনি কেবল সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া কাল্য থাকেন না, সাহিত্য সৃষ্টির নব নব উপাদানের সন্ধান ও রচনার গূঢ় রহস্য এই পুস্তকখানিতে দিয়াছেন। যদিও তাহার কয়েকটি রচনার মধ্যে মতের অনৈক্যও পরিলক্ষণ হয় তথাপি তাহার ‘সাহিত্যে বৈরাচার’, ‘সাহিত্যের উপাদান’ ‘বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তা’। ‘রেক্তারো সাহিত্য’ ও ‘বাংলা ভাষার রূপ’

প্রবন্ধগুলি সাহিত্য অনুরাগী মাত্রকেই তৃপ্তিদান করিবে এবং বঙ্গসাহিত্যের পরিচয় জানিবার সুযোগ দিবে।

তিনি বঙ্গসাহিত্যের আগাছাগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য নিষ্ঠিকভাবেই লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। বর্তমানে আটের নামে বঙ্গসাহিত্যে সে সব কুরুচ্ছিন্ন ও অনৈতিক ভাব-ধারণার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহারই তীর নিন্দা বসন্ত বায়ু এই পুস্তকে করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবে।

শ্রীজ্যোতিষ্মতী কোষ

গান

শ্রীস্মৃতি দেবী

একেলা এসেছি তোমায় দরবারে
ধূয়া ধরে ধরে আসিনি।
জোয়ারের জলে ভেসে যাব বলে
তবে ভাবনায় ভাসিনি।
ওগো প্রভু মোর বরাভয় লয়ে
জোয়ারে যে ছিলে জানিনি।
বারে বারে তাই আসি কি'না আসি
ভেসে বেড়ায়েছি মানিনী।
প্রভু হে তোমার শত স্নেহ ধরে
প্রাণ ভরা প্রেম প্রীতি যে

মোর শত ধারে ঘিরে আছে ধরে
তবু ফিরে গেছি নিতি যে।
ধীরে ধীরে আজি ধীরে ধীরে ধীরে
তোমার মনের মহিমায়
স্নান করে আমি ডুবে যেতে সখা
আসিয়াছি এই অবেলায় ;
জানি তুমি আজো তেমনি রয়েছ
পশারিয়া তব স্নেহ-কোন্
নিঃস্বপ্নে মম নিদ্রা নামিবে
থেমে যাবে সব কলরোল।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির আবেদন বর্তমান পরিস্থিতিতে পল্লী অঞ্চলে নারী-উন্নয়ন কার্য

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি, এইচ-ডি ;
পি-আর-এস্ নিম্নলিখিত আবেদন করিয়াছেন :—

‘বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্ত সহস্র সহস্র মহিলা কলিকাতা সহর পরিত্যাগ করিয়া পল্লী অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাদের অনেকেই সুশিক্ষিতা। এই সকল শিক্ষিতা মহিলারা আজ পল্লীর সেবা করিবার বিশেষ করিয়া তাঁহাদের পল্লীবাসিনী ভগিনীদের সর্বোচ্চ কল্যাণ প্রচেষ্টার অপূর্ব সুযোগ পাইয়াছেন। এই সময়ে তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে বা সহরে “মহিলা সমিতি” গঠন করিয়া মহিলাদের নানাবিধ কুটীর শিল্প শিক্ষা, বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কার্য, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি এইরূপ মহিলা সমিতি গঠন ও পরিচালনে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং পূর্বে চারিশত মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই কার্যের জন্ত নারীমঙ্গল সমিতির পুরুষ ও মহিলা প্রচারকসম্মি এবং শিক্ষয়িত্রীগণ রহিয়াছেন। বর্তমানের প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন স্থানে প্রচারক ও শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া মহিলা সমিতি গঠন ও সূচীশিল্প, সেলাই, ছাঁটকাট, তাঁতবোনা, কার্পেট ও সতরঞ্চির আসন বোনা, চামড়ার উপর নক্সার কাজ, পিতলের উপর নক্সার কাজ ইত্যাদি শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মফঃস্বলের মহিলা সমিতির সভ্যাগণ মহিলাই হইবেন, তবে তাঁহাদের পুরুষ আত্মীয়গণ পরামর্শ-দাতারূপে এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। এ বিষয়ে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির প্রধান কার্যালয় ২৩১ বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে সাধারণ সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।”*

* উল্লিখিত আবেদন সমস্ত ইংরাজি ও বাংলা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ফলে বহু স্থান হইতে সাড়া পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গের বহু পল্লী ও সহর হইতে মহিলা সমিতি গঠন করিবার উদ্দেশ্যে প্রচারক ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্ত অস্থায়ী শিক্ষয়িত্রী পাঠাইবার আবেদন আসিতেছে এবং সরোজনলিনী সমিতির কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা করিতেছেন। কেন্দ্র সমিতি এই সকল শিক্ষয়িত্রীর বেতন বহন করিবেন এবং মফঃস্বল সমিতি শিক্ষয়িত্রীগণের আহার ও বাসস্থান এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করিবেন। শিক্ষয়িত্রীগণ একস্থানে একমাস এবং প্রয়োজন হইলে দুমাস পর্যন্ত থাকিয়া বিভিন্ন শিল্প শিক্ষা দিবেন।

ভুল সংশোধন

Re. Change of Address

প্রিন্টারের অসাবধানতাবশতঃ—গত বৈশাখ সংখ্যা (April issue 1942) বঙ্গলক্ষ্মীতে এলেম্বিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস কোম্পানী লিমিটেড (বরোদা) এর ডিস্ট্রিবিউটিং এজেন্সি বোম্বাই দিঃ ১নং ষ্ট্রীফেস হাউস, ডালহাউসী স্কোয়ার হইতে রাস্তোগী হাউস, মুরাদপুর, বাকীপুর, পাটনায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। অতএব এখন হইতে উল্লিখিত ঠিকানায় চিঠিপত্রাদি লিখিতে হইবে।

Alembic Chemical Distributing Agency (Bombay) Ltd., Rastogi House, Moradpur, Bankipore, Patna.



— গুরুসদয় দত্ত ।



১৭শ বর্ষ

আষাঢ় ১৩৪৯

৮ম সংখ্যা

মৃত্যু

হে মৃত্যু তোমারে কেহ ভাল নাহি বাসে
 যদিও জীবনে তুমি রহ পাশে পাশে ।
 যদিও তোমারে ছুঁয়ে আছি রাত্রিদিন
 তবু মনে হয় মোরা মৃত্যু-স্পর্শ-হীন ।
 তোমারে এড়ায়ে যবে বাঁচিবারে চাই
 চক্ষু মুদি ভাবি মৃত্যু নাই নাই নাই ।
 সবারে দিয়াছি কঁাকি, এবে তব জালে
 জড়ায়ে পড়েছি—মৃত্যু নাহি অন্তরালে—
 দৃষ্টিপথে অলিতেছে কাল-বহি-শিখা
 আসিছে বিদ্যুৎ বেগে মৃত্যু-চিহ্ন-লিখা ।

এত অগ্নি ! এত মৃত্যু ! তবু নাহি ভয়,
 তবুও জাগ্রত প্রাণ চির নিঃসংশয় ।

মৃত্যু নহ জীবনের ঘন আবরণ
 চির নূতনের তুমি নিভৃত তোরণ !

গুরুসদয়-স্মরণে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সহিত কবে কোন্ সময় প্রথম পরিচয় হইয়াছিল আজ সে কথা আমার স্মরণ নাই। তবে সে প্রায় পনেরো কুড়ি বৎসরের কম নহে। তাঁহার মৃত্যুর সম্ভবতঃ দুই তিন মাস পূর্বে একদিন এশিয়াটিক সোসাইটিতে বসিয়া আমি একথানা বই পড়িতেছিলাম এমন সময় সহসা কাহার করস্পর্শে চমকিত হইলাম। চাহিয়া দেখি আমার পেছনে দাঁড়াইয়া সদাপ্রফুল্ল হস্তশ্রীমণ্ডিত শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়। জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বিক্রমপুরের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড কবে বার কছেন?’ আমি বলিলাম, আরও এক বছর লাগিবে। তারপর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় আজও ত ব্রতচারী ও রায়বেশে নৃত্যের ইতিহাস ‘শিশুভারতী’র জন্ত লিখে পাঠালেন না। হাসিয়া বলিলেন—‘মনোজ কি পাঠায় নাই?’ আমি বলিলাম না। ‘শিশুভারতী’ ত শেষ হয়ে যাচ্ছে। পরে পেলে আর কি হবে! ‘তাই’ত বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং বারবার অহুরোধ করিলেন, একবার আসবেন আমার বাড়ী। আমি বলিলাম নিশ্চয় যাব একদিন। কিন্তু সে বাওয়া আর হইল না। অল্প কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে খবরের কাগজে পড়িলাম, গুরুসদয় পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। সেদিন বিদায় কালে বলিয়াছিলেন—‘এবার পেন্সান নিয়েছি। অনেক কাজ করা যাবে। হায়রে মানুষের আশা!

আমি তাঁহার প্রবর্তিত প্রথম ব্রতচারী নৃত্য দেখি আমাদের দেশে বিক্রমপুরের একটি গ্রামে। আর এই ব্রতচারী নৃত্যের সম্বন্ধে বহু লোকের কাছে নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই শুনিয়াছি। আমাদের বাঙ্গালী চরিত্রের একটি অতি প্রধান গুণ এই যে আমরা কাহাকেও মন খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারি না। গুরুসদয়ের পক্ষে নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই লাভ হইয়াছে। তবে তিনি ছিলেন কৃতী পুরুষ, তাই রাজপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদিগকেও এবং

পুরুষ ও মহিলা বালক-বালিকা-স্কুল কলেজের ছাত্র ও ছাত্রী প্রভৃতি সকলকেই ব্রতচারী নৃত্যের অহুরাগী করিয়া নাচাইতে পারিয়াছিলেন।

আমি ‘শিশুভারতী’তে যে সকল বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা বিশেষজ্ঞ লেখকদেরই রচিত। কাজেই ব্রতচারী নৃত্য সম্বন্ধেও এই নৃত্যের নব প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে প্রবন্ধ লিখিবার জন্ত ১৯৩৬ সালের ২৮শে মে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি সে পত্রখানির যে উত্তর দেন তাহা এখানে প্রকাশ করিলাম।

Bengal Secretariat,
Darjeeling, 2nd June 1936,

Dear Sir,

I am in receipt of your letter of the 28th May and am very pleased to note your appreciation of the Bratachari dances and in particular of the Raibeshe dance, as a great national heritage of the Bengali race which will serve to give to the whole nation more correct aesthetic ideas as well as a greater consciousness of their own heroic past. As requested by you I shall be very pleased to contribute to your ‘Sishubharati’ an article on the Raibeshe dance and also on the Bratachari movement. As you are no doubt aware, the Bratachari movement includes within it many other dances besides the Raibeshe dance and also includes a very comprehensive ideal citizenship both from the national and international points of

view and it is extremely desirable that our young folk should thoroughly understand them. I am coming down to Calcutta by the end of this month and I shall be very pleased if you can come and see me at my residence, 12 Loudon Street, some morning in the first or second week of July so that I may decide in consultation with you the nature and length of my Contribution to the "Sishubharati" regarding these matters.

Yours truly
G. S. Dutt

J. N. Gupta, Esq
Editor, "Sishu-bharati,"
P. 651A, Mahanirvan Road.
Calcutta.

আমার তাঁহার নিকট যাইবার পূর্বে একদিন 'সাহিত্য-পরিষদের' কি একটি অধিষ্ঠান হইতেছিল, সেখান হইতে আমাকে ও আমার একজন বন্ধুকে তাঁহার বাড়ী লইয়া আসিলেন। শ্রাবণ মাসের বর্ষণ দিনে রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত তাঁহার সহিত আমার ব্রতচারী নৃত্যের প্রবন্ধ বিষয়ে আলোচনা ও আলোচনা হইল। কি কি ছবি যাইবে, কত পৃষ্ঠা হইবে লেখাটি, এ সব কথাই স্থির হইয়া গেল।

সেদিন তাঁহার কাছে সমুদয় নৃত্যের ইতিহাস শুনিলাম। বাঙ্গালার ও ভারতের বিভিন্ন নৃত্যের জন্মস্থানের একখানি মানচিত্র ও দেখিলাম। নিজের লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও পড়িয়া শুনাইলেন। তারপর নিজে নাচিয়া আমাদিগকেও নাচাইলেন। কি উৎসাহ—কি সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে কথা আজিও মনে পড়িতেছে। বিদায়ের পূর্বে জলযোগ করাইলেন। যেমন মিষ্ট হাসিতে আদর ও অত্যাধিকার করিয়াছিলেন, তেমনি মিষ্ট মুখ করাইয়া নিজের গাড়ীতে আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে কেহ আলোচনা করেন নাই।

আমি মৎসম্পাদিত 'কৈশোরক' পত্রে ঐ সকল বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। একটিকে Edward leer-এর লিমাটিক ছড়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে কে কে লিমাটিক ছড়ার অনুসরণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের রচিত দুই একটি ছড়া উদ্ধৃত করিয়া দত্ত মহাশয়কে কয়েকখানি 'কৈশোরক' পাঠাইয়া দিয়া লিখিয়াছিলাম—'লিমাটিক ছড়ার প্রকৃত অনুসরণ আপনার ছড়ায়ই দেখিতে পাইলাম। অন্য সকলেই অন্তরূপ করিয়াছেন। আমার পত্র পাইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

জ—সো—বা

২৮শে শ্রাবণ

১৩৪৬

প্রীতিভাজনে

আপনার পত্রকালের চিঠি এবং তৎসঙ্গে প্রেরিত কয়েকখানা 'কৈশোরক' এর জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন।

এই সঙ্গে আপনার জন্য একখানা 'ভজার বাঁশী' পাঠালাম প্রাপ্তি সংবাদ দিলে সুখী হব।

১৩৪৫-এর শ্রাবণমাসের কৈশোরকে আপনার লিমাটিক কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে আমার প্রণীত ১৩২২ সালে মুদ্রিত 'পাগলামির পুঁথির' উল্লেখ ছিল দেখিয়া বড় সুখী হলাম। Edward leer এর Limerick কবিতাগুলি বরাবর পাঁচ লাইনের, এবং শেষ লাইনটা প্রায়ই অবিকল প্রথম লাইনের অনুরূপ—'ছ' একটা কথা মাত্র তফাৎ। আপনি সুবীজনাথের, সুকুমার রায়-চৌধুরী ও অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের যে লিমাটিক কবিতার উল্লেখ করেছেন, তাহাতে ঐ দুইটি লক্ষণ সর্বদা নাই। সুতরাং সেগুলি টিক Edward leer-এর প্রকৃত লিমাটিক নয়। তা ছাড়া আমার মত এতগুলি লিমাটিক ঐ সকল লক্ষণ পূর্ণ করে রেখে কেউ বোধ হয় বাংলায় এখনো লিখেনি। আশা করি আপনি এখন এবিষয় পুনরায় আলোচনা করবেন তখন আরও কিছু বিস্তৃত করে লিখবেন।

'ভজার বাঁশী'তেই বোধ হয় সর্বপ্রথম ইংরিজি ও অন্যান্য দেশীয় ছড়ার ছন্দ ও ধাঁজ বজায় রেখে বাংলা ছড়া লেখা হয়। বইখানার শেষ দিকে যে সব অভিমত ছাপান আছে তাতে

উহা স্বীকৃত হয়েছে। এর পরে অনেকে আমার এই সব ছড়াই হুবহু অনুলকরণ এমন কি অপহরণ (plagiarism) ও করেছেন। তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। আপনার মত রসগ্রাহী ও অভিজ্ঞ সাহিত্যিক যে সকল গ্রন্থেরই সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। চাঁদের বুড়ী আপনার কেমন লাগল? আমার সাদর নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

প্রীতিসংবদ্ধ

গুরুসদয় দত্ত

শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সমীপে।

এ চিঠিখানা পাইবার পূর্বে আমাকে তাঁহার ‘চাঁদের বুড়ী’ বইখানি পাঠাইয়াছিলেন।

জ—সো—বা

২৭শে শ্রাবণ

১৩৪৬

প্রীতিভাজনেষু

আমার প্রণীত “চাঁদের বুড়ী” আপনাকে সাদর উপহার পাঠাইলাম। আশা করি আপনার প্রবন্ধ লিখবার আগে এটি পড়বার সময় পাবেন।

এতে আমি বাংলার একেবারে নতুন ধরণের ছড়ার প্রবর্তন করেছি। অবশ্য ইতিমধ্যেই এর নানা প্রকার অনুলকরণ আরম্ভ হয়েছে।

আমার প্রণীত ‘ভজার বাঁশী’ আপনি বললেন পড়েছেন। তাই পাঠাইলাম না। যদি আপনার কাছে না থাকে, জানাবেন, একখানা তাহলে পাঠাব।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ইতি

প্রীতিসংবদ্ধ

গুরুসদয় দত্ত

আমি ‘কৈশোরকে’ লিমাটিক ছড়ার সম্বন্ধে যখন আলোচনা করি, তখন বাঙ্গালার কোন্ কোন্ লেখক Edward leer এর অনুসরণে খাঁটি লিমাটিক ছন্দে কবিতা লেখেন তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া গুরুসদয়ের বই কথানি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এবং ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। গুণগ্রাহী দত্ত মহাশয় এ বিষয় জানিতে পারিয়া আমার নিকট

‘কৈশোরক’ কথানি চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং আমি পরম সমাদরের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিই। তিনি তত্ত্বেরে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার দুইখানি মাত্র প্রকাশ করিতে পারিলাম। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ইদানিং আমাকে কয়েকখানি দীর্ঘ পত্রে ব্রতচারী নৃত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং রাইবেশে নৃত্যের এত পক্ষপাতীই বা তিনি কেন তৎসম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানাইয়াছিলেন। সে পত্রে তাঁহার দেশপ্রীতি, বাঙ্গালী জাতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভবিষ্যৎশীলদের মনে দেশ-প্রীতির উদ্বোধন ও শরীর এবং স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া উন্নত করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, এই মহৎ জিনিষই তিনি নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন।



স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত

একখানা বড় চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—‘এইবার ত অবসর নিচ্ছি। অবসর নিয়ে আমার প্রধান কাজ হবে কি জানেন? আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াব, বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে বালক, যুবক, বৃদ্ধ সব শ্রেণীর নরনারীকে নিয়ে রাইবেশে নৃত্য করতে করতে লেগে যাব গ্রামের কাজে—পুকুর পরিষ্কার করবো, জঙ্গল কাটবো,—সকলে মিলে কাজ করলে লজ্জা কোথায় থাকবে বলুন ত! গ্রামের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ মোচন করতে হলে চূপ করে ঘরে আরাম কেদারার বসে চাঁয়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চুরুট টানলে চলবে কি? ইত্যাদি

নানা কথায় পূর্ণ ছিল। একান্ত পরিতাপের বিষয় যে সে পত্র ক'খানি খুঁজিয়া পাইলাম না।

পত্নীবৎসল গুরুসদয় স্বদেশ ও সমাজকে ভালবাসিতেন, আর তাঁহার প্রাণ কাদিত তাঁহারই পত্নীর অপূর্ণ প্রেরণা বলে আমাদের প্রপীড়িতা দুঃস্থা নারীসমাজের জন্ত। কথায় ও কাজে এক করিয়া তোলা হইতেছে বিরাট পৌরুষত্বের কাজ। সেই পৌরুষ ছিল গুরুসদয়ের, তাই বাঙ্গালার সর্বত্র সেরোজনলিনী স্মৃতি-মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে। আমার সেরোজনলিনী বিদ্যালয় কিংবা উহাদের কার্যপ্রণালী দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই, তবে সে বিদ্যালয়ের অপূর্ণ কর্মকুশলতার পরিচয় ত সর্বদাই পাইয়া থাকি।

ব্রতচারী ও রাইবেশে নৃত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার ভার শেষটায় তিনি নানা কর্মব্যস্ততার দরুন স্থপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সুলেখক শ্রীযুক্ত মনোজবাবুর উপর দিয়াছিলেন। মনোজ বাবুও আমাকে বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাহা প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। তাই আমার একান্ত আগ্রহ সম্বন্ধে ব্রতচারী নৃত্য বিষয়ে কোন প্রবন্ধ 'শিশুভারতীতে' প্রকাশ করিতে পারি নাই। সে একটা দুঃখ রহিয়া গেল। ভবিষ্যতে 'শিশু-ভারতী'র কোনও সংস্করণ হইলে এই অভাব পরিপূরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

প্রকৃত কর্মী, পরম উৎসাহী, জ্ঞানী, বাঙ্গালা মায়ে প্রিয়-সন্তান ছিলেন গুরুসদয়। কোথায় কোন্ দূর পল্লীর তালবনের ছায়ান্তরালে অবস্থিত কুটির প্রাঙ্গণে রহিয়াছে একটি মাটির ভাঙ্গা পুতুল, কোথায় কোন্ গৃহস্থরমণী কৃত সৌবন-শিল্পের অপূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে একখানি কস্থা—গুরুসদয় তাহা সমস্তে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। বাঙ্গালার কুটির-শিল্পের, মৃৎশিল্পের ও চিত্র আলিপনা প্রভৃতির সংগ্রহ ছিল তাঁহার অনেক; এ বিষয়ে তিনি বাঙ্গালার নানা বিখ্যাত মাসিক পত্রে কয়েকটি সচিত্র ও সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিভিন্ন মাসিক

পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার সেই প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হওয়া উচিত।

মানুষ মৃত্যুর অধীন। কিন্তু কীর্তিমান পুরুষেরা মৃত্যুকে বিজয় করিয়া তাঁহাদের কীর্তির মধ্য দিয়া অমর হইয়া থাকেন। গুরুসদয়ের অধিনশ্বর কীর্তি হইতেছে তাঁহার সেরোজনলিনী স্মৃতি-পুত প্রতিষ্ঠান সমূহ। দরিদ্রা নারীসমাজকে শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণের জন্ত তাঁহার দান চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আমার সহিত আলাপ ও পরিচয় দীর্ঘ দিনের হইলেও সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু যখনই সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনই এই নিরভিমानी বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া অকৃত্রিম সৌহার্দের পরিচয় দিয়াছেন।

গুরুসদয় সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে ছিল সতেজ সাহসিকতা এবং বিজ্ঞপাতক বাণী। সে বাণীতে লোকে আনন্দ পাইত এবং নিজ নিজ ক্রটি সংশোধনের জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িত। কোনরূপ ভাণ তাঁহার চরিত্রে ছিল না। নির্ভীক বিচারক, জনপ্রিয় শাসক, সদালাপী বন্ধু এবং বাঙ্গালা মায়ে প্রবৃত্ত হিতকামী সুসন্তান ছিলেন এই গুরুসদয়। তাঁহার আলস্য বলিয়া কিছুই ছিল না। এই অনলস, সুস্থ, সবল কর্মীর অকালমৃত্যু দেশের পক্ষে যে গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়াছে তাহা আমরা বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছি।

আজ তাঁহাকে স্মরণ করিবার সুযোগ পাইয়া আপনাকে ধন্ত জ্ঞান করিতেছি। গুরুসদয়ের আদর্শ একদিন সারা বাঙ্গালা দেশের নরনারী সাংগ্ৰহে বরণ করিয়া লইয়া দেশের সেবা করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে—এ বিশ্বাস আমি করি।

গুরুসদয়ের সহধর্মিণী সেরোজনলিনী সত্য সত্যই ছিলেন গৃহিণী, সচিব, সখী এবং তাঁহার কর্ম প্রেরণার উৎস সেই উৎসহারা হইয়া প্রেমিক গুরুসদয় মানবপ্রেমমন্ত্রে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া জীবনকে সার্থক, সুন্দর ও মহিমামণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন।

আকুল প্রতীক্ষা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

মহর্ষি মাতঙ্গ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। তাঁহার শরীর তপস্তার তাপে শীর্ণ ও জরাভারে ভগ্ন। শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্টা শবরী শোকাকুল অন্তরে গুরুর সেবায় নিযুক্ত। মাতঙ্গের মৃত্যু-শয্যায় আসীনা শবরীকে সদা-প্রস্তুতি রৌদ্রদগ্ধ বনফুলের মত স্নান দেখাইতেছে। মহর্ষির মহাপ্রয়াণ আগতপ্রায়। পালিত কন্তা শবরীকে কাছে ডাকিয়া মাতঙ্গ আবেগভরে বলিলেন—“মা, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। আমি পরলোকে যাইতেছি। মানবদেহধারী শ্রীভগবানের চাক্ষুষ দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিল না। ভগবান রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমানে তিনি চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান কচ্ছেন। তিনি সীতার অঘেষণে নীত এই আশ্রমে পদার্পণ করবেন। তুমি ব্যাকুলভাবে তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা কর। তাঁহার দীর্ঘ দর্শন লাভের পর তুমি জলন্ত অগ্নিতে দেহ-বিসর্জন দিয়ে ব্রহ্মলোকে আমার নিকটে এসো।” এই কথা বলিবার পরই মাতঙ্গের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

মাতঙ্গের মৃত-দেহের সংস্কার সমাপণ করিয়া শবরী শ্রীরাম-চন্দ্রের আকুল প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতে লাগিল। শবরী মাতঙ্গের শুধু শিষ্যামাত্র নহে, পরমস্নেহে পালিতা কন্তা। মাতঙ্গ যেমন শবরীকে অশেষ স্নেহ করিতেন, শবরীও তেমনি একনিষ্ঠভাবে বৃদ্ধ গুরুর সেবা করিতেন। মাতঙ্গ ছিলেন শবরীর গুরু ও পিতা উভয়ই। ঋষির সেবাই শবরীর দৈনন্দিন জীবনে প্রধান কাজ। মাতঙ্গের অন্তর্দানে শবরীর কোমল হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। কিন্তু গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই শবরী আশ্রমে জীবন কাটাইতে লাগিল। গুরুর বাক্যই গুরুর শৃঙ্গ স্থান অধিকার করিল। গুরু শিষ্যের মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ় ও গভীর না হইলে কোন শিক্ষাই ছাত্রের জীবনে কার্য্যকরী স্থায়ী হয় না। মাতঙ্গের স্নেহ-সিক্ত শবরী আজ তাই গুরুর অন্তিম উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া জীবন যত্ন করিবার জন্ত উৎস্রাব হইল। মাতঙ্গের মৃত্যুর সময় শবরী অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র ছিল। আজ

বালিকা আশ্রমে একাকিনী। আশ্রমের সকল স্থানই গুরুর স্মৃতি-বিজড়িত। শবরী চারিদিকে বাহাই স্পর্শ করে বা দেখে তাহাতেই স্বর্গগত গুরুর পুণ্য স্মৃতি মূর্ত হইয়া উঠে। প্রত্যহ প্রাতে শবরী গুরুর নাম স্মরণ পূর্বক শয্যাভ্যাগ করেই স্বীয় হস্তে স্তম্ভর ও স্তম্ভরী পুষ্প চয়ন করিয়া পূজার পাত্রে সাজাইয়া রাখে। জুঁই, চামেলি, মল্লিকা, মালতী, গোলাপ, মাধবী প্রভৃতি নানাবিধ ফুলে আশ্রমের উদ্যান পরিপূর্ণ। শবরী মর্ত্যের একটি সৌন্দর্য-চক্র। তার যৌবন প্লাবিত দেহলতা হইতে কান্তি কিরণ সদা বিচ্ছুরিত হইতেছে। সে যখন বাগানে ফুল তোলে তাহাকে পারিজাত-বৃক্ষরূপে ভ্রম হয়। পুষ্প-চয়নান্তে শবরী আশ্রম-বেদী পরিষ্কার করিয়া, পত্রপুষ্পে বেদী সাজাইয়া সচন্দন পুষ্পের অর্ঘ্য-তৈয়ার করিয়া রাখে। ভগবান রামচন্দ্র আসিবেন—সচন্দন পুষ্পে সে তাঁহার পাদ-পূজা করিবে। এই আশায় বৃক বাধিয়া শবরী দিন রাত্রির প্রত্যেক ঘণ্টা কাটায়। আশ্রমের বৃক্ষ রাজি হইতে নানা স্তম্ভিত ও সুপক ফল সংগ্রহ করিয়া শবরী বেদীর উপর নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখে। কিন্তু রামচন্দ্রজী আর আসেন না। প্রাতের সূর্য্য পূর্বের উদয়গিরি ছাড়িয়া মধ্যাহ্নে আকাশ শীর্ষে অবস্থিত হয়, আবার মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমের অন্ত-গিরিতে গমন করে; অর্ঘ্যের পুষ্প ও নৈবেদ্যের ফল শুকাইয়া যায়। দিনের পর দিন অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য এইভাবে নষ্ট হইতেছে। পরম অতিথির অভ্যর্থনার জন্ত শবরী সদা প্রস্তুত আছে। শবরী নিত্য স্নান ও আহার তাড়াতাড়ি সারিয়া লয় পাছে অতিথি অসময়ে উপস্থিত হন। এত উৎকর্ষ ও আকুল প্রতীক্ষায় রাত্রি অতীত হইত যে, তার চক্ষে নিদ্রা আসিত না। আকুলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শবরী স্নানাহার ভুলিল। আশ্রমের দ্বার সদা উন্মুক্ত আছে—যাহাতে অতিথি আশ্রমে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন। এইরূপ আকুল প্রতীক্ষায় দিন যায়, রাত্রি আসে। কিন্তু অতিথি কোথায়? এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিল—কিন্তু রামচন্দ্রজীর কোন সংবাদ নাই। শবরী বাল্য অতিক্রম করিয়া যৌবনে

প্রবেশ করিল। যৌবন বিবাহের কাল। কিন্তু তার বিবাহ স্থগিত রহিল—কারণ বিবাহের ব্যস্ততার মধ্যে যদি স্বর্গের অতিথি আসিয়া হাজির হন—তাহা হইলে অতিথির অভ্যর্থনার যে ব্যাঘাত হইবে! এইভাবে যৌবন ও চলিয়া গেল—আর শবরীর বিবাহ করা হইল না। রামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় তাহার হৃদয় এত আকুল যে, যৌবন তাহার মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টির সুযোগ পাইল না। এইরূপে আদর্শের ধ্যানে আত্মহার্য না হইলে কামাদি রিপু জয় করা অসম্ভব। কামক্রোধাদি রিপুকে ভুলিতে হয়, জয় করা যায় না। শবরী তাহার হৃদয়-কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া শ্রীভগবানের চিন্তায় এত তন্ময় হইয়াছে যে, অন্য কোন বিষয়ই তার মনে স্থান পাইতেছে না। অন্য কোন বিষয় সে শূন্যিয়াও শুনে না; অন্য কোন বস্তু সে দেখিয়াও দেখে না। শবরীর সমগ্র মন রামচন্দ্রে একাগ্র হইয়াছে, এক একটি দিন বা রাত্রি এক একটি বৎসরের মত সুদীর্ঘ মনে হইতেছে।- তাহার বার্কাক্য আসিল। দেখে জরা দেখা দিল। কান্তি নিস্ত্রভ হইল। শবরী ভাবিল—প্রভু আমার মত পাতকীকে বোধ হয় কৃপা করিবেন না। আমার মতন অকৃতী অধমকে তিনি দর্শন দিবেন মনে হয় না। এই অসম্ভব ব্যাপার নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে না। আমি অবশ্য তাঁহার দর্শন লাভের অযোগ্য। কিন্তু গুরুবাক্য ত মিথ্যা হইবার নহে। সিদ্ধ সংকল্প মহর্ষির মনে ত কখনও অসত্য সংকল্প উদ্ভিত হইবে না। তিনি যখন বলেছেন—শ্রীভগবান নিশ্চয়ই আসিবেন। তাঁহার বাক্য নিশ্চয়ই সফল হইবে।” গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আবার হৃদয় হইতে নৈরাশ্রের অন্ধকার অপসারিত করিল। হৃদয়ে আবার আশার স্নিগ্ধ আলোক জলিয়া উঠিল। আশার সঞ্চারে তাহার মনপ্রাণ উৎফুল্ল হইল।

একদিন প্রাতে শবরী পুষ্প চয়ন করিতে যাইয়া দেখে আশ্রমোদ্যানের সকল ফুলই ফলে পরিণত হইয়াছে। শবরী গাছে একটিও ফুল পাইলেন না। তবে কি আজ তাঁহার ভক্তি-পুষ্প ফল-প্রসব করিবে? আজ কি তাহার আকুল প্রতীক্ষা সফল হইবে। শবরী উদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন—আশ্রম বেদীতে লক্ষণ সহ শ্রীরামচন্দ্র আঙ্গজ্যোতিতে দশদিক দীপ্ত করিয়া বিরাজমান। তার এতদিনের অর্থ্য রচনা সার্থক হইয়াছে। এতদিনে তাহার সাগ্রহ আত্মান প্রভু শূন্যিয়াছেন। নবদুর্বাদল কান্তি, ভক্তমনোরঞ্জন, সত্যব্রতধারী শ্রীরামচন্দ্র

দর্শনে শবরী আনন্দে বিভোর। নয়ন মুদিয়া দেখেন তাহার হৃদয়-বেদী আলোকিত করিয়াও শ্রীভগবান প্রকাশিত। আনন্দের আতিশয্যে শবরী নির্বাক। শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-কমল-মুগল চোখের জলে ধুইয়া স্বীয় কেশে মুছিলেন। পরে স্নগন্ধ পুষ্পে পাদ-পূজা করিয়া তাঁহাকে আহৃত ফল নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষণ শবরী প্রদত্ত ফলাহার পূর্বক আশ্রম পরিদর্শনে উঠিলেন। শবরী অতিথিবরকে মেঘঘনপ্রাচ্য মৃগ-পক্ষি সমাকুল মাতঙ্গ বনের দর্শনীয় সকল বস্তু ও বৃক্ষ ও পশু দেখাইলেন। বলিলেন—“গুরুদেবের যাবজ্জীবন তপ প্রভাবে হিংস্র জন্তু হিংসাত্যাগ করিয়া আশ্রমে একত্র বাস করিতেছে। এই বনের পুষ্পরাজি যতদিন বৃক্ষে থাকে ততদিন মলিন গন্ধহীন হয় না। মহর্ষি যাগযজ্ঞ ও কঠোর তপস্যায় সমগ্র জীবন তোমার অপেক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আজ আশ্রম পবিত্র ও কৃতার্থ হইল। গুরুর আকাজ্জ শিষ্য পরিপূর্ণ হইল। আমার জীবনে দ্বিতীয় বাসনা নাই। আমি গুরু-সমীপে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিব। তার পূর্বে তোমার সম্মুখে আমি অগ্নিতে এই নখর দেহ ত্যাগ করিবার অল্পমতি ভিক্ষা করি।” রামচন্দ্র স্বীয় প্রয়োজনেই শবরীকে দর্শন দিয়াছিলেন। সীতার অদর্শনে তিনি অধীর। শবরীর নিকট সীতার অবস্থিতির সংবাদ জানিতে তিনি মাতঙ্গ আশ্রমে উপস্থিত হন। সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইয়া লঙ্কার অশোকবনে আছেন—এই খবর রামচন্দ্র শবরীর মুখে শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। স্ত্রীবেদ সহিত মিত্রতা করিয়া সীতা উদ্ধারের সঙ্কেত লাভে রামচন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া শবরীকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

চিতা প্রস্তুত। স্নাতসংযুক্ত গুরু কাষ্ঠ সংযোগে চিতার আগুণ দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। চিতা সমীপে ভব-সাগরের কাণ্ডারী সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান। শবরী আশ্রমস্থ সকল পুষ্পবৃক্ষ, ফলবৃক্ষ ও মৃগাদি জন্তুর নিকট বিদায় লইল। গুরুর বাক্য আজ সে পালন করিতে পারিবে এই তৃপ্তি ও প্রসাদে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। ভগবদর্শন হেতু তাহার মন ও নির্ভীক। এইরূপ যুতাজ্জয়ী অভীঃ একমাত্র ঈশ্বর-দর্শনেরই ফল। যুতুর পূর্বে বাহার নাম একবার মাত্র স্মরণ করিলে মানুষ সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মুক্ত হয়, সেই ভগবান যখন মানব দেহে তাহার সম্মুখে উপস্থিত, তাহার আর

ভয় কি। শ্রীগুরুর স্মরণ এবং শ্রীভগবানের দর্শন করিতে রঘুপতি আশ্রম হইতে অন্তর্হিত হইলেন। শবরীর মুক্তায়া করিতে শবরী ধীর পদে শান্ত মনে ও প্রফুল্ল বদনে জলন্ত অগ্নিতে ব্রহ্মলোকে গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া ব্রহ্মপদে লীন হইল। প্রবেশ করিল। শবরীর শুদ্ধ শরীর পুত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। স্বর্ঘ্যের রশ্মি স্বর্ঘ্যেই পুনর্মিলিত হইল। হরি ওঁ

শেষ-কথা

রথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী

সন তারিখের হিসেব নিয়ে কাটিলো অনেক কাল,
ধমকে থামা ঝড়ে এবার হারিয়ে গেছে সাল।
দূর থেকে কার ডাক এসেছে আকাশ থেকে নেমে,
স্বর্ঘ্যতারা একপলকে হঠাৎ গেল থেমে,
দিনের বাধা চেকিলো এসে সাঁঝের উপকূলে,
আলোর সোনা লাগলো কাজল মোদের এলোচূলে,
সজ্জনে শালের ফুলের আঁচল কাঁপায় দূরের হাওয়া
এবার আমার চরম হলো ফুলের গন্ধ পাওয়া।
এই পৃথিবীর ধুলির পরে এক নিমেষের স্তরে
আমার প্রাণের ষোগ হলো আজ লক্ষ যোজন দূরে,
সেই স্তূরের একটুখানি ব্যাকুল করা বাঁশী
হঠাৎ কখন উঠলো বেজে বুকের কাছে আসি ;
আকাশ যেন ঝিমিয়ে পড়ে নেশায়,
পৃথিবী তার চোখ দু'টিতে অবাক খুশি মেশায়।
ঝিমিয়ে পড়া রোদটুকু তাই অধীর হয়ে জাগে
জলে স্থলে স্পর্শ স্পৃহা মাগে,
আবেশে তার চোখ রেখেছে তন্দ্ৰাভরা স্তখে
এই পৃথিবীর নয় মাটির বুকে।
এই পিপাসা মুচুবে না তার ভবিষ্যতের কালে
চমক লাগা কোনো তারিখ সালে।

চরম হলো এই পৃথিবীর এমনি করে থামা
অজানা দূর পাহাড় থেকে সোনার ঝর্ণা নামা,
শেষ হলো আজ একপলকের পুতুল খেলায় যেন ;
কেউ জানে না যাওয়া আসার চরম মৃত্যু কেন !

এই ধরণীর একটি কোনের একটুখানি নীড়ে
শত যোজন দূরের স্বর্গ ফিরে,
শিথিল আজি পথিক বধূর ব্যাকুল ছুটি জাঁখি—
থামলো হঠাৎ অশ্রুজলে ঢাকি',
মনের ক্ষুধা অনামিকার স্তূর থেকে নেমে
ধুলির পরে বুধাই থাকে থেমে।

সন তারিখের হিসেব নিয়ে কাটিলো অনেক কাল,
ধমকে থামা ঝড়ে এবার হারিয়ে গেছে সাল,
হারিয়ে গেছে কোথায় থসে ইতিহাসের পাতা :
সৃষ্টি যেন হঠাৎ শূন্য খাতা।
আমার বুকের কাছে এসে তুচ্ছ তুণের দল
আজকে যেন ভুলেছে কোন গভীর কোলাহল,
দৃষ্টি আমার এক পলকে উড়ে
শূন্য হাওয়ায় মুক্ত পালে কোথায় এলো ঘুরে।
দূরে সে নয়, এই পৃথিবীর একটি গোপন কোণে
চামেলিকার গন্ধ-বিজন বনে।
উদাসী আজ তেমনি করে চির দিনের নেশায়—
দূরের মোহ সমুখ পথে মেশায়।
থামলো দিনের পথগুলি মোর সাঁঝের উপকূলে
দিনের আলোর রঙ লেগেছে মেঘের এলোচূলে,
মুচুবে নাকো ভবিষ্যতের স্তূর কোনো কালে
চমক লাগা কোনো তারিখ সালে।

[এই কবিতাটি ১৩৪৭ সনের ৫ই জ্যৈষ্ঠ শান্তিনিকেতনে
রথীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অহুস্তিত 'সাহিত্যিকার' সভায়
পঠিত হয়।]

বাঁধ ও বন্যা

(পূর্বাহ্নরুতি)

শ্রীমনোজ বসু

একটা ইটের পাঁজার উপর দিক্কার হাত দুই-তিন দেখা যাইতেছে। দিগ্ভ্রান্ত অন্ধকার, মাঝে মাঝে বিহ্বল চমকাইতেছে। জল দেখা যাইতেছে না, কিন্তু পাঁজার গায়ে ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে—কখন জোরে, কখন আশু—তাহার শব্দ হইতেছে। মাঝে মাঝে একেবারে থামিয়াও চলিতেছে। তাহারই মধ্যে লোকজনের কথাবার্তা কানে আসে।

পাঁজার উপর কতকগুলি লোক আশ্রয় লইয়াছে—দূর হইতে ও আর্তনাদ আসিতেছে।

দূর হইতে স্ত্রী-কণ্ঠ। সবোনাশ...ও দিদি, আমার খোকন পড়ে গেল জলে...ধরতে নারলাম, ভেসে গেলো...ও দিদি, দুখ ছিল না, বাচ্চা আমার কেন্দে কেন্দে একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ল...কি করি, ও দিদি—

দূর হইতে পুরুষ-কণ্ঠ। ধরো...ধরোনা ছোট বউকে...ঘুর কুটি অন্ধকার...কি হল...বাবা ভৈরব নিয়ে নিল...হারে অদেষ্ট...

পাঁজার উপরের একজন। হরেকিষ্টর বউয়ের ছেলেটা গেল রে!

আর একজন। পাঁচ-পাঁচটা গরু গেল, আট সের দুধ।

এক বড়ী। ওরে আমার গুলের কোটো-টা গেল রে—

আর একজন। গেল গেল—সব গেল। ধান, পাট,

বাড়ি ঘরদোর সমস্ত গেল। কলি উলটাবে।

আর একজন। বাবা ভৈরব, হে বাবা কাল ভৈরব,

ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও—

ইহাদের মধ্যে ত্রিলোচন ও আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

ত্রিলোচন। কারো কাছে দেশলাই আছে ভাই?

একজন। তামাকের পিপাসা হ'ল কার?

ত্রিলোচন। তামাক নয়, বিড়ি খাব...ডিঙি বেয়ে

ফুটি করে যায় কে?

দূরের চলন্ত ডিঙি হইতে। আমি যাদব চন্দ্র নাথ, সাকিম আহুগড়া। বাদায় গোলপাতা কাটতে গিছলাম। জিজ্ঞাসা করে কেভা?

একজন আরও দূর হইতে। ও ভাই নৌকোটা এদিক পানে আনো। গাছের ডাল ধরে ঝুলছি; যাঃ শালা—ডালও ভেঙে পড়ল।

এই অবস্থাতে ও কোথা হইতে একজন বেসুরা গাহিয়া উঠিল—

জল আনিবার করে ছলা—

কদম তলায় দেখিস কালা।

ত্রিলোচন। ও ডিঙি-ওয়াল ভাই—যাদব না কি নাম বলে—জোনাকির মতো ফুট ফুট করছে...আগুন নাকি? ঘুরিয়ে নিয়ে যাও ডিঙিটা। বিড়িতে একটা টান দেবো, গলা খুস-খুস করছে—

এমন সময়ে বিদ্যুতের আলোয় দেখিলাম, সন্ধ্যারাগী ও রামেশ্বর ক্রান্ত ভাবে পাঁজার উপর উঠিতেছে। কয়েক জন কোলাহল করিয়া বাধা দিতে লাগিল।

একজন। আবার কে আসে?

আর একজন। একটা নয়, এক জোড়া—আপনি জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে—

আগের জন। কেন, মরবার জায়গা এই পাঁজাটা ছাড়া আর নেই? পাঁজাও ত আরো চার-পাঁচটা রয়েছে।

পরের জন। আরে মোলো যা। নেছি ছোড়ে গা পথ...ভাগো—বলে, তিল রাখবার জায়গা নেই—তা দু-হুটো মালুম!

সন্ধ্যারাগী। বড়ো মানুষ বাবা; অনেক পথ ভেসে ভেসে আসছি। আর যাবার ক্ষমতা নেই।

রামেশ্বর। (মুহু কণ্ঠে) ছাড়ো পথ; হুত্বার মুখোমুখি.

দাঁড়িয়েও হিংসা ছাড়তে পার না? আশ্রয় হারিয়ে হাজার হাজার মানুষ ভেসে বেড়াচ্ছে, যতক্ষণ পা রাখবার জায়গা আছে, ততক্ষণ জায়গা দিতে হবে।

গলা শুনিয়া ত্রিলোচন এদিকে ছুটিয়া আসিল।

ত্রিলোচন। হজুরের গলা...সঙ্গে রাণী-মা রয়েছেন। ওরে হারাম জাদারা সন্—সন্—
একজন। হজুর?

ত্রিলোচন। হ্যাঁ...হ্যাঁ হজুর—রামেশ্বর রায়। হারাম জাদারা মরবার জায়গা পাওনি? হজুর এসেছেন ইটের পাঁজার আর তোরা সেখানে কা—কা—কা যেন কাকের জটলা হচ্ছে। নাম হতভাগারা, নাম—

লোক গুলার ঘাড় ধাক্কা দিয়া জলে নামাইতে লাগিল।

রামেশ্বর। (কষ্ট কষ্টে) ত্রিলোচন!

ত্রিলোচন। তখনও লোককে ধাক্কা দিতেছে—দেখুন ত রায় মশায়। হতভাগাদের আঙ্গুলটা বিবেচনা করে দেখুন। যেখানে আপনি আছেন, আর তার উপর রাণী-মা...নাম্ নাম্। ততক্ষণে এদিককার সকলেই নামিয়া গিয়াছে। ত্রিলোচন পাঁজার অপর দিকে বাঘের মতো গিয়া পড়িল। প্রায় সকলেই নামিয়া গেল। ছুটি প্রাণী পড়িয়া আছে—

সংজ্ঞাহীন নিশ্চয়—তাহাদিগকেও ত্রিলোচন বাদ দিবে না।

ত্রিলোচন। এ ভিন্নকৃষ্টিতে ত্রিলোচন পাকড়াশি ভোলে না; যমের বাড়ির পথ থেকে ও চুল টেনে ধরে খাজনা আদায় করে। ওঠো—ওঠো—

রামেশ্বর। ত্রিলোচন, এখানেও তোমার গোমস্তাগিরি?

ত্রিলোচন বুঝিয়াছে উহারা সত্যই অচেতন। তাহাদিগকে ছাড়িয়া কথা বলিতে বলিতে এদিকে আসিল

ত্রিলোচন। অস্তায় কি রায় মশায়। কেন, ঐ সব ঘরের চাল ভেসে যাচ্ছে...ওখানে উঠে মজা করে চলে যাক না!...কিন্তু ধরুন ঐ পোয়াটাক গিয়ে বারোখানির কাঁঠাল বন—সাঁতরে সেখানে যাক, দোতালার বসে দিব্যি ঘুমও দিতে পারবে।...তা নয়, আপনি আর রাণীমা যেখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—একটি ছোকরা ছিল, তাহাকেও থাক্কা দিল।

রামেশ্বর। তোমার আমি মেরে ফেলব ত্রিলোচন—

রামেশ্বর তাড়াইয়া যাইতে ত্রিলোচনও জলে ঝাঁপ দিল।

এমনিই হয়। প্রভুত্বের দর্প এমনি করে জড়িয়ে গেছে, সবাই চিনে ফেলে, সবাই ভয় পায়। মানুষের সঙ্গে মিলতে চাই, ওরা মিশতে দেবে না। প্রলয়ঙ্কর মৃত্যুদেবতা চারিপাশে গর্জন করছে, ঝড়ের মুখে পাতার মতো ধর ধর করে কাঁপছে পৃথিবী, সামান্য এই কয়েক হাত জায়গার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আছি...এখানেও বিভেদ, এখানেও ব্যবধান...

[ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল]

সন্ধ্যা। ও কি...বসে পড়লে—

রামেশ্বর। কতকাল...আজ কতকাল পরে জীবনের সীমান্তে এসে আপনার জন পেলাম [রামেশ্বর শুইয়া পড়িল] তোমার কোল হল আমার বালিশ। এমন স্থখে যে মরতে ইচ্ছা করে মনোরমা। জানি, আমার শবদেহের উপর তোমার চোখের জল উধেল হয়ে উঠবে। এ কি কম স্থখ আর এমন স্থখ কোনদিন জুটবে, তা কি রাঘব ঘোষ স্বপ্নেও ভেবেছিল।

সন্ধ্যা। শুয়ে পড়লে, শরীর খারাপ হল নাকি?

রামেশ্বর। না মনোরমা, এখন খারাপ হলে চলে। আর কি মরবার সময় আছে আমাদের? বাঁধ ভেঙে গেছে... হাজার হাজার মানুষ নিরস্ত, গৃহহারা হয়েছে। ওদের বাঁচাতে হবে, ঐ বাঁধ আবার নতুন করে বাঁধতে হবে। ওদের এই চরম বিপদে আমাদের চোখ বুঁজলে ত হবে না—

সন্ধ্যা। যাদের করবার কথা, তাঁরা কীকি দিয়ে গেল। আমার স্বরমা—

রামেশ্বর। আর নির্মল...সে আমার বড্ড আপন।... মনোরমা, তাই কাঁধের বোঝা আরও বেশি হয়ে চাপল। যারা যৌবনের তেজে যৌবন মাধুর্য্যে এই স্থানে নতুন কুল ফোঁটাত, তারা নেই...আমাদের ছ'জোড়া হৃদয় বাঁচ দিয়ে সেই সব করতে হবে।

সন্ধ্যা। দেখ...হয়ত তারা আছে...হয়ত ডোবেনি, কোণায় আশ্রয় নিয়ে আছে।...স্বরমা, খুকী, ফিরে আয়—

রামেশ্বর। নির্মল, স্বরমা, আমি ডাকছি—কোন ভয় নেই। জবাব দেও—নির্মল!

[পাঁজার ওদিককার সংজাহীন লোক দুইটি সুরমা ও
নির্মল। উহাদের চেতনা হইতেছে]

নির্মল। উ—

রামেশ্বর। জবাব দিল যে! সুরমা, নির্মল! ওই
না...তারা ওই পাঁজার উপর।...আলো পাই কোথায়—

সন্ধ্যা। আলো নেই, আলো লাগবে না। এতটুকু
থেকে মাহুষ করেছে, এখন আলো নিয়ে মেয়ে চিনতে হবে?

[তাহারা ছুটিয়া সেইদিকে গেল]

সুরমা, থুকা!

সুরমা। মা—

সন্ধ্যা। ওঠ মা, আমাদের এতটুকু রাগ নেই। ওঠো...
ওঠো নির্মল—

সুরমা। আমরা কোথায় মা?

সন্ধ্যা। এই যে—আমার কোলে। যেখানে পাঁচ
বছর বয়স থেকে বড় হয়েছিস।

নির্মল। রায় মশায়, আমাদের ক্ষমা করুন। নৌকো
ভেঙে চুরে গেল...টেডেয়ে আমাদের আছড়ে রেখে গেছে—

রামেশ্বর। তুমি ওঠ নির্মল...ওঠ সুরমা...ভয় নেই।

[হঠাৎ স্থির তীব্র আলো আসিয়া পড়িল]

ষ্টিমারের আলো পড়ল, ষ্টিমার কোথেকে?

নির্মল। সাহেবদের শিকারের ষ্টিমার—শায়ুক পোতা
ঘুরে যাচ্ছে। কাপড় ওড়ান...সকলে কাপড় ওড়ান...দেখলে
তুলে নিয়ে যাবে—

সুরমা। মা, রায় মশায় এখানে...উনিও কি বন্যায় ভেসে
এসেছেন?

সন্ধ্যা। রায় মশায় নয়—রাঘব ঘোষ। তাঁর মা'র
হারানো নিধি। ঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন...বন্যায় ফিরে
পেয়েছি।

[ষ্টিমারের সাইরেন বাজিল]

যশনিকা।

নীলনা-কমন

ত্রীকান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

ফুলটুনি-সই

‘ফুলটুনি-সই ফুলটুনি-সই,

আয় গোপনে কানে কানে একটা কথা কই!’

‘মুখটা চেপে কানের পরে

কও যে কি ছাই, লজ্জা করে!’

‘লজ্জা কি রে! বলছি না তো একটা কথা বই!’

‘ফুলটুনি লো ফুলটুনি,

কানের কাছে কইতে কি চাই যাও শুনি!’

‘ছি ছি! মাথার আঁচল খুলে,

চিবুকখানি ধরলে তুলে!’

‘নইলে কি আর দেখতে পেতাম লাল চুনি!’

‘ফুলটুনি-ভাই ফুলটুনি-ভাই,

আয় গোপনে একটা কথা বলতে কানে চাই!’

‘না ভাই, তুমি করলে কি এ,

ঠোঁটের উপর ঠোঁটটি দিয়ে!’

‘চুপ চুপ চুপ!—এই তো আমার গোপন-কথাটাই!’

পরিবেদনা

হা নিষ্ঠুর! হা নির্দয়! হা হা চিত্তচোর!

চলে গেলে? এখনো তো টুটে নাই মোর

নয়নের নেশার পুলক! তব লাগি’

বিনিম্ভ এ আখিপাতে রহিয়াছে জাগি’

অতৃপ্ত তিয়াস! দৃঢ় ভুজের বন্ধন

এখনো রেখেছে বুকে একে আলিঙ্গন!

বিজলীর মত হৃদি বারেক উজলি’

কোথা গেলে চলি’, বন্ধু, কোথা গেলে চলি’!

হা নিষ্ঠুর, হা নির্দয়, এসেছিলে যদি

মুহূর্তের তরে কেন? থাকো নিরবধি

কণ্ঠ মোর আলিঙ্গিয়া, ওগো কণ্ঠমণি,—

প্রতি অঙ্গ; প্রতি শিরা, প্রত্যেক ধমনি

কোমল পরশে তব শিহরি’ শিহরি’

উঠুক গুঞ্জরি’ আজি উঠুক গুঞ্জরি’!

নদীর জোয়ার সম উছলি’ উছলি’

ডুবাইয়া রাখো নীরে উত্ত-তটস্থলী!

(প্রবন্ধ)

১। প্রণালীর যে প্রথমে হিন্দুভাবধারা, তারপর বৌদ্ধভাবধারা, পরে

বহু প্রাচীনকালে স্তব উপাসনার মধ্যে সাহিত্যের করিয়া সাহিত্যের গতিভঙ্গীর পরিবর্তন করিয়া বহু প্রকাশ পায়। দেবদেবীর চরিত্র ও কাহিনী রচনা রস-সৃষ্টি করিয়াছেন।

তৎকালীন কবিরা ইহাদেরই জীবন কথা দেবভাবের মধ্যে ব্যাপক ও বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করিতে

সমাজে ধর্মভাবের মধ্যে প্রকাশিত হয়। পরে দেখা দিল ঐশ্বর্য্য ও বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের ঘন ঘন

হইতে অধিকাল্পনিকভাব বিলুপ্ত হইয়া সত্যকার কাহিনীতে পরিবর্তনের মোহ যাহারা পছন্দ করেন এবং গতানুগতিক

বৌদ্ধযুগে সাহিত্যের গতিভঙ্গী আর একরকমে দেখা বলিয়া রাখা ভাল যে এইসব গতিগঙ্গী যাহা সাহিত্যের

লাভ হয় তাহা নবযুগেরই সূচনা বলিয়া মনে হয়। পরিবর্তনের ফলেই হইয়াছে।

কথা এবং মহাপুরুষ বুদ্ধের অমৃতময় বাণী সাহিত্যকে দিক দিয়া বহু পরিবর্তন দেখা যাইতেছে—তাহার মূলে

সত্যই সম্বন্ধ করিল। ইংরাজ প্রীতি ও ইংরাজি অনুকরণের মোহই বেশী।

ভারতীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি দেখা দেয়। আরবী, ইংরাজী ভাষার প্রাধান্যে এই শ্রীবৃদ্ধি জাতীয়

ফারসীর সংশ্লেষে এবং মুসলমান রীতিনীতির সঙ্গে জীবনের মহত্তর পরিকল্পনা।

সঙ্গে আংশিক সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে লাগিল। দুই পাইয়াছে বিস্তর। সামাজিক চিত্র অঙ্কন এবং প্রাচীন-

জাতির মেলামেশার ফলে উভয় পক্ষই বহু নূতন তথ্য ভাবধারার নিখুঁত বর্ণনা করিয়া আচার ও রীতিনীতি

পাইল এবং এই স্বযোগে তৎকালীন কবিরা যে রচনা-সম্বন্ধে বহু উপন্যাস বাহির হইয়াছে। তারপর আধুনিক

ভঙ্গীর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত করিয়া গিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক সমাজ-জীবনের বিচিত্র ঘটনা যাহা উপন্যাসাকারে বাহির

এবং সাহিত্যের দিক দিয়ে উচ্চ শ্রেণীর বিষয়বস্তু। হইতেছে তাহার মধ্যে প্রাচীনপন্থীদের সামাজিক আচার

নীতির তীব্র সমালোচনা ব্যক্ত হইয়াছে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে সমাজের পরিবর্তন কম হয় নাই। এবং ভাবের সজ্জাতে ভাষার ভিতর দিয়া সাহিত্যের গতিভঙ্গীর যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে সাহিত্য বলিতে রাজা-মহারাজার চরিত্র, ঋষি চরিত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরে তাহা কিছু নিয়ন্ত্রণে নামিয়া আসিয়া অল্পখ্যাত-নামা ব্যক্তিদের বিষয় আলোচিত হইত। কিন্তু বর্তমানে একেবারে যে পর্যায়ে আসিয়া সাহিত্যের গতিভঙ্গী চলিয়াছে তাহা অপূর্ব এবং অদ্ভুত। কিছুদিন পূর্বে সামাজিক পদমর্যাদাসম্পন্ন গৃহস্থদের বিষয় উপস্থাসের মধ্যে আলোচিত হইত। অবশেষে তাহা গিয়া দাঁড়াইয়াছে কুলি মজুর ও চাকুরীজীবীদের বিষয় লইয়া। ভিক্ষুক, কুষ্ঠব্যাদিগ্রন্থ লোক এবং ইহাদেরই সমপর্যায়ে যাহারা নিতান্তই অবজ্ঞেয় তাহাদের স্থান অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিয়াছে আধুনিক সাহিত্যের ভিতরে। সত্য কথা বলিতে গেলে—বিরাট, ব্যাপকের সঙ্গে ক্ষুদ্র বিষয় বস্তু লইয়া যে আলোচনা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই বড় জিনিষ।

তারপর আসিল স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারা। জেলখানা, পিকেটিং, কংগ্রেস, স্বৈচ্ছাসেবক, সভা-সমিতি, বক্তৃতা, ধর-পাকড় প্রভৃতি লইয়া বহু রচনার প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহার ভিতর দিয়া রাজায়-প্রজায়, পিতা-পুত্রে যে নির্মম সংঘাত চলিয়াছে তাহা অবর্ণনীয় কিন্তু হইলে কি হইবে, লেখকেরা সেগুলিরও বহু চিত্র আঁকিয়া সাহিত্যের গতিভঙ্গী বিভিন্ন পথে চালাইয়া গিয়াছেন। এই যে পরিবর্তন এবং বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার বৈচিত্র্যময় গতি তাহা রোধ করিবার উপায় নাই।

যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্মে, সমাজে এবং নীতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। সাহিত্যও সেই তালে তাল রাখিয়া চলিতে থাকে—ফলে তাহারও বৈচিত্র্যময় গতিভঙ্গী ক্রমাগত আমরা দেখিতে পাই।

বর্তমানে আর এক আবহাওয়া দেখা দিয়াছে। তাহা হইতেছে বিশ্বযুদ্ধ। এই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষের

জীবনগত ও চরিত্রগত ব্যবধান ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। সর্বত্র একটা আভঙ্কের ভাব। ক্রমে ক্রমে তাহা সমাজকে আক্রান্ত করিতেছে। মানসিক এবং শারীরিক বলের প্রয়োজন দেখা দিতেছে। ধ্বংসের ভাবী সম্ভাবনায় সকলেই মুহূমান। এই যে অভিনব অবস্থা বর্তমানে সকলের দাঁড়াইয়াছে তাহার মধ্যেও সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীর ছায়া পড়িয়াছে। তাহারাইহার মধ্যেই এক নূতন রসের আভাষ পাইয়াছেন। শাইরেন, বোমা, গ্যাস, কামান, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, মেশিনগান, ডিনামাইট, ব্র্যাক আউট, এ-আর-পি, স্লিট ট্রেক, এক্সপ্রারগান, এভাকুয়েশন প্রভৃতি লইয়া তাহাদের যেন নূতন খোরাক জুটিয়াছে। এই সকল বিষয় লইয়া ইতিমধ্যে বহু রচনা বাহির হইয়াছে। এই নবরস-স্বাদিত বিষয়বস্তু সত্যই স্বথকর নয়, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে ইহাকে স্থান দিলে তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিলে মিথ্যা বলা হয় না।

সাহিত্যের এই সব গতিভঙ্গী যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া মানুষের মঙ্গল সাধন করিয়াছে বলিলে ঠিকই বলা হইবে। কারণ ইহাই পুরান্বিত। অতীতের কথা কাহিনী লইয়া ইহা চলিয়া আসিতেছে। গতিভঙ্গীর অর্থ সুস্পষ্ট। মানুষের ধর্মগত, জাতিগত, সমাজগত, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী লইয়াই সাহিত্য এবং এই সবগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন হইলেও তাহা বিসদৃশ লাগে না।

এই যে সাহিত্যের গতিভঙ্গীর কথা আলোচিত হইল ইহা এইখানেই শেষ হইল না। ইহা চিরন্তন হইয়া আসিয়াছে এবং হইবেও। বর্তমান সঙ্কটকালে যাহা দেখা বাইতেছে তাহাই সাহিত্যের মধ্যে পুষ্টলাভ করিতেছে এবং পরেও তাহা কিরূপে দেখা দিবে আংশিক তাহাও অনুমান সাপেক্ষ। বর্তমানে একটা কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গতিভঙ্গী সেই স্বরে স্বর মিলিয়া প্রকাশ পাইবে আবার নবরূপে নবচ্ছন্দে। ইহাই সাহিত্যের গতিপথ।

বদলি

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

“কি ডাক্তারবাবু, আজই চলতি তা” হলে? ও, জিনিষ পত্র বাঁধতে শুরু করে দিয়েছেন যে! এত তাড়াতাড়ি কেন?”

“ব্যবস্থা করে রাখি। গুরুপক্ষ, সন্ধ্যার বোঁকে রওনা হব, বহুদূর হরিশ বাবু।”

বঙ্কিম ঘোষ, জেলা বোর্ডের ডাক্তার। বদলির ছকুম এসেছে, তাই যাত্রার আয়োজন। শার্কত্য উপত্যকার মাঝে গ্রামের ভেতর ডিসপেন্সারী, তার পাশের লাগোয়া ঘর হল কোয়ার্টারস্। বছর তিনেক কালাজ্বর এড়িয়ে এখানে কাটিয়াছে, এবার ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গায় বদলি হ’য়েছে। বিদেশে জঙ্গলের মধ্যে বাস, বাঙালী বলতে বস্তু ডাক্তার আর কাছের চা বাগানের কর্মচারি হরিশ রায়।

এক বিদেশ থেকে আর এক বিদেশে যাত্রা; নিঃসঙ্গ, ওলট পালট খাওয়া জীবন। ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে, পাহাড়ী কুলী লাগাম ধরে এগিয়ে চলল। পেছনে আর একটা মালবাহী ঘোড়ায় জিন লাগান, বস্তু চড়ে বসল। তখন গোধূলি উত্তীর্ণ হ’য়ে গেছে। খোয়া-ওঠা পথ, ধূলি-ধূসর। দোকান পাট সব বন্ধ হ’য়ে যাচ্ছে। তিন বছরের বাস তুলে চলেছে বঙ্কিম। মাহুস চলে যায়, স্থিতি পড়ে থাকে। স্থিতি ফেলে রেখে যাবার এখানে কিছু নেই। কর্ম স্থল; আজ বঙ্কিম চলল, কাল আর একজন তারই মত এসে ডিসপেন্সারী খুলবে। এমনি দিনে এক সকালে তিন বছর আগে সে ডিসপেন্সারী খুলে বসেছিল। বদলির কালে যাত্রাটাই বড়, থাকাটা নয়। তাদের জীবনে চেনা স্বথ, পরিচিত কর্মস্থল, কেবলই পেছু হেঁটে সরে সরে যায়। এই তিন বছর আগে যখন তরাই থেকে এখানে এসে হাজির হ’য়েছিল তখন বঙ্কিমের কত না ভাল লেগেছিল। তরাই বিশ্রী অস্বাস্থ্যকর, তবু এখানটা মন্দের ভাল। তারপর হরিশবাবুর

পরিবারের সাথে আলাপ হল, প্রায় সন্ধ্যা কাটাত ওখানে। কুগীরা পর্যন্ত জেনে গিয়েছিল, দরকার হলে ওখানে তারা তাকে ডাকতে যেত। আজকে যে-রাস্তার মোড় ফিরতে বারবার সে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, এ পথ তার কত পরিচিত। তিন বছরের ভেতর এমন সন্ধ্যা ছিল না, যে কাজে অকাজে এ পথে সে হাঁটেনি। এই ত সেই লক্ষ্মীদাস মাড়োয়ারীর গদি, পি ডবল্যা, ডির বাংলা বেড়া ঘেরা জনারের ক্ষেত। এক বছর, দু’ বছর, ... এমনি পর পর দিন কেটে যাবে, এই সব অভ্যস্ত পরিচিত পরিবেশ ম্লান হয়ে আসবে ক্রমশঃ, হয়ত মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত মনে পড়বে।

চা বাগানের ভেতর হরিশবাবুর বাড়ী দেখা যাচ্ছে। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। বেশ লোকি হরিশবাবু। কত যত্নই না করতেন! হরিশবাবুর স্ত্রী বড়দিদির মতই ভালবাসতেন। আজ যখন দেখা করতে গেলাম, তাঁর মুখ অশ্রুনিরুদ্ধ হ’য়ে উঠেছিল। প্রণাম করলাম, কোন কথা বলতে পারলেন না। ...বিদেশের নিঃসঙ্গতা তবু এঁদের জন্যই কমেছিল। ভাগিটীও বড় ভাল। মাঝীর অস্থখের সময় কি সেবাটাই না করলে। ওর যত্নেই সে-যাত্রা উনি রক্ষা পেলেন। কেবল ওয়ধে কিই বা হত!

উপত্যকার গুমোট গরম। চারপাশ নিঝুম, নিস্তব্ধ। দুশাশে চা ঝোপ, মাঝে মাঝে রেকাবে চা গাছ ঠেকে যাচ্ছে। অনেক পথ চড়াই করতে হবে, ঘোড়া চলেছে আপন মনে ঠুকঠুক করে বঙ্কিম লাগাম টিলে দিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে বড় গাছ; কুয়াসায় সব ঢেকে যাচ্ছে। আকাশ থেকে সূর্যের শেষরশ্মি তখনও বিদায় নেয়নি। দু’ একটি তারা ফুটে উঠছে, চাঁদের আলো পড়েছে আকাশের গায়। অস্থখুরে ওড়া ধুলোর কড়া গন্ধ। মোড় ঘুরতে চা ঝোপ নড়ে উঠল।

“আরে রমা, এই ভর সন্ধ্যায় কোথায় যাচ্ছ? যাক্,

ভাল হল, তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।” বন্ধিম ঘোড়া খামালো। কাপড় সামলিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রমা বললে, “মামা ত ছুপুরে গিয়েছিলেন। এ-ই একটু এদিকে এলাম।”

আজ গুরা সন্ধ্যার বিজ্ঞান পরিবেশে, অদ্ভুত লাগল বন্ধুর রমাকে। মামীর রোগ শয্যায় কত কাছাকাছি সে রমাকে দেখেছে। কিন্তু পাটভাঙ্গা সাধারণ সাড়ী পরা, শুছিয়ে চুল বাঁধা মেয়েটিকে আজ বড় বিচित्र লাগল। কেমন যেন বিষাদের ছায়া তার মুখে, তবু দেখতে ত মন্দ লাগছে না। কোন দিন কি রমার এমন পরিপাটি বেশ তার চোখে পড়েনি? কেন, এই ত সেদিনও দেখেছে সন্ধ্যা বেলায়, যেদিন তার বদলির খবর এসেছে জানালে বন্ধু হরিশবাবুদের। হরিশবাবুর স্ত্রী ত আকাশ থেকে পড়লেন। রমা তখন তক্তা-পোষের ওপরে বসে, বেরালের গায়ে হাত বুলচ্ছিল, বেরালটা চোখ বুজে ঘড় ঘড় করছিল। কথাটা শুনে বেরালটাকে চুপ করে নামিয়ে ঘর থেকে আলগোছে বেরিয়ে গেল।

বন্ধু ঘোড়া থেকে নেমে, লাগাম ধরে এগিয়ে চলল। “যাক, তবু যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হল।” আঁচলটা বুকের ওপর টেনে ধরে ঘাড় হেঁট করে বাঁ হাত দিয়ে আঁচলের কোণ পাকাতে পাকাতে রমা চলেছে পাশে। “সত্যি, তোমাদের যত্ন ভুলতে পারব না। এই বিদেশে তোমরাই ছিলে একমাত্র সঙ্গী। হরিশবাবুকে, দিদিকে বল আমার কথা।”

—এই ত সবে সন্ধ্যা, এত সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেন যে।

—গরমের সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে। রাত ন'টা নাগাত সহরে পৌছব। এই আট মাইল পথ চড়াই করতে হবে ত! তারপর, রাতটা বন্ধুর বাড়ী কাটিয়ে কাল সকালের ট্রেনেই দেশে চলে যাব,—আবার ত সাত দিন পরে কাজে জোতা আছে।

—আপনাদের দেশ কোথায় যেন ব'লেছিলেন?

—ফরিদপুর।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ফরিদপুর। আচ্ছা, মিরিক জায়গা কেমন?

—জায়গা শুনেছি ত ভাল। পোলো খেলার মাঠ আছে। কাছাকাছি চা বাগানের সাহেবরা খেলতে আসে। তবে নির্বাকবপুরী। এখানে তবু তোমরা ছিলে।

সেখানে ও আলাপ হ'য়ে যাবে।

—অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছ, এই যে আর খানিক দূরেই পুল। আবার এতটা পথ কিরতে হবে ত!

বন্ধু দাঁড়াল

রমা বললে, ভারী ত দূর। ঐ ত বাড়ী দেখা যাচ্ছে—। তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, আপনার একটা চিঠি আছে, এই যে; বন্ধু হাত বাড়িয়ে নিলে। “আচ্ছা আসি” বলে রমা নেমে গেল চা খোপের মাঝে পাক দণ্ডী বেয়ে। বন্ধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটি স্তিমিত জ্যোৎস্নালোকে অস্পষ্ট সাদা ছায়া অল্পসরণ করতে লাগল। ছ' একটা বাকের পর আর রমাকে দেখা গেল না।

পাহাড়ীকুলী অনেক দূর এগিয়ে গেছে, বন্ধু ঘোড়ার পিঠে চড়লো। নিঃশব্দে চলেছে ঘোড়া, আঁধার তরল হ'য়ে আসচে। চাঁদ গোল রূপার মত চক্চকে হ'য়ে উঠেছে। কোন কিছু সাড়া শব্দ নেই। কেবল রাত চরা পোকের একটানা কাতরানি।...

পুল পেরিয়ে কিছুটা ওপরে উঠতে জ্যোৎস্না ঘন হ'য়ে উঠল, বন্ধু চিঠি খুলে আবছা আবছা পড়ে নিলে। মেয়েলি ছাঁদে গোটা গোটা লেখা—

“জীবনে চলার পথে মাল্লষ-খুঁজে বেড়ায় সম্পদ। কত লোকের সাথেই ত আমাদের পরিচয় হয়; কিন্তু সবাইকে কি আমাদের ভাল লাগে? আপনি সেই ভাললাগাদের একজন, তাই চাই আপনার লেখা। লিখবেন ত?

আর দুদিন বাদেই ত চলে যাবেন, হয়ত আপনি এতে খুসী, ভাল জায়গায় যাচ্ছেন, কত নতুন বন্ধু সাথী পাবেন।...

আপনার গান বাজনা সত্যিই আমার ভাল লাগত। গায়কের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য ত হয়নি কখনও; এখানে এসে যদিও বা হ'ল, তা' হ'লেও হুঁজোড়া চক্ষুর

পাহারা,—কি জানি এঁরা কি ভাববেন!...বিদেশে আবার যখন এসরাজ নিয়ে বসবেন, তখন আমার কথা একটু মনে করবেন।

আপনি ছিলেন—ভেবেচিন্তে, কথাবার্তায় তবু সন্ধ্যাটা কাটত। এখন কি করব বলুন ত?

বলার সময় হবে না, বলে লিখলাম। অনেক কিছু বকলাম, কিছু মনে করবেন না ত?.....”

এও কি সম্ভব? বন্ধুর আটাশ বছর বয়সে এক অনির্বচনীয় অল্পভূতি! তার মনে পড়ল, তিনমাস আগে রমাকে দেখেছে সে হরিশবাবুর বাড়ীতে, তাঁর জ্বর অস্ত্রের সময়। জ্বর বেশি অস্থির হয়ে পড়ায় ভাঙ্গীকে আনায়ে হরিশবাবু। রমার কি অক্লান্ত পরিচর্যা!... এক একদিন রাতে টাল যেত, রমা সারারাত মামীর শিয়রে জেগে কাটাত। বন্ধু রাতে উঠে ইঞ্জেকশন দিত, রমা মাথা ধুইয়ে দিত রোগিনীর, সারারাত অবিশ্রাম পাখা টানত। দিনেতেও কি তার বিশ্রাম ছিল—সংসার দেখবার আর ত কেউ ছিল না।...তারপর সকাল বিকাল অল্প অল্প বেড়াতেও রমা ছিল মামীর নিত্য সঙ্গী। বন্ধুও প্রায়ই এসে জুটত।...এই পুল পর্যন্ত গুড়ি পথ চড়াই করে কতবার তারা এসেছে, এমনি কত গুল্লা সন্ধ্যায়। একদিন তার সখ হয়েছিল, পাহাড়ে নদীতে খরসোলা মাছ ধরবে। সারা দুপুর ছিপ ফেলে কাটিয়ে দিয়েছে, মাছ খায়নি; শুনে রমার সে কি হাসি। এই ত এখানেই পুলের ওপারে খোঁড়া ভিখারীটাকে পয়সা দিতে গিয়ে সেটা কোথায় যে ধুলার ভেতর মিশিয়ে গেল, আর পাওয়া গেল না। রমা বললে, “আহা, ওকে আর একটা পয়সা দিন।”

মাথাটা বন্ধুর খুলিয়ে গেল। লাগাম শক্ত করে ধরে, রেকাবে বেশ করে ভর দিয়ে চেপে বসে রইল।...

বিদায় সম্ভাষণ, রমার সাথে দেখা হওয়া, পত্র পড়ার মাঝে উছলে ওঠা মন কেমন যেন দমে গেল। একটা অস্থিতি বোধ হ’তে লাগল। তার কেমন লজ্জা হল, চারপাশ বেশ করে দেখে নিলে। কেউ কোথাও নেই।...

তারপর বন্ধুর কিছু মনে রইল না। কেবল চোখে ভাসতে লাগল, কলটানা একসারসাইজ খাতা থেকে ছেঁড়া

কাগজে আঁকা কথাগুলি, রমার ঝোপের পাশ হতে উঠে আসা, তার পাশে পথ চলা, আবার ঝোপের আঁধার পথে মিশিয়ে যাওয়া। বন্ধুর নাকে ভেসে এল, তার কবরীর মুখ-গন্ধ। কানে বাজতে লাগল আঁচলের খস-খসানি। নীচের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, উপত্যকা হতে সাদা চাদরের মত কুয়াশা উঠে ধীরে ধীরে সব ঢেকে ফেলেছে। উপরের গিরিশৃঙ্গ, সরল গাছ, মিটমিটে তারা সব গ্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। কেমন যেন ব্যথা অল্পভব করলে বন্ধু। রমার নেমে যাওয়ার সাথে সাথে যেন তার জীবনে হঠাৎ আসা স্বর্ণ মুহূর্ত গড়িয়ে গেল। আর কি তা ফিরে আসবে?

কখন সহরের পাকা রাস্তা এসে পড়েছে, জানতেও পারেনি। তার মনে এক অদ্ভুত নিষ্ফলতার অল্পভূতি তখনও জেগে রয়েছে; আজ আটাশ বছর ধরে তার জীবনের কি আশ্বাস সে পেল! কটির জন্তে ছেঁড়া-কড়া, নির্বাসন কুমার-জীবন!...ঘোড়া আপন মনে চলেছে সহরের সোজা পথ ধরে। জ্যোৎস্না আরও ফুটে উঠেছে, পথের বিজলী আলোয় তা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বন্ধু মনে আছে চিন্তা-মুগ্ধ। চিঠিটা দিয়ে রমা একটু দাঁড়ালে না কেন?...তার সমস্ত অন্তরাঙ্গা চাইলে রমাকে ফিরিয়ে আনতে।...

আরও ঘণ্টা খানেক পরে বন্ধুর বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়ল বন্ধু। রাতের সহর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক। ক্লান্ত মনে এগিয়ে এসে যখন সে দরজার কড়া নাড়লে, তখন গির্জার ঘড়িতে দশটা বাজছে।

রমা নেমে গেল উঠি-পড়ি করে। উত্তেজনার আতিশয্যে তার দম-বন্ধ হয়ে আসছিল।.....

একদিন, দু’দিন করে সাতদিন কেটে গেল।...

ডাক ওয়ালা এসে হাঁকত, “চিঠি!” খাসরুদ্ধ হ’য়ে আসত রমার, বুক দুড় দুড় করত। ক্রান্ত এগিয়ে আসত। কই তার নামে চিঠি নয় ত!...

আচ্ছা আমাকে না দিলেও মামাকেও ত দিতে পারেন। মামা অফিস থেকে এলে রমা কাছে এসে দাঁড়ায়।.....

ভাক্তারবাবুর কোন চিঠি আসেনি।.....

চৈতন্যদেবের কাশী-প্রবাস-স্থান

শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ

শিবপুরী কাশী হিন্দুদের যেমন একটি বহুপ্রাচীন তীর্থ তেমনই এই স্থান বহু মণীষির লীলার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া পুণ্যময়। কাশীর মহিমা অপার, পৃথিবীতে কাশীর মত এত প্রাচীন কোনও সহর সেই দেশের সাধনার ধারা অব্যাহত রাখিতে পারে নাই। শুধুই তাহা নহে, যুগে যুগে নানা চিন্তা ও জ্ঞানের উৎস এই বারাণসীধাম। সেই নিমিত্ত ভারতের সকল মতের সাধু-সন্ন্যাসীগণ তাঁহাদের সাধনার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কাশীধামে করিতে সক্ষম না হইলে জীবন ধন্য মনে করেন না।

বাঙ্গালার গৌরব, প্রেমধর্মের প্রধান সাধক চৈতন্য-মহাপ্রভু কাশীধামে আগমন করিয়া, সেই পরম বৈদান্তিক ও দার্শনিকদের পীঠস্থানে প্রেমের স্রোত বহাইয়া দিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন প্রকট করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন—সেই সময়ে প্রয়াগ হইয়া (১৫১৫ খৃঃ) কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার বহু প্রমাণ বহু প্রামাণিক গ্রন্থে প্রকাশিত আছে। চৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভুর কাশী-আগমনের বর্ণনা-কালে বলিয়াছেন—

মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিয়া গ্রামের বাহির আসি ॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজ গৃহে লঞা গেলা ॥
তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্ট গোষ্ঠি করি প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা ॥
ভিক্ষা করায়ে মিশ্র কহে পায়ে ধরি।
এক ভিক্ষা মাগি সেবার মেহ রূপা করি ॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিব ক্রটি ॥

আধুনিক বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, শ্রামকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন সবই চৈতন্যদেবের নির্দেশ ও উপদেশমতই প্রকটিত বা

স্থাপিত হইয়াছে। বৃন্দাবন যেমন বাঙ্গালীর এক প্রধান অবদান আধুনিক কাশীতেও বাঙ্গালীর প্রভাব ও দান প্রচুর। তাহাও মহাপ্রভুর রূপায়। তাঁহার কাশী-আগমনের পর হইতে কাশীর বাঙ্গালীটোলা একরকম বাঙ্গালীর সৃষ্টি। সেখানে প্রায় চল্লিশ হাজার বাঙ্গালী নর-নারী বসবাস করিয়া বাঙ্গালীর সাধনার ও সংস্কৃতির আলোক প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে। এক প্রচলিত কাহিনী প্রকাশ করে রাণী ভবানী পুণ্যতীর্থ কাশীতে বাঙ্গালী দশকর্ম্মীপুঞ্জক ব্রাহ্মণ না পাইয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবার মানস করিলেন। এক বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিদিন এক একটা ব্রাহ্মণকে বাঙ্গালা হইতে আনয়ন করিয়া কাশীতে বাস করান এবং ৩৬৫ জন ব্রাহ্মণকে ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ খানি দান করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। এমন দানের পরিকল্পনা ও রীতি বিশ্বে বিরল।

আধুনিক কাশীর মন্দির ও সৌধাবলি সবই বিগত প্রায় ৫০০ বৎসরের মধ্যে নিম্নিত। তৎপূর্ব্বের বাবতীয় মন্দির মুসলমান বাদশাগণের খেয়ালে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ (যেমন বিদ্যেশ্বরের পুরাতন মন্দির, বেণীমাধবের ধ্বংস) হিন্দু-মুসলমান-বিদ্বৎমানলে আহুতি দিবার জন্ত অর্ধনষ্ট রহিয়াছে। সেই রকমে মহাপ্রভুর প্রবাসের স্থানের চিহ্নও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বদ্যাপি কাশীতে ত্রিশ চল্লিশ হাজার বাঙ্গালী বাস করেন, প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নর-নারী কাশী ভ্রমণ করিয়া পুণ্য ও পণ্য সঞ্চয় করিয়া বান, তথাপি কোনও বাঙ্গালী বাঙ্গালার পরম গৌরব প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের কাশী-প্রবাসের লীলার স্থানটির সন্ধান করেন না ও রাখেন না।

মহাপ্রভু যে কয়দিন কাশীবাগ করিয়াছিলেন সে কয়দিন চন্দ্রশেখরের বাটীতে অবস্থান করিতেন এবং তপন মিশ্রের বাটীতে ভোজন করিতেন—এ 'কথা 'চৈতন্যচরিতামৃত' হইতেই পাওয়া যায়। সনাতন গোস্থামী বৃন্দাবন-প্রকটের

সমস্ত নির্দেশ এই কাশীধামে মহাপ্রভুর কাশী-প্রবাসকালে তাঁহারই নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের ভিত্তি সংলগ্ন এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া সনাতন গোস্থানীকে উপদেশামৃত বিতরণ করিতেন—সেই বটতলাটি কাশীর “জতনবট” মহা বলিয়া কাশীবাসীর নিকট পরিচিত ছিল। এই বটতলার পরিচয় গোড়ীয় ও বল্লভাচার্য্য কয়েকটি পুথিতে বিশেষজ্ঞরা পাইয়াছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে। কাশীবাসী গোড়ীয় বৈষ্ণব, চৈতন্যদেবের একনিষ্ঠ সেবক, শ্রীগোপালদাস আগরওয়াল প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া বেনারস মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ডের সভ্যগণকে এই ‘জতনবট’তলা যে পুরাকালের “চৈতন্যবট”—এরই হইল অপভ্রংশ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এই বটতলাটি এখন বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি। সেই স্থানে বহুদিন হইতে দুধ-দধির একটি ‘সত্তি’ (বাজার) নিত্য বসিয়া থাকে।

(দ্রষ্টব্য—‘চৈতন্য বট—কাশী’ প্রবন্ধ ; ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ সাল)

এই বটতলার উক্ত গোপালদাস বাবাজী বেনারস পোর-সভার নিকট হইতে গোরাক্ষ মহাপ্রভুর কাশী-প্রবাসের



স্বতি-মন্দির নির্মাণের জন্য অহুমতি পাইয়াছেন। সেই স্থানে তিন ফোকরযুক্ত উঁচু পোস্তার উপর প্রস্তরের একটি মণ্ডপ তাঁহারই চেষ্টায় নির্মিত হইয়াছে।

চৈতন্য-মঠ—মহাপ্রভুর কাশী-প্রবাসের স্থান

এই মণ্ডপটির তিন দিক উন্মুক্ত—একদিকের দেয়ালে (চন্দ্রশেখরের বাটীর গাত্র-সংলগ্ন) মহাপ্রভুর প্রমাণ আকারের

ষড়ভুজ গোরাক্ষ-মূর্তি সিমেন্ট জমাইয়া নির্মিত হইয়াছে। আর এই দেয়ালের দক্ষিণদিকের কুলঙ্গিতে—মহা প্রভু সনাতন, তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর, বলভদ্র ভট্ট-মিশ্র তনয় রঘুনাতনের সহিত আলোচনা করিতেছেন—তাঁহারই চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। চৈতন্যদেব দার্শনিক পণ্ডিত ও সম্যাসীগণের সহিত তর্কযুদ্ধে জয়ী হইয়া গেমখর্কের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহারই নিদর্শন শিষ্য প্রকাশানন্দের মহাপ্রভুর আনুগত্য স্বীকার। তাঁহারও একটি ছবি বাম ধারের কুলঙ্গিতে অঙ্কিত রহিয়াছে।

হিন্দুস্থানী মহাশয় বাঙ্গালীর কাঙ্গাল ঠাকুরের মূর্তি ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত মহাপ্রভুর নাম মন্ত্র—

হরে রাম হরে রাম

রাম রাম হরে হরে—

দেখিয়া চিত্ত পুলকে ও গর্জে ভরিয়া উঠিল—নিজেকে বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া ধন্ত মনে করিলাম।

যে রাস্তাটি কাশীর ডাল-চালের প্রধান বাজার বিবেশ্বর-গঞ্জের বড় রাস্তা হইতে বাহির হইয়া চৈতন্য-বটতলা বেটন করিয়া গিয়াছে কাশীর মিউনিসিপ্যাল বোর্ড তাঁহার নাম ‘চৈতন্য-রোড’ রাখিয়াছেন। বড় বড় অক্ষরে লিখিত রাস্তার পরিচয়-ফলকে ‘চৈতন্য-রোড’ লিখিয়া—প্রাচীর গায়ে বিলম্বিত করিয়াও দিয়াছেন। ইহা দেখিলেই আনন্দ হয়—আমাদের পরম প্রিয় চৈতন্যের স্মৃতি অ-বাঙ্গালীরা এমনই সাদরে করেন।

তনিতৈছি, গোপালদাস বাবাজী চন্দ্রশেখরের ভিত্তিটি খরিদ করিয়া সেই স্থানে চৈতন্য-মঠ, চৈতন্য-গ্রন্থশালা, চৈতন্য-টোল স্থাপিত করিয়া মহাপ্রভুর বাণী ও উপদেশ প্রচার করিবার মনস্থ করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের বাটীও রাজসরকার পুণ্য-স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে খরিদ করিবার হুকুম দিয়াছেন। কেবল কয়েক সহস্র মুদ্রার জন্য বাঙ্গালার সাধনা ও সংস্কৃতির প্রকাশের কেন্দ্রটি স্থাপনা হইতে পারিতেছে না। ইহা যেমন লজ্জার কথা, তেমনই ক্ষোভের বিষয়। কোন পুণ্যবতী যদি এই অভাব মোচন করিয়া ধন্ত হন তাহা হইলে বাঙ্গালার গোরাক্ষ কাশীধামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী নর-নারী বিবেশ্বর দর্শন করিয়া প্রেমাবতারের লীলাস্থানটীও দর্শন করিয়া ধন্ত হইবেন।

সবুজ পথ

শ্রীশৈলজ মুখোপাধ্যায়

গাঁয়ের এক প্রভাত। এক ফালি রোদুর মাটির দেয়াল বেয়ে কুটিরের প্রাঙ্গণে টানানো মাছ-ধরার ভিজা জাল-গুলোর উপর পড়ে এক অপূর্ণ রূপালী ছক কাটছিলো। আবছা-ধূসর ছায়া সন্ধ্যা বঁকা পথটির উপর দিয়ে লম্বা চলে গেছে সেই বুড়ো-তৈতুলগাছটার গোড়া অধি। তৈতুল-তলায় গাঁয়ের গরুর গাড়ীর চাকা তৈরী হ'তো; কিন্তু ছুতো-বুড়ো ম'রে গেছে; তার একটি অসমাপ্ত চাকা এখনও তৈতুল-গাছের গোড়ায় দাঁড় করানো রয়েছে। কত আশা নিয়ে বুড়ো তার বয়সের অভিজ্ঞতার পূর্ণ শক্তি ওই চাকায় জুগিয়েছিলো। তার বাঁচা হ'লো না,—মরে গেছে, যেন তার বেঁচে থাকবার অধিকার নেই; তাই, এখনও সেই অসমাপ্ত ফ্রিঙ্ক চাকা কত জল-ঝড় ও কালের মারণ কাটিয়ে গাঁয়ের ছুতো-বুড়োর আত্মকথা জাগিয়ে রেখেছে। যেমন ওখানে চাকা তৈরী হ'তো তেমনি আবার তার পাশেই লোহার হালও বানাতো কামার-দাদা। হাল আর হয় না। অভাব সবেই দিক থেকে—শক্তি নেই—একদিন সে গরম লোহা পিটিয়ে হাল তৈরী করতো—সে আজ ধুকছে—মাংসপেশী তার লোল হ'য়ে গেছে—শুকিয়ে গেছে—গাল ঢোক ঢুক গেছে—একেবারে শীর্ণকায়। গাঁয়ে খাবার নেই—তাদের বাঁচতে দেবে না—তাদের কোনও দাবী পৃথিবীতে মঞ্জুর হবে না। তৈতুল-তলায় এখনও পুরোনো হাঁকরের গর্তটিতে কয়েকখানা কয়লা মাটির বুক কামড়ে পড়ে রয়েছে। যেন ওই মাটিতে ওদের অধিকার, তাই এখনও মায়া কাটিয়ে ছাড়তে পারেনি। আর লোহার হাল তৈরী হয় না, কিন্তু কামার-দাদাকে বেঁচে থাকতে হবে—তাই সে তৈতুল-তলায় পুরোনো জায়গাটিতে ব'সে টিকলি কাটে—জাল বুনে, আর গাঁয়ের ছেলেগুলো আশেপাশে খেলা করে। এমনি তাদের চেহারা। দূরে প্রান্তর, শূন্যময়—চারদিক রূপণতায় ভরা; নদী শুকিয়ে গেছে—

বাতাস শুকনো—আকাশ দপ্ দপ্ ক'রে জলছে; গাঁয়ের কোথাও একটুও শ্রী নেই, উৎসাহ নেই, বরং অশাস্ত্য, দারিদ্র্য, মহামারি, ক্ষুধাভুক্ষণ সে ভীষণকার। এই শূন্যতায় মাঝে তারা দাঁড়িয়ে একটি জীবন প্রার্থনা করে। মানুষের নিঃশ্বাসে লেখা হয় এই সবুজ পথের ইতিহাস—তবুও এরা প্রার্থনা করে—বেঁচে থাকে—আকাশ থেকে জল পড়ে; মৃত্তিকাকে জীবন্ত ক'রে রসবান হ'য়ে ওঠে পাইয়া—বীজ রূপান্তরিত হয় এক নব জীবনের নবীনতা ও নব চেতনা নিয়ে। দেখতে দেখতে শূন্যতা রূপময় হ'য়ে ওঠে এক দাসে। হয়তো সে রিক্ত ও নিঃশ্ব ছিলো সৃষ্টির আদিম অবস্থায়, কিন্তু এই চলমান জীবনটি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গী চলেছে...সৃষ্টির পাশেই সে আছে। জীবনের চেহারা এমনি। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধ'রে জীবনের অবসানের মধ্যে সমগ্র ছন্দের পূর্ণতা রয়েছে। ধীরে ধীরে এমনি একটি জগৎ সৃষ্টি হয়; এত অভাব, এত রিক্ততা ও জীর্ণতার পাশেই থাকে এক জাগ্রত সৃষ্টি—ক্লান্তিহীন জীর্ণতাহীন আপন শান্ত সুন্দর মূর্তি।

গাঁয়ের শেষে নিম্নরূপ প্রান্তরের শূন্যতা রোদ্রে খাঁ খাঁ করছিলো। মাটি ফেটে ধোয়া উঠছে, দূরে মরা নদীর পাড়ে চাতক চোঁচায় 'ফটক জল'। গাঁয়ের একটা মেটে রংয়ের উলঙ্গ ছেলে ছপ্পরে মেঠো মেটে সবুজ পথটিতে বুনা কচু-পাতাগুলো পটপট ক'রে ছিঁড়ে সারা পথটা সবুজ ক'রে দেয়; তারপর ওই ফাঁকা মাঠ পার হয় এক দোড়ে। গরম বাতাস, গরম মাটি অগ্রাহ্য ক'রে কত আল ফাটোল্ ভেঙে, সাপের গর্ভে কাঠি ভ'রে দিতে দিতে যায় মরা নদীর পাড়ে। হাওয়ায় সরগাছগুলো রোদে পোড়া হ'য়ে দোলে—পাড়ের তপ্ত বালির উপর পায়ের দাগ দেগে চলে উলঙ্গ ছেলে সেই নরম ভিজ বালির দিকে; বালির বুক ফেড়ে পা ঢুকিয়ে দেয় শীতল নরম ভিজা বালির ভিতর। পোড়া পা জুড়ায়; তারপর জোরে সে হাঁক দেয়—গাঁ। শালিকের দল উড়ে

পালায় ছপুনের গাট নীল মরা দিগন্তে। দম্কা বাতাস নদীর
পাড়ের বালি খানিকটা উড়িয়ে দেয়। তারপর সব নিসাড়
নিস্কর। এমনভাবে অপরাহ্ন চারদিকে গোলাপী লেপে
দেয় বালির গায়—আর সরগাহের ছায়ায় ক্লান্ত উলঙ্গ
ছেলেটি ঘুমায়ে মাটির কোলে। নদীর পাড়ের অসংখ্য গরুর
ও মানুষের পায়ের ছাপগুলো যেন জীবন্ত হ'য়ে তাকে
আগ্লাম। ঘুমন্ত বালক পরে শুনে পায় দূরে মায়ের ডাক।
খড়মড়িয়ে উঠে দেখে তার কোমরের ঘুন্টি হারিয়ে গেছে—
পুরাণো আধুলা বাঁধা ঘুন্টির জন্ত তার মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।
চারদিক খোঁজে, কোথাও পায় না—মা আবার ডাকে জোরে
—‘কেলো—কেলো’। মাঠের বিপ্লবী কেলো ফিরে যায় মার
কোলে আবার সেই মেটে সবুজ পথ দিয়ে। মা ব'লে—‘হেঁরে
তু কুখাক্ গে গেইছিলি’; কেলো উত্তর দেয়—‘হেঁ হোথা, মাঠ
পিরিয়ে লদির চর পানে’—মা দেখে তার কোমরের মানত করা
ঘুন্টি হারিয়েছে, বুকটি ধড়াস করে উঠলো—ছেলেকে বুক

জড়িয়ে ধরে; কেলো কেঁদে বলে—‘মা, ঘুন্টিটো কুখাক্ হারায়
ফেলছি’। অমঙ্গলের কথা ভেবে মার বুক কেঁপে ওঠে। মা
কেলোকে সঙ্গে নিয়ে চলে শীতলাতলার দিকে বুকভরা
কল্যাণ-কামনা নিয়ে। গাঁয়ের বটতলায় শীতলা-মার কাছে
ভয়ে থমকে দাঁড়ায়; মা কেলোর মাথা ধ'রে হুইয়ে দিয়ে বলে
‘মাকে গড় কর’। কেলো পাথরে মাথা ঠেকায়। লাল সিন্দূরে
শীতলা-হুড়ি আরও ঘেন লাল হ'য়ে উঠলো দিগন্তের অন্ত-
রবির রক্তিম আভাষ—সেখানকার সবুজ, নীল কালো সব
লাল হ'য়ে গেলো। কেলোর মা প্রণাম ক'রে কল্যাণ
প্রার্থনা করে; মরা বাতাস আশ্রায় বিশ্বাসে লাল হ'য়ে গেলো,
লাল হ'য়ে ওঠে তার দাবী—কালো মাছের মেটে সবুজ পথে
ফেরে উল্লাস নিয়ে; পরিচিত প্রাণী মাটির সবুজ পথে
শ্রেণীহীন; কিসে তার অধিকার আছে বা নেই তারা জানে
না—জানতেও চায় না; তারা চায় শুধু বাঁচতে—আর
হাসতে—কাদতে—ভালবাসতে—একটুখানি জীবনের মাঝে
সেই মাটিতে—জীবন-মাটিতে।

কবিগুরুর প্রতি

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দেখার অতীত দেশে কল্পনার রহস্যের তীরে,
এ মর্ত্যের উর্দ্ধলোকে দিন বেধা রাত্রি সনে মেশে,
অনন্তের পারাবারে, সেথা হ'তে চাহিবে কি ফিরে।
আজ তুমি ফিরিবে কি এই পথে বাউলের বেশে।
কিশলয়-সহচর। আলো করি' পুষ্পবনতল
গেয়ে গেছ কত গান মঞ্জুরিয়া তরু-স্নেহলতা।
অশ্রুর বরষা নামে, পথহারা চলে যাত্রিদল,
অরণ্যের কিশলয় যৌন জ্ঞান, কহে নাকো কথা।
মল্লারের মঞ্জুসুরে কে বাজাবে জীবন-বীণারে।
বিছাভের করাঘাতে দেয় দেখা রাত্রি-বিভীষিকা।

ধূজটির ওড়ে জটা মেঘাচ্ছন্ন গগন-কিনারে,
তিমির-সন্ধ্যার পথে দীপশিখা জালিছে বালিকা,
নিবে যায় বারে বারে; কুটির তাহার বনমাবে
দিতে দেখা অগোচরে, তোমারি আসন শূন্য রহে
কবির। কার গলে দিবে মালা এই ঘন সঁঝে।
প্রতীক্ষায় রহে বালা স্মৃতি তব বহে গন্ধবহে।
কেমনে বিরহ সহি। কবির। কাজরী-উৎসবে
মেঘোৎসবে বাজাইতে বীণাখানি বর্ষে বর্ষে তুমি,
বর্ষা-নটী নাচিত যে তোমারে ঘেরিয়া; কেকারবে
আনন্দ কল্লোলে নৃত্যে মুখরিত হোতো বনভূমি।
সভ্যতা-সঙ্কট-রাত্রি নিয়ে আসে দেশে অশ্রুধারা,
এ দুর্যোগ-তমসায় দেখাবে কি তব আধিতার।

ফলদীপিকা

শ্রীগণপতি সরকার

পঞ্চম অধ্যায়

লগ্ন এবং চন্দ্র বলবান হইলে অর্থপ্রাপ্তি হয়। রবি লগ্ন ও চন্দ্র ইহাদের মধ্যে যে বলবান, তাহার দশমস্থ গ্রহগণ দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। ঐ দশমস্থ গ্রহ পিতা, মাতা, শত্রু, স্ত্রী, ভ্রাতা, স্ত্রী বা ভৃত্য যাহার কারক হইবে, সেই কারকজাত উপায় হইতে অর্থাগম হয়। দশমপতির নবাংশরাশি-পতির বৃত্তি-অনুসারে জাতকের বৃত্তি হয়। ইহাই পণ্ডিতদিগের মত ॥ ১ ॥

দশমপতির নবাংশপতি রবি হইলে—(রবি নবাংশের বৃত্তি)—ফল, বৃক্ষ, মন্ত্রবল (পাঠান্তর—মন্ত্রজপ), শঠতা, জুয়াখেলা, মিথ্যা, কঞ্চল, ঔষধাদি ধাতু ক্রয় বিক্রয়, (পাঠান্তর—“ধাতুক্রিয়া” ধাতু জব্যের রূপান্তর করা) ও রাজকাৰ্য্যই জাতকের জীবিকাজ্ঞানের পন্থা হইবে ॥ ২ ॥

চন্দ্র নবাংশের বৃত্তি—জলোদ্ভব বস্তুর ক্রয় বিক্রয়, কৃষিকাৰ্য্য, গো বা মহিষী সম্বৃত্ত ব্যবসা, তীর্থভ্রমণ দ্বারা, জীলোকের আশ্রয়ে, বা বস্ত্র ব্যবসায় ; এই সকল জীবিকার কারণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অমঙ্গল নবাংশের বৃত্তি—ধাতু, বৃক্ষ, প্রহার, রক্তনবৃত্তি, জমি হইতে, স্তবর্ণ-ব্যবসায়, পরপীড়ন, অন্ত্র-ব্যবসায়, সাহস (অর্থাৎ অন্ত্রায় কার্য্য) দ্বারা, ম্লেচ্ছ-সহায়তায়, সূচক (কোটনা), চোরবৃত্তি, এই সকল মধ্যে জীবিকার উপায় হয়। ৪ ॥

বুধ নবাংশের বৃত্তি—কাব্য, আগম, লেখক, লিপিকাৰ্য্য, জ্যোতিষগণ, (দল), জ্ঞান, পরার্থ (পরদান দ্বারা) ব্যবসায়, বেদপাঠ, জপ, পৌরোহিত্য ও ছলনা ; এই সকল জীবিকার কারণ হয় ॥ ৫ ॥

বৃহস্পতির নবাংশের বৃত্তি—ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ; দেবতার আশ্রয়ে ; রাজার বা ভূমিপতির অনুগ্রহভাজন ; পুরাণ-শাস্ত্র-আগম এবং নীতিমার্গ ; ধর্মোপদেশ ও কুসৌদ (হৃদ)-জীবি। এই সকল মধ্যে জীবিকা হয় ॥ ৬ ॥

শুক্রের নবাংশের বৃত্তি—স্ত্রীলোকের সংশ্রবে ; গো-মহিষ-গজ ও অশ্বসম্বৃত্ত ব্যবসায় ; গীত-বাদ্য-নৃত্য দ্বারা ; রজত, গন্ধ, ক্ষীর, অলঙ্কার, রেশম ও বস্ত্রব্যবসায় ; অমাত্যগুণ ও কবিত্ব। এই সকল জীবিকার পথ ॥ ৭ ॥

শনির নবাংশের বৃত্তি—মূল, ফল, পরিশ্রম, দাসত্ব, খলতা, নীচবক্তির অর্থ দ্বারা, কুখ্যাত্ত ব্যবসায়, ভারবহন, কুৎসিত পথের বৃত্তি, শিল্পাদি, কাষ্ঠনির্মিত বস্তু, ঘাতক ; এইগুলি মধ্যে উপার্জনের পথ ॥ ৮ ॥

(পূর্বোক্ত) নবাংশপতি বলবান হইলে, (পূর্বোক্ত কারক হইতে) বিনা যত্নেই অর্থলাভ হয়। আর নবাংশপতি দুর্বল হইলে উক্ত ফলের স্বল্পতা হয়। লগ্নের দশমরাশিই কর্মভূমি। দশমপতির নবাংশরাশির দিক্ই কর্মভূমির দেশেতে দিক্ স্থির করিতে হইবে। (মাত্রাসের সূত্রানুযায়ী শাস্ত্রের মতে=লগ্নের দশমরাশি অথবা দশম পতির নবাংশ রাশিই কর্মভূমি হইবে)। ঐ দশমভাব এবং নবাংশরাশি স্বীয় পতিযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে স্বদেশেই কর্মস্থান। উক্ত স্থান অগ্ন গ্রহগণ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে পরদেশে কর্মস্থান। দশমপতির নবাংশ স্থিররাশি হইলে স্বদেশেই কর্মস্থান হয় ॥ ৯ ॥

ইতি বিদ্যারত্ন-জ্যোতিষ-জাতকপ্রভাকরোপাধিক শ্রীগণপতি সরকার কর্তৃক অনূদিত মন্ত্রেখর-বিরচিত ফলদীপিকা গ্রন্থের কর্মজীব নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

মঙ্গল স্বক্ষেত্রগত বা উচ্চস্থ হইয়া কেদ্রগত হইলে “রুচক” নামক যোগ হয়। ঐরূপ বুধ হইলে “ভদ্রক”, বৃহস্পতি হইলে “হংসক,” শুক্র হইলে “মালব,” এবং শনি হইলে “শশক” নামক যোগ হয় ॥ ১০ ॥

রুচকযোগের ফল—দীর্ঘমুখ, বহুসাইন দ্বারা সম্পত্তিলাভ, বীর, শত্রুহন্তা, বলবান, অতিগর্বিত, বিখ্যাত গুণী, জয়শীল সেনাপতি ; এই সকল গুণ রুচকযোগে জন্মের ফল ।

ভদ্রকের ফল—আয়ুর্হান, কুশাগ্র-বুদ্ধি, অমল, বিদ্বান্ কর্তৃক পূজিত, ভূপতি, অতিধনী, অস্থান কোলাহল (সভায় কোলাহলকারী অথবা জনাকীর্ণ সভার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, বা যাহার গৃহপ্রাঙ্গণে প্রার্থাদিগের কোলাহল হয়) ॥২॥

হংসকযোগের ফল—সদব্যক্তিদিগের দ্বারা সম্মানিত ; ক্ষিতিপতি ; হস্ত ও পদতলে শঙ্খ, পদ্ম, মৎস্য ও অঙ্কুরের চিহ্নযুক্ত ; সুন্দরদেহ ; মিষ্টান্নভোজী ও ধার্মিক ।

মালবযোগের ফল—পুষ্পাঙ্ক, ধৈর্যশালী, ধনী, স্ত্রীপুত্রযুক্ত ভাগ্যবান্, বুদ্ধিশীল, সুখভোগী, সুবাহন, সুশযুক্ত, বিদ্বান্ ও প্রসম্মেলিত (ইন্দ্রিয়গুলি উত্তম কর্মক্ষম) ॥৩॥

শশকযোগের ফল—সর্বজননের দ্বারা প্রশংসিত, উত্তম ভৃত্যযুক্ত, বলবান্, গ্রামাধিপ বা রাজা, দুর্বৃত্ত, পরবনিতা ও পরধনযুক্ত, সুখী ।

এই পাঁচটি যোগ লগ্ন বা চন্দ্র হইতে বিচার্য । ইহার পাঁচটিই একত্র হইলে সাম্রাজ্য-সিদ্ধি দান করে ; একটি পাইলে ভাগ্যবান্, দুইটি পাইলে নৃপতুলা, তিনটি হইলে রাজা, চারটি হইলে নৃপেন্দ্র এবং পাঁচটি হইলে শ্রেষ্ঠ নৃপেন্দ্র (প্রধান সম্রাট) হয় ॥৪॥

চন্দ্র হইতে দ্বিতীয়ে, দ্বাদশে বা চন্দ্রের উভয় পার্শ্বে রবি ভিন্ন গ্রহ থাকিলে যথাক্রমে “সুনকা”, “অনকা” ও “ধূন্ধুরা” এই তিনটি যোগ হয় । আর চন্দ্রের দ্বিতীয়ে বা দ্বাদশে গ্রহ না থাকিলে “কেমক্রম” যোগ হয় ।

চন্দ্র গ্রহযুক্ত হইলে অথবা লগ্নের কেন্দ্রগুলিতে গ্রহ থাকিলে কিংবা চন্দ্রের কেন্দ্রেও গ্রহ থাকিলে কেমক্রম যোগ হয় না, এইরূপ কথিত আছে ॥৫॥

সুনকাযোগের ফল—স্বোপার্জিত ধন ; রাজা বা রাজতুলা ; বুদ্ধি, ধন ও খ্যাতিযুক্ত ।

অনকাযোগের ফল—প্রভু, ব্যাধিহীন শরীর, শীলবান্, বিখ্যাত-কীৰ্ত্তি, বিষয় সুখী, সুবেশযুক্ত, এবং সমৃদ্ধ ॥৬॥

ধূন্ধুরাযোগের ফল—উৎপন্ন-ভোগ ও সুখভোগী, ধন ও বাহনযুক্ত, ত্যাগযুক্ত ও ভৃত্যযুক্ত ।

কেমক্রমাযোগের ফল—এই যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজবংশজাত হইলেও মলিন, দুঃখী, নীচ, নিঃস্ব, চাকর ও খল হয় ॥ ৭ ॥

রবির দ্বিতীয়ে বা দ্বাদশে বা উভয়স্থলে চন্দ্র ব্যতীত শুভগ্রহ থাকিলে যথাক্রমে “শুভবেসি”, “শুভবাসি” ও “শুভভোভয়চরী” নামক তিনটি যোগ হয় । আর উক্ত স্থানে (শুভস্থলে) পাপগ্রহ থাকিলে, ‘পাপবেসি’, ‘পাপবাসি’ ও ‘পাপোভয়চরী’ যথাক্রমে এই তিনটি যোগ হয় ।

লগ্নের উভয় পার্শ্বে (বা দ্বিতীয় দ্বাদশে) শুভগ্রহ থাকিলে “শুভকর্ত্তরী” যোগ হয় । আরলগ্নের উভয় পার্শ্বে পাপগ্রহ থাকিলে ‘পাপকর্ত্তরী’ যোগ হয় ।

লগ্নের দ্বিতীয়ে পাপগ্রহগণ কর্তৃক দুষ্ট না হইয়া শুভগ্রহগণ থাকিলে “সুশুভ” যোগ হয় ॥৮॥

(মাজাজ সংস্করণের নিম্নলিখিত ৪টি শ্লোক অতিরিক্ত আছে । সেগুলি এ পুস্তকের অঙ্কের সহিত ক, খ, গ, ঘ, দ্বারা চিহ্নিত করা হইল ।)

শুভবেশিযোগফল—সুন্দর, সুখী, গুণবান্, ধীর, নৃপ ও ধার্মিক ।

শুভবাসিযোগের ফল—বিখ্যাত, সকলের প্রিয়, অতিসুন্দর ও রাজপ্রিয় ।

শুভোভয়চরীযোগফল—সুন্দর-দেহ, প্রিয়ভাবী, প্রপঞ্চ রসিক, বাগ্মী, যশস্বী ও ধনী ॥ ৮ (ক) ॥ (৯) ॥

অশুভবেসিযোগফল—অত্যাশ্রয়ে লোকের নিন্দাকারী, অমুন্দর মূর্তি, হীনপ্রিয় (নীচজন সঙ্গী) ও দুর্জন।

অশুভবাসিযোগফল—মায়াবী, পরনিন্দাকারী, খলব্যক্তির সঙ্গকারী, দুর্ভৃত্ত-শাস্ত্রাধিক (অর্থাৎ দুর্ভৃত্ত ও শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানী, অথবা শাস্ত্র-জ্ঞানের দ্বারা হ্রনীতি পোষণ করে)।

অশুভ উভয়চরীযোগফল—লোকের নিকট অপকীর্তি প্রকাশ পাওয়ায় দুঃখিত, বিদ্যাহীন, অর্থহীন ও ভাগ্যহীন ॥ ৮ (খ) ॥ ১০ ॥

শুভকর্তরীযোগফল—দীর্ঘজীবী, ভয় রোগ ও রিপু শূন্য, সুখী ও ধনী।

পাপকর্তরীযোগফল—নিঃস্ব, অশুচি, অসুখী, স্ত্রী, পুত্র ও অর্থ-হীন এবং অন্নায়ুঃ ॥ ৮ (গ) ॥ (১১) ॥

সুশুভ বা অমলযোগফল—সদাচারী, ধর্মে মতি, প্রসন্ন, সৌভাগ্যবান, রাজসম্মানপ্রাপ্ত, যুত্বভাব, হাসিমুখে কথা এবং ধনী ॥ ৮ (ঘ) ॥ (১২) ॥

সুশুভযোগ, শুভকর্তরীযোগ, শুভবেসি, শুভবাসি ও শুভউভয়চরী যোগগুলির ফল, সুখফল, অনফল ও দুঃখফল যোগের ফলের দ্বারা ফল জানিতে হইবে। অবশ্য শুভগ্রহ দ্বারা যে সুশুভাদি যোগ হইবে তাহারই ফল ঐরূপ হইবে। কিন্তু অশুভগ্রহ দ্বারা যে পাপবেশি প্রভৃতি যোগ হইবে তাহার ফল ইহার বিপরীতরূপ হইবে ॥ ৯ ॥ (১৩) ॥

মহাভাগ্যযোগ—দিবসে পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাহার জন্ম লগ্ন, চন্দ্র এবং রবি ওজরাশিতে থাকিবে। এবং রাত্রিতে নারী জন্মগ্রহণ করিলে তাহার লগ্ন, চন্দ্র ও রবি সমরাসিতে থাকিবে।

কেশরীযোগ—চন্দ্র, এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রে থাকিবে।

শকটযোগ—বৃহস্পতি হইতে দ্বাদশে, অষ্টমে বা ষষ্ঠে চন্দ্র থাকিবে কিন্তু উক্ত চন্দ্র লগ্নে বা কেন্দ্রে থাকিবে না।

অধমযোগ—রবির কেন্দ্রে চন্দ্র।

সমযোগ—রবির পঞ্চমে চন্দ্র।

বরিত্তযোগ—রবির আপোক্রমে চন্দ্র ॥ ১০ ॥ (১৪) ॥

মহাভাগ্যযোগে পুরুষ-পক্ষে ফল—সকলের নয়নের আনন্দজনক, বদান্ত, বিখ্যাত, ক্ষিতিপতি, ৮০ বর্ষ আয়ু এবং নির্মল।

মহাভাগ্যযোগে স্ত্রীলোক-পক্ষে ফল—ধন ও সুমঙ্গলযুক্ত, পুত্র-পৌত্রের সহিত চিরকাল সুখে থাকিবে এবং সুচরিত্রা ॥ ১১ ॥ (১৫) ॥

কেশরীযোগ ফল—সিংহের দ্বারা রিপুবর্গনাশকারী, সভায় নিপুণবক্তা, রাজোপগম্যবৃত্তি, দীর্ঘজীবী, অতিযশস্বী, পটুবুদ্ধি, ও ভৈরবের দ্বারা জয়কারী ॥ ১২ ॥ (১৬) ॥

শকটযোগফল—কিচিং কচিং ভাগ্যপরিচ্যুত, পুনঃপুনঃ সমৃদ্ধ ভাগ্যপ্রাপ্তি, লোকে অপ্রসিদ্ধ, মনের মধ্যে অপরিহার্য্য দুঃখযুক্ত, এবং অতিদুঃখী ॥ ১৩ ॥ (১৭) ॥

কষ্ট বা অধম, মধ্যম বা সম এবং বর বা বরিত্ত, এই তিনটি যোগের ফল—স্বথাক্রমে অল্প, মধ্য ও অধিক হইবে।

ফল যথা—দ্রব্য, বাহন, যশ, সুখ, সম্পদ, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিনয়, নৈপুণ্য, বিদ্যা, ত্যাগ এবং ভোগ-প্রাপ্তি ॥ ১৪ ॥ (১৮) ॥

লগ্ন বা চন্দ্র হইতে উপচয়ে সমস্ত শুভগ্রহ থাকিলে বসুমান্-যোগ হয়।

লগ্ন বা চন্দ্র হইতে দশমে শুভ গ্রহগণ থাকিলে অমলা নামক যোগ হয়।

ভ্রম-সংশোধন

প্রথম অধ্যায়

শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	পৃষ্ঠোদয়	পৃষ্ঠোদয়
-	উভয়োদয়	উভয়োদয়
-	শীর্ষোদয়	শীর্ষোদয়
৯	দ্ব্যত্মক	দ্ব্যত্মক
১১।১২	দ্বিচ্চিক্য।	দ্বিচ্চিক্য
-	প্রাণ)	(প্রাণ)
১৩	ঋণঃ	ঋণ
-	যুক্ত)	(যুক্ত)
১৪	দৈবতঃ	দৈবত
-	ভাগ্যভাব পদ্যায়	ভাগ্যভাব পদ্যায়। ১৪।
-	সং' কীর্তি	সংকীর্তি
-	মেঘুরস	মেঘুরণ
-	অকর্ষণ	আকর্ষণ
১৭	অষ্টম;	অষ্টম,
-	পরগৃহ অর্থাৎ	পরগৃহ (অর্থাৎ
-	যষ্ঠ	ষষ্ঠ
-	ইতি (বিদ্যারত্ন...পাথক	ইতি (বিদ্যারত্ন...পাথিক)

চতুর্থ অধ্যায়

১৮	পাগল	পাগল
২৪	লিপ্ত	পিণ্ড



আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিদ্যাসাগর *

ডাঃ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ ; পি, এইচ, ডি ; পি, আর, এস

বাণীর বরপুত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের একনিষ্ঠ সেবক পুতচরিত্র রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতি বৎসর দেশবাসীর সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজলি নিবেদন করিয়া থাকেন। এটা পরিষদের অবশ্য করণীয় কার্য্য সন্দেহ নাই। বাস্তবিক পরিষদের জন্মদিন হইতে প্রথম বিশ বৎসর কাল তিনি যুগপৎ ইহার সেবক ও কর্ণধার হইয়া ইহাকে সর্ববিধ অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিয়া ইহাকে পরিপুষ্টায়তন করিয়া গিয়াছেন। বাং ১৩০১ সালে পরিষদের স্থাপনাকালে ইহার সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৩ এবং বিশ বৎসর পরে যখন রামেন্দ্রসুন্দর শারীরিক অসুস্থতার জন্ত পরিষদের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন ইহার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধিত হইয়া ২১৪৮ জনে দাঁড়াইয়াছিল। এই বিশ বৎসরকাল পরিষদের যখন যে কার্য্যের জন্ত তাঁহার ডাক পড়িত তখন তিনি সেই কার্য্যই মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্য, আয় ব্যয় পরীক্ষক, পত্রিকাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক, পরিভাষা সমিতির সম্পাদক, সম্পাদক, সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন এবং মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে পরিষদের সভাপতি পদেও বৃত্ত হইয়াছিলেন।

সাহিত্য পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পর হইতেই তিনি পরিষদের জন্ত একটি অতঃপূর্বে নির্মাণ করিবার বাসনা বহুদিন হইতে মনে মনে পোষণ করিয়াছিলেন। এই পরিষৎ-মন্দির কিরূপ হইবে তাহাও তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন ‘সাহিত্য পরিষৎ’ একটি মন্দির নির্মাণ করিতে চাহেন, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গলাদেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব। সেইখানে বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত ইতিহাসের সম্যকরূপে আলোচনার সুযোগ পাইব। সেই মন্দিরের এক পাশে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, মুদ্রিত, অমুদ্রিত, অপ্রকাশিত বাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। আর একস্থানে

বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। মন্দিরের অল্প স্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের চিত্র দেখিতে পাইব। গ্রন্থের বিষয়, তিনি তাঁহার জীবদ্দশার মধ্যেই এ সবই সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়া বাহিতে পারিয়াছিলেন। পরিষদের পুস্তকালয়ের আয়তন ক্ষুদ্র নহে। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বাবতীয় গ্রন্থ এই স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে ত বটেই, ইংরাজি গ্রন্থও বড় কম নাই। ‘রমেশ ভবনে’র কল্পনাও তাঁহার নিজস্ব। এই ভবনে বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের উপাদান—মূর্তি, শিলালিপি তাম্রলিপি, পুঁথি, মুদ্রা প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। বঙ্গের সাহিত্যিকগণের আলেখ্য এবং মন্দির মূর্তিও পরিষদ মন্দিরে আপনারা সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছেন। কেবল এক বিষয়ে তাঁহার কলিত কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তিনি চাহিয়াছিলেন, ‘বাঙ্গালার ফুলফল, লতাপাতা, গাছপালা, জীবজন্তু, শিরসন্তারের নমুনা দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব।’ এ সম্বন্ধে এখনও কিছুই করা যায় নাই। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের ইম্পিত কার্য্য কি বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাঁহার মত আরও এক বা ততোধিক বৈজ্ঞানিক যদি সাহায্য করেন এবং কর্তৃগক্ষ যত্নশীল হন তাহা হইলে রামেন্দ্রসুন্দরের এই ইম্পিত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভবপর হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনও তাঁহার আর এক অক্ষয় কীর্তি। সাহিত্যকে তিনি এক মহান ও ব্যাপক রূপ দিয়াছিলেন। সেইজন্ত কেবল সুকুমার সাহিত্যকেই তিনি সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানকেও সাহিত্যের মধ্যে স্থান দান করিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক কুমার শরৎকুমার রায় ও রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিতে সাহিত্য পরিষদের কার্য্যে তাঁহার সহায়করূপে এবং বঙ্গের বহু ভূম্যধিকারীকে তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইয়াছিলেন। কাশিমবাজারের ভূতপূর্ব প্রাঃস্বরণীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে শুধু পরিষদের পৃষ্ঠপোষকরূপেই পাইয়া-

ছিলেন এমন নয়, বাং ১৬১৪ সালে কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রথম সাহিত্য সম্মিলনের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ হইতে সকল বাঙ্গালী সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের তাবৎ সেবক বাঙ্গলাদেশের আধুনিক-কালের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একত্রে মিলিত হইয়া বঙ্গভাষা-জননীর পূজায় একত্র হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কতবার তাঁহার সহিত বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্ত গিয়াছি। কি অপরিণীত আনন্দই না তিনি সকলের মধ্যে বস্তু করিয়া দিতে পারিতেন! তাহাতে পথশ্রম অপনোদিত হইত, তত্পরি তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে তিনি অতি সহজেই ক্ষুদ্র বৃত্ত সকল সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিকের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য স্থাপন করিয়া দিতে সক্ষম হইতেন। সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন কয়েক বৎসর আর হইতেছে না। রামেন্দ্রসুন্দরের এই কীর্তি বাহাতে লোপ না পায় তাহার জন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

শিক্ষাদীক্ষা হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান ছিলেন। বি, এ, পরীক্ষায় তিনি পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে এবং এম, এ, পরীক্ষায় পদার্থ বিদ্যায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশ ও বিশেষতঃ কলিকাতা সহর তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল, সেইজন্ত বঙ্গদেশ ছাড়িতে হইবে বলিয়া মহীশূরে একটি বড় চাকরি তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ছাড়িয়া সাত ঘাটের জল খাইবার সম্ভাবনা থাকায় তিনি সরকারি চাকরিও গ্রহণ করেন নাই। ভালই করিয়াছিলেন। লেখক দুই এক ঘাটের জল খাইয়াই হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র কলিকাতার মত বড় বড় সহর—মফঃস্বল নহে। পাশ করিয়া ইং ১৮৯২ সালে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন ও পরে ১৯০৩ সালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার সরল অথচ দৃঢ় ছিল। একবার কলেজের সঙ্গাধিকারী সুরেন্দ্রনাথের পুত্র ভবশঙ্কর ক্রাসে কোনও অধ্যাপকের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন

করাতে তিনি তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হুকুম দেন ও তাহা না করিলে বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দিবেন না বলিয়া আদেশ করেন। এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের সহিত পত্র ব্যবহারের ফলে তাঁহার অধ্যক্ষ পদের মর্যাদার হানি হইতেছে মনে করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন। পরে সুরেন্দ্রনাথের অনেক অনুনয় বিনয় এড়াইতে না পারিয়া তিনি ঐ পত্র প্রত্যাহার করেন। কলেজে তিনি বক্তৃতা কালে বহু স্থলে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয় বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে অতি সরল করিয়া ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। কলেজের অধ্যাপনায় বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারে লেখকের কাছে রামেন্দ্রসুন্দর পথ-প্রদর্শক। আমিও এম, এ, সি ক্লাস পর্যন্ত ইংরাজি বাঙ্গালা মিশ্রিত এক খিচুড়ি ভাষা বরাবরই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। ছেলেরাও যে সেটা খুবই উপভোগ করিত সেটা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কেবল বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্লাশে সাহেব ছাত্র থাকিতে বাঙ্গালা ভাষা অনেক সময়েই বর্জন করিতে হইত। তবে সেখানেও বাঙ্গালা কথার ব্যবহার করার অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করিতে পারি নাই। এরূপ স্থলে বাঙ্গলা শব্দ ইংরাজিতে তর্জমা করিয়া দিতাম।

সে যাহা হউক রামেন্দ্রসুন্দরের অধ্যক্ষতার সাফল্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কার্যকালের পূর্বে কলেজের লাইব্রেরী, বিজ্ঞানাগার প্রভৃতি বিশেষ কিছুই ছিল না এবং কলেজও ভাড়াটিয়া বাড়িতে বসিত। তাঁহার সময়ে কলেজের নূতন বাড়ী, লাইব্রেরী, বিজ্ঞানাগার প্রভৃতি স্থাপিত হয় এবং ছাত্র সংখ্যাও প্রায় দুই সহস্রের উপর হয়। সাহিত্য পরিষদের উন্নতি কল্পে তাঁহার যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, রিপন কলেজের উন্নতিকল্পেও তাঁহার সেরূপ চেষ্টাই দেখিতে পাই। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, শিক্ষা দীক্ষায় তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন। কিন্তু তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুগ ভারতে আরম্ভ হয় নাই বা সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। বলা বাহুল্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার শিক্ষা, দীক্ষা ও গুরু কলেজের মামুলি শিক্ষা ও শিক্ষক হইতে একেবারে পৃথক। সেটা সেকালে এখনকার মত মোটেই সুলভ ছিল না। বিজ্ঞানাগারও ছিল না বলিলেই

চলে। সেইজন্য রামেন্দ্রসুন্দরকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে দেখি না। কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অল্প দিকে স্কুরিত হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনেও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা ছিলেন। সেইজন্য তিনি বিজ্ঞানকে দর্শনের বাহকরূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাস্তবিক দর্শন ও বিজ্ঞান প্রত্যেকের পরিপোষক, বিরোধী নহে। বৈজ্ঞানিক যদি দর্শনের জ্ঞান অর্জন করিতে সক্ষম হইয়েন, তিনি উৎকৃষ্টতর বৈজ্ঞানিক হইবেন সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে দার্শনিকের যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে তিনি বুঝাই “পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলারার পাত্র” এই সম্বন্ধ কল্পে জীবনটা নষ্ট করিবেন। বিলাতের জেভন্স, মিল, হার্বার্ট স্পেনসর, ডারউইন প্রভৃতি মনীষীগণ বৈজ্ঞানিক ছিলেন কি দার্শনিক ছিলেন নির্ণয় করা কঠিন। রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞান সমতালাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তাঁহার দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় পাই।

সাহিত্য রচনাতেও রামেন্দ্রসুন্দরের এই দর্শন-বিজ্ঞান-সংস্কৃত-বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে তিনি অগ্রণী ছিলেন ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা কার্যও তিনি অনেক আগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি একাধিক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য ও কৃষ্টির প্রতি অমুরাগের নিদর্শন পাই তাঁহার ‘যজ্ঞ কথা’ নামক নিবন্ধ-গ্রন্থে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদে। ‘বিচিত্র জগৎ’ বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধের জ্ঞানের ত্রোতক।

স্বদেশ প্রীতি তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। স্বদেশী যুগে তাঁহার এই স্বদেশ প্রীতির সম্যক নিদর্শন দেখিতে পাই। সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া সেই সময় তিনি বঙ্গভঙ্গ দিনে ‘অরক্ষন’ ও ‘মেয়েদের ব্রতকথা’ প্রবন্ধ রচিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি ব্যাপ্রকভাবে রাজনীতির চর্চা কখনও করেন নাই—সেবকভাবেই তিনি স্বদেশের সেবা করিয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর স্বাস্থ্য ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সক্রমে কালে তিনি অকালে আমাদের গকে পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রাণ করিয়াছেন। আমার স্বরণ আছে যে তিনি পঞ্চাশ বৎসর বয়সক্রমে কালে কলিকাতার সখ্য সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সেই সময়েই

তাঁহার স্বাস্থ্য এতদূর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল যে বহু কষ্টে আমরা তাঁহাকে কলিকাতার টাউন হলের উপর তলায় লইয়া গিয়াছিলাম এবং তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ তিনি পাঠ করিতে অসমর্থ হওয়াতে আমিই পড়িয়া দিয়াছিলাম। বস্তুতঃ অকাল বার্কিকা ও অকাল মৃত্যু বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরম শত্রু। তাই আমি সেই সময়ে “বঙ্গে অকাল বার্কিকা” নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া উহার নিবারণ কল্পে কতকগুলি সুপ্তিযোগের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলাম। পঞ্চাশের মধ্যে বা কিছু পরে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, মধুসূদন নবীনচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বঙ্গের অনেক মহাপুরুষ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদ, রিপন কলেজ প্রভৃতির উন্নতিকল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ তাহার অত্যন্ত কারণ। অনেক পারিবারিক শোকও তাঁহার আয়ুষ্কাল হ্রাস করিয়াছিল। শেষ বয়সে তিনি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে হারায়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর কলি হয়। তাঁহার শ্রদ্ধা ক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্ত তিনি তাঁহার পত্নী-আবাসে ফিরিয়া যান। তাহার পর তিনি কলিকাতার ফিরিয়া আসিয়া যে শয্যা গ্রহণ করিলেন তাহা হইতে আর উঠিলেন না। আমরা আজ তাঁহার স্বদেশ ও ভাষার প্রতির অমুরাগ, বিজ্ঞান ও দর্শন ও সাহিত্য-সেবা, চরিত্রের মাধুর্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্য অর্পণ করিতে সমবেত হইয়াছি। আসুন, আজ স্বর্গগত, বঙ্গের অদ্বিতীয় কবির ভাষার রামেন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে বলি ‘তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমরা তোমাকে সাদর অভিবাदन করিতেছি’।

* গত ৬ই জুন শনিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের ২৩ শতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জনসভার সভাপতির অভিভাষণ।

(অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন যে রামেন্দ্রসুন্দর ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে উপাধিতে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ভূষিত হইয়াছিলেন সেই জলভ উপাধি রামেন্দ্রসুন্দরও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এ সংবাদ দেশবাসী সকলকে জ্ঞাত করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। সেই জন্ত এই প্রবন্ধের শীর্ষ নাম ‘আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিদ্যাসাগর’ করিয়াছি। ১৯২৭ সনতে (ইং ১৯১৬ সালে) বারানসীর ‘ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের’ পণ্ডিতগণ রামেন্দ্রসুন্দরের অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি দান করিয়াছিলেন—পঃ নিঃ।)

গুরুসদয়ের সাহিত্য সাধনা

ত্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

সাহিত্যই মানবের সাধনা ও সংস্কৃতিকে রূপ দেয়, করিয়া রাখে তাহাকে অমর! জাতীয় জীবনের প্রেরণার উৎস ও এই সাহিত্য। যুগে যুগে সুধী, দ্রষ্টা, ও স্রষ্টাগণ কাব্য, মহাকাব্য, গীত, ছড়া, প্রবন্ধ রচনা করিয়া যেমন তাহারা স্বয়ং অমর হইয়া আছেন, তেমনই তাঁহাদের লেখা জাতি ও দেশকে উদ্ধৃত্ত করিয়া থাকে। এই সত্য তথ্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, নিজের সাধনার ফল ফুটিয়া তুলিতে, সার্থক করিতে, দেশের ও দেশের মধ্যে পরিবেশন করিতে হইলে মাতৃভাষাকেই তার উপযুক্ত বাহন করিতে হইবে।

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্য সাধনার অল্পপ্রেরণা পাইয়াছিলেন বাঙ্গলা মায়ের মেয়ে তাঁরই সহধর্মিণী সরোজ-নলিনীর নিকট হইতে, সে কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন “সরোজনলিনী” পুস্তকের ১২শ পৃষ্ঠায়—“বঙ্গবিচ্ছেদ রদ হইয়া যখন বিহার একটা আলাদা প্রদেশ হইল তখন আমার ইচ্ছা ছিল বিহারেই থাকি, *** তিনি (সরোজ-নলিনী) বলিলেন—“দেখ সমস্ত জীবন ত আর শীকার লইয়া থাকিবে না। নিজের প্রদেশের লোকের সঙ্গে তোমার বেশী জানাশুনা আছে, বাংলাভাষা তোমার মাতৃভাষা, সুতরাং বাংলাদেশেই কাজ করা উচিত।”

বিগত শতাব্দীতে ইংরাজি সাহিত্য ও সভ্যতার প্রবল মোহে ও চাপে বাঙ্গালী তাহার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আই, সি, এস গুরুসদয় ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের রুতী সন্তান হইলেও তিনি বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য হারান নাই, বঙ্গবাণীর সেবা হইতে দূরে থাকিতেন না। বঙ্গসাহিত্য সাধনার প্রারম্ভে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শিশুর মন গঠন করিতে হইলে মাতৃভাষাই প্রকৃষ্ট বাহন, সেই নিমিত্ত গুরুসদয় প্রথমে বাঙ্গলার শিশু-সাহিত্য রচনা করেন। তখন বাঙ্গলা ভাষায় শিশু সাহিত্য লিখিতেন অতি অল্প সাহিত্যিক। এই সময় ইংরাজি সাহিত্যের শিশুর মন ভুলান ছড়াগুলি

বাঙ্গলায় রূপ দিলেন গুরুসদয়।—মুদ্রিত হইল সেই ছড়াগুলি “ভজার বাঁশী” পুস্তকের পৃষ্ঠায়।

ভজার বাঁশী

এই “ভজার বাঁশী” প্রথম বাঙ্গলার শিশু চিত্তে বাজিয়া উঠিল—যখন পুস্তকখানি ১লা আশ্বিন ১৩২৯ সালে মুদ্রিত হইয়া বাহির হইল। বিদেশী মূল ছড়ার ছন্দ বজায় রাখিয়া বাংলা ভাবে ও বাংলা ভাষায় সে গুলিতে নির্মল হাস্য রস পরিবেশন গুরু সদয় দত্ত মহাশয় করিয়াছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাসির রোল উঠিয়াছিল বাঙ্গলার বহু গৃহে “ভজার বাঁশীর”র ছড়া পড়িয়া।

“বাঁশী ফুঁকতে ভজা এমনি চমৎকারটা পারত
(যে তা’র) আওয়াজ শুনে চুপ’টি করে’ থাকতে কেহই নারত।
যেমন বাঁশী শুনত, অমনি নেচে সবাই উঠত—
(এমন কি গাধা গুলো হু’পায় নেচে তা’র পিছনে ছুটত।

একদিন একটা বুড়ী, নিয়ে হাঁসের ডিমের ঝুড়ি
যাচ্ছে হাটে, অমনি ভজা বাজনা দিল জুড়ি;
বুড়ী উঠল নেচে, ডিম সব ভেঙ্গে হ’ল চুর,
বুড়ী উঠল রেগে—ভজা আনন্দে ভরপুর।

বাল্য কালের চপলতা যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত না হয় তাহাও “ভজার বাঁশী”র—“ছুটমি আর করব না” ছড়ায় বেশ প্রকাশ হইয়াছে।

“বিড়াল আপন মা’কে বলে—

‘ঘরের বাঁধন সহিব না;’

গভীর বনে গিয়ে আমি।

দস্যু হয়ে রইব মা!

রইব মা! রইব মা!

দস্যু হয়ে রইব মা!”

নানা ঘাত প্রতিঘাত, জয় বিজয় দেখাইয়া কবি ঘরের
ছেলেকে মায়ের বশুতা স্বীকার করাইতেছেন—

“যুদ্ধে জয়ী হ’য়ে কুকুর

চৌচিড়ে ডাকে ভেউ ভেউ ;

ভাঙ্গা হাড়ের ব্যথায় বিভাল

মিহি সুরে করে মেউ ।

অবশেষে লেজ গুটায়

বাড়ী এসে বলে, “মা !

নাপ করগো এবার মোরে

ছুটামি আর করব না ।

করব না ! করব না !

ছুটামি আর করব না ।

‘ভজার বাশী’র ছড়া গুলিতে গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের
অনুবাদের কৃতিত্ব যেমন দেখা যায় তেমনই বিদেশীয় ছাপের
প্রভাব না রাখিয়াও বিদেশী ছন্দগুলি বাঙ্গলায় রূপ দিবার
শক্তির প্রকাশ দেখা যায় ।

গুরুসদয় সাহিত্য সাধনা কোন প্রকার বশ বা অর্থ
লিপ্সার জন্ত করেন নাই । তিনি তাঁর বইগুলির বিক্রয় লব্ধ
অর্থ ‘সরোজনলিনী সমিতি’র জন্ত প্রদান করিয়া গিয়াছেন ।
শিশুদের মন কেবল কথায় ভুলে না, তাই নন্দলাল বসু, অসিত
কুমার হালদার, ও অর্জুজপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের
স্ননিপুন হস্তে ছবি আঁকাইয়া শিশু-সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করিয়া
গিয়াছেন ।

পাগলামির পুঁথি

গুরুসদয় দত্তের শিশু সাহিত্যের অন্ততম অবদান “পাগ-
লামির পুঁথি ।” বিলাতী লিমাংক কবিতার আদর্শে এই
ছড়াগুলি লিখিত । সে সময় বড় কেহ এই লিমাংক প্রথায়
শিশু সাহিত্য রচনা করেন নাই । এই পদ্ধতিতে—পাঁচটি
পুঁক্তিতে এক একটি ছড়া সম্পূর্ণ এবং এক একটি ছড়া ছোট-
খাট একটি গ্রন্থনের মত কোন পরিহাস চিত্রের ব্যঙ্গনা
করিতেছে । কবি গুরুসদয় শেষ পুঁক্তিতে যমক অলঙ্কারের
একটা কাঁক দিয়াছেন—তাহাতে বাঙ্গলার বিশেষত্ব ফুটিয়াছে—
যেন মালদহের ফজলী কাশীতে যাইয়া নেংড়ায় দাঁড়াইয়াছে ।

বিলাতী লিমাংক বাঙ্গলা ছড়ায় আরও একটু বেশী রস-সমৃদ্ধ
হইয়াছে । ইহাই গুরুসদয়ের বাঙ্গলা সাহিত্যে নব অবদান ও
সৃষ্টি । যেমন—

‘ছিল তমলুকের এক তেলি ;—

গড়ে সেক্সপিয়র ও শেলি

বলত তেলের ব্যবসা ওরে,

কি আর সভ্যলোকে করে ?—

তমলুকের সেই-তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তেলি

এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, “জার্মান ভাষার
জটিল ভাব-প্রকাশের শক্তি এবং ইতালিয় ভাষার মাধুর্য্য
বাঙ্গলা ভাষায় একত্র বিদ্যমান, মানুষের এমন কোন ভাব নাই,
যাহা বাঙ্গলা ভাষায় উৎকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ করা যায় না ।”
‘পাগলামির পুঁথির’ বিচিত্র ছন্দ বাঙ্গলা ভাষার বহুমুখী শক্তির
পরিচয় দিতেছে ।

ছিলেন বালীগঞ্জের এক বারিষ্টার ;

মামলা হলে খারিজ তাঁর,

হয়ে জজের উপর জুর্জ

করতেন ভাখ্যার সঙ্গে যুদ্ধ—

বালীগঞ্জের বিটুকেলে সেই বারিষ্টার !

যেমন হাসির কোয়ারা তেমনই ছন্দেরও নৃত্যের ঢেউ এই
ছড়াগুলিতে বহিয়া দিয়াছেন কবি গুরুসদয় । আমরা
তাঁর খোজও রাখি না, পড়িও না । তাঁহার দানে সাহিত্য
পুঁঠ হইয়াছে, আমরা দীন হইয়া আছি । কেবল নিজের
জ্ঞানের অহঙ্কার লইয়া ‘গুরুসদয় একটা পাগল’ বলিয়া
উপেক্ষা করিয়া গিয়াছি, কবিও তাই মনের আবেগে—প্রিয়তমা
সরোজনলিনীকে উৎসর্গ করিতে যাইয়া উৎসর্গ লিপিতে
লিখিয়াছেন—“আমার সকল প্রকার নির্দোষ পাগলামির
প্রশংসাই তুমি দিয়াছ এবং এই ছড়া গুলি লিখিতে তুমিই
প্রথম আমাকে উৎসাহিত করিয়াছ ।

তাই এই পাগলামির সাজিটি ভরিয়া আজ তোমারই
উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম ।’

বারাসতের এক বাকুই

কেয়ার করত না কারুই,

কেউ কিনতে এলে পান,

ছাড়ত বিকট স্বরে গান—

বারাসতের বেহায়া সেই বাকুই।

এর মত ছড়াগুলি জাত ব্যবসায়ের মমতা শিশুমনে যেমন বদ্ধ
মূল করে তেমনই হাসির উৎস ছুটায়।

শ্রীপুরের এক ছাত্রী

ছিলেন সুলক্ষণা পাণ্ডী,—

কিন্তু হতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

পড়ে শরীর করলেন শীর্ণ

শ্রীপুরের সেই অতি শ্রমিক ছাত্রী।

এইরূপ ছড়ায় কবি গুরু সদয় সমাজের নর-নারীর দুর্দশা
ও অভাব স্বল্পরূপে লক্ষ্য করিবার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

রতনই রতন চিনিতে পারিয়া থাকেন। রায় বাহাদুর
ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন এই পুস্তকখানির ভূমিকায় লিখিয়া
ছেন—“দত্ত মহাশয়ের নানাবিষয়ে প্রধাবিত মনস্তিতার
একমাত্র উৎসের সন্ধান আমরা জানি—তাহা দাম্পত্য প্রেম।
তিনি অল্প বয়সে যাহাকে হারাইয়াছেন, বয়স যতই বাড়িয়া
চলিতেছে ততই যেন তাঁহাকে বেশী করিয়া পাইতেছেন।
তিনি তাঁহার স্বামীর কাছে মৃত হন নাই, অমরলোক হইতে
নিত্য নিত্য তাঁহাকে অমৃতের সন্ধান দিতেছেন। * * *

এই ক্ষুদ্র ছড়াগুলি সেই দেবী প্রতিমার বিশ্বাধরের
কৌতুকহাস্যে বিকশিত হইয়াছিল—গল্প পড়িয়াছি, কোন
দেববালার হাসির সঙ্গে মুক্তা বরিয়া পড়িত। ছড়া গুলির
মধ্যে যে নিবিড় কৌতুক রস নিহিত আছে, তাহা সেই
বিশ্বোত্তীর মুহূর্ত্ত হাস্য হইতে কবি কুড়াইয়া পাইয়া এই মালা
গাঁথিয়াছেন,—তাঁহারই পুণ্য নামের সঙ্গে জড়িত হওয়াতে
এই দানের মহিমা অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে।

আমার বিশ্বাস এই ক্ষুদ্র বই খানির অধিকার লইয়া
ঘরে ঘরে শিশুদের লড়াই বাধিয়া যাইবে।”

বাষট্টি ছড়ায় গুরু সদয় বাঙ্গলার স্বরূপ—এমন সরল
ও স্পষ্ট ভাবেও ভাষায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা পড়িতে
যেমন আনন্দ পাইবে তেমনই শিশু চিত্তে বাঙ্গলার রূপ
ভাসিবে। ইহাই ত প্রকৃত সাহিত্য-সৃজনের শক্তি।

ভাট পাড়ার এক ভট্ট

ছিলেন ভোজনে স্পষ্ট ;—

পেলে নিমন্ত্রনের ডাক—

পেটে রাখতেন না আর ফাঁক

ভাটপাড়ার সেই বৃহৎ-উদর ভট্ট।

চাঁদের বুড়ী

‘চাঁদের বুড়ী’ শিশুসাহিত্যে গুরুসদয় দত্তের আর একটি
সরস, সরল, নব অবদান। কতকগুলি পুস্তক লিখিলেই যে
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হওয়া যায় তাহা নয়। সাহিত্য ভাণ্ডারে
কিছু নূতন ও মৌলিক সৃষ্টির পরিচয় প্রদানেই লেখক
সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। গুরুসদয়ের লেখা
অধিক না হইলেও অল্পতে তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয়
আমরা পাইয়া থাকি। চাঁদের বুড়ীর ছড়া গুলিতে তাহারই
সন্ধান পাওয়া যায়।

সরোজনলিনী

“অর্থ-ভাণ্ডারে মূল্যবান সামগ্রী লইয়া মানুষ গরু করে
কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কথা স্মৃতি ভাণ্ডারের সম্পদ। সেই
মানুষই একান্ত দরিদ্র বাহার স্মৃতি সঞ্চয়ের মধ্যে অক্ষয়
গোরবের ধন বেশি কিছু নাই।

তাই সরোজনলিনীর জীবনী পড়িয়া বুঝলাম—জীবনী,
লেখক তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত গুরু সদয় দত্ত যথার্থই ভাগ্যবান,
কারণ এইরূপ জীকে মৃত্যুর মধ্যে হারাইয়াও হারান সম্ভব
নহে, শুভাদৃষ্টক্রমে যিনি তাঁহাকে নিকটে পাইয়াছেন, তাঁহার
জীবনের মধ্যেই তিনি চিরদিন জীবিত থাকিবেন।”—রবীন্দ্র
নাথ এই কথাই বই খানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন।

জীবনী লেখা খুবই শক্ত—বিশেষত আত্ম জীবনী বা
আত্মীয়ের জীবনী লেখা। অনেক কিছু ভালবাসায়, ভক্তি,
বা স্নেহে অতিরঞ্জিত হইয়া যায়—নচেৎ অনেক কথা
অপ্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু জীবনী লেখা তাহারই সার্থক
হয় যিনি আদর্শ ব্যক্তির সহিত আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে
তাঁহার সকল চিন্তের বা মনের অবস্থার সহিত পরিচিত
হইয়াছেন। গুরু সদয় দত্ত মহাশয় “সরোজ-নলিনী”
পুস্তক খানিতে ভাবের প্রস্রবন প্রবাহিত করেন নাই, অথচ
সরল ভাষায় সঠিক ভাবে সরোজ নলিনীকে চিত্রিত
করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় “সরোজনলিনী” পুস্তকে সরোজ-
নলিনীর চরিত্র ও জীবন কথা এমন সরল ও পুষ্পপাতিত

শূন্য ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে বঙ্গনার 'নারী-শিক্ষা' ও সংগঠনেও বিশেষ সমুদ্রপ্রেরণা দিবে। এই পুস্তকে এই যুগের বঙ্গ নারীর অবস্থা ও তাহাদের উন্নতির পথ এমন সোজা ও প্রাণপুষ্পী ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহা যুগে যুগে বঙ্গ নারীর মঙ্গলের পথ নির্দেশ করিয়া দিবে।

রবীন্দ্রনাথও এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—
“সাধারণত আমরা যখন খাঁটি বাঙালী মেয়ের আদর্শ খুঁজি তখন গৃহকোণচারিণীর উপরেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে। গৃহ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ যে সঙ্কুচিত জীবন তাহারই সঙ্কীর্ণ আদর্শের বহুবৈচিত্র্যময় উৎকর্ষভূত পদার্থ নহে। তাহার উপাদান অল্প, তাহার ক্ষেত্র অপ্রশস্ত, তাহার পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অকঠোর। * * * এই তাঁর (সরোজনলিনীর) বড় সংসারের মধ্যে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধকে তিনি মাধুর্যের দ্বারা শোভন ও ত্যাগের দ্বারা কল্যাণময় করিয়াছিলেন। এইরূপ ক্ষেত্রেই নারীজীবনের যথার্থ পরিচয় ও পরীক্ষা। তাঁহার কাছে বাহিরের দ্বারা ঘর ও ঘরের দ্বারা বাহির পরাহত হয় নাই। এই উভয়ের সুন্দর সমন্বয়েই তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। আজকালকার দিনে যে নারী কেবল একান্ত ভাবেই গৃহিণী তিনি আমাদের আদর্শ নহেন, ঘরে বাহিরে সর্বত্রই যিনি কল্যাণী তিনিই আদর্শ। বাহ্যিক জীবন কেবলমাত্র চিরাগত প্রাদেশিক প্রথা ও সংস্কারের ছাঁচে ঢালা তিনি আদর্শ নহেন কিন্তু বাহ্যিক মধ্যে বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান ও ভাবের বিচিত্র দ্বারা গভীর ও সুন্দরভাবে সজ্জিত লাভ করিতে বাধা না পায় তিনিই আদর্শ।

সরোজনলিনীর জীবনী পড়িয়া আমরা এই আদর্শের পরিচয় পাইলাম।”

বাস্তবিকী তাহার অমর কবিত্ব শক্তির প্রভাবে রামের সীতামুরাগের ও সাক্ষী স্ত্রী সীতার চরিত্র লিখিয়া যেমন অমর হইয়াছেন তেমনই গুরুসদয় বর্তমান উচ্ছ্বলতার যুগে এক সাক্ষী রমণীর জীবনী লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে অপূর্ণ রত্ন অর্পণ করিয়াছেন।

পটুয়া সঙ্গীত

বাংলা দেশের গণ-সঙ্গীত, গণ-নৃত্য, গণ-শিল্প, ও গণ-সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্য ও কলা ভাণ্ডারে অপূর্ণ দান। বাঙ্গালার

বৈশিষ্ট্য ইহার প্রত্যেকটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সব গণ-সাহিত্যের মধ্যে ‘পটুয়া সঙ্গীত’ অপূর্ণ ও অভিনব। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় অনেক গবেষণা, অনুসন্ধান, শ্রম স্বীকার করিয়া এই ‘পটুয়া সঙ্গীত’ সংকলন ও ইহার ইতিহাস লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু লিখিয়া বাণীদেবীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করিবেন। কালের নিষ্পন্ন গীড়নে তাঁহার সে বাসনা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। দেশের ও বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইল।

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ভারতের চিত্রলেখার স্থান এক সময়ে সমাজে অতি প্রয়োজনীয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাই তিনি তাঁহার লেখনী সঞ্চালনে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ‘পটুয়া সঙ্গীত’ পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়া গণ-সাহিত্যের একটি লুপ্ত অধ্যায় উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তকটি প্রকাশ হওয়াতে বাঙ্গলা সাহিত্য অতিশয় সমৃদ্ধশালী হইয়াছে।

গুরুসদয় দত্ত লিখিয়াছেন—“প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মানুষ চিত্র লিখিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষেও চিত্র-লিখন ও চিত্র প্রদর্শন রীতি অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এই বিষয় প্রচুর উল্লেখ আছে।”—তাঁহার পর তিনি চিত্র-লিখনের ইতিহাস নানা গভীর গবেষণার দ্বারা লিখিয়াছেন। বাঙ্গলায় পটুয়া সঙ্গীত-বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—

“বাংলায় গণজাতির হিন্দুধর্মের রূপ চিরকালই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মণ্যধর্মের রূপ হইতে পৃথক হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাভাবিক অদম্য স্বাধীন আত্মা ধর্মোচরণ-ক্ষেত্রে ও দেবমূর্তি পরিকল্পনায় শাস্ত্রীয় বিধি বিধানের খুঁটিনাটি দাসের মতন মানিয়া লইতে পারে নাই; পরন্তু তাহার আত্মার নিজস্ব ভাব ও রসপ্রেরণা-প্রসূত রূপে সে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছে। তাই বাংলার গণজাতীয় বাধাকল্প রূপকল্পনা পুরাণের পরিকল্পনা হইতে পৃথক। * * *

গণজাতির প্রয়োজনের আহবানে ও স্বকীয় আত্মার অনুপ্রেরণার ফলে বাংলার জাতীয় শিল্পী পটুয়াগণ তাহাদের গীতিকায়, চিত্রে ও মৃৎশিল্পী প্রতিমা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বাংলার নিজস্ব ভাব ও রসের ব্যঞ্জনায রূপ-কল্পনা করিয়াছিল—সাহস প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজের অকুটি উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই যে

তাহারা সমাজ হইতে পতিত হইয়াছিল, এইরূপ মনে হয়।
নিখ্যাত হইয়াও এই জাতীয় ভক্ত সাধক শিরিগণ জাতীয়
ভাবধারা ও রূপধারাকে যে বর্জন করে নাই, ইহা বাংলার
গণজাতীয় আত্মার হৃদমণীয় স্বাধীনতা-প্রিয়তারই প্রকৃষ্ট
পরিচয়।” (পটুয়া সঙ্গীত, পরিচায়িকা—পৃঃ ১১/০)।

এইরূপে তিনি ‘পটুয়া সঙ্গীত’ লিখিয়া এবং ‘পটুয়া সঙ্গীত’
সংকলন ও সম্পাদন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের গণ সাহিত্য
অধ্যায়ের একটি ধারা প্রবর্তন করিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহার
গণ সাহিত্য রচনায় কৃতিত্ব ও অমর্যোগ এই গ্রন্থে পাই। এই
গ্রন্থখানি ১৯৩৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু চিত্র
সম্বলিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ‘পটুয়া’ ও
‘চিত্রলেখা’ পুস্তিকা এবং ‘বাংলার রসকলা-সম্পদ’ (প্রবাসী
বৈশাখ ১৩৩৯) ‘পটুয়ার প্রাচীন ইতিহাস’ (বাঙ্গালার শক্তি
পৌষ ১৩৪৫) রচনাবলীতে বাঙ্গালার পট-চিত্রের অনেক তথ্য
দিয়াছেন।

কৃষ্ণের অবতার, কৃষ্ণলীলা, রাম অবতার, শঙ্খ-পরান পালা,
সিদ্ধুবধ, মহাদেবের শঙ্খদান, গৌরঙ্গ অবতার, ভগবতী-মঙ্গল,
পাঁচ কল্যাণী, শিবের মাছ ধরা প্রভৃতি ঊনত্রিশটি সঙ্গীত
গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ১৯৩০-৩৩ খৃষ্টাব্দে বীরভূমে যখন কালেক্টার
ছিলেন তখন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইগুলি বর্ণশুদ্ধি, শব্দার্থ
পাঠশুদ্ধি দিয়া অতি স্ননিপুণতার সহিত সম্পাদন করিয়া বঙ্গ
সাহিত্যের পরম উপকার করিয়াছেন। এই গীত সংশ্লিষ্ট পাঠ
তাঁহার সংগ্রহ আছে ও এই সব পাঠ ও গীতিগুলি পাঠ তাঁহাকে
নানা মৌলিক পল্লী-সঙ্গীত রচনা করিবার অনুপ্রেরণা দিয়াছে।
তিনি লিখিয়াছেন—

“জাতির মনোরাজ্যের সর্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শগুলি পটুয়াগণ
অপরিসীম নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ সাধনার দ্বারা সঙ্গীত ও চিত্রে
রূপায়িত করিয়াছে এবং উহার ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনকে
গভীর অধ্যাত্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে।”
(পটুয়া সঙ্গীত, পৃঃ ১৬/০)

ব্রতচারী সখা

গুরুসদয় দত্তজী ব্রতচারী পরিচেষ্টার জ্ঞাত যে সব গান রচনা
করিয়া গিয়াছেন সেইগুলি বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার নূতন দান।
এই গানগুলি যেমন প্রাণবান হুন্মে রচিত হইয়াছে তেমনই

শব্দ মাধুর্য্যে ভরা। বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য ও বাঙ্গালার সরলত
এই গানগুলির প্রতিহুত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

জয় জয় জয়

নব বাংলার জয়!

দেহে নাহি ক্লান্তি, বুকে নাহি ভয়-॥

মহা শৌর্যশালিনী সেই বাংলার জয়!

চির-শৌর্যশালিনী সেই বাংলার জয়!

গানে বাঙ্গালী ছেলে মেয়ের বাস্তবিক ভয় ভাঙিয়া দেয়,
নূতন উৎসাহ প্রাণে আনিয়া দেয়।

মোদের বাংলাদেশের মাটি!

তোমার সহর, গ্রাম ও বাটি

সবতনে সবাই মোরা রাখব পরিপাটি ॥

করব পানার নির্বাসন

কেটে গাছের নিবিড় বন—

বইয়ে দিব আলো-হাওয়ায় মুক্ত বিচরণ;

সাধব মোরা নিত্য তোমার ধনের বিবর্জন—

রচে তরকারি ফল ফুলের বাগান কোদাল হাতে খাটি ॥

গানটি তরুণ প্রাণে কতই না আশার সঞ্চার করিয়া দেয়।

মায়ের জাতের মুক্তি দে রে!

নয় তো যাত্রা-পথের বিজয়-রথের

চক্র তোদের ঠেলবে কে রে?

গানটিতে বাঙ্গালার মেয়েদের প্রাণে মুক্তির বাণী শুনাইয়া
গিয়াছেন। তাহারই অনুপ্রেরণায় বঙ্গ নারীগণ—

শক্তি মন্ত্র সাধন করে

গড়বে নারী সন্তানেরে ॥

গুরুসদয়জী ‘ব্রতচারী সখা’র অনেক গান এমনই উদ্দীপনা-
ময়ী হুন্মে রচনা করিয়াছেন যাহা বলহীনের প্রাণেও অপূর্ব
উৎসাহ আনিয়া দেয়।

উঠবে উল্লাস ভরে সিংহনাদের বুলি

বাড়বে বৃকের পাঁচি বাহুর বাঁকায় ফুলি।

তিনি গানের ভিতর দিয়া তাঁহার ব্রতচারীর প্রধান ধর্ম—
জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ—বাঙ্গালার তরুণ ও তরুণীর
চিত্তে প্রভাবিত করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

হাসবে খেলবে নাচবে গাইবে

খাটবে ভুলে ভয় আর মান,

দেহের তেজ আর মনের তুষ্টি

আনন্দে উথলাবে প্রাণ।

এই আদর্শ প্রচারে তিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন।
দিবারাত্রি, শয়নে স্বপনে তাঁহার চিন্তা বাঙ্গলার যুবক-যুবতীদের
মানুষ বাঙ্গালী গড়িয়া তুলিবার চিন্তায় পূর্ণ থাকিত।

বাংলার মানুষ আমরা বাংলার সেবকদল—

কর্মে খুঁজি মুক্তি, ঐক্যে গড়ি বল ॥

তুলব গড়ে বাংলার অসীম বীৰ্য্যবল—

বাংলার মানুষ আমরা বাংলার সেবকদল।

বাংলাকে জগতে করব বড় মৌর

বাংলার ব্রতচারী-দল।

মিলনের শ্রোত তাঁর অনেক কবিতার মধ্যে প্রবাহিত
হইতে দেখা যায়। তিনি যে সত্য, যে সাধনা বিশ্বাস
করিতেন—তাহা আনন্দের ভিত্তির উপর গড়িতে চাহিয়াছেন।
তিনি তাঁর ‘ব্রতচারী সখার’ প্রত্যেকটি রচনায়, প্রত্যেক গানে
আনন্দের সহিত জ্ঞান, শ্রম, সত্য ও ঐক্য অর্জন করিতে
অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। নৃত্য ও গীত করিয়া কর্ম-করিবার
স্পৃহা নর-নারীর হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দিয়াছেন—

স্বাগত, স্বাগত, স্বাগত—

স্বাগত হে তুমি শুভ অতিথি ;

আজি মিলনের পুলকিত পরশে

হরষে-আবেশে হাসে প্রকৃতি।

গুরুতর রাজকাণ্ডের মধ্যে যখন অবসর পাইতেন গুরুসদয়
পল্লী-শিল্প, পল্লী-নৃত্যর অনুসন্ধান করিতেন, এবং তাহার
পুনরুদ্ধার ও প্রচলনের জন্ত তাঁহার সকল চিন্তা ও বিত্ত দিতেন।
কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালার নিজস্ব শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, গীতি
সম্বন্ধে বঙ্গের নর ও নারীর প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য তিনি
বহু প্রবন্ধে বাঙ্গলা মাসিক ও ইংরাজি কাগজে লিখিয়া গিয়াছেন।
“Woman of India” লিখিয়া বাঙ্গলার নারীর সঠিক চিত্র
অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালার মর্যাদা বুদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গলক্ষ্মী

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই প্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে নিজ

মত ও পথ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে সাহিত্যই
প্রধান পরিবেশনের উপাদান তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই
নিমিত্ত তিনি ১৬ বৎসর ধরিয়া ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও
পরিচালন করিয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার নানারূপে পরিপুষ্ট করিয়া
গিয়াছেন। এই বঙ্গলক্ষ্মীতে তিনি মাসের পর মাস তাঁহার
নানা বিষয়ে জ্ঞানের ও সাধনার ফল বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।
তাঁহার বাঙ্গলার সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য প্রীতি তাঁহার
লেখার মধ্যেই প্রকাশ রহিয়াছে। সম্পাদনে সাহায্য
লইয়াছেন প্রথম বৎসর শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর পরের ১৫ বৎসর
শ্রীমতী হেমলতা দেবীর।

১৩৪০ সালের বঙ্গলক্ষ্মীর চৈত্র সংখ্যায়, মথুরাপুর শীর্ষক
প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—“আমার মনে হয়, মথুরাপুরের
সিংহের পরিকল্পনায় যে পৌরুষ ও বীর্যের ব্যঞ্জন। প্রকাশ
পেয়েছে, বিশ্বের সমগ্র ভাস্কর-শিল্পের ক্ষেত্রে কোথাও তার
তুলনা মিলিবে না।

আমার-আরোও মনে হয় যে প্রাচীনমের ভাস্কর্যের চেয়েও
মথুরাপুরের দেউলের ভাস্কর্য্য অধিকতর বীৰ্য্যবান ও পৌরুষ
ব্যক্তক। মথুরাপুর দেউলের একটা বিশেষত্ব যে, ভাবের
পরিকল্পনা ও গঠন পদ্ধতি সমস্তই বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর
নিজস্ব”

একপ জোর অথচ সরল, মনোরম ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় তিনি
বাঙ্গলা রচনা করিতেন। মানুষের লেখার ভিতর দিয়া তাহার
প্রাণের আকাজক্ষা, সাধনার ধারা, চিন্তাশক্তির প্রখরতা উপলব্ধি
করা যায়। তিনি কেবল সাহিত্য সেবা দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য পুষ্ট
করিয়া যান নাই, বাঙ্গালীর মানুষ হইবার পথ নির্দেশ করিয়া
গিয়াছেন।

‘বাঙ্গলার শক্তি’

বাঙ্গলার তরুণ তরুণীর মধ্যে বাঙ্গলার স্বরূপ প্রকাশ
করিবার জন্ত, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য প্রচার করিবার মানসে,
বাঙ্গলায় শিল্প সাধনার উৎসাহ দিবার নিমিত্ত, বাঙ্গলার পল্লী
নৃত্য ও গীত-প্রীতি বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে ‘বাঙ্গলার শক্তি’
নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া ৫ বৎসর সুসাহিত্যিক
শ্রীমদোজ বসুর সম্পাদনে পরিচালন করিয়া গিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র পত্রিকা বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে বহু অপূর্ণ রত্ন যোগান দিয়াছে।

সাহিত্যিকগণের সংশ্রব ও সাহিত্য আলোচনায় তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। যখনই তাঁহাকে সাহিত্য পরিষদে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছি তখনই সকল কাজ ফেলিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া কাজ করিবার ইচ্ছা তিনি বহুবার প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের জামসেদপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্ত তিনি অসুস্থ শরীরে, অল্প সময় মধ্যে অতি আগ্রহের সহিত গিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাবে তাঁহার জন-সাহিত্য প্রীতি ও জন-সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয় দিয়া সাহিত্য সেবীদের মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

‘নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির’ সহঃ সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাসনা ছিল সমগ্র ভারতে বঙ্গ ভাষার প্রসার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবেন। মাদ্রাজে যখন তাঁর রচিত বাঙ্গলা গান গুলিও ভাষান্তারিত হইল তখন তাঁহার মুখে মৃত্যুর করাল ছায়ায় মধ্যেও নির্মল হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

দারুণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াও তিনি রচিয়া গিয়াছেন গান। সাহিত্য যে তাঁহাকে কতখানি উজ্জীবিত করিত, তাঁহার চতুর্পার্শে যাহারা থাকিতেন তাঁহারা প্রতি মুহূর্তে তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে।

পুস্তক পরিচয়

কীর্তন-গীতি-প্রবেশিকা—রায় বাহাদুর শ্রীখগেননাথ মিত্র, সঙ্গীতরত্ন কবুকের প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য—২৫০ টাকা।

এই পুস্তকে ২৯টা কীর্তন পদের স্বরলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। স্বরলিপি দিয়া কীর্তন গানের পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহাই খগেনবাবুর অভিনব ও তাঁর কীর্তন গানের অনুরাগের প্রমাণ। তিনি শ্রীনবদীপ ব্রজবাসীসহ “শ্রীপদামৃত মাধুরী” ও পুস্তকে বহু বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন ও মুদ্রণ করিয়া প্রভূত উপকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি কীর্তন শিক্ষানুরাগীগণের শিক্ষা করিবার অত্যন্ত সুবিধা হইবে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অনেক সঙ্ঘে কীর্তনের পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হইয়াছে—ছাত্র ও ছাত্রীদের এই পুস্তক অশেষ উপকার দিবে।

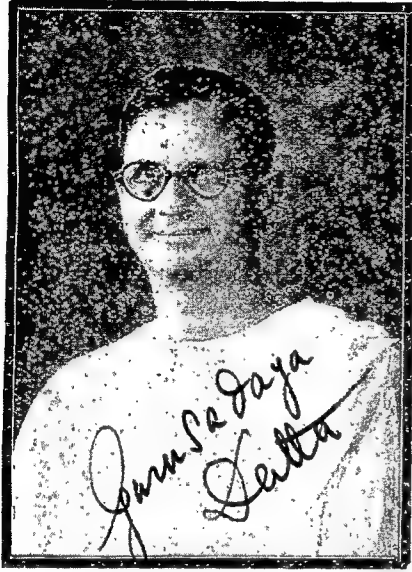
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তনের জনক। কীর্তনে খোল ও করতাল সহ সঙ্গীত করাও মহাপ্রভুর দান। আর কীর্তনও ভারতের সঙ্গীত রাজ্যে বাঙ্গালীর অপূর্ণ অবদান। কীর্তন গানের সুর বৈচিত্র্য, অদ্বৈত। ইহার তাল ও মাত্রা যেমন অদ্ভুত তেমনিই জটিল। অনেক বাঙ্গালীর ধারণা কীর্তন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের মতন সুর, তাল মাত্রাসহ গীত হয় না—ইহা তাহাদের

অনভিজ্ঞতার ফল। এই পুস্তকের ভূমিকাগুলিতে খগেনবাবু, ডাঃ অমিয়নাথ সান্নায়া ও শ্রীনবদীপ ব্রজবাসী কীর্তনের রূপ ও সুর এবং তালমাত্রা সম্বন্ধে শিক্ষণীয় বহু তথ্যের সমাবেশ করিয়া পুস্তক খানির মূল্য ও উপকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কীর্তনের সুর ও বাদ্য অতি অধ্যবসায় সহকারে না শিখিলে প্রকৃত মহাজনী সুর বা জাত সুর দখল করিতে পারা যায় না। কীর্তন সুরের মধুর ও বিশিষ্ট ভাব প্রকাশের উপযোগী করিতে বৈষ্ণব সাধকগণ গভীর সাধনা করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ‘খেতরীর’ উৎসবেই কীর্তনের সুরের রূপ প্রবর্তিত হয়, সেই রূপকে বলে গরণহাটী সুর, সেই সময়ই মনোহরসাহী কীর্তনের জন্ম হয়। তাহার পর রেণেটি ও মন্দারিণী সুরেতে প্রবর্তন হয়। খগেনবাবু স্বরলিপি মুদ্রিত করিয়া এই সব সুরের স্বরূপ রক্ষা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। ইহাতে কীর্তনের আভিজাত্য ও উচ্চাঙ্গতা রক্ষিত হইবে।

এক সময় বাঙ্গলা দেশ কীর্তনে মাতিয়া উঠিয়াছিল—প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি পল্লীতে নৃত্য-গীত-বাদ্যের আনন্দের ফোয়ারা ছুটিত। এই সঙ্কট পরিস্থিতির সময় খগেনবাবুর পুস্তক আবার বাঙ্গালীর প্রাণে কীর্তনানুরাগ জাগরিত করিয়া বাঙ্গলার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া দিবে।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ



বীর গুরুসদয়

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

কবি গুরু ৮০বছরীনাথের সুবিখ্যাত সঙ্গীতগুলির মধ্যের
একটি গানের এই অংশটি বারোবারেই মনে পড়িতেছিল ;—

হৃৎথের বেশে এসেছ বলিয়া তোমায়ে নাহি ডরিব হে,

যেখানে বেদনা সেখানে তোমায়ে নিবিড় করিয়া ধরিব হে।

হৃৎথকে বাঁহারা ভয় না করিয়া ভয়-ভঞ্জনরূপে ভজনা
করিয়াছেন, তাঁরাই জগতে বীর নামধেয়। গুরুসদয় দত্ত
মহাশয় ছিলেন তাঁদেরই অন্ততম একজন। সবদেশেই বিশেষ
করিয়া আমাদের দেশে শোকে, প্রধানতঃ পত্নীবিয়োগ শোকে,
ছন্দে বন্ধে কাব্যসাধনার রীতি বেশ একটু সুপ্রচারিত। ছোট
বেলায় আমার পিতামহের প্রেস ‘বুদ্ধোদয় প্রেস’ হইতে মুদ্রিত ও
প্রকাশিত ‘বিরহ শোক’ নামে একান্ত বিরহবিধুর এক প্রেমিক
পতির অগ্রশ্রু অশ্রু-উৎসের সহিত পরিচিত ছিলাম। তারপর
‘বিরহগাথা’ প্রভৃতি পদ্য এবং ‘উদ্ব্রান্ত প্রেম’ প্রভৃতি পুস্তক ও
পুস্তিকা এবং মাসিক পত্রে বহুতর মর্ম্মাহত পত্নীবিয়োগ-বিধুরের
শোকাশ্রয় পরিচয়ে আমাদের আসিতে হইয়াছে।

আমি এমন কথা বলি না যে সে সকল কথা
প্রকাশের কোন মূল্য নাই। আছে বই কি, নিশ্চয়ই আছে।
জীবন সঙ্গিনীর সঙ্গ বিচ্যুত যক্ষের পরিকল্পনা জগতের
সর্বশ্রেষ্ঠ বিরহবেদনার মূর্ত্ত প্রকাশ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম
ব্যথাকাব্য! মনে হয়, কবি প্রিয়ার সঙ্গ বিরহিত, কবির
অন্তরোৎসারিত না হইলে কখনই এ কাব্য এত বড়
মর্ম্মস্পর্শী হইত না। হৃদয় শোণিত ক্ষরিত রক্তরাগে অনুরঞ্জিত

এ কাব্য নিশ্চয়ই নিছক কল্পনার তুলি দিয়া লেখা নয়, অনুভূতির
পরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণিত। কিন্তু যে ব্যথা আমার একান্ত
নিজস্ব তাহাকে সার্বজনীন করিয়া তোলা শুধু কাব্য কলার
কর্ম্ম নয়; সাহিত্য সম্পদে সমৃদ্ধ হইলে তাহার গৌরব ও
স্থায়ীত্ব অবশ্যই সর্বকুল স্বীকৃত হয়, ইহা সত্য; কিন্তু সাহিত্য
শিক্ষিত জনগণের বিলাস-ব্যাসনের মধ্যকার একতম মাত্র। যে
কাব্য যত উন্নত স্তরের তাহার স্থান ততই সমাজ জীবনের
সঙ্গীর্ণ স্তরে, ততই দৃঢ়বদ্ধ মণি মঞ্জুরার গোপন অভ্যন্তরে তাহার
স্থান, তাই তাহাকে ঠিক সার্বজনীন বলা যায় না। আর কাব্য
হিসাবে বাহা একান্ত ব্যর্থ, তাহা অজবিলাপ, রতিবিলাপ বা
মৈথুন্য নহেই; ব্যক্তি বিশেষের বিয়োগাতুর চিন্তের আন্তর্জন্মন-
ববের মতই ক্ষণিকের অভিব্যক্তি মাত্র। একদিনই তা শ্রোতার
নেত্রে সমলতা আনিয়া দিয়া গুষ্ঠপ্রান্তে সহানুভূতির যুগ্মধ্বনি
আনিয়া দেয়, তারপর বিশ্বতির মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দেয়।

গুরুসদয় দত্ত ও তাঁর যৌবন-মধ্যাহ্নেই তাঁর জীবন সঙ্গিনী
মনোমত পত্নী-বিয়োগ শোকে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি তাঁর
প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে কাব্যে না হইলেও ভাষা সাহিত্যে তাঁর
জীবনকথা রচনা করিয়াছিলেন। সরোজনিনী বইখানি
আমায় তিনি পাঠাইয়া দেন, আমিও তাহা অনেকের মতই
মন দিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শুধু যদি এইটুকু করিয়াই
তিনি নিবৃত্ত হইতেন, আজ গুরুসদয়-পত্নীকে স্মরণে রাখিতে
পারিতেন কয়জন? পরিচিত বা আত্মীয়ের কথা অবান্তর,

বাহিরের লোকে এই নামটাকেই বা চিনিত কে? কিন্তু এই মহাবিরহী তাঁর বিরহ-সঙ্গীতের যে উচ্চ সুরগ্রাম সমগ্র দেশের বাতাসে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহার রেশ আজও বাংলায় এবং তাহার বহিরাংশেও প্রতিধ্বনিত হইয়া রহিয়াছে এবং রহিবে। সে গান প্রত্যেক নরনারীর কানের মধ্য দিয়া মর্মে পশিয়া প্রত্যেককে প্রত্যেকের জন্য কর্তব্য শিক্ষা দিবে। তাহার মর্ম কথা এই যে, যাহাকে অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছি, তাহাকে হারাই নাই, হারাব না; তার স্বজাতীয়া সমুদয় মহিলার মধ্যে তাকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়া অমরত্ব প্রদান করিব। এ প্রেম বাস্তবিকই নৈশ্বর্গিক, স্বর্গীয়। এই ভারতবর্ষের পূণ্যভূমি একদিন সতীদেহধারী মহাদেবের এমনই অসীম প্রেমের প্রেরণায় সৃজিত হইয়াছিল বাহ্য মহাপীঠের পূর্ণ উপাদানে। আগ্রার তাজমহল ও এর কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য! তাজের মহিমা সুন্দরী প্রেয়সীর প্রতীক কলনায় রূপবিলাসী সত্ৰাটের সৌন্দর্য্যসাধনার গৌরবে, কিন্তু বিশ্বহিতৈষণার ভিত্তিতে সারা দেশের চিত্তকে ধর্ম বন্ধনে নিবদ্ধ ও একীভূত করিয়া সারা ভারতের অখণ্ড প্রদান সতীদেহবিভক্ত মহাপীঠ স্থাপনায় করা হইয়াছিল। ৬শুরুসদয় দত্তের এই বিরহ কাব্যও যে সেই ভিত্তি লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য সরোজনলিনী শিল্প আশ্রম এবং তাহার বহুব্যাপী শাখা প্রশাখা দ্বারা সমগ্র দেশে বিপন্ন নারীজাতির রক্ষা ও শিক্ষা বিধান প্রবর্তন করা। একে ধর্ম্ব অপরে কর্ম্ম, এই দুইটাই মাল্লবের

জীবন-ক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দুইটা অংশ দুইটা রূপে প্রতীয়মান হইলেও একটা পথ। ভারতবর্ষ সতীদেহরূপী এক এবং অখণ্ড, প্রেমিক বিরহী দেবাদিদেব তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

৬ভূদেবের রচিত মাতৃভূমির বন্দনা যাহা বন্ধিমের বন্দেমাতরম গানের উপাদান তাহাতেই আমরা দেখিতে পাই এই পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যকে দান করিয়াছিলেন;—

মাতনামি সবতং সতীদেহরূপাং
মাতনামি বসুধাতল পূণ্য তীর্থাং
মাতনামি পদযুগ্ম ধৃতং সমুদ্রাং
মাতনামি হিম গৌর কিরীট ভূষাং।

আজ শুনিতে পাই ভারতবর্ষ কখন এক ছিল না। ৬শুরুসদয় দত্ত নারীদেহতীর্থস্বরূপ ধর্ম্মভূমিতে নারীনামরূপ কর্ম্ম-ভূমির পরিকল্পনায় অতি বিচক্ষণতারই পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলেন। নারীকে ঐ শক্তির প্রতীকরূপে না দেখিলে এ ভরসা কেহ করিতে পারে না। ‘স্বীয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু’ এই মহামন্ত্র সহায় করিয়াই তিনি বিপন্ন নারীজাতির জন্ত যে মুক্তি-ক্ষেত্রের পথ প্রদর্শন এবং পরিচালনা করিয়া দেশবাসীকে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, সেজন্ত সমস্ত নারী-সমাজ তাঁহার ‘নিকট কৃতজ্ঞ, তিনি তাদের পিতার ও পুত্রের, গুরু ও বান্ধবের কার্য্য করিয়াছেন।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

বসন্তকুমারী বিধবাপ্রমের পারিতোষিক বিতরণ

সম্প্রতি পুরীর বসন্তকুমারী বিধবাপ্রমের সংগঠিত শিল্প ও সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভা মাননীয় ক্রীমতী হেমলতা দেবীর সুপরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ক্রীমতী প্রতিভা শেন বি এ, বি টি, পারিতোষিক বিতরণ করিয়া স্বদূর প্রবাসে ছাত্রীদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় মেয়েদের বিদ্যালয় বন্ধ

কলিকাতার পরিস্থিতি এখনও অপরিবর্তিত থাকায় সরকারী শিক্ষা-বিভাগ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের স্কুল কলেজ

খুলিবার পরামর্শ দিতে পারিতেছেন না। অথচ সব ছাত্রীরা এমারজেন্সী সার্টিফিকেট লইয়া মফস্বল সহরের বিদ্যালয়ে যোগ দিয়াছেন, তাহাতে পাঠের সুবিধা পাইতেছেন না। হয় স্থান অভাব কিম্বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের অভাব। এমন অবস্থায় মেয়েদের পাঠের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটতেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান-কলিকাতার বাহিরে তাহাদের শাখা খুলিয়াছে (যেমন সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়, বিদ্যাগার বাণী ভবন, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় প্রভৃতি) কিন্তু তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। এ সম্বন্ধে বাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সুব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গলার মেয়েদের পড়ায় সমুহ ক্ষতি হইবে।

শৈশবে সদয়

৮তারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩) পরিবার

আমি যখন বীরশ্রী ছিলাম তখন গুরুসদয়ের পরিবারে নিম্নলিখিত লোকসকল ছিল।

- (১) রাধাকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী (গুরুসদয়ের জ্যেষ্ঠতাত)
- (২) রামকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী (গুরুসদয়ের পিতা)
- (৩) রাজচন্দ্র দত্তচৌধুরী (রাধাকৃষ্ণ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র)
- (৪) গিরিশচন্দ্র দত্তচৌধুরী (রাধাকৃষ্ণ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র)
- (৫) বৈকুণ্ঠচন্দ্র দত্তচৌধুরী (রাধাকৃষ্ণ দত্তের তৃতীয় পুত্র)
- (৬) রোহিনীকুমার দত্তচৌধুরী (রামকৃষ্ণ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র)
- (৭) রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী (বড় গৃহিনী)
- (৮) রামকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী (ছোট গৃহিনী)
- (৯) ব্রহ্মময়ী (রাধাকৃষ্ণ চৌধুরীর বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা)
- (১০) লাবণ্যময়ী (রাধাকৃষ্ণ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা)
- (১১) রাসমণি (রামকৃষ্ণ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা)
- (১২) সুনীলা সুনন্দরী (রামকৃষ্ণ চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যা)
- (১৩) মনোরমা (রামকৃষ্ণ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা)
- (১৪) রাজচন্দ্র বাবুর স্ত্রী
- (১৫) গিরিশবাবুর স্ত্রী
- (১৬) বৈকুণ্ঠের স্ত্রী
- (১৭) সারদা সুনন্দরী (রাজচন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা)
- (১৮) জ্ঞানদা সুনন্দরী („ „ ২য় কন্যা)
- (১৯) ক্ষণদা সুনন্দরী („ „ ৩য় কন্যা)
- (২০) মানদা সুনন্দরী („ „ ৪র্থ কন্যা)
- (২১) রাজেন্দ্র (রাজচন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র)
- (২২) রবীন্দ্র („ „ ২য় পুত্র)
- (২৩) শিশু („ „ ৩য় পুত্র)
- (২৪) নরেন্দ্র দত্ত (ব্রহ্মময়ীর পুত্র)

প্যারীর মা, প্যারী, মুরারী, বিহারী ও প্যারীর স্ত্রী, কুমুর

মা, কুঞ্জের ঠাকুরমা, কুঞ্জ, জয়রাম, জয়রামের মা, ভয়ী ও স্ত্রী, কয়, কহুর মা, কহুর স্ত্রী (ভাগ্যবীণা)

আমি বীরশ্রী থাকিতে থাকিতে সুনীলা, লাবণ্য, মনোরমা ও সারদার বিবাহ হইয়া যায়। আমি বীরশ্রী ছাড়িলে পর জ্ঞানদা, মানদা প্রভৃতির বিবাহ হইয়াছে। রাজচন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র আমি থাকিতেই করিমগঞ্জ স্কুলে পড়িতেছিল—এখন বি, এ, পাশ করিয়াছে এবং শুনিতেছি বিবাহও করিয়াছে।

৮রামকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রোহিনী অতি অল্প বয়সে মারা যায়। আমি বীরশ্রী যাইয়া মাত্র ২৬ দিন তাকে পড়াইতে পারিয়াছিলাম। অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে সান্নিধ্যপাতিক জরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। সে মাত্র মধ্য ইংরেজি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল। বৈকুণ্ঠ খুব তেজস্বান ছিল। তাকে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে আমিই ভর্তি করাইয়া দেই। সেক্রেটারী মহাশয় ইহার খরচ দিতে বিশেষ কার্পণ্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সে নিজ গুণে ফ্রি ও বৃত্তি উভয়ই পাইয়া অনেকটা কষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। আমার প্রতি তাহার অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। সে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হইয়া সমস্ত মেডেল একা পাইয়াছিল। তাহার নাম এখনও উক্ত মেডিকেল স্কুলের কৃতি ছেলেদের নামের লিষ্টে আয়নার বন্ধ হইয়া লটকান আছে।

শ্রীহট্টের টাউন তাহার কার্যক্ষেত্র ছিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই চিকিৎসায় এত যশঃ উপার্জন করিয়াছিল যে অনেকে শিবিল সার্জেনকে না ডাকিয়া বৈকুণ্ঠকে ডাকিত। দ্রুত কালাজরে তাহার ও তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

ব্যারামে পড়িয়া বৈকুণ্ঠ অনেকদিন ভুগিয়াছিল। শেষ কালে আমার স্ত্রীর হাতে থাইয়া মরিবে অভিশাপ করায় তাহাকে আমার বাড়ী আনিয়া চিকিৎসা করাই কিন্তু বিদ্যাতার কলম ফিরিল না। ঢাকার বাসায় কার্তিক মাসে তাহার মানব

লীলা সাধ হইল। ঢাকার পোল্ল সোনার শ্মশান বাটে তাহাকে দাহ করিয়া আমরা শূন্য হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম। এই সময় সদয় শ্রীহট্টে গবর্ণমেন্ট স্থলে পড়িতেছিল।

বৈকুণ্ঠ স্কন্দর, সবল, পরোপকারী এবং বিচক্ষণ মানুষ ছিল। এখনও শ্রীহট্টের লোক তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে নাই। শ্রীহট্টের নিকট ছালাপী তাহার শ্মশরালয় ছিল। সে কোন সন্তান সন্ততি রাখিয়া যায় নাই।

গিরিশু, পঞ্চাঙ এবং রাজচন্দ্র বাবু ঢাকা দক্ষিণ বিবাহ করিয়াছিল। গিরিশ নিঃসন্তান।

গিরিশ বাবু চা বাগিচার বাবু ছিলেন। ক্রমে ম্যানেজার পদাশ্রিত হন। কিন্তু মাথার দোষ থাকায় অল্পদিনেই তাঁহাকে

কার্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহার শরীর হৃষ্টপুষ্ট এবং বুদ্ধি বিচক্ষণ ছিল কিন্তু মস্তিষ্কের চাঞ্চল্যে সমস্ত নষ্ট হয়। তাহারারা সংসারের বিশেষ কিছু উপকার হইতে পারে নাই; পিতার প্রতি তাহার বিস্তর অভক্তি ছিল কিন্তু খুড়াকে (রাম কৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়কে) বিশেষ ভক্তি করিত। অল্পদিন হয় শিলচরে তাহার মরণ হইয়াছে।

রাজচন্দ্র বাবু করিম গজের মুসেকীর একাউন্টেন্ট ছিলেন। পরে মৌলবী বাজারে সেরেস্টাদার হন। এখন পেন্সন পাইয়া বাড়ী আছেন। ইহার ব্যবহার বড়ই স্ত্রীতিকর। আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং আমিও তাঁহাকে সোদরবৎ জ্ঞান করি।

গুরুসদয় দত্ত মৃত্যুবার্ষিকী

ব্রতচারী নৃত্যের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের মৃত্যু বার্ষিকী [উপলক্ষে] গত ২৫শে জুন অপরাহ্নে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে হলঘরটি পত্রপুষ্পে সুশোভিত করা হইয়াছিল। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সভায় সভাপতিত্ব করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নরনারী স্মৃতিসভায় যোগদান করিয়া মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভার প্রারম্ভে প্রবীন ডাঃ সুনন্দরীমোহন দাস পরলোকগত গুরুসদয় দত্তজীর আত্মার কল্যাণ বিভূর চরণে প্রার্থনা করেন।

সমবেত ব্রতচারীগণ নাথকআলা শ্রীনবনীধর বন্দ্যোপাধ্যায়-জীর নেতৃত্বে গুরুসদয় দত্তজীর রচিত প্রার্থনা সঙ্গীত, বঙ্গভূমি বন্দনা, নৃত্য ও গীত করিবার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস গুরুসদয় দত্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, স্বর্গীয়

গুরুসদয়ের সংস্পর্শে আসিবার বাহারই সৌভাগ্য হইয়াছে তিনিই তাঁহার প্রাণের প্রাচুর্য ও অক্ষুরন্ত জীবনীশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহাকে কেহ কোনদিন নিশ্চল অবস্থায় থাকিতে দেখেন নাই। তাঁহার ব্রতচারী নৃত্য আন্দোলন ও নারীশিক্ষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্পর্শ করিয়াছে। তিনি তাঁহার কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন।

শ্রীঃ এ. কে. এম. জ্যাকেরিয়া বলেন, বাঙ্গালী তাঁহার জাতীয় নৃত্য, গীত ও শিল্পের মধ্য দিয়া আপনার সত্তাকে চিনিয়া লইবে, স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই বাঙ্গলার নিজস্ব নৃপু নৃত্য গীতাদি উদ্ধারের জন্য জীবনপাত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই মহৎ কার্যে তাঁহার সহধর্মিণীর অনুরোধে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী যুক্তভাবে বাঙ্গলার সংস্কৃতির ভাণ্ডারে যে দান দিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য এখনও পূর্ণভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত মুণালকান্তি বসু বলেন, স্বর্গীর গুরুসদয় দত্ত অশেষ গুণের আধার ছিলেন। তিনি যে বিভিন্ন প্রকারের অসাধারণ কর্ম করিয়া গিয়াছেন তাহার যে কোন একটিই আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে তাঁহাকে চিরদিন উজ্জ্বল রাখিতে পারিত।

ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখার্জী বলেন, দেশে স্বাধীনতা প্রসার স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের জীবনের এক ব্রত ছিল। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙ্গালী—এ বাঙ্গালী গৃহকোণে আবদ্ধ বাঙ্গালী নয়—শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল ভারতীয় শিক্ষার এক প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করিতেন, বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালীজাতির দান করিবার মত যথেষ্ট প্রাণের সম্পদ ও ঐশ্বর্য আছে। তাঁহার ব্রতচারী নৃত্য সম্পর্কে দেশবাসী ও রাজপুরুষ এই উভয়ের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। কালে তাহা দূর হইয়াছে। তাঁহার দানের পরিপূর্ণ স্মৃতি এখনও হয় নাই। তিনি বাঙ্গালীর শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার আশা ছিল, ভারতের অস্বাভাবিক প্রদেশের কুটির সহিত বাঙ্গলার কুটি মিশিয়া পৃথিবীর এক উজ্জ্বলতম শিক্ষাদীক্ষার প্রকাশ হইবে। হয়তো ভবিষ্যতে তাঁহার আশা ফলবতী হইবে। আমি তাহাকে নব্য বাঙ্গলার অস্বাভাবিক প্রশংসা বলিয়া মনে করি। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মিঃ কে এ এইচ ছিল, আই সি এস ; এম, এন, মুরসেদ ; সার বি, পি, সিং রায় ; রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ; মিস এস্ বি গুপ্ত ; মিঃ প্রফুল্ল সরকার ; মিঃ হেমচন্দ্র নন্দর ; শ্রীযুক্তা অমরুপা দেবী ; শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার এম, এল, এ ; মিঃ জে, পি, আগরওয়াল ; প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ; মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ; শ্রী মন্মথনাথ মুখার্জী ; অর্থার মুর ; মিঃ এন কে বসু ; মাননীয় এস, সি, মিত্র প্রভৃতি অমুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া

‘তার’ ও পত্র প্রেরণ করেন। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, ব্রতচারী সমিতি ; মিস এন বি সোম ; মিঃ ভাঃ বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি প্রতিষ্ঠানগুলি মালা, পুষ্প বীধি, পুষ্প, গ্রন্থ প্রদান করেন।

সরোজনলিনী নারী-শিক্ষালয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি

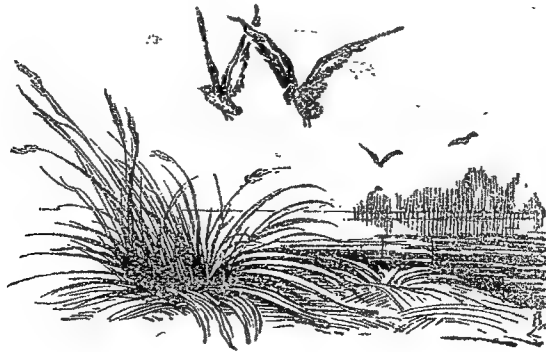
বর্তমানে উক্ত বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ ও ট্রেনিং বিভাগ কৃষ্ণনগরে পরিচালিত হইতেছে। সেই বিদ্যালয় গৃহে প্রাতে সকল কর্ম্মী ও ছাত্রীগণ সমবেত হইয়া প্রার্থনা ও গুরুসদয়জীর প্রতিমূর্তিকে স্মরণ পুষ্প মালায় বিভূষিত করত সশ্রদ্ধ স্মৃতি তর্পণ করেন।

মিস্ প্রতিভা সেন, হেড মিস্ট্রেস্ ; ট্রেনিং ছাত্রী কুমারী অরুণা গুপ্তা ও মিসেস্ উষারানী রায় গুরুজীর জীবনী আলোচনা করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গান হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে স্কুল বন্ধ থাকে।

অপরূপে উক্ত সহরে খুষ্টান পল্লীতে একটি সভায় গুরুজীর স্মৃতির তর্পণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মিস্ হেমলিনী মল্লিক গুরুজীর জীবনী পাঠ করেন। কয়েকজন ছাত্রী মিলিয়া ব্রতচারী নাচ গানের অভিনয় প্রদর্শন করেন। সভান্তে মিষ্টান্নও বিতরিত হইয়াছিল।

ঐ তারিখে ২৩।১ বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে সরোজনলিনী সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়েও গুরুজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্ম কর্ম্মীগণ সমবেত হইয়া প্রার্থনা করেন। গুরুজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্ম কলিকাতার কার্যালয় বন্ধ থাকে।



এই গ্রীষ্মেই দেখুন না !

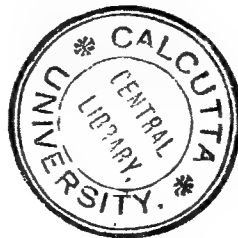
সুপরিচিত ইংরেজ নিবন্ধ লেখক রবার্ট্‌ লিও প্রায়ই “ওয়াই, ওয়াই” এই ছদ্মনামে লিখে থাকেন। সম্প্রতি একটি নিবন্ধে উনি বলেছেন যে কড়া ভারতীয় চায়ের সঙ্গেই তাঁর সব চেয়ে স্বথের স্মৃতিগুলি জড়িত আছে। নিজের জীবনের পুরানো দিনের স্মৃতিগুলো স্মরণ করে “ওয়াই, ওয়াই” লিখছেন :

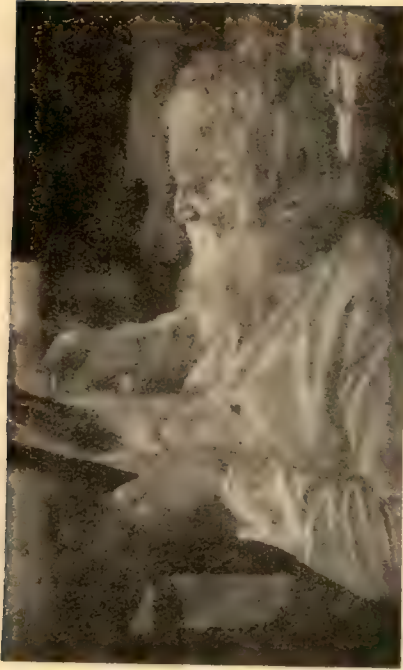
“অল্প বয়সে কোনো এক রোজকরোজ্জল দিনে, সমুদ্রতীরে রোজে স্নান করে’ রোজের মধ্যে হেঁটে, রোজের মধ্যে শুয়ে থাকার পর বাড়ী ফিরে খাবার টেবিলে এসে বসা, এবং সেখানে মাখন দেওয়া নানারকম গরম গরম সুখাদ্যের সঙ্গে মস্ত এক পেয়ালা—কিংবা হু’ পেয়ালা ভর্তি আঙ্গুরের মতো গরম ভারতীয় চা খাওয়ার মানে ছিলো চোখের, জিহবার এমন কি সমস্ত সত্তার মধ্যে একটা গভীর আনন্দ অহুভব করা। চা খেতে খেতে কী অপূর্ব অল্পভূতিই না বোধ করতাম! টের পেতাম সমস্ত কপালটা ঘামে ভিজ়ে উঠছে! বাইরের প্রচণ্ড সূর্যের মতো, সমুদ্রের উজ্জ্বল হাওয়ার মতো, আটলান্টিক সমুদ্রের নীল জলের মতো, সেই চা-ও তখন আমার কাছে এক অপূর্ণ—এমন কি এক নিখুঁত জগতের অংশ বলেই মনে হতো।

“যে কোনো সময়েই চা আমাদের একটা প্রয়োজনীয় কাজ

করে’ দেয়,—অন্তত হু’এক মিনিটের জন্তেও আমাদেরকে জীবনের চাপ থেকে মুক্ত করে। কিন্তু সবচেয়ে ভালোভাবে উপভোগ করতে হলে চা খেতে হয় গরমের দিনে, আর চা-টাও খুব গরম হওয়া দরকার। এই জন্তেই একথা মনে হতে হয় যে সূর্যের তেজ যখন সবচেয়ে বেশি তখনই চায়ের গুণ ভালো করে’ প্রকাশ পায়। অবশ্য পৃথিবীর উল্টো পিঠে (অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে) যারা বাস করে তাদের সম্বন্ধে আমি এ-কথা বলতে পারবো না। কেননা আজো তারা অষ্টাদশ-শতাব্দী-মূলত চা-প্রীতি বজায় রেখেছে, এবং যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো সময়ে এবং যে-কোনো ঋতুতেই তারা সমান উল্লাসের সঙ্গে চা খায়। আজ যদি ডক্টর জনসন্ বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো তিনি স্কটল্যান্ডের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পাড়ি দিয়ে অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড-এ গিয়ে উপস্থিত হতেন। কেননা অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের লোকেরা যে-পরিমাণ চা খায়, তাতে তারাই হয়তো ডক্টর জনসনের মতে চায়ের প্রকৃত ভক্ত বলে’ গণ্য হতো।”

“ইংরেজরা চায়ের মর্ম জানে, তাই তারা খায় গরম চা—তা সে শীতেই হোক, কি গ্রীষ্মেই হোক; গ্রীষ্মমণ্ডলেই হোক অথবা মেরুমণ্ডলেই হোক। তারা বিশ্বাস করে যে গরমের দিনে গরম চা খেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। এবার গ্রীষ্মে আপনারা এটা পরীক্ষা করে’ দেখতে পারেন।”





বঙ্গলক্ষ্মী

১৭শ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৪৯

৯ম সংখ্যা

বাইশে শ্রাবণ

এল রে এল রে ফিরে বাইশে শ্রাবণ,
বরষার ধারা সাথে অক্ষর প্লাবন
মিশি হল এক,—চক্ষু হারাইল দিশা
কবির আনন্দছবি ঢাকিল কি নিশা
পূর্ণিমাবাসরে—আসি দিবা দ্বিপ্রহরে
এক ঘর হ'তে তাঁরে নিতে অশ্রু ঘরে।

জনতার স্রোত, দাঁড়াল ঘিরিয়া, করি
যাত্রা-পথ রোধ—দিবে না লইতে হরি
আনন্দ তাদের ;—সে তো মানিল না বাধা
অযুত চক্ষুর দৃষ্টি করি দিয়া আঁধা—
আশীর্ব্বাদ বাণী দিয়া ভুলাইয়া সবে
যাত্রা করিলেন কবি শ্মশান-উৎসবে।

শ্মশানে ফুটেছে ফুল, পাখী গান গায়,
নিদ্রিত আছেন কবি তারি স্নিগ্ধ ছায়।

যোগ ও যোগের সাধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা

[সত্য উপলব্ধির ভারতীয় আদর্শের প্রতি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। সকল দেশের, সকল জাতির সকল রকম সাধনার বিষয় আলোচনা করেছেন তিনি বহুরকমে বহুবার। নিজের প্রাণের রস দিয়ে সেই সকল সাধনার রস অনুভব করার চেষ্টাও করেছেন তিনি নানা সময়ে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের কথা আমরা শুনেছি তাঁর মুখে অনেক সময়। কিন্তু পরম চৈতন্যে আত্মচৈতন্য সমাহিত করার উপলব্ধিতে তাঁর প্রাণ যে-রকম ওতঃপ্রোত ছিল, এমনতরটি আর কোন কিছুতে নয়। অন্তরের পথ ধরে এই সাধনাতেই তিনি চলে এসেছেন চিরজীবন। শেষ ফল দিয়ে গেছেন সর্বমাহুয়ের জন্ত শেষ প্রাপ্তি—অক্ষয় শক্তির অধিকার।]

আমাদের দেশের সাধকেরা ধর্মসাধনার একটা বিশেষ প্রণালী ও লক্ষ্য অবলম্বন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যের একটা বিশেষ দিক আমাদের পিতামহদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব সে একটা বিশেষ সম্পদ, কেবল আমাদের পক্ষে নয়, সকল মানুষের পক্ষেই।

বিজ্ঞানে সত্যসাধনার একটি বিশেষ পন্থা আছে। এই পন্থা অবলম্বন করে মানুষ একটি বিশেষ সিদ্ধিলাভ করেছে সন্দেহ নাই। অতএব এই বিজ্ঞানের পন্থাকে যে পশ্চিমদেশ-বাসীরা নিজের অধ্যবসায় দ্বারা প্রশস্ত ও বাধ্যমুক্ত করছেন তাঁরা কেবল নিজেদের নয় সমস্ত মানুষের একটি বিশেষ শাক্ত দান করছেন।

ভারতের বে পন্থা তারও একটি সিদ্ধি আছে। অতএব সচেতন হয়ে এই পন্থাকে নিরন্তর প্রশান্ত রাখার একটি বিশেষ দায়িত্ব ভারতবাসীর আছে। যে সাধনার দ্বারা ভারতের চিন্তা-শিখর থেকে প্রবাহিত হয়েছে, তাকে যদি মোহবশতঃ লুপ্ত হোতে দেই, তাহলে আমরা নিজে বঞ্চিত হব। অন্তর্কে বঞ্চিত করবো।

সাধারণতঃ পশ্চিমের মানুষ বলে থাকে, চলাটাই লক্ষ্য, পাওয়াটা লক্ষ্য নয়। চরম পাবার জিনিষ কিছু আছে কি না সে সম্বন্ধে সেখানে সন্দেহ রয়ে গেছে। দিনের মজুরী দিনে দিনে চুকিয়ে নেওয়া, চলতে চলতে টুকরো টুকরো জিনিষ জমিয়ে তোলা—এইটে হচ্ছে সেখানকার কথা। সেখানকার বন্দোবস্ত রাস্তার বাতি জালিয়ে চলা, ঘরের বাতি জালানো নয়।

ভারতে এই চলমান সংসারের অন্তরে একটি পরম সত্যকে স্বীকার করা হয়েছিল এবং সেই সত্যকে নিজের মধ্যে পাওয়াই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বলে এখানে গণ্য হয়েছে। এই পরম সত্যে পৌছবার প্রণালীটি ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল; সেটি কী তা এই যোগ শব্দের দ্বারা জানা যায়; সেই কথাটাকে একটু স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া চাই।

যে সত্যকে মানুষ সাধারণতঃ ঈশ্বর নাম দিয়ে থাকে সেই সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের বিধিকেই আমরা ধর্ম বলি।

কোনো কোনো ধর্মে বলে, এই সম্বন্ধের বিস্তৃতিতা অমূল্যেরে আমরা পুরস্কার পেয়ে থাকি। সেই পুরস্কারকে কখনো পুণ্য বলি, স্বর্গ বলি, কখনো পরিত্রাণ বলি। যা-ই বল না কেন, এর একটা বাহ্য মূল্য আছে।

ঈশ্বর বিধাতা, তাঁর বিধান পালন দ্বারা আমরা তাঁর প্রসন্নতা পাই; সেই প্রসন্নতাই আমাদের কল্যাণ। অতএব বিধাতার বিধান পালনের যে ধর্ম সেই ধর্মকে আশ্রয় করবার একটা হিসাব পাওয়া গেল।

এই পন্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের পন্থার এক জায়গায় মিল আছে। বিজ্ঞানের নির্দেশ -ই যে বিশ্বের অমোঘ নিয়ম-গুলিকে যদি আমরা জানি এবং তাদের যদি মানি তাহলে শক্তি লাভ করি, ঐশ্বর্য লাভ করি। নিয়মের জগতে নিয়ন্ত্রার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে দত্ত পুরস্কারের ভয়ে ও লোভে

দেওয়া ও পাওয়ার সম্বন্ধ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দেওয়া পাওয়া হচ্ছে বস্তু-নীতিগত, আর ধর্মক্ষেত্রে সেটা কর্তব্যনীতিগত। ধর্ম বিহিত এই কর্তব্যনীতি কোথাও শাস্ত সত্যের অন্তর্গত কোথাও কৃত্রিম আচারগত। যেখানে তা শাস্ত সত্যের বিরোধী নয়, সেখানে মানুষ তা পালন করে কল্যাণ লাভ করে, যেখানে তা কৃত্রিম আচারমাত্র সেখানে তাকে আশ্রয় করে মানুষ দুর্গতির জালে জড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশে পদে পদে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। এই আচারকে ধর্ম বলা আর যাহুবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা একই কথা।

কিন্তু ভারতবর্ষ যাকে পরম সত্য বলছে, যাতে উত্তীর্ণ হবার প্রণালী হচ্ছে যোগ, তার সঙ্গে পাওয়ার সম্বন্ধ নাই, হওয়ার সম্বন্ধ। বস্তুত সত্য হওয়া ছাড়া সত্যকে পূর্ণভাবে পাওয়ার কোনো অর্থই থাকে না।

মানুষের দুটো দিক। একদিকে সে স্বতন্ত্র, আর একদিকে সে বিশ্বতন্ত্র। আহায়ে ব্যবহারে সঙ্করে কর্মক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য আমাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। একে বাঁচাতে গেলে বিশ্বের নিয়মকে মানা চাই। নইলে চারিদিকের টানে ধূলিসাৎ হতে হবে। এই নিয়মকে আপনার আয়ত্ত করে স্বাতন্ত্র্যকে বলিষ্ঠ করে তোলা যুরোপের স্বভাবগত। এতে বিশ্বনিয়মের সঙ্গে ক্রমাগত তাকে বোঝা-পড়া করতে হয়।

ভারতবর্ষ সত্যের সেই দিকে ঝোঁক দিয়েছে যে দিকে মানুষ বিরাট। এই যে বিশ্বের মধ্যে আমি বিরাজ করছি একে যে পরিমাণে আপন না করবো সেই পরিমাণেই আমি অসত্য থাকব। সমস্তের মধ্যে প্রবেশ করে তবে আমার পূর্ণতা হবে।

সেই প্রবেশের মানে এই নয় যে, আয়ত্তনের দ্বারা বিশ্বকে অধিকার করা। সেই আয়ত্তনের দিকে সীমার কোথাও শেষ নাই। বস্তুত অফুরান সীমা অসীম নয়। বিশ্বের সত্যের মধ্যে প্রবেশই বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ।

একখানা গ্রন্থকে তার বস্তুর পরিমাণ আর শব্দ পরিসরের দ্বারা পরিমাপ করতে গেলে সেই বোঝা দুঃসাধ্য বৃহৎ হয়ে পড়ে। তার মূল তত্ত্বটির রস পাবামাত্র সমস্তই পাওয়া যায়। যা কিছু সমস্তের মধ্যে এই প্রবেশের প্রয়াস ও প্রণালী হচ্ছে যোগ। কিন্তু পূর্বেই আভাস দিয়েছি, সমস্ত মানে সমষ্টি নয়। তাকে ওতপ্রোত করে এবং অতিক্রম করে যে সত্য বিরাজ করেন সেই ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশই যোগের লক্ষণ।

প্রণবো ধনুঃ সারোহায়া ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

এই যে যোগ, এ মনের কর্ম নয়। মন আপনার সঙ্গে পরের ভেদ ঘটিয়ে সংসারযাত্রার কাজ চালায়। যোগসাধনের প্রধান অঙ্গই হচ্ছে মনকে ভোলা। যারই সঙ্গে যোগে মনের ব্যবধান ঘুচে যায় তারই সম্বন্ধে আত্মার গভীর আনন্দ ঘটে। কারণ আত্মা বাধ্যমুক্তরূপে সেখানে আপনাকে প্রসারিত করে।

আত্মার এই যোগের পথে মনকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়। কোনো কিছু অর্জনে মন কর্তা নয়, উপলব্ধিতে মন কর্তা। যাকে আমরা বাইরে রাখি তাই অর্জন, যা অন্তরের জিনিষ তাই উপলব্ধি। এই অর্জনের রাজ্য হচ্ছে অঙ্কশাস্ত্রের রাজ্য। এখানে সংখ্যা এবং আয়ত্তন এবং ওজন। এখানে সংগ্রহ করা এবং সঞ্চয় কেবলি পরিমাণের পথে এগোতে থাকে। কোথাও তার পর্যাপ্তি নেই। সেখানে শত যে সে দশশতের এবং দশশত লক্ষের দিকে অঙ্কের মত চলতে থাকে।

উপলব্ধির রাজ্য হচ্ছে পরিমিত্তির অতীত রাজ্য। সেজন্তু সেখানে পৌঁছানোর মধ্যে সমাপ্তি আছে অথচ সমাপ্তি নাই। সেখানে আত্মা পূর্ণতার স্বাদ পায়। এই পূর্ণতার অব্যবহিত অল্পভূতিই আনন্দ। তারই কথা উপনিষদে আছে—

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা হ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

স্বাগতম*

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

স্বাগত সুধীজন। আপনারা বাণীর বরপুত্র, বঙ্গভাষা-জননীর সুসন্তান; আপনাদের সান্নিধ্যলাভ করিয়া আমি ও আমার পরিজনবর্গ আজ পরম প্রীতি ও তৃপ্তিলাভ করিতেছি। সংসার বিষবৃক্ষের তিক্ত ফলগুলি অহর্নিশ আশ্বাদন করিয়া মন ও শরীর দুইই একান্ত অবসন্ন; তাই আজ কয়েক নিমেষের জন্ত হইলেও আপনাদের মত সুধী ও সজ্জনের সহিত সঙ্গ ও সেই সঙ্গে বঙ্গের কবিশুদ্ধ-রচিত কাব্য-সমুদ্র মস্থন প্রস্তুত অপূর্ব অমৃত—এ বৃক্ষের এই দুইটি মধুর ফলের আশ্বাদনের সুযোগ পাইয়া আমরা নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। আপনাদিগের অভ্যর্থনা করিবার ও আনন্দ দিবার যে স্বল্প আয়োজন-আমরা করিতে পারিয়াছি, তাহা যে আপনাদের উপযুক্ত হয় নাই তাহা আমরা অনুভব করিতেছি; কিন্তু বন্ধুস্নেহ ও দার্দ্র্যগুণে আপনারা আমাদের সকল ক্রটি মার্জনা করিবেন, এ ভরসাও আমরা রাখি।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের প্রথর রোদ্র ও উত্তাপে ধরণী শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। “আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাবৃটের জলধারা আজ ধরণীকে সিক্ত করিয়া” তাহার তৃষ্ণা নিবারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এক অভিনব শ্রীতে মণ্ডিত করিতেছে। শুষ্ক ভূগণ্ডে আবার মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে; জলহীন নদনদী তড়াগাদি আজ জলে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ক্রমকুল বারিসিক্ত মাঠগুলি কর্ষণ করতঃ ধাত্ত রোপণ করিবার জন্ত স্বল্পে হল-বহন করিয়া সারিগান গাহিতে গাহিতে পল্লীর রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। কুমদকল্লার, রজনীগন্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্থলী আকাশ আজ কোথাও ঋত কোথাও ঘনকৃষ্ণ মেঘে আবৃত হইয়া নাট্যালালার ন্যায় পরিবর্তনশীল পটের আকার ধারণ করিয়াছে। বিরহী যক্ষ এমনই এক দিনে তাহার বিরহ বেদনা প্রিয়জনের নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্ত বরষার মেঘখণ্ডের প্রতি আকুলভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছিল।

আমরা বরষার নাতিশীতোষ্ণ আঙ্গিকার দিনে মিলিত হইয়াছি। বেদনা কিন্তু আমাদের অন্তরে নাই। প্রার্থনা করি, আমাদের এই মিলন সার্থক হউক।

প্রায় সার্ক এক বৎসর পূর্বে এইস্থানে আপনাদের সহিত মিলনের সৌভাগ্য আমরা আর একবার লাভ করিয়াছিলাম। তখন এই ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ এতটা বিস্তৃতিলাভ করে নাই। জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি শক্তিশালী রাষ্ট্রনিচয় তখনও যুদ্ধে যোগদান করে নাই। ভারতবর্ষ সমরাজ্ঞ হইতে তখন বহু দূরে অবস্থিত ছিল। আর আজ! বিজয়ী শত্রু ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের দ্বারদেশে। সেই কারণে কখন কি হয় এই আতঙ্কে সকল ভারতবাসীই আজ আতঙ্কিত। জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পর হইতেই কলিকাতার সহস্র সহস্র অধিবাসী কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমাদের বাড়ীর সম্মুখের রাজপথ দিয়া কত লোককেই পলায়ন করিতে দেখিলাম। তাহার ইয়ত্তা নাই। লরি, মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা ও পদ-ব্রজে বহুলোক এই রাস্তা দিয়া পলাইয়াছে। যখনই অতি ক্ষীণকায় দু’টি হয়পুঙ্খবহা হিত ছেক্সা গাড়ীর ভিতরে জন আটেক দশ পুরুষ, মহিলা, বালক, বালিকা ও শিশু, এবং গাড়ীর চাদের উপর একগাদা পুটুলি, বাক্স, প্যাট্রা, বিছানা, মায়া টিয়া পাখীর খাঁচার সমাবেশ দেখা গিয়াছিল, তখনই বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা করতালি দিয়া এবং একটা কিছু মজা হইতেছে মনে করিয়া নৃত্য করিত ও বলিত ‘ঐ দেখুন আর একদল পালাচ্ছে।’

বাড়ীর রাঁধুনি বায়ুন পালাইল, চাকর পালাইল, বাগানের উড়েমালী পালাইল, ঝিও পলাইল, সংসার অচল হইয়া উঠিল। কিন্তু আমরা পলাতকের দলে যোগদান করিলাম না। আত্মীয় স্বজন দিন দুপুর সন্ধ্যায় টেলিফোন করিলেন, অনেকে বাড়ী বহিয়া আসিয়া বলিয়া গেলেন—“আপনি করেন কি?”

আপনি বিজ্ঞ ও প্রাচীন লোক হইয়াও শ্রী পুত্র নাতি নাতিনী লইয়া এখানে দিয়া বসিয়া আছেন ত ? তারপর বোমা পড়িলে ইহাদিগকে সরাইবেন কি করিয়া ? রাস্তাঘাটত সব বন্ধ হইয়া যাইবে, শীঘ্র পালান”। বলিয়াই তাঁহারাও পলাইলেন। আমরাই রহিয়া গেলাম ! পাঁচ ছ’মাস অন্তে আরায়, তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন। দ্বিগুণ তিনগুণ বাড়ী ভাড়া দিয়া, হুটো সংসারের খরচ জোগাইয়া, দারুণ গ্রীষ্মে সিদ্ধ হইয়া, এমন কি দুই একটি চেলেমেয়েকে চিরবিদায় দিয়া, তাঁহারা আবার ফিরিয়া আসিলেন। এখন আসিয়া তাঁহারা কিন্তু উটো স্বয়ং ধরিয়াছেন—“এবাজারে কিন্তু আপনিই জিতিয়া গেলেন, আমাদের পৈয়াজ-পরজার দুই-ই হইয়াছে”। এখন তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কলিকাতায় বোমাই পড়ুক আর যাহাই হউক, তাঁহারা কিন্তু আর পলাইতেছেন না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস আছে যে যদি কোনও দিন কলিকাতায় একটা বোমাও পড়ে, সেই দিনই তাঁহারা আবার পলাইবেন।

সে কথা যাক। ভাবিতেছি যে এই ভয়াবহ যুদ্ধের শেষ কোথায়, কবে বা কিরূপে হইবে ? কেই-ই বা বলিয়া দিবে ? আমরা ভারতবাসী যুদ্ধাতঙ্কে বিহ্বল। কিন্তু যে সকল জাতি যুদ্ধমান, তাহাদের দেশে ঘরে ঘরে আজ হাহাকার। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে ; বহু সমৃদ্ধিশালী জনপদ আজ নিশিচ্ছ। বোমার নিশ্চয় আঘাতে সহর, গ্রাম, বাড়ী ঘর—কিছুই থাকিতেছে না। এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা আরো কয়েক বৎসর চলিবে শুনিতেছি। তবে এই যুদ্ধের ফল ভোগ করিবার জন্ত থাকিবে কাহার, কত জন বা কতগুলি জনপদ ?

তবে কি প্রত্যক্ষদর্শী ভগবান ব্যাসদেব ভারতের অতীত যুগের যে ভয়াবহ যুদ্ধ ও তাহার পরিণামের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এই সর্বগ্রাসী বিশ্ব যুদ্ধের পরিণাম তদনুরূপই হইবে ! কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে উভয়পক্ষেই বহু অক্ষৌহিনী সৈন্য ছিল ; ভারতের তাবৎ নৃপতিই উভয় পক্ষের এক পক্ষ না এক পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম হইল কি ? পিতামহ ভীষ্ম গেলেন; দ্রোণ গেলেন, কর্ণ, কৃপ, অভিমন্যু, দ্রুপদ্যন ও তাঁহার শত ভ্রাতা সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। কুরু-পাণ্ডবদের সন্তান সন্ততিও কেহই জীবিত রহিল না।

যুদ্ধমান বহু অক্ষৌহিনী সৈন্তের একজনও ঘরে ফিরিল না। শুধু রহিলেন ধর্মরাজ, ও তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং শ্রীকৃষ্ণ। এ সমস্তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে শুনিয়াছি। তাই জিজ্ঞাসা করি তিনি এখন যে লীলা খেলিতেছেন, তাহার পরিণাম কি হইবে ? কিন্তু এটাও বুঝি যে তাহা লইয়া ব্যস্ত হইলে কোনও ফল লাভ হইবে না। তিনিই একদিন তাহা শুনাইবেন। আমাদের বলিবার এইমাত্র অধিকার আছে “স্বয়ং হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।” তাহাই হউক, ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। মহাভারতের যুদ্ধের পর তুমি ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, এই বিশ্বযুদ্ধের পরে জগতে ধর্ম ও সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পুনরায় আপনাদিগকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি। বর্ষার দিনে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনা করিতে আপনারা আসিয়াছেন। বেশ কথা। তাঁহার মৃত্যু দিবস হইতে ‘রবিবাসরে’র বহু অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় আপনারা অনেক দিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার অনন্ত ভগবৎ বিশ্বাস ও অমুরাগের কথা কি শুনানো হইয়াছে ? যদি না হইয়া থাকে, আপনারদের মধ্যে কেহ কি তাহা শুনাইবেন না ? আমি সাহিত্যিক নই, বৈজ্ঞানিক। সাহিত্য বিশ্লেষণ আমার অনধিকার চর্চা হইবে। তবে পাঠক হিসাবে দেখিতে পাই যে তাঁহার কাব্যের মধ্যে শুধু ‘গীতাঞ্জলি’ কেন, বহু স্থানেই অনন্ত ভগবৎ অমুরাগ ও বিশ্বাস দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্ষার যতগুলি গান তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহারও প্রায় সকল গুলিতেই এই ভগবৎ অমুরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি—

আজি আঁধার ঘন গহন মোহে

গোপন তব চরণ ফেলে,

নিশার মত নীরব গুহে

সবার দিঠি এড়িয়ে এলে।

প্রভাত আজি মুদেছে আঁধি,

বাতাস বুধা যেতেছে ডাকি,

নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি

নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।

কুজন হীন কানন ভূমি
 দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
 একেলা কোন পথিক ভূমি
 পথিকহীন পথের পরে !
 হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
 রয়েছে খোলা এ ঘর মম

সমুখ দিয়ে স্বপন সম
 যেওনা মোরে হেলায় ঠেলে।”
 হে বরষার কবি, হে সকল ঋতুর কবি, হে ভগবৎ
 বিশ্বাসী ও অল্পরাগী কবি ! তোমার স্মৃতির উদ্দেশে আমি
 সশ্রদ্ধ অর্থ্য নিবেদন করিতেছি, এবং সেই সঙ্গে আপনাদের
 সকলকে আবার আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাইতেছি।

* এই জুলাই মদীয় আবাসে ‘রবি-বাসরের’ অধিবেশনে পঠিত। পঃ নিঃ

পুরীর বসন্তকুমারী বিধবাপ্রশম

শ্রীপুণ্যময়ী সরকার

বসন্তকুমারী বিধবাপ্রশমটি আজ তের বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বর্গীয় জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত প্রভুলচন্দ্র চ্যাটার্জীর বিধবা লেডী বসন্তকুমারী চ্যাটার্জী আশ্রম বাড়িটি দান করেন পরে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের চেষ্টায় একটি সুন্দর বিদ্যালয়-বাটি প্রস্তুত হইয়া আশ্রমটিকে সর্বদক্ষসুন্দর করিয়াছে।

দেশের বর্তমান সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতেও এই প্রতিষ্ঠানের কার্য নিরমিত চলিতেছে, এই জন্ত ভগবানের চরণে আমরা কৃতজ্ঞ। গত ৫ই এপ্রিল রবিবার এই প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী সভার কার্যটি নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পুরী জিলার কালেক্টর রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মন্থনাথ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সরযুবালা বসু পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরীর বহু গণ্যমান্য উড়িয়া ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ এই সভায় যোগদান করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ষাঁহার পুরস্কার দান করিয়া প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পুরীর রাজা সাহেব
 এমার মর্শে মোহন্ত মহারাজ
 দক্ষিণ পার্শ্ব মঠের মোহন্ত মহারাজ

রায় বাহাদুর মন্থনাথ বসু (কালেক্টর, পুরী)

রায় বাহাদুর লোকনাথ মিশ্র

শ্রীযুক্ত লোকনাথ পট্টনায়ক

„ পাঁচুগোপাল মুখার্জী

„ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

„ অটলকুমার চক্রবর্তী।

„ জীতেন্দ্রনাথ মুখার্জী।

„ প্রমোদকুমার ব্যানার্জী।

„ নীলদ্রিড্রুষণ ব্যানার্জী।

„ শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও।

„ গিরিবালা দেবী।

„ সরযুবালা বসু।

„ বেলা পালিত (এস, ডি, ওর পত্নী)

„ সুবাবালা দেবী

„ অল্পমা সরকার

কলিকাতা হইতে :—

মাননীয় জাষ্টিস্ চাকচন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর।

মিস্ এন্, বি, সোম।

মিস্ প্রতিভা সেন।

শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে।

শ্রীমতী সত্যবতী চক্রবর্তী আশ্রমের পক্ষ হইতে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। স্মৃতি শিল্পে শ্রীমতী শান্তিলতা ঘোষ, বয়ন শিল্পে শ্রীমতী গোপেশ্বরী দাসী ও আলিম্পনায় ও কাঁচু ঘাসের কার্যে শ্রীমতী রেবতী দেবী প্রথম হইয়া পুরস্কার লাভ করেন এবং পাঠ শিক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া শ্রীমতী পারুলবালা গাঙ্গুলী পুরস্কার লাভ করেন।

বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী অরুণা বসু প্রথম পুরস্কার লাভ করেন এবং কুমারী কমলরেসারহমান সংস্কার ও সাধারণ জ্ঞানের জন্য মিস্ সোম কর্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণ খচিত মেডেল লাভ করেন। কুমারী আশা রায় ও

গীতা সাত্তাল জাষ্টিস বিশ্বাস প্রদত্ত পুরস্কার পান। সুখলতা রাও কর্তৃক প্রদত্ত সঙ্গীতের পুরস্কারটি কুমারী সীতা মুখার্জী পান এবং অন্যান্য পুরস্কারগুলি যথাযোগ্যভাবে বিতরিত হইয়াছে। পুরী বিধবাস্রমের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমতী সত্যবতী দেবী সরোজনলিনী ট্রেনিং এ ও শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী ও রেবতী দেবী কটক ট্রেনিং এ ভর্তি হইয়াছেন।

প্রায় আড়াই মাস বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবার পর গত ২২ শে জুন পুনরায় বিদ্যালয় খুলিয়াছে এবং যথারীতি বিদ্যালয়ের কার্য চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির উপর সকলের সহায়ভূতি ও দৃষ্টির আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।

স্থান পরিবর্তন

২৩১, বালীগঞ্জ স্টেশন রোডস্থিত (কলিকাতা) সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির নিজস্ব ভবন গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বর্তমান যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজন হওয়ায় গত ১২শে জুলাই ১৯৪২ তারিখে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, শিল্প শিক্ষালয় এবং সমিতির মুখপত্র বঙ্গলক্ষ্মী কার্যালয় উল্লিখিত ঠিকানা হইতে ১২ ডি, আমহাষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। অতএব আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক, সমিতির সভ্যগণের প্রতি নিবেদন এই যে, এখন হইতে তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক পূর্বের ন্যায় চিঠিপত্র টাকা কড়ি সাধারণ সম্পাদকের নামে ১২ ডি, আমহাষ্ট স্ট্রীট, পো: আমহাষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। ইতি—

ত্রীপঞ্চানন নিয়োগী

সাধারণ সম্পাদক

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

স্বাগত শ্রীমতী আরতি দেবী

স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রসদয় দত্ত, বার-এট-ল্ সহিত বাদলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী আরতি মিত্রের শুভ বিবাহ ১৩৪২ সালের ওরা শ্রাবণ, রবিবার সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে।



শ্রীমতী আরতি দেবী

ব্যথা-বিজড়িত চিত্তে, আমরা এই দম্পতিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। বিভূষণ-মিনাতি যে তিনি তাহাদিগকে দীর্ঘ শাস্তিময় সুস্থ জীবন দান করুন।

বীরেন্দ্রসদয় যেমন জ্ঞান-সত্য-ঐক্য-শ্রম-আনন্দের সাধক-

প্রবরের পুত্র শ্রীমতী আরতিও তেমনই সুপ্রসিদ্ধ দেশসেবক ত্যাগী কংগ্রেস কর্মীর কন্যা। এই মিলনে দেশের এও দেশের কাজেই উপকার হইবে।

সাধ্বী সরোজনলিনী দেবীর পুত্র চরিত্র, সমাজ সেবার একনিষ্ঠতা, স্বদেশের মহিলাদের উন্নতি কামনা, স্বামী-অমুবাগ আরতি দেবীর আদর্শ হউক। আশাকরি নববধু খসুর কুলে সম্রাজ্ঞী হইয়া খসুর ও খাস্তুরীর আরব্ব কার্যে ব্রতী হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। স্বামীর অমুরাগিনী হইয়া সরোজনলিনীর মতই চির এয়োদ্বী থাকিবেন।

এ মিলন বাস্তবিকই আমাদের চিত্তে আনন্দ প্রদান করিয়াছে। উরুলোক হইতে গুরুসদয় ও সরোজনলিনীর আশীর্বাদ নব দম্পতির উপর বর্ষিত হউক।

“ভেসে যাচ্ছে চারিদিক আনন্দের বান
কাটার মতন ব্যথা তবু বিঁধিছে পরাণে।

“বীরেনের” পিতামাতা নাই বর্তমান
কে করিবে আজ দৌড়ে আশীষ দান ?

সহসা একি এ দেখি অন্তরীক্ষ হতে
ভেসে এল স্বর্ণরথ মমতার স্রোতে

রথারোহী হৃদয়েই মাতাপিতাগণ
আসিয়াছে পুত্রবধু করিতে বরণ

কল্যাণ কুসুম গাথা মেহাশীষ দিয়া
সম্মিলিত হৃথে সবে লইছ বরিয়া।”

(শ্রীমতী সুরমা হুন্দরী বোষ রচিত)

মুক্তি

শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী, সাহিত্য-ভারতী

(১)

বিনয়বাবু মধ্যাহ্নে আহার করিবার নিমিত্ত রান্নাঘরে গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া চৈচামেচি করিতে লাগিলেন। দুইটি খাইয়া তখনই আবার তাঁহাকে বাহির হইতে হইবে। উপর হইতে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া স্ত্রী অন্নপূর্ণা ছোট জা মিনতির চৌদ্ধ পুরুষের শ্রদ্ধ করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং রান্নাঘরে গিয়া নিজের স্বামীকে খাইতে দিলেন।

মিনতি বিনয়বাবুর ছোট ভাই প্রশান্তের স্ত্রী। বয়সে বিনয় প্রশান্তের অনেক জ্যেষ্ঠ। সংসারের অভিব্যবহাও তিনি। পিতামহ বাঁচিয়া থাকিতেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রী অন্নপূর্ণার রূপ ছিল বটে, কিন্তু সে রূপের সঙ্গে মুখে বিষও ছিল প্রচুর। বিনয়ের পিতার মৃত্যুর পর বিধবা মাতা কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ত তাই নিজেই দেখিরাশুনিয়া মিনতিকে আনিলেন। ছোট বধু রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। কিন্তু হইলে কি হয়, ইহাতেই সে হইল বড় জায়ের চক্ষের বিষ। শান্তি বাঁচিয়া থাকা পর্য্যন্ত বিশেষ গোলযোগ হইতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরই অন্নপূর্ণা নিজ-মুক্তি ধারণ করিলেন। বিনয় উপার্জনশীল। পিতার অবর্তমানে লেণাপড়ার ভেতন স্বযোগ না হওয়ায় প্রশান্তের চাকুরিবাতিরও সুবিধা হয় নাই। অন্নপূর্ণা সেই সূত্র ধরিয়া দুই বেলা দেবরের উদ্দেশে বাক্যবাণ বর্ষণ করেন। সেই বাণের আঘাত মিনতিকেই গ্রহণ করিতে হয়। বেচারী মুখ বুজিয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম নিজ-হস্তে করিয়া উপার্জনহীন স্বামীর দেনা পরিশোধ করে।

ইহার উপর বছর দুই হইল ভগবান একটি পুত্র-সন্তান দান করিয়া মিনতির উপর আরো একটি বোঝা চাপাইয়াছেন। পিতার অক্ষমতার দায়ে এই ক্ষুদ্র শিশু কাহারওই আদর লাভ করিতে পারিল না।

কয়েক দিন হইল মিনতির সেই ছেলোটর অসুখ। রুগ্ন ছেলেকে একা ঘরে রাখিয়া মিনতিকে সংসারের কাজ করিতে

হইতেছে। গত রাত্রি হইতে ব্যারামের বাড়াবাড়ি হওয়ায় কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে ছেলের কাছে আসিতে হইতেছে। সংসারের কি কাজে প্রশান্ত অতি ভোরেই বাহির হইয়া গিয়াছে। বড় জা অন্নপূর্ণার বেলায় খাইলে সহ্য হয় না,—প্রত্যহই সকাল সকাল খাইয়া নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস। আহা! তাহা হইলে তাই তিনি শয়ন-কক্ষে চলিয়া গিয়াছেন। বিনয়বাবুর বাড়ী ফিরিতে অনেক বেলা হয়। ভাস্করের খাওয়া না হওয়া পর্য্যন্ত মিনতি প্রত্যহই অতুচ্ছ থাকে। সেদিনও সংসারের কাজকর্ম শেষ করিয়া ভাস্করের অপেক্ষায় সে রুগ্ন ছেলের পাশে বসিয়াছিল। কোন্ সকালে স্বামী বাহিরে গিয়াছেন, এত বেলায়ও ফিরিতেছেন না, একে সেই দুর্ভাবনা, তার উপর পুত্রের অবস্থাও আশঙ্কাজনক হওয়ায় শিশুর রোগক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া মিনতির মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। সারারাত্রি জাগরণে বিকাল হইতে তাহার দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রোগীর সেবা করিতে করিতে ইতিমধ্যে তাহার অবসাদগ্রস্ত দেহ অকস্মাৎ নিদ্রাদেবীর অঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। কতক্ষণ যে সে এভাবে ঘুমাইয়া থাকিত বলা যায় না; কিন্তু বড় জায়ের উচ্চকণ্ঠের সহসা জাগরিত হইয়া ভয়ত্রস্তা হরিণীর স্রাবসে দ্রুত রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল—তাহার ভাস্কর খাইতে বসিয়াছেন। অসময়ে নিজের ব্যাঘাত ঘটায় অন্নপূর্ণার মেজাজ গরম ছিল। মিনতিকেই তাহার জন্ত সম্পূর্ণ দায়ী ভাবিয়া তিনি এতক্ষণ মনে মনে তাহার মস্তক চর্ষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে তাহাকে সম্মুখে পাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—‘আর আসতে হবে না, নবাব-গিন্নি! আরো খানিক ঘুমোও গে, যাও!’ বিনয়বাবুও স্ত্রীর সুরে সুর মিলাইয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন—‘খা হয়েছি দিন-দিন বাড়ীর কাণ্ড! আবার বেলায় দশজন, আর খাটনির বেলায় একজন! খেটেখুটে অবেলায় এসে তা-ও যদি হাঁক-ডাক না করে দুটো ভাত পাই!’ অন্নপূর্ণা স্বামীর কথার জবাব দিয়া বলিলেন—‘তা-পাবে কোথেকে? ভাইটিকে

আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে ক'রে রেখেছ নবাবপুত্র। তা-ও যদি ছুটো টাকা উপায়ের যোগ্যতা থাকত ! তার উপর যেমন যাহ্মণি তেমনি তার কৃষ্ণিণী ! গুণধর ভাই বউটিকে মাথায় তুলে ক'রে রেখেছেন রাজরাণী ! একটা লোক যে তেতে-পুড়ে অসময়ে বাড়ী আসে তার খোঁজ নেওয়ার আর দরকার কি ! রাজরাণী, যান, পালঙ্কের উপর ঘুমিয়ে থাকুন গে ! এক বাদা আছে খেটেখুটে এনে দেবে, আর এক বাদী আছে যা করবার সেই করবে। আর রাজপুত্র যেমন ঘোরেন সারাদিন টো টো ক'রে, সেই রকমই ঘুম্নন গে, খাওয়ার বেলা হাজরে দিলেই হ'লো—বাদা আছেন, ভাবনা কি ! বড় জায়ের বাক্যবাণ মিনতির বৃকে শেলের মত বিদ্ধ হইল। তাহার প্রতি জায়ের এই রকম ব্যবহার অবশ্য নূতন নহে ; কিন্তু ভাস্কর যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সে মরমে মরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল—‘বসুমতি, দ্বিধা হও, তা না হ'লে আমার লজ্জা রাখবার আর স্থান নেই।’ মনের বেদনায় তাহার চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারার মত অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাহার চোখে জল দেখিয়া অন্নপূর্ণা হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—‘দেখে আর বাঁচিলে ! ফুলপত্রী ফুলের ঘায়ে মুচ্ছা বান !’

বিনয়বাবুর আহার শেষ হইলে অন্নপূর্ণা সিঁড়ি দিয়া দৌতলায় উঠিতে উঠিতে বলিলেন—‘ওগো রাজরাণী, রান্না-ঘরের শেকলটা যেন দেওয়া হয়।’ তারপর রাগে গরগর করিতে করিতে উপরে উঠিয়া গেলেন। মিনতি দুঃখের প্রতি-মূর্ত্তির মত কম্পিতপদে ধীরে ধীরে নিজের শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া গেল এবং রুগ্ন পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পুঞ্জীভূত বেদনা অশ্রুজলে দৌত করিতে লাগিল।

(২)

প্রশান্ত বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখে মিনতি নীরবে কাঁদিতেছে। সে দ্বীর সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘তুমি কাঁদছ কেন ? কি হয়েছে, মিনতি ?’ স্বামীর সহানুভূতিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া মিনতি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রশান্ত তাহার মুখ হইতে হাত-দুইখানি সরাইয়া দিতেই মিনতি

কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল—‘ওগো, এতদিন আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইনি, কিন্তু দুই শনিগ্রহের মত আমি আর তোমায় জ্বালাতে চাই না। এখন আমি মুক্তি চাই, তুমি আমাকে মুক্তি দাও। আমার জন্ত তোমার লাঞ্ছনা আর সহ করতে পারছি না।’ মিনতির কথা শেষ হইতে না হইতেই রুগ্ন-শিশুটি অকস্মাৎ যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দ করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিনতি আশঙ্কাপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল—‘দেখ দেখ, খোকার এ কি হ'লো !’ প্রশান্ত ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বিপদ-আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। সে বুঝিল চিকিৎসার অভাবে এই স্বর্গীয় ফুলটি ফুটিতে না ফুটিতেই বুঝি ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অক্ষম পিতা সে, কোনো উপায়ই তাহার নাই, তবু ক্ষীণ আশা অন্তরে লইয়া সে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে ছুটিয়া গেল। মিনতি নিরুপায়ভাবে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া শুক হইয়া বসিয়া রহিল।

(৩)

অন্নপূর্ণা উপরে গিয়াই শুইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিজাকর্ষণ হইতে বিলম্বও ঘটে নাই। বিনয়বাবু আহারের পর চলিয়া গিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার শয়ন-গৃহে তাঁহার শিশু-পুত্র ও কন্যা খেলা করিতেছিল।

মনের উত্তেজনায় সেদিন অসময়ে অন্নপূর্ণার নিজাভঙ্গ হইল। তাঁহার শিশু-দুইটিও তৎক্ষণাৎ খাবারের জন্ত চোঁচা-ঘেচি করিতে লাগিল। অগত্যা এই ঝগড়াট মিনতিকেই পোহাইতে হয়। সেদিন তাহার অপেক্ষা না করিয়া অন্নপূর্ণা নিজেই ছেলেমেয়ের জলখাবার প্রস্তুত করিতে উদ্যোগী হইলেন। এজন্ত ঠোঁট জ্বালাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে একবার নীচে যাইতে হইল। সেই সময়ে তাঁহার ছেলেমেয়ে-দুইটি খেলা করিতে করিতে হঠাৎ ঠোঙের উপর আসিয়া পড়িল। সঙ্গেসঙ্গে ঠোঁটটি উল্টাইয়া পড়িতেই তাহার আগুনে ছোট ছেলেটির জামা ধরিয়া গেল। অন্নপূর্ণা উপরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন—ছেলের জামায় আগুন ! ভীষণ আতঙ্কে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়া উচ্চঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই চীৎকার নীচে মিনতির কানে পৌঁছিল। সে উৎকর্ণ হইয়া স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিল—‘হ্যাঁ, উহা তো

তাহার জায়েরই কণ্ঠস্বর।...কিন্তু, কেন? সে মৃতপ্রায় পুত্রকে ফেলিয়া রাখিয়া স্বরিতপদে উপরে উঠিয়া গেল। সেখানে গিয়া যে দৃশ্য তাহার চক্ষে পড়িল তাহাতে তাহারও দিগ্বিদিক জ্ঞান রহিল না। সে দেখিতে পাইল ছোট খোকার জামায় দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, আর তাহার মা দিশাহারা হইয়া শুধু চীৎকার করিতেছেন। মুহূর্ত্তমাত্র বিহবল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরক্ষণেই সে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। তাহার মাতৃহৃদয় আর একটি মাতৃহৃদয়ের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সে খোকার নিকট ছুটিয়া গেল এবং নিজের আঁচল দিয়া তাহাকে সাপ টাইয়া ধরিল ইহাতে কিন্তু হিতে বিপরীত হইল—খোকার জামার আগুন মিনতির কাপড়েও ছড়াইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা তখনও হতবুদ্ধির স্থায় চীৎকারই করিতেছিলেন, ছেলেকে বা মিনতিকে সাহায্য করার বুদ্ধি পর্য্যন্ত তাহার লোপ পাইয়াছিল। ততক্ষণে সর্বগ্রাসী বৈশ্বানর লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া মিনতির সর্বদ্বন্দ্ব গ্রাস করিল—অগ্নিদাহে অচেতন হইয়া সে ভূতলে পড়িয়া গেল।

(৪)

অন্নপূর্ণার করুণ আৰ্ত্তনাদ তখনও সমভাবেই চলিতেছিল। প্রশান্ত ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া এই সময়ে গৃহে ফিরিতেই উহা তাহার কর্ণগোচর হইল। শশ্যাস্ত্রে সে তৎক্ষণাৎ উপরে ছুটিয়া গেল। সেস্থানের দৃশ্য চোখে পড়িতেই আবার ছুটিয়া নামিয়া আসিয়া ডাক্তারের হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেল।

কিন্তু ততক্ষণে অন্নপূর্ণার ছেলের প্রাণপাখী তাহার দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। মিনতিরও অস্তিত্ব অবস্থা। ডাক্তারের আশ্রয় চেষ্টায়ও কোনোই ফল হইল না। নির্বাহকের পূর্বে দীপ যেমন দগ্ধ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, প্রশান্তের উপস্থিতিতে মিনতিরও জীবন-প্রদীপ তেমনই হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে তাহার আয়ত চক্ষু চাইটি মেলিয়া একবার প্রশান্তের মুখের দিকে তাকাইল; সঙ্গেসঙ্গে গভীর পরিতৃপ্তির জ্যোতি মুখমণ্ডলে পরিফুট হইতেই তাহার অস্তিত্ব নিঃশাস নির্গত হইল।

(৫)

এতক্ষণ রুগ্ন পুত্রের কথা প্রশান্তের মনেই ছিল না।

অভাবনীয় বিপৎপাতে ডাক্তারবাবুকেও উপরেই থাকিতে হইয়াছিল। সেহান হইতে তিনি নিজেই প্রশান্তকে টানিয়া লইয়া নীচের ঘরে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন—আর-এক দৃশ্য!—প্রশান্তের ছেলে মাতৃকোল-ছাড়া হইয়া রোগশয্যায় একাকী ছটফট করিতেছিল; প্রশান্তকে লইয়া ডাক্তারবাবু যখন নীচে আসিলেন তাহার পূর্বেই ক্ষুদ্র শিশু তাহার মাতৃকোলে চলিয়া গিয়াছে।

মিনতির শোকে প্রশান্তের হৃদয় হাহাকার করিতেছিল। বহুচালিতের স্থায় সে ডাক্তারের সঙ্গে নীচের ঘরে আসিয়াছিল। তাহার ছেলের দিকে দৃষ্টি দিয়াই ডাক্তার যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন সে তখনও তাহা বুঝে নাই। মিনতির বিচ্ছেদ জ্বালায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া কথঞ্চিৎ শান্তির আশায় সে মিনতিরই প্রতিমূর্ত্তি ক্ষুদ্র শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিতে গেল।...কিন্তু, এ কি! খোকার শরীর এত ঠাণ্ডা কেন! অবচলিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই প্রশান্ত বুঝিতে পারিল, অনাদরে ও অবহেলায় খোকা তাহার মায়ের কাছে চলিয়া গিয়াছে।

খোকাকে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিয়া প্রশান্ত প্রস্তর-মূর্ত্তির স্থায় নির্বাক-নিষ্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। তাহার বুকে আগ্নেয়-গিরির শিখা উঠিতেছিল; উহার উত্তাপে চক্ষের অশ্রু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছিল। উভয় হস্তে দৃঢ়ভাবে নিজের বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া সে শুধু ভাবিতে লাগিল—‘আজই না মিনতি আমার কাছে মুক্তি চেয়েছিল! মা ও ছেলে কি একসঙ্গেই আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল!’ কিন্তু সেই মুক্তি যে এইরূপ নিদারুণভাবে আসিবে তাহা তো তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। গৃহের নিম্নতলে মৃতপুত্র, দ্বিতলে পত্নীর শব—উভয় স্থানের ভীষণ দৃশ্য যুগপৎ মনে উদ্ভিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। পাগলেরই স্থায় সে আৰ্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—‘মিনতি, মিনতি, তুমি না মুক্তি চেয়েছিলে? সে মুক্তি কি একলাই তুমি নেবে? তোমার সঙ্গে আমারও আজ মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি!’

দ্বিতলে অন্নপূর্ণার আৰ্ত্তনাদ তখনও চলিতেছিল। সেই আৰ্ত্তনাদের সঙ্গেসঙ্গে ছোট জায়ের স্থিতি তাহার অন্তরে কি আলোড়ন জাগাইতেছিল, কে জানে?

দুঃখের কারণ

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী

দুঃখ আমার নিজ কৃত অবস্থা এবং ইহা বহির্জগতের কিম্বা অশক্তি দ্বারা প্রক্ষিপ্ত নয়, যখন এই জ্ঞানোদয় হয় তখন আমরা বুঝিতে সক্ষম হই যে দুঃখ নিবারণের উপায় আমাদের নিজেরই কাছে আছে। অর্থাৎ আমরা যদি দুঃখের কারণগুলি বর্জন করি তাহলে আর আমাদের দুঃখ থাকে না। দুঃখের লক্ষণগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই আমাদের স্পৃহা বর্তমান। এবং এই স্পৃহা জীবনের স্থায়ীত্বের সহিত সম্যক সামঞ্জস্যহীন হইলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। আমরা এই নিয়ম পরিবর্তন করিতে পারি না সুতরাং স্পৃহার পরিবর্তনই একমাত্র উপায়।

জীবনের দুইটি ধারা আছে :—একটি সঙ্কোচন অপরটি প্রসারণ। প্রথমটি কেন্দ্রীভূত, অর্থাৎ সম্বৃচিত এবং দ্বিতীয়টি বিকৃত অর্থাৎ বিস্তারিত হইতে চায়।

বিস্তার যদি সঙ্কোচনের উপর আধিপত্য করে অর্থাৎ সঙ্কোচন অপেক্ষা প্রবল হয় তা হলে অবস্থা বিকল ও ধ্বংস অনিবার্য। এরূপ অবস্থায় দেহের ধ্বংস হয় এবং মানসিক অবস্থার উৎকর্ষ কেন্দ্রীভূত না হলে লোক উন্মাদ হয়ে যায়। আর যদি এই কেন্দ্রীভূত অবস্থা উৎকর্ষ (সম্প্রসারণ) হীন হয় তাহলে মাত্ত্ব শারীরিক ও মানসিক জড়তা প্রাপ্ত হয়। উৎকর্ষের ক্রিয়া একিভূত অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে; তাহা শারীরিকই হউক (যথা খাদ্য, শ্বাস প্রশ্বাস ইত্যাদি) অথবা মনসিকই হউক (যথা চিন্তা, ধারণা প্রভৃতি)। কেন্দ্রীভূত করণের সফলতা বিভিন্ন ব্যক্তির ধর্ম ও কাৰ্য্য-কলাপের (যাহা একিভূত করা যায় না) বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। এই কেন্দ্রীভূত করণ হয় সেই শক্তির উদ্ভাবনা যাহা বিভিন্ন অসহযোগে বিভিন্ন প্রকৃতীর ধ্বংস নিবারণ করে। ইহাই অহংকার নামে বিদিত এবং ইহাই অহং। এই অহংই জীবকে নিজ সত্তায় সজাগ করে। যতক্ষণ এই অহং বিচার বুদ্ধির দ্বারা সমভাবে চালিত হয় ততক্ষণই সন্তোষ থাকে। পরন্তু যখন ইহা সমভাবে বিচার দ্বারা চালিত না হইয়া গর্ভিত অহংএর উৎপত্তি করে তখন ইহা পৃথিবীর অজ্ঞান সত্তার সহিত সামঞ্জস্যহীন হয় এবং প্রকৃত অবস্থা অর্থাৎ মানসিক অশান্তিকেই অজ্ঞতা অথবা আত্মপ্রত্যারণা কহে। এই অজ্ঞতাই স্বার্থপরতা হতেই চিরস্থায়ী ও চির আনন্দময় জগতের জন্য অদম্য স্পৃহা জন্মায়। কোন কিছুই চিরস্থায়ী হয় না সুতরাং এই অদম্য স্পৃহার পরিণতি ক্লেশ, দুঃখ ও হতাশা। আকাঙ্ক্ষার দুটি রূপ আছে, একটি অহং হইতে বিবেকের উৎপত্তি করে,

অপরটি বিবেক বিহীন অহংকারের উৎপত্তি করে। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে সন্তোষের উৎপত্তি এবং অনুসরণে ইহা পূরণের অন্তরায় বস্তু দূরীকরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। অর্থাৎ লাভেচ্ছা করে। সুতরাং এই লোভ ও লাভেচ্ছা একই শক্তির দুই অংশ। এবং এই শক্তিই আমাদের জীবন-বৃত্তের বন্ধন রাখে। আর জীবনের এই সত্তার বশীভূত হওয়ার জন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করি। ইহাই কর্মযজ্ঞ। আমাদের ইচ্ছা এবং আমাদের অদম্য আগ্রহই এই জগৎ সৃজন করেছে যাহাতে আমরা বিচরণ করি।

সুতরাং এই লোভ ও লাভেচ্ছা একিভূত ইহাই আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ভাবের সৃজন করে। যাহার স্থায়ীত্বের উপরই জগতের পূর্ণতা অথবা পরিবর্তনশীলতা নির্ভর করে। তাহা মানসিক অথবা কার্যিক যাহাই কেন হউক না। এই পরিবর্তনই জন্ম ও বৃদ্ধি অথবা সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়েই, মৃত্যুর উভয় পৃষ্ঠের স্তায় পরস্পরের সহিত একান্তভাবে সংযুক্ত। যেমন দর্শকের প্রয়োজন মত গৃহের একই দ্বারকে প্রবেশ দ্বার অথবা নির্গমের দ্বার বলা যেতে পারে, সেইরূপ এই পরিবর্তনকেই আমাদের সীমাবৃত্তি অনুসারে (যাহা কেবল একদিকদৃশ্য) আমরা জন্ম অথবা মৃত্যু বলি। এই পরিবর্তনের উভয় পার্শ্বের বলিয়া আমরা ইহা-মনে করিতে পারি না যে আমরা এককে ছাড়িয়া অন্যকে লাভ করিতে পারি না। অর্থাৎ জন্ম বিনা মৃত্যুকে কিম্বা মৃত্যু বিনা জন্মকে লাভ করিতে পারি না। জীবনের অহরন্তর মানেই মৃত্যুর আকর্ষণ। জীবনের সত্তাই পরিবর্তনশীল। আকর্ষণের সত্তা দৃঢ়ভাবে স্থায়ী করণ সুতরাং পরিবর্তনে বাধা দেওয়া। এই জন্মই পরিবর্তন আমাদের দুঃখের বলিয়া বোধ হয়। কোন বস্তুই যদি আমবা আমাদের অধিকারভূক্ত অর্থাৎ আমার অহংএরই অধিকৃত এবং আমারই স্বার্থ বিজড়িত এরূপ না ভাবি তাহলে তাংর পরিবর্তনে এমন কি তাহার ধ্বংসেও আমার কোনও রকম দুঃখবোধ হবে না। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে আনন্দই ভোগ করিব। কারণ অনেক সময় এই পরিবর্তন আশ্রয় বস্তুকে দূরীভূত করে এবং নূতন নূতন অভিজ্ঞতা ও জগতের প্রতি গাঢ় দৃষ্টি উন্মোচন করিয়া আমাদের মুক্তির অধিকতর সহায়তা করে। এই জগৎ যদি অপরিবর্তনশীল হইত এবং আমাদের জীবন চিরস্থায়ী হইত তাহলে মুক্তির কোনও সম্ভাবনা থাকিত না। সুতরাং এই পৃথিবী অথবা পৃথিবীর কাঁধই দুঃখের কারণ নহে। আমাদের নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপরতা ও অজ্ঞতাই দুঃখের কারণ।

ওয়েস্ট পেপার বান্ধে

শ্রীশান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

মন যখন সৃষ্টি করতে চায় তখন তার গ্রহণের কাজে ব্যাঘাত আসে। এ ব্যাঘাত আসবেই। অবশ্য একে যদি ব্যাঘাত বলে মনে করে। এ ব্যাঘাত আমার জীবনে নেমে এসেছিলো। সৃষ্টির তরঙ্গে বয়ে যেতে চেয়েছি। চলতি জীবনের বাঁধাধরার রজ্জু ছিঁড়ে আরো খানিকটা এগিয়ে যেতে হয়েছিল অন্তরের তাগিদে। সে তাগিদ অসহ হয়ে উঠেছিলো। কি পাইনি, কি পেলাম বা কি পাবো তার হিসাব-নিকাশের সময় সেটা নয়। পাবার কথা নয়, তখন দেবার কথা। আরও কি দিতে পারি—মানের গোরববহা নাড়ীর তরঙ্গে উজ্জল হয়ে উঠেছিলো মন। পৃথিবীর আকাশ-বাতাস, পৃথিবীর পশুপাখী, পৃথিবীর ধূলি, পৃথিবীর পিতামাতা-পুত্র-আচার্য—মনের রাজ্যে তারা সৃষ্টির খাতায় আঁকের পর আঁক চড়িয়ে চলছে। যা কিছু নিয়েছি তারি কিছু দিতে হবে দান। পশুরা সে স্বীকার করে না। মানুষের মধ্যে সে স্বীকার করার করে—তার সৃষ্টি করতে চাইবে। ফিরে দিতে চাইবে তাদের স্বর্ণ। পৃথিবীকে দানে দানে ভরে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণায়। কত রাজপুত্র সিংহাসন ছেড়ে পথের ধূলায় খুঁজছে—আপনগন্ধে পাগল হইয়া কস্তুরী মৃগসম—তাদের দেয়ের সন্ধান। গ্রহণের ইতিহাস তাদের শেষ হয়েছে। জীবনের ধর্ম একরোখা নয়। সৃষ্টির প্রেরণা তাকে অহরহ উদ্বোধিত করছে।

গৌতম রাজ্য ছেড়েচেন, শিশুপুত্র ও গোপা তাঁকে সংসারের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি; যেখানে গ্রহণ করা চলবে কেবল—সৃষ্টির পরিসর নেই সেখানে। কুলবধু কুলভয়লাজ ছেড়েচে। সামনের বাধানিয়েধের বেড়া সৃষ্টির তরঙ্গে ভেঙে পড়েছে—পাখীর গান গেয়েছে—যমুনায় জোয়ার নেমেছে সৃষ্টির আরতি-সন্ধ্যায়। নববধুর বুক লজ্জা নেমেছে—রক্তিম হয়ে উঠেছে তার মন।

সেই একই প্রেরণা উদ্ভুদ্ধ করেছে সাহিত্যিকের বিকচোন্মুখ মনটিকে। গ্রহণের আরও ছিল প্রয়োজন। পৃথিবীর অঞ্জলিভরি' দান ব্যর্থ হয়ে যায় ফিরে। সে নিজেকে বহু

সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পাকা করে তুলবে। সে নিজেকে ভালবেসেছে বড়। আজকের রূপে সে সন্তুষ্ট নয়। ভেঙে দাঁও তবে আজিকার সভা। আনো নবরূপ, আনো নব শোভা।

* * *

কতক মানুষের মধ্যে যেমন একটা বিকাশ আছে সকল মানুষের মধ্যে তেমন নাই। এই বিকাশ বলিতে কি বুঝিতেছি—নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিবার মধ্যে বাঁচিয়া থাকার একান্ত চেষ্টা। মজল করিবার শক্তিই ধন নহে। সঞ্চয়ের শক্তি কল্যাণের শক্তি নহে। আমি যাহা পাইলাম তাহা বিশেষ করিয়া পাইবার জন্ত অপর পাঁচজনের সহিত তাহা পাওয়া চাই। এই সকলের করিয়া পাওয়ার মধ্যে আমি বিকাশশক্তিকে লক্ষ্য করিতেছি। মাটির রসে যাহা পাইয়াছি, ফুলের সৌরভে তাহা বিখে বিকীর্ণ করিয়া দিব—এ বাহার আদর্শে তাহার বৃহৎ জীবনের ছোঁওয়া লাগিলে আমি ধন্ত হইতে পারিতাম। তাই নিঃস্ব যাহারা, ধনের গৌরবে ধনী নহে, বিশ্বের দরবারে তাহাদের দান অমূল্য। আমি তাহাদেরই একজনের মত হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিব। এ বাঁচাকে কেহ স্বীকার করিবে না—ব্যাক্স একাউন্টের খাতায়, যুনিভারসিটির উপাধিধারীদের তালিকায় আমার নামের খোঁজ পাওয়া যাইবে না। কিন্তু বিশ্বের সহিত নিজের একাত্মীয়তা অনুভব করিয়া যে আনন্দের খোঁজ পাইলাম তাহা কি কেহ অন্য কোথায় পাইত? পৃথিবীর আকাশ-বাতাস সূর্য-জল, পশুপাখী, তরুণ্ডলের মধ্যে যে একটা আনন্দের শিহরণ অনুভব করিয়াছে তাহাকে পাগল আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু সে পাগলের মনের অভলে কেহ কি ডুব দিয়া দেখিয়াছে? এই নিজেকে উৎসর্গ-করা-পাগলামির একটা বৃহৎ দিক আছে। বিশ্বসৃষ্টির রীতিটাও এই রকম একটা পাগলামি। যাহারা সৃষ্টি করে তাহারা নিজের সমস্ত সত্তা দিয়া সৃষ্টি করে। বৃহৎ সৃষ্টির মধ্যে এইরূপ একটা বৃহৎ অনুভব ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। এই অনুভবটিকে সমস্ত জীবন ধরিয়া রাখিতে, সমস্ত ক্ষণ ব্যাপিয়া রাখিতে পারাতেই মহামানবত্ব। কোনদিন

নিজের মনের মধ্য হইতে কল্যাণ করিবার তাগাদায় পরের উপকারের মধ্য দিয়া নিজেকে সাধক করিয়া তুলিতে পারিয়াছি কি? সে-সাধকতার আনন্দ তুলিতে পারিব না। করুণা মিশ্রিত হইয়া এ আনন্দ আমার কাছে লঘু হইয়া পড়ে নাই। নিছক অন্তরের তাগাদায় যাহা করিয়াছি তাহা ভালও নহে মন্দও তাহে—তাহা নিছক নিজের। লঘুগুরু প্রসঙ্গ আসে না। এই ভালমন্দের বিভেদ তুলিয়া, এট অন্তরিক আনন্দটিকে মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন করিয়া পাইবার ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া তুলিতে পারিলে মানুষ মহামানবতার স্তরে উঠিয়া পড়ে। সমস্ত মানুষকে মুক্ত করিয়া যে চেতনা বিরাজ করিতেছে—যে চেতনার একাংশে তরঙ্গ উঠিলে তাহার অভিঘাতে সমস্ত চেতনাস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠে—সেই চেতনাস্রোতে অভিসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে কি বলিব—সে আত্মপূর্ণ বিভেদ তুলিয়াছে, সঞ্চয়ের আকাজক্ষা সে ভাগ করিয়াছে, নিজেকে টানিয়া টানিয়া হ্রবহ করিয়া তুলিবার ইচ্ছায় তাহার জীবন জর জর হইয়া উঠে নাই। সে আর অপর সাধারণের মত নহে। তাহার পৃথক অস্তিত্বে সে দাঁড়াইয়া নাই। বিশ্বের মধ্যে নিজেকে হারািয়া ফেলিয়া তাহার আনন্দ—তাহার চরম বিকাশ।

নিজের কথা দিয়া নিজেকে বিশ্লেষণ করিবার একটা স্রবীণা আছে। তাহা হয়ত ঠিক সত্য কথাটি বলিয়া দিতে পারে না—অর্থাৎ যাহাকে বলিতেছি the state of being. মনের একটা গতি আছে। মনন-রীতি এবং বচন-ভঙ্গীতে সে গতি ধরা পড়ে। আমি যে ভাবে চিন্তা করি এবং যে ভাবে কথা বলি তাহার মধ্য দিয়া আমার প্রকাশমান স্বরূপকে আবিষ্কার করিতে পারি—(the state of becoming). Pope বলিয়াছেন—The study of mankind is man. আর শঙ্কর বলিয়াছেন—আত্মানং বিজি। এ দুই জনার মধ্যে খুব বড় একটা ব্যবধান নাই। কারণ নিজেকে জানিতে গেলে অপরের পরিপ্রেক্ষিতে জানিতে হইবে। পরকে জানার মধ্য দিয়া আমি যেমন নিজেকে জানিতে পারিব, তেমনি আমার জানার মধ্যে একটা গভীরতা ও বিস্তৃতি আসিয়া পড়িবে। নিবিড়ভাবে জানিতে পারিব আমি একা নহি—বিশ্বের একটা করিয়াই ভগবান আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর বাহির বিশ্ব ঠিক ঠিক জানিতে পারিলে জানিতে পারিব যে, এই যে আলাদা আলাদা ভাবে অবস্থান করিতেছে এক একটা তারা মানুষ, পশু, পক্ষী—ইহাদের মধ্যে একটা যোগ আছে। বাহির ও অন্তর পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। Binsien-এর Theory of Relativity বস্তুর রাজ্যে প্রমাণসাপেক্ষ—কিন্তু মনের রাজ্যে তাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

আমি আমার এই বিশ্বাসের কথা অনেককে অনেক ভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি এই অন্তরের যোগকে বিশ্বাস করি। মানুষের ক্ষুদ্র ছিন্ন চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি সমগ্র চেতনা বিরাজ করিতেছে—এ কথা আগে বলিয়াছি। এই বিশ্ব তরঙ্গময়। যাহাকে বস্তু বলিয়া ভ্রম হয় তাহা চেতনার তরঙ্গে উদ্ভোষিত। এ তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগে। তরঙ্গ বহিয়া চলে এই বিশ্ব তরঙ্গের আকর্ষণে। এ অদৃশ্য আকর্ষণ যুগ যুগান্ত ধরিয়া বহিয়া চলিতেছে—ইহা মনোরাজ্যের gravitational pool. আমি যাহা দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করিয়াছি সেই দৃঢ়তার ব্যঞ্জন বহিয়া আমার প্রাণের তরঙ্গ-ইঙ্গিত মনটিকে একটি অহুচ্চ তরঙ্গে নাচাইয়া তুলিল। তাহার ইচ্ছার প্রাবল্যে সে তরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠিল। আকর্ষণে আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। মায়ের ইচ্ছা বহিয়া প্রবাসী সন্তানের কাছে পাখীটি গান গাহিয়া গেল—ঘরে ফেরার গান। ভাদরের আকাশে গম্ভীর মেঘের সঘন শব্দে বকের কাছে যেন কাহাকে পাইতে ইচ্ছা করিল—স্বচ্ছ প্রভাতে ঘুম ভাঙিয়া স্বপ্নের মত এক টুকরা ফ্যাকাসে চাঁদে মনটিকে মৈত্রী করুণায় ভরিয়া। কি যেন কেন সমস্ত ইন্দ্রিয় ভরিয়া মন একযোগে গাহিয়া উঠিল—কে যেন তাকে ডাকে।

এ আমার ছাত্রাবাসের জীবনের কথা। কত মধ্যাহ্নে, কত সন্ধ্যায় মায়ের স্নেহ মুখের কথা মনে পড়াইয়া দিয়াছে—ভাই বোনের আকুলতা জানাইয়া দিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়াছি তখন মনের আকর্ষণে। আসিয়া দেখি—এ কি, কাহারো তো জানা ছিল না আমি আসিব। অথচ অকারণে নানা আয়োজন জমা হইয়া উঠিয়াছে। আমার যেন আসিলে ভাল হইত—এ ইচ্ছা মূর্তি ধরিয়া আয়োজনের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি করিয়া ফিরিতেছে।

তবে যে সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগিয়া মনের তটে ভাঙ্গন ধরিয়া যায়। তবু যে সাড়া মেলে না। এ কেন? কিন্তু তুমি তো তরঙ্গের সৃষ্টি করিলে—নাচিতে নাচিতে তরঙ্গ চলিল—খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল তাহাকে যাহাকে মনে করিয়া ইহাকে পাঠানো। কিন্তু যে-মন মরুভূমির ব্যবধান রচনা করিয়া নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে বিশ্বের বিরাট সংযোগ হইতে—যাহা দিনে দিনে নিজেকে বলি দিয়াছে—সে ছুস্তর মরুপার হইয়া যে তোমার মনের তরঙ্গ পৌছিতে, সে প্রতি-আকর্ষণ কই? নিজের ইচ্ছা করিলেই হয় না—আর একজনকে ইচ্ছা করিতে হইবে। একটা আকর্ষণ—আর একটা প্রতি-আকর্ষণ!

পুতুল

শ্রীকান্তনী মুখোপাধ্যায়

মানুষ যখন তরকোটরে এবং গিরিগুহায় বাস করিত, যখন সে ছিল নিতান্ত অসভ্য, বস্ত্র—তখনো তাহার মনে ছিল সৌন্দর্য-পিপাসা। এই সুন্দরের অন্তঃসন্ধান-স্পৃহাই তাহার বস্ত্র জীবনকে দিয়াছে আজিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কলাসম্পদের স্রষ্টার আসন। কিন্তু আজিকার পূর্ণাঙ্গ চিত্রকলা বা মূর্তিশিল্প দেখিয়া বোঝা একান্তই সুকঠিন, কেমন করিয়া তাহার আদিম সৌন্দর্য্যক্ষুধা মানুষ মিটাইত। সেদিনকার তুলিয়া আসা দিনকে আজ আর স্মরণে আনিবার বড় একটা সুযোগ নাই। গিরিগুহায় অঙ্কিত চিত্র বা প্রস্তরে ক্ষোদিত সে-যুগের মূর্তি দেখিয়া আমাদের আদিম পূর্বপুরুষগণের কলারসজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়মাত্র পাইতে পারি; তাহাদের কাল নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণার উপর নির্ভর করিতে হয়।

কালনির্ণয় করা ইহাদের কাজ তাঁহারা কলা-রসিক না হইতে পারেন। কেমন করিয়া শিল্পকলা ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা হয়ত তাঁহারা বলিয়া দিতে পারেন, হয়ত বা কত বৎসর পূর্বে কোন ধারার শিল্প প্রচলিত ছিল তাহারও সঠিক হিসাব তাঁহারা রাখেন কিন্তু শিল্পরস-পিপাসুর অন্তর তাহাতে তৃপ্ত হইবে না।

শিল্প-রসিক চান সে-যুগের শিল্পের মধ্যে কতখানি সৌন্দর্য্য ছিল, কতখানি ছিল তাঁহাদের প্রকাশ-শক্তি, কিরূপ সাবলীল ভঙ্গীতে তাঁহারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মনোভাব, তাহার তথ্য উদ্ঘাটন করিতে। ইহার জন্য প্রাচীন চিত্র, প্রস্তর মূর্তি প্রভৃতির সংগ্রহ করা প্রয়োজন; দেশের সংগ্রহশালায় তাহা হইতেছেও। কিন্তু এখনো সেই প্রাচীনতম শিল্পের ধারা যে পল্লীতে পল্লীতে প্রবহমান রহিয়াছে, তাহার সংবাদ হয়তো সকলে রাখেন না। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের অধিনায়কত্বে “পল্লীসম্পদ-রক্ষা-সমিতি” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। দত্তমহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া এই সমিতিটিতে বহু শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনো আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই। এখনো বহু বিভাগের দ্রব্য সংগৃহীত হয় নাই।

যাহা হউক, যে প্রবহমান শিল্পধারা লইয়া আমরা আজ

আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহা এখনো প্রতি পল্লীতে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। ইহারই একটি বিভাগ লইয়া আমরা আজ আলোচনা করিব।

প্রত্যেক গৃহে ছেলেমেয়েদের জন্য পুতুল প্রয়োজন হয়। আজ আমাদের মেয়েদের খেলার পুতুল যোগায় জার্মানী, জাপান, কিন্তু পশ্চিম-ত্রিশ বৎসর পূর্বে এদেশে বহুপ্রকার পুতুল প্রস্তুত হইত এবং আমাদের মেয়েরা তাহা দিয়া পুতুল-খেলার আনন্দ উপভোগ করিত। এখনো পল্লীতে পল্লীতে মাটির পুতুল গড়িয়া ছোট ছোট মেয়েরা খেলা করে। এই পুতুলগুলির ধারা লক্ষ্য করিয়া আমার কয়েকটি কথা মনে হইয়াছে। মানুষ তাহার সভ্যতার নৈশবৎ নিশ্চয়ই পুতুল লইয়া খেলা করিত। বস্ত্র জীববস্ত্র, হাতী, ঘোটক, গরু, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি যাহা সে তাহার চতুর্দিকে দেখিতে পাইত, সেই সকলের মূর্তি মাটি দিয়া গড়িয়া সে তাহার খেলার আনন্দ ও শিল্পরস উপভোগ করিত। এই সব জন্তুজানোয়ারের মূর্তি তখনো সে সঠিক গড়িতে শিখে নাই কিন্তু তাহার কলা-রস-পিপাসু অন্তরে যে সৃষ্টির প্রতিভার বিদ্যুৎ চমকাইত তাহারই প্রেরণায় সে গড়িয়াছিল অতি সহজ ভঙ্গীতে হাতী, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতির মূর্তি; এই মূর্তি হয়তো বাহ্যতঃ দেখিতে ঠিক হাতী বা ঘোড়ার মত নয় কিন্তু হাতীর হস্তোত্ত বা ঘোড়ার ঘোটকত্ব এই মূর্তিগুলিতে অতি সহজ রেখায় রূপাইত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে আদিম সভ্য মানুষ হয়ত মানুষের মূর্তিই গড়িতে শিখিয়াছিল, ঠিক মানুষের মত না হইলেও এই মূর্তিগুলিতে মানবত্ব সে সুপরিষ্কৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যাহারা উন্নততর কল্পনার অধিকার লইয়া আসিয়াছিল তাহাদের রচনায় এই মূর্তির মধ্যেই নানারূপ ভাবের ব্যঞ্জনা বিকাশ লাভ করিত। তখন তাহারা শিল্পের বিষয়-বস্তুকে খেলনার উর্দ্ধে তুলিয়া দেবালয়ে দেবমূর্তিতে স্থান দিয়াছিল। প্রাচীন দেবালয়াদিতে তাই সিংহের মূর্তিতে মানুষের মুখ ও তাহার মুখের ভাবে শিল্পীর মনের কথা আজো আমরা দেখিতে পাই। উন্নততম যুগে শিল্পী যে দেবমূর্তির পরিকল্পনা করিয়াছিল, হয়ত তাহার প্রেরণা তাহার পিতামহীর নিকট খেলার পুতুল হইতেই সে লাভ করিয়াছিল। আপনার

কল্পনার সংমিশ্রনে সে সেই পুতুলেই দ্বিভুজ, বড়ভুজ মূর্তি গঠিত করিয়া ভাবের সংমিশ্রনে সৃষ্টি করিয়াছিল দেবত্বের; পূজার বেদীতে সেই শিল্পীর জয়গান আজো আমাদের কানে বাজত হইতেছে।

মানুষ তাহার শৈশবে বাহ্য কিছু ভাল শিক্ষা করে তাহাই নিজের সন্তানকে শিখাইয়া দেয়, সন্তানও উত্তরাধিকার স্বত্বে শিখিবার ক্ষমতা লাভ করে। এই কারণেই আমরা এই সুসভ্য দিনেও সেই প্রাচীন ধারায় পুতুল নির্মাণ ও পুতুল খেলা, আলিপনা অঙ্কণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া থাকি... আমাদের এ যুগের শিশুদের মধ্যে। অবশ্য সহরে ইহার প্রচলন উঠিয়া গিয়াছে। এবং আমরা রঙ্গিন খেলনা পরমা দিয়া কিনিয়া সন্তানকে খেলিতে দিতেছি; কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে আজও সেই প্রাচীন শিল্পধারা অন্তঃসলিলা ভোগবতীর জায় প্রবাহিত রহিয়াছে।

আদিম মানুষ তাহার বৃক্ষতলবাসী দেবতাকে উপহার দিত তাহার শিল্প-সম্পদ, মাটির তৈরী ঘোড়া, মাটির কারু-কাণ্ডাময় পাঞ্জা, কাঠের হাতী প্রভৃতি; আজও পল্লীতে পল্লীতে তাহার প্রচলন রহিয়াছে এবং মাটির ঘোড়া, কাঠের হাতী ইত্যাদি এখনো পল্লীশিল্পীগণ ঠিক সেই প্রাচীন ধারাতেই নির্মাণ করিয়া থাকেন। ইহার জন্ত আমাদের দেশের রক্ষণশীলতা হয়ত অনেকটা দায়ী কিন্তু তাহাতে আমাদের এক্ষেত্রে লাভই হইয়াছে।

আজও প্রতি পল্লীতে মেয়েরা যে মৃৎপুতলী লইয়া খেলা করে উহা তাহারা প্রথমে তাহাদের মাসিমা পিসিমার নিকট শিখিয়া পরে নিজেরাই গড়িয়া লয়। সকলের গঠনক্ষমতা অবশ্য সমান হয় না, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে একটি একটা, একটি ক্রম-পরিণত ধারা সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠে। এই পুতুলগুলি কাদা দিয়া গ্রামের মেয়েরা তৈরী করিয়া পরে ঘুঁটের আঙনে পুড়াইয়া লয়। প্রত্যেকটি পুতুল বিভিন্ন হাতের তৈরী অথচ সকলগুলির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় ও কারুকাণ্ডের দিক দিয়া ক্রমশ উন্নত হইয়া উঠে।

এই সহজ ছন্দই পল্লী-শিল্পের গ্রাণ। আদিম যুগে মানুষ অতি সহজে মানুষের যে আকৃতি গিরিগহ্বরে আঁকিয়াছিল, আজও পল্লীজননী তাহার সন্তানের সেই শিল্পরীতিটি সযত্নে পল্লীজীবনের মধ্যে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু আর বুঝি বাঁচিয়া থাকে না। রঙ্গিন গাটাপাটারের পুতুল না দিলে আজকালকার মেয়েদের আর মন উঠে না। মৃত্তিকার পুতুল তৈরী করিতে তাহারা ক্রমশ ভুলিয়া যাইতেছে।

এই পল্লীশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে আমাদের চোখ-বলসানো বিদেশী জিনিষের মোহ-তাগ্য করিতেই হইবে। আমাদের গকে দেখিতে হইবে, বাহ্য আমাদের ছিল এবং এখনো আছে, তাহা কিছু কম মূল্যবান নয়।

বীরভূম অঞ্চলে হাঙ্গা কাঠের তৈরী একরূপ পুতুল বিক্রয় হয়, উহার আকার কতকটা মিশরদেশের মমীর মত। কবে বাংলার পুতুল শিল্পী মিশরের মমী দেখিয়াছিল, কোন অতীত যুগে তাহার সহিত মমীর পরিচয় তাহা ইতিহাসের অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু বাংলার স্ত্রধরগণ আজও সেই শিল্পধারাটি কাঠপুতলিকার মধ্যে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন।

আমার নিকট আরো কয়েকটি কাঠের কাজ রহিয়াছে। উহাতে ক্ষোদিত চিত্রগুলি সৌন্দর্য্য এবং প্রকাশভঙ্গিতে এতই সুন্দর যে বর্ণনা করা কঠিন। পূর্বে আমাদের দেশের গৃহাদি বেশির ভাগ কাঠেই নির্মিত হইত। মৃত্তিকার গৃহ নির্মাণ-শিল্প বাংলায় এমন উন্নত হইয়াছিল যে ভারতের আর কোন স্থানে তেমন হয় নাই। বীরভূম, বর্ধমান ইত্যাদি অঞ্চলে যে মাটির ঘোড়াতা গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার কার্শিশে নানাবিধ কাঠের পুতুল এখনো রহিয়াছে। এই পুতুলগুলি এমন ভাবে সাজানো এবং উহাদের গঠনভঙ্গী এতই উৎকৃষ্ট কলারসিকতার পরিচায়ক যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্থানান্তরে উহার চিত্র দেখাইতে পারিলাম না। মাটির এবং কাঠের পুতুলের উন্নতির যুগ কবে অতীতের গর্ভে মিলাইয়া গিয়াছে, দেশবাসী আবার তাহার পুনরভ্যুদয়ের জন্ত চেষ্টা করিবেন, এই প্রার্থনা।

পৃথিবীর গ্রন্থাগার সমূহ

শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য্য

আদি যুগে যে সভ্যতা ভারতকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল তার এক বৈশিষ্ট্য ছিল বিদ্যামুখীলন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনা। যুগ যুগ ধরিয়া ভারত চাহিয়াছিল অমৃতের সন্ধান, যে অমৃত প্রবহমান কাল ধরিয়া তাহাদের প্রাণে সজীবিত রাখিবে ধর্ম, সমাজ ও নিষ্ঠা। ভারতের ধর্ম ছিল ভূমার ধর্ম—পরমানন্দ লাভ। তাই সামিনিদিত তপোবন মধ্যস্থ পঞ্চবট-তলে সরল প্রাণ শুদ্ধাচারী ঋষিকুমারগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য্যগণ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সারাকে ভারতীয় পরা-বিদ্যার অমূল্যলতনে ব্যস্ত থাকিতেন। শিক্ষার্থীগণ ব্রাহ্মমূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করতঃ প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ সমিধ ও হবি সংগ্রহের পর শাস্ত্রাধ্যয়নে নিরত হইতেন। ক্রমে নৈমিষারণ্যে, কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, জাহ্নবী-যমুনা-দৃশবতীর পুণ্যতীরে এক একটি বিরাট বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল স্থানে চতুর্বেদ, ষড় বেদাঙ্গ দর্শন, বিজ্ঞান, স্থিতি জ্ঞান, মীমাংসা ও পুরাণের শিক্ষালভের জন্য প্রাচীন ঋষিগণ সমীপে সমুপস্থিত হইতেন নৈষ্টিক স্নাতক মণ্ডলী। বৌদ্ধ যুগে নালন্দা, ওদন্তপুরী, ভক্ষশীলা ও বিক্রমশীলায় জ্ঞানের যে বক্তিকা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল তাহারই উজ্জ্বল আলোকে তৎকালে সমগ্র এশিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

তৎকালে যে সমুদয় বিদ্যাপীঠ গড়িয়া উঠিয়াছিল সেইগুলি ছিল তদানীন্তন ধর্মপ্রাণ নৃপতিদের বিদ্যোৎসাহিতার উজ্জ্বল নিদর্শন। তৎকালে এবং তৎপূর্ব্বকালে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ-পত্র শলাকা দ্বারা ক্ষোদিত গ্রন্থ সমূহ রক্ষার জন্য গিরি গহবরে, আশ্রম কুটীরে এবং তৎপরবর্তী কালে বিদ্যাপীঠের ভবনে সুব্যবস্থা ছিল। মুসলমান রাজত্ব কালেও কোন কোন নৃপতি জ্ঞানানুরোধে নিমিত্ত নিজ নিজ গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান ফার্সী গ্রন্থ সংগ্রহে সতত তৎপর ছিলেন। এইরূপে তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ও বিদ্যোৎসাহিতায় বিরাটকায় গ্রন্থাগার সমূহের সৃষ্টি হইয়া-ছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে লর্ড কার্জনের শাসন-

কালে তিব্বতের দালাই-লামার গ্রন্থাগারের বহু দুস্তাপ্য গ্রন্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রেরিত হইয়াছে।

মোগল সম্রাট বাবর পিতৃরাজ্য হইতে বিভাঙিত হইয়াও গ্রন্থানুরোধে কদাচ অবহেলা করেন নাই। তাঁহার পুত্র সম্রাট হুমায়ুন গ্রন্থাগারের সোপান হইতে পদস্থলিত হইয়াই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট সাজাহানের হুভাগা পুত্র শুবরাজ দারা অধিকাংশ সময় গ্রন্থচর্চাতেই অতিবাহিত করিতেন। সম্ভবতঃ নিজের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াই হিন্দু দর্শনের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া তদানীন্তন সুপণ্ডিত কাশী অধিবাসী কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কবীন্দ্রাচার্য্য দক্ষিণাত্যের মহারাত্রীষ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনিও রাজনৈতিক কারণে স্বীয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতের কুণ্ঠি ও সংস্কৃতির জীবস্থান কাশীতে আগমন করিয়া জ্ঞানানুরোধে নিবসিত হন। সম্ভবতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রভায়ে দশ দিক উদ্ভাসিত হইল। ক্রমে কবীন্দ্রাচার্য্যের জ্ঞান গরিমায় আরুণ্ঠ হইয়া চতুর্দিক হইতে আসিতে লাগিলেন শত শত বিদ্যার্থী, অসংখ্য জ্ঞান পীপাসু পণ্ডিত এবং মনীষী। আমীর ওমরাহগণও তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহার গ্রন্থাগারের বিস্তৃত বিবরণ সম্প্রতি কাশী হিন্দু বিদ্যাপীঠের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবীন্দ্রাচার্য্যের মৃত্যুর পর গ্রন্থাগারের অধিকাংশ গ্রন্থই ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ বরোদার ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট এবং কাশীর সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বরোদা স্টেটের কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত একটি গ্রন্থ-তালিকাতে কবীন্দ্রাচার্য্যের গ্রন্থাগারের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগ দৃষ্টে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাতে বেদ, বেদান্ত, যোগ, মীমাংসা, স্থিতি, স্রুতি, জ্ঞান, সংহিতা, পুর্ণাণ, তন্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ,

ছন্দ, নাটক, সঙ্গীত, জ্যোতিষ, কথ্য, কৌতুক ও চতুষষ্টি কলা প্রভৃতি নানা বিষয়ের গ্রন্থ ছিল।

১৮৫০ অব্দে মিঃ লেয়ার্ড নামক জর্জেনক প্রত্নতত্ত্ববিদ মিশরের মিনিভা নগরীর ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্বে এশিরিয়া রাজ্য সার্ডেনোপোলাসের যে গ্রন্থাগার আবিষ্কার করেন উহাতে টালির ওপর খোদিত প্রায় বিশহাজার গ্রন্থ ছিল। খৃষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিশরের রাজ্য দ্বিতীয় রামেসিসের যে বিরাটকায় গ্রন্থাগার ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অষ্টম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে রোমীয় নৃপতি সার্গেমাগ্নের অন্ত্রপ্রেরণায় পূর্ব ইউরোপে গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছিল এবং তৎকালীন ধর্মসাধকগণের প্রচেষ্টায়ও ইটালী, অষ্ট্রিয়া, হলেণ্ড, জার্মেনী প্রভৃতি স্থানে বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে বৃটেনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতি ও সর্ব সাধারণকে উৎসাহ দান করলে “পাবলিক লাইব্রেরীজ এক্ট” প্রচলন করা হয়। এই আইন অনুসারে প্রতি মিউনিসিপ্যালিটি ও স্থানীয়-স্বায়ত্ত-শাসন মূলক প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট হইতে প্রতি পাউণ্ডে এক পেনী করিয়া কর আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে। বিগত মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ অব্দে এই আইন-কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া কর নির্ধারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। এইভাবে ইউরোপের স্থানে স্থানে বিরাটকায় গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে প্যারিস ত্রাশনেল লাইব্রেরীতে ৪৫লক্ষ গ্রন্থ ও লক্ষাধিক পুঁথি সুরক্ষিত আছে। বৃটিশ মিউজিয়ামের পুস্তকের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪৫ লক্ষ এবং পুঁথিও লক্ষের উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতের বিখ্যাত লাইব্রেরীগুলির মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের “বডলিয়ান লাইব্রেরী” স্থান বৃটিশ মিউজিয়ামের ঠিক পরেই, উহার পুস্তকের সংখ্যা ১৫ লক্ষেরও উপর। ওয়াশিংটনে অবস্থিত “লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস” ৫০ লক্ষ পুস্তক রক্ষিত আছে। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনজুয়ার কারাকাস সহরে ৮ লক্ষ পুস্তকের স্থান সঙ্কুলানোযোগী একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর চেকোশ্লোভাকিয়ায় গ্রন্থাগার-আন্দোলন বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ার্স সহরে একটি “জাতীয় গ্রন্থাগার” স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে ওয়ার্স সহরে যে সমস্ত গ্রন্থাগার ছিল তন্মধ্যে

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটিই ছিল শ্রেষ্ঠ, বর্তমান সময়ের লেলিহান জিহবার সম্মুখে পড়িয়া এই গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা যে-কিছু দাঁড়াইয়াছে তাহা তথাকার অধিবাসিরাই জ্ঞাত আছেন। পোল্যান্ডের পোজেন সহরেও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার ছিল। পোল্যান্ডের উইলনো নগর এককালে লিথুনিয়ার রাজধানী ছিল। এই সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটিই প্রধান। লিথুনিয়ার বিগত মহাযুদ্ধের পর একটি সরকারী অর্থে প্রতিপালিত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থাগারে ৬৫ হাজার গ্রন্থ আছে। বার্লিন ও সেন্টপিটার্সবার্গের রয়েল লাইব্রেরী, রোম, মিলানো, জুরিখ, ভিয়েনা, ষ্টাট্‌গার্ট, ড্রেজ্‌ডেন, লাইপজিগ্‌ কোপেন-হাগেন প্রভৃতি নগরের বিভিন্ন গ্রন্থাগার দেখিলে বিশ্বাবিষ্ট হইতে হয়। মধ্য ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন কারণে সমগ্র পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। বিগত মহাসমরের পবিত্র রাষ্ট্র বিপ্লবে নব নব রাজ্যের উত্থান পতন বহু বিভিন্ন প্রকৃতির গ্রন্থাগারের জন্ম দিয়াছে। ইউরোপের নানা স্থানে বিরাট ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কোন কোন দেশে শিশু তরুণ ও নারীদিগের জন্য পৃথক গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই কোন কোন দেশে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকাদিগের জন্য Dollery বা পুতলাগার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই সব পুতলাগারে বিভিন্ন সাজে সজ্জায় সজ্জিত পুতল এবং বহু প্রকারের খেলনা আছে। বালক বালিকাগণ ঐ সকল পুতল বা খেলনা নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইতে পারে বা তথায় বিশেষজ্ঞের চালনায় খেলা করিতে পারে। ঐ সমস্ত খেলার ভিতর দিয়া বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষাদানও করা হইয়া থাকে। কোন কোন দেশের গভর্নমেন্ট এইভাবে খেলিবার দ্রব্য, সঙ্গীত-অনুশীলনের যন্ত্রপাতি, শিল্পকলা ও অত্যাশ্চর্য ধরণের জনশিক্ষা মূলক দ্রব্যাদি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। রাশিয়াতে অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের জন্ম যে সমস্ত গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। উক্রেইনে অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের একটি গ্রন্থাগারে ষাটটি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পঞ্চাশ হাজার পুস্তক আছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার পর হইতেই তথায় গ্রন্থাগার আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার কিব্ (Kiev)-সহরের জাতীয় গ্রন্থাগারে ৭১ লক্ষ গ্রন্থ সাধারণ লেখিত গ্রন্থাগারে ৬৬ লক্ষ গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। যে সমস্ত পুস্তক সরকার বাজেয়াপ্ত করেন লণ্ডন সহরে তাহারও একটি গ্রন্থাগার রহিয়াছে। কতৃপক্ষের বিশেষ অনুরাগ নইয়া উক্ত গ্রন্থাগারে বসিয়া এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিতে এবং জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়া আনিতে পারা যায়।

জার্মেনীর রাজধানী বার্লিন সহরের সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ রাস্তা উণ্টার-ডেন-লিঙেনে অবস্থিত প্রুশিয়ান স্টেট লাইব্রেরীর এক অংশে যে এক অভূতপূর্ব বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। পৃথিবীর অল্প কোন স্থানে আনন্দ ও জ্ঞান দানের এই প্রকার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। জার্মেনীর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক উইল-হেল্ম-ডোয়েগেন এই অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানটির জন্মদাতা। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জাতীয় মানবের বিভিন্ন প্রকার ভাষা ও সঙ্গীতের প্রায় ২৫ হাজার তাত্ত্বিক ম্যাট্রিক্স (Matrices) রক্ষিত আছে। তাহাদের প্রত্যেকখানা হইতে এক একটি ভাষার সঙ্গীত, বক্তৃতা ও ক্রন্দনের রেকর্ড ঢালাই করা যাইতে পারে। আগন্তুকগণ এই লাইব্রেরীর সাধারণ বিভাগে বসিয়া নীরবে পাঠ করিতে পারেন, কিন্তু এই বিভাগে আসিলে পাঠ করিতে হয় না, কেবল শ্রবণ করিতে হয় মাত্র। অধ্যাপক ডোয়েগেন ফনোগ্রাফের যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বনে সর্বপ্রথমে ১৯১২ অব্দে এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

স্টেট লাইব্রেরীর এই অংশকে ‘কণ্ঠস্বর (voice) লাইব্রেরী’ বা ‘বাণ্য লাইব্রেরী’ (talking library) বলা হয়।

বিগত মহাসমরে পৃথিবীর ৮৭টা বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন ভাষাভাষী সৈনিকগণ যখন বন্দী হইয়া বার্লিনে নীত হইয়াছিল, সেই সময় অধ্যাপক ডোয়েগেন বন্দিনিবাসে পরিভ্রমণে আসিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষাভাষী সৈনিকগণের ২৫০টি ভাষা, বহু মিশ্র কণ্ঠস্বর, অগণিত সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতির রেকর্ড প্রস্তুত করিয়া ‘বাণ্য লাইব্রেরী’টিকে একটি মূল্যবান শিক্ষাপ্রদ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিলেন। আগন্তুকগণ আসিয়া শুনিতে লাগিলেন, ইংরাজ

সৈনিকের-টিপারারী, আরব সৈনিকের আজান, আর দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের বেদের স্বকৃত পাঠ। সেখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল ভারতের ১৮টি বিভিন্ন ভাষাভাষী সৈনিকের কথ্য ভাষা, হিমালয় পর্বতের পাঁচ প্রকার সৈনিকের কথ্য ভাষা, সুদান-বাসীদের ২৩ প্রকার কথ্য ভাষা, এ ভিন্ন হিমোটক, সেমোটক, গোটিক, স্নেভোনিক, ম্যাগিয়ার এবং আরও যে কত প্রাকৃত, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার রেকর্ড প্রস্তুত হইল, তাহা দেখিয়া তৎকালীন ভাষাবিদগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ইহাতে যে কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষারই সুবিধা হইল, তাহা নহে, ব্যাকরণ-হীন ভাষা সমূহের যে ব্যাকরণ সঙ্কলনে বিশেষ সুবিধা-হইল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

এই লাইব্রেরীতে বহু ধ্বংস প্রাপ্ত জাতির ভাষার রেকর্ডও রক্ষিত আছে। ইউরোপের আদিম অধিবাসিদিগের অন্তর্ভুক্ত বান্ধগণের এসকয়ারা নামক ভাষার রেকর্ডও এই স্থানে স্বরক্ষিত আছে, স্মরণ্য কালের কুটিল গতিতে কোন জাতি ধরাবক্ষ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও তাহাদের মাতৃভাষা একেবারে বিলুপ্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

এই লাইব্রেরীতে যে আগন্তুকগণ কেবল মাত্র বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সঙ্গীতাদিই শুনিতে পায় তাহা নহে, সঙ্গে সেই সেই গায়ক ও বক্তাদের চিত্রও দেখিবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

তাহা ছাড়া পৃথিবীর নানা দেশের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বক্তব্যও এই লাইব্রেরীতে বসিয়া শুনিতে পারা যায়। যাহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও রাজনীতিক্ষেত্রে জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, এই লাইব্রেরীতে তাহাদের বক্তৃতা শোনার ব্যবস্থা ও চিত্র দেখিবার নয়ন ও মন সার্থক করিবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, রামজো-মেকডোনাল্ড, আর্নল্ড হ্যাভেল, গ্যালস্‌ওয়ার্দি, হিটলার, রুজভেল্ট প্রভৃতি ব্যক্তিগণের বক্তৃতাও এখানে শুনিতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক দিক হইতেও এই লাইব্রেরীটি বিশেষ কোঁক্ক-প্রদ ও মূল্যবান। এখানে আগন্তুকগণ শুনিতে পান, কি ভাবে জেনারেল হিগেনবার্গ পূর্ব প্রুশিয়া টানেনবার্গের যুদ্ধে বিজয়ী সেনানীকে সম্বোধন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন, আর শুনিতে পান ভূতপূর্ব

সাক্ষর করিবার জন্য ইংরেজ-ফরাসী-ইটালী-বেলজিয়াম প্রভৃতি জাতির নেতৃবৃন্দ সমাসীন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হ্যারি হিটলারের জাতিশ্রেণীর চ্যান্সেলার নির্বাচিত হইয়া হিটলারের সমীপে উপস্থিত হইয়া বশুতা স্বীকার করা এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অধিপতি অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ উপলক্ষে মিষ্টার বলডুইন ও কেট্টার বারীর আর্কবিশপের বিয়োগকালীন মর্মস্বস্তিক বক্তৃতা এই বাস্তব লাইব্রেরীতে নিয়ত ধ্বনিত ও প্রতি ধ্বনিত হইতেছে। ইহাই অধ্যাপক উইল্‌ হেল্ম ডোয়েগেনের অবিস্মরণীয় দান। অধ্যাপক সিলভিয়ান লেভী, অধ্যাপক লুইডাস, অধ্যাপক আরপল, মনীষী র'মার'লা, আইনষ্টাইন প্রভৃতি মনীষীগণ এই লাইব্রেরীর ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপকের উচ্চ ভাষায় প্রশংসা করিয়াছেন। এই বিচিত্র লাইব্রেরীর অনুস্মরণ আজ পর্যন্ত কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

জনমে জনমে যোগা-যোগ ।

মৃত্যু

শ্রীমমতা ঘোষ

এই যে হেথায় জামা কাপড় তারি
এই যে দেখি কলম খাতা বই,
জড়িয়ে আছে চারধারেতে সব—
শুধু আমার কান্ন মাণিক কই ?
গুছিয়ে তোলা যত্ন ক'রে আজি
স্মৃতি-মাথা সকল জিনিস তার,
থেকে থেকে এই গুলিরে দেখে
তার কথা যে ভাব'বো বারে বার ।
যা কিছু তার ছিল নিজের ব'লে
সবই গেছে হেথায় রেখে দিয়ে,
তালবাসার সুবাসটুকু শুধু
যাবার বেলায় সঙ্গে গেল নিয়ে ।
মনটি যে তার নরম ছিল বড়,
ছিল নরম তুলতুলে তার তন্ন,
জনম তার জ্যোষ্ঠা তারায় জানি,
জন্ম রাশি গুরুর গেহ ধন ।
তারার দোষে কাল না পুরো হ'তে
গেল সে কি কালেরি কোল মাঝে ?
শাওন-শিশু জ্যোষ্ঠ মাসের তাপে
শুকিয়ে গেল—ফুটতে পারল না যে ।
নির্গমেয়ে সবাই ছিল ব'সে—
কী গেল তা দেখল না কি কেহ ?
কোন জিনিষের বিচ্ছেদে হায় আজ
অর্থ বিহীন অসীম স্নেহের দেহ ।
এই তনুরে কতই ভালোবাসা—
সাজানো আর কতই আলোচনা,
শ্মশান-ভূমে তার এই পরিণতি ?
রাশি রাশি জমছে ভস্মকণা ।
দেহের সাথে আত্মারো নাশ হয় ?
নাকি কোথাও থাকে নতুন বেশে ?
লোকে লোকে ঘুরে ঘুরে শেষে
মাহুষ রূপে আসে মাটির দেশে ?
মৃত্যু যে নেয় কোলের পরে টেনে—
মধুর সে-নয়, সে যে ভয়ঙ্কর,
তার পিছেতে কী আছে নেই জানা—
গুধালে তার মেলে না উত্তর ।

নয়ন আমার দেখবে না আর তারে—
শ্রবণ নাহি শুনবে তাহার কথা,
আজকে হ'তে ভুবন ঘিরে শুধু
রবে তাহার ভীষণ নীরবতা ।

*

*

*

খুঁজি তোমায় তারায় তারায় আজি,
খুঁজে বেড়াই আবার আকাশ মাঝে ;
মাটির বুকে বেড়াই খুঁজে খুঁজে,
খুঁজি তোমায় নিত্য সকাল সাঁঝে ।
ভূপ্তি আজো হয় নি তোরে পেয়ে—
দেখার ক্ষুধা রয়েছে মোর চোখে ;
সব ইন্দ্রিয় নয়ন হ'য়ে আজি
অনিমিখে দেখতে চাহে তোকে ।
সাত বছরের নবীন সহচর—
রাতের সখা, দিনের উজল আশা,
এই পৃথিবী লাগল না কি ভালো—
তুচ্ছ হ'ল মায়ের ভালবাসা ?
পিঁজরে খানি রইল শূত্র প'ড়ে—
পরান-পাখী কোথায় গেল উড়ে—
কোন সাগরের উপর দিয়ে দিয়ে
কোন আকাশে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ?
বৎস আমার, কোন্‌খানেতে তুমি ?—
এক প্রভাতে হঠাৎ শুনি “নাই”,
নিষ্ঠুর আগুন দীপ্ত শিখা তুলে
আপন বুকে দিল তোমায় ঠাঁই ।
কাল যে ছিল সবায় মধ্যখানে—
আজকে কোথাও চিহ্ন নাহি তার,
সোনার তন্ন ছাই যে হয়ে গেছে—
চাইলে কেঁদে ফিরবে নাক' আর ।
এখনো যে হয় নাকো বিখাস—
বাড়িয়ে দ্রুহাত আকুল আশায় চাহি,
মুক প্রকৃতি নীরব ভাবায় বলে
“নাইরে সে আজ এই ভুবনে নাহি ।”

দ্রাবিড় দেশ

শ্রীকমলা দেবী, সুধর্ম্মা, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

বৃহস্পতিবার, ১৭ই আগস্ট, ১৯৩৯—

ত্রিচীনোপলী—শ্রীরঙ্গম—জম্মুকেশ্বর

খুব ভোরবেলায় গাড়ি ত্রিচিনোপলীতে পৌঁছিল। ত্রিচিনোপলী স্টেশনটা খুব চমৎকার—প্লাটফর্মগুলি (আমাদের দেশের ভাষায় অর্থাৎ বিহারের হিন্দীতে “লাট্‌ফর্ম” গুলি) খুব চওড়া, আর সব বক্‌ছক্‌ তক্তক্‌ করছে। বাহির থেকেও এই স্টেশনটা দেখতে খুব সুন্দর, আধুনিক ধরণের বাড়ী। সামনে খুব চওড়া একটা চত্বর বা খোলা জায়গা আছে। আমরা বেরোতে না বেরোতেই ট্যাক্সিগুলারা এসে ঘিরে দাঁড়াল, তারা ইংরেজী আর হিন্দীতে মহা উৎসাহে কথা কইতে লাগলো। আমার স্বামী এখানে আর ছইবার এসেছিলেন, জায়গাও সব জানেন, এদের ধরণ-ধারণও জানেন; ট্যাক্সি ওলাদের আপসে প্রতিযোগিতায় দেখলুম ভাড়া নামতে আরম্ভ করলো। হু-মাইল দূরে সহর, ঠিক হল ঐ ট্যাক্সি করে গিয়ে নিজেদের পছন্দমত ধর্ম্মশালা বা হোটেল ঠিক করে নেব; ট্যাক্সির ভাড়া খুবই সস্তা বলে মনে হলো। প্রথমে আমরা গেলুম সহরের ম্যুনিসিপ্যাল ধর্ম্মশালায়, সেখানে আমার স্বামী একদিন ছিলেন। বাড়ীটা বেশ পরিষ্কার, একতলা, কিন্তু তখন অনেকগুলি যাত্রী এসে বেশীর ভাগ ঘর দখল করেছে। ধর্ম্মশালার কর্মচারী এসে যত্ন করে ঘর খুলে দেখালে, কিন্তু এতগুলি মেয়ে-পুরুষের কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে দিন কাটানো আমাদের পছন্দ হল না, বিশেষতঃ যখন খুটিনাটি নানান অসুবিধার কথা মনে হল। কয় বছর আগে আমার স্বামী যখন এখানে এসেছিলেন কতকগুলি রন্ধুর সঙ্গে, তখন এখানে উঠেছিলেন, ভীড়-টীর ছিল না, তাঁরাই এখানে রাজত্ব করে গিয়েছিলেন, সে-কথা মনে করে তিনি ট্যাক্সিগুলোকে আগে এই ধর্ম্মশালায় আসতে বলেন; আমরা অল্প বাসার সন্ধানে গেলুম, ট্যাক্সিগুলোকে বললাম একটা ভাল দেখে হিন্দু

হোটেল নিয়ে যেতে। ধর্ম্মশালার কাছেই মডার্ন হিন্দু হোটেল, না, নিউ হিন্দু হোটেল এই নামের একটা হোটেল আমাদের নিয়ে হাজির করলে। বাড়ীখানা বাহির থেকে দেখতে বেশ ভালো, দোতলা, সামনেটাষ একটা ভোজনাগার, তখন ঝুঁটি-বাঁধা তামিল ভদ্রলোকের দল কেউ খালি গায়ে কেউ বা টুইলের কামিজ পরে, মার্বেল পাথরের টেবিলে বসে “ইড্‌নৌ, উপ্‌মা, ঘোসাই, বড়াই প্রভৃতি অল্পপান যোগে প্রাতঃকালীন কফি সেবায় মনোযোগ করেছেন, আর খবরের কাগজ প’ড়ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে খুব তড়বড়ে ইংরেজি আর তামিল মিশিয়ে উচ্চৈঃস্বরে আপসের মধ্যে তকরার করছেন। আমরা গাড়িতে রেখে স্বামী গেলেন ভিতরে ঘরের খোঁজে, ট্যাক্সীওলা সঙ্গে গেলো, আমি গাড়িতে বসে দেখতে লাগলাম। ঘর পছন্দ করবার জন্ত আমার ডাক পড়ল, সব চেয়ে ভাল ঘর বা খালি ছিল সেটা দেখলাম, ছোট-ঘর, দুখানা খাট, একটা লোহার একটা নেয়ারের, লোহার ষাটটায় একটা নূতন টিকিনের গদি, দুখানা চেয়ার, একটা টেবিল, আর দেয়ালে একটা আয়না, আর—দেয়ালের দুই এক জায়গায় পানের পিকের পেক্টিং। ঘরটা দোতলায়, নাইবার ঘর টর সব নীচে আর বেশ আবরু আছে। ঘরের ভাড়া দিন এক টাকা। সারারাত রেল এসেছি, সকালে নাইবার ইচ্ছা বড়ই হচ্ছিল, বাসার জন্ত কোথায় আর ঘুরবো, এই হোটেলেরই থাকা ঠিক করলাম। জিনিষ-পত্তর সব ঘরে তুলে দিলে, হোটেলের চাকর আর আমার চাকর জ্ঞানকে বলে বালুতি কয়েক জল এনে ঘরটা আর দেয়ালের খানিকটা করে ধুয়ে ফেলতে বললাম আর আমি নাইবার জন্ত নিচে নাইবার ঘরে গেলুম।

নেয়ে ঘরে এসে দেখি ঘরটা একটু পরিষ্কার আর ভদ্র হয়েছে। স্বামীও চান-টান করে তৈরী হয়ে নিয়েছেন; হোটেলের চাকর তখন পাতরাশ দিয়েছিলো—সেই মাদ্রাজী

খাবার, উপমা লাড়ু কফি, আর আমার জন্ম চা। ইতিমধ্যে হোটেলের যে কজন স্থায়ী ভাড়াটে ছিল তারা জানতে পেরেছে যে অমুক নম্বরের ঘরে কলিকাতা থেকে এক বাঙ্গালী ভ্রমলোক সস্ত্রীক এসে উঠেছেন; একটা সরু বারান্দা দিয়ে আমাদের ঘরে পৌঁছতে হয়। পথে আরও তিন চারটে ঘর পড়ে। সব ঘরগুলোই ছোট ছোট। আমরাও আড় চোখে অল্প ভাড়াটাদের একবার দেখে নিলাম। দুই একটা ঘরে তামিল ভ্রমলোক একজন দুজন করে আছেন। স্বামী বল্লেন, এটা হোটেল-কে-হোটেল, মেস-কে মেস, এরা নিরীহ কেরাণী বা 'ইন্সল মাস্টার', মাস মাস খরচা দিয়ে থাকে! আর একটা ঘরে একা থাকে নাহুস নুহুস ফর্সা চেহারার এক সৌখীন ছোকরা, তার ঘরের কোনে এক আরসি-টেবিলের উপর নানান রকম তেল সাবান পাউডার সুগন্ধি চিকিৎসা বুদ্ধি প্রভৃতির পসার সাজানো। মনে হলো, সে আমাদের শোনা-বার জন্মই গ্রামোফোনে সায়গলের হিন্দী গানের রেকর্ড চড়িয়ে দিলে। এইভাবে যতক্ষণ আমরা হোটেলে ছিলাম সে তার তিন চার খানা সিনেমার গানের রেকর্ড বার পাঁচ ছয় করে শুনিতে দিলে। লোকটাকে ভ্রমঘরের চেহারার দেখলেও একটু কি রকম যেন মনে হলো। স্বামী বললেন যে ও তামিল বা দক্ষিণের লোক নয়, তারা এ রকম করে ঘাড়ে পড়া হয়ে অচেনা মেয়ে পুরুষের কাছে নিজেকে জাহির করতে চেষ্টা করে না; হিন্দী গানের রেকর্ড নিয়ে বেড়াচ্ছে, এ উত্তর ভারতের কিম্বা বোম্বাই অঞ্চলের কোন উজবুগ হবে। ঐ হোটেলেরই ছোকরার ঘরের পাশের ঘর দখল করে একটা মহিলা ছিলেন—বয়স ২৫ থেকে ৪৫ মধ্যে একটা কিছু, রংটা কালো কিন্তু মেজে ঘবে রং পাউডার লাগিয়ে ফর্সা করবার চেষ্টায় আছে, পরণে তামিল ধরণের শাড়ি, এটাকে আমাদের যেন একটু কেমন কেমন বোধ হলো। এর সঙ্গে আমার হুচারবার চোখাচোখি হয়েছিল। দেখলুম যে গ্রামোফোনগুলো ছোকরার সঙ্গে এর একটু বেশি মাথামাথি। এদের ধরণ ধারণ দেখে মনে একটা প্রশ্ন জাগতে লাগলো “কে তুমি কুলপাবনী!” স্বামীর মত হলো যে এটা হয়তো সিনেমা বা থিয়েটারের অভিনেত্রী, একটু নিরেশ দরের। আমাদের এই পথ-যাত্রীর জীবনে ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে”, তার উপর কত রকম মাহুষ নজরে আসে, এও এক নতুন জিনিস দেখলুম।

চা-জল খাবার খেয়ে বেকলাম প্রথমটা ত্রিচিনোপলী শহর দেখতে। শহর দেখবার জিনিস হচ্ছে শহরের মধ্যেই একটা সটান উচু পাহাড়ের উপরে কতকগুলি মন্দির। মন্দিরের লাগোয়া একটা প্রাসাদ আছে, সেটা আগে একটা কেল্লা রূপে ব্যবহার হতো। পাহাড়ের পায়ের তলায় একটা মস্ত বড় ঢোকা আকারের পুকুর, এর চারিদিকে রাস্তা, এরই একটা রাস্তা ধরে বাজারের বড় রাস্তা চলে গিয়েছে, সেই বাজারের রাস্তা থেকে ত্রিচিনোপলীর পাহাড়ের মন্দির আর গড়ের উপরে উঠবার পথ। সব জায়গাটা যেন একটা বিরাট মন্দির। আমরা একটা ঢাকা পথের ভিতর দিয়ে গেলুম। দুধারে ফুল, রুদ্রাক্ষের মালা, ক্ষটিকের মালা ও ক্ষটিকের শিব প্রভৃতির ছোট ছোট দোকান। সেবার আমার স্বামী যখন এখানে আসেন তখন এখান থেকেই একটা ছোট ক্ষটিকের শিব আর গণেশ নিয়ে জান, এছাড়া আমাদের বাড়ীতে আছে। পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি, সেটাও ছাতে ঢাকা, এই সিঁড়ির দুপাশে মন্দির আর প্রাসাদ কতকগুলি আছে, সব পাথরে তৈরী। এটা পাথরের আর পাথরের মূর্তির রাজ্য। নিচে সিঁড়িতে ওঠবার মুখে বাঁহাতি একটা ছোট গণেশের মূর্তি আছে, সামনে মস্ত বড় এক প্রদীপ জ্বলছে, মূর্তিটা ঘি মাখিয়ে মাখিয়ে আর প্রদীপের ভূষার কালো করে ফেলেছে, সেখানে ভক্তদের খুব ভীড়, যত লোক এই সকাল বেলায় আফিসে বা কাজে যাচ্ছে তারা ভক্তিভরে গণপতির দর্শন করে যাচ্ছে। এদেশে সত্যিই লোকেরা ঠাকুর দেবতা মানে। গণেশ আর কান্তিকের পূজা এদেশে খুব বেশী। তামিলেরা ঠাকুরের সামনে যখন নমস্কার করে তখন এদের নমস্কারের ভঙ্গীটা আমাদের চোখে একটু অদ্ভুত ঠেকে। স্বামী আমায় দেখালেন—এরা দুটা হাত জুড়ে মাথায় ঠেকিয়ে মুখে একটা অদ্ভুত ভাব এনে ঠাকুরের সামনে একবার ঘুরে যায়।

পাহাড়ের আঙ্গেকটা উঠে এই ঢাকা সিঁড়ি-পথের শেষ, সেখানে সমতল ভূমি একটু আছে, তার উপরে একটা ছোট পল্লী গড়ে উঠেছে। এই পল্লীটিতে বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণের বাস; ফিরতি পথে এদিকটা একটু ঘুরে যাই, একটা রাস্তার দুই ধারে এই পল্লীটা; এখানে একটা পোষ্ট অফিস আছে। তারপরে আবার পূর্বের মতন ছাত ঢাকা পথ, তার একদিকে পাথরের প্রাসাদ আর তার উপরে মন্দির—মহাদেব, পার্বতী,

কাভিক আর গণেশের। মন্দিরটা বড় অন্ধকার, সব যেন স্ফুটনের মধ্যে, তবে মাঝে মাঝে চওড়া আঁখি আর মণ্ডপ আছে। প্রদীপ বা মশালের আলো না হলে মন্দিরের ভিতর দেখা যায় না।

এর উপরে, পাহাড়ের মাথায় আর ছাতাওয়া সিঁড়ি বা বাড়ী নেই, সেখানটা সব খোলা। এখানেও দেখবার জিনিস আছে। প্রথমে বাঁদিকে পড়ে পাহাড়ের গা-কেটে তৈরী একটি ছোট মন্দির। এই মন্দিরটা প্রায় বারো শ' তেরো শ' বছর আগে পল্লব বংশীয় রাজাদের দ্বারা তৈরী হয়েছিল, যাদের হাতে মহাবলিপুত্রের আর কাঞ্চীপুত্রের প্রাচীন মন্দিরগুলি গড়ে উঠেছিল। খুব সরু সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরে উঠতে হয়। মন্দির মানে খালি একটা ছোট বারান্দা। সেই বারান্দার তিন দিকে পাহাড়ের গা-কেটে কতকগুলি ছবির মত মূর্তি। ডানদিকে একটা ছোট ঠাকুর ঘর তার দরজার দ্বারা ছোট স্তম্ভের দ্বারপাল মূর্তি। বাঁ পাশের দেয়ালে একটা খোঁদাই করা চিত্র আছে, সেই চিত্রটা খুব স্তম্ভর, এটা মহাবলিপুত্রের পাহাড়-কাটা চিত্রগুলির মতন তৈরী। গঙ্গাধর মহাদেবের মূর্তি। চার-হাত মহাদেব একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন, বাঁ পা-টা মাটির উপর, ডান পা-টা উঁচু করে একটা বামন-আকার রাক্ষুসের মাথায় রেখেছেন, উপরের ডান হাতটা দিয়ে মাথার একটা লম্বা জটা টেনে ধরেছেন, সেই জটাতে আশ্রয় করবার জন্য উপর থেকে গঙ্গাদেবী নেমে আসছেন। মহাদেবের আশ-পাশে আকাশে আর মাটিতে দেবতা আর ঋষিরা রয়েছেন। এই মূর্তিটা বেশ চমৎকার, কিন্তু পাথর ক্ষয়ে গিয়ে অনেক বারগায় মুখ-টুক গুলি একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার স্বামীর হয়তো ততটা পছন্দ হবে না, কিন্তু এই গঙ্গাবতরণের ছবি রবিবর্মারই আমার বেশী ভাল লাগে। ছেলেবেলা থেকেই এই রং চংয়ে ছবিখানি বাপের বাড়ীতে দেখে আসছি, বরফে ঢাকা হিমালয়ের চূড়ার মধ্যে শিব বাঘ-ছাল পরে আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন, জলের ধারার মধ্যে গঙ্গা নেমে আসছেন, ঠিক যেন আকাশ থেকে আলোর ধারা শিবের জটায় এসে পড়ছে, শিবের এক পাশে সুরভি গন্ধ নিয়ে পৃথিবী দেবী দাঁড়িয়ে, আর এক পাশে ভগীরথ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে—যা হোক একটা অনেক দিনের পরিচিত পুরাণের গল্পের এই রকম স্তম্ভর পাথরে কাটা

ছবি দেখে মনটা খুসিতে ভরে গেলো। এই পাথরে কাটা মন্দির ছাড়া আছে একটা গণেশের মন্দির, সেটা সকলের চাইতে উঁচুতে। অল্প গড়েন সিঁড়ি দিয়ে এই মন্দিরে উঠতে হয়। এই মন্দিরের গণেশ মূর্তি নাকি রাবণের প্রতিষ্ঠিত।

এই পাহাড়ের মাথা থেকে চারদিকে খুব স্তম্ভর দৃশ্য দেখা যায়। উত্তর আর পূর্ব দিকে সবুজ ধানের ক্ষেত আর নারকোল বন, আর রূপার চওড়া ফিতার মতন কাবেরী নদী উত্তর দিয়ে পূর্ব মুখে বেয়ে যাচ্ছে। রেলের লাইন চলে গিয়েছে কাবেরীর উপরে সাঁকো দিয়ে, চলন্ত ট্রেনের গাড়িগুলি এত উঁচু থেকে কত ছোট দেখাচ্ছে। পূর্ব দিকে ছ'একটা পাহাড় সমতল ভূমি থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, সেগুলির মাথায়ও প্রাসাদ আর মন্দিরের মুকুট। দক্ষিণ দিকে এই পাহাড়ের পায়ের তলায় ত্রিচিনোপোলি সহর জড়িয়ে রয়েছে। সহরের সব চৌকো চৌকো ইঁট আর পাথরের বাড়ী, বেশীর ভাগ সাদা চূর্ণকাম করা, উপর থেকে দেখতে ঠিক যেন কাঁশী বা অল্প কোন উত্তর ভারতের সহর, রোদ্দুরে সব যেন ঝক ঝক তক তক করছে। মাঝে মাঝে মন্দিরের আর গির্জার চূড়া।

আমরা এর পর নেমে এলাম। আধা পথে যে ব্রাহ্মণ বস্তীর কথা বলেছিলাম, স্বামী সেইটার মধ্যে দিয়ে আমার নিয়ে গেলেন। এই বস্তির এক কোণে পাহাড় কেটে তৈরী পল্লব রাজাদের আর একটা মন্দির আছে, সেটা দেখবার জন্যে, আগে এটা তাঁর দেখা হয়নি। বস্তি মানে একটা চওড়া রাস্তা, আর তার দ্বারা বাড়ী। প্রায় সব বাড়ীর সামনে সদর দরজার দ্বারা একটা করে রোয়াক, খোলার চালে ঢাকা, আর সব বাড়ীর সামনে চালের গুঁড়োর আলপনা দেওয়া—এই আলপনা আমাদের দেশের মত নয়, একটু অন্য ধরনের। বাড়ীর গিন্নি বউয়েরা বেশ স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা করছে, রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে। এদের কুমারী আর সখবাদের মাথায় কাপড় নেই, সন্ধ্যাই রঙ্গিন কাপড় পরা—কালো-লাল-হলুদে-সবুজ; খালি বিধবারা সাদা কাপড় পরে আর মাথায় কাপড় দেয়, কিন্তু কাণ দুটো বের করে রাখে, এই ব্রাহ্মণ পল্লীর রাস্তা থেকে ত্রিচিনোপোলির পাহাড়ের উপর তলার রাজ প্রাসাদের দেয়াল সোজা উঠে গিয়েছে। আমরা খানিকটা পথ গিয়ে ডান হাতি বেকে একেবারে পাহাড়ের গায়ের কাছে গিয়ে পড়লাম। এখানটায় ব্রাহ্মণের

বাস নেই, কয়েক ঘর নীচু হিন্দু জাতের বাস। দু-পা গিয়েই আমরা সেই মন্দিরটার একেবারে সামনে এসে পড়লাম। পাশে কতকগুলি খুব ভালো চোরা কুঁড়ে। পাহাড়ের গা-কেটে একটি খুব বড় হল ঘরের মতন, চার কোনা; সামনে কতকগুলি খাম। কারুকার্যের বাহুলা নেই। হল ঘরের দুপাশে দুটা ছোট ঘর, সে দুটার একটাতে শিবলিঙ্গ মূর্তি, আর একটাতে বিষ্ণু মূর্তি আর এতটা ঘরের সামনে আবার একটি করে নাট মন্দির মতন আছে। বড় বারান্দার গায়ে পাহাড়ের উপর পাঁচটা অস্ত্র দেবতার মূর্তি—মাহুঘের আকার হবে; মূর্তিগুলি পর পর গণেশ, কার্তিক, ব্রহ্মা আর দেবী, মূর্তিগুলি সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে। এই রকম পাহাড়-কাটা মন্দির দেখলে আর এর মহান শিল্প কি ভাবে দেবতাদের মহিমা প্রকাশ করছে তার অল্প মাত্র ধারণা করতে পারলে ধন্য হয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু "হায়! এমন সুন্দর মন্দিরের, এমন সুন্দর কীর্তির কোনও আদর নেই। মন্দিরের মধ্যে দখলানু, এক রাশ ভুট্টার দানা শুকোতে দেওয়া হয়েছে, আর গরু ছাগল বেঁধে সব নোংরা করে রেখেছে। মন্দির দেখে মনে আনন্দ আর কষ্ট দুইই হলো।

নিচে নেমে এলাম। আমাদের দুজনেরই রুচি মতন এদেশের চালের পিতল কাঁসার কিছু বাসন কিনবার জন্য একটি বাসনের দোকানে গেলাম। আমার স্বামী একটি বড় পিতলের ঘড়া, খাস দ্রাবিড়ী চালের, ফরমাস দিলেন, তার গায়ে প্রাচীন ধরণের নকশা থাকবে আর তামিল ভাষায় কি সব লেখা থাকবে। আমি কতকগুলি ঘর-গৃহস্থালীর জিনিস কিনলাম। আর নিলাম আমার তৈরী অতি সুন্দর সীতা, রাম, লক্ষ্মণ আর হনুমানের মূর্তি।

এই মূর্তিগুলি চমৎকার দ্রাবিড় বা তামিল ধরণের, প্রত্যেকটা এক বিষয় করে বড় হবে, রাম আর সীতা পাশাপাশি সিংহাসনে বসে আছেন, লক্ষ্মণের আলাদা দাঁড়ান মূর্তি, রাম-সীতা-লক্ষ্মণের মাথায় আমাদের বরের চৌপরের মতন উঁচু মুকুট, তিনজনের বেশ লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন। হনুমান হাঁটু গেড়ে যেন রামের পদ-সেবা করছেন। এই কটা মূর্তির দাম টাকা ষোলো নিলো। তামিল দেশে তরকারী পরিবেশনের চমৎকার এক রকম পাত্র পাওয়া যায়, এ যেন চারটে বড় বড় বাটি একটি হাতলে আটকানো; হাতলটা হাতে ঝুলিয়ে ধরা

যায়, হাতলের চারদিকে চারটা বাটি লাগানো, আলাদা আলাদা বড় বড় চামচে বা হাতা দিয়ে একসঙ্গে চার রকম তরকারী পরিবেশন করা যায়। সবটা পিতলের, ভিতরটা কলাই করা, বেশ সুন্দর দেখতে, আর মজবুত।

এই ভাবে মন্দির দেখে আর বাসন কিনে সকালটা কাটানো গেল, বেলাও হয়ে গিয়েছে, হোটেল ফিরে আবার চান করে আর খেয়ে দেয়ে দুপুরে জিরানো গেলো।

বিকালে বাসে করে শ্রীরঙ্গমে নারায়ণের মন্দির দেখতে গেলাম। আমাদের হোটেল থেকে মাইল দুই পথ হবে। কাবেরী নদী পেরিয়ে শ্রীরঙ্গম সহর, এখন ত্রিচিনোপোলির একটা অংশ হয়ে গিয়েছে। শ্রীরঙ্গমের মন্দির যে এত বিরাট তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। পর পর সাতটা দেওয়ালের ঘরের মধ্যে মন্দির, সাত দেউড়ি পার হয়ে তবে মন্দিরের সিংহ দরজায় পৌঁছান যায়। একটার ভিতর একটা করে যেন সাতটা বাস, আর সব ভিতরের বাস বা মণিকোটা হচ্ছে শ্রীমন্দির, তারই মধ্যে বিরাট অনন্ত শয়ন নারায়ণের মূর্তি। ছটো করে দেয়াল বা দেউড়ির মাঝে যে জায়গাটুকু আছে, সেখানে হয় দোকান পাট নয় অগ্রহার অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের বাস। আমরা প্রথম ফটকের কাছে এসে পৌঁছতেই একটি ব্রাহ্মণ পাণ্ডা এসে আমার স্বামীর সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইতে লাগলেন। লোকটাকে বড় ভাল মানুষ বলে বোধ হল, আর তার কথাবার্তাও বেশ ভদ্র। মন্দিরের প্রথম ফটকের বাহিরেই বড় রাস্তার উপর পাণ্ডাদের বাড়ী, সে হাত দিয়ে দেখাল, ঐ আমাদের বাড়ী। বলল যে ভদ্র স্বামীদের থাকবার ব্যবস্থা তার বাড়ীতে বা অন্য কোথাও সে করে দিয়ে থাকে, সহজেই যখন ইচ্ছা মন্দির দেখতে পারা যায়। আমরা কেবল পাঁচ মিনিটের দর্শন করতে এসেছি, মনে হচ্ছিল—(বিশেষতঃ পরে যখন মন্দির আর ঠাকুর দেখা হয়ে গেল তখন)—এই তীর্থস্থানে দু-পাঁচ দিন থাকতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু আমাদের এখন হয়েছে "এক পয়সায় অন্ধ্র সংবাদ" শোনার মতো অবস্থা—অল্প সময়ের মধ্যে যত বেশী পারা যায় চটপট দেখে নিয়ে ঘরে ফেরা। এর একটা কুফল এই হয় যে আমাদের মতন মেয়েদের অনেক বিষয় মনের মধ্যে চিরকালের জন্য স্থান করে নেবার সময় পায় না! কত জিনিষ ভুলে যাই, কত

জিনিষ তাল গোল পাঁকিয়ে যায়, আব্বা ছাঁ আব্বা ছাঁ হৈয়ে পড়ে। তবে আমার সুবিধে এই যে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেবার গুরুমশায়ের অভাব আমার নেই।—যাক, গুরুমশাই বললেন যে লোকটা বেশ ভদ্র, একেই পাণ্ডা ক'রে দেন ওয়া যাক। তখন পাণ্ডাটা জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা রীতিমত পূজো-আর্চা করবো যাতে ব্রাহ্মণের দরকার হবে, না, খালি মন্দির দেখে দেব দর্শন করে ফিরবো? তাহলে তিনি একজন ইংরেজী বলিয়ে ছোকরা সঙ্গে করে দেন। আমরা ছোকরা একজনকে নিয়েই চললুম। পর পর সাত দেউড়ী, বোধ হয় চতুর্থটার পরে আর গাড়ী যেতে দেয় না। এই দেউড়ী বা ফটকগুলিকে আশ্রয় করে যেন একটা টানা রাস্তা। এই রাস্তা ধরে, আর বিশেষ করে প্রত্যেক ফটকের আশে পাশে বাজার বসে গিয়েছে। এখানে যেন এক নোতুন ধরনের কাশীর বিশ্বনাথের গলির মতন দোকানের পসার সাজানো রয়েছে। হিন্দুর তীর্থে যে সব জিনিষ পাওয়া যায় সেই সব জিনিষেরই মেলা—তামা, পিতল, কাঁসার তৈজসপত্র, ঠাকুর-দেবতার মূর্তি, পূজোর সরঞ্জাম; কাঠের আর মাটির খেলনার দোকান; রকমারি কাপড়-চোপড়; ছবি, পট, সিঁহুর, রুলি, মালা, কণ্ঠি, প্রভৃতি; ফুলের দোকান; মেঠাই-খাবারের দোকান; ফলের দোকান—এই সব। আমার লোভ বাসনে আর কাপড়-চোপড়ে, আর স্বামীর দৃষ্টি—কোথায় সেকলে তামার মূর্তি পাওয়া যায়। সকালে ত্রিচিনোপল্লীতে কিছু বাসন কিনেছি আর অর্ডার দিয়েছি, আর স্বামী বললেন, মাদ্রাজী সাদী কিনতে হলে মাদ্রাজতেই কেনা উচিত; আমরা মাদ্রাজা যাচ্ছি, সুতরাং লোভ আপাততঃ দমন করলুম। পুরো বিকাল, অনেক কিছু দেখতে হবে, তাই দেবদর্শন করে নেবার জন্যে সোজা ভিতরে চলে গেলুম। খুঁটিনাটি কিছুই মনে নেই—খালি বিরাট বিরাট “গোপুরম্” বা ফটকের শিখর; নানা নকশা আর মূর্তিতে অপূর্ব স্তম্ভের পাথরের থামের ছুঁড়াছড়ি; আর শেষটায়, শত শত যাত্রীর কলরবের মধ্যে রঙ্গনাথ স্বামী নারায়ণের শ্রীমন্দির। কত রথ, মণ্ডপ, থামের শ্রেণী ঘুরে শেষকালে আমরা ঠাকুরের সামনে উপস্থিত হলুম। ভিতরটা অন্ধকার, কিন্তু প্রাণীপ জেলে সব আলো করে রেখেছে। ঠাকুরের কালো পাথরের বিরাট অনন্ত শয়ন মূর্তি, একটু

আগেই ঠাকুরকে হাঁবে, জহরত প্রবানো হয়েচে, বড় বড় ডুমো ডুমো চুণী পান্না হাঁবে থেকে আলো ঠিকবে আসছে। ভিতরে স্ত্রীর বাইরে, যাত্রীদের কলরব, পাণ্ডাদের মন্ত্র পাঠ আর মন্ত্রে সঙ্গে যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সার জুতা ভাগাদা, বাইরে থেকে তামিল রোশন-চৌকী বাজনার আওয়াজ; সমস্ত শ্রীমন্দির জুই ফুলের আর জলন্ত কপূরের গন্ধে ভরপুর—সব মিলে একটা বিরাট ঐশ্বর্যের ছবি। আমার মনের মধ্যে একটা কেমন অপূর্ব ভাব এসে পড়ল—আমি বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়লুম। এখানে বড় বড় মন্দিরে পূজোর বেশ ভালো ব্যবস্থা আছে—মন্দিরের কর্তারা দাম বেধে দিয়েছেন, যার যেমন শক্তি সে সেইরকম খরচ করে নারায়ণের পূজো করতে পারে, পাণ্ডা বা পুরুতের আইনতঃ বেশী চাইবার হুকুম নেই তবে তেমন যাত্রী পেলে এরা মোচড় দিয়ে খোঁবামদ করে বেশ আদায় করে নেয়। আমার একমাত্র ছেলে স্তম্ভন তার ডাক নাম বাদল, তার নামে সঙ্কল্প করিয়ে একশো আট তুলসী পাতা দিয়ে নারায়ণের পূজো করলুম। এই পূজোর বাঁধা রেট এক টাকা না কত, আর পুরুতের বোধ হয় একটা টাকা মাত্র, এই খরচ হলো, কিন্তু প্রসাদী ফুল তুলসী পাতা পেয়ে মনে ভারী তৃপ্তি হলো। পাণ্ডা আর পুরুতরা আপোষে তামিলে আর আমাদের সঙ্গে হিন্দীতে আং ইংরেজীতে কথা কইলে। মন্দিরের মধ্যে ভীড় খুব হয়েছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছোকরাটা আর পুরুতের যত্নে আমরা অনেকক্ষণ ধরে ভাল করে দর্শন পূজো আরতি করতে পেয়েছিলাম। যাত্রী প্রায় সবই ও-দেশীয় দক্ষিণী লোক।

দর্শন পূজা শেষ করে বাইরে বেরলুম—এইবার মন্দির প্রদক্ষিণের পালা। সেই থামের সারি দিয়ে, টাকা পথ ধরে শ্রীমন্দিরের চারিদিক ঘুরে এলাম। মন্দিরের যেখানে ঠাকুর থাকেন ঠিক তার ওপরে যে চুড়া বা গোপুরম্ আছে সেই যায়গাটা ছাতে টাকা নয়। মন্দিরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সেখানে আকাশ দেখা যায়। সঙ্গে ছোকরাটা আমাদের দেখিয়ে দিলে যে শ্রীমন্দিরের চুড়াটা সোণায় ঢাকা। সোণায় মোড়া পাথরের কাজে নারায়ণের মূর্তি রয়েছে, যাত্রীদের তা দেখে প্রণাম করতে হয়। মন্দিরের বড় কাজ অর্থাৎ দেবদর্শন তো চুকে গেলো; কিন্তু আমার স্বামী নিয়ে গেলেন কতকগুলি

খামের কারুকাৰ্য্য দেখাতে। এক একখানা আন্ত পাথরে কাটা দেড়তলা সমান কতকগুলি খাম, সেগুলির গায়ে নিখুঁত করে কাটা ঘোড় সওয়ার মূর্তি, কতরকম গয়না পরে ঘোড়া সামনের দু'পা তুলে লাফাচ্ছে, ঘোড়ার পিঠে নানা রকম গয়না আর বর্ষ পরে সেপাই মূর্তি, ঘোড়ার পেটের নীচে, সিংহ বা অস্ত্র জানোয়ার সামনের পা তুলে লাফাচ্ছে। তাকে বর্ষার খোঁচা মারছে ঘোড়ার পিঠের সওয়ার। খামগুলির কাজ অদ্ভুত, কিন্তু সবটা কেমন যেন অস্বাভাবিক, আর এত বেশী গয়নার চড়াছড়ি যে তা চোখে লাগে। আমার স্বামীরও তাই মত—এই ধরনের শিল্পে সরলতার চেয়ে বেন কারুকার্য্য দেখানোর চেষ্টাই বেশী।

তারপরে ভাবলুম মন্দির দেখা সাজ হলো—কিন্তু তা হবার নয়, আর একটা চমৎকার জিনিষ আমার স্বামী নিয়ে গিয়ে দেখালেন। মন্দিরের বাইরে ভিতর থেকে প্রথম দেউড়ীর পরে, একটা আটচালা মতন নিরে মন্দিরের পরিচালকেরা একটা সংগ্রহশালা আর পুস্তকালয় করে রেখেছেন। পুস্তকালয়ে দু'পাঁচশ সাধারণ সংস্কৃত আর তামিল শাস্ত্রের বই রেখেছেন। পড়বার জায়গায় টেবিলের উপর খবরের ক্লাঁগজ রাখা হয়েছে। ছচারজন এসে পড়ছে। উড়ে-কাঁমানো মাথা, কপালে বৈষ্ণব ফোঁটা, খালি গায়ে কাঁধে এক তোয়ালে ফেলা, লুঙ্গির মত করে সাদা ধুতি পরা, খালি পা তামিল ব্রাহ্মণই বেশী। কিন্তু এই সামান্য পাঠাগারের পিছনে মন্দিরের রক্তভাগুর থেকে নানা রকমের হাতীর দাঁতের মূর্তি, পুতুল, খোদাই করা ছবি আর অস্ত্র জিনিষের যে একটা বিরাট সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে সে এক অদ্ভুত ব্যাপারও আর কোথাও এ রকমটা আছে কিনা জানি না। আমার স্বামী এ জিনিষ আগে দেখে গিয়েছিলেন, তিনি অনেকগুলি ভালো ভালো জিনিষ আমাকে দেখালেন। একেলে ঠাকুরের মূর্তি আছে, তিন চারটা মূর্তি একসঙ্গেও আছে। এত বড় বড় হাতীর দাঁতের মূর্তি আমি জীবনে দেখিনি। ঠিক যেন বড় বড় পাথরের মূর্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ। ইচ্ছে হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে এই সমস্ত দেখি, এ জিনিষ আর পাওয়া যায় না, সব একশো, দেড়শো, দুশো বৎসর পূর্বেরকার কাজ, প্রাচীন ভারতের শিল্পের চমৎকার নমুনা। স্বামী বললেন, ইউরোপ হলে এ জিনিষের আরও আদর হতো, এর

চর্চা হতো, এর ছবির বই বেরুতো। যাক, দীর্ঘ নিখাস ফেলে এ সংগ্রহের ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। এই ছমুন্ডা বা অমূল্য জিনিষগুলিকে অতি অথেষ্টের সহিত কতকগুলো বাজে কাঁচের শো-কেশ আর আলমারীতে রাখা হয়েছে, এদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে ভালো করে এগুলিকে রাখবার ব্যবস্থা হয় নি দেখে মনে বড় দুঃখ হলো।

পাণ্ডা লোকটার সঙ্গে সাত দেউড়ী পার হয়ে আমরা বড় রাস্তার এসে পড়লুম। ভদ্রতার খাতিরে পাণ্ডার বাড়ীতে গিয়ে একটু বসতে হলো। পাণ্ডা ঠাকুর তাঁর খাতা নিয়ে এলেন, তাতে স্বামী ইংরেজী, বাংলা আর দেবনাগরীতে আমাদের নাম, খাম, পরিচয় লিখে দিলেন।—তামিল অক্ষরে নাম লেখাতে পাণ্ডা যায় আর কি! সঙ্গে ছোকরাকে চার আনা আর পাণ্ডাকে গুণ্ডা আঠেক পরস্যা দেওয়া গেল। পাণ্ডা কিছু ফুল, নারকোল আর এলাচ প্রসাদী দিলেন।

এদিকে রোদ পড়ে গিয়েছে, সন্ধ্যা হয়-হয়। আমরা স্থির করেছিলাম, শ্রীরঙ্গম থেকে মাইল দেড়েক পূর্বে জম্মুকেশ্বর মহা-দেবকে দেখে যাবো। এখানে শিব আছেন জলের মধ্যে, অপো মূর্তি, যেমন কাঞ্চীপুরের বালির শিবলিঙ্গ হচ্ছেন ক্ষিতি মূর্তি। বাটকা একখানা নেওয়া গেলো। গাড়োয়ানকে ইংরাজীতে বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সন্ধ্যার পরেই মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, তার পূর্বেই বেন সে আমাদের জম্মুকেশ্বরে পৌঁছে দিয়ে দর্শন করিয়ে দেয়। বকশিসের আশায় সে খুব জোরে হাঁকিয়ে চললো। সোভাগ্যক্রমে আমরা ঠিক সময়েই হাজির হতে পেরেছিলুম—এখানেও একটা পাণ্ডা ছোকরা জুটলো, সে তাড়াতাড়ি একেবারে সোজা মন্দিরের ভিতরে আমাদের নিয়ে গেলো। তখন সন্ধ্যার আরতি হচ্ছে, এই শেষ আরতি।

আমরা বেশ করে এই আরতি দেখলুম। যাত্রীর ভিড় ছিল না। যথারীতি নারকোল দিয়ে পূজা দিলাম, প্রসাদী ফুল বেলপাতা নিলাম। মন্দিরের ভিতরটা জলে ভর্তি, এরকম ব্যবস্থা করেছে যে মন্দিরের মধ্যে দিয়ে জলের স্রোত বেয়ে যাচ্ছে। এইভাবে এখানে জলের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ দেখান হচ্ছে; মাটি, জল, আগুন, বাতাস, মহাশুদ্ধ, এই পঞ্চ বস্তু বা পঞ্চভূত যা নিয়ে পৃথিবী, এ সব প্ররমেশ্বরেরই প্রকাশ কি না। আমাদের অপেক্ষাতেই যেন এই শেষ আরতি সম্পূর্ণ হয় নি,

দেখা হবে না এই আশঙ্কা করে গিয়ে শেষে দর্শন পাওয়ায় মনটা বেশ একটা মিষ্টি ধূপের গন্ধ। তবে বেশী আলোর ঘটনা নেই, ভারী খুসী হলো। সন্ধ্যার অন্ধকার মেমেছে, অতবড় জম্বুকেশ্বর মন্দির কিছুই দেখতে পেলুম না। এখানে একটা জাম-গাছের তলায় অতি প্রাচীন কালে এক শিব মূর্তির পূজা হতো, সেইজন্ত এই জম্বুকেশ্বর নাম। মন্দিরের বাইরে দোকানে দু'একটা পট কেনা গেলো। তারপরে আমরা বড় রাস্তায় এসে বাস ধরে ত্রিচিনোপলী সহরে ফিরলাম। ত্রিচিনোপলীতে বাস যেখানে আমাদের নাবিয়ে দিলে, সে জায়গাটা হচ্ছে ত্রিচিনোপলীর পাহাড়ের মন্দিরের পায়ে তলায় যে বড় পুকুর আছে তার দক্ষিণের বড় রাস্তা। এইখানে একটা মাঝারি আকারের রোমান ক্যাথলিক গীর্জা আছে। গীর্জার ভিতরে অল্প অল্প আলো জ্বলছে, আর দু'চার জন মেয়ে পুরুষ যাচ্ছে আসছে। দরজা ভেজানো বলে ভিতরের কিছু দেখা যায় না। গীর্জে আমি কখনো দেখিনি, তাই আমার মনে দেখতে ইচ্ছা হলো। স্বামী বললেন, “চলো; ভিতরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি, খ্রীষ্টান ধর্মের মন্দির কেমন, সেটাও দেখে নাও।” (এর পরে রাজপুতনার পুষ্করতীর্থ দেখতে গিয়ে আজমীরের দরগা দেখে এসেছি; মুসলমান ধর্মের মন্দিরও বাদ যায় নি।) দরজাঠেলে গীর্জার ভিতরে ঢুকলুম। মস্ত এক হলের মতন, সমস্তটাই প্রায় বেঞ্চি আর চেয়ারেতে ভরা। দূরে এক কোণে বেদী, তাতে যীশুর মূর্তি। রংচং করা ঠিক আমাদের হিন্দু মন্দিরের মতন, তবে প্রদীপের বদলে মিটমিট করে বাতি জ্বলছে। ক্রুশাবিদ্ধ যীশুর ছপাশে বাতি আর ফুলের তোড়া, আর গীর্জার মধ্যে

বেশ একটা মিষ্টি ধূপের গন্ধ। তবে বেশী আলোর ঘটনা নেই, ভারী খুসী হলো। সন্ধ্যার অন্ধকার মেমেছে, অতবড় জম্বুকেশ্বর মন্দির কিছুই দেখতে পেলুম না। এখানে একটা জাম-গাছের তলায় অতি প্রাচীন কালে এক শিব মূর্তির পূজা হতো, সেইজন্ত এই জম্বুকেশ্বর নাম। মন্দিরের বাইরে দোকানে দু'একটা পট কেনা গেলো। তারপরে আমরা বড় রাস্তায় এসে বাস ধরে ত্রিচিনোপলী সহরে ফিরলাম। ত্রিচিনোপলীতে বাস যেখানে আমাদের নাবিয়ে দিলে, সে জায়গাটা হচ্ছে ত্রিচিনোপলীর পাহাড়ের মন্দিরের পায়ে তলায় যে বড় পুকুর আছে তার দক্ষিণের বড় রাস্তা। এইখানে একটা মাঝারি আকারের রোমান ক্যাথলিক গীর্জা আছে। গীর্জার ভিতরে অল্প অল্প আলো জ্বলছে, আর দু'চার জন মেয়ে পুরুষ যাচ্ছে আসছে। দরজা ভেজানো বলে ভিতরের কিছু দেখা যায় না। গীর্জে আমি কখনো দেখিনি, তাই আমার মনে দেখতে ইচ্ছা হলো। স্বামী বললেন, “চলো; ভিতরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি, খ্রীষ্টান ধর্মের মন্দির কেমন, সেটাও দেখে নাও।” (এর পরে রাজপুতনার পুষ্করতীর্থ দেখতে গিয়ে আজমীরের দরগা দেখে এসেছি; মুসলমান ধর্মের মন্দিরও বাদ যায় নি।) দরজাঠেলে গীর্জার ভিতরে ঢুকলুম। মস্ত এক হলের মতন, সমস্তটাই প্রায় বেঞ্চি আর চেয়ারেতে ভরা। দূরে এক কোণে বেদী, তাতে যীশুর মূর্তি। রংচং করা ঠিক আমাদের হিন্দু মন্দিরের মতন, তবে প্রদীপের বদলে মিটমিট করে বাতি জ্বলছে। ক্রুশাবিদ্ধ যীশুর ছপাশে বাতি আর ফুলের তোড়া, আর গীর্জার মধ্যে

আমাদের হোটেল এই গীর্জার কাছেই, তারপর আমরা পায়ে হেঁটে হোটেল ফিরলাম। এই ভাবে মোটামুটি ত্রিচিনোপলী, শ্রীরঙ্গম, আর জম্বুকেশ্বর এই তিন তীর্থ একদিনেই সেরে নেওয়া গেল। উপরন্তু রোমান ক্যাথলিক গীর্জাও দেখা হল। আর এখানে রাত্রি বাস করতে ইচ্ছে হোলো না—বিশেষতঃ যখন মনে পড়ল যে হোটেলের সেই বোসেটে ছোকরা হয়তো তার হিন্দী গানের রেকর্ড ক'থানা নিয়ে আমাদের আবার শোনাবার জন্ত মুখিয়ে আছে! তাই টাইম-টেবল থেকে যখন দেখা গেল যে রামেশ্বরের দিকে যাবার সুবিধের ট্রেন ঐ রাত্রিতেই আছে, তখন খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে নিয়ে জিনিস পত্র বেঁধে হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে যাত্রা শুরু করলাম। (ক্রমশঃ)

প্রেমিকা

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুহ

আজি এ ঘন বরষায়
কে বাশী বাজায়
মন আঙ্গিনায় মোর
ফেলিয়ে ছায়;
কেউ নাই শুনিবার তরে
পঞ্চমের তান,
প্রকৃতি ও ব্যস্ত আজি
নাহি দেয় কান।

বাশীতে বলিছে যেন
মোরে কর তাঁর
আজি এ নিশীথে তাই
প্রেম-অভিসার;
পরাব ব'লে তার গলে
গেথেছি এ মালা
চির সুন্দর দেবতা আমার
হ'ক না সে কালা ॥

ফাউল কারি

(গল্প)

হিরণ্ময় ঘোষাল

ফাউল জিনিষটা আজকাল প্রকাশ্যে বিজকুলেও পাত্রস্থ করা চলে। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কোনো একটির বলির উপকরণরূপে নির্দ্ধারিত হয়ে গেলেই তার জাতি সম্বন্ধে যেটুকু বিধা আছে, তা অচিরেই লুপ্ত হবে, সন্দেহ নেই।

আমি ফাউল খাই না।

কারণ মাংস হিসেবে অত্যাশ্চর্য যে কোনো দ্বিপদ, চতুষ্পদ বা ঋণপদের তুলনায় ফাউল নিতান্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর। মৎস্য-জগতে বেলেমাছও বা, মাংস-জগতে ফাউলও তাই, একথা মাংসাসীমাত্রেরই সমর্থন করবেন। ফাউল যদি গাঁদালের ঝোল বা স্তূতানিতে দেওয়ার রেওয়াজ থাকতো, তা হলে তা অরণমাত্রেরই ভোক্তার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার করতো। আমার বন্ধুরা বিশ্বাস করতে চান না, শাস্ত্রকারেরা সর্বোৎকৃষ্ট মাংস ছাগ-মাংসটি অধিসন্তানদের জন্ত রিজার্ভ করে রেখে বাদ বাকী সব যবনহস্তে সমর্পণ করেছিলেন।

খাওয়ার কথা উঠলেই বন্ধুরা নিগূঢ় মূহুরাস্যে বলে থাকেন—দেখ ভায়া, একদিন ঐটের ব্যবস্থা করা। পূলক-কটকিত দেহে, লাল, গদগদ কণ্ঠে খেচরটির আভাসমাত্র দিয়েই ক্ষান্ত হন—‘ঐ জিনিষটি’, ‘জটায়ুর বংশধর’, ‘আরে তোমার কি বলে সেই দ্বিজেন্দ্রনাথ অণ্ড’, বড় জোর ‘সেই পাখীটে’।—‘ফাউল’ বা ‘মুরগী’ কথাটা এমন ভয়ঙ্কর রেমালিকি যে তা রেষ্টোরাঁয় অর্ডার দেবার ঠিক আগে ছাড়া উচ্চারণ করা চলে না। এক কথায় আমার বন্ধুরা ফাউল ভালবাসেন এবং একদিন জুপুরে বসে বসে ইঠাৎ সক্রিয় করলাম, ছুড়োর, আমি ওদের ফাউলই খাওয়াবো।

সকলটার উদয় হবার প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে এই যে, সেদিন আমার ডিমওয়ালা এই নিষ্ঠাবান হিন্দু পরার রাস্তাটা দিয়ে যাবার সময়ে মূর্তিমান পাপের মত আমার জানলার নীচে দাঁড়িয়ে প্রলোভন-মেঘুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—কি বাবু, লেবেন নাকি আজ, ফাউল কেলাস চিজ আছে।—সসঙ্কোচ ইঙ্গিত মাত্রেরই লোকটা সটান ওপরে উঠে এলো—এই দেখুন বাবু,

এমন চিজ আপনি সারা কলকাতায় পাবেন না।—বলে সে চিজটিকে আমার সামনে তুলে ধরলে। বাঁকুনী খেয়ে পাখীটা কী একটা দেশের পতাকায় আঁকা ঈগলের মত তেজোভরে পাখা-ছুখানা মেলে ধরলে। তিন পো তো হেসে খেলে, চায় কি সেরখানেকও হতে পারে। পালকের ফাঁকে ফাঁকে ফুঁ দিয়ে, লোকটি দেখিয়ে দিলে, জীবনানন্দের আধিক্যে পাখীটা ভেতরে ভেতরে তৈলাক্ত হয়ে উঠেছে। বন্ধুদের পাতে দেবার মত চিজ বটে। দর-দস্তুরের প্রয়োজন হলো না। পা-ছুটায় দড়ি বেঁধে বারান্দায় ফেলে রেখে সদ্যানিহ্রোখিতা গৃহস্থামিনীর সঙ্গে পাক-প্রণালী সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম।

উনি বললেন—তোমাদের যত সব বাঙালে কাণ্ড, গর-গরে করে তেল আর ঝাল না দিলে তোমাদের মুখে রুচবে কী? আমি বাপু আজ রান্নায় হাতটা না পাকিয়ে ছাড়িচি নে। অমন মুরগীটা পাওয়া গেচে, আর বাঙালীতে অমন বিলীতি বইখানা রয়েছে কি করতে?

গৃহিণীর বৈদেশিক পাক-রসায়নে যেটুকু আস্থা ছিল, তাও সেদিন কিস্মিস-বহুল গরম সিল্লীর মত সসে ভাসমান ভেটকী মাছ খাওয়ার পর সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়েছে। তত্রাচ পারি-বারিক শান্তি রক্ষার খাতিরে তাঁর প্রস্তাব সানন্দে অমুমোদন করি—অশোক, অমিয়, এরা তোমার রান্নায় কিন্তু ভারী স্বথোত করে। তা করো না বা তোমার খুশী। কালিয়া, কাবাব, কোফতা, ওরা তো দুটি বেলা খায়। এমন জিনিষ করো যা ওরা খায় নি, খায় না, খাবে না।

পাক-শিল্পে অদূর সাফল্যের আনন্দে ওঁর চোখ দুটি জ্বল-জ্বল করে ওঠে, বলেন, দাঁড়াও না বইখানা আনি।

গো-মাতার শরীরের নানা অংশে অধিষ্ঠিত ঋষিদের মত করে ছক-কাটা, নম্বর-দেওয়া কী একটা পণ্ডর ছবিওয়ালা মলাট সমেত ন ইঞ্চি পুরু একখানা গ্রন্থ চণ্ডীদাসের ফরাসী অনুবাদ-

খানার ওপর সজোরে অবতরণ করলে।—খোলো তো দেখি, পেজ সিল্প হাওড় আঙু সেভেনটি সেভেন।

এই সেই কুকুট-পর্ব যার প্রসাদে আমার ভাগ্যে আজও ভ্রলোকের পাতে দেবার মত একটা কাউল কারিও জুটলো না। অধ্যায়টির ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—
Fowl, domestic and wild.

উনি এবার আঁচলের ভেতর থেকে এক তাড়া কাগজ বের করে বললেন—এই শোনো কোস গুলোর কেমন বাংলা অনুবাদ করিচি।—যেটা যেটা ভাল লাগবে, সেটার বলায় বলবে, হুঁ, কেমন?—গৃহিণী সমাহিত অবস্থায় তাঁর পাক-প্রণালীর অল্পবাদ পড়তে শুরু করলেন :

মুরগী তোমাতো সসে : পরিষ্কার করে ছাড়ান, যেন ছালটি মাংস থেকে খসে না যায়। পরে টুকরো টুকরো করে কেটে মাখন (বা ঘি)-এ সামান্য জল দিয়ে সেদ্ধ করুন। পাত্র যেন ঢাকা থাকে। চিমে আঁচে সেদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয়। সেদ্ধ করার সময়ে অল্প ময়দা দিয়ে জলটাকে একটু মাথো-মাথো করে নিন। এবার সেদ্ধ তোমাতো ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন, যেন একটুও খোসা বা বিচি না থাকে। এইরূপে লব্ধ সস প্যান (বা ডেকচি)-এ ঢেলে দিন। এক হাতা ক্রীম দন। সমস্তটা গুমে গুমে সেদ্ধ হতে থাকুক। কাঁচা দিয়ে দেখুন, ছাল ও মাংস ভেদ করে তা হাড়ে গিয়ে পৌঁছচ্ছে কিনা। যদি ঠেকে তো বোকা বাবে, মাংস তৈরী হয়েছে। এইবার গরম গরম পাতে দিন। একটু কাঁচা শুজ বা ধনে শাক দিতে আপত্তি নেই।

গৃহিণী আমার “হুঁ”র প্রতীক্ষায় একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আবার পড়তে শুরু করলেন :

মুরগী ও গুস্বেরী : তারতবর্ষে গুস্বেরী জন্মায় না, সুতরাং তার পরিবর্তে করমচা বা কাঁচা কুল ব্যবহার করা চলতে পারে। মুরগীটিকে প্যানে রেখে তার সঙ্গে কিছু আন্ডাজ (যথা গাজোর, ধনে শাকের গোড়া, পেঁয়াজ ইত্যাদি) ও এক চামচ মাখন (বা ঘি) দিয়ে আঙুনে চড়িয়ে দিন। এইবার দু চামচ আন্ডাজ কোন মাংসের স্থপ ছড়িয়ে দিন। আঙুনে চিমে হাওয়া চাই। মুরগীটি যখন বেশ সেদ্ধ হয়ে এসেছে, তখন এক কাপ পরিমাণ গুস্বেরী (বা করমচা বা কাঁচা কুল) ফেলে দিন। এইবার সমস্তটা একসঙ্গে সেদ্ধ

হতে থাকুক। গুস্বেরীগুলি (বা করমচা বা কাঁচা কুল) যখন বেশ সৈন্ধ হয়ে এসেছে, তখন অল্প পাত্রে মাখন (বা ঘি)-এ একটু ময়দা রাঙা করে ভেজে নিন। এইবার ছুটি পাত্রে জিনিষ একত্র মেশান এবং গরম গরম পাতে দিন। (এই প্রণালীতে ভেড়ার মাংসও রাখা চলতে পারে।)

এবারও অল্পমোদন-স্থচক “হুঁ” না পেয়ে উনি আর এক রকম পদের বিবরণ পড়তে লাগলেন :

লেবু-মুরগী : মুরগীটিকে পুরোপুরি রোস্ট না করে নামিয়ে নিন। পরে তার বৃকের হৃদিক আন্তে আন্তে কেটে নিন। এইবার খানিকটা মাখন (বা ঘি) কিছু পাউরুটির গুড়ো ভেজে নিন। একটু গুড়ো মশলা মেশান, আবার একটু পাউরুটির গুড়ো দিন। সবটুকু বেশ করে মেশান। এই সসে মুরগীর বৃকের ছুটি অংশ ফেলে দিন এবং প্যানের গায়ে চেপে ধরুন। পরে ছাঁকনি দিয়ে সবটুকু ছেঁকে নিয়ে তাতে সমগ্র মুরগীটিকে ফেলে দিন : একটু অল্প কোনো মাংসের স্থপ দিয়ে চিমে আঁচে চড়িয়ে দিন। পাত্র যেন ঢাকা থাকে। পাতে দেবার আগে আধখানি লেবু নিংড়ে দিন, যেন বিচিগুলি পাত্রে না পড়ে। লেবু-মুরগী অল্প উপায়ের ও রাখা যেতে পারে।
যথা : মুরগীর বৃকের ছুটি পাশ কেটে নিয়ে তাতে আদার গুড়ো ছড়িয়ে দিন, পরে সসে লেবুর রস ও ক্রীম দিয়ে মুরগীটির সঙ্গে সেদ্ধ করে নিন।

এবারও “হুঁ” না পেয়ে গৃহিণী একটু অসহিষ্ণু হয়ে পরবর্তী পদটি পড়ে শোনালেন :

রুগ্ন ব্যক্তির জন্য মুরগীর রস : মুরগীটিকে বেশ লাল করে রোস্ট করে নিন এবং তার সঙ্গে নিম্নলিখিত সমষ্টি তৈরী করুন : আধ চামচ ময়দা, আধ চামচ মাখন (বা ঘি)-এ ভেজে নিন, পরে তাতে কয়েক চামচ অল্প মাংসের স্থপ দিন। রং করার জন্য একটু চিনি পুড়িয়ে জলে মিশিয়ে তাতে ঢেলে দিন এবং একটু লেবুর রস দিন। রুচিমত চিনি মেশান এবং তার সঙ্গে লেবুর খোসা গুড়ো দিন। এইবার মুরগীটির ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সেটিকে উক্ত সসে দশ মিনিট কাল সেদ্ধ করুন।

উনি এবার আমার “হুঁ”র প্রতীক্ষা না করেই সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—দিনে দিনে তোমার শরীরটে যা হচ্ছে!—দীর্ঘনিঃশ্বাস দিয়ে বাক্যটিকে পূর্ণ করে আঁচল

গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ভাবে-ভঙ্গীতে বোঝা গেল, আমার কল্যাণে অশোক, অমিয় এদের কপালে আজ রুগ্ন ব্যক্তির মুরগীর রসা অবশ্যস্বাভাবিক, এবং আমার ভুগ্ন স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি

রেখে উনি কি হুচারটে স্বাস্থ্যকর অনাঙ্ক-তরকারি না বোগ করবেন? আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলাম, ঐ রুগ্ন ব্যক্তির

রসায় শরীর ঠাণ্ডা করবার জন্ত দেওয়া হয়েছে গুটিচারেক পটল, হুজমের জন্তে দেওয়া হয়েছে লবুপাক ছুটি বিঙে, আধখানি চিচিঙ্গে, একটি কাঁচা পেঁপে, আধখানা কাঁকড়, দুটি কুলী বেগুন এবং রক্ত পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে গুটিচারেক উচ্ছে। এবং আমি একথাও জানি যে, আমার কল্পনা যদি পুরী প্যাসেস্জারের গতিতে ধাবমান হয় তো তাঁর কল্পনার গতি হচ্ছে স্বয়ং তুফান মেলের। সুতরাং আমার স্বাস্থ্যের খাতিরে যে রুগ্ন ব্যক্তির রসায় যাবতীয় রোগীর খাদ্যোপকরণ যুক্ত হবে না, তারও কোনো স্থিরতা নেই। উক্ত রসায় যদি একটি কাঁচকলা ও চারটি গিমে শাক খুঁজে পাওয়া যায় তো তাতেও আশ্চর্য্যঘটিত হবার বিশেষ কারণ নেই। এতগুলো অখাদ্যের সঙ্গে যে মুরগীটাকে অন্ততঃ ষষ্ঠাধানেক সহবাস করতে হবে তা ভেবে সত্যিই গুর জন্তে কেমন ভংগু হলো। এমন সময়ে দেখলাম, বেচারী বারান্দায় খানিকটা আধ-শুকনো জলের দিকে এগিয়ে যাবার জন্তে লস্কির হয়ে উঠেছে। আহা, ওটার জলতেষ্টা পেয়েচে গা!— বলে গৃহিণী কৃষ্ণের জীবটির স্তম্ভে একটা কাপে করে জল রাখতেই সে ঠোঁট ভুবিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে সমুদ্র পানের ভঙ্গীতে তা চোখের নিম্নে গুবে নিলে।

জীব-জগতের তৃষ্ণা-নিবারণের সে এক অদ্ভুত ভঙ্গী! ঠিক মাহুঘের মত তার চোখে একটি স্নিগ্ধ ভূপ্তির আমেজ ফুটে উঠলো। দুপুরের রোদ মাথায় করে হুক্রোশ পথ হাঁটার পর এক গেলাস মিছরীর জল কি একটা ডাব থেলে মাহুঘের মুখের ভাবটা যেমন হয়, এরও ঠিক তাই। মনে হলো এইবার বুঝি বলে ওঠ—আ-মাঃ, প্রাণটা জুড়লো, কৈ একটা পান দেখি।—জল খাওয়ার পর সে তার ভুবার-শুল পালকগুলির প্রসাধনে ব্যাপৃত হলো। পা-বাঁধা অবস্থায় গুয়ে গুয়েই সে গলার চারপাশ, পিঠ বুক খুঁটে খুঁটে সাক্ষ্য করতে লাগলো। প্রতিটি পালকের প্রতিটি রোম পরিষ্কার করার সে কী নিষ্ঠা! এক জায়গায় তার এক সঙ্গিনীর মল-

চিহ্ন লেগে ছিল। সেটার ওপর নজর পড়তেই যেন তার সর্বস্বি বিন্দু বিন্দু করে পড়লো। পালকটাকে খুঁটে খুঁটে করে সেকেশুর মধ্যেই ধব ধবে শাদা করে ফেললে। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন বললে—আহা, একটু জল পেলে হতো, স্নানটা সেরে নিতাম তাহলে।—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে যেন শুধালো—হ্যাঁগা, আমার ঘরটা দেখিয়ে দেবে? খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর উত্তর না পেয়ে সে একটু কাৎ হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে নিলে, তারপর বারে বারে তার চোখের ওপর ছোট ছোট ছুটি তন্দ্রার পরদা পড়তে লাগলো।

উনি এবার পাকগৃহের দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করলেন। ডাকলাম, শুনছো।

কী? বাই, ওবেলার জোগাড়টা করে ফেলিগে যাই।

কী রান্না হবে গো?

তোমার সে-খোঁজে কী দরকার বল তো?—উনি ঝাঁঝিয়ে ওঠেন।

এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম, অশোক, অমিয় এদের বলবো কিনা ভাবছি।

বলবে কিনা মানে? নিশ্চয়ই বলবে!

কিন্তু তাদের তোমার ঐ রুগ্নব্যক্তির রসা খেতে ডাকবো এত দূর?

তাদের জন্তে রসা রাখবার জন্তে আমার দায় পড়েচে! তাদের জন্তে দুটো পেঁয়াজ আর খানিকটা তেল আর বাটনা দিলেই চুকে গেল। বাবাঃ, যে গরম পড়েচে, কে তোমার ঐ উত্তরমুখে রান্নাঘরে অভক্ষণ থাকবে? মাংস চড়িয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকো, তারপর গিয়ে নামিয়ে নেওয়া। অবিজ্ঞি, তোমার রান্নার অনেক হাজার। তা এই দক্ষিণ দিকের বারান্দাটার তোলা উল্লুনাটার—

আমার জন্তে অত কষ্ট করবে?

না, কষ্ট কা? বইটে কিনে অবধি ক-বার ব্যাভার করতে পেয়েচি বল তো! তা বাপু তোমায় আগে থেকেই বলে রাখচি, বুকের দুটি পাশ আমি তোমার জন্তে কেটে নেবো, বাদবাকী ফাউল কারি।

তার চেয়ে আমি বলি কি জানো, দুটো আলাদা রান্না না করে একরকমই কিছু করো না। তা না হলে ওরা মনে মনে

হিংসে করতে পারে এই ভেবে যে, আমার পাতে অপূর্ব কিছু পড়েছে হয়তো। সে আমার ভারী খরাপ লাগবে।

তা আমি করবো কী? তোমার তো একটা কোসও পছন্দ হলো না।

তুমি সবটা পড়লেই না তা আমার দোষ কী? আচ্ছা, সেই, সেইটে কেমন হয় গো—সেই ফাউল কারি আ লা বুলগার!

ওঃ মানে তুমি বোধ হয় মীন করচো, সেই কোসটা অনুপেক্ষে সিক্তহাণ্ডে আণ্ডে এইটটি নাইন; না? আচ্ছা, শোন।

ফাউল-কারী, বুলগারীয় মতে: মুরগীটিকে এমনভাবে ছাড়ান যাতে তার চালটি না খসে যায়। পরে টুকরো টুকরো করে কেটে একটি পাত্রে ছুন মেখে রাখুন। এইবার এক সের পরিমাণ টক দইয়ে নিম্নলিখিত উপকরণকটি ফেলে দিন: চারটে লক্ষা, কিছু তেজপাতা, গোটা কয়েক লবঙ্গ। একটু দারুচিনি, একটু মৌরী, দু-চামচ গুঁড়ো শক্ত চীস, এক চামচ চিনি, এক চামচ গুঁড়ো আদা, চারটে পেরাজ (কুচিকুচি করে কেটে), দুটো ডিমের হলদে অংশ, একমুঠো কিশমিশ, কিছু বাদাম ও পেস্তা, একপো মাখন (বা ঘি)। এইবার একখানি বড় টেবিল-চামচ দিয়ে সমস্তটাকে অনেকক্ষণ ধরে ফেটান, যাতে সব উপকরণগুলি একত্র মিশে যায়। ডিমে জাঁচে চাপিয়ে দিয়ে, তার ভেতর মাংসের টুকরোগুলি ফেলে দিন। অল্প জল মেশান। মাংস সেক হলে গরম গরম পাতে দিন। সস পাতলা মনে হলে তাতে অল্প ময়দা যোগ করা চলতে পারে।

এবার আর মৌনঃ সম্মতিলক্ষণম্ নয়, বা একটা চলনসই ছোট-খাটো “হুঁ”—ও নয়, এতখানি হাঁ করে উঠে: স্বরে বললাম—বাঃ, তোকা!

সত্যি পছন্দ হয়েছে?

শুধু পছন্দ? নবাবী আমল হলে ওরা তোমায় ধরে নিয়ে যেত।

সত্যিই ভালো লেগেছে? কিন্তু জানো?—উনি খানিকটা কাছে সরে এসে বললেন—জানো, বইয়ে যা ছিল, তার চেয়ে আমি অনেক বাড়িয়েচি। ঐ ডিম আর মেওয়াগুলো, সব আমার মাথা থেকে বেরিয়েচে মশাই!—বলে আরো প্রশংসার

প্রতীক্ষায় আমার কোলের ওপর তজ্জাবিষ্ট বেজীটার ঘাড় চুলকে দিতে লাগলেন। ওটা এর মধ্যে কখন যে কোলে উঠে বসেছে তা লক্ষ্যই করিনি।

এরকম নিঃশাড়ে কোলে এসে বসা ওর অভ্যেস।

একরত্তি বাচ্ছাটি থেকে মানুষ করা; ও আমাদের সন্তানের মত। ওর বিশেষত্ব এইটুকু যে কলকাতায় এ-অংশটার ষ্ট্রাই-ডিরেক্টরী ওর একেবারে কর্তৃত্ব। সারাটা দিন পাড়ায় পাড়ায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোন কাজ নেই। তবে কারো বাড়ী ঢুকে হাঁড়ী-খাওয়া ওর দস্তুর নয়, কারণ ও স্বপাকভোজী। হর্রের তাপে মাছ সেকে খাওয়া ওর গৃহকর্মের মধ্যে একটি। তাছাড়া কাচের সেট ভাঙ্গা, বই ছেঁড়া, জল স্ক্রু কুঁজো উল্টে দেওয়া, নুন বা চিনি ছড়িয়ে তছনছ করা, এসব তো আছেই এবং বাদবাকী সময়টুকু আদর খাওয়া। আঙুল কামড়ে দিয়ে ঘাড় চুলকানো আদার করা ওর কার্যকলাপের আর একটি। এবং ও যেখানেই থাক, পাক-শিল্পের আলোচনা হলেই কোথা থেকে যে এসে হাজির হয়, আশ্চর্য! ওর নাম ছলারী। আমাদের পাড়ায় ছলারীকে না চেনে কে?

ছলারী চোখ বুজে ঘাড় কাৎ করে তার ঐ অদ্ভুত লম্বা গলাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কণ্ঠস্বর-স্বথ উপভোগ করছে। তোমার হাতের তেলোয় মাথাটি আদর করে ঘসে দেবার ওর একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে। তখন তাকে আদর করে বুকে চেপে না ধরে থাকো তো দেখি! ওর ঐ ছোট্ট টেডি বেরারের মত নাক, ছোট ছোট, জলজলে ছুটি চোখ আর ঐ অতটুকু মাথায় বারবার চুমু দিয়েও আশা মেটে না। সেও তার ঐ ছোট ছোট ছুটি হাত দিয়ে তোমার গলাটি জড়িয়ে ধরে তোমার মুখ, গাল চেটে অস্থির করে তুলবে। ছলারী আমাদের ভারী স্বাদরের।

উনি ছলারীর ঘাড়টা ধরে নিজের কোলে তুলে নিয়ে বললেন—এ-বেটীর আবার কোনো রান্নাই পছন্দ নয়। রোদও তো পড়ে এলো, কিসে এঁর রান্না হবে কে জানে?

ছলারী আদর খেতে খেতে মিটমিট করে খানিকক্ষণ তার মার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ মেঝের ওপর লাফিয়ে পড়ে, লেজ ফুলিয়ে মুরগীটার ঘাড় কামড়ে ধরলে। উনি টেচিয়ে উঠলেন—ছলারী, ছাড় ছাড়, গেল, গেল, রগীটাকে মুশেষ করলে গো, ওঠ না, দেখতে পাচ্চো না?

সারা বারান্দাটায় তখন ছলারী আর মুরগীটাতে বটাঁপটি করছে। শাদা ধবধবে পালকগুলো হালকা তুষারের ফুলকির মত হাওয়ায় ভাসছে। ছলারীকে তাড়া দিতেই সে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। বারান্দার এক কোণে তখন মুরগীটা পা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে পড়ে খুঁকছে।—আহা হা, ওটাকে শেষ করে ফেল না গো, বেচারাকে জিইয়ে রেখে লাভ কী?—উনি বললেন।

কেষ্টটাকে পোষ্ট-আফিসে পাঠিয়েছি, সে আসুক না।

হ্যাঁ, সে তোমার একুণি আসচে কিনা! তার আগেই ও শেষ হয়ে যাবে। দেখচো না, কি রকম খুঁকচে?

মুরগীটার ঘাড়ের কাছটার শাদা পালকের ওপর দিয়ে একটি ক্ষীণ রক্তের ধারা মাটিতে নেমে আসছে। ওকে যখন শেষ করতেই হবে, এবং ও না হলে আমার বন্ধুদের একান্ত যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ করতেই হয়, এই ভেবে যথাসম্ভব ওর ইহজন্মের ত্রুণের চক্রগতিক সম্পূর্ণ করবার জন্যে আমি অস্ত্র ধারণ করলাম। ধারালো ছুরিখানা নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলাম।

উনি বললেন—উহঁহঁ, দাঁড়াও, দাঁড়াও, বেচারাকে আর কষ্ট দিয়ে মারবে কেন? বইখানাতে পশুবধ-বিধি পর্যন্ত দেওয়া আছে। ভারী হৃন্দর বইখানা! এই যে অল্পবাদ করেচি, বলে তিনি পড়তে লাগলেন:

যদি পাখার স্বাদটিকে তাজা রাখতে চান তো তাকে এক-দিন আগে মারাই প্রশস্ত, এবং মারার আগের দিন থেকে তাকে খেতে দেওয়া বিধেয় নয়। তারপর কয়েক ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে যাক্‌গে ওসব দরকার নেই, হ্যাঁ, এই যে, মুরগী মারার উপায় হচ্ছে ঘাড়ের নীচে থেকে . . .

আমি মুরগীটার কাছে যেতেই তার মুখ থেকে আতঙ্কের ছায়াটুকু আস্তে আস্তে মুছে গেল। তার চোখে কেমন যেন আশ্বাসের ভাব ফুটে উঠলো। বাঁ হাত দিয়ে তার মাথাটা ধরতেই সে ঘাড়টা আমার হাতে তুলে দিলে, ঠিক ছলারীর মত। ছলারীর গলার সঙ্গে তার গলার অদ্ভুত সাদৃশ্য। হাতের ওপর সেটাকে তুলে দেবার সে কী নির্ভরতা! আবার চোখে পড়লো, শাদা পালক বেয়ে ক্ষীণ রক্তের ধারাটি ক্রমেই জমাট বেঁধে আসছে। উনি বধ-বিধান পড়ে চলেছেন:

.....ঘাড়ের নীচে থেকে শুরু করে মেরুদণ্ড অবধি। গলা কেটে দেওয়া নিতান্ত নির্ভরতা। পাখীর রক্তের যদি প্রয়োজন না থাকে (কখনো কখনো পাক-শিল্পে প্রয়োজন হয়) তো নিম্নলিখিত উপায়ে তাকে বধ করাই শ্রেয়ঃ—মাথার পেছন দিক ও মেরুদণ্ডের প্রথম হাড়ের মাঝখানে ধারালো ছুরি বসিয়ে দিন। এই উপায়ে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অতি সম্ভব স্বপ্ণাশীন মৃত্যু এসে দেখা দেবে।

ঠিক যে-সময়ে মুরগীটা আমার হাতে মাথা রেখে হয়তো ছলারীর মত আদর বা সান্ত্বনার প্রতীক্ষা করছে, সেই সময়ে ওঁর পক্ষিবধ-বিধির নির্দেশ মত ধারালো ছুরিখানা তার মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মাঝখানে চালিয়ে দিলাম, ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত ছুটলো, আমার সর্বাঙ্গ লাল হয়ে গেল। মুরগীটা তার বাঁধা পা-ছানা টান করে ছড়িয়ে দিয়ে চরম দৈহিক পুলকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে। উনি মুখ ঢেকে পালিয়ে গেলেন।

তারপর কেষ্ট গেল বাজারে এবং যথাসময়ে লম্বা ফর্দ-মাফিক রন্ধনের উপকরণগুলি এনে হাজির করে দিলে। সারা বিকেল ও সন্ধ্যায় পোলাও ও মাংস রান্নার গন্ধে সমস্ত পাড়াটা মশ-শুল হয়ে রইলো। যথাসময়ে এলো অমিষ, এলো অশোক, রেশমের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে। হালকা কথা ও সিগারেটের ধোঁয়ায় বৈঠকখানাটা জম্জমা হয়ে উঠলো।

গল্পের ফাঁকে একবার রান্নাঘরে গিয়ে ওঁকে বললাম—ওগো, তোমার বলতে ভুলে গেছি, আমার সেই অল্পখটা আবার দেখা দিয়েছে।

ওম, তাই নাকি? এত কষ্ট করে রান্নালাম। যাক্‌ আজ তো এটা শুধু একটা এক্সপেরিমেন্ট, মানে হাত পাকানো আর কী? আর একদিন 'ফাউল-কারি আলা ব্যুলগার' রান্নাবো গো রান্নাবো। তা তুমি আজ খাবে কী গো?

তাংতো ভাবছি, ওসব আজ না খাওয়াই ভালো, কী বলো?

হ্যাঁ, সে আর বলতে। তোমার শরীরটা দিনে দিনে যা হচ্ছে। যাক্‌ গে, একটা কিছু করে দেবোখন।—বলে উনি ভরকারী চুপড়ীর দিকে নজর ফেরালেন।

তাকিয়ে দেখলাম, চুপড়ীটাতে বাছ-পড়া ব্যঙ্গের মত পড়ে রয়েছে ছটি ঝিঙে, তিনটি পটল, গুটিকয়েক উচ্ছে এবং চাঙি আধশুকনো নটে শাক।

মহিলা-সমাচার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

ঢাকার কৃতী ছাত্রী

ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট বোর্ডের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সমগ্র ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে কুমারী ফুল্লরা রায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সাফল্যে ছাত্রী-সমাজ গৌরবান্বিত। তিনি কুমারেমেসা স্কুলের ছাত্রী।

প্রথম মহিলা ভাইস চ্যান্সেলার

শ্রীমতী সারদা মেটা বি-এ, পুনর ভারতীয় মহিলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বহু দিন হইতে বোম্বাই প্রদেশের নানা স্থানে শিক্ষা ও সমাজ সেবা কর্তী মহিলা। ভারতে তিনিই প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হইলেন।

ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় ছাত্রীর কৃতিত্ব

বর্তমান বর্ষে এই মহা যুদ্ধের ভীষণ পরিস্থিতির চাঞ্চল্যকর অবস্থার বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় সাউথ ক্যালকাটা গার্লস্ কলেজের (বেলতলা) ছাত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত এবং বেথুন কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী নীলিমা মুখার্জি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ছাত্রীদের সঙ্গীত-শ্রীতি

আজ কাল ছাত্রীদের অন্যান্য অধীত পাঠ্য বিষয় মধ্যে সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। বেনারস লক্ষ্মী, দিল্লী লাহোরের ছাত্রীগণ অনেকে সঙ্গীতে গ্রাজুয়েট হইয়া বি-এ উপাধি লইয়াছে; লাহোরের কৃতি ছাত্রী মিস্ কোমুদি বেড়ী এম-এ, বেনারসের কুমারী নীলিমা ভট্টাচার্য্য সি-এর, (মিউজিক্)-বিশেষ কৃতিত্ব, বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে গানের আসরে দেখিয়া পরম গৌরব-অনুভব করা গিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রীদের এ বিষয় উদাসীনতা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। সুকুমার কলা ও সঙ্গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করা মেয়েদেরই সুবিধা। আশা করা যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মিউজিকের গ্রাজুয়েট শীঘ্রই বাহির হইবে।

কলিকাতায় অবাংগালী মহিলার দানে হাঁসপাতাল

সিষ্টার সরস্বতী এক জন বোম্বাই প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয় মহিলা। তাঁহার নাম শ্রীমতী রমাবাদ্, তাঁহার স্বামী ধারোয়ারের ব্যবহারজীবী যশবন্ত বাসুদেব পালেকার অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই অল্প বয়সী পরমা স্নন্দরী যুবতী বিধবা তাঁহার চিত্ত ও বিত্ত আর্ন্তজন সেবায় নিয়োগ করিয়া ধন্ত হইলেন।

আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসারধিক কলিকাতায় তাঁহার কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। প্রথমে তিনি রামকৃষ্ণ-শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সেবিকার (নাসের) কার্য আরম্ভ করেন। তৎপরে তিনি ক্যাথলিক মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তারী শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া প্রসূতি ও মহিলা হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিয়া আসিতেছেন।

সম্প্রতি কলিকাতার মমিনপুর অঞ্চলে ব্রণফিল্ড রোডে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রদত্ত এক খণ্ড ভূমির উপর হাঁসপাতালের অট্টালিকা সাধারণের চান্দা, সরকার ও কর্পোরেশনের অর্থে নির্মাণ করাইয়াছেন। তিনি স্বামী ও শ্বশুর বাটি হইতে যে সম্পত্তি পাইয়াছিলেন তাহা এই হাঁসপাতালের পত্তনে নিয়োগ করিয়াছিলেন। নিজের জীবনও এই হাঁসপাতালের সেবায় অর্পিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইলেন। অবাঙ্গালী মহিলার এই কীর্ত্তি কি বঙ্গের ধনী বিধবাদের প্রাণে অনুপ্রেরণা কি যোগাইবে না? ধন্য সিষ্টার সরস্বতী।

কৃষ্ণনগরে সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের উদ্বোধন

গত ১৮ই জুলাই অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায়, স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের (স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভূতপূর্ব আবাস) প্রাঙ্গণে এক মহতী সভায় সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের উদ্বোধন কার্য সমাধা হয়।

এই উপলক্ষে সরোজনলিনী বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও কর্মীদের হাতে প্রস্তুত শিল্প কার্যের প্রদর্শনীও খোলা হয়।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় কলিকাতা হইতে গমন করিয়া এই অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। নদীয়া জিলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম্ ইসলাম সরোজনলিনী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

নদীয়ায় জেলা-জজের পত্নী শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্বোধন করেন। সেই শুভ মুহূর্তে মিসেস্ গুপ্ত সুললিত ও সারবান বাক্যে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি বলেন যে বাল্যকাল হইতে সরোজনলিনী-নারীমঙ্গল-সমিতি ও শিল্প বিদ্যালয়ের কথা শুনিয়া আসিতেছি। সরোজনলিনী বঙ্গের মহিলাদের দ্ব্যর্থমোচন ও উন্নতির আদর্শ ও যে পথ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই মিঃ গুরুসদয় দত্তের অনুপ্রেরণায় বিরাট কর্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখন বঙ্গের মহিলাদের কর্তব্য এই নারী মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সর্বদীন উন্নতি করা।

সভায় বহুশত মহিলা ও ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মতন সহরের সভায় এত মহিলা প্রায় সমবেত হয় না। অনেক সাহেব ও মেম আসিয়াছিলেন।

মোষ্ট রেভাঃ বিশপ্ এল আর মরো; রেভাঃ ডি, ওল্‌স্টেন ডি ডি, নদীয়ার মহারাজ কুমার সৌরেশ চন্দ্র, মিঃ শৈবাল গুপ্ত আই. সি. এস. প্রিন্সিপাল জে, এম সেন ও ভদ্রপত্নী, মিঃ এম্ পালচৌধুরী, বিশপ তরফাদার, মিস্ এ, এ কেম্পসন ডাঃ অমল সাহা, পি. এচ্ ডি, মিসেস্ জে, এন মুখার্জি, শ্রীমতী—সুরমা দাস, মিস্ এ দাস গুপ্ত ও লেডী কারমাইকেল স্কুলের শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ, মিস নলিনী সোম, মিস্ গীতা ও দীপ্তি চাটার্জি, মিস্ প্রতিভা সেন, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা) শ্রীগিরীন্দ্র নাথ মুখার্জি, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম এল এ (সেন্ট্রাল) শ্রীমুনিবিশ্বাস (কলিকাতা) ডাঃ এস, সি, সেনগুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট বহু ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মোষ্ট রেভাঃ বিশপ মরো উদ্দীপনাময় বক্তৃতায় বলেন— ভারতের মহিলাদের উপর যদি কোন কর্মের ভার অর্পিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা আশ্চর্যরূপে সফলতা লাভ করিতে পারেন। ভারতের কোন স্বামী জীর সেবা যন্ত্রের ক্রটি দেখেন না এবং তাহাদের জনহিতকর কার্যের জন্য কখনও তাহারা দ্বিধিত

নহে। ভারতের মহিলারা প্রতি গৃহের রাণী; শান্তি ও আনন্দের প্রতীক। আমরা এই সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি ও শিল্প বিদ্যালয়ের এই কৃষ্ণনগর সহরে প্রতিষ্ঠা সাধনে গ্রহণ করিতেছি। কেবল মুখে “খুব ভাল, খুব ভাল” বলিয়া গেলে হইবে না। আমাদের ইহার সহিত সর্বদা সহযোগ করিতে হইবে, ইহার উন্নতিতে আমাদের সকলের চেষ্টা করাই কর্তব্য হইবে।

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র মহাশয় সারগর্ভ উৎসাহ বাণী প্রদান করেন। তিনি এতদিন সরোজনলিনী সমিতির নামই শুনিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, তাহা বৃষ্টি অক্লান্ত কর্ম্মী গুরুসদয় দত্তেরই অবদান মাত্র। এখন ইহার সহিত এত বিশিষ্ট কর্মীদের কর্মকুশলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে স্কুলটি চিরস্থায়ী হইলে কৃষ্ণনগরবাসীর পরম উপকার হইবে।

প্রিন্সিপাল জিতেন্দ্র সেন বলেন, সরোজনলিনী সমিতি ও বিদ্যাসাগর-বাণীভবনের কৃষ্ণনগরে আগমন যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দিয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। দুইটা প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল, শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব কামনা করি। সভাপতি ও বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় অনিশ্চয়তার মধ্যে মঙ্গল সাধনের যে আশায় আলোক প্রদীপ্ত করিয়া দিতেছেন, তাহাই মঙ্গলের পথে এই প্রতিষ্ঠানকে লইয়া যাইবে।

বিশপ তরফাদার বলেন সরোজনলিনী সমিতি যে বঙ্গের নারীদের উন্নতির পথে এত অগ্রসর করিয়া দিতেছেন যে তাহার জনা সমস্ত বঙ্গনারী সমাজ কৃতজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন এবং ইহার উন্নতিতে সাহায্য করা কর্তব্য।

উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী-মঞ্চের সম্মুখে শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মনরোম আলিপনায় প্রবেশ দ্বারপথটি সূচিত্রিত করিয়া শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল।

সভাপতি, ম্যাজিস্ট্রেট ও মিসেস্ গুপ্তকে দ্বারদেশে মিস্ নীরজ বাসিনী সোম, সম্পাদক ডাঃ নিয়োগী ও শিক্ষয়িত্রীগণ সাদরে অভ্যর্থনা করেন। আলোক-চিত্র গ্রহণের পর, ব্রতচারী কবি গুরুসদয়ের “আজি শুভ অতিথি” গানটি গাহিয়া মাননীয় অতিথিজনকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সভামঞ্চে লইয়া যাওয়া হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মিস্ নীরজ বাসিনী সোম সভাপতি, ম্যাজিস্ট্রেট ইসলাম সাহেব, মিসেস্ অশোক গুপ্তকে পুষ্পমালায় বরণ করেন।

সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের পূর্বে ইতিহাস, যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করিবার কারণ বিষদ ভাবে বর্ণনা করেন। তৎপরে তিনি কৃষ্ণনগরবাসীদের আগ্রহের প্রশংসা করেন। এত বিশিষ্ট পৌরবাসী মহিলার সমাগম দেখিয়া আশাবিহীন হইয়াছেন, ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন।

সভার অন্তে ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাকপটুতায় এই অল্পস্থানের প্রধান হোতা

জটিল বিশ্বাস, মিঃ ইসলাম ও মিসেস্ গুপ্তকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি সরোজনলিনী সমিতির প্রসার, “বঙ্গলক্ষ্মী” মাসিক পত্রিকায় শ্রীবৃদ্ধি, শিল্প বিদ্যালয়ের ও ট্রেনিং বিভাগের উন্নতির জন্য কৃষ্ণনগরবাসীকে সাদরে আহ্বান করেন এবং তাহাদের উৎসাহ দেখিয়া উৎফুল্ল হয়। শ্রীযুক্ত মনমথনাথ পাল চৌধুরী পঞ্চাশ টাকা প্রদান করায় আন্তরিক ধন্যবাদ দেন। সভা অন্তে মিঃ ও মিসেস্ গুপ্ত তাহার বাকলায় সভাপতি, ডাঃ নিয়োগী, মিস্, সোম শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ আদিকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

কেন্দ্রসমিতির কথা

সৈয়দপুর মহিলা সমিতি।

গত ২২শে মে বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ের ওয়েল ফেয়ার অফিসার কর্তৃক আহৃত হইয়া কেন্দ্রসমিতির মহিলা কর্মী শ্রীযুক্তা সুবোধ বাল্য ঘোষ সৈয়দপুর রেলওয়ে সমিতি পরিদর্শন করিতে যান। সমিতি গৃহে অনেক মহিলা একত্রিত হন। মিঃ বারি, মিসেস বারি, মিঃ রায়, মিসেস রায় বর্তমানে সমিতির প্রেসিডেন্ট। মিসেস ঘোষ ও অন্যান্য গম্ভীর মন্ত্র মহিলারা সমিতির গৃহে উপস্থিত হইয়া সমিতির কার্যাদি পরিদর্শন করেন। সমিতিতে কাজ ভালই হইতেছে। বর্তমানে একখানি তাঁতে কাপড়, কাড়ন, তোয়ালে, বেড কভার প্রভৃতি তৈরী হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সকলে এক যোগে কার্য করিলে এই সমিতি উন্নতি করিতে পারিবে।

তৎপরদিবস ৩০ শে মে সমিতি গৃহে একটি সভা হয়; উক্ত সভায় অনেক মহিলা উপস্থিত হইলেও অন্ত পাড়ার মহিলারা উপস্থিত হন নাই। মিঃ বারি শ্রীযুক্তা ঘোষকে তাহাদের ডাকিয়া পরদিন মিটিং করিতে অনুরোধ করেন, শ্রীযুক্তা ঘোষ সেই দিন সকলকে সমিতি গৃহে আসার জন্য অনুরোধ করেন, এবং পর দিবস অনেক মহিলা সমিতি গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্তা ঘোষের সহিত আলোচনা করেন। যদিও প্রথমে অনেকের মন ভারাক্রান্ত ছিল, শ্রীযুক্তা ঘোষ বর্তমান মহিলাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ক্রমে ক্রমে সকলের মধ্যেই একটা উত্তেজনার স্রষ্টি হয়। তাঁহারা শ্রীযুক্তা ঘোষকে আরো

কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ করেন, এবং বলেন, আমরা প্রতি পাড়ায় একজন মহিলা প্রচারিকা গঠন করিয়া প্রত্যেক মহিলার মধ্যে এই কার্যের উপকারিতা, জাগরুক করিয়া সমিতিরও প্রসারতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিব।” শ্রীযুক্তা ঘোষ অন্যান্য কার্যের জন্য তথায় থাকিতে পারেন নাই। ভগবান তাহাদের এ কার্যে সহায় হউন।

সান্তাহার সমিতি।

গত ১লা জুন শ্রীযুক্তা সুবোধ বাল্য ঘোষ সান্তাহার সমিতির নব নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রীকে লইয়া গমন করেন। বহু দিন যাবত সামতি বন্ধ থাকার দরুণ কেহই সমিতিতে যোগ দেন না। শ্রীযুক্তা ঘোষ কয়েক দিন তথায় থাকিয়া মিটিং করেন, অনেক প্রকারে মহিলাদের বলা হয় কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ শর্মা প্রেসিডেন্ট মিসেস মোদী ও মিঃ মোদী এক সভায় স্থানীয় পুরুষ ও মহিলাদের বিশেষ ভাবে আহ্বান করেন; ঐ সভায় শ্রীযুক্তা ঘোষ বর্তমান সময়ে সকলের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষতঃ মহিলাদের কার্যকরী ক্ষমতা লাভ প্রয়োজন, এ বিষয়ে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী একটি-সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দিন সভায় খুবই জাগরণের সাড়া পাওয়া যায় ও সকলেই উহা হৃদয়ঙ্গম করেন। শ্রীযুক্তা ঘোষ আরো দুই দিন তথায় থাকিয়া ক্লাস আরম্ভ করিয়া দিয়া আসেন। অনেক মহিলাই নূতন উদ্যমে সমিতিতে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। সমিতির সেক্রেটারী মিঃ শর্মা প্রেসিডেন্ট

মিসেস মোদী, মিঃ মোদী ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীযুক্তা সুবোধ বালা ঘোষের ধৈর্য, কাৰ্য্য দক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা পুনঃরায় সমিতি কার্য্যকারী হওয়ার বহু প্রসংশা ও অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

নওগাঁ (রাজসাহী)

নওগাঁয়ের এক্সাইজ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহোদয়ের আমন্ত্রণে শ্রীযুক্তা ঘোষ নওগাঁ গমন করেন। তথায় কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে একটি বিরাট মহিলা সভার আয়োজন হয়। প্রায় পাঁচশতাধিক মহিলা সভায় যোগ দান করেন। শ্রীযুক্তা ঘোষ তথায় উপস্থিত হইলে বহু সমাদরে মহিলারা তাঁহাকে লইয়া বান। উক্ত সভায় শ্রীযুক্তা ঘোষ বর্তমান সময়ে মহিলাদের কর্তব্য ও কার্য্যকারী দক্ষতা লাভ করা দরকার—এ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। ইহাতে সমস্ত মহিলাদের মধ্যেই একটা আগ্রহের সাড়া পাওয়া যায়। তাহারাই এইরূপ সমিতি গড়িয়া তাহার মধ্য দিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন এবং পাড়ায় পাড়ায় মহিলাদের এই ভাবে গঠন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ স্থানে মহিলাদের মধ্যে খুবই আনন্দের সাড়া পাওয়া গিয়াছে।

লালমণির হাট মহিলা সমিতি

১১ই জুন শ্রীযুক্তা সুবোধ বালা ঘোষ লালমণির হাট মহিলা সমিতি (রেলওয়ে) পরিদর্শন করিতে তথায় গমন করেন।

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল

সরোজনলিনা নারী মঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট বাক্তব শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল মহাশয়ের নামের সহিত বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠকপাঠিকা মাঝেই নিশ্চয়ই পরিচিত আছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আশালার একটি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রুরিকা কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি প্রথমে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসর আলিপুরে

টেলিগ্রাফ-বিভাগে কৰ্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে সরকারী কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি 'মেসার্স' সেক্সবে এণ্ড কারমার' কোম্পানীর ইটালি অফিসে কিছুকাল কার্য্য করেন।

তৎপরে ১৯১৯ সালে তিনি নিজস্ব ব্যবসায়-জীবন আরম্ভ করিয়া প্রথমে লোহ ব্যবসায় ও ইলেকট্রিক কন্ট্রোলারী আরম্ভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন।

তিনি বাংলার এবং ভারতের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হন এবং দেশমাতৃকার ও সার্বজনীন সমাজের সেবায় প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন।



শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল

সরোজনলিনা নারীমঙ্গল সমিতিতে তিনি বিশেষরূপে অর্থ এবং সামর্থ্য দিয়া সর্বদাই সাহায্য করিয়া থাকেন। আমরা শ্রীযুক্ত আগরওয়ালার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ঠাকুরগাঁও মহিলা সমিতির বার্ষিক কার্য বিবরণী-১৯৪১-৪২

মঙ্গলময়ের আশীর্বাদে ঠাকুরগাঁও মহিলা সমিতি দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিল—১৯৪২ সালে সমিতির নিম্নলিখিত নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়—

১। শ্রীযুক্তা নীলাবতী দেবী (সভানেত্রী) ২। শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী (সহসভানেত্রী) ৩। চাকুবালা দেবী (সম্পাদিকা) ৪। শ্রীযুক্তা সরোজা দেবী (সহসম্পাদিকা) ৫। সুভাষিনী দে ৬। সুরবালা দেবী ৭। শরৎরাণী দেবী ৮। শ্রীযুক্তা শতদল ঘোষ ৯। শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবী ১০। শ্রীযুক্তা শোভারানী রায় ১১। শ্রীযুক্তা কালীদাসী দেবী ১২। শ্রীযুক্তা হরিন্দাসী দেবী ১৩। শান্তিরানী দেবী।

আলোচ্য বর্ষে শিল্প ক্লাস ভালভাবেই চলিতেছে। ২৪ জন ছাত্রী সেলাই শিক্ষা করিতেছে। শিক্ষয়িত্রীকে মাসিক বেতন ৬ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। এবং ছাত্রীদের মাসিক বেতন ১০ আনা করিয়া ৩ ভর্তি ফিস ১০ আনা করিয়া দেওয়া হয়। সভ্যদের মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেলাইয়ের ক্লাসে বর্তমানে ৬ জন বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিতেছে। আলোচ্য বর্ষে একটি গানের ক্লাস সমিতি হইতে খোলা হইয়াছে। গানের ক্লাসের শিক্ষয়িত্রীকে মাসিক বেতন ৩ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। এবং ছাত্রীদের নিকট হইতে ১০ করিয়া মাসিক বেতন লওয়া হয়। বর্তমানে সদ্যীত ক্লাসে ৭ জন মেয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে। আলোচ্য বর্ষে গানের ক্লাসের হারমোনিয়ম না থাকায় স্থানীয় মেয়েদের দ্বারা একটি নাটিকা ক্রয় হইয়াছিল। খরচ বাদে ৪৭০ আনা লাভ ছিল। তাহা হইতে ৪০ টাকা দিয়া একটি হারমোনিয়ম নেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাঠক (সাবডেপুটী বাবু) মহাশয় সমিতির প্রতি সাহায্যতৃপ্তিসম্পন্ন হইয়া ৪০০ টাকা দিতে চাহিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে ২৫০ টাকা দিয়াছেন, বাকি ১৫০ টাকা পরে দিবেন। আলোচ্য বর্ষে সমিতি একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহাতে পাপোষ, জামা, রুমাল, এবং

নানারকম খাবার জিনিষ ছিল। ইহাতে সমিতির মহিলাদের খুব উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। কিছু কিছু জিনিষ বিক্রয় হয়। ইহাতে সমিতি খরচা বাদে কিছু লাভ পাইয়াছে। আশাকরি আগামী বৎসর জিনিষটী আরও সুন্দর করিতে পারিব।

আলোচ্য বর্ষে সমিতি কেন্দ্রীয় সমিতির বায়ে একটি খাত্তী ক্লাস খুলিয়াছেন। ১০ জন মহিলা শিক্ষা লাভ করিতেছে। স্থানীয় ডাক্তার কশীপ্র নাথ অধিকারী মহাশয় শিক্ষা দিতেছেন। তিনি অল্পগ্রহ করিয়া প্রতি শনিবার শিক্ষা দিয়া থাকেন।

আলোচ্য বর্ষে সমিতি হইতে ৪ জন স্থানীয় হুঃহা মহিলার আর্থিক সাহায্য মোট ২৪০ টাকা করিয়াছে। এবং মুষ্টি ভিক্ষা প্রায় ৪/০ মন চাউল তাঁহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে একজন স্থানীয় মহিলাকে দাইলের ব্যবসা করিবার জন্য ২০ টাকা দিয়াছে। তিনি দাইল তৈরী করিয়া প্রতি সভ্যের বাসায় লইয়া যান। এবং সভ্যেরা বাজার দর অনুযায়ী কেনেন, ইহাতে তাহার আর্থিক সাহায্য হয়।

আলোচ্য সমিতিতে একটি তাঁত বগান হইয়াছে। ইহাতে তোয়ালে বোনা হয়।

শিল্প ক্লাসে ছাত্রী দিগকে সমিতি হইতে কাপড় কিনিয়া দেওয়া হয়। ছাত্রীরা তাহা সেলাই করিয়া থাকে এবং তাহা বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমিতিতে জমা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও সভ্যেরা কাপড় কিনিয়া সম্পাদিকা কাছে দেন, সম্পাদিকা তাহা ছাত্রীদের দিয়া সেলাই করাইয়া দেন, তাহারা বাহা মজুরী দেন তাহার অর্ধেক সমিতি পাইয়া থাকে আর অর্ধেক যিনি সেলাই করেন তিনি পাইয়া থাকেন। ইহাতে ছাত্রীদের কিছু সুবিধা হয়। এই

বৎসর সমিতি একটি অর্গান কিনিয়াছে। ইহাতে গানের ক্লাসের কিছু সুবিধা হয়। এইরূপ কিছু ২ করিয়া ক্লাসটি বড় করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে ৪টি সাধারণ সভা ও ৪টি কার্যকরী সভার অধিবেশনে হইয়াছে। প্রত্যেক সভাতেই সভারা উপস্থিত হইয়া সভার কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

মহিলা সমিতির উদ্যোগেও স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণের চেষ্টায় গত বৎসর হইতে বালিকাদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। এইবৎসর অষ্টম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সমিতি আশা করে এইরূপ ভাবে বালিকাদিকের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে।

সমিতির হিসাব পরীক্ষক স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তিনি সুচারু রূপেই সমিতির হিসাব দেখিয়া থাকেন।

সভ্যদের প্রদত্ত মাসিক টাঙ্গা এবং ছাত্রীবেতন দ্বারা সমিতির শির ক্লাস এবং গানের ক্লাসের মাসিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

এই সমিতির চেষ্টায় সপ্তাহে একদিন করিয়া সমিতি গৃহে স্থানীয় মেয়েদের নিরা সঙ্গীতের জলশা খোলা হইয়াছে।

সমিতির ঘরের জন্য অসুবিধা হওয়ায় মাসিক ২৮ টাকা ভাড়া একখানি ঘর লওয়া হইয়াছে। বর্তমানে সে খানেই ক্লাস হইতেছে। সমিতির বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল—

সমিতির আয়ব্যয়ের হিসাব—১৯৪১—৪২ আয়

১। গতবৎসরের তহবিল	৮৩।
২। ১৯৪১ সালের মে মাস হইতে ১৯৪২ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত টাঙ্গা আদায়	১০৭।৮
৩। ছাত্রীবেতন আদায়	১১০।
হারমোনিয়মক্রয়ের জন্য সাহায্য	২৫।
৪। মেয়েদের নাটক অভিনয় দ্বারা থ্রুচা বাদে ৪৭।	
৫। কুমাল বিক্রয়, এবং প্রদর্শনীর লভ্যাংশ	৩৮।৫
	২৭৬।৫

১৯৪১ হইতে ৪২ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট খরচ

১। সেলাই শিক্ষয়িত্রী	৭৫।
২। গানের শিক্ষয়িত্রী	৯।
৩। খি	১৬।
৪। টাঙ্গা আদায় করা	১৪।৮
৫। চাউলের ব্যবসার জন্য সাহায্য	২।
৬। জর্নেক বিধবাকে সাহায্য	১।
৭। বঙ্গলক্ষ্মী বাধাই	১।
৮। জামা, কুমালের কাপড় খরিদ	৬।১০
৯। মাজুর খরিদ	১।
১০। সভ্যস্বাকার জন্য	১।
১১। ঘরভাড়া	৪।
১২। মজুরী ফিস	৭।
১৩। চিঠি প্রেরণের টিকেট এবং মণিঅর্ডার ফিস	৫।৫
১৪। খাতা খরিদ	১।
১৫। হারমোনিয়ম ক্রয়	৪০।

১৭২।৫

মোট জমা ২৭৬।৫

মোট খরচ ১৭২।৫

১০৪।০

তহবিলে জমা একশত তিন টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র

সম্পাদিকা

বোমার যাদের আকাশ ভাঙে

সুপরিচিত মার্কিন সমর সাংবাদিক কুইন্টিন রেনল্ড স্ লগুন সহরের 'দেইট্ এণ্ড্' পাড়ার উপর এক সাম্প্রতিক বিমান আক্রমণের সময় অ্যাথুলেন্স চালকদের সঙ্গে সঙ্গে একটা রাত্রি পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। চালকরা ছিল সবাই মেয়ে। ঐ সাংঘাতিক রাত্রির কথা স্মরণ করে রেনল্ড স্ লিখছেন :—

‘সে এক ভয়াবহ রাত্রি। সে রাত্রিরই কথা বলছি—গুহুন। সমস্ত দেইট্ এণ্ড পাড়া সেদিন হয়ে উঠেছিলো চকল। মাঝে মাঝে আমাদের মাথার উপর এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো, আর কানে আসছিলো রক্ষা-বিমান-বহর থেকে জুঁজ সঙ্গীতের উদ্ভাস্ত ধ্বনি। সেই তীব্র আওয়াজের মধ্য দিয়েও আমরা স্তব্ধে পাচ্ছিলাম বোমা পড়ার শব্দ। বোমাগুলো পড়ছিলো কাছেই। খানিকক্ষণ পরেই শোনা গেল বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ ; সঙ্গে সঙ্গে বালির বস্তাগুলো থেকে বালি ছিটকে এলো—পরিখার মধ্যকার অ্যাথুলেন্স কেজকে ভিত্তি করে’ দিয়ে আমাদের চোখে মুখে।

‘কেউ কোন কথা বলেন না। কাছাকাছি বোমা পড়লে তাতে যে আওয়াজ হয় আর ধাক্কা লাগে, তাতে খানিকক্ষণের জন্তে হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়।

‘রোগা মতো একটি মেয়ে পরিখার মধ্যে এসে চুকলো। সে তার নীল টুপিটা খুলে কেলে বিনি ওখানকার নেত্রী ছিলেন তাঁকে বলে, ‘আমি আজ রাত্রিটা কাজ করতে চাই।’

‘মহিলাটি বলেন, ‘কিন্তু এখেল, আজ তোমার ছুটি। এখনও বাড়ি গিয়ে শোও নি কেন?’ বলতে বলতে এখেলের দিকে তাকাতেই তাঁর মুখের কথা খেমে গেলো। আর, কেন জানি সকলের মুখই হঠাৎ নীরব হয়ে গেল।

‘মেয়েটি বলতে লাগলো, ‘আজ সকালে যখন বাড়ি গেলাম, গিয়ে দেখি আমার বাড়ি আর নেই। আমি আজ রাতে কাজ করতে চাই, দয়া করে, আমাকেই আগে যেতে দিন।’ যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে নেত্রী মহিলাটি বলেন, ‘আচ্ছা এর পরেই তুমি বাইরে যাবে।’

কাঠের বেঞ্চির একধারে এখেল বসলো। কেউ তাকে

কোনো কথা ভিজেস করলে না! সেই নীরবতার মধ্যে বেজে চললো শুধু কেটলির আওয়াজ। চা আজ লগুনে কেবল একটা পানীয় নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি। চা আজ সুস্থ মনের প্রতীক। একদিন যে-দিনগুলি স্বাভাবিক ছিলো, আর একদিন যে-দিনগুলি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে সেই কথাই আজ স্মরণ কবিয়ে দেখ চা। মেয়েদের মধ্যে একজন এখেলকে এক পেয়লা চা এগিয়ে দিলে।’

আজকের যুদ্ধের উবেগ ও উৎকর্ষার মধ্যে চায়ের মূল্য যে কতখানি তা এই রকম একেকটি ঘটনাতেই আরো বড় হয়ে চোখে পড়ে। আজকের যুদ্ধের সম্মুখক্ষেত্রে রয়েছে কারা?—না, জনসাধারণ ; এবং এই জনসাধারণের পক্ষে চায়ের প্রয়োজন আজ অপরিমিত। বোমা-বিক্ষেপিত ব্রিটেনের লোককে চা যে তৃপ্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছে, তার উজ্জল দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের চোখের সামনে। বোমার যাদের আকাশ ভাঙে সেই ব্রিটেনের লোক আজ শরীরের ক্লান্তি আর মনের অশান্তি দূর করছে চা খেয়েই। এইভাবে অসামরিক জনসাধারণের মধ্যে চা যে কতখানি শান্তি আর সান্ত্বনা এনে দিচ্ছে সম্প্রতি লগুনের একজন সুপরিচিত পাত্রি, রেভারেণ্ড এইচ্ এ, উইলসনের উক্তিতে সেটা খুব পরিষ্কার স্কুটে উঠেছে। লগুনের পূর্বাঞ্চলে বোমা বর্ষণের পরের বর্ণনা করে রেভারেণ্ড উইলসন্ বলছেন :

‘গভীর রাতে কাছাকাছি বোমা পড়ে’ যখন দরজা জানালা ভেঙে গেছে, তখনো দেখছি স্থানলোকদের,—মনে তাদের ভয়ের লেশমাত্র নেই। তাদের একমাত্র চিন্তা দেখছি, তারা কী করে’ অন্তকে সান্ত্বনা দেবে, আর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—‘যদি থাকে তাহলে আর এক পেয়লা চা দিন।’

অসামরিক লোকের মধ্যে বোমা বধণে ‘জীবন যখন তপ্ত এবং হৃদয় যখন শীতল’ হয়ে আসে, তখন চা যে কত বড় আশ্রয়, সেকথা উল্লেখ করে, কাউন্টেন্ট্ অভ গ্লিমাথ্ কিছুদিন আগে বলেছিলেন,

‘এইরকম অবস্থায় এক পেয়লা চা তীব্র হৃদশাকও অপেক্ষাকৃত আরামে পরিণত করতে পারে।’



বঙ্গসঙ্গী—

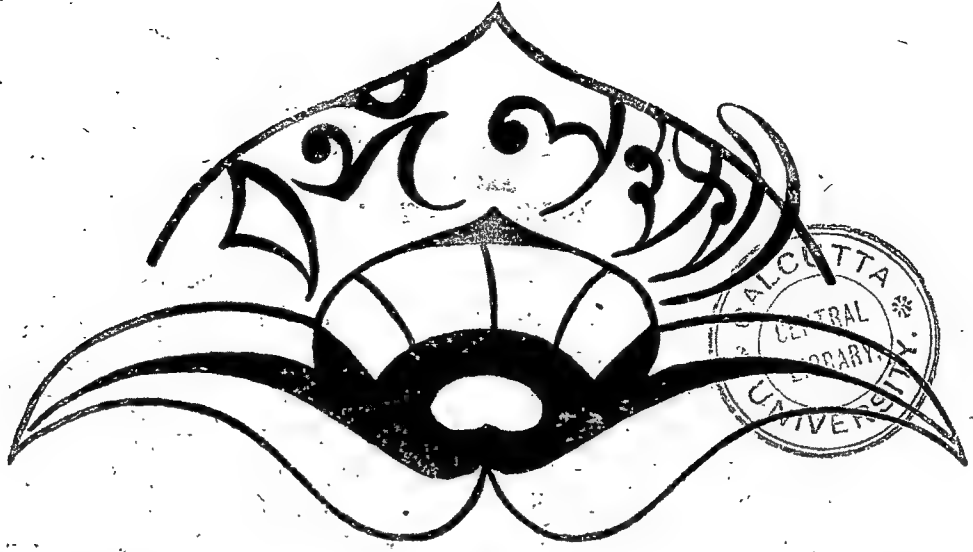


কৃষ্ণনগরে গরোজ নলিনী দত্ত শিল্প শিক্ষাগৃহের শাখা উদ্বোধন সভায়

ডান দিক হইতে—ডাঃ পঞ্চানন নিগুণী, নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম, ইসলাম, নদীয়ার জজ মিঃ শৈবাল গুপ্ত আই-সি-এস,

তৎপন্নী শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত, ত্রিভোজিত্য চন্দ্র বোষ, যাননীয় বিচারপতি চারু চন্দ্র বিশ্বাস, মিস্ মল্লিক,

মিস্ এন, বি, সোম, মিস্ গীতা ও দীপ্তি চ্যাটার্জি, মিস্ প্রতিভা সেন ও শিক্ষার্থীগণ।



১৭শ বর্ষ

ভাদ্র, ১৩৪৯

১০ম সংখ্যা

পৃথিবী সংগ্রাম রত

যুগে যুগে রয়েছে প্রমাণ
মার জয় করিলেন বুদ্ধ ভগবান ;
যে-অবধি নাহি হোল বিশ্বুদ্ধ চেতনা
সহিলেন প্রভু বুদ্ধ সংঘাত-বেদনা ।
ছিন্ন করি ফেলি শেষে জড়-জন্ম-পাশ
মুক্ত করিলেন চিত্ত—স্বচ্ছন্দ আকাশ ।
অন্ধপথে দ্বন্দ্ব ছিল জড়ে ও চেতনে
“জাগ্রত সন্ধিত”—বাণী উড়িল কেতনে ।
পরাস্থ মারের দল, বুদ্ধ সমাহিত,
বিলুপ্ত সংগ্রাম-চিহ্ন, মার অন্তর্হিত ।

মানব-সাধনা উঠি' সর্বোচ্চ শিখরে ।
তৃষ্ণা নাশ করি দিল,—অন্তর শিহরে ;
অবাধ উন্মুক্ত ক্ষেত্রে মৈত্রীর প্রসার
হিংসার হনন হতে বিমুক্ত সংসার ।

পৃথিবী সংগ্রাম রত—দ্বন্দ্ব করি ক্ষয়
আনিবে বিশ্বের পথে মৈত্রী নিঃসংশয় ।

বর্তমান যুগের নারী-সমস্যা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমি যখন গ্রামে যাই তখনই দেখিতে পাই, গ্রামের কি ভদ্র, কি নিয়ন্ত্রণের, কি বিধবা, কি সখা সকলেই ভিক্ষা-প্রার্থিনী হইয়া উপস্থিত হন। তাদের অনেকে যুবতী, কেহবা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা। এই সব ভিক্ষাপ্রার্থিনী মহিলাদের মলিন বসন, মলিন বদন এবং দারিদ্রাজনিত ক্রিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিয়া বাথিত হই, কিন্তু প্রতিকার করিব কিরূপে? শত-শত, সহস্র সহস্র পল্লীতে নারীগণের এইরূপ দুরবস্থা দেখিলে মনে হয়, আমরা কি করিতেছি? যে দেশে নারীসমাজের এত বড় দৈন্ত্য তাহাদের বড় হইবার আশা কোথায়? কিন্তু তবুও ত আমাদের বাঁচিতে হইবে, তবুও ত আমাদের সমাজের এই দৈন্ত্য ও দুঃখ বিমোচন করিতে হইবে। কিন্তু কে করিবে? এ প্রশ্নই হইতেছে গুরুতর এবং গভীর চিন্তার বিষয়।

আমরা বর্তমানে গৌরব করিয়া থাকি যে নারীসমাজের কল্যাণের জন্ত সর্বদা চিন্তা করি। কাব্যে ও উপন্যাসে নানা শ্রেণীর নারী-চরিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের বাঙালীর নিকট যে সমস্যা গভীরতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতেছে নারী-সমস্যা। এ সমস্যা বহুমুখী।

বাংলাদেশে বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগ পর্যন্ত নারীজাতির প্রতি যে অত্যাচার ও অবিচার চলিয়াছে, যে নির্ধ্যাতন চলিয়াছে, যে নিপীড়ন চলিয়াছে তাহার কথা কেহই ভুলিতে পারেন না, কেননা সেকালের পত্রিকার পৃষ্ঠায়, সেকালের আদালতে এখনও তাহার শত শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোনদেশের নারী কুলীন-কুমারীদের জায় হুঃখময় জীবন যাপন করিয়াছেন? ১২৭৪ সালের আশ্বিন, ইংরাজী ১৮৬৭, অক্টোবর মাসের “পল্লী বিজ্ঞান” নামক পত্রিকায় লিখিত আছে, “বজ্রযোগিনী (বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম) পুত্র পাবে ৬কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন কুলীন ছিলেন। কথিত আছে তিনি প্রায় একশত আটটি বিবাহ করিয়াছিলেন।” একবার অবস্থা ভাবিয়া দেখুন।

সে সময়ে কোলিত-প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবাদের প্রতি নির্ধ্যাতন ছিল সামাজিক দৈনন্দিন ব্যাপার। সেকালের নারীসমাজের উন্নতির জন্ত যে সকল যুবক, যে সকল মনীষী সংস্কারকগণ আশ্রয় চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহারা নারী-সমাজের নমস্যা। নারীজাতির হীনাবস্থা দেখিয়া ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎকালে একটি অতি স্বন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন :

বাহার-জং

“ভারতনারীর দশা দেখে অশ্রুধারে ;
ঝরে নয়নের বারি অবিরত ধারে ।
নাই জ্ঞান, নাই মান, সবে করে অপমান,
মাগুষ বলিয়া কভু, কেহনা আদরে ।
ক্রীড়া পুতলি প্রায়, অথবা দাসীর ভায়,
স্বার্থপর পুরুষেরা সদা ব্যবহারে ।
হায় যবে নিরঞ্জে, এসব একান্ত মনে—
ভাবি, দংশে চিন্ত-দেহ কাণবিষধরে ।
ইচ্ছা হয় সব ছাড়ি, এদের মোচন করি,
সঁপি, আছে বাহা কিছু, ইহাদের তরে।”

সে সময়ে নারী জাতির এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া অনেকেই কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের উদ্ধৃত সঙ্গীত হইতে সেকালের নারীসমাজের ইতিহাস সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

এই যে অতীত ইতিহাস তাহা সমাজ হইতে আংশিকভাবে বিদূরিত হইয়াছে। কোলিত-প্রথা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে, বাল্যবিবাহ পূর্বের মত নাই তবে অল্প দিক্ দিয়া যে সব নিপীড়ন চলিত তাহা সবই হ্রাস পাইয়াছে, এমন কথা বলা চলে না।

নারীজাতির প্রতি মধ্যযুগে দান প্রাচীন হিন্দু সমাজে ছিল গৌরবের জিনিষ। কিন্তু সব যুগে সব কালে ছিল, এমন কথা চলে না।

আমরা যখন খ্রীশ্চীচণ্ডীর অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্যো পড়ি, দেবতার বলিতেছেন :—

“বিদ্যাঃ সমস্তান্তব দেবী ভেদাঃ

ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সর্বলা জগৎসু ।

অষ্টকরা পুরিতমম্বৈতৎ

কা তে স্তুতিঃ স্তুব্য পরাপরোক্তিঃ ॥

“হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যা এবং সকল স্ত্রী তোমারই অংশ-স্বরূপা। জগজ্জননী একা তুমিই অখিল পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ ; সুতরাং তোমার আবার স্তব কি ?”

কেননা—আরোপিত গুণবর্ণনার নাম স্তুতি, সেই স্তুতি তোমার ত’ সম্ভব নয়। (তুমি স্তুতির অবিষয় সুতরাং তোমার আবার স্তব কি ?”)

তখন মনে হয়, যে মহতী কলনার দ্বারা সেকালের ঋষিরা নারীজাতিকে জগজ্জননীর অংশস্বরূপা বলিয়া মনে করিতেন

সেই নারীজাতির প্রতি আমরা কি ভাবে কি প্রকারে সামাজিক উৎপীড়ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। সে ইতিহাস-আলোচনা করিতে গেলে রাষ্ট্র ও সমাজের বিবিধ পরিবর্তনের কথা বলিতে হয়। এক্ষেত্রে তাহা নিশ্চয়োক্ত। কেননা তাহার মধ্যেও নানারূপ অসামঞ্জস্য বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন : “ভারতবর্ষের নানা জাতির এই সংঘাত ও সামঞ্জস্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বৈদিক যুগ বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধযুগ পৌরাণিক যুগে পরিণত হইয়াছে। এই সৃষ্টির উদ্যমে রাজা ও রাষ্ট্রনীতি প্রধান শক্তি নহে। অবশ্য বিদেশী রাজা যখন হইতে ভারতে আসিয়াছে তখন হইতে এই স্বাভাবিক সৃষ্টিকার্য্য বাধা পাওয়ার আর একটা অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে। এই জন্মই ইংরাজ যাহাকে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করে ভারতে সেই ইতিহাস মুসলমান অধিকারের পরে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অর্থ এমন নহে যে বিদেশী রাজত্বের পর হইতে ভারত-ইতিহাসের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পর্যন্ত বলা যায় যে পূর্বের চেয়ে আমাদের ইতিহাস জটিল হইয়াছে, আমাদের হ্রস্ব সময় আরো একটা নূতন গ্রন্থি পড়িয়াছে। এখনো আমাদের মধ্যে ভেদের সমস্যা। এই ভেদ সমাজের ভিতরে থাকতেই তত্ত্ব দেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কিছুতেই ঠিকমত ঘটতেছে না। আমরা অন্তর্দেশের নকলে যে সব পন্থা অবলম্বন করিতেছি, বার বার তাহা ব্যর্থ হইতেছে।”

“যাহা হউক, আমাদের দেশের এই সামাজিক ইতিহাসের ধারা এখনো আমরা আগাগোড়া অনুসরণ করিয়া দেখি নাই, অনেকটা অস্পষ্ট আছে এবং অনেক জায়গাতেই ফাঁক পড়িয়াছে বিশেষত যেহেতু আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্ম্মতত্ত্বমূলক সেই জন্মই আমাদের নিজেদের আজন্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাস কুশাশর মত আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; সত্যকে নিরপেক্ষ ভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে বাধা দিতেছে। যেটুকু গোচর হইয়া উঠিতেছে তাহা বিদেশী ঐতিহাসিকদেরই চেষ্টায়। *

আমাদের সমাজে এই যে দুঃখ-দারিদ্র্য তাহার মূলে রহিয়াছে বিদেশীর অন্ধকৃতি, তাহারই ফলে বিলাস ও অভাব বৃদ্ধি। আর অনাবশ্যক ভাবে ইংরাজের অন্ধকরণ। নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বর্তমান যুগেও ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা বড় এমন কথা বলিতে পারি না। ইংরাজ নারী জাতির প্রতি এ যুগেও সম্মান প্রদর্শন করে না এমন কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রাও নহে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রা তাহাদের সতীর্থ ছাত্রীদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন তাহাই বলিতেছি। লেখক সোবিয়ট রুশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের ব্যবহারের সহিত তুলনা

* ভারত-ইতিহাস চর্চা...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

করিয়া বলিতেছেন : “And in class there was none of that nonsense that is the tradition at Cambridge that men should stamp when the women enter lecture room nor was there that constant flirting in the passages which had been a characteristic of college life at Bangor. In Cambridge, I believe there is still a University lecturer who refuse to tolerate a woman in the lecture-room. Such barbarity amazed the Russians when I told them of it.”

ক্যাম্ব্রিজের স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছাত্রীদের প্রতি এমন কি অধ্যাপকেরা কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা ক্যাম্ব্রিজের একজন অধ্যাপকের লিখিত গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের বাঙ্গালাদেশের ছাত্রগণ কলেজে ছাত্রীদের প্রতি এইরূপ অসম্মানজনক আচরণ করেন বলিয়া শুনি নাই। আর ভারতীয় অধ্যাপকগণ ছাত্রীদের প্রতি যেক্রূপ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেন তাহাও আদর্শ স্থানীয়। কিন্তু এ কথা ত আর বাহিরে প্রচারিত হয় না।

বর্তমান সময়ে সোবিয়ট রুশ পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি করেন না। তাহারা নারীকে সর্বোংশে পুরুষের তুল্য বলিয়া মনে করেন এবং প্রতি কার্য্যে সমভাবে নিত্য সাথী রূপে গ্রহণ করিয়া অপূর্ণ আদর্শ প্রচার করিতেছেন। Men and Women এই সংজ্ঞা, আমাদের দেশের পুরুষ ও নারী এমন কথা সোবিয়ট রুশে নাই। ইহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। পুরুষও মানুষ, নারীও মানুষ, কাজেই কোন বিভেদ ব্যতিরেকে “মানুষ” এই সাধারণ নামেই সে-দেশের নারীও সমাজে পুরুষের সমতুল্য। সে হয় নহে, সে নীচ নহে কোন দিকেই সে ন্যূন নহে। এইরূপ আদর্শ সেদেশের সর্বত্র হয়ত প্রচারিত। এমনভাবে আমাদের দেশে কোন কালে হয়ত ছিল, এখন কিন্তু তাহা নাই।

আমরা অতীতের কথা বলিব না বলিয়াছি। ভবিষ্যতের কথাও অদৃশ্য দেবতাই জানেন। কিন্তু বর্তমানের কথাই বলিব এবং তাহা আমাদের সমাজসমস্যা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে—গ্রামের যেয়েরা ভিক্ষার্থীরা রূপে যখন আসেন তখন লজ্জাও হয় দুঃখও হয়। কিন্তু প্রতিকার কি? প্রতিকারের বিষয় আমরা গভীর ভাবে ভাবিয়া কখনও কিছু করিতে যত্নবান হইয়াছি কিনা তাহাই মনে আসে।

প্রথমতঃ গ্রাম্যজীবনে স্বাস্থ্যের অভাব, লোকদের আর্থিক অবস্থার অভাব, শিক্ষার অভাব, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা,

এবং ধর্ম সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস। এ সমুদয় অভাবের মূল কারণ কি? আমাদের মনে হয় শিক্ষা।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে বালিকা ও নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কম। কি হিন্দু বাঙ্গালী, কি মুসলমান বাঙ্গালী, যাহারা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দেন, তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে আমরা ভারতবর্ষের অগ্রান্ত প্রদেশের বিভিন্ন জাতির অপেক্ষা উন্নত এমন গর্ব করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞী-শিক্ষায় বাঙ্গলা দেশ কি মাদ্রাজ, কি বোম্বাই প্রভৃতি দেশ হইতে অবনত, তাহা সরকারী বিবরণ হইতে প্রকাশ হইতেছে। মাদ্রাজ জ্ঞী-শিক্ষায় বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। নারীদের নিরক্ষরতার দ্বারা সমাজের যে কত অবনতি হইতেছে তাহা কে বুঝিবে? সোভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গলাদেশের মুসলিম সমাজ এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন এবং এ জুতাই হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলিম সমাজে জ্ঞী-শিক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে।

শিক্ষার অভাবেই দারিদ্র্য আসে। পরনির্ভরশীল হইতেই হয়। গ্রামের স্ত্রীলোকদের দুরবস্থা বেশী ভাগ দেখিতে পাই ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে। তাহার কারণ—বালবিধবা নারী হয়ত খণ্ডুর বাড়ী হইতে বিভাড়াইয়া আসিয়াছেন পিজালয়ে। পিতামাতা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাহাকে স্বখে হউক, দুঃখে হউক, এক বেলা এক মুষ্টি ভাত খাইতে দিয়াছেন, কিন্তু ভাই বিদেশে প্রবাসী। তিনি লিখিয়া পাঠান বাড়ীর জমিজমার আয় হইতে খরচ চালাও। কিন্তু সে জমি জমা হইতে হয়ত এক পরস্যাও আসে না। এইরূপ ভাবে গ্রাম্য বিধবা মহিলাদের অনেকেরই অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকে না। হয় পরপ্রত্যাশী হইতে হয়, নয় ভিক্ষা করিতে হয়।

ভারপর সখা স্ত্রীলোকদের কথাও বলিতেছি। তাহারা সামাজিক বৈষম্যে নানারূপ ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ করিয়া থাকেন। আমাদের বাসগ্রামে এক ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের স্ত্রী বিয়োগ হয়। ভদ্রলোকের দুইজন উপার্জনক্ষম বিবাহিত পুত্র ছিল, বয়স্ক বিবাহিতা কন্যা ছিল এবং পৌত্র ও দৌহিত্র চারি পাঁচটি ছিল, কিন্তু তথাপি বৃদ্ধের বিবাহের কামনা দূর হইল না। সে এক সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতীকে বিবাহ করিল। এই পক্ষে পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে ছয়টি। বৃদ্ধের বয়স এখন আশীর কাছাকাছি। সে বাতে পুত্র ও অচল হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বেও সে অতি সামান্য উপার্জন করিত। এখন ত কোন উপার্জনই নাই। পুত্রেরা কার্যস্থলে বিদেশে। তাহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতেছে। তাহাদের উপার্জনও তেমন বেশী নহে। নিজেদের পারিবারিক ব্যয়ও ত নির্বাহ করিতে হয়। তাহারা সময় সময় পিতা ও বিমাতাকে সামান্য কিছু কিছু সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু তাহাতে ছয়টি সন্তান লইয়া মোট আটজনের কিরূপে চলিতে পারে? ভারপর বাড়ী নাই। পরের আশ্রয়ে অতি জীর্ণ কুটীরে থাকিতে হইতেছে। ঐ ভদ্রলোকের

পত্নী বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, নানা উপহাস ও বিজ্ঞপের মধ্যে কোনদিন একখানি পুরাণো কাপড়, কোনদিন পাঁচ সের চাউল বা কিছু ডাল সংগ্রহ করিয়া যে কষ্টে জীবিকানির্বাহ করিতেছে, তাহা ভাবিলেও দুঃখ হয়। এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে কিরূপে বাঁচানো যাইতে পারে? তাহাই হইতেছে প্রধান সমস্যা। ছেলেমেয়ে কয়টি লেখাপড়া শিখিবে কিরূপে? বই কিনিবে এবং স্কুলের মাইনে দিবার টাকা দিবে, এমন পরস্যা তাদের কোথায়? এ সমস্যার সমাধান কি?

অনেকদিন পূর্বে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সত্যবালা দেবী লিখিত ‘নারীসমস্যা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। প্রবন্ধের একস্থানে লেখিকা বলিয়াছিলেন: “নারী না উন্নত হইলে নারীর অবস্থারও উন্নতি হইবে না। প্রথম বাধা, নারী আপনার দিক হইতে একথা এখনও বুঝিতে পারে নাই; তাহারা চোখে এখনও বেশই বাপসা দেখে। উন্নত হইবার ইচ্ছা জাগিবার মত উপযুক্ত মানসিক অবস্থা এখনও তাহারা লাভ করে নাই। সে নিজের দিক হইতেই তাহাকে তুলিবার, তাহাকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ করিয়া দিবার সকল চেষ্টাকেই প্রতিরোধ করিতেছে। সে রক্ষণশীল। একদিকে জীবন-সমস্যা তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়া, আমাদের সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, কালোপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে প্রচণ্ডবেগে তাগিদ করিতেছে; অপর দিকে নারীর জড়ত্ব সমাজের রক্ষণশীলতার অবস্থান-দুর্গ হইয়া, আমাদের মুখ খুবড়িয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। সমাজ অচল—নারী তাহার চরণের শৃঙ্খল বলিয়া। সমাজ নিষ্পন্ন—নারী তাহার বৃকে জগদল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া আছে বলিয়া! এত অস্বাভাবিকতা প্রকৃতির অসহ। স্বাধীন, উন্নত চিত্ত পুরুষের কাছে বিবাহিত জীবনটাই অশ্রদ্ধার বস্ত্র—ইহাই আজ সমাজবিপ্লবের সুস্পষ্ট পূর্ব লক্ষণ। নারী সমস্যার সমাধান সেই দিনই হইবে, নারীর জীবনে একটা স্বাধীন ব্রতের স্বাধীন অনুষ্ঠান সেই দিনই হইবে, যেদিন নারী বুঝিবে আপনাকে সমগ্ররূপে; পাইবে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে। ইহারই নাম প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতা। নারী সমস্যার স্বাধীন চেষ্টা যতদিন গোঁজামিল ব্যাপার, সমাধান ফলও ততদিনই অস্থিরীর্ষ ডিম্ব প্রসব। সব মিথ্যা, সব ছদ্মগুণ। স্থায়ী ফল আকাশ কুমুম।” প্রত্যেকটি কথা নিগূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার নাই বলিলেই হয়। বিরাট বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক জেলার যে শিক্ষা-বিবরণী সরকার প্রকাশ করেন, তাহা হইতে দেখিতে পাই আমরা স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি। ভারপর শিক্ষার যে ব্যবস্থা প্রচলিত তাহাও আমাদের দেশের উপযোগী, সমাজের উপযোগী এমন কথা বলা চলে না। কলেজের শিক্ষা যে সব মেয়েরা পায়,

তাহাদের বেশীর ভাগই বিবাহের ব্যবস্থা হয় না বলিয়া। উপযুক্ত পাত্রের অভাব। কতাকে বাড়ী বসাইয়া রাখিলেও চলে না, তাই কলেজে পাঠানো হয়। এই শিক্ষিতা মেয়েরা বিবাহ না হইলে হয় শিক্ষয়িত্রী হন, কিংবা অবিবাহিতা থাকিয়া একান্ত নিরাশ মনে কোনও উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র না পাইয়া রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করেন কিংবা উদ্দেশ্য-বিহীন পথে ব্যর্থ জীবন যাপন করেন।

সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টির মূলে দৈন্ত ও দুর্দশা এবং উদ্দেশ্য-হীন জীবন যাপনই হইতেছে প্রধান। এ সমস্যা একা নারীর নহে পুরুষেরও আছে। পুরুষ ও নারীর অন্নবস্ত্র সমস্যা সমতুল্য, কিন্তু আমাদের দেশে নারী পুরুষের বোঝা। পুরুষ নারীর বোঝা নহে। কেননা পুরুষ উপার্জন করিয়া, নারীকে প্রতিপালন করে, কাজেই আপনা হইতেই নারীর সাধ করিয়া অধীনতার ফাঁস গলাইয়া পরিতে হয়। কিন্তু নারী এইরূপ অধীনতাকে, অন্ততঃ আমাদের দেশে অধীনতা বলিয়া মনে করে না। মনে করিয়াও সে সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। নতুবা কোলিক্তপ্রথার শোচনীয় দুর্দশাকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিত না, সহমরণপ্রথাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতানলে জীবন বিসর্জন দিত না। কিন্তু বর্তমান যুগে বখন পৃথিবীর প্রথর সভ্যতার দীপ্তি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রভা আমাদের দেশের নারীসমাজের মধ্যেও নবীন জাগরণের অরুণিমা জাগাইয়া দিয়াছে, তখন নারীও বৃত্তিতে আরম্ভ করিয়াছে,—পুরুষও যেমন মানুষ সেও তেমনি মানুষ। সমাজের সর্বাদীন পুষ্টির জন্য উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য চাই—এক্য চাই। নতুবা সমাজ অচল ও অনড় হইবে। পুরুষ বা স্ত্রী, সমাজ-জীবনে সমান। কেহ কাহারো অপেক্ষা হয় নহে। পুরুষ কে? নারীর সমান। সেই সৃষ্টির কোন অনাদি অতীত হইতে সে জননীরূপে, ধাত্রীরূপে, রক্ষণী ও পালনী শক্তির দ্বারা মানবজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। পুষ্টিটির মত, সমাজ-জীবনে প্রীতি ও প্রেম বিকশিত করিবারে মূলে রহিয়াছে নারী। পারিবারিক জীবনে নারী আনে শান্তি ও মধুরতা।

আমাদের বর্তমান যুগে যে নারী-সমস্যা উপস্থিত

হইয়াছে, যে ক্ষুধার্তা দীনা-প্রণীড়িতা নারীসমাজের ক্রন্দনে আমরা বিচলিত হইতেছি—তাহার মূলে রহিয়াছে বিশ্বমানব সমাজের রক্তচক্ষু ও প্রলয়ঙ্করী রণস্পৃহা এবং দুর্দমনীয় লোভ ও আকাঙ্ক্ষা। এই আঘাতের প্রতিরোধ করিতে হইলে নারীসমাজের মধ্যেও প্রলয়ের হুঙ্কার চাই। নারী জাতির শিক্ষা, সামাজিক জীবন পূর্বের প্রাচীন পন্থার অনুসরণ করিলে কখনই চলিতে পারিবে না। আর নারী যদি বিনয়ী লতা-বধূটির মত উন্নত বিটপের আশ্রয়ে আপনাকে জড়াইয়া রাখিতে চাহেন, তাহা হইলেও তিনি বাঁচিতে পারিবেন না।

নারীর মর্যাদা, নারীর পবিত্রতা, নারীর রক্ষণাবেক্ষণের ও জীবিকা অর্জনের জন্য কেবল পুরুষের রক্তচক্ষু ও কঠোরতার উপর নির্ভর করিলে বর্তমান সময়ে নারী-সমাজের উন্নতির মূলে বাধা জন্মিবে, ইহা সুনিশ্চিত। ইহাতে সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে। নারীর স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা ও নমনীয়তা এবং পাত্তিত্বের ব্যাঘাত ঘটবে—এমন কথা মনে করিলে চলিবে কেন? আমি তাহা বিশ্বাস করি না।

আমি প্রত্যহ চোখে দেখিতে পাই—আমাদের পাড়ার বস্তীতে অসহায় নারীরা নিত্য নির্ধাতিতা হইতেছে। স্বামী গৃহে আসে না। কিন্তু দুর্ভাগিনী-নারী পাঁচ ছয়টি সন্তান লইয়া বিপন্ন। ছেলেমেয়েরা পথে ঘাটে খেলিয়া বেড়ায়, শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা নাই, কেহত তাহাদিগকে দেখে না। কলিকাতা সহরের স্নায় বিরাট সহরে, কলিকাতা করপোরেশনের স্নায় অর্থশালী পৌরকেড্রেই বখন দেখিতে পাই—শত অবজ্ঞা, শত লাঞ্ছনা ইহাদের সহিতে হইতেছে, তখন পল্লীর কথা আলোচনা করিতেও সঙ্কোচ হয়। মা দাসী বৃত্তি করিতে প্রত্যাষে বাহির হইয়া যায়। অভাগা শিশুরা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, চুরি করিতে শিখে, কুসংসর্গে মিশে, অথচ এদিকে আমরা লক্ষ্যও করি না। এইরূপভাবে নারী জাতির সমস্যার প্রতি যেমন পুরুষ আমরা উদাসীন, নারী জাতির মধ্যে বাঁহারা নেত্রীস্থানীয়া তাঁহারও উদাসীন। এরূপ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সে-কথাই আমি ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিব। ক্রমশঃ

সহর-ও পল্লীগ্রাম

শ্রীরেণুপ্রভা রায় (নাহিড়ী) বি-এ

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় একালের মেয়েদের জীবন যাত্রার প্রণালী; একালের মেয়ে কেবল সহরের আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়ে ওঠে না, সহর এবং পল্লীগ্রাম এই দুই এর সম্মিলনে বাদ্যলার বিরাট নারীশ্রেণী গঠিত হয়েছে। কিন্তু নাগরিক এবং গ্রাম্য জীবন যাত্রার প্রণালীর মধ্যে বিভিন্নতা বা পার্থক্য প্রচুর। সাধারণ পল্লীবাসিনীর প্রাতিহিক জীবন যাত্রার ধারা কি রকম? তারা রান্না এবং গৃহকর্ম করে, কামনা মত বর লাভের জন্য শিব পূজা করে এবং গৃহে পূজাপার্বণ উপলক্ষে অতিথি ও অভ্যাগতদের আপ্যায়িতও করে। শুধু তাই নয়, অবসর সময়ে গ্রামের যাত্রা গমনের বা কথকতার আসরে যোগদান করে এবং অবসর সময়ে বিচিত্র গৃহ-শিল্প সাধনায় নিজের সৌন্দর্যপ্রিয়তার ও কৃচিজ্ঞানের পরিচয় দিতে চেষ্টা করে। এ তো গেল সাধারণ মেয়ের জীবন যাত্রার ধারা, এ ছাড়া ছোট ছোট বহু প্রকার কার্য আছে যা আধুনিক যুগে স্থল কলেজে পড়া সহরের আবহাওয়ায় বর্ধিত মেয়েদের মধ্যে একেবারেই অভাব। পল্লীগ্রামের এই সাধারণ ভাবে জীবনানুভবিত করার সম্বন্ধে—যেমন সকলের একটি মোটামুটি ধারণা আছে, তেমনি একথাও সর্বজনবিদিত যে তারা আধুনিক বা নাগরিক সভ্যতার স্পর্শের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের সরল, অনাড়ম্বর জীবনের প্রথম দর্শনে দর্শকের চিত্তে এক বিলম্বময়ী উন্মাদনার সৃষ্টি করে। কারণ সেখানে নেই কৃত্রিমতার বেড়াঁজাল,—আর নেই সেখানে প্রতিপদ ক্ষেপে অতি আধুনিকতার বা আধুনিক সভ্যতার নিকট মস্তক অবনতি। কিন্তু রাঙ্গালা দেশে সমগ্র নারী শ্রেণী পল্লী-জীবনের মধ্যেই পর্যাবসিত হয়নি। আধুনিক আবহাওয়ায় বর্ধিত সহরের মেয়ের জীবনে চলার রীতি যে বিভিন্ন হবে, সে কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। তাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থল কলেজে পড়াশুনা করে, পাশ্চাত্য সভ্যতা

বা কৃষ্টির সর্বাংশে অনুকরণ করতে না পারলেও করতে অন্ততঃ চেষ্টা করে, সিনেমা, চায়ের পার্টিতে যোগদান করে। শুধু তাই নয়, কালোপযোগী সাজ বিহীন করে যুগের সাথে চলতে চেষ্টা করে। এটা এক রকম মোটামুটি একটি চিত্রের বর্ণনা দেওয়া গেল। তবে সহরের বন্ধেও পল্লীগ্রামের জায় জীবন যাত্রার প্রণালী যে একেবারে অচল, একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু দুইয়ের জীবন যাত্রার চিত্র অঙ্কন করলে পর পল্লী জীবন ভাল এবং সহরের জীবন যাত্রা মন্দ অথবা সহর ভাল এবং গ্রাম্য জীবন তা নয়, এই সহজ মন্তব্য প্রকাশ করতে পারি না। কারণ জগতে কি ভাল ও কি মন্দ সেটা আমরা চট করে বা ক্ষণিকের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি না। বললেও সে মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ হয় না। যুক্তি পূর্ণ হয় না এই জন্য যে পৃথিবীতে সকলের মধ্যে এবং সকল পদার্থের মধ্যেই ভাল এবং মন্দ উভয়েরই সমাবেশ আছে। যিনি perfect being তিনি হয় দেবতা না হয় অতি-মানুষ। এক কথায় ভাল ও মন্দ উভয়কেই বিচার করার ক্ষমতা আমাদের থাকা চাই। না থাকলেও মন্তব্য প্রকাশ করার পূর্বে অর্জন করে নিতে হয়। সতীদাহ প্রথাতে এককালে আমাদের দেশের মেয়েরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত। কিন্তু কালের প্রবাহে বিশ্ব-বাসীর সংস্কার ভেঙ্গে গেছে, আর ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। আমেরিকায় পূর্বে ভদ্র ঘরের মেয়েরা ছায়াছবিতে অভিনয় করতে লজ্জা পেতেন, কিন্তু আজ সে লজ্জাও নেই, সে শঙ্কাও নেই। আমাদের সমাজেও ঠিক অল্পরূপে অবস্থা হতে চলেছে। একদিকে যেমন ভাল অপর দিকে তেমনি মন্দ দুইই আছে! এবার গ্রাম্য মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলা যাক; তারা সরল-অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে, সৌখিনতা বা বিলাসিতা কি, জানে না—অথবা Life এর Complexity বা জটিলতা পূর্ণ জীবনের অর্থ বোঝে

আকাশের বিচিত্র বর্ণ সমারোহ, জ্বাল বনানীর
কর শোভা এবং তরুণ তরুণীর স্বচ্ছ হাসি ও
অনাবিল আনন্দ—এইগুলো নিয়েই বিচার করলে
বিচার সুবিচার হবে না। সে সুখী মাত্রেই স্বীকার
করবেন। জীবনের বাহ্যিক চিত্রটিই সব নয়, ভিতরের ও
আরো একটি রূপ আছে। সে চিত্র অঙ্কন করে ভাল-মন্দ
বিচার করার ক্ষমতা রাম-শ্যাম-যজ্ঞ সকলেরই থাকে না।
সে পেরেছিলেন অপরাধের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। কিন্তু
জুগের বিষয়, সকলেই শরৎচন্দ্র নন। ‘অরক্ষণীয়’ বড়
বৌ’ ও পোড়া কাঠ। ‘রামের স্ত্রী’ ‘দিগন্ত’ এবং
‘বিন্দুর ছেলের’ ‘এলোকেশী’ এই চরিত্রগুলি পল্লী সমাজে
কি একবারেই অচল? সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে বাধ্য যে
নারায়ণী, রমা প্রভৃতি চরিত্রগুলিও সমাজে অসম্ভব নয়।
আর অসম্ভব হবেই বা কেন? তাঁর ছিল এদের সম্বন্ধে
তিন্ত অভিজ্ঞতা এবং তিনি দিনের পর দিন এদের সঙ্গে
বাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর অতি অল্প
উপভাসেই সহরের মেয়ের চিত্র আছে। কারণ বাদে
সম্বন্ধে তাঁর ভাল রকমের অভিজ্ঞতা ছিল না—তাদের
সম্বন্ধে তিনি কখনও অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করেন নি।

আর এক কথা। আধুনিক যুগে কাগজে পড়েই
হোক অথবা অল্প যে কারণে হোক সহরের মেয়ের দোষ (১)
দেখিয়ে দেওয়াটাই যেন ফ্যান্টাসি হ’য়ে দাঁড়িয়েছে।
দোষ দেখাবার সাহস সকলেরই আছে। কিন্তু ভাল হ’বার
পথ বাৎসল্য দেবার ক্ষমতা কারও নেই। যারা বলেন
তাঁরা হয়তো প্রশ্ন করবেন, “তোমাদের আছে কিছু ভাল?”
তা হলে আধুনিক সহরের মেয়েরা কি Super human?
ডাক্তার আসেন কি কেবল রোগ ধরিয়ে দেবার জন্য, ওষুধের
ব্যবস্থাটাও কি তাঁরা করে যান না? কিন্তু এমনও অনেক
রোগ আছে যা আমরা সাধারণ মানুষ হয়তো বলে দিতে
পারি কিন্তু ওষুধের ব্যবস্থা তো করতে পারব না, সে কথা
সর্ববাদী সত্য! সহরের মেয়েরা বিলাসিতার শোতে গা
ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে। এ কথা যে ভুল, অনেক অনেকবার
বলেছেন। সুতরাং এর মধ্যে নতুন বা মৌলিক কিছুই
নেই। সহরের মেয়েরা বিলাস করে। নিত্য নতুন
সাজ বিভ্রাস করে, সত্য কথা। বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত সংসারে

বিলাসিতা বা সৌখিনতার পরিচয় দেবার কয়জনের সাধ্য
আছে? সহরের অনেক মেয়েকে নিজ হস্তে গৃহের কাজ
কর্ম সমাধা করে, ভাই বোনকে মানুষ করে নানারূপ শিল্প-
কার্য বা লেখাপড়া শিক্ষা করতে হয়। অনেক মেয়েকে
পড়িয়েও শিক্ষা লাভ করতে হয়। অর্থাৎ নিজেকে অর্থো-
পার্জন করতে হয়। সুতরাং তার মধ্যে বিলাসিতা করার
সময় বা অর্থ তারা পাবে কোথা থেকে? যুগোপযোগী
সাজ বিভ্রাস, নিত্য নতুন অলঙ্কারের বায়না আজ যে কেবল
সহরের মেয়েরা একচেটিয়া করেছে, একথা বললে এক-
দেশ দর্শিতার পরিচয় দেওয়া হবে। একটা উদাহরণ
দেওয়া যাক। বসে মিলের এক ধরনের শাড়ী আছে যাকে
আমরা বরণা শাড়ী বলি। সেই শাড়ী যখন বাঙ্গলা দেশে
চালান হ’লো তখন সহরের মেয়েরাই তাকে সর্বপ্রায়ে
আহ্বান করে নিল সত্য কথা। কিন্তু অনতিবিলম্বে দেখা
গেল, সুদূর পল্লিবাসিনীরাও এই নতুন ফ্যাশনের তরঙ্গে
চলেছে। এ আমার তাজা অভিজ্ঞতার থেকে বলছি।
এমন কি এখনও পর্যন্ত তারা এ শাড়ী ব্যবহার করেই
চলেছেন যদিও সহরের অনেক মেয়ে নানা কারণে এ শাড়ী
আর ব্যবহার করতে চাইছে না। শুধু তাই নয়, হাল
ফ্যাশনের অলঙ্কার, লম্বা হাতার ব্লাউজ, পাঁচাত্তা মেয়েদের
মত বুলন Twelve এর ব্লাউজ সমস্তরই বহুলতা তাদের
মধ্যে দেখা দিয়েছে। পূর্বে পল্লিবাসিনীরা শাড়ী-সেমিজেই
সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু এখন শাড়ী-ব্লাউজ তারি সাথে
সাথে শায়া সমস্তরই চাহিদা তাদের মধ্যে সমান ভাবে
যাচ্ছে। অর্থের প্রশ্ন হয়তো এখানে উঠতে পারে। বাদে
সামান্য অর্থ আছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই সাজ করে থাকেন,
কিন্তু পল্লিবাসিনীরা এইখানে সহরের আনুগত্য স্বীকার না
করে অন্যায়সে তো নিজেদের স্বাভাব্য বজায় রাখতে
পারেন। তাঁদের পুরাতন ফ্যাশনের সাজ গোঁষাক ও
অলঙ্কার নিয়ে থাকতে পারেন না কেন? সুতরাং অনুকরণ
যে কেবল সহরের মেয়েরাই করেন, তা নয়, গ্রাম্য মেয়েরও
অনুকরণের ক্ষমতার অল্প প্রমাণ আছে। অত্যধিক
মানসিক পরিশ্রমে সহরের মেয়েরা স্বাস্থ্যহীন
হয়ে পড়ছে এ কথা যেমন অসম্ভব নয়, তেমনি ম্যালেরিয়া
প্রাণিড়িতা পল্লিবাসিনীর মধ্যে অজ্ঞতার দরুণ স্ত্রীত্ব ইত্যাদি

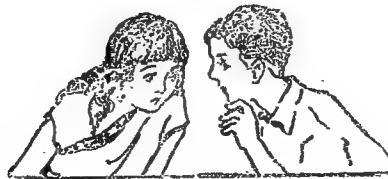
রোগে কি অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন না? স্মৃতি, শ্রীলতাজ্ঞান, সৌন্দর্যপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেক গুণ যে গ্রাম্য মেয়েদের অপেক্ষা সহরের মেয়ের মধ্যেই অধিকরূপে দেখা যায়, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আজকাল কাগজে, কলমে, বেতার বাতায় বা platformএ আমরা আধুনিক সভ্যতার বা পাশ্চাত্য প্রভাবের যতই তীব্র নিন্দা করি না কেন তবুও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাদের প্রভাব নাগরিক এবং নাগরিকাদের জীবনের উপর প্রতিফলিত হ'তে বাধ্য। রুচিজ্ঞান, সৌন্দর্যপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণগুলি আমরা তাদের নিকট থেকেই আয়ত্ত করেছি। যদি রুচিমত সাজ বিহীন করে নিজের স্বাতন্ত্র্য বড়ায় রাখতে পারি তাহলে ভাল, না হ'লেও তার মধ্যে মন্দ কোথায় আছে আমরা বুঝি না। যে সমাজের সংস্পর্শে আমরা নিরন্তর বাস করছি তার কিছু ছাপ আমাদের জীবনের উপর পরিস্ফুট হ'তে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের পর অনেক ছোট কবি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদের অনেকের কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এটা বোধ হয় তারা জ্ঞাতসারে করেন না।

একদিক দিয়ে সহর যেমন শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির কেন্দ্র অপর দিকে আবার আছে শাড়ী জামা পরার আকাজক্ষা ও ফ্যাশন ষ্টাইল করার আগ্রহ। যেখানে অন্ধকার সেইখানেই আলো। ভালোর পাশে মন্দ থাকবেই। পল্লীমেয়ের জীবন সরল-অকৃত্রিম সত্য কথা। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়জন জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে? জাতীয় জীবন বা জাতীয়তা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতির অর্থ কয়জন উপলব্ধি করতে পারে? কয়জন মেয়ে অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চা বা সদৃশ পাঠ করে? প্রতি পদক্ষেপে যারা অপরের মুখাপেক্ষী, তারা যদি উদ্দেশ্যবিহীন জীবনযাপন করে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কি-ই বা আছে। সহরের মেয়েরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে,

সিনেমায় অভিনয় করে, কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে পোষাক পরিচ্ছদের অন্তরালে নিজেকে ঢেকে রাখতে করে। তাহ'লেও তারা প্রতিদিনের সংবাদপত্রখানা করে বৃহত্তর জগতের সংবাদ রাখার চেষ্টা করে এবং আধুনিক জগতে উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের যে কোনও অর্থ বা মূল্য নেই, সে কথাও সর্বাংশে না হ'লেও কতক অংশে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সরোজিনী নাইডু, বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত, ক্রপসকায়া, মাদাম চিয়াং কাইসেক, সরোজনিনী দত্ত প্রভৃতি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন কি না জানি না—কিন্তু তারা যে সরল অকৃত্রিম জীবনের মধ্য দিয়ে পল্লীর আবহাওয়ায় বর্ধিত হ'য়ে ওঠেন নি সে কথা সর্বজন বিদিত। এখনও যারা মুখ্যভাবে বা গৌণভাবে দেশের সাহায্য বা জাতীয় জীবনে উন্নতি করার চেষ্টা করছেন, তাঁরাও এই সহরের মেয়ে। পরাধীন ভারতবর্ষের অবস্থা সহরের মেয়ে যদি শতাংশের একাংশও উপলব্ধি করে থাকে, পল্লীর মেয়ে তার কিছুই বোঝেনি। সুতরাং জাতীয় জীবনের উন্নতি কি কেবল সহরের মেয়েরাই সাধন করবেন আর পল্লীর মেয়ে বাদ পড়বেন? কিন্তু দু'জনকে নিয়েই বাঙ্গালার বিরাট নারী-শ্রেণী গঠিত হ'য়েছে। পল্লীর অজ্ঞতা দূর করতে পারেন একমাত্র সহরের মেয়েরাই। তাদের অনাড়ম্বর ও সরল জীবন যাত্রাকে বাদ দিয়েও তারা অনেকাংশ স্বয়ংমুখীর মত আধুনিক নাগরিকাদের মুখাপেক্ষী হ'য়ে আছে। শেষ কথা এই যে আংশিক সত্যকে স্বীকার করার ক্ষমতা হয়তো অনেকেরই আছে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যকে স্বীকার করার হুসোহস অতি অল্প লোকই অর্জন করে থাকে।*

* আমার লিখিত মেয়েদের সম্বন্ধে “ফ্যাশন ও ষ্টাইল সমস্যা” এই প্রবন্ধের প্রতিবাদের উত্তর।

লেখিকা।



পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

মনে পড়ে শান্তিনিকেতনের একটা অননীয় দিবাসানের কথা। পশ্চিমের রক্তকঁকর বিস্তৃত ধূসর মাঠের ধারে ধারে সন্ধ্যার আবছায়া নেমে আসছে। আকাশে রক্ত আবার—ক্লান্ত গোরু-গাড়ির চাকার একটানা শব্দ সমগ্র পৃথিবীকে ঘন বিহ্বল করে তুলেছে। উত্তরাংশে কবিগুরুকে দেখেছিলাম সন্ধ্যার সেই ছায়াঙ্ককারে। দারুণ রোগভোগের পর কবি মৃত্যুর দ্বার থেকে এই কোলাহল-মুখর পৃথিবীতে সদ্য ফিরে এসেছেন। তাঁর সমস্ত দেহে ক্লান্তির পাণ্ডুর ছায়া। দেখলাম, সমস্ত পৃথিবীর দিকে কবির বিহ্বল দৃষ্টি প্রসারিত, রবীন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ। মনে পড়লো কবির যৌবনের অমর কবিতা :

“মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।”

যৌবনের সেই হরন্তু আকাংখাই যেন কবিকে মৃত্যুর কঠিন বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন করে আবার সুন্দর পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছে। সেদিন অনুভব করেছিলাম—এ পৃথিবীর প্রতি কবির কী নিবিড় ভালবাসা—বঁচে থাকবার জন্য কি গভীর আকৃতি! এই পৃথিবীর দৃশ্যগন্ধগান, এই পৃথিবীর আকাশের আলো, তরুলতার শ্যামল মোহ—কবিকে চিরদিন বিহ্বল করে তুলেছে; মধুর মায়ার নীড়ে মুগ্ধকবি নব নব ছন্দে নতুন আশার স্পর্শে সংগীত রচনা করেছেন।

রোগশয্যায় দারুণ যন্ত্রণায়ও কবি বরাবর এই পৃথিবীকে স্মরণ করেছেন—সুন্দর দেবতার আলো-উদ্ভাসিত সভায় আবার নিজেকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি, রবীন্দ্রনাথ ইহকালের কবি, রবীন্দ্রনাথ বর্তমানের কবি। বিশ্বকবির অন্তরে চিরন্তন বাণী শুনেছি :

“শুধু অকারণ পুলকে

নদীজলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে ;

ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন

ঝলমল প্রাণ করিস ঘাপন

ছুঁয়ে থেকে ছলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে।

মর্শ্বর তানে ভরে ওঠে গানে শুধু অকারণ পুলকে।”

এই অকারণ পুলকে কবি পৃথিবীকে ভাল বেসেছিলেন। এই পৃথিবীর সংগে চির বিচ্ছেদের নির্মম লগ্ন স্মরণে কবির দুই চোখে অশ্রুবত্তা প্রবাহিত হয়েছে, কণ্ঠস্বরকে আচ্ছন্ন করেছে অশ্রুবাস্প, রোগশয্যায় শুয়ে জীবনের প্রান্তিকে কবি পৃথিবীর কাছে তাঁর মমবাণী নিবেদন করলেন :

“যাবার সময় হলো বিহংগের। এখলি কুলায়
রিক্ত হবে।

কতবার এই বসুন্ধরায়

আতিথ্য দিয়েছে, কতু আত্ম মুকুলের গন্ধে ভরা

পেয়েছি আহ্বান বাণী কান্তনের দাক্ষিণ্যে মধুর,

অশোকের মঞ্জরী সে ইন্দ্রিতে চেয়েছে মোর সুর,

দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি। কখনো বা ঝঞ্জাঘাতে

বৈশাখের, কণ্ঠমোর কষিমাছে উত্তপ্ত ধূলাতে,

পক্ষ মোর করেছে অক্ষম; সব নিয়ে ধন্য আমি

প্রাণের সম্মানে। এপারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি

ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নন্দ্র নমস্কারে

বন্দনা করিয়া যাব এজন্মের অধিদেবতারে।”

কবি এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা সব মিলিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন; পৃথিবীর আর কোনও কবির কণ্ঠ হতে এখন ব্যাকুল সুরে ধ্বনিত হতে শোনা যায়নি “সব নিয়ে ধন্য আমি প্রাণের সম্মানে।” এই প্রাণের সম্মানে কবি পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রের কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর তুচ্ছতার পূর্ণতায় সর্বত্র দেখি তাঁর সক্ষম হস্তক্ষেপ। স্বার্থান্ধ আত্মচেতনা তাঁকে বৈরাগ্যে দীক্ষিত করে মাহুঘের সুখ দুঃখের নীড় থেকে, সংসারের কোলাহল থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। এই সংসারের বাইরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনো মুক্তি চান নি।

তাই বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে দেখি তাঁর কর্মপ্রবাহ, ব্যাকুল কর্মনিষ্ঠা পৃথিবীর দিগ্দিগন্ত আন্দোলিত করে ফিরেছে। বাধক্যের দারুণ পংক্তিবন্ধে প্রাণের তেজে দীপ্ত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়নি। কর্মী রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্ত্যচল থেকে পৃথিবীকে চিন্তার স্কুলিংগে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন, রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি :

“অন্ত সিদ্ধকুলে এসে রবি

পূরব দিগন্ত পানে পাঠাইল অন্তিম পূরবী।”

রবীন্দ্রনাথের এই অন্তিম পূরবীতে ক্রান্তির এতটুকু ছায়া নেই; ভৈরবীর তেজে দীপ্ত, নিগূঢ় জীবনরসে উর্বর।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চির তরুণ। অতীতের সংস্কার, অতীতের অন্ধ মোহ কোনদিন তাঁর নবীন অন্তরাঙ্গাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কালের দ্রুত গতিপ্রবাহ থেকে রবীন্দ্রনাথ এক মুহূর্তের জন্তেও বিচ্যুত হননি; ‘পৃথিবীকে ভালবাসি’ এই স্বীকৃতি তাঁকে চিরদিন পৃথিবীর মর্মের মাঝখানে টেনে নিয়ে গিয়েছে, যে পৃথিবী নিত্য নতুন প্রাণ রসে উর্বর, যে পৃথিবী পুরাতন শতজীর্ণ পুষ্পকে বিদায় দিয়ে নতুন ফুল ফোটায়। এই চির নবীন রসলোকের সন্ধানই রবীন্দ্রনাথকে নটরাজের কল্পনায় সহায়তা করেছিল। কবি নটরাজকে বন্দনা করেছেন:

“পূর্ণচন্দ্রলিপি তব, হে পূর্ণ, পাঠাল নিমন্ত্রণে

বসন্তদোলের নৃত্যে, দক্ষিণ রাঘুর আলিঙ্গনে

মল্লিকার গন্ধোন্মাদে, কিংস্ককের দীপ্ত রক্তাঙ্গকে”

কবি নটরাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বসন্তের নিমন্ত্রণ।

সেই নিমন্ত্রণের বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হয়েছে। বেগুন বীথিকার মর্মে কল্পনে ইংগিতে ভংগিতে। বিশ্বের এই চরম আমন্ত্রণে কবি জানিয়েছিলেন অন্তরাঙ্গার স্বীকৃতি প্রবল রসাত্মকভাবে। কবি চিরকাল বেঁচে থাকতে চেয়েছেন এই আলো-হিলোলিত আকাশের নিচে, তৃণশ্যামল মৃত্তিকার মর্মের মাঝখানে। এই আকুলতা সমগ্র বিশ্বসংসারকে করেছে তাঁর কাছে পরম আত্মীয়; কবির ব্যগ্র কামনাকে চিরদিন ‘বসন্তের মাধবী মঞ্জরী’ নদীপারে শুভ্রশান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্না রাশি স্পর্শ করে ফিরেছে, বিশ্বজগৎ তাঁর মর্মদ্বারে শত সহস্র আহ্বানের করাঘাত করেছে:

“বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে

আমার ছুরারে শিথিল জগৎ শত কোটি কর হানিছে।”

প্রতি মুহূর্তে বিশ্বকবির ভালবাসা আশ্রয় খুঁজছে পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্ব মানবের অন্তরলীলায়। কী নিগূঢ় মোহেই না পৃথিবী তাঁকে চিরদিন বেঁধে রেখেছে; এই লীলাচঞ্চল সুন্দর সংসারের সংগে তার চিরন্তন আত্মীয়তা।

সুদীর্ঘ জীবন তিনি যে সুন্দরের সাধনা করেছেন তার কেন্দ্রে ছিল পৃথিবীর প্রতি নিবিড় মোহ। শান্তিনিকেতনের প্রতিটি ঋতু উৎসব, নৃত্য গীতানুষ্ঠানের মূল সুরটিতে এ সত্যটি নিবিড় করে অহুভব করেছে—রবীন্দ্রনাথের রস সাধনায়, সুন্দরের উপাসনায় এ সত্যটিই প্রকটিত। তাই আজ ভাবি, এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বমুহূর্তে পৃথিবীর স্পর্শকাতর কবির অন্তরাঙ্গায় কী করুণ ক্রন্দনই না জানি জেগে উঠেছিল। কী প্রবল বেগেই না জানি চোখের দৃষ্টি কাপসা করে অশ্রবন্যা নেমে এসেছিল। ‘সোনার তরী’তে কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের প্রশ্ন শুনেছি:

“আজি হ’তে শত বর্ষ পরে

এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে

কাঁপিবেনা আমার পরাণ? ঘরে ঘরে

পাতিবে সংসার খেলা, তাহাদের প্রেমে

কিছু কি রবনা আমি? * * * ছেড়ে দিবে তুমি

আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,

যুগ-যুগান্তের মহামৃত্তিকা বন্দন

সহসা কি ছিঁড়ে যাবে?

এ প্রশ্নের উত্তর আছে সর্বকালের সর্ব মানবের অন্তরে। কেবল মাত্র শতবর্ষ নয়, শত শতাব্দির ব্যবধানও কবিকে পৃথিবীর অনাঙ্গীয় করতে পারবে না। চিরদিন কবির আত্মা বেঁচে থাকবে পৃথিবীর শ্রামল মৃত্তিকার কোড়ে; তাঁর অন্তরাঙ্গার বাণী, আশা আকাংক্ষা, চির প্রেম সর্বকালের সর্ব দেশের মানুষকে করবে বিহ্বল, তাঁর মৃত্যুজয়ী কল্পনা ঋতুতে ঋতুতে পৃথিবীকে গড়ে তুলবে সুন্দর করে।

সেদিন শান্তিনিকেতনের ছায়াঙ্ককারে কবির চোখে পৃথিবীর প্রতি যে প্রেমের স্মৃতি দেখেছিলাম তার মধ্যে ছিল কবির চিরন্তন আকাংক্ষার বাণী:

“হে সংসার

আমারে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে

বর্জন করোনা মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষকের মতো।”

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের সমগ্র কবিতার মর্মস্থলে এই চরম প্রার্থনার সুরটি আত্মপ্রকাশ করছে।

শৈশবে সদয়

তারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৪) বৈষয়িক অবস্থা

৩রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী ও রামকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় একান্তভুক্ত ছিলেন। একান্তভুক্ত থাকা বাঙ্গালীর সরল প্রাণতার চিহ্ন। তাহাদের জমিদারীর আয় ছিল প্রায় হাজার টাকা। খাজনা টাকায় ও ধানে আদায় হইত। ধান খাজনার অধিকাংশই জামালপুর হইতে আদায় হইত। জামালপুরী মেথি আমনের সন্নিহিত স্বাদ এখনও ভুলিতে পারি নাই। খাজনার ধানে এই বিপুল পরিবারের বৎসরের খোরাক চলিত। বিলে মাছ, গোয়ালে ছধ, গোলায় ধান, বাঙ্গালীর আর ছুখ কৈ? চৌধুরী মহাশয়েরা ছুখে-ভাতে বেশ স্নেহে ছিলেন। অতিথি অভ্যাগত সাদরে স্থান পাইত; বার মাসে তের পার্কন হইত। “হা অন্ন, হা অন্ন” কখনও শুনি নাই।

হাওরি বা বিলা-জমির নির্দিষ্ট খাজনা পাওয়া বাইত না। সরিষা, তিসি ও ঘাস হইতে কোন বৎসর অধিক কোন বৎসর অল্প খাজনা মিলিত। বিলের মাছ ধরিবার বন্দোবস্ত দিয়া ও বিশেষ লাভ হইত। এইরূপে নিয়মিত ও অনিয়মিত অনেক প্রকার আয় ছিল।

বাড়ীর ঘরঘার প্রস্তুত করিতে মজুরি লাগিত না। দুর্গা পূজায় বাড়ী পরিষ্কার করিতেও কিছুমাত্র ব্যয় হইত না। রায়তগণ নিজ হইতে এই সমস্ত আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিয়া দিত। মনিবের বাড়ীর ঐ সকল কার্য তাহাদের নিজের কার্য মনে করিত। কিন্তু হায়, গবর্ণমেন্টের প্রজা ভূম্যধিকারী আইনে এই স্বথের সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজকাল বীরশ্রীর প্রজায় মিরশাদারে কেমন ভাব, জানি না।

দুর্গোৎসবে, মনসা পূজায় এবং দোলযাত্রায় হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাই মিরশাদারবাড়ীতে মাছ, ছধ, কলা ও নারিকেল, —যাহার যাহা সাধ্য দিত এবং মিরশাদারগণও তাহাদিগকে

তৈল মাখাইয়া দিতেন, আবীর দিতেন এবং সময় সময় খাওয়াইয়া দিতেন—কি সুন্দর স্মৃষ্টি বনিষ্টতা!

এইরূপ স্বচ্ছলতায় থাকিয়াও চৌধুরী মহাশয়ের ঋণ ছাড়ে নাই। ইহার দুইটা কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। একটি বাজে জিনিষের কারবারে লোকসান আর একটি নাম বাঁচাইবার জন্য নিম্নয়োজনীয় ব্যয়। আমি সেক্রেটারী মহাশয়কে অনধিকারী হইয়াও হিসাব করিয়া চলিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

ভদ্রলোকে নিজহাতে খামার করেন না। চৌধুরী বাড়িতে আমার সময় খামার ছিল না। গ্রাম্য লোকের ছেলেদের মত এই বাড়ীর ছেলেরা গোঠে মাঠে গরু চরাইতে বা বিলে নামিয়া মাছ ধরিতে যাইত না। চাকর যথেষ্ট ছিল, তাহারাই গরু বাছুর চরাইত। কখন কখন আমরা বৈকালে মাঠে গরু আনিতে যাইতাম এবং ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করিত, সে কেবল আমোদার্থে। বাটীতে সকলগুলি ঘরই ছনের ছিল। গ্রাম্যদেশে ছনের ঘরই প্রচলিত। খুব ধনী না হইলে কেহ দালান দেয় না। টানের ঘর কেহ পছন্দ করিত না; একে ব্যয় অধিক, তাতে আবার রেজায় গরম, অস্বাস্থ্যকর। বিলাতি পশমী কাপড়ের মত রৌদ্রের সময় গরম, শীতের সময় ঠাণ্ডা। বাহির বাড়ীতে নাট মন্দির বা চণ্ডীপূজামণ্ডপ। বাড়ীর মধ্যে পূর্বের ভিটায় প্রায় ত্রিশ হাত লম্বা দো রোখা দো চালা ঘর। পশ্চিমের ভিটায় ক্রমান্বয়ে এক সারিতে চারিখানা দো চালা ঘর। দক্ষিণের ভিটায় ভাঁড়ার ঘর এবং উত্তরের ভিটায় দেব-গৃহ। উঠান উত্তর দক্ষিণে খুব লম্বা। বায়ু চলাচলের বাধা নাই কিন্তু পশ্চিমের ভিটার ঘরগুলি খুব আঁধার এবং বায়ু চলাচলের অস্ববিধা হেতু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর।

বাড়ীখানা, নানা, পুষ্করিণী বাগ বাগিচা সহ ঘোল

বিঘার কম নয় এবং আম, কাঁটাল, লেবু, সুপারি, বাঁশ প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ সমৃদ্ধ। তরি-তরকারি বাটিতে যথেষ্ট ফলান হইত। আমি নিজে কপি, শালগম, মূলা প্রভৃতি প্রচুর ফলাই-তাম আর সদয় প্রভৃতি ছেলেরা জল ও সার বহিয়া দিত, মাটি কোপাইত, জঙ্গল নিড়ি দিত। এই কার্যে প্রত্যহ বিকালে মাষ্টার, ছাত্র ও সেক্রেটারী সকলেরই প্রফুল্লকর ব্যায়াম হইত। সদয়ের পিতার ফলবান বৃক্ষরোপণে বড়ই হাউস ছিল। তিনি ফুল ও ফলের গাছ রোপণ করিতেন এবং বলিতেন, ফলবান বৃক্ষই সুপুত্র। মাহুঘের ছেলে মাহুঘ নাও হইতে পারে কিন্তু

বৃক্ষপুত্র চিরদিনই সুপুত্র। সে কাহারও অহিত করে না অধিকন্তু ফল-ফুল-ছায়া প্রদান করিয়া শত্রু মিত্র সকলকে পরিতৃপ্ত করে। রোগকের স্নানাম হয়। তাঁহার রোপিত বৃক্ষের বঙ্কল উত্তোলন, শাখা ছেদন বা কোনও রূপে কিছু ক্ষতি করিলে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া যাইত। তাঁহার স্থাপিত কালা-চাঁদের বাড়ীর পঞ্চবটী এখনও বিদ্যমান আছে।

পুরোহিত, নাপিত, ধোপা বৃত্তাগণের নামে নিকর ভূমি ছিল। ইহারা বার্ষিক ক্রিয়া কৰ্ম সম্পন্ন করিয়া পয়সা লইত না। মোটের উপর চালচলন বড়-মাহুঘের মতই ছিল।

ক্রমশঃ

সোহাগ

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

আজ কেন গো আঁখি-ছুটি অভিমানে নত ?

আজ কেন গো আঁখি-ছুটি অভিমানে নত ?

আজ কেন গো দূরে থাকি, আব্দালে বরাদ্দ রাখা,—

উদাস গতি বিরস মুখ,

অবশ দেহ হীনোৎসুক,

সকোচেতে পঙ্কজিনী লজ্জাবতীর মত ?

মাথার বেণী এলোমেলো, যুগল-বাছ লুপ্ত,

রাঙ্গা গালে রাঙ্গা ঠোঁটে

হাস্য মধুর নাহি কোটে,

গায়ের আঁচল ভুতল-গড়া,

কানের কুসুম ধূলায় পড়া,

ভাঙ্গা মেঘের ছায়া যেন চন্দ্রে উপগত !

নয়নতলের কাজল-মোছা,—এ কি দারুণ ব্রত !

আজ কেন গো আঁখি-ছুটি অভিমানে নত ?

আজ কেন গো আঁখি-ছুটি অভিমানে নত ?

আজ কেন গো আঁখি-ছুটি অভিমানে নত ?

হয়েছে কি আমার ক্রটি,—

অভিমানের তাই ক্রটি ?

নাই কি ক্ষমা, মনোরমা, দোষ করেছি যত ?

তাকাও বারেক আঁখির গানে

সলাজ মধুর দৃষ্টিদানে,

ঠোট-ফুলোনো মিচকি হেসে ধন্য কর শত !

আশায় বড় এসেছি রে,

দোর হ'তে কি যাব ফিরে ?—

গৌরবিনী মানিনী যোর, মান করিবে কত ?

আজ কেন গো আঁখি-ছুটি অভিমানে নত ?

এসেছিলে সুরে

ত্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

রেল লাইন হইতে দেখা যায়—এ যে সৰু রাস্তাটি ধান ক্ষেতের আলের উপর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া দূর নারিকেল কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে, ঐ গ্রামটিই শ্রামলপুর।

নামটা শুনিয়া হইত গ্রামটিকেও বড় স্নন্দর ঠাওরাইয়াছেন? তা—হ্যাঁ, বছর পঞ্চাশ পূর্বে গ্রামখানি স্নন্দরই ছিল। ভট্টাচার্য্যদের টোলে তখন প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র পড়িত; প্রভাত হইবার পূর্বে হইতে তাহাদের স্তোত্রপাঠ আপনাকে ঋষিদের ঘুগে লইয়া যাইত, আর কি! তারপর ছিলেন স্বয়ং দিনদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়; যুবা পুরুষ,—স্বগৌর তনুখানি তাঁর দেখিবামাত্র আপনার ভ্রম হইত,—ছায়ন্তের রাজ্যেই আসিয়াছেন বা।

শকুন্তলা? হ্যাঁ, তিনিও ছিলেন, ঐ ভট্টাচার্য্যেরই পত্নী উদাসতী। কোন কন্দের আশ্রমে তরুণী তিনি জল সেচন করিতেন তাহা নাই বা শুনিলেন! তবে এই রাজ্যে তাঁহাকে সকলে দেখিয়াছে রানীর আসনে, আবার দেখিয়াছে মর্ত্যধূলিতে ভিখারিণী অপেক্ষাও ব্রান।

আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন, আমি একটা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা ফাঁকি দিয়া আপনাদের শুনাইতেছি—না, সেরূপ ছুরভিসন্ধি আমার নাই। আমি ঐ শ্রামলপুর গ্রামের দিনদেব ভট্টাচার্য্যের কথা বা তাঁহার প্রাণাধিকা পত্নী উদাসতী দেবীর কথা বলিতে বসি নাই। যাহা বলিতেছি, তাহা আপনি ইচ্ছা করিলে শুনিতে পারেন—তবে বলিয়া রাখি যে ইহা কোন ঐতিহাসিক কাহিনী নহে।

ঐ যে, ঐ পুকুরটা, দেখিতেছেন না, ঘন সারি নারিকেল গাছ, যার মাথায় চাঁদটা উঁকি দিতেছে, ঐ পুকুরটার নাম শ্রামলপুকুর—শ্রামলপুরের শ্রামলপুকুর। দিনদেব ভট্টাচার্য্যের পিতামহ ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য্যের হাতে গড়া ঐ পুকুর, আর ঐ পুকুরে দিনদেব ভট্টাচার্য্যের পিতা গণদেব ভট্টাচার্য্য স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন নারিকেল বৃক্ষ; বসাইয়াছিলেন টোল ঐ পুকুরের দক্ষিণদিকে। টোলের ছাত্রগণ অতি

প্রত্যাষে উঠিয়া তখন দেব-বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে গণদেবেরও বন্দনা গান করিত। গণদেব বেশিদিন পৃথিবীতে থাকিতে পাইলেন না, দিনদেব তখন মাত্র ষোল বৎসরের বালক। কিন্তু বালক হইলে কি হইবে, ভীষ্মদেবের পৌত্র, গণদেবের পুত্র দিনদেব—তিনি কি কোন কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইতে জানেন? তিনি ঐ বৃহৎ গ্রামের শাশনদণ্ড পিতার মৃত্যুর পরদিনই তুলিয়া লইলেন স্বহস্তে। কিন্তু থাক—রাজা-জমিদারের কথায় আমাদের কি-ই বা প্রয়োজন।

শ্রামলপুকুরের পূর্বদিকে যে ছোট গ্রামখানি, মাত্র কয়েকটা ঘর বসতি, উহার নাম রূপসীপুর। ঐ গ্রামের বধূগণ শ্রামলপুকুরে পানীয় জল আহরণে আসে, রূপসীপুরে আর ভাল পুকুর নাই বলিয়া। পাশাপাশি ছুটি গ্রামের ঐ পুকুরটি যেন যোজক। কিন্তু সে কথাও না-হয় থাক!

ঐ যে টোলের কথা বলিয়াছি, ঐ টোলেরই একটি ছাত্র তখন মাত্র কাব্য পাঠ আরম্ভ করিয়াছে; উদাত্ত শ্লোকগাথা তাহার স্মৃষ্টি কণ্ঠ হইতে অনর্গল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে প্রতি প্রভাতে। পুকুরের দক্ষিণদিকের ঘাটে যে বিশাল বহুল-বৃক্ষটা, উহার তলায় বসিয়া সে তাহার প্রভাতের পাঠ অভ্যাস করে।

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে কি আছে বলিতে পারেন? মনুষ্যকে যেন উহা কোন অননুভূত, অনাস্বাদিত, অবাস্তব রাজ্যে লইয়া যায়। ছাত্রটি কবি—কাব্য পাঠের সময় তাহার জানা থাকিত না যে পূর্ব দিকের ঘাটে একটি বালিকা শিবপূজা করিতে করিতে মন্ত্র ভুলিয়া যাইতেছে। শিবপূজার মন্ত্রও অবশ্য কাব্যময়, কিন্তু ছাত্রটির উচ্চারণের শক্তি তো আর বালিকার ছিল না—কাজেই যাহা হইবার—মেয়েটি রোজই পূজায় ভুল করিত। হয়ত ধ্যানের আগেই পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিত কিম্বা প্রণাম-মন্ত্রের সাথে সাথে ছাত্রটির আবৃত্তি করা কাব্যের বাণী বলিয়া ফেলিত। নিত্য এইরূপ ভুলে অতিষ্ঠ হইয়া একদিন মেয়েটি তাহার পিতার নিকট

নালিশ করিল যে কে একজন পুত্র ঘাটে উঠেচেষ্টা করে কাব্য পাঠ করায় তাহার পূজার ব্যাঘাত হইতেছে। পিতা কত্নাকে জানাইলেন যে তাহার পূজার ব্যাঘাত হইতে দেওয়া যেমন উচিত নয়, ঐ ছাত্রটির পড়ার ব্যাঘাত হইতে দেওয়াও তেমনি অতুচিত।

মেয়েটি আর কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু ঐ কাব্য-পাঠকে কে তাহা জানিবার জ্ঞান বিশেষ চেষ্টিত হইল— অথচ জানিবার কোনই উপায় বাহির করিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে মেয়েটি ঐ ছাত্রটির আশ্রয় কণ্ঠস্বরে কেমন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। প্রতি প্রভাতে শিব-পূজার বসিয়া সেই কণ্ঠস্বর না শুনিলে তাহার আর পূজাই হইত না। সে যেন তখন হইতে মনের অজ্ঞাতে শিব-পূজার মধ্যে সেই কণ্ঠস্বরকেই পূজা করিতেছিল। একদিন কোন কারণে ছাত্রটি অস্থিত হইলে মেয়েটিও তাড়াতাড়ি কোনরূপে পূজা সারিয়া বাড়ী চলিয়া যাইত। সাপুড়িয়ার বাঁশী যেমন সাপকে আকর্ষণ করিয়া স্থির করিয়া রাখে, ঠিক তেমনি ঐ ছাত্রটির কণ্ঠস্বর মেয়েটিকে ধরিয়া রাখিত পুত্রের ঘাটে। ঘাটের বাধান শানে বসিয়া সে স্তব্ধ হইয়া শুনিত ছাত্রটির স্তোত্র পাঠ। সে-সময় একটা কোকিল ডাকিলেও মেয়েটির বিরক্তি বোধ হইত। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে অন্ত লোক আসিত কিন্তু তাহার পূর্বেই ছাত্রটির পাঠ শেষ হইয়া যাইত এবং সে চলিয়া যাইত। এ ঘাটেও মেয়েটি তার পূজার সজ্জাগুলি গুছাইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিত।

এমনি করিয়া বেশ কাটিতেছিল, কিন্তু মেয়েটি বড় হইয়া উঠিল এবং তাহার পিতা তাহাকে পাত্রস্থা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ভয়ে এবং ভাবনায় মেয়েটির বুকের রক্ত শুকাইয়া উঠিল। তাহার আবাল্যের পরিচিত তপোবনভূমি, তাহার শিবপূজার তীর্থ শ্রামলপুত্র, তাহার মর্ত্যের স্বর্গ বকুল তরুণল এবং তাহার স্বর্গের ইন্দ্র ঐ পাঠরত ছাত্রটি, ইহাদের ছাড়িয়া সে যাইবে কোথায়! মেয়েটি গোপনে এত কাঁদিল যে কান্না আর গোপন রহিল না। তার মা তাহাকে একদিন ধরিয়া ফেলিলেন এবং সবিস্ময়ে জানিলেন যে মেয়েটির বিবাহে দারুণ অনিচ্ছা। কিন্তু তখন তো আর ভদ্র ব্রাহ্মণঘরে চিরজীবন কুমারী মেয়ে রাখা চলিত না,

তাই মেয়েটির সকল আপত্তি অগ্রাহ করিয়া পিতামাতা তাহার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন।

মেয়েটির বিবাহ ঠিক হইয়া গেল—কিন্তু কাহার সঙ্গে তাহা জানিবার জ্ঞান তাহার এতটুকু আগ্রহ দেখা গেল না। এই বিবাহ যে তাহাকে তাহার কুমারী-জীবনের আনন্দ হইতে বহু দূরে লইয়া যাইবে, ইহাই যেন সে প্রাণ মন দিয়া অনুভব করিতে লাগিল, তাহার বারম্বার মনে হইতে লাগিল, এই বিবাহের অর্থ তাহার পূজারিণী-জীবনের মৃত্যু।

কিন্তু এমন করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে তাহার পূজারিণী-মন রাজি হইল না। সে-মন তাহাকে শাসাইয়া বলিল,—তুমি এতদিন ঐহার কণ্ঠস্বরের পূজা করিয়াছ— তাঁহাকে একবার চোখের দেখা দেখিয়া কি তোমার কুমারী-জীবনের শেষ প্রণতিটিও জানাইয়া যাইবে না! যদি তাঁহার সম্মুখে যাইতে তোমার একান্ত বাধা থাকে তবে অন্তত প্রত্যাং যে-স্থানে তিনি উপবেশন করেন, সেই স্থানের মৃত্তিকায় একবার তোমার মস্তক স্পৃষ্ট কর—তোমার ভাবী জীবনের পথে তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষিত হইবে।

দুর্লভতা আছে বলিয়াই তো আজো মানুষ ঠিক মানুষই আছে! মেয়েটি এতদিন ঐহার কণ্ঠস্বরকে পূজা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার কুমারী-জীবনের শেষ দিনে একবার তাহার সেই দেবতার আসনটিকে প্রদক্ষিণ করিবার সাধ হইল। ছাত্রটি পাঠ শেষ করিয়া এতক্ষণ চলিয়া গিয়াছে; নারিকেল বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায় মেয়েটি আসিয়া দাঁড়াইল দক্ষিণদিকের ঘাটে—সেই বকুল বৃক্ষের তলায়। সূর্যালোকে কি একটা চক্চক্ করিতেছে। মেয়েটি অবনত হইয়া তুলিয়া দেখিল, একটি সুবর্ণাসুরী; ইহা নিশ্চয়ই ছাত্রটির; তিনি হয়ত মনের ভুলে ইহা ফেলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কেমন করিয়া সে যথার্থ অধিকারীকে ইহা প্রত্যর্পণ করিতে পারে! অকস্মাৎ মেয়েটির সমস্ত অন্তর কি এক অনির্জনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহার মনে হইল—ঐ কণ্ঠস্বরের স্বত্বস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি যেন বিধাতার দেওয়া আশীর্বাদ।

আর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সে বকুলতরুমূলে একটি প্রণাম করিয়া আংটিটি লইয়া গৃহে ফিরিল। গৃহে ফিরিয়াও তাহার হৃৎকণ্ডার মনে হইল যে পিতাকে দিয়া আংটিটি ফেরৎ

পাঠাইলেই ভাল হয়। কিন্তু এ কণ্ঠস্বরের অধিকারীর এই ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু সে কিছুতেই ছাড়িতে পারিল না।

সন্ধ্যালগ্নে বিবাহ—রাজোচিত বাদ্যাদিসহ বর আসিলেন, বিবাহ হইয়া গেল। অভ্যাসবশে বাসরঘরেও মেয়েটির ঘুম ভাঙিয়া গেল ভোরের দিকে। উৎকর্ণ হইয়া রহিল সে, যদি আজো, তাহার বিদায়ের শেষ ক্ষণেও আর একবার শুনিতে পায় সেই কণ্ঠস্বর—আশ্চর্য্য মানুষ্যের মনের দুর্বলতা।

প্রভাতে তাহাকে স্বামীগৃহে যাইতে হইল চিরাচরিত প্রথা মত। চতুর্দিকে বন্দিনী হইয়া মেয়েটি আসিল তাহার স্বামীগৃহে। বিশাল সে অট্টালিকা—নারিকেল বৃক্ষগুলিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহার চতুর্পার্শ্বের প্রাচীর,—মেয়েটি হইল তাহার মধ্যে চির বন্দিনী; বংশের প্রথমত বাহিরের সমস্ত জনকল্লোল তাহার নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু প্রতি প্রভাতে—না, প্রতি রাত্রিশেষে মেয়েটির ঘুম ভাঙিয়া যায়—আর স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়—হয়ত তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্র করিয়া শুনিতে চায় সেই কণ্ঠস্বর, যে স্বর তাহার কুমারী-জীবনের একমাত্র উপাস্য ছিল।

মেয়েটির স্বামীও উঠেন অতি প্রত্যুষে, কিন্তু তাহারও পূর্বে স্ত্রীকে শয্যাভ্যাগ করিতে দেখিয়া সুখীই হন—অথচ বুঝিতে পারেন না, কেন তাঁহার স্ত্রী প্রত্যহ জানালার নিকট দাঁড়াইয়া থাকে। অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যানের প্রাতঃ সৌন্দর্য্য দেখিতেও তো মানুষ্যের আকাজক্ষা জাগিতে পারে। জিজ্ঞাসা করিবার কিই বা প্রয়োজন! পতিপ্রাণা সাক্ষী স্ত্রী, তাহার ব্যবহারে স্বামী এতটুকু ত্রুটি খুঁজিয়া পান না কোনদিন।

মেয়েটি কিন্তু দূরে বহুদূরে যেন সেই কণ্ঠস্বর এখনো শুনিতে পায়। নিস্তরু পল্লীর অপর প্রান্ত হইতে যেন সেই কণ্ঠস্বর কোন কোন দিন তাহার কর্ণে ভাসিয়া আসে।

স্বামী উঠিয়াই বাহিরে চলিয়া যাইতেন। তারপর নানাবিধ গৃহকর্মে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। সমস্ত দিন মেয়েটি আর স্বামীর দেখা পাইত না। রাত্রে স্বামী শয্যা প্রবেশ করিলে মেয়েটি যথাবিধানে তাঁহার সেবা করিত এবং গভীর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িত। কতদিন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিত যেন বাল্যের শোনা সেই কণ্ঠস্বরই শুনিতেছে; অমনি তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাইত। ঝড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিত সে শয্যার

উপর। ভয় পাইয়াছে ভাবিয়া স্বামী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, ভয় কি—ঘুমাও! মেয়েটি আবার ঘুমাইয়া পড়িত।

দিন তাহাদের ভালই কাটিতেছিল। মেয়েটির পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে কোথাও কোন শ্রানি ছিল না। স্বামীর আহ্বানে তাহার কেমন একটা মোহ আসিয়া যাইত। তাঁহার কর্ণেও মেয়েটি সেই বাল্যের স্মৃত মোহনীয় সুরলহরীর আভাস পাইত কখনো কখনো। ভাবিত, ইহাই তাহার স্বামীকে গভীরভাবে ভালবাসার লক্ষণ—হয়ত সেই প্রিয় কণ্ঠস্বরটিকে প্রিয়তম স্বামীর কর্ণে শুনিবার জন্য তাহার ব্যাকুল আকাজক্ষার অল্পরঞ্জন ইহা।

বিরাট চক্ৰমিলান বাড়ী। বহির্বাটিতে স্বামী তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া যান, অন্তরে মেয়েটি অস্বাভাবিক—কীজল হৃদয়তলে অঞ্চল বিছাইয়া রামায়ণ পাঠ করে কিম্বা বহুমূল্য পালকে শুইয়া গভীর স্তম্ভিতে মগ্ন থাকে।

স্বামী সম্মুখে আসিলে আনন্দে তাহার সারা অন্তর ভরিয়া যায়—কিন্তু এ আনন্দ দিবাভাগে তাহার ভাগ্যে কদাচিত ঘটে। স্বামীর নাকি বিস্তর কাজ—সময় তাঁহার এক মুহূর্তও নাই, তাই রাত্রিতেও ক্লান্তিবশতঃ তিনি শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়েন। মাঝে মাঝে মেয়েটির মনে হয়, স্বামীকে আর একটু বেশি কাছে পাইলে যেন তাহার জীবনের কোন এক অদৃশ্য বেদনার কাঁটাটিও উঠিয়া যায়। কিন্তু কি সে কাঁটা তাহা সে ভাবিয়া পায় না। কতদিন সে ভাবিয়াছে, সে তাহার বিবাহিত জীবনেও তাহার বাল্যকালের শোনা কণ্ঠস্বরটিকে মনে করিয়া রাখায় কি সে স্বামীর নিকট অপরাধিনী হইতেছে? কিন্তু মন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিয়াছে, সঙ্গীতে আকৃষ্ট হওয়া মানব-প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তি। ইহাতে অপরাধ কেন হইবে! গায়ককে তো সে চেনে না।

সেদিন ছিল কি একটা পর্কদিন। বংশের প্রথাযুগ্মী পুণ্যাহ করিতে হয়। মেয়েটির স্বামী সেদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বাহিরে গিয়াছেন, মেয়েটি তখনো ঘুমাইতেছে। স্বপ্নে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল তাহার বাল্যের শোনা সেই কণ্ঠস্বর! মেয়েটি উঠিয়া বসিল—না—স্বপ্ন তো নয়! এ যে একান্তই নিকটে! কোথায়—কোথায় তবে সেই কণ্ঠের অধিকারী! মেয়েটি অধৈর্য্য হইয়া উঠিল, চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনো ঠিক ভোর হয় নাই, অথচ স্বামী এত আগেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

স্বামী কাছে থাকিলে হয়ত সে আজ জিজ্ঞাসা করিতে পারিত, ঐ কণ্ঠস্বরের অধিকারী কে! কোথায় সে থাকে?

মেয়েটি শুনিতে পাইল—রহিয়া রহিয়া সেই শুভগীতি ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; আকাশ-বাতাস পরিপ্লাবিত করিয়া বারিতেছে যেন কি এক স্বর্গীয় সুরমা।

বহু, বহু দিন পরে সেই চিরপ্রিয় কণ্ঠস্বর মেয়েটির সারা অন্তরকে মুর্ছিত করিয়া দিল কি এক ইন্দ্রিয়াভীত অমুভূতিতে। তন্ময় হইয়া সে জানালার নিকট গিয়া শুনিতে লাগিল সেই গীতধ্বনি। নিকটে, দূরে, বহু দূরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে সে স্বর লীন হইয়া গেল আকাশে,—মহাকাশে। কিন্তু স্নেহেট তখনো চক্ষু খোলে নাই; তাহার বাল্যের স্মৃতি তাহার ক্ষুদ্র অন্তর আলোড়িত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—সেখানে গ্রামলপকুর, বকুল তরুল আর সেই কণ্ঠস্বর ছাড়া কিছু নাই, কেহ নাই।

অকস্মাৎ তাহার সমস্ত স্বপ্নকে সচকিত করিয়া প্রবেশ করিলেন স্বামী। বিশ্বয়ভরা কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শুভদিনে তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিতেছে কেন—কি হইয়াছে?

আত্মসংবরণ করিয়া মেয়েটি তাড়াতাড়ি সংবৃত হইয়া বসিল এবং সংক্ষেপে কহিল যে তাহার কুমারী-জীবনে শ্রুত একজন ছাত্রের কণ্ঠস্বর সে আজ বহুদিন পরে শুনিয়াছে—তাই বাল্যস্মৃতি মনে উদ্ভিত হওয়ায় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তবে কি তাঁহার পত্নী তাহার বাল্যজীবনে শ্রুত একটি কণ্ঠস্বর শুনিবার জহই প্রত্যহ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকে! আজ বিশেষ কার্যাবশতঃ তিনি গুরুগৃহে যাইতে পারেন নাই কিন্তু অত্র দিন তো প্রত্যুষে উঠিয়াই তিনি চলিয়া যান—আর তাঁহার স্ত্রী জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে কোন্ এক পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিবার অপেক্ষায়! হয়ত এমনি করিয়া অশ্রুর বন্যাও বহিয়া যায়! স্বামীর বৈষয়িক অন্তর বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সমস্তদিন তাঁহার মনের মধ্যে এই কথাটাই জ্বলিতে লাগিল যে তাঁহার পত্নী প্রতি উষায় একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করে।

স্ত্রীর উপর অবিশ্বাস পোষণ করার মত হৃৎখদায়ক আঁর কিছু নাই। স্বামী সেই ভীষণ দুঃখের মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রাত্রি আসিল, শয্যা শুইয়া তিনি পূর্বের মত স্ত্রীকে আদর করিতে পারিলেন না; তাঁহার সমস্ত কোমল অমুভূতিকে ডুবাইয়া জাগিয়া রহিল কি এক বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা। কিন্তু পত্নীকে খুলিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেও বাধিতেছিল। বাল্যের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুত্যাগ কিছুমাত্র বিচিত্র নহে এবং প্রত্যুষে বাতায়ণ-সন্নিবর্তে আসিয়া সৌন্দর্য উপভোগ মানুষ্যের একান্তই প্রাকৃতিকগত! ইহার মধ্যে দুষণীয় কি থাকিতে পারে! জিজ্ঞাসা করিবারই বা কি আছে!

কিন্তু কিছুতেই মন শান্ত হইল না। দিনের পর দিন সন্দেহ বাড়িয়াই চলিল আর সেই সঙ্গে বাড়িয়া চলিল মেয়েটির প্রতি উপেক্ষা, অবহেলা। স্বামীর অন্তরে যে সন্দেহের বিষ ঢুকিয়াছে, মেয়েটি তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না—কোথায় তাহার ক্রটি হইতেছে ভাবিয়া দিনে দিনে সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

স্বামী বাহির বাটীতেই রাত্রিবাস আরম্ভ করিলেন। কদাচিত তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখা যায়, তাহাও দিব্যভাগে। পত্নী শয্যা রচনা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকে—স্বামী বাহিরের ঘরে শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন।

ধীরে ধীরে মেয়েটির জীবন-কুসুম শুকাইতে লাগিল। এতখানি অবহেলা প্রথম হইতে পাইলে হয়ত সে সহিতে পারিত কিন্তু পূর্ণ স্বামীপ্রেম লাভের পর এই অপমানকর উপেক্ষা তাহার আত্মমর্যাদা সম্পন্ন অন্তর সহিল না—অল্পদিনেই সে শয্যা লইল। স্বামী শুনিলেন, রোগ কঠিন, কিন্তু তিনি স্ত্রীর মৃত্যুই কামনা করিতেছেন। বিশেষ কোন খবর লইলেন না। দাসদাসীরাই দেখাশুনা করিতে লাগিল।

একরাত্রি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে, বধু স্বামীর সহিত শেষ দেখা করিতে চায়।

যে কারণেই হউক, আজ আর স্বামী উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, পত্নীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, যে-প্রফুল্ল কমল তিনি দরিদ্রের গৃহ হইতে আহরণ করিয়া ছিলেন তাহা কঙ্কালবশেষে পরিণত হইয়াছে। তথাপি তাঁহার মনে এতটুকু স্নেহ জাগিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,

ঐ জীর্ণ কঙ্কালের মধ্যে একটি ক্ষুধিত আত্মা কাহার কণ্ঠধ্বনি শুনিবার জন্য এখনো উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

মেয়েটির তখন আর ভাল করিয়া কথা ফুটিতেছে না।

সে অতি কষ্টে জানাইল যে বহুদিন পূর্বে কুড়াইয়া পাওয়া

একটি আংটি তাহার বাস্নে রহিয়াছে। তাহার ধারণা, ঐ আংটিটি তাহার বাল্যজীবনে শ্রুত এক স্বর্গীয় কণ্ঠধ্বনের অধিকারীর। কিন্তু তিনি কে বা কোথায় আছেন তাহা সে জানে না। ঐ আংটিটি এই পরিবারের অনন্দের সঙ্গে না রাখাই উচিত, উহা যেন কোন ভিত্তিয়ারে দান করা হয়।

স্বামী নিশ্চুপ হইয়া শুনিলেন স্ত্রীর কথা কয়টি। মুহূর্ত্ত বিলম্ব তাঁহার সহিতেছিল না। সমস্ত অন্তর বিম্বিত করিয়া জাগিতেছিল একটি প্রশ্ন, কে সেই আংটির অধিকারী যে তাঁহার সারা জীবন এমন করিয়া বিষময় করিয়া দিয়াছে! কে সে? জানিতেই হইবে!

স্ত্রীর শিথানের নিম্ন হইতে চাবি লইয়া তিনি খুলিয়া ফেলিলেন অনন্দের সেই লৌহ সিন্দুক। কাঠের একটি ক্ষুদ্র কোটার মধ্যে বাহির হইল একটি সোনার আংটি—স্বামী চমকিয়া উঠিলেন।

আংটিটা তাঁহারই!

ছন্দ

আদি কবি বাঙ্গালীক একদিন এক ক্রোধের শোকে বিগলিত হইয়া ছন্দের অমৃত-ধারায় মর্ত্যবাসীকে স্নান করাইয়াছিলেন; তদবধি মানবমন ছন্দের জন্ত যেন পিপাসিত হইয়া ফিরিতেছে। ছন্দ সর্বত্র। যেখানে ছন্দ নাই সেখানেই বিশৃঙ্খলা। ছন্দহীন হইয়া বাঙ্গালা পলকটো চলিতে পারে না। তাহারও চক্রবর্ণনের তালে তালে ছন্দ-বন্ধন। মানুষের জীবনে কেন, এই স্বাবর-জন্ম-বিশ্বচরাচরের সর্বত্র ছন্দ।

ছন্দকে ছাড়িলে আনন্দকেও ছাড়িতে হয়। বিশৃঙ্খলতার মধ্যে যে আনন্দ তাহারও যেন ছন্দ থাকে। যেমন ধরুন, একজন মাতাল প্রাসের পর প্রাস মদ্য পান করিয়া যাইতেছে—তাঁহাতে ছন্দ এবং বিরতি তো আছেই, মাতাল হইয়া চলিয়া গড়িয়াও সে ধীরে ধীরে চোখ বুজিল এবং ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল—এখানেও মত্ত প্রকৃতি তাহার ছন্দকে হারায় নাই। এইরূপে ছন্দ সর্বত্র তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু এই ছন্দের বন্ধন মানুষ যেন শুনিয়াও শোনে না। ইহা শুনাইবার জন্য দরকার হয় ঋষি কবি বাঙ্গালীর। যতক্ষণ তিনি তাঁহার ছন্দটিকে ঠিক ছন্দ বলিয়া না চিনাইয়া দিয়াছিলেন, ততক্ষণ কেহই তাহা স্বীকার করে নাই। কিন্তু তৎপূর্বেও ছন্দ ছিল, তাহার বিস্তার প্রমাণ রহিয়াছে। শোক হইতে শ্লোকের উৎপত্তি। হৃৎ হইতে আনন্দের উদ্ভব। একটি করুণ গাথা শুনিয়া মনটি ব্যথিত হইয়া উঠিল, অর্থাৎ রসাবিষ্ট হইয়া গেল। ব্যথিতে হইবে—উহা মনের আনন্দ-উপভোগের প্রকারভেদ মাত্র। আমরা যেমন তিস্ত বা কটুরস ভোজন করিয়া রসনাকে মধ্যে মধ্যে তৃপ্ত করি, মনও তেমনি দুঃখিত বা ভীত হইয়া তৃপ্ত হইতে চাহে। মন আনন্দেরই উপাসক, সে সর্বত্র পাইতে চায় আনন্দ—হৃৎ এবং স্মৃতি।

কিন্তু যে হৃৎ-আমাদিগকে অবশ্যজ্ঞাবী বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, যাহা প্রতিরোধ করিবার মতো শক্তি আমাদের নাই, মন সে-হৃৎকে বরণ করিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করে—যেমন কথ শিশুর ঔষধ খাওয়ার মত—তথাপি মন ঐ গভীর

এবং অবশ্য গ্রাহ্য হৃৎ হইতেও আনন্দের আশ্বাস লাভ করিবার জন্য সচেতন হয়—কারণ, আনন্দ ব্যতীত মনের আর কোন ধাড়া নাই।

হৃৎকে মানুষ স্বীকার করিতে পারে, কারণ মনের এই আশ্চর্য গ্রহণশক্তি আছে বলিয়া। মন তাহার খাদ্য হিসাবে গভীর হৃৎব্যথাতে ছন্দে রূপান্তরিত করিয়া লয়—পাক করিয়া লইয়া উপাদেয় ভোজ্যে পরিণত করে। এইজন্তই হৃৎের অভিব্যক্তিতে ছন্দের বন্ধন যেমন অপক্লপ হয় এমন আর কোথাও হয় না। এখানে মন যেন ছন্দ-বন্ধনে বেশি শক্তি নিয়োজিত করে।

তবুও আমরা ছন্দকে হারাইয়া ফেলি। হারাইয়া ফেলিতে বাধ্য হই, কারণ ছন্দের মধ্যে একটা আশ্চর্য রহস্য আছে যাহা সেই আদি কবির যুগ হইতে এখনো ধরা গেল না। ইহা যেন কোন মাধুর্যময়ী নারীর চরিত্র—যাহাকে ব্রূষিবার সমস্ত উপায়ই রহিয়াছে অথচ বোঝা একান্তই অসাধ্য। এ যেন নিত্য নব নব রূপে নবীন হইয়া দেখা দেয়।

কবিতার ছন্দকে ব্যাকরণের গুণ্ডিতে বাঁধা হইল। এত আঁটসাঁট বাঁধন সে ক্রমাগত কাটিয়া চলিতেছে। গদ্যের ছন্দেরও ব্যাকরণ সৃষ্টি হইল—টিকিতেছে না। ছন্দ যেন নিজকে ভাঙিয়া গড়িয়া খেলা করিয়া ফিরিতেছে সেই অনাদি কাল হইতে। অথচ মূলতঃ সে সেই রহস্যময়ী নারী যাহাকে ব্রূষিবার সর উপাদান-হাতের কাছে।

অতএব কোথায় সে মূলতঃ এক—নিজ স্বরূপে স্থিত হইয়া আছে—তাহাই জানিতে হইবে। এবং তাহা জানিলেই এই রহস্যময়ীর অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু তাহা জানিবার কোন উপায়ই সে রাখে নাই। সে যেন অতীতের স্মৃতিকাগরের সর জঞ্জাল ফেলিয়া দিয়া একদিন 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' ফুটিয়া উঠিয়াছে—পিতা বা মাতার কোন সংবাদই রাখিবার তাহার প্রয়োজন হয় না। সে কাহারও প্রিয়া নহে অথচ সে সকলেরই প্রিয়।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া ছন্দের যে অপরূপ দ্যোতনা দিবস রজনী বিকশিত হইতেছে—তাঁহাতে বিশ্বশিল্পীর প্রকাশই দীপ্যমান। তাই ঋষি বলিয়াছেন, ছন্দই আনন্দ এবং আনন্দই ব্রহ্ম—সং, চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ!

বারাণসী

ত্রিনিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী

বারাণসী অথবা কাশীধাম। ইহার অপর এক নাম “আনন্দ কানন”। বাস্তবিক পক্ষে বারাণসীতে গেলে পুঁথি-গত কথা নহে—মানব চক্ষে অহরহ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, আনন্দের ভাবে প্রস্ফুটিত এক কানন। এখানকার প্রস্থগুণলি কখন অযথা বিলাসেই শুকায় না। শীত, বসন্ত, নিদাঘ, শরৎ, হেমন্ত, একই ভাবে মধুগন্ধ বহিয়া মানবের মনে ধর্ম-ভাবের সঞ্চার করিতেছে। এই মহানগরী বহু পুরাতন। চিরদিন এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়া অন্নপূর্ণার দানে ভরপুর। তাঁর কাশীপুরাধীশ্বরী রূপে বিরাজিতা থাকার প্রবাদি কথিত :—শঙ্করের সহিত শঙ্করীর প্রণয়-বিবাদ ঘটিলে, দেবী রোষভরে পিত্রালয়ে বাইতে উদ্ভাত হইলেন, কি করেন, তখন divorce (ডাইভোর্স) প্রথা ছিল না, সুতরাং তাঁহার সখী জয়া পরামর্শ দিলেন, “ওগো মহামায়ে। পিত্রালয়ে কেন যাবে? তুমি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী; তোমার কিসের অভাব? তুমি মা অন্নপূর্ণা, সমুদয় সংসারের জীবন স্বরূপ। তোমার কিসের দৈত্য, কিসের ভয়। তুমি সকল ব্রহ্মাণ্ডের অন্ন আকর্ষণ কর।” এমন পরামর্শ দিতেই অন্নপূর্ণা তথাস্ত বলিলেন। যখন নিজ পছন্দ অবলম্বন করিলেন, তখন সংসারে হাহাকার পড়িয়া গেল। উপায় কি? সকল দেবগণ মিটিং করিয়া শঙ্করকে গিয়া ধরিলেন। তিনিও ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির। গাঁজা, ভাজ, সিদ্ধি খাইয়া পেট ভরে না। এই বার ভিক্ষাং দেহি বলিয়া অন্নপূর্ণার নিকট গেলেন। হাজার হউক রমণীর প্রাণ, বুদ্ধ পতির মুখ দেখিয়া তাঁর মনের রোষ রহিল না। তখন অন্নপূর্ণা স্বরূপে হিত হইয়া কনক দীর্ঘা (হাতা) ও স্বর্ণ পায়ে অন্ন লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর মতো সংসারের ক্ষুধা নিবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। ওদিকে হরপার্বতীর মিলন দেখিয়া বিস্ময় তাড়াভাড়া সোনার কাশী নির্মাণ করিয়া দিলেন। এখানে জীব অমৃতাবে মরে না। অন্নপূর্ণা দেবী হইতেই দশমহা-

বিদ্যার উদ্ভব হইল। আমরা এখন পৌরাণিক আলোচনা বন্ধ করিয়া আর যাহা জানি নিবেদন করি।

পবিত্র কাশী ধাম চির প্রসিদ্ধ। যজ্ঞদর্শন, বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি, শ্রুতি, পুরাণ, শিক্ষার নিমিত্ত কাশীধাম চির বিখ্যাত।

এই মহাতীর্থ ভারতে হিন্দু সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া গণ্য। বেহেতু এই পুণ্যভূমি জন্ম, মরণ ও ইহ পরকালের নিদান স্বরূপ ধর্ম অর্থ মোক্ষ ও কাম, এই চতুর্ভুজ ফললাভের জন্ত শিক্ষা, দীক্ষা, আরাধনা, ও তপস্যা করিবার স্থান।

সুতরাং ধন্য এই কাশী। কাশীতে তেত্রিশ কোটি দেবতার মন্দির বা আবাস ভূমি। এত অধিক দেবালয় মন্দিরপূর্ণ ধর্মের চিত্রশালা বোধ হয় ভূভারতে আর নাই। পথে ঘাটে বাহির হইলে, সন্ত, রজ, তম এই সাধনার রূপ নয়ন মন আকর্ষণ করিয়া তুলে। পুরুষ প্রকৃতির লীলাময় সংসার আপনাআপনি ফুটিয়া উঠিতেছে। যেমন নানা দেব দেবীর মন্দির, তদনুরূপ পূজা, আরাধনা, জ্ঞান অর্জনের তীর্থ ভিন্ন উপাসক ও গুরু আছেন—শাক্ত, বৈষ্ণব, কোল ইত্যাদি। ইহার উপর সাধু, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, অবধূত, নানাপন্থী, নানা ধর্মের গুরু, শিষ্য, মঠ, আখড়াও আছে। ইহা ব্যতীত সর্বদা বাহির হইতে দেশ বিদেশ ও পর্বত গুহাবাসী সাধু তপস্বী স্ত্রী পুরুষের নিত্য আগমন হইয়া থাকে। এইত গেল ধর্মের দিক। ধর্মেরও দিকে প্রসারিত রহিয়াছে রাণী ভবানীর কীর্তি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতীত পূর্ববঙ্গের জমীদারগণের অন্নসদ ও দেবালয় আছে। যথা—পুটিয়াসত্র, কুচবেহারসত্র ইত্যাদি। অনেক দেব-মন্দির-ঘাট বাদালী-কীর্তির সাক্ষ্য দেয়। কাশীতে বিস্তর বাদালীর বাস। কেহ বা মরিতে কেহ বা বাঁচিতে আসিয়াছেন। তারপর এত অবসরপ্রাপ্ত পেনসনভোগী

ব্যক্তির এবং বঙ্গ বিধবার সমাবেশ, অল্প কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

তরুণী, যুবতী, প্রোঢ়া, বৃদ্ধা, সকল প্রকারের বাঙ্গালী বিধবা

ছাড়া মহারাষ্ট্র ও ড্রাবিড় রমণী বানপ্রস্থ লইয়া জীবন

কাটাইতেছেন। এখানের এক প্রধান সুবিধা স্ত্রী-বাঙ্গালী স্কুল আছে।

স্বাধীনতা। অপরাধের কোন শাসন নাই। অল্প পরিমাণে প্রশংসনীয়।

ও ব্যয়ে সকলের জীবিকা নির্বাহ অতি সুচারু ভাবে হয়।

আনন্দের ও উৎসবের অন্ত নাই। কাশী যেমন তীর্থক্ষেত্র

তেনমই বাণিজ্য প্রধান স্থান। এখানে দেওয়ানী,

ফৌজদারী আদালত, দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। কতক-

গুলি ধর্মশালা আছে বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। স্কুল,

কলেজ ও পুস্তক-কুইনস্ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্ত্রী

শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীরই প্রভাবে গঠিত। আমি এখানে

মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথাই বলিব। স্বর্গীয় কেশব

সান্যাল মহাশয় স্ত্রী শিক্ষার প্রচারের পক্ষপাতী

হইয়া দুইটি-বালিকা বিদ্যালয় নিজ বাসভবনে স্থাপিত

করিয়া কাশীধামে বালিকাগণের লেখা-পড়ার প্রচলন

করেন। উক্ত মহোদয় ব্যক্তি তখন নিজেও ছাত্রাবস্থায়

ছিলেন; উদ্যোগী হইয়া উক্ত কার্যে তিনি ত্রুটি করেন।

পরে তাঁহাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হয়। তাঁহার

অনুপস্থিতিতে বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। অবশেষে

রক্তকালের পরে-খিয়সফিটগণের নেত্রী মিসেস বেঙ্গাল্টের

যত্নে আবার এখানে স্ত্রী শিক্ষার বীজ বপন হয়। তদীয়

সহকারিনী মিস্ আরেওল এবং মিস্ পামার

এই দুইজন ইংরাজ মহিলা শিক্ষয়িত্রীর অক্লান্ত যত্ন, পরিশ্রম

ও অধ্যবসায়গুণে, -বারানসীতে স্ত্রীশিক্ষা উচ্চস্থান-অধিকার

করিয়াছে; এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সত্য

কথা বলিতে বাধ্য; বঙ্গভাষার দ্বারা শিক্ষার কোনই প্রচেষ্টা

দেখা যায় নাই।

অবশেষে প্রায় দশ বার বৎসর পরে একটি স্থানীয়

ভদ্রলোকের দ্বারা বিবেকানন্দ-বাণী ভবন নামে বালিকা-স্কুল

স্থাপিত হয়। কিছু দিন পরে দুর্গাচরণ রক্ষিত নামক

জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্র কিছু টাকা—প্রায় এগার হাজার টাকা,

প্রদান করেন। বিবেকানন্দ বাণী ভবন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নন্দী

ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী শোভানা নন্দীর উদ্যোগে ও যত্নে

প্রতিষ্ঠিত হয়।

উক্ত টাকা স্কুল ভবন নির্মাণ জন্ত ব্যয় হয়। এক্ষণে

সেই স্কুল “দুর্গাচরণ বালিকা বিদ্যালয়” নামে খ্যাত।

ইহা ছাড়া দু’একটি পাঠশালা ও ছোট মেয়েদের

বাঙ্গালী স্কুল আছে। অত্রস্থ বিধবা রমণীগণের কীৰ্ত্তি

প্রশংসনীয়। তাহারা প্রাজুয়েট বা বিদুষিণী না হইয়াও

দ্বারে দ্বারে শিক্ষা করিয়া বিধবা আশ্রম ও নারী কল্যাণ

বিদ্যালয়, সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সাফল্য

লাভ করিয়াছেন। বঙ্গ বিধবার আশ্রম কয়েকটি এবং

কাশী ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল প্রায় ১৬১৭ বৎসর হইতে

চলিতেছিল। এখন নির্বানোমুখ হইতে নব জাগরণ বাঙ্গালী

মেয়েদের কীৰ্ত্তি। কাশীর বিস্তর কথা বলিবার থাকিলেও

আমার পক্ষে এখন সম্ভব নহে। তবে এখানকার সৌন্দর্য্য

ও পুণ্যের আকর্ষণী শক্তি নিত্য শত সহস্র নর-নারীকে

আকর্ষণ করে।

এই যে বিমল প্রবাহিনী সুরধুনী পতিতপাবণী বিমলা

গঙ্গা, উত্তর বাহিনী হইয়া সবেগে উভয় তট ধৌত করিয়া

আপন মনে দুঃখী ভাগী পাপীর সকল মলিনতা ধৌত করিয়া

চলিয়াছেন, সে দৃশ্য যে কি রমনীয় উহা শুনিবার কাজ নয়,

প্রত্যক্ষ দর্শীর অহুভবে আনিবার বস্তু। বাম তট মহা

বিরাট হর্ম্যরাজী শোভিত, গগনচুম্বিত ধ্বজা পতাকা

শোভিত সেই সঙ্গ শঙ্খ ঘণ্টা দামামার নিনাদে উষা-

কালের অরুণ কিরণ ছটা শোভিত মন্ডাকিনীর বক্ষে প্রণব

চিত্র ফলিত, রূপে ঝলমল করিতে থাকে। শত শত

ভক্তের স্তুতি গানের বন্ধারে, জীবন পবিত্র ও আনন্দ সঞ্চারে

প্রাণকে বিমোহিত করিয়া তুলে। দেবতার নিদ্রাভঙ্গের

সহিত মানব প্রাণের জড়তা দূরীভূত করিয়া বলিতেছে

“উদ্ভিষ্টত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত।”

আবার সারাদিনের কর্মক্লাস্ত জীব ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়

এই পুণ্যভূমীর উদ্দীপনায়, মহিমাময়ী গঙ্গাজলে অবগাহন

করিয়া সন্ধ্যা সমাগমে যখন দিবা রাত্রির মিলন সন্ধিকাল,

সেই অবসরে, তারকা বেষ্টিত চন্দ্রমার আধো আলো আধো

জাঁধারের ছায়া লইয়া নির্মল গগন বক্ষে প্রকাশিত সেই

মধুর সন্ধ্যাকালে সর্বকার্য্য তুলিয়া দেবাদিদেব বিশেষধরের

পূজায় চিত্তকে আপনি ছুটিয়া যাইতে দেয়। বিশ্বনাথের

আরতি কাশীর বৈশিষ্ট্য। ইহার ঐতিহাসিক ও পারমাখিক

তত্ত্ব ও তথ্য বহু বহু শাস্ত্রানুশীলনে জ্যাত হওয়া যায়।

“মধুরেণ”

(উপন্যাস)

শ্রীমানসী বসু, এম, এ

সেদিন ছিল রবিবার-‘মেল ডে’। স্বজিত নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখিল, আটটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গেছে। তাড়াতাড়ি স্লিপিং সুটের উপর ড্রেসিং গাউন চড়াইয়া পাশের পড়িবার ঘরে আসিয়া দেখিল, অনেকগুলি পত্রই তাহার এ মেলে আসিয়া পড়িয়াছে। সানন্দে বেয়ারাকে চায়ের ফরমাজ দিয়া সে প্রথমেই একখানি সুগন্ধযুক্ত খাম তুলিয়া লইল। মাত্র সে পত্রটি খুলিয়াছে এমন সময় পিতার খাস বেয়ারা যহ আসিয়া সংবাদ দিল, কর্তাবাবু তাহাকে অবিলম্বে ডাকিতেছেন। কয়েক মাস ধরিয়া পিতার শরীর সুস্থ যাইতেছিল না, স্বজিত পেপার ওয়েটের নীচে পত্রখানি রাখিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে সে আবার যখন ফিরিয়া আসিল তখন আর পত্র পড়িতে তার কোন উৎসাহই রহিল না। হতাশভাবে ইজিচেয়ারটার উপর সে শুইয়া পড়িল। ট্রে হইতে এক পেয়ালা চা লইয়া বাকী জ্যাম্ জেলী রুটী ডিম ইত্যাদি ফিরাইয়া দিল, তার পর চায়ে চুমুক দিতে দিতে আগা গোড়া ব্যাপারটা ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। স্বজিতের পিতা কোনো কালেই ভাবুকতার ধার ধরিতেন না, তবুও তিনি যৌবনে বিপাক্তিক হইয়া শিশুপুত্র লইয়া বিব্রত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ করেন নাই। স্বজিতের মাতা-পিতার স্থান একাকী লইয়া তিনি স্বজিতকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। ছোটকালে সঙ্গী হইয়া তিনি তাহার সহিত খেলা করিয়াছেন, শিক্ষক সাজিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছেন, আবার জননীর স্নেহে স্বজিতের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। পক্ষীমাতা তার শিশু পুত্রকে সকল প্রকার ঝড় ঝাপটা হইতে নিজের দেহ দিয়া আগুলিয়া রাখে এই আটাশ বৎসর পিতা তাঁর শুভ ইচ্ছায় স্বজিতকে সেইরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। পিতা সকলের নিষেধ সত্ত্বেও স্বজিতকে ছয়বৎসর বিলাতে রাখিয়া ডাক্তারী পাশ করাইয়া আনিয়াছেন এবং পিতারই চেষ্টায় দেশে ফিরিয়া সে মোটা মাহিনার সরকারী কর্ম্ম পাইয়াছে। সমস্তই ঠিক! তবুও হতাশাগা যত্নর উপর রাগ হইতেছিল,

চিঠিখানা পড়িবারও সময় দিলেনা। পিতা অবশ্য সুস্থই আছেন এবং অবিলম্বেও ডাকেন নাই। রবিবার বলিয়া উঠিতে একটু বেলা হইয়াছিল, সেই অপরাধে মূৰ্খ যত্ন ধরিয়া লইয়াছিল; সে সকালে একঘণ্টা মোটর ট্রিপ দিয়া ফিরিয়াছে এবং পাছে ছবার তাহাকে ডাকিতে হয় সেইজন্য অবিলম্বে কথাটি জুড়িয়া দিয়াছিল। যা হোক পিতা সুস্থ আছেন দেখিয়া স্বজিত নিশ্চিন্ত মনে তাহার পাশের চেয়ারটা অধিকার করিয়া বসিল। ভূমিকা করিয়া কথা বলা জগৎ বাবুর কোষ্ঠিতে লেখেন! কিন্তু আজ তিনি প্রথমেই ভূমিকার সৃষ্টি করিলেন। স্বজিত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল তথাপি পিতার মতামতবর্তী কাজ করিতে রাজী আছে, প্রকল্প কণ্ঠে তাহাই জানাইল। অবশ্য পিতা যে এরূপ একটা অসম্ভব আদেশ করিয়া বসিবেন তাহা সে স্বপনেও ভাবে নাই। তাহার উত্তরে পিতা হাসিয়া উত্তর করিলেন, অসম্ভব আদেশ তিনি মোটেই করিবেন না বরঞ্চ ইহাই জগতের চিরন্তন ব্যাপার এবং পিতারও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। সুনীতির সহিত পুত্রের বিবাহ তিনি স্থির করিয়াছেন! হায় হায়! এর চেয়ে পিতা যদি বলিতেন, জিতু আমার বিশাল সম্পত্তি সুনীতি কি আর কাউকে দিতে চাই, স্বজিত সর্বাস্তবরণে মত দিতে পারিত। কিন্তু বিবাহ যে কত অসম্ভব তা পিতাকে কেমন করিয়া সে বুঝাইবে। প্রতিবাদ করিবে, তাহা অসম্ভব! সে নির্জে ডাক্তার, পিতার শরীর কিরূপ ভয় হইয়াছে তাহা তাহার অবিদিত নাই। পিতার এই শেষ আদেশ সে কিছুতেই অবহেলা করিতে পারিবে না। পিতার কাছে সে নভেলের ভাষায় বলিতে পারিবেন যে কোন নারীকেই প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সুনীতি! হাঁ, সুনীতিকে সে দেখিয়াছে বইকি। মাসছয় পূর্বে পিতা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। পিতাকে লইয়া সে কোন পাহাড়ে যাইতে চাহে কিন্তু নূতন ঢাকরীতে ঢুকিয়াছে, এখনি লম্বা ছুটি লইলে ক্ষতি হইতে পারে, এই ভয়ে পিতা স্বজিতকে কিছুতেই সঙ্গে লইতে রাজী হইলেন না। দার্জি-

লিংবাসী এক বালাবন্ধুর সনির্বন্ধ অল্পরোধে তথায় বায়ু পরিবর্তনে যান। বন্ধুর এই এম, এ, পাশ মেয়েটির কথা স্মৃতি পিতার পত্রেই জানিয়াছিল, এমনকি তাহার পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের কারণ দার্জিলিংএর জলবায়ু বা ডাক্তারের ঔষধ নয়, কেবলমাত্র এই মেয়েটির একান্ত সেবা ও তাহার স্বাস্থ্যের দিকে একান্তিক মনোযোগ—তাহাও লিখিতে ভুলিতেন না। স্মৃতিতের মনে হইল, একবার তিনি লিখিয়াছিলেন “সুনীতি যদি আমার মেয়ে হইত; আমার মাকে কিন্তু আমার চাই জিতু।” মূর্থ স্মৃতি পিতার পত্রের অর্থ সেদিন বুঝিতে পারেন নাই। আজ তাহার মনে হইতেছিল, ক্ষতির ভয় না ভাবিয়া পিতাকে লইয়া যদি সিমলা কি মুসৌরী যাইত তবে এ বিপদে পড়িতে হইত না। প্রায় মাস দুই পূর্বে পিতাকে আনিতে সে দার্জিলিং গিয়াছিল ও সুনীতিকে দেখিয়া আসিয়াছিল। আকর্ষিত হইবার চেহারা তাহার নয়, কালো রোগামত মেয়েটি সাজসজ্জার ধার ও ধারেনা। সামনের দিকের চুলগুলি টানিয়া খোঁপা বাঁধা, শাড়ী কাঁধের উপর পিঠে আবদ্ধ, দেখিলে মনে হয়, সব সময় নিজকে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। অতিথি আসিলে তাহাকে যতটা যত্ন আদর ও আপ্যায়িত করা দরকার ঠিক ততটাই সুনীতি তাহাকে করিয়াছে; বেশী ও নয় কমও নয়। স্মৃতিতকে সে অবজ্ঞাও দেখায় নাই কিংবা স্মৃতিতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেও লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই। স্মৃতিত বিস্মিত হইয়াছিল, কারণ পাত্র হিসাবে তাহার মূল্য সে বুঝে এবং বিলাত হইতে আসিবার পর সমাজ হইতে চা'য়ে ডিনার ও পার্টিতে সে এত নিমন্ত্রণ পাইতেছিল যে, সে যে কতাদায়গ্রস্ত পিতাদের নিকট একটা কেও কেটা নয় তাহাও জানিতেছিল। তারপর স্মৃতিতের পিতার বিশাল সম্পত্তি ও স্মৃতিতের সম্মানিত সরকারী কর্ম যে আধুনিকদের চক্ষে কতখানি, স্মৃতিতকে কত উচ্চপদ দিয়াছে তাহাও স্মৃতিতের অজ্ঞাত ছিল না এবং ইহাতে সে আজও প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। সে কাহাকেও মনোনীত করুক বা না করুক তাহাকে সকলেই মনোনীত করিয়া রাখিয়াছে, এই ছিল তাহার ধারণা। সুনীতির ব্যবহারে, তাহার আশ্রয়বে আঘাত লাগিলেও এই মেয়েটির প্রতি সে যথার্থ শ্রদ্ধা অল্পভব করিয়াছিল। তাহার মনে পড়িল, আলোচনা স্থলে সুনীতি একদিন বলিয়াছিল Give and take principleতার মতে মানব-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে

পালিত হওয়া উচিত। এমন কি Love world এও; স্মৃতিত কৌতুক অল্পভব করিল! কিন্তু এও মনের ভাল বলিতে হইবে। না পায় দেবেও না; সাধারণ নারীর মত বায়ে বায়ে স্মৃতিতের শাস্তি ভঙ্গ করিবে না। কালো স্মৃতিত তাহার কি আসে যায় যখন সে কাহাকেও প্রনয়ণীরূপে চায় না। কিন্তু সুনীতি জানে, অন্ততঃ শুনিয়াছে, নারীর সম্বন্ধে সে কোন আকর্ষণ বোধ করে না। আজ পর্যন্ত অভিভাবকদের নিমন্ত্রণে ও আগ্রহে সে অনেক নরনারীর সহিত মিশিতে বাধ্য হইয়াছে কিন্তু কাহারও সম্বন্ধে সে কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নাই। উহাতে হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজে তাহার নিন্দাও রহিয়াছে “হয় তার বোধ কম, নয় সে মেয়েদের অবজ্ঞা করে।” স্ত্রী চরিত্র সত্যই দুর্জয়। স্মৃতিত কতক্ষণ তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল জানে না, অকস্মাৎ দমকা ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার ধ্যান টুটিয়া গেল। সামনের টেবিলে পেপারওয়ারের নীচে তাহার আকাঙ্ক্ষিত পত্রের মুক্ত অংশ বাতাসে উড়িতে লাগিল, স্মৃতিত সজল চোখে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

(২)

স্মৃতিত বাধা দিল না, সুনীতির সহিত তাহার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। জগৎবাবুকে এত আনন্দ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই—স্মৃতিত নির্বিক্রে জাহাজ হইতে নামিতে স্মৃতিতকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এত আনন্দ প্রকাশ করিতে কেহ দেখে নাই। স্মৃতিতের পিসীমাতা প্রকাশে এবং অপ্রকাশে দুঃখ করিতে ছাড়িলেন না যে বংশের একমাত্র ছেলে স্মৃতিত অমন রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, তার সঙ্গে কি এই বো? অল্পখে ভুগিয়া নিশ্চয় দাদার মাথা খারাপ হইয়াছে। অত্যাচার আত্মীয়েরা বুড়ার ভীমরতি হইয়াছে বলিয়া রায় দিল। এমন কি স্মৃতিতের বন্ধুর দলও আড়ালে স্মৃতিতের পিতৃভক্তির উপর টীকা করিতে ছাড়িল না। কিন্তু সব চেয়ে উদাসীন রহিল স্মৃতিত নিজে। পিতা কতটা চান এবং তাহাকে আনিয়া দিবার তার স্মৃতিতের, —তাই সে দিয়াছে। কেবল বিবাহের আনুসঙ্গিক কর্মগুলোই তাহাকে পৌঁড়ন করিতেছিল, সেইগুলো শেষ হইয়া গেলেই সে শান্তি পায়।

ফুলশয্যার দিন অধিক রাতে ক্রান্ত স্মৃতিত ঘরে আসিয়া দেখিল, সুনীতি টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্তপ্রস্থে বিশৃঙ্খল জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে, দ্বার বন্ধ করার শব্দে ফিরিয়া

স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার সে নির্বিকার সাজ নাই, সকলের মতই সে সাজিয়াছে, ফিকে রংএর শাড়ী ব্লাউজ, কপালের চন্দন, ফুলের গহনা ইত্যাদি মিলিয়া নীল রংএর বিজলী আলোকে তাহাকে সত্যই অপূর্ণ দেখাইতেছিল কিন্তু সজ্জিত এক পলক চাহিয়াই চোখ নামাইয়া লইল এবং ক্ষণ-মাত্র ইতস্ততঃ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। কহিল, 'তোমার সহিত আমার কয়েকটা কথা আছে।' সুনীতি বিস্মিত হইল, তথাপি শান্তকণ্ঠে কহিল 'বল।' সুনীতির নিঃশব্দেচ ব্যবহারে সজ্জিত অনেকটা সপ্রতিভ হইয়া উঠিল, ইজিচেরারটা সুনীতির দিকে সরাইয়া দিয়া নিজে অপরটা অধিকার করিল। সুনীতি নিঃশব্দে দুরু দুরু হৃদয়ে চেরারটার উপর স্থির হইয়া বসিল। সজ্জিত একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিল, 'নারীর প্রতি আমি উদাসীন, বিবাহে আমার রুচি নেই,' এই রকম অনেক কথা আমার সম্বন্ধে উঠেছে—তুমিও জান বোধ হয়?' সুনীতি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, মুত হাসি তাহার মুখের উপর ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সজ্জিত নারী-বিদ্বেষী, একথা সে শুনিয়াছিল, দার্জিলিংএ তাহার নির্লিপ্ত স্বভাবও সুনীতির দৃষ্টি এড়ায় নাই তবুও সে বিবাহে মত দিয়াছিল তাহার কারণ সজ্জিতের হৃদয় জয় করিবার ইচ্ছা, তাহার প্রবল হইয়াছিল। বাহিরের সৌন্দর্য্য নাই থাক, স্বভাবের সৌন্দর্য্য দিয়া সে প্রিয়তমকে মুগ্ধ করিবে। বাহ্য সৌন্দর্য্য ছাড়া কি পুরুষ নারীর কাছে কিছুই চাহে না? স্নেহ প্রেম, মোহ এসব কি তুচ্ছ করিবার? স্বভাবের সৌকুমার্য্য কি কিছুই নয়? ভালবাসার জোরে সজ্জিতকে সে জয় করিয়া লইবে। সজ্জিত সুনীতির দিকে না চাহিয়াই বলিয়া গেল, "বিবাহে অনিচ্ছার কারণ নারীর প্রতি বিদ্বেষভাবের জন্ম নয়, বরং তা নারীরই জন্ত, বিলাতে থাকতে একটি মেয়েকে আমি ভালবাসতাম এবং আজও তাকে ভালবাসি।"

সুনীতির মুখ নিম্নেই বিবর্ণ হইয়া গেল, পরক্ষণেই তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার চেয়ে স্বামী যদি বলিতেন "নারীর প্রতি আমি উদাসীন, তোমাকে আমার ভালবাসা দিতে পারিব না, তবে সুনীতি আশ্রয় তাহার প্রেমের জন্ত সাধনা করিত কিন্তু এ ত নারী-বিদ্বেষ নয়, এ নারী-প্রেম! এ অপমান সুনীতি সহ্য করিবে ক্রমেন করিয়া? দেবতার সম্মুখে সে স্বাহাকে নিজের হৃদয় দান করিয়াছে সে তাহার হৃদয় অস্ত

নারীর কাছে বিকাইয়া দিয়াছে? মুখ তুলিয়া দেখিল, সজ্জিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে, উত্তর দিতে গিয়া ওষ্ঠ কস্পিত হইয়া গেল কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল "এসব কথা জ্যাঠামশায় জানেন?" সজ্জিত শুককণ্ঠে কহিল "না, বাবা এতে অতিশয় আঘাত পাবেন বলে রীটার কাছ থেকে ভালবাসার প্রতিদান পেয়েও তাকে আমার—" ষোড়শের মাথায় বলিতে গিয়া সুনীতির উপস্থিতি স্মরণ করিয়া সজ্জিত অপ্রস্তুত ভাবে থামিয়া গেল। সুনীতি অতিশয় শান্ত ও কঠিন স্বরে কহিল "এতে তোমার বাবা আঘাত পাবেন, এই শুধু আশঙ্কা ছিল কিন্তু একজনের সারাজীবন নষ্ট হয়ে যাবে, একথাও মনে করা উচিত ছিল।" সজ্জিত চমকাইয়া উঠিল। এত বড় সত্য সে ত ভাবিয়া দেখে নাই—পিতার জন্ত নিজের আত্ম-তাগের কথাই তাহার সারা অস্তর জুড়িয়াছিল, সুনীতির কথা ত মনে হয় নাই। অপরাধীর স্বরে কহিল "বাবাকে আঘাত দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল, আর—" সুনীতি বাধা দিয়া পূর্ববৎ স্বরে কহিল "একথা আগে আমাকেও ত জানাতে পারতে, তা হলে কোন ঘটনাই ঘটতে পেতো না।" চেরারের মধ্যে সে ডুবিয়া যাইতেছিল। হায়, কি কুক্ষণেই পিতা বাল্যবন্ধকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দার্জিলিং না গেলে ত সে তাঁহার সম্মুখে পড়িত না। প্রায় দশ মিনিট নিঃশব্দে কাটিয়া গেল, সজ্জিত একটু নড়িয়া বসিয়া কৈফিয়তের স্বরে কহিল "বাবা তোমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন এবং সর্বদা তোমাকে কাছে চান, এ সম্বন্ধে আমার কাছে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। দু' বছর বয়সে মা মারা যান, তাঁর অভাব বাবা আমাকে কখনও বুঝতে দেন নি, আজ তিনি রোগে দুর্বল হয়েছেন, এ অবস্থায় তাঁকে আঘাত দেওয়া উচিত নয় বোধে, স্নাতকের দিক থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে ছিলাম।" সুনীতি কোন উত্তর দিল না কেবল গলায় যে বেলফুলের বড় গোড়োটা ছিল সেইটা নির্মম হস্তে টানিয়া ছিড়িয়া ফেলিয়া দিল। সজ্জিত নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। সে অনেক দেশ ঘুরিয়াছে কিন্তু এ রকম কঠিন স্বভাবের মেয়ে তাহার চক্ষে এই প্রথম পড়িল। সুনীতি তাহার এই বিহ্বলভাব বুঝিল কিনা বলা যায় না, উঠিয়া বসিয়া মুত অথচ স্পষ্ট স্বরে কহিল "আর কিছু কথা আছে।" সজ্জিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বিধাভরে কহিল "বাবা যেন একথা

না জানতে পারেন, তাতে যে আঘাত তাঁকে দেব না বলে ইচ্ছা ছিল তাই দ্বিগুণ ভাবে বোধ করবেন।” “বেশ তাই হবে” সুনীতি নিলিখিত ভাবে কহিল। সজিত কুণ্ঠিতস্বরে কহিল “তোমার বা আমার আত্মীয় স্বজন যেন না জানতে পারেন।” গম্ভীরভাবে সুনীতি কহিল “আমার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে।” সজিত সুনীতির কঠিন কথায় ও স্পষ্ট ব্যবহারে আঘাত পাইলেও নিশ্চিন্ত হইল, সুনীতির দিক হইতে কোন ভয় নাই। একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল “তুমি খাটে শোও, আমি ইজিচেয়ারেই ঘুমতে পারব।” সুনীতি নিম্প্রহভাবে কহিল, আমি এখানে বেশ ভালই আছি, তুমি বিছানায় শোও, আত্মীয় কুটুম্বরা চলে গেলে অল্প ব্যবস্থা করলেই হবে।” সজিত দ্বিধাভরে কহিল “ওতে অসুবিধা হবে—”

অদ্ভুত রকমের হাসি সুনীতির মুখে ফুটিয়া উঠিল; তাহার মন বলিতেছিল, ওজন করা দরদের প্রয়োজন নাই কিন্তু মুখে বলিল “অসুবিধে হলেই বা কি করা যাচ্ছে। কিন্তু আর নয়, রাত ছোটো হয়ে গেছে, আমার ঘুম পাচ্ছে। প্রদীপ ত জ্বলছে আলোটা নিবিরে দিচ্ছি, আলোয় আমার ঘুম হয় না” বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাত বাড়াইয়া সুইচটা বন্ধ করিয়া দিল। নিজে কে সে আর সংঘত করিতে পারিতেছিল না। অন্ধকারে বড় বড় ধারার অশ্রু বরিতে লাগিল; হাত উঠাইয়া সে মুছিতেও সাহস করিল না। পাছে-বা সজিত কিছু সন্দেহ করে। সুনীতি ভাবিতে লাগিল সজিতের সহিত বিবাহ স্থির হওয়াতে সকলেই প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তাহার ভাগ্যের উপর দ্রব্য প্রকাশ করিয়াছিল। সজিত সকল অবিবাহিতা নারীরই কামনার জিনিষ। আর সুনীতি, সেও ত নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া সেদিন কতকি ভাবিয়াছে, আজ সেই ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে মথিত হইয়া যাইতেছিল। অন্ধকারে দু’ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া সজিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ভাবিতেছিল, এসব কথা শুনিয়াও যে নারী নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারে তাহার নিকট সে যে প্রেমের ভিখারী হয় নাই, এ ভালই হইয়াছে। রীটাই তাহার চির প্রেয়সী হইয়া থাকিবে। তবুও সজিতের মনে হইতে লাগিল, সুনীতিকে মন হইতে একেবারে বিদায় দেওয়া সোজা নহে, মুখের ছটা মিষ্ট কথায় তাহাকে তুষ্ট করা যাইবে না। আঘাত করিল সে প্রতিঘাত করিতে জানে। আজই অপরাহ্নে বারান্দা

দিয়া যাইবার সময় সুনীতি ঘরে বসিয়া ‘চিত্রাঙ্গদা’ পড়িতেছিল শুনিয়া গিয়াছে, তাহার কয়টা লাইন সজিতের মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—

“দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী,
পূজা করি রাখিবে মাথায়, তাও নহি,
অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে
তাও নহি আমি।

তিন

বোভাতের পরই আত্মীয় ও কুটুম্বের দল চলিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষ অবধি সজিতের পিসীমাতা জিনিষপত্র গুছাইয়া দিবার জন্ত ছিলেন। আজ তিনিও চলিয়া গেলেন। সজিত তাহাদের রেল উঠাইয়া দিয়া আফিসে গিয়াছিল। বিকালে ফিরিয়া আসিয়া ইজিচেয়ারে শ্রান্তভাবে শুইয়া পড়িল। একদিন গোলমালে কোন কথাই ভাবিতে পারে নাই। ফুলশয্যার পরের দিন হইতেই সুনীতির সহিত তাহার বাক্যালাপ হয় নাই, সুনীতি অধিক রাজে ঘরে ঢুকিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া প্রত্যুষেই উঠিয়া গেছে। সজিত কোন দিন জাগিয়া থাকিলেও কুণ্ঠা ও লজ্জার কোন কথা বলিতে পারে না। আজ নির্জন গৃহে থাকিয়া তাহার সহিত সামনাসামনি হওয়ার আশঙ্কায় সজিত লজ্জিত হইয়া উঠিল। সজিতের ধ্যান ভাদিয়া রাজু প্রবেশ করিয়া ফ্যানটা খুলিয়া দিল ও সজিতের জুতা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। ব্যবস্থাটা নূতন, যদিও সজিত বিলাত হইতে আসিবার পর রাজুকে জগৎবাবু সজিতের খানসামার কাজ করার জন্ত নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু গৃহিনীহীন ঘরে ভৃত্যদের কাজ কর্ম ঠিক নিয়মামুসারে চলিত না এবং অফিস হইতে ফিরিয়া চৌচামিচি না করিয়া রাজুর দেখাও মিলিত না। ক্লান্ত দেহে রাজুর পরিচর্যা মন্দ লাগিতে ছিল না; তাহার সাহায্যে পোষাক খুলিয়া হাসিয়া বলিল, “বা আজত বেশ ভদ্র হয়েছিস। এ রকম স্নতি থাকলে ত আর চৌচামিচি করতে হয় না।” রাজু সলজ্জভাবে বলিল “আজ্ঞে খেয়াল রাখিই তবে মার মত খেয়াল কজন্যর হয় বলুন? রান্নাঘরে খাবার করছিলেন, আপনার ঘোটরের ভেঁপু বাজতেই বললেন, রাজু শীগগীর যা, জুতা জামা খুলে দিগে যা!” বেয়ারা খাবারের ট্রে আনিয়া টিপরের উপর সজিতের সম্মুখে

নামাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। স্বজিত লক্ষ্য করিল, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুনীতি বাড়ীর আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন আনিয়াছে। সমস্ত ঘরের পর্দা বদল হইয়াছে, টেবিল চেয়ার গুলি ঝাড়া মোছা লোকজন বেশ একটু সন্ত্রস্ত ব্যক্তভাবে করিতেছে। এমন কি আজকের রন্ধনেও নূতন স্ব-রহিয়াছে, স্বজিত সুনীতির প্রশংসা মনে মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না; খানিকটা বিশ্রাম করিয়া স্বজিত উঠিয়া পড়িল। অন্তর্দিন এ সময় সে বেড়াইতে বাহির হয়, আজ আর বেড়াইবার ইচ্ছা না থাকায় চট্টা পায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বজিতের শয়ন ঘরের দুই-পাশে দুটা ছোট ঘর ছিল; একটা স্বজিত নিজের ষ্টাডিয়ামে ব্যবহার করিত, অন্যটাকে কয়েকটা আলমারি ছিল। আজ সেই ঘরের পর্দা ঈষৎ সরানো দেখিয়া স্বজিত কোতুলী হইয়া ভিতরে আসিয়া দেখিল, সে ঘরের যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। আলমারীগুলি দেয়ালের ধারে সরাইয়া দিয়া আর একটা খাটে বিছানা হইয়াছে; একটা টেবিল ও একটা চেয়ার আছে। কোনে একটা ড্রেসিং টেবিল। ভিতর হইতে বারান্দার দরজা বন্ধ। প্রবেশ পথ স্বজিতের ঘরের ভিতর দিয়া; যাহাতে কেহ না সন্দেহ করে, তাহার একঘরে শয়ন করে না এবং আরো অধিক সাবধান হওয়ার জন্ত স্বজিতের খাটে দুটা বালিশ দেওয়া আছে। স্বজিত বুলিল, তাহাকে সকল প্রকার চম্ফুলজ্জী হইতে সুনীতি মুক্তি দিয়াছে। তথাপি নিজের অজ্ঞাতসারেই দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল; মুহূর্তের জন্ত স্বজিত লজ্জার ব্যাকুল হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই ধীরপদে বাহির হইয়া আসিল। পিতার সন্ধানে আসিল স্বজিত, দেখিল সামনের বারান্দায় জগৎবাবু সিন্ধের চাঁদর মুড়ি দিয়া তাঁর রোলিং চেয়ারে শুইয়া আছেন

এবং পাশে একটা চেয়ারে বসিয়া সুনীতি ইংরাজি জার্নাল হইতে ভ্রমন কাহিনী পাড়িয়া শুনাইতেছে। সুনীতি এখন দার্জিলিং-এর মতই চুল বাধিয়াছে, কাপড় পরিয়াছে তবে তফা-তের মধ্যে কানের হীরার ফুলটো চিক চিক করিতেছে আর মাথার সিন্দুর ও কপালের টিপ তাহার পূর্ববৎ আছে। স্বজিত ফিরিয়া বাইবে ভাবিতেছিল কিন্তু তাহার পূর্বেই জুতার শব্দে জগৎবাবু চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন “আয় জিতু, মা রাজ্যকে একটা চেয়ার দিতে বলত।” সুনীতি উঠিতেছিল, স্বজিত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল “থাক, থাক, এই ত রয়েছে আমি নিচ্ছি।” সুনীতি আবার পড়িতে লাগিল; স্বজিতের উপস্থিতি তাহাকে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত করিল না; আর স্বজিত সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, নারী কঠিন হইলে ইম্পাতের মতই কঠিন হয় সত্য, কোন কিছুর দাগ তাহাতে পড়ে না।

রাত্রে খাবার টেবিলেও সুনীতি যতটা সপ্রতিভ ভাবে ও অসঙ্কোচে কথাবার্তা বলিল, স্বজিত ততটা পারিতেছিল না। সুনীতি জগৎবাবুর সঙ্গে নানা প্রকারের গল্প করিতে লাগিল; স্বজিতকেও এটা ওটা খাইতে অনুরোধ করিল। সুনীতির ব্যবহারে স্বজিত নিশ্চিন্ত হইতে গিয়াও কী একটা ব্যথা তাহার মনে খচ খচ করিতে লাগিল।

কাল মেলডে, স্বজিত পত্র লিখিতে রাস্তা ছিল, তথাপি সুনীতি নিঃশব্দে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, তাহাও সে বুলিতে পারিল এবং কিছু কথা তাহার সহিত বলা উচিত, একটা সম্বোধন অন্ততঃ, কিন্তু কি বলিবৈঠক করিবার পূর্বেই সুনীতি নিজের ঘরে ঢুকিয়া পর্দা টানিয়া দিল। (ক্রমশঃ)





চি. ত্র. শি. স্ত্রী.

স্বর্গীয়া শান্তিলতা

বিজ্ঞানার্চ্য ডাঃ পঞ্চানন
নিয়োগী মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা
স্বর্গীয়া শান্তিলতা মাত্র সাড়ে
তের বৎসর বয়সে পৃথিবী হইতে
বিদায় লইয়াছে। কিন্তু ঐ
ক্ষণিকের জীবনে সে যে-কয়টি
স্থিতির অমর সৌরভ রাখিয়া
গিয়াছে আজও তাহা অপরিমল।
এই অপূর্ণ প্রতিভাময়ী বালিকা
নিতান্ত শৈশব হইতেই ভাস্কর্য
নিয়োগীর বিশ্বয়কর প্রতিভার
উত্তরাধিকারিণী রূপে সর্বক্ষেত্রে
আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।
প্রতি বৎসর প্রত্যেক পরীক্ষার
প্রথম স্থান তো সে অধিকার
করিতই, একবার ভবল প্রদর্শন
লইয়াও সে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু সর্বোপরি ছিল তাহার আশ্চর্য চিত্রাঙ্কনশীলনপটুতা।
স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিবলে সে অনায়াসে চিত্রবিদ্যার স্বকঠিন পদ্ধতি
(technique) আয়ত্ত করিয়াছিল এবং তাহার অমূল্যলনে
এমনই দক্ষতা লাভ করিয়াছিল যে, ঐ ক্ষুদ্র বালিকার অঙ্কিত
মূল চিত্রগুলি যে কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রকরের গোরুর
সামগ্রী হইতে পারে। বর্ণস্বচ্ছতা, রেখার সাবলীলতায় এবং
ভাবের ব্যঞ্জনা এই কয়েকখানি চিত্র অপরূপ। আমরা

তাহার অঙ্কিত ত্রিবার্ণ চিত্র শ্রীকৃষ্ণ-এর প্রতিলিপি আগামী
কোন এক সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

আমরা গত সংখ্যায় শান্তিলতার তিনখানি চিত্রের
প্রতিকল্প বঙ্গলক্ষ্মীতে প্রকাশ করিয়াছি। উহা দেখিয়াই
চিত্রকলারসিক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এরূপ আশ্চর্য
কলাপ্রতিভা কদাচিত্ দেখা যায়। অল্পবয়সে প্রতিভার
বিহীনস্বরূপে যেন সে তাহার কলাচর্চায় এমনি বিশ্বয়কর সৃষ্টি

করিতে পারিয়াছিল। তাহার অঙ্কিত সমস্ত চিত্রগুলিকে একত্র করিয়া দেখিলে যে-কোন কলারসিক যুগপৎ আনন্দ ও বিষয়ে মগ্ন হইয়া বাইবেন। এই আশ্চর্য্য প্রতিভা অকালে কাল-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

মানুষের জগতে প্রতিভার আবির্ভাব বড় সুলভ নহে। যেখানে তাহা সম্ভব হয় সেখানেও অশুকল আবহাওয়ার প্রয়োজন। বিজ্ঞানচাৰ্য্য ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার এই কল্পাটির শৈশবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বিজ্ঞান ও কলা-প্রতিভার উত্তরাধিকারিণীর স্থান সেই অধিকার করিবে। পিতার কর্তব্যে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই—বরং আপনাদি প্রতিভার ভাবী অধিকারিণীকে নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারিয়া যতদূর সম্ভব অশুকল পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া সেই ক্ষুদ্র লতার বর্ধন সাধনে যত্নপর ছিলেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হইবার নয়। ক্ষণিকের বিদ্রোহী কালো মেঘের কোলে লুকাইয়া গেল। ডাঃ নিয়োগী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক—গীতার মহান শ্লোকমালা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিত্যপাঠ। নিজকে সাধনা দিবার উপায় তিনি তাহা হইতেই সংগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া চোখের জল সংবরণ করা স্ককঠিন।

অগ্নীয়া শান্তিলতার একখানি আলোকচিত্র এখানে মুদ্রিত

করা হইল। চিত্র দেখিয়া চরিত্র অধ্যয়নের শক্তি যাহাদের আছে তাঁহারা দেখিলেই বুঝিবেন—অন্তরের সদাজাগ্রত শক্তিতে যেন ঐ স্বর্গকুহলের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আপনাদি মহিমায় যেন সে আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। এই আলোকচিত্রটি শান্তিলতার মাত্র তের বৎসর বয়সের সময় গৃহীত হয়।

আমরা হিন্দু, আমাদের অবিদ্যারহিত এবং অনন্ত প্রসারতায় বিশ্বাসী, তাই নিজকে সাধনা দিই,—ডাঃ নিয়োগী এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ঐ দেবকুমার বেদেশে গিয়াছে, সেখানে হয়ত মহত্তর বৃহত্তর কর্ণের আহ্বান তাহার জন্ত আসিয়াছিল। তথাপি চোখের জল গড়াইয়া পড়ে—মনে হয়, মায়াবর এই জগতের মায়াবর বন্ধনগুলিই আমাদের সম্পদ হইয়া থাক! তাই স্থতিটুকুও ছাড়িতে চাহি না। অনিত্যের এই অন্তহীন ছঃখ বরণ করিয়াই আমাদের জীবন।

যে পবিত্র স্থতিকণা কয়টি শান্তিলতা রাখিয়া গিয়াছে, আজ তাহা লইয়াই আমরা শান্তি ও সাধনা লাভ করিব এবং ভাবিব—

“কুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে।”



মরমী রবীন্দ্রনাথ ও নারী

শ্রীপুরঞ্জয় রায়

বিরাট প্রতিভার আলোচনা সমগ্রভাবে বা অখণ্ডভাবে হওয়া স্বকটিন! বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা যাহা সর্বতোমুখী তাহার সম্পর্কে আরও অধিক। তবেই ইহা বলা যাইতে পারে। কবি, দার্শনিক, উপন্যাসিক, শিক্ষাব্রতী সমাজ সেবী, রাজনীতিক, সর্বোপরি মানব-কল্যাণে উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র আলোচনা একই কালে সম্ভবপর নহে বলিয়াই মনে হয়। তাই অংশতঃ বা খণ্ডীকৃতভাবে (যদিও ইহার এক একটা অংশও নিজ গরিমায় সম্পূর্ণ) ইহার আলোচনা যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। রবীন্দ্র-সাহিত্য দেশকালের উর্দ্ধে শাশ্বত মানবমানে চিরদিন উজ্জ্বল থাকিয়া সত্যকার রস-পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করিবে, ইহা বলা বাহুল্য। তবে সৃষ্টির আদিম যুগ ইহাতে নিখিল নরনারীর অন্তর্লোকের নিভৃত কন্দরে যে প্রচ্ছন্ন রহস্য যুগে যুগে আনন্দ মধু সঞ্চার করিয়া আসিতেছে—সেই সম্পর্কে বিশেষতঃ বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্টি নারীর মন সম্পর্কে মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ কী আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন আজ তাহারই কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস করিব। নারীকে তিনি প্রধানতঃ দুইভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

মেয়েরা দুই জাতের, কোন কোন পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

এক জাত প্রধানতঃ মা আর এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন। তাপ, উর্দ্ধ লোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে; দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব। আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু! গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়া-মন্ত্র তার চাকল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌছয় চিত্তের সেই মণি কোঠায় যেখানে সোণার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, যে ঝঙ্কারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী! ‘দুই বোন।’

তাই দেখি সত্যি নারী-চিত্তের বিশ্লেষণে এই দুই ছাড়া তৃতীয় কোন রূপ নাই! তবে কোন চরিত্রে প্রথমটী আবার কোন চরিত্রে দ্বিতীয়টির প্রাধান্য অধিকতর পরিষ্কৃত। আবার কখন কখন কোন বিশেষ চরিত্রে দুইটী বিশেষ ভাবই এমন পাশাপাশি অথচ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে যাহা সত্যি বিশ্বয়কর! তবে সাধারণ নারী এই দুইটী ভাবেরই সংমিশ্রণে গঠিত এবং অন্তঃসলিলা ফন্সুর মতই প্রচ্ছন্ন। এইজন্যই বিশেষতঃ আমাদের দেশের মেয়েরা অল্পবিস্তর Frigid। তবে এইখানেই ইহার শেষ নহে, ইহাই চরম নহে। এই দুইটী ভাবকে আমরা অধ্যায়ের পূর্ব ও উত্তর কাণ্ড ধরিয়া লইতে পারি। সাধারণ নারীর জীবনে বসন্ত ও বর্ষা ঋতুর মনোরম লীলা সমান বেগেই প্রবাহিত। তবে বসন্ত আসে অজ্ঞানে তাহার দখিনা বাতাসের পাখায় ভর করিয়া; তাহার আয়ু অল্প, তাহার অনাস্থাদিত অভূতপূর্ব শিহরণ অন্তরের মণি কোঠায় একটা অভিনব পুলকের স্পর্শ রাখিয়াই চলিয়া যায়—‘আর বর্ষা আসে সাড়সুরে ঘনঘটা করিয়া! সর্বত্র তাহার সাড়া জাগায় ‘ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব রভসে।’ এর জনধারায় অভিসিঞ্চিত নারী হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায় ভাষার ভরা গন্ধার মতই! তবে পূর্বেই বলিয়াছি, কোন কোন চরিত্রে এই দুইটী বিশেষ ভাবের কোন একটির বিশেষ প্রাধান্য থাকিয়া যায়। তাই নিখিল চিত্তলোক আজও অনন্ত যৌবনা উর্ধ্বশীর পুনরাগমন প্রত্যাশায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া নৈশ উপাধান সিন্ত করে যদিও সে জানে ‘কিরিবে না কিরিবে না অন্তাচলবাসিনী উর্ধ্বশী।’ কিন্তু সর্বোপেক্ষা বিশ্বাসের বস্তু এই যে, এই বসন্ত ঋতুর আগমন প্রত্যাশায়—যখন তাহার সর্বদেহে মনে নূতন গঠন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তখনও সে তৎসম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নহে অথচ তাই বলিয়া সে তাহার অভাব অনুভব করে না তাহা বলা চলে না। তাই ‘বিসর্জনে’ যখন অপর্ণা বলিতেছে ‘যবে বসে থাকি ভরা মনে দিতে চাহি নিতে কেহ নাই, তাহে বলি একেলা’ তখন এই অভাব বোধের মধ্যে নিজেকে চিনিবার

সহস্র প্রচেষ্টার মধ্যেও তাহার ব্যর্থতা এই কথারই সত্যতা প্রচার করে। বিমলাও (যেরে বাইরে) যখন সন্দীপের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পড়িয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিল তখন তাহাকেও অভাব বোধের তাড়নায় একদা বলিতে হইয়াছিল—

‘যার সমস্ত আত্মীয় স্বজন একে একে মরে গিয়েছে সেও একলা নয়; মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই রয়েছে তবু কাছে নেই, যে মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল সঙ্গ থেকে একেবারে খসে পড়ে গিয়েছে, মনে হয় যেন অন্ধকারে তার মুখের দিকে চাইলে সমস্ত নক্ষত্র-লোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। আমি যেখানে রয়েছি সেইখানেই নেই—যারা আমাকে ঘিরে রয়েছে তাদের কাছ থেকেই দূরে! আমি চলছি ফিরছি বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে যেন পদ্মপাতার ওপরকার শিশির বিন্যাসের মত। (যেরে বাইরে—৩১৯ পৃঃ)

এই একাকীত্ব এই নিঃসঙ্গবোধ নারী হৃদয়ের এক অপূর্ণ অভিযুক্তি! যতদিন তাহার প্রেম আশ্রয় না পায়, যতদিন তাহার নারীত্বের উদ্বোধন না হয় ততদিন এই মধুর অথচ সর্বনাশা বিচ্ছেদের অন্ত নাই! ইহার বিরুদ্ধে যত অভিযোগই সঞ্চিত হইয়া উঠুক না তবু কাহাকেও উপলক্ষ করিয়া সেই অন্তর্বেদনা প্রকাশের পথ পায় না। কিন্তু যদি কোন মত্যকার হৃদয়ের স্পর্শ সে পায় তবে সে যায় রূপান্তরিত হইয়া! প্রেমের অপূর্ণ আলোকে যায় অন্তর ভরিত হইয়া! সে নারী তখন আর বিমলা নহে, বিনোদিনী নহে, শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীও নহে। সে লাবণ্যের মতই আপ্তকাম নিম্পূহ উদার অথচ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। লাবণ্যই বলিতে পারে—

‘তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মত করে নিজেকে সাজাতে বসলো। আজ তো দেখি ও (কেটী) বিলিতি দোকানের পুতুলের মত; সেটা সম্ভব হোতো না যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকতো।...

ওকে আনন্দ দিতে যদি নাও পারো ওকে আমোদ দিতে পারবে।—তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ—তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।

(লাবণ্য, শেষের কবিতা—২১৫-১৬ পৃঃ)

নিজেকে সম্পূর্ণভাবে চিনিবার পর আপন নারীত্ব

প্রতিষ্ঠিত হইয়া উদার ভূমালোকের পরিবেষ্টনীর মধ্যেই নারী এমন কথা বলিতে পারে। বিনোদিনীও আপনাকে চিনিলা, আপন নারীত্বকে ফিরিয়া পাইল বহু আলোড়ন বহু ঝড়ঝঞ্ঝা হুঃখ তাপের সাগর পার হইয়া। যে বলিষ্ঠ ও স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষ একদা তাহার অন্তরকে রাঙাইয়া তুলিয়াছিল তাহাকেই একান্ত করিয়া পাইবার কুচ্ছ সাধনায় যখন সে বিপরীত পন্থা গ্রহণ করিল, তাহার রূপ তাহার শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ লইয়া অভিমানিনী প্রত্যাখ্যাতা বিনোদিনী যখন বিহারীর একান্ত বন্ধু ও পরম শ্রদ্ধার পাত্রী আশাকে গ্রাস করিয়া বিহারীকেই আঘাত করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে কাল ভুজঙ্গিনীর মত তাহার করাল ফণা বিস্তার করিল—তখন তাহার তীব্রতায় আমরা বিস্মিত হইয়া যাই। কিন্তু কবি তাঁহার অপূর্ণ লেখনীর অভিনব তুলিকাপাতে নারীত্বের সার্থকতার স্রী সম্পাদনে যখন তাহাকে কলাগময়ী সেবিকারূপে পর্যাবসিত করিলেন তখন শুধু শ্রদ্ধার মন অবনত হইয়া আসে না পরন্তু নারীত্বের বিস্তার সাধনে নিজেকে বিস্তারিত করার যে বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহারও দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তাই দেখি আগুন লইয়া খেলায় শরৎচন্দ্র ভোজবাজীর যে চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন সেখানেও সেই কিরণময়ীকে তিনি উদ্ভাসিত নারী না করিয়া পারেন নাই। কিন্তু বিনোদিনীর মত তাহার পরিণতি অত সুন্দর নহে। বিনোদিনী বলিতেছে: ‘পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই প্রাপ্য নাই। আমি অনেক হুঃখ দিয়াছি অনেক হুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে; সে শিক্ষা যদি তুলিতাম তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরও হীন হইতাম। কিন্তু তুমি আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।...তুমি চিরদিন নিলিপ্ত প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো—আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও তুমি খুসী হও। (চোখের বালি ২৯১ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রে এমনই একটা দৃঢ়তার, এমনই একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে যাহা সগর্বে তাহার বিশেষ মূল্যকেই ঘোষনা করে। আমরা কেবল স্নেহ-হৃৎকল রাজলক্ষীকেই দেখি না পরন্তু কর্তব্যনিষ্ঠা তেজোদৃগ্ধা-অন্নপূর্ণা দেবীকেও দেখি যাহার সম্মুখে পরম সত্যাশ্রয়ী বেহারীও

ফণেকের তরে নিজের দৌর্য্য অশ্রুভব করে। শরৎচন্দ্রের
জ্যাঠাইমা যেন এই রাজলক্ষী ও অন্নপূর্ণা দেবীরই একত্রীভূত
পরিণতি। যে জ্যাঠাইমা গোপনে এক তীর অথচ গভীর মেহা-
তুর মন লইয়া নিজেরই সন্তানের হস্তের মুখারিঁ ভরে গ্রাম
ক্রান্তিগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে পারেন, সে যে অশ্রু-
নাশিত দিকে অর্থাৎ প্রেমিকারূপেও সে যে অশ্রু-
কিছুই চাহে না কিছা চাহে না বলিলেও ঠিক হইবে না। তাহার
অন্তরে সাড়া দেয় না। যে ব্যক্তি যে পৌরুষ তাহার চিত্তে
তারুণ্যের প্রারম্ভ হইতেই বাসা বাধিয়াছে তাহারই স্নেহ-
প্রেরনায় সে বলে :

যায়েচোঁ ন্যাসবু স্নেহে বধু রেশে বাক্যে স্বিকৃতি।

আমারে প্রেমের বীণা করে অশ্রুধীনী।

হে বিধাতা আমারে প্রেমে না বাক্যহীন।

রক্তে মোর জাগে রক্ত বাণী—

উত্তরিয়া জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তের পরে

জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন করে

কণ্ঠ হতে

নির্ঝরিতশ্রোতে

যাহা মোর অনির্বচনীয়—

তারে যেন চিত্ত মাঝে লয় মোর প্রিয়।—

সংস্কৃতি ৫০৯ পৃঃ।

কিন্তু তাই বলিয়া নারী রহস্য এতটা উন্মুক্ত নহে। যদিচ
চিত্রাঙ্গদা বা এইরূপ কবিতায় নারী-হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্য কবির
তুলিকাপাতে আমাদের চোখের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে
তবু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, বাস্তব জগতে প্রেম অন্তর্মুখী।
তাহার বাহ্যিক প্রকাশে যে তাহার অল্পম্য মাধুর্যের অঙ্গদতি
ঘটার তাহা নহে পরন্তু তাহা রহস্যময়ীর চিররহস্য ঢাকা
অন্তরের লীলায়িত গতির ব্যাঘাত ঘটায়। কবি তাঁহার অপূর্ণ
তুলিকাপাতে তাহার রহস্য উন্মোচন করিয়াছেন কেবল মাত্র
রসিক চিত্তে তাহার অন্তর্গত রসটিকে পরিবেশন করিবার
জন্তই! তাই নারী হৃদয়ের এই ‘মিষ্টটুকু বা’ রহস্য ভাবটী
তিনিই দেবদায়ীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন।

‘জানো নাকি প্রেম অন্তর্ধামী ?

বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন

গন্ধ তার লুকায়ে কোথায় ?’

‘বিদায় অভিষাপ’ সংস্কৃতি ১৬৯ পৃঃ।

প্রকৃতির রহস্যের ছলান রবীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া প্রকৃতির
সহিত নিজেকে মিশাইয়া নারী চিত্তের গোপন গভীর অথচ
মাধুর্যভরা রসগুলিকে সাধারণ ভাবে অতি সহজ ছন্দে
অনার্যাস ভঙ্গিমায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিদ্রাজ
আভাস বিতে প্রয়াস পাইলাম।



বঙ্গ ভাষার প্রসার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

মেদিনীপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত

সাহিত্যিক দুই প্রকার, এক দল যাহারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সাহিত্য-রসের ভাণ্ডার ও উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেন, যাহাদের কাব্য রচনা পড়িয়া জাতি আনন্দ পায়, কর্ণে অনুপ্রাণিত হয়, ধর্মে উন্নতি হয়—যথা কবি, উপন্যাসিক; দ্বিতীয় দলের লোক সাহিত্যরস নরনারীর মধ্যে পরিবেশন করিয়া জাতির উপকার করেন। তাহাদের লব্ধ জ্ঞানরাশি সাহিত্যের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। তাহাদের কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি সাহিত্য মধ্যে ফুটিয়া উঠে, তাহাদের জ্ঞান গরিমা জাতির নর নারীর সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম-জীবনে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। যেমন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক।

কিন্তু এই দুই দলের সাহিত্যিকদের যশ ও শ্রম সার্থক হয় ভাষার বহুল প্রচারে। যে ভাষার তাঁহারা তাঁহাদের সাধনার ফল প্রকাশ করেন সেই ভাষাই যত ব্যক্তি শিখিবে, পড়িবে, বলিবে ততই তাহাদের প্রারব্ধ জ্ঞান সিদ্ধি ও সত্য হইবে।

সেই নিমিত্ত আজ বাঙ্গলা ভাষার প্রসার নিখিল ভারতে একাজ প্রয়োজন। আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বময় বাঙ্গলা ভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বের সুখীজন বাঙ্গলা ভাষার ঐশ্বর্য দেখিয়া যেমন হইয়াছেন চমৎকৃত তাঁহাদের সেই ভাষার সহিত পরিচয় পাইবার জন্য তেমন সুযোগ ও সুবিধা পান না, বাঙ্গলা শিখিবার ব্যবস্থা এক রকম বিল। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মাইকেল, হেম, নবীন, রবি, শরৎ যে অমূল্য রত্নরাজিতে বঙ্গ ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিয়া গিয়াছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, হানদাস, গোবিন্দ দাসের মধুর গীতাবলী সমগ্র ভারতে মুখরিত তাহার অন্তরকরণে আজ হিন্দি, গুজরাটি আদি নানা সাহিত্য পুষ্টলাভ করিতেছে। অথচ আমাদের বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গলার সীমান্তে, প্রবাসে, অ-বাঙ্গালীদের নিকট অনাদৃত, অপরিচিত। ইহা কি বাঙ্গালীর উদারতা না গুদামিস্ত্রের পরিচয়?

ভাষাই জাতির ও রাষ্ট্রের ঐক্য সাধন করিবার একটি বিশিষ্ট উপায়। ধর্মের বন্ধনে জাতিকে বাঁধিবার চেষ্টা বর্তমানে শিথিল হইয়া আসিতেছে। তাই আজ সমগ্র ইংরাজি ভাষাভাষী জাতি এক বিরাট রাষ্ট্রমণ্ডলী গঠন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। কয়েক মাস পূর্বে এমেরিকায় স্থধী মণ্ডলী English Linguistic Fedaration নামে এক বিরাট রাষ্ট্র—‘ভাষায় ঐক্য’ উপর গঠন করিতে উদ্যম কারিতেছে। ভারতের রাজনৈতিক নেতাগণও এক ভাষা ভাষী জনসংখ্যা হিসাবে (Linguistic Basis) ভারতের প্রদেশগুলির সীমা নির্দেশ করিবার আন্দোলন করিতেছেন। কংগ্রেসও এ দাবী মানিয় লইয়াছেন।

সেই নিমিত্ত বাঙ্গালী মাত্রেবই বাঙ্গলা ভাষা-ভাষী ব্যক্তিগণ বাহাতে এক রাষ্ট্র ভুক্ত হয়, একই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অনুশাসনে তাহাদের জীবনের ধারা প্রবাহিত করিতে পারে তাহার চেষ্টা কার্যমনোবাক্যে করা কর্তব্য। বৃটিশ শাসন-তন্ত্রের কলমের খোঁচায় যে সব বাঙ্গলা ভাষা ভাষী নর নারীকে বাঙ্গলা মায়ের স্নেহাঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামে ও বিহারে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের বাঙ্গলা-প্রদেশ ভুক্ত করিবার জন্ত সকল বাঙ্গালীর আন্দোলন ও উপায় নির্ধারণ করা দৃশ্যনীয় নহে। ইহাতে কোন রাজনৈতিক বা প্রাদেশিক গুঢ় নীতি নাই। বাঙ্গলা সাহিত্য ও ভাষা প্রবাসী বাঙ্গালীদের স্বভাতি প্রীতি ও ঐক্য রাখিবার প্রধান বাহন। বঙ্গ নর নারীর সেইজন্ত বাঙ্গলা ভাষার প্রসারে মন দেওয়া কর্তব্য। সাহিত্যিকদেরও ভাষার প্রচারের জন্ত চেষ্টা করা, প্রধান কর্তব্য। ইহার জন্ত বাঙ্গালী যুবকদের তাগ স্বীকার করা তাহারই সুপ্রতিষ্ঠার জন্ত বাঙ্গলার ধনীদেব অর্থদান করা কেবল কর্তব্য নয়, ধর্ম। বাঙ্গালী আজ রাজনীতি ও ব্যবসা-ক্ষেত্রে ইংরাজ শাসন তন্ত্রে তেমন প্রতিপত্তি বিস্তার করিবার সুযোগ না পাইলেও তাহাদের জ্ঞানের, বুদ্ধির, স্বাধীন চিন্তার গরিমা এখনও সকল প্রদেশবাসীর শ্রদ্ধাকর্ষণ করে।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাঙ্গালী—‘বঙ্গভাষার

রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী” পেশ করিতে পশ্চাত্তপদ নহে। তবে এই দাবী কায়মী করিবার জন্ত—চাই একাগ্রতা ও নিস্বার্থ স্বজাতি ভাষাপ্রেম। “মুখেন মারিতং জগৎ” করিলে চলিবে না। এক সময় ত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুক যেমন ভারতের সাধনার বৃত্তিকা লইয়া দেশ বিদেশে তাহার আলোক বিতরণ করিয়া ধন্ত ও মান্ত হইয়াছিলেন তেমনই ব্রত লইয়া বঙ্গ ভাষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তাহাদেরই প্রভাবে আজ অন্ধ জগৎবাসী সেই বুদ্ধেরই চরণে প্রণাম জানাইয়া ধন্ত।

সংহত, সংযমী হইয়া বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য দেশ বিদেশে বিতরণ করিবার ভার বাঙ্গালীকেই লইতে হইবে। ভারতে নানা স্থান হিমালয় হইতে কেপকমরীণ, পেশেওয়ার হইতে ইমফাল ভ্রমণ করিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে যে সুযোগ ও সুবিধা পাইলে সমগ্র ভারতের সুস্বীকৃত বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়া রবীন্দ্র সাহিত্যের রস উপভোগ করিতে আগ্রহান্বিত। ইয়োরোপের কয়েকটি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা শিখাইবার রীতিমত ব্যবস্থা আছে। এমন কি পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষা দিবার জন্ত অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন ডাঃ হিরন্ময় ঘোষাল। এখানে বাঙ্গালাকে রবীন্দ্র-লজী নামে অখ্যাত করা হয়।

কিন্তু ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষাদানে একেবারে উদাসীন। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন শিক্ষা কেন্দ্রেও বাঙ্গলা সাহিত্য পঠন পাঠনের ব্যবস্থা নাই। ইহা যে কেবল নব ভেদনৈতি প্রবর্তনের ও প্রাদেশিকতার অন্ধ মোহেরই ফল তাহা নহে, বাঙ্গালীদেরও উদাসিন্ত ইহার অন্য কারন। এখনও আমাদের মাতৃভাষার আভিজাত্য স্বীকার করিতে লজ্জা পাই, ইহার অন্যতম কারণ। তাই প্রবাসী বাঙ্গালীদেরও নিঃ মাতৃভাষার প্রতি মমতাও নতি লঘু। উপার্জনের সুখ সুবিধার জন্ত নিজ মাতৃভাষা বাঙ্গলা শিখিবার প্রবাসী বাঙ্গালীদের অনাগ্রহ দেখিলে যেমন লজ্জা বোধ হয় তেমনই পরাধীনতার বিষময় ফল অনুভব করিয়া বিস্মিত ও দ্রুংখিত হইতে হয়।

যখন নাগপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার কেদার নাথ মহাশয় দেখাইলেন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আই, এ, পরীক্ষায় বেঙ্গলী কম্পোজিশন পাঠ্য হইলেও সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪টি

বাঙ্গালী ছাত্র মধ্যে মাত্র ২৬টি ছাত্র বেঙ্গলী কম্পোজিশন গ্রহণ করিয়াছে, তখন লজ্জায় আধোবদন হইতে হইল।

দিল্লী সমগ্র ভারতের রাজধানী; এখানে বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর বাস, বহু ছাত্র ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করে, অনেকগুলি কৃতি বঙ্গ সন্তান অধ্যাপনা করিতেছেন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারার বাঙ্গালী (রায় নিশি কান্ত সেন বাহাদুর) তথাপি দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বাঙ্গলা বিভাগ নাই। ইহা দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে নিজ কন্ঠার স্মৃতিতে বাঙ্গলা পুস্তক কয়েক শত উপহার দিয়া “উমারাগী গ্রন্থসংগ্রহ” স্থাপনা করিবার প্রস্তাব তিন বৎসর পূর্বে করিয়া-ছিলাম।

যদিও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতি ও ভাইস চ্যান্সেলার স্যার মরীশ গায়ের সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারে “নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির” উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ শ্রীমান্দ্রাসদ মুখার্জির নির্দেশে তাহাদের প্রকাশিত মূল্যবান বাঙ্গলা পুস্তকগুলি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাহাদের যাবতীয় প্রকাশিত পুস্তকাবলী এবং স্বয়ং ১৫০ বাঙ্গালা পুস্তক পাঠাইয়াছি; তথাপি এখনও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বাঙ্গালা বিভাগ স্থাপনা হয় নাই বা “উমারাগী সংগ্রহ” সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা কি বাঙ্গালীদের মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতার ফল নহে?

বোম্বাই সহরে চারি সহস্রের অধিক বাঙ্গালী বাস করে। প্রায় ১৫ জন বাঙ্গালীর এক সহস্র টাকার অধিক মাসিক আয় আছে। কয়েকটি বাঙ্গালী ছাত্রও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং কয়েকটি খ্যাতনামা অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ বাঙ্গালী আছেন, তথাপি রাজবান্ধি টাউন্সার নামে সুবৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে একখানিও বাঙ্গালা বই নাই। তাহা দেখিয়া কোনো বাঙ্গালী ব্যথিত হন না বা বাঙ্গলা পুস্তক রাখিবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্রীপক্ষকে বাধ্য করান না। সেখানেও “নিখিল বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির” সম্পাদক রূপে বোম্বাই গমন করিয়া বাঙ্গালা পুস্তক প্রদান ও ক্রয়ের জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্রীপক্ষকে সম্মত করিতে সক্ষম হইয়া ধন্ত হইয়াছি। সেখানেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষদ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং লেখক স্বয়ং বহু পুস্তক দান

করিয়াছেন। কিন্তু তৎস্থানের প্রবাসী বাঙ্গালী ও তৎস্থান ভ্রমণকারী বাঙ্গালীরা এ বিষয় লক্ষ্য করেন না।

পূর্বে বলা হইয়াছে, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে অ-বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষা শিখিতে আগ্রহাশ্রিত আছেন। আমরা এবং বঙ্গের প্রবাসী বাঙ্গালীরা বিগত দেড়শত বৎসর লক্ষ লক্ষ অ-বাঙ্গালীর সংশ্রবে আসিয়াও একটি অ-বাঙ্গালীকে বাংলা ভাষা শিখিবার জন্ত অনুরোধ করি নাই বা সুযোগ প্রদানও করি নাই।

বাঙ্গালার নর-নারী হিন্দী ভাষার কিছু না জানিয়া ‘হাম, কাম, তুম’ বাল্য অ-বাঙ্গালীদের সহিত অবোধ্য হিন্দিতে কথাবার্তা করিয়া থাকে। ভুলেও তাহার সহিত বাংলার কথা বলি না। আমার বোধ হয় আমরা মনে করি হিন্দিতে কথা না বলিলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হইবে না। অথবা যুরোপীয়ানরা যখন চাকর-বাকর, কুলি-মজুরদের সহিত হিন্দিতে কথা বলে তখন যদি আমরা লোকজনদের সহিত হিন্দিতে কথা না বলি তাহা হইলে সম্মানের হানি হইবে। হয়! দাস মনোবৃত্তির আর কি অধিক পরিচয় পাওয়া যায়? এমন কি যে সব অ-বাঙ্গালী বাংলা ভাষা জানে এবং বাংলায় কথা বলিতে গৌরব বোধ করে তাহারা বাংলায় কথা বলিলেও তার সঙ্গে আমরা হিন্দি বলিয়া থাকি। আমাদের এ-প্রবৃত্তি না ত্যাগ করিলে বাঙ্গলা ভাষার প্রসার হইবে না। আমরা যদি অ-বাঙ্গালীদের সহিত বাংলায় কথা বলি তাহা হইলে এই কালকাতা সহরে আগত আমাদেরই অনুরোধ প্রাপ্তী ও ব্যবসায়ীগণ বাধ্য হইয়া নিজেদের গরজে ও ব্যবসায় খাতিরে বাঙ্গলা ভাষা শিখিবে ও বাংলা ভাষা বলিবে। ইহাতে বাঙ্গলার সাহিত্যের ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার লাভ করিবে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ভাষায় বর্তমানে ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ১৩২৭সালে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বলিয়াছেন—“একদিন আমাদের বাঙ্গলা ভাষার শক্তি সংকীর্ণ ছিল, কারণ সে ভাষা কেবল ঘরের ভাষা, গ্রামের ভাষা ছিল। এই জন্ত সে ভাষা বিদ্যার ভাষা ছিল না। এই কারণে, যারা জড়চিত্ত তারা অবজ্ঞা করে বলেছিল, বাংলা চিরকাল প্রাকৃত সাধারণের ভাষা হবে, যারা নির্বিচারে ইংরাজি ভাষাকেই বিশিষ্ট সাধারণে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আজ আমাদের গৌরবের কথা এই যে সেই অবজ্ঞা বাঙ্গলা ভাষা স্বীকার করে নাই। বাঙ্গলা ভাষা বিদ্যার ভাষা, সাহিত্যের

ভাষা হয়ে উঠিল। “কেমন করে হল? আগনার ক্ষেত্র সমুচিত করে নয়। নিজের মইলকে প্রতিদিন বাড়িয়ে তুলে, আধুনিক কালের বিদ্যা ও ভাবকে দ্বারের বাহির থেকে বিনয়ী না করে। নিজের প্রাণশক্তি-বেগেই বিশ্ববিদ্যা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীনরিত নিজের সামঞ্জস্য সাধন করবে।” সেই নিমিত্ত বাঙ্গলীকে সমগ্র-বিশ্ব বাঙ্গলা ভাষার ঐশ্বর্য বিস্তরণ করতে হইবেই।

বাঙ্গলা ভাষা পৃথিবীর সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষা সমূহের মধ্যে সংখ্যা হিসাবে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে—হিন্দির উপরে। ভারতে বাঙ্গলা ৫৩৩,৬৪,৪৯৬ ব্যক্তির মাতৃভাষা। গ্রীষ্মার্দন সাহেবের মতে ভাষার সমগোষ্ঠির বে—তালিকা আছে তাহাতে যে গ্রুপে বাঙ্গলা আছে, ইষ্টার্ন গ্রুপে (উড়িয়া, মৈথিলী, বাঙ্গলা, আসাম, ইষ্টার্ন হিন্দি) মোট সংখ্যা ১০,২৪,৫৫,৪৫০, অথচ হিন্দি ও উর্দু মিলিত গ্রুপে ৯,৬২,৯৪,৯৫১—তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষার সংখ্যা হিসাবে অধিক। হিন্দি বাঙ্গলা হইতে বেশী লোকের মাতৃভাষা, ইহা ভুল ধারণা।

“নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার” সমিতির উদ্যোগে এপ্রিল মাসে কাশীর বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুল ও এঙ্গলো বেঙ্গলী কলেজে অ-বাঙ্গালীদের বাঙ্গলা ভাষা শিখাইবার ক্লাশ খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ক্লাশ খুলিবার সংবাদ যখন কাশীর সুপ্রতিষ্ঠিত দৈনিক “আজ” প্রতিকার প্রকাশ করিবার জন্ত অনুরোধ করি, তখন তাহার সম্পাদক মহাশয় কত আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা শুনিয়া বাঙ্গালী আমি খুশি হই। ‘আজ’ সানন্দে সেই দিবসই, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৪২, এই সংবাদ মুদ্রিত করিয়া আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন।

আজকাল প্রচার ও আত্মপ্রকাশের যুগ। সুপ্রাচীন আবিষ্কার হইবার পর হইতে মানবের পুস্তক পড়িবার সুযোগ ও সুবিধা অত্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশে পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িবার সুবিধা শিক্ষিত নরনারীর মধ্যে খুবই কম। একখানি ভাল বই প্রকাশিত হইলে তাহার ক্রেতার সংখ্যা তিন শতের বেশী হয় না। সে বইতে স্বতই জাতীয়, ধর্মের, বিজ্ঞানের, শিল্পের উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান নিবন্ধ থাকুক না কেন। সেইজন্য শিক্ষিত নরনারীর মধ্যে পুস্তক ক্রয় করিবার বা পাঠ করিবার অনুরাগ বৃদ্ধি করা এবং তদনুসারে জনমত গঠন হওয়া

প্রয়োজন। গ্রন্থাগারগুলিও ভাল ভাল মনোজ্ঞ পুস্তক ক্রয় করেন না। তাহাদের পাঠক ও পাঠিকার সংখ্যা বেশীর ভাগ উপন্যাস, গল্প, নাটক পড়িবার অনুরাগই অধিক দেখান। আমরা অধিকাংশ লোকে পুস্তক পাঠ করি অবসর বিনোদনের ও অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত। জ্ঞানার্জনের জন্ত নহে। পাশ্চাত্য দেশে এক একখানা পুস্তকের প্রথম সংস্করণ অন্ততঃ দশ হাজার সংখ্যা মুদ্রিত ও বিক্রীত হয় আর আমাদের বঙ্গদেশে পাঁচশত বা এক সহস্র অধিক পুস্তক মুদ্রিত করিতে প্রকাশকরা ভরসা পান না। এরূপে বঙ্গভাষার প্রসার হয়ই।

বর্তমান যুগে ভাষা প্রসারের অন্ততম বাহন বেতার যন্ত্র। কিন্তু অতীব দূরত্বের বিষয় এখানেও বাদ্যলীর ওঁদাসিত্য ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের অভাব; বঙ্গভাষা যথোপযুক্ত স্থান পাইতেছে না। উত্তর ভারতে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, ঢাকা ও লাহোর পাঁচটা বেতার কেন্দ্রে সুপরিচালিত হইতেছে। তাহার মধ্যে কলিকাতা ও ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বাদলা ভাষাতে হইয়া থাকে। এবং এই সব কেন্দ্রে ইংরাজি ব্যতীত হিন্দি, উর্দু এমন কি উড়িয়া ও আসামী ভাষায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে।

অথচ দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও লাহোর বেতার কেন্দ্রে বাদ্যলীর

কোন স্থান নাই, যদিও উত্তর ভারতে বঙ্গভাষাভাষী বহু লক্ষ নরনারী বাস করেন। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লীর বেতার যন্ত্রের লাইসেন্স হোল্ডারের সংখ্যা বহু রহিয়াছে। তাহাদের পরিবারের মেয়ে ও শিশুরা বেতার বার্তাকেই জন্মভূমির সহিত যোগাযোগ রাখিবার প্রধান উপায় মনে করেন। কিন্তু দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রে হইতে বাদলা ভাষায় সঙ্গীত ও বার্তা পরিবেশন না হওয়াতে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করেন।

এ সম্বন্ধে 'নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা' প্রসার সমিতির পক্ষে আজ বৎসরাবধি নূতন দিল্লীতে ভারত সরকারের প্রধান বেতার কর্মকর্তাদের (কন্ট্রোলার অব ব্রডকাস্টিং) সহিত পত্রব্যহার করিয়া কোন আশা ভরসা পাওয়া যায় নাই। বুঝা যায়, যদি জনসাধারণ তুমুল আন্দোলন করেন এবং লাইসেন্স হোল্ডাররা এই বিষয় তাহাদের অসুবিধা জ্ঞাত করান তাহা হইলে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ বেতার কেন্দ্রে কিছু কিছু বাংলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইতে পারে।

এ বিষয় বাদ্যলী সংবাদপত্র ও লাইসেন্স হোল্ডারগণের আন্দোলন ও চেষ্টার উপর বাদ্যলী ভাষা প্রসারের এ অমোঘ পহার প্রচলন নির্ভর করিতেছে।

পুস্তক পরিচয়

হৃদি উচ্ছ্বাস

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী; প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমুভায় চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩নং এলগিন রোড, এলাহাবাদ।
মূল্য—১।০

এই কবিতার বই খানিতে ৩২টা ছোট বড় কবিতা আছে। এক সময় বাদলা, কবিতা ও গানের দেশ ছিল। এখন কেহ ভেমন কবিতা ভাল লেখে না, লিখিলেও কেহ পড়ে না। কবিতা পাঠে সহজেই মন কবির ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। কবিতা স্মৃতি শক্তির বিকাশের এক প্রধান উপায়। বাদ্যলীর শিক্ষিত সমাজ কবিতার আদর করিলে মঙ্গল হইবে। আলোচ্য পুস্তকে কবিতা গুলির ভাষা ও ছন্দ সুসুললিত। জন্মভূমি, আলোকের সন্ধান, আবেগ ধারায়, দেবতার দান, ফুলের বিরহ, বন্দনা কবিতার ভাবগুলি চিত্রে শান্তি ও আনন্দ প্রদান করে। লেখিকার লেখা উত্তর উত্তর উন্নতি লাভ করুক।

অধিকা চরণ মজুমদার

একখানি জীবনী—শ্রীমুখেন্দ্র চন্দ্র গোস্বামী এম-এ প্রণীত। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী, ৭নং মুরলীধর সেন লেন কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০।

গত ষাট সত্তর বৎসর হইতে বাদ্যলীর রাজনৈতিক চেতনা

উদ্ভূত করিবার জন্ত সে সমস্ত মনীষীগণ কায়-মন-অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ফরিদপুরের অধিকা চরণ মজুমদার অন্যতম। আজ বাদ্যলীর এই অবনতি ও দুর্গতির সময় যে সব দেশনায়করা মফস্বলের সহরে প্রতিপত্তি ও প্রভাব দ্বারা বাদ্যলীর উন্নতি করিয়াছিল তাহাদের জীবন কথা অবগত হওয়াই একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে তাহারই অনেক সংবাদ দিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া অধিকাচরণ দেশের, দেশের ও রাজনৈতিক যে কর্মাবলী পর্যালোচনা করিয়াছিলেন তাহারই নিদর্শন এবং বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের অনেক সংবাদ এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

কালিদেহের ধনরত্ন

শ্রীমন্মেনারায়ণ চৌধুরী—প্রকাশক—বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—১।০ আনা।

ছেলেমেয়েদের জন্ত লিখিত এই বোমাঞ্চকর পুস্তকটি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। সহজ ভাষায় কাহিনীটিকে সুখপাঠ্য করিয়া যে মুন্সিরানার পরিচয় লেখক দিয়াছেন তাহা প্রশংসার। ছাপা ও ছবি চমৎকার। শিল্পী লক্ষ্মীবাবুর অঙ্কিত প্রচ্ছদপটখানি প্রশংসনীয় ছবি। ছেলেদের এ বই পড়া উচিত।

ফলদীপিকা

ত্রীগণপতি সরকার

(ষষ্ঠ অধ্যায়)

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশিপতির সহিত লগ্নপতি কেন্দ্রে বা অধিমিত্র গৃহে থাকিবে এবং কোনও বলবান্ গ্রহ লগ্নকে দেখিলে “পুঙ্কল” যোগ হয়। (সুত্রক্ষণা শাস্ত্রীর মতে রাশিপতি ও লগ্নপতি একত্রে কেন্দ্রে বা অধিমিত্র গৃহে থাকিয়া উহাদের মধ্যে কেহ লগ্নকে দেখিবে এবং একটি বলবান্ গ্রহ লগ্নে থাকিবে, তবে পুঙ্কল যোগ হইবে)। ১৫। (১৯)।

বস্তুমান্ যোগে জাতক সর্বদা স্বগৃহেবাসী এবং প্রচুর জব্য যুক্ত।

অমল যোগে পৃথিবীপতি, ধনী, পুত্রবান্, যশস্বী ও সম্পদ যুক্ত এবং নীতিমান্ হয়।

পুঙ্কল যোগে—শ্রীমান্, শ্রেষ্ঠ রাজ দ্বারা সম্মানিত, বিখ্যাত, সূক্ষ্মর বস্ত্রভরণ ভূষিত, সূক্ষ্মর বাক্যবিত্তাসপট্, সর্বোত্তম এবং প্রভু হয়। ১৬। (২০)।

সমস্ত গ্রহ পাঁচটি গৃহে পরপর থাকিলে কিংবা ৬টি গৃহে পরপর থাকিলে কিংবা ৭টি গৃহে পরপর থাকিলে যে যোগ হয় তাহার নাম শুভমালা। কিন্তু ষষ্ঠ ৮ম বা ১২শ গৃহ হইতে ৫, ৬ বা ৭টি গৃহে সমস্ত গ্রহ পরপর থাকিলে অশুভমালা যোগ হয়। (সুত্রক্ষণা শাস্ত্রী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—সমস্ত গ্রহ ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গৃহে থাকিলে শুভমালা; আর ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১২ শে সমস্ত শুভগ্রহ থাকিলে অশুভমালা। এখানে বক্তব্য এই যে ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭মে এই তিনগৃহে গ্রহ থাকিলে মালার মালার আকার হয় বটে কিন্তু ৬ষ্ঠ, অষ্টম ও ১২শে গ্রহ থাকিলে মাঝে মাঝে ফাঁক পড়াতে আদৌ মালার আকার হয় না। সুতরাং মনে হয় তিনি চিন্তা না করিয়াই এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন)।

নবম পতি এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে বা উচ্চক্ষেত্রে থাকিয়া কেন্দ্র বা কোণস্থ হইলে লক্ষ্মী যোগ হয়।

চন্দ্র স্বক্ষেত্র বা উচ্চস্থ হইয়া কেন্দ্র বা কোণ গত থাকিয়া বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে গৌরী যোগ হয়। ১৭। (২১)।

শুভমালা যোগফল—জনাদিকারী, রাজা কর্তৃক প্রশংসিত, ভোগী, দাতা, অপরের কার্যকারী, বন্ধুপ্রিয়, উত্তম পুত্র ও স্ত্রীযুক্ত এবং ধীর। ১৮। (২২)।

অশুভমালা যোগফল—কুপথগামী, দুঃখী, পরবধকারী, কৃতঘ্ন, কাতর, ব্রাহ্মণে ভক্তিহীন, লোকের অভিশাপগ্রস্ত, এবং কলহ প্রিয় হয়। ১৯। (২৩)।

লক্ষ্মী যোগফল—মঙ্গল স্বভাব বনিতার সহিত সর্বদা ক্রীড়াশীল, অরোগী, ধনী, ভেজস্বী, স্বজনপালক, মহালক্ষ্মী-প্রসাদযুক্ত, শ্রেষ্ঠ যান অশ্ব ও হস্তীযুক্ত, লোকের আনন্দকারী, মহীপতি শ্রেষ্ঠ ও দাতা। ২০। (২৪)।

গৌরী যোগফল—সুন্দর শরীর, বংশশ্রেষ্ঠকর্তা, রাজমিত্র, গুণবান্ পুত্রযুক্ত, পদ্মযুগ্ম এবং তাহার জয় সকলের দ্বারা প্রশংসিত। ২১। (২৫)।

শুক্র, বৃহস্পতি ও বৃষ কেন্দ্র ত্রিকোণ সহিত দ্বিতীয়ে থাকিবে এবং বীর্ঘবান্ বৃহস্পতি স্বগৃহে, উচ্চগৃহে বা মিত্র গৃহে থাকিবে, তাহাতে সরস্বতী যোগ হয়। ২২। (২৬)।

সরস্বতী যোগফল—ধীমান্ নাটক, গদ্য, পদ্য, গণনা এবং অলঙ্কার শাস্ত্র নিপুণ; কবিতা, প্রবন্ধ রচনা এবং শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে অতি নিপুণ; ত্রিভুবনে বিখ্যাত, অতি ধনী, স্ত্রীপুত্র পরিবৃত্ত, রাজমান্য এবং ভাগ্যবান্। ২৩। (২৭)।

লগ্নপতি, রবি ও শনি, কেন্দ্র বা ত্রিকোণ গত হইয়া উচ্চ গৃহ, স্বক্ষেত্র বা সূক্ষ্ম গৃহগত হইলে ত্রীকণ্ঠ যোগ হয়।

শুক্র, নবম পতি এবং বৃষ পূর্বোক্ত রূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে ত্রীনাথ যোগ হয়।

বৃহস্পতি, পঞ্চমপতি ও শনি উক্তরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে বিরিঞ্চি যোগ হয়। ২৪। (২৮)।

শ্রীকৃষ্ণ যোগফল—কুশাঙ্গ মালাধারী, বিভূতি মাখিয়া ধবল শরীর, মহাত্মা, সর্বদা হৃদয়ে শিবধ্যানকারী, সুনিয়ম, শৈব, সাধুদিগের উপকারী, পরমত দেব শূন্য, তেজস্বী এবং শিব পূজায় আনন্দিত। ২৫। (২২)।

শ্রীনাথ যোগফল—লক্ষ্মীমান, সরস চাটুবাঁকা কখন নিপুণ, নারায়ণ নামের ছাপ সর্বদা ভূষিত, স্বজনবর্গের সহিত নারায়ণের নামের মনোহর পদাবলী সঙ্গীভূত নিপুণ, নারায়ণ-ভক্তগণের পূজায় প্রসন্ন বদন, সংপূজাদায়ক, সকলের নমনে প্রিয় এবং অতি সুন্দর বা বিনয়ী। ২৬। (৩০)।

বিরিকি যোগফল—ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ, বিশেষ বুদ্ধিমান, বেদকেই প্রধানরূপে মান্যকারী, গুণী, হৃষ্ট, বৈদিকমার্গ হইতে বিচলিত হ'ন না, বিখ্যাত বহু শিষ্যবৃত্ত, মিষ্টভাষী, বহুদন, স্ত্রীতনয়বৃত্ত, ব্রহ্মভোজোদ্ভাসিত, দীর্ঘায়ু, জিতেজিয় এবং রাজবন্দিত। ২৭। (৩১)।

লগ্নপতি হইতে দ্বাদশপতিকে লইয়া এই ১২টি অধিপতির পরস্পর ক্ষেত্র পরিবর্তনে ৬৬টি যোগ হয়। তন্মধ্যে ৬ষ্ঠ, ৮ম এবং ১২শ পতিকে লইয়া যে ৩০টি যোগ হয় তাহাকে দৈন্য যোগ বলে। আর ৩য় পতির সহিত যে ৮টি যোগ হয় তাহাকে “শ্রীল” যোগ কহে।

অবশিষ্ট যে ২৮টি যোগ থাকে তাহার নাম মহাযোগ। ২৮। (৩২)।

দৈন্যযোগফল—মূর্থ, অপবাদকারী, পাপকাঁচাকারী, সর্বদাই শত্রু দ্বারা পীড়িত, ক্রুরভাষী, অস্থিরমতি ও কার্যের উদ্যম স্থিতিশীল হয় না।

খলযোগ ফল—দ্রবৃত্ত, কদাচিৎ বিশেষভাগ লাভ ও বিশেষ মিষ্টভাষী, কদাচিৎ অতি হুমুখ, এবং কদাচিৎ দরিদ্র ও দুঃখাদি লাভ হয়। ২৯। (৩৩)।

মহাযোগফল—লক্ষ্মীমান, প্রভু, ধনী, বহুবিধ বস্ত্র ও কনকভরণবৃত্ত, রাজা হইতে বহুমান প্রাপ্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত, বান, ধন ও পুত্রবৃত্ত। ৩০। (৩৪)।

“লগ্নাধিপাত্ত ভপতিস্থিত রাশিনাথঃ” অর্থাৎ লগ্নপতির সপ্তমপতি যে রাশিতে আছে সেই রাশিপতি (পাঠান্তর লগ্নাধিপ্ত পাত্তভপতি স্থিতরাশিনাথঃ অর্থাৎ লগ্নপতি যে রাশিতে আছেন সেই রাশিপতি যে রাশিতে অবস্থিত সেই রাশিনাথ) যদি উক্ত গৃহ বা স্বগৃহে থাকিয়া কেন্দ্র বা কোণগত হয় তাহা হইলে কাহিল যোগ হয়।

লগ্নপতি যে রাশিতে আছে সেই রাশিপতি এক্রণ অর্থাৎ ষোড়শ বা স্বগৃহস্থ হইয়া কেন্দ্র বা কোণস্থ হইলে পর্বত নামক যোগ হয়। ৩১। (৩৫)।

কাহিল যোগফল—বর্ধিষু, আর্ধ্য, সুমতি, প্রসন্ন, ক্ষেমকর এবং মহুয়গণ কর্তৃক মানপ্রাপ্ত বা লোকমাত্ত।

পর্বত যোগফল—স্থির অর্থ স্বথ, স্থির কার্যকারী, এবং ক্ষিতীশ্বর। ৩২। (৩৬)।

নবম দশমপতি দ্বয় শ্রেষ্ঠভাবে থাকিয়া একত্র থাকিলে রাজযোগ হয়। কেন্দ্রকোণপতিদ্বয় শ্রেষ্ঠভাবেগত হইয়া একত্রিত থাকিলে “শ্রীল” যোগ হয়। ৩৩। (৩৭)।

রাজযোগফল—ভেরী ও শঙ্খনিবাদ মুখরিত, কোমল বস্ত্র নিষ্পিত রাজছত্র পরিশোভিত, হস্তী অথ আশ্বোজিক প্রভৃতিবৃত্ত, স্ত্রীপাঠক কর্তৃক প্রশংসিত, মানারূপ উপহার সমূহে কম্পিত হস্ত সজ্জনবৃন্দদ্বারা প্রার্থিত, ভূমিপাল।

শঙ্খযোগফল—বহু সুন্দর বনিতা-ভোগ সম্পত্তিবৃত্ত রাজা। ৩৪। (৩৮)।

সংখ্যায়োগ সাভটি যথা—বহুকী (বা বীণা), দাম, পাশ, কেদার, শূল, যুগ ও গোল। ৭টি রাশিতে ৭টি গ্রহ থাকিলে “বহুকী”, ৬টি রাশিতে ৭টি গ্রহ থাকিলে “দাম”, ৫টি রাশিতে ৭টি গ্রহ থাকিলে “পাশ”, ৪টিতে ৭টি গ্রহ থাকিলে “কেদার”, ৩টিতে ৭টি থাকিলে, “শূল”, ২টিতে ৭টি থাকিলে “যুগ”; ১ বরে ৭টি গ্রহ থাকিলে “গোল” যোগ হয়।

মহিলা-সমাচার

ত্রিযোতিষ চন্দ্র বোষ

কৃতি মুসলমান রমণী ভাস্কর—

বর্তমান বর্ষে মেডিক্যাল কলেজ হইতে আনোয়ারা খাতুন সন্মানের সহিত এম. বি. পাশ করিয়াছেন। তিনি দিনাজপুরের এক মুসলমানবংশের কন্যা। তাঁহার ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে দিনাজপুরের নারী-সমাজ উপকৃত হইবে।

মহিলা খাদ্য পরিদর্শিকা—মিসেস এফ. এস. ক্যালে বি-এ (বোম্বাই) এ আর এস আই (লন্ডন) এফ এ পি এস (নিউইয়র্ক) ডি এচ এম (সুইজারল্যান্ড) বরদা রাজ্যে খাদ্য পরিদর্শক কর্মচারী (ফুড সার্ভে অফিসার) নিযুক্ত আছেন। এই মহারাষ্ট্রীয় রমণী কেবল যে বিদ্যুৎ তাহা নয়, সুন্দরী ও সৌন্দর্যের উপাসক। প্যারিসের সৌন্দর্য উৎসবের কলা বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম ভারত মহিলা এই বিদ্যা অর্জন করেন।

প্রথম মুসলিম মহিলা বিমান পোত চালক লাহোর নিবাসিনী মিসেস ইমিতাজ আলি ভারতে প্রথম মুসলমান মহিলা বিমান পোত চালনা করিবার যোগ্যপাত্র পান। তিনি এক্ষণে একজন সুন্দর বিমান পোত চালক হইয়াছেন। সম্প্রতি রয়েল এয়ার ফোর্সে যোগদান করিয়াছেন।

বিদ্যুৎ বজ্রবালা—মিস নীলিমা মুখার্জি বর্তমান মহাযজ্ঞের পূর্বে যুরোপের নানাদেশ বিশেষতঃ ফরাসী-মুল্লুক, জার্মেনী ও সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করিয়া নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। জার্মানীর এক ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয়ে দুইবৎসর থাকিয়া নানা শিল্পকলার উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তিনি পাটনার বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপ্যাল) আশুতোষ মুখার্জির কন্যা।

মহিলা এক, আর, সি, এস—

ডাঃ মিস সুভদ্রা বাই গোমালীয়া এম. বি. বি. এস. সম্প্রতি

এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক, আর, সি, এস উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যেও একজন এক, আর, সি, এস আছেন।

তিরোধান তিথি—শেষঘর

হিন্দু তিথি ধরিয়া সব কর্ম করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা অমুরাগীগণই আগষ্ট তারিখ ধরিয়া সভা সমিতি করিয়া রবীন্দ্র নাথের তিরোধানের প্রথম বার্ষিক উৎসব দেশময় করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের তিরোধান তিথি শ্রাবণের রাখী পূর্ণিমার দিন।

সেই পবিত্র তিথিতে শ্রীমতী হেমলতা দেবী কবির শেষ শয়ন ঘরে, শেষ শয্যাপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথের পারলৌকিক আত্মার কল্যাণে স্মৃতিতর্পণ ও শ্রদ্ধাজলির ব্যবস্থা করিয়া অতি সমীচীন অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

রাখী পূর্ণিমার প্রাতে ৮টার সময় শেষ-ঘরটা ধূপ, ধূনা, চন্দন পুষ্প-গন্ধে পরিপূর্ণ হইল। সুনিপুন ভাবে পুষ্প মাল্যে শেষ শয্যা ও ঘরটি সজ্জিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করে।

শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র বড়ালের সুসিষ্ট কণ্ঠে ও সুললিত স্বরে উদ্বোধন, ‘শান্তি পরাবার’ ‘শেষ প্রণাম’ সঙ্গীত গীত হইয়া উৎসব কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মাননীয়া হেমলতা দেবী তাঁহার পিতৃ-স্বস্তর মহাশয়ের আত্মার কল্যাণে শ্রাদ্ধ মন্ত্র পাঠ করেন এবং কবির নিজের রচিত ‘শান্তি নিকেতন’ পুস্তক হইতে পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশ সাংখ্যাতীর্থ মহাশয় উপসনা করিয়া বিশ্বকবি আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করেন।

উৎসবে লেডী অবলা বহু আদি মহিলাগণ যোগদান করেন। হিন্দু শাস্ত্র প্রথানুযায়ী মিষ্টান্ন বিতরণও হইয়াছিল। উৎসবটি পবিত্র-পুণ্যানুষ্ঠানের সহিত সমাপ্ত হয়।

সকলক্ষী

স্বর্গীয় গুরুমদয় দত্ত মহাশয় সংগৃহীত



পট্টয়ার অঙ্কিত চিত্র



মুৎশিল্লীর গঠিত পাত্র

সাদা দাঁও সাদা দাঁও হে গুপ্ত অমৃত
প্রত্যক্ষ চেতনলোকে স্ফুটনর ইও,
মিলনের মহাভূমি কর অনাবৃত
সবার অন্তর হতে একই কথা কও ।

বঙ্গলক্ষ্মী

১৭শ বর্ষ,

আশ্বিন, ১৩৪৯

১১শ সংখ্যা

পূজা সংখ্যা

যুগান্তর

যুগান্তর ষটিছে কালের —

মসীলেখা মুছি যাবে বিকৃত ভালের,

পড়িয়া ঘুচিয়া যাবে পতনের শঙ্কা

মরিয়া বাঁচিয়া যাবে সোনার এ লক্ষ্য ।

খাদি সোনা খুঁটি কাল ফেলিবে সাগরে,

মাটি হতে খাচি সোনা তুলিবে সাদরে ;

বাছাই করিয়া লবে আসল নকল

যাচাই করিবে তারে সোনা কি পিতল ;

অকারণে জমিয়াছে যত আবর্জনা

অগ্নিমুখে ফেলি' দিবে করিয়া মার্জনা ।

শূন্যপথে আসে কাল অগ্নিময় পক্ষ

ধ্বংস করি চলি যায় অদৃশ্যে—অলক্ষ্য ।

ছুঁই ছুঁই, ধরি ধরি, গণি গণি ক্ষণ,

মুহূর্ত্তে গেল সে চলি সহস্র যোজন ;—

মৃত্তিকায় রহি গেল চিহ্নটুকু তার

কাল-পদধ্বনি সেথা শুনি বারম্বার ।

হে রথ ! হে মহাপথ ! জুড়ি হুই পাণি

ক্ষণিক দাঁড়াও—শুনি যুগান্তর বাণী ।

পশ্চিমের গ্রাম

শ্রীমতী দেবী

বাইশ তেইশ বৎসর আগে এলাহাবাদের কাছাকাছি একটি অখ্যাত পাড়া গাঁয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলাম। দিন-গুলির স্মৃতি এখনও আনন্দ দেয়। ধরা যাক, গ্রামটির নাম গোবিন্দপুর। এলাহাবাদ থেকে ট্রেনেও যাওয়া যায়, আবার গাড়ী কি একটা চড়ে গঙ্গার উপরের ব্রীজ পার হয়ে সোজাও চলে যাওয়া যায়।

প্রথম যে দিন গেলাম, গাড়ীতেই গিয়েছিলাম। বিকাল বেলা পশ্চিমের প্রচণ্ড গরমে তখনও মন্দা পড়েনি, রোদও বেশ প্রখর। যখন গ্রামটিতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন শরীর বড় ক্লান্ত, মাথাও ধরে উঠেছে। সারাপথ কেমন করে যে এসেছি তা নিজেই যেন জানিনা। চোখের সামনে দেখলাম, ছোট একটা বাংলা একটু যেন বেমেসামত অবস্থায়। যা হোক, থাকবার অস্থিবিধা নেই, চৌকিদার এসে বাড়ীর তালা খুলে দিল। ভিতরে ধুলো যথেষ্ট, তবে আর কোনো নোংরা নেই। আসবাবের মধ্যে দড়ির খাট অনেকগুলি রয়েছে। দুই ভগিনীতে ঘর দোর ঝাড়া মোছা হবার আগেই খাটে শুয়ে খানিক শ্রান্তি লাঘবের চেষ্টা করা গেল। মা-বাবা সংসার-পথের পুরনো যাত্রী, অত সহজে ক্লান্ত হন না। তাঁরা লোক জন ডাকিয়ে জিনিষ পত্র ঘরে তোলা, ঘর পরিষ্কার করান, রান্নার জোগাড় করা প্রভৃতি কাজে মন দিলেন। অর্দ্ধঘুমন্ত অবস্থায় কানে আসতে লাগল একটা বিচিত্র কলরব।

বেশ খানিকক্ষণ পরে চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম। দিনের আলো তখন নিতে আসবার জোগাড় করেছে; ঘরের ভিতরটা ছায়াচ্ছন্ন, উঠে বসলাম, দিদি তখনও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছেন। আর কেউ কোথাও নেই। বাইরে বেরিয়ে এলাম সকলের সন্ধানে। মা দেখলাম রান্নাবান্নার আয়োজন করছেন, বাবা বাগানে বেড়াচ্ছেন ব—বাবুর সঙ্গে। আমিও বাগানেই নেমে গেলাম এবং এতক্ষণ পরে চেয়ে দেখলাম, যে-জায়গায় এসে উঠলাম সেটা কি প্রকার। সূর্য্য তখন একেবারে অন্ত যাবার

মুখে। বাংলাটা পঞ্চাশ বাট বিঘা বিস্তৃত বাগান এবং ক্ষেতের মধ্যে। সামনে মস্ত এক রাস্তা, গাড়ী মোটর সবই চলে তবে ধুলো ওড়ে প্রচণ্ড রকম। নাম সেটির ফয়জাবাদ রোড। ছোট একটা গেট দিয়ে বাগানে ঢুকতে হয়। যাদের বাড়ী তাঁরা জায়গাটাকে বাগান বলেন কাজেই আমিও তাই বলছি, নইলে এটাকে ফুলের বাগান এবং গাছের Chaos বললেই ঠিক বর্ণনা দেওয়া হয়। গেটের দুধার দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেওয়ালের পরিবর্তে চলে গিয়েছে দুই সারি ঝাঁকড়া ফুল গাছ। কি যে তার নাম তা জানিনা; ফুলের রং হালকা বেগুনি, গাছগুলো ঝাড় করা মস্ত বড় বড়, এমন তাদের ঘন সন্নিবেশ যে পাচিলের কাজ তারা স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করতে পারে। ফুলগুলোর আকৃতি কল্কের মত। চারিদিকে ফুল ছুড়াছড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছে। বাগানটার এককালে Plain বলে কিছু হয়ত ছিল; এখন প্রকৃতির গাণী স্রবিশেষে গেয়ে তাঁর শ্যামল অঞ্চল সব কিছুর উপর এমন ভাবে পেতে দিয়েছেন যে মানুষের হাতের চিহ্ন প্রায় অবলুপ্ত। কামিনী, সন্ধ্যামালতী, রজনীগন্ধা এ ওর ঘাড়ে পড়েছে; বিলিতি ফুল দিশী ফুলের থোকার থোকার ভট পাকিয়ে যাচ্ছে। গোলাপবালা বড় আদরের আদরিনী, অভিমানে ভরপুর। অযত্ন অবহেলা, এদের সযত্ন, অনেক জায়গায়ই ফুলগুলি ঝরে পড়েছে। তবে এমন উজ্জল প্রাণের ফোয়ারা সহজে শুকোয়না, তাই মাঝে মাঝে তাদের রঙীন হাসি সাদা ফুলের মাঝে মাজে উকি দিচ্ছে। মস্ত মস্ত বক ফুলের গাছ এখার ওখার অনেকগুলো, বকের পালকের মত শাদা ফুলের সুপে গাছের তলাগুলো সব ছেয়ে রয়েছে। একদিকে একটা জবাফুলের avenue, একটা রাস্তার দুধার দিয়ে জবাগাছের পুষ্পিত ডালপালা মাথার উপর এসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। লালফুল আর সবুজ পাতার আলিঙ্গনে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে চমৎকার একটি নিভৃত কুঞ্জ। এটি অনেকদূর ধরে চলে গিয়েছে, মানুষ একবার এর ভিতরে ঢুকে পড়লে

বাইরে থেকে তাকে আর দেখবার জো নেই। এমন
সুন্দর সে জায়গাটা।

বাংলার সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোজা তাকালে
চোখে পড়ে ফরজাবাদ রোড। তারপর রাস্তা পার হয়ে মস্ত
এক জুররীর ক্ষেত, তার প্রান্তদেশে 'হু' একটা খোলার ঘরের
চাল। গঙ্গার একটা ধারা বর্ষাকালে বেশী উৎসাহ দেখিয়ে
এগিয়ে এসে, তারপর গ্রীষ্মে আর মাতৃকোড়ে ফিরে যাবার পথ
পায়নি। এই জুহু মনের নানীটির শুভ্র স্বচ্ছ জলধারা ক্ষেতের
পরপারে বিকম্বিক করে। এইটার পরে মস্ত এক বালির চর,
তাতে গাছপালা গজিয়ে উঠেছে, তবে বর্ষার বোধহয় ডুবে যায়।
তারপর আসল গঙ্গার স্রোত। গঙ্গার ওপারে এলাহাবাদ
সহরের দু'চারটে বড় বড় tower, মন্দিরের চূড়া এবং গম্বুজ
নীল আকাশের গায়ে ছায়াছবির মত আঁকা।

বারান্দার ডাইনে সেই জবাকুঞ্জই চোখ আটকে যায়,
তারপরে আছে ক্ষেত ধামার অনেক কিছু। একপাশে
প্রাচীনকালের নীলকরসাহেবদের দু'চারটে স্মরণচিহ্ন এবং গোটা
কয়েক কুঁয়া এবং খোলার ঘর। এইখানেই চৌকিদার প্রভুতি
চাকরবাকরের দল আস্তানা পেতেছে। এরও পরে নাকি
পেয়ারা বাগান আছে, চোখে দেখিনি।

বাদিকে বরা এবং তাজা ফুলের মেলা, তারপরে
বস্তুতান্ত্রিকদের নয়নরঞ্জন তরকারি এবং শস্তের ক্ষেত। তারপর
ধু ধু করছে মাঠ, তাতে খাপচাড়া ভাবে ওখানে এখানে
গোটা কয়েক গাছ।

বাড়ীটা পুরনো, কিন্তু বাসযোগ্য। আসবাসপত্র বিশেষ
নেই, তবে শোবার খাট আছে। কার স্থিতিচিহ্নস্বরূপ জানিনা,
ঘরের ভিতর একটা ছেঁড়া লেশের পরদা ঝুলছে। চেয়ার
টেবিল কয়েকটা আছে।

ব—বারু বাড়ী ফিরলেন। এর পর বাকি রইল কেবল
আহার এবং নিদ্রা। অর্গত্যা তাইতেই মনোনিবেশ করা
গেল।

গোবিন্দপুরে পরদিন প্রথম যখন রাতভোর হল তখন
চারিদিকে তাকিয়ে মনটা যেন দমে গেল। বড় নির্জন,
চারিদিকে যেন খাঁ খাঁ করছে; জনমানবের চিহ্ন নেই। ইট
কাঠের পিঞ্জরে বাস করা মনটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, বন্ধন-

মুক্তিতে আরামের চেয়ে অসোয়াস্তিটাই ঘটে বেশী। যাক,
একটু পরেই সে-ভাবটা কেটে গেল।

তারপর কয়েকটা দিন কাটল মন্দ নয়। কাজকর্ম ছিলনা,
চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও যে প্রচুর ছিল তা মোটেই বলা যায়না,
অথচ এমনি স্থানমাহাত্ম্য যে dull লাগবার অবকাশ হয়নি।
সকাল বেলাটা বাগানে ঘুরঘুর করে ফুলগুলির সঙ্গে পরিচয়
করে বেড়াভ্রাম, তারপর কয়েকটা-ঘণ্টা নাওয়া খাওয়া এবং
তদনুসঙ্গিক আয়োজনই কেটে যেত। ছপুর্বে রোদ
এমন প্রখর যে বাইরে বেরনোর উপায় নেই, তাই সে সময়টা
ঘরে বদ্ধ হয়েই কাটাতে হত। বই সঙ্গে ছিল কতকগুলি,
সাহিত্যচর্চা আর নিদ্রাচর্চা করে সময়টা কাটিয়ে দিতাম।
দিদি ছাড়া মানুষ-সঙ্গী আর একটাও ছিল না। ওখানে মানুষ
ছিলই বা ক'জন যে সঙ্গদান করতে আসবে? ব—বারুদের
সর্দার ভৃত্য ও ভরত এবং গোটাকয়েক কাহার চাকর আর
তাদের কাহারীন পত্নীশুল্লি এবং কয়েকজন চাষী। ভরত
মধ্যে মধ্যে মায়ের রান্নাঘরের সীমান্তদেশে বসে নিজের বাড়ীর
লুপ্ত ক্ষাত্রমহিমার গল্প করত; কাহারীন ছোটর কাজ ছিল
যতরকম অকাজ করে মায়ের কাছে বকুনি খাওয়া এবং মাকে
তার স্নেহ এবং স্বকেশ সম্বন্ধে compliment দেওয়া।
মাঝে মাঝে তাঁকে সঙ্গে করে গঙ্গাস্নান করতে নিয়েও যেত।
আমাদের দুইবোনের সঙ্গে এদের কারই বিশেষ কোনো সম্পর্ক
ছিলনা।

বিকেলবেলা একটু বেড়াতে যাওয়া যেত। এমন স্থানেই
এসেছিলাম যে বেড়াবার সময়েও একটু প্রসাধনের দরকার
হত না। এমন অদ্ভুত বেশে এক একদিন বেরতাম যে এখন
মনে করলেই হাসি পায়। বেড়াবার জায়গা ছিল ঐ একটাই,
ফরজাবাদ রোড—রাস্তাটির সব ভাল, শুধু তিনি ধুলিসম্পদে
বড়ই ঐশ্বর্যশালী। দু'ধার দিয়ে গাছের সার, শিশু গাছ, আর
অশখগাছ, আর তার পরেই ক্ষেত, হয় জুররীর নয় বাজুবর।
খোলার ঘরের আধিক্য নেই, মাঝে মাঝে দু'চারখানা দেখা
যায়। দৃষ্টির বাধা জন্মাবার মত বিশেষ কিছু কোনোদিকে
নেই। গাছগুলো এখানকার ভারি সুন্দর, দেখলে চোখ
জুড়ায়। ঠেলাঠেলি, মারামারি নেই, যে যতখানি জায়গা,
আলো, বাতাস চায় তা পেয়েছে, কোনোদিকে তাদের বাড
চাপা পড়েনি। গাছের মাথাগুলো এমন সুগোল আর

স্ট্রডোল যেন কেউ যত্ন করে মাপ নিয়ে গড়েছে ; পাতার ভারে একটিও ডাল দেখা যায় না। রাস্তা দিয়ে একা আর গরুর গাড়ী অনবরত চলেছে আর অরোহিণী বিশ্বয় বিস্মারিত নেত্রে এই অদৃষ্টপূর্ব মানুষগুলিকে দেখছে। রামলীলা ফেরৎ গোটাকতক হাতী ও একদিন এই পথে দেখা গেল। মধ্যে মধ্যে ধূলিধ্বজার প্রচণ্ড আক্ষালন সহকারে এক একটা মোটরকার চলে যেত। সেগুলির তিরোধানের প্রায় আধঘণ্টা পরে অবধি রাস্তার দিকে আর চাইবার যো থাকত না। মাইল ষ্টোনের হিসাব দেখে দেখে বেভাতাম, প্রায়ই দেখতাম মাইল দেড় দুই হচ্ছে। তারপর ফিরে এসে খোলা জাল ঘেরা বারান্দায় মা রাস্তা চড়াতে, সেই ধানেই বসে আমরা গল্প করতাম। কাঠের আঙনের ছায়াপাতে মাইল দেরালটা বেশ আলো-ছায়ার লীলায় ভরে উঠে। তখন শুক্ল পক্ষ ছিল, বাগানে ঝাঁদের আলোর শ্রোত বয়ে যেত।

একদিন সেই শাখা নদীতে মা আর দিদি গেলেন স্নান করতে, আমি গেলাম দেখতে। জল খুব কম, বসে না পড়লে

মাথা ভেজেনা ; চারিদিক খোলা ত বটেই, তার উপর একপাল কোঁতুলী রাখাল-শিশুর আবির্ভাবে স্নান করা ব্যাপারটা খুব যে সুবিধাজনক হ'ল তা নয়, বিশেষ করে দিদির পক্ষে। মা এবং তাঁর কাহারীন পরিচারিকা নিষিদ্ধান্ন করে নিলেন। আমি তীরে বসেই রইলাম, জলে নামতে ভরসা হল না।

গঙ্গাহ্রিতার কাছে যাবার পথটি বেশ দেখতে, তবে চলবার পক্ষে তত সুগম নয়। হ্রদারে বাবা'গাছে সোনালী ফুল দেখে মনে বেশ কবিত্বের উদয় হল বটে, কিন্তু পায়ে বাবা'কাঁটার কঠিন পরিচয় সে-ঘোরটা তখন কাঁটিয়ে দিল। জায়গাটা সমতল নয়, মাঝে মাঝে মত্ত বড় বড় চিপা আবার তার পাশেই গভীর গর্ত। একটা চিপির পাশে স্থান করে খোলার ঘর, গুটি দুই তিন নিমগাছ, তার ছায়ায় গরু বাছুর বাধা, বেশ একটি পল্লীচিত্রের মত। হ্রদারটি মেয়েমানুষ ছেলেপিলেও এখার ওখার দেখা যায়।

কদিন থেকেই এখানকার বাস উঠল। ব—বাবুদের নিয়ন্ত্রনে আবার এলাহাবাদে ফিরে চলেলাম।

পূজা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ফোটার পুলক স্রবাস রবার ব্যথা,
ফুল চায় তার ফোটার সার্থকতা।
সে খোঁজেনা কোথা আছে মুক্তির চাবি,
কেবল পূজার অধিকার করে দাবী,
দেবতা তাহার যেথা আছে যায় তথা।

রূপ ত পূজার মধ্যস্থতা কত বোঝে—
খুপ অনলের সঙ্গ যেমন খোঁজে।

রঙ চায় শুধু তুলির পরশ তাই,
ছেনীর আঘাত সরস পাশাপটাই,
রেবা মর্ষর শিলাতলে অবনত।

সাধনা চলিছে শুধু সিদ্ধির লাগি,
পূজারী যে, সেই রসিক ও অল্পরাগী।
তপস্যা করে নির্জনে ভগীরথ,
স্বপ্নমুখী খুঁজে অবতরণের পথ,
ভাবকে সদাই সন্ধান করে কথা।

সম্পাদিকার জল্পনা

সত্ৰাট-জননীৰ পুত্ৰ শোক

পুত্ৰশোকৰ আঘাত জননীৰ পক্ষে কি নিদাৰুণ যাঁৱ পুত্ৰ-বিয়োগ ঘটছে তিনিই তা জানেন। কেটেৰ ডিউকেৰ অকাল মৃত্যুতে সত্ৰাট জননী এই বয়সে যে শোক পেলেন, আমৰা ব্যথিত হৃদয়ে তাঁৰ সেই শোকে আন্তৰিক সমবেদনা জানাচ্ছি। পুত্ৰ শোক সহ কৰা সহজ নয়।

তবে যে বাঁৱ পুত্ৰ স্বদেশ ৰক্ষাৰ কাজে প্ৰাণ বিসৰ্জন কৰেন, তাঁৰ গৌৰবময় মৃত্যু জননীৰ সন্তপ্ত প্ৰাণে অনেকখানি সাম্বনাৰ প্ৰলেপ এনে দেখ। সহস্ৰ সহস্ৰ জননী আজ সন্তানহারা। ভগবান—যিনি সব কিছুৰ শেষ পৰিণাম, সন্তানহারা সকল জননীৰ শোকে তিনি সাম্বনা দিন—এই প্ৰাৰ্থনা।

মহাত্মা হীৰেন্দ্ৰনাথ

বাংলাৰ কোলৰ সন্তান হীৰেন্দ্ৰনাথ বাংলা ছেড়ে নতুন লোকে যাত্ৰা কৰেছেন। বাংলাৰ কোল আজ শূন্য। বাংলাৰ সংস্কৃতি তাঁৰ মধ্যে যেমন উজ্জ্বল মূৰ্ত্তি পৰিগ্ৰহ কৰেছিল তেমনটি আজকাল দেখা চুলি। বহুজনে বহুপ্ৰকাৰে এই মনীষী সন্তানৰ পৰিচয় দেবেন, জানি, আমৰা সামান্য একটা ঘটনাত্তে তাঁৰ অন্তৰেৰ যে গভীৰ স্নেহৰ পৰিচয় পেয়েছি, এখানে সেইটুকু উল্লেখ কৰে তাঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা না জানিয়ে পাৰলুম না।

মাত্ৰ কয়েক বৎসৰ পূৰ্বে—পূজাপাদ ৰবীন্দ্ৰনাথ বথন পুৰী গিয়ে সেখানকায় 'সারকিট হাউসে' বাস কৰছিলেন, হীৰেন্দ্ৰনাথ সে-সময় পুৰী যান। ৰবীন্দ্ৰনাথৰ সঙ্গে সাক্ষাৎ কৰতে গিয়ে আমাৰ সঙ্গে তাঁৰ 'সারকিট হাউসে' দেখা হয়। বলেন, আমি বিশ্বাস্তম দেখতে যাব, এখান থেকে কত দূৰ! বহুদূৰ, দূৰ আছে একটু, তবে গাড়ীতে গেলে আপনাৰ যেতে কষ্ট হবে না।

পয়দিন সকালে নয়টাৰ সময়ে দেখি, মানবপ্ৰেমিক হীৰেন্দ্ৰনাথ বিশ্ববাস্তৱৰ দৰজাৰ সামনে হাজিৰ—যে কথা, সেই কাজ। তাকে দেখে ভাড়াভাড়ি আমৰা গিয়ে একান্ত সমাদৰে এনে আশ্ৰমৰ চাতালে মোড়া পেতে বসালুম। আশ্ৰমৰ

বিধবা কস্তাৰা মাটিতে তাঁৰ সামনে বসে গেল; তাঁৰ সোম্য-মূৰ্ত্তি দেখে তাৰে মন প্ৰসন্ন হোল, দেখে বুঝলুম। আমাৰে সঙ্গে দুচাৰটি কথা বলে মেয়েদেৱ দিকে স্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বলেন, মা, তোমৰা পৃথিবীৰ শ্ৰেষ্ঠ ধন পতিকে হাৰিয়েছ, কিন্তু ভগবান-পতি তোমাদিকে ছেড়ে নাই, তাকে লাভ কৰতে চেষ্টা কৰ, সাধনা কৰ, মন বসাও, তাকে চাইলে পাওৱা যায় নিশ্চিত। মেয়েৰা মুগ্ধ হয়ে তাঁৰ কথা শুনতে লাগল, অনেকক্ষণ তাৰে কাছে তিনি বসে ৰইলেন। বলেন, আমাৰ বই তোমাদেৱ জন্ত পাঠিয়ে দেব, পোড়ো। বেশ খানিকক্ষণ মেয়েদেৱ নিয়ে বসে, পৰে ধীৰে ধীৰে উঠে গিয়ে তিনি ৰিকসায় চড়ে চলে গেলেন। কলকাতায় ফিৰে বই পাঠাতে ভোলেন নি, রেজিষ্ট্ৰী ডাকে বই গিয়ে পৌছালো কয়েকদিন পৰেই।

মাসখানেক পৰে আমি কলকাতায় ফিৰি, সৰোজনলিনী অফিসে গিয়ে একদিন শুনি, হীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত মহাশয় পুৰী বিশ্ববাস্তৱৰ সাহায্যৰ্থে ১০০ টেক পাঠিয়েছেন। বিশ্ববাস্তৱৰ প্ৰতি তাঁৰ স্নেহ অৱশ্যে মন আঁকায় ভৱে উঠলো। আশ্ৰমে তাঁৰ উপস্থিতি-দিনেৰ স্মৃতি ভুলবাৰ নয়।

পুণ্য-স্মৃতি

“পুণ্য-স্মৃতি” বইখানি সীতাদেবীর লেখা। লেখিকা বালিকা-বয়সে প্রথম যেদিন রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করেন, তাঁর তরুণ মনে সেদিন একটি অনির্বচনীয় আনন্দের সাড়া জেগেছিল;—সেটি সৌন্দর্য্য-বোধের সাড়া। বালিকার মনে স্বপ্নের অল্পভূতি সেইদিনই যেন প্রথম দেখা দিল। পরে যত দিন যত বার কবির সংস্পর্শে তিনি এসেছেন—কবির দর্শন, কথোপকথন, গতিবিধির প্রত্যেক ভঙ্গিটি লেখিকার মনে যে তরঙ্গ তুলতো সঙ্গে সঙ্গে লেখিকা সেটি লিপিবদ্ধ না করে পারেন নি। সেই আনন্দ উজ্জ্বল মুহূর্ত্তগুলি—দিন-লিপিতে ধরে রাখা তার রূপ-রংগুলি “পুণ্য-স্মৃতি” নাম নিয়ে, সুনিবদ্ধ ভাবে কবির জীবনান্তে আজ দশের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

রচনাগুলির মধ্যে অহেতুক শ্রীতির একটি সৌরভ পাওয়া যায়—পাঠক সেটি অনুভব না করে পারবেন না। লেখিকার কাছে কবি শুধু কবি নন, তাঁর অন্তরঙ্গ পিতৃবন্ধু, তাঁদের পরিবারে কবি আত্মীয়ের মতন। এতে করে কবিকে তাঁরা অনেকটা কাছে পেয়েছিলেন। এই কল্পাগুলির প্রতি কবির

অকৃত্রিম অনাবিল মেহের পরিচয়ও এই রচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে—স্বন্দরভাবে।

লেখিকা কবির স্মৃতির পুণ্য আসনের চারিপাশে ছোট ছোট আরো কতজনের কত স্মৃতি সাজিয়ে তুলে ধরেছেন—পূর্ণচন্দ্রের চারিপাশে যেন নক্ষত্র খচিত হয়ে রয়েছে। এই সব ছোটখাট স্মৃতিগুলি কোথায় লুপ্ত হয়ে যেত, লেখিকা সেগুলিকে প্রাণবান করে সেই সময়কার শাস্তিনিকেতনের অধিবাসীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন; একথা না বলে পারলুম না।

স্কুলের ছাত্রছাত্রী,—যাদের তরুণ মন সব-কিছু নূতনের আশ্বাদ পাবার জন্য উৎসুক, বইখানি তাদের পাঠের বিশেষ উপযোগী। কবির স্বাভাবিক ভাবের এমন সহজ পরিচয় অল্প কোন গ্রন্থে আমরা দেখি নাই।

“পুণ্য-স্মৃতি” কতক অংশ প্রবাসীতে প্রকাশ হয়ে শেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২৬০। প্রাপ্তি স্থান, প্রবাসী কার্যালয়। কলিকাতা।

ফুলচারী

(গল্প)

শ্রীকান্তনী মুখোপাধ্যায়

ছুইটি ছেলে আর একটি মেয়ে লইয়া সংসার।

অঁভাব, অশান্তি, অনটন লাগিয়াই আছে। কবি-স্বামীকে বলিবার উপায় নাই, বলিলেও গ্রাহ করেন না, কবিতা লিখিয়াই অন্তর ভরিয়া যায় তাঁহার, উদর ভরাইবার জন্য ভাবিয়া মরুক স্থলেখা। অশ্রুচর্য্য মানুষ সন্দিপ।

ঘরের উঠানের ছাঁচকোলে কয়েকটা তরুলতা বর্ষার জল পাইয়া কিশোরী হইয়া উঠিয়াছে। জানালা দিয়া তাহাদের স্তম্ভাম তরুলকে শয়নগৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টায় সন্দিপ আজ সারা সকাল ব্যস্ত। ঘরটার দেয়ালে দেয়ালে পেরেক পুতিয়া শক্ত স্থতা বাঁধিয়া সে একটা জালের মত করিয়াছে শিলিংএর নীচে।

তরুলতার শাখা-প্রশাখাগুলি জানালা দিয়া আসিয়া উহারই উপর ভর করিয়া নাকি ঘরের মধ্যে চন্দ্রাতপ রচনা করিবে। রোদ না পাইয়া ওগুলো যে মরিয়া যাইবে, সে খেয়াল সন্দিপের নাই। আর মরিয়া না গেলেও ঘরের মধ্যে লতাপাতার গাছ কি ভালো? সাপ-ব্যাং চুকিবার সম্ভাবনা; ছেলেমেয়ে লইয়া স্থলেখাকে বাস করিতে হয়, কিন্তু কে শোনে কার কথা।

রান্নাঘর হইতে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে স্থলেখা ডাকিল—সিকতা, তোমার বাবাকে বলতো মা—খুব বাগান করা হয়েছে, এবার নেয়ে আমুক গিয়ে। শয়ন ঘর হইতে সন্দিপ উত্তর দিল—দেখে যাও গৌ, কেমন চমৎকার হয়েছে। স্থলেখার হাসি পাইতেছে; এ

শিশু-যুবকের খেলা সে কি দেখিবে! কিন্তু দেখিতেই হইবে তাহাকে; নতুবা অভিমান করিয়া স্বামী হয়ত এখনি সব টানিয়া ছিড়িয়া দিবেন। হয়ত ভাতই খাইবেন না রাগ করিয়া। স্নলেখাকে দেখিতে হইবে এবং প্রশংসা করিতে হইবে। স্নলেখা উঠিয়া আসিল।

সন্দিপ সতাই ঘরটাকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। স্নলেখারও একদিন কবি-মন ছিল যখন ছেলেমেয়েদের জন্য হয় নাই—যখন অভাব এত কঠোর ভাব ধারণ করে নাই। একমুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া স্নলেখা বলিল—চমৎকার, বাঃ! ইহার বেশি সে বলিতে পারে না। বেশি বলিলে সন্দিপ ভাবিবে, স্নলেখা ঠাট্টা করিতেছে, অত্যন্ত সাবধানে স্নলেখাকে কথা বলিতে হয়।

সন্দিপ স্নলেখাকে একটু ছুইয়া বলিল, রান্না হোল তোমার?

—হাঁ, যাও স্নান কর; খোকা, বুড়ো, সিকতা খেয়েছে।

—যাই—হাসিমুখে সন্দিপ স্নান করিতে চলিয়া গেল। কি অন্তত উহার আত্মপ্রসাদপূর্ণ মুখছবি। স্নলেখার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। যদি আজ অভাবের সংসার না হইত তবে তাহাদের মত সুখী দম্পতি বোধ হয় এ গ্রামে কেহই ছিল না। কিন্তু.....

ব্যথাটাকে ঠেলিয়া দিয়া স্নলেখা আবার রান্নাঘরে আসিল। গাছের পাতিলেবু কয়েকটা সিকতা ছিড়িয়া আনিয়াছে, কাটিয়া রাখিল; আর কিছুই করিবার নাই; আহারের উপকরণ সামান্যই। স্বান সারিয়া আসিলেই তাহা সাজাইয়া দেওয়া চলিবে। স্নলেখা দাঁড়িয়া বসিয়া উঠানের দিকে চাহিল। চারিদিকে নানারকম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল—বহু দিন সে সন্দিপের শয্যাগৃহে ফুলের গুচ্ছ দেখে নাই। স্নলেখা উঠিয়া কতকগুলি ফুল তুলিয়া একটা তোড়া বাধিল। একটি গ্লাসে জল দিয়া তাহার উপর তোড়াটি বসাইয়া দিল, তারপর সন্দিপের জন্য আসন পাতিয়া, জল গড়াইয়া তাহারই পার্শ্বে রাখিল ফুলের তোড়া সমেত গ্লাসটি।

সন্দিপ আসিয়া ঢুকিল গৃহে, হাতে গোটা পাঁচ লীল শালুক ফুল সুদীর্ঘ বস্ত্রসহ ঝুলিতেছে। ইহা লইয়া সে ছেলেমেয়েদের সম্মুখেই কি কাণ্ড করিবে, স্নলেখা তাহা জানে। বাহিরে না আসিয়াই সে তাই বলিল, কাপড় ছেড়ে এসো; আমি ভাত বাড়ছি।

সন্দিপ কাপড় ছাড়িয়া তিনটি শালুক তিন ছেলেমেয়েকে দিয়া দুইটি লইয়া রান্নাঘরে আসিল, আসিয়াই অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিল—বাঃ, আজ যে তোড়া করেছ দেখছি! তোমারও আবার কবিত্ত জাগলো নাকি লেখা!

হাসি মুখে স্নলেখা বলিল—খেতে বোসো।

স্বরিত হস্তে দুটি শালুকের দুটি মালা তৈয়ার করিয়া সন্দিপ একটি স্নলেখার গলার ও অপরাট খোঁপায় পরাইয়া দিল, ইহা বহু পরিচিত ব্যাপার—স্নলেখা অল্প হাসিল শুধু—সন্দিপ খাইতে বসিল।

(২)

ঘরে একটাও পরসাদ নাই—স্বামীকে না বলিলে বৈকালে মহা অসুবিধার পড়িতে হইবে। কিন্তু স্বামীর মনের মাধুর্য্যটুকু স্নলেখা কেমন করিয়া নষ্ট করিবে। না, এখন বলিয়া কাজ নাই, বৈকালেই যাহা হয় করা যাইবে। কিন্তু তিনটা বাজিতেই যে ছেলেমেয়েগুলি খাইবার জন্য চীৎকার আরম্ভ করে! একা স্নলেখা আর সন্দিপ হইলে না-খাইয়াই তাহারা কাটাওয়া দিত। না; বলিতেই হইবে স্বামীকে! খাওয়াটা হইয়া যাক! স্নলেখা ফুলের বাগান এবং ফুল সম্বন্ধে কথা পাড়িল। সন্দিপের খাওয়া হইয়া গিয়াছে প্রায়। অশ্বলের অভাবে পাতি লেবুটাকেই আর একবার চুষিয়া লইয়া সে উঠিল। ‘আর একটু কিছু খাও’, বলিবার মত কোন উপাদান স্নলেখার নাই। দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক ঠেলিয়া উঠিতেছে যেন!

সন্দিপ শয়ন করিয়াছে; খাইতে খাইতে স্নলেখা মনের মধ্যে কথাগুলি গুছাইয়া লইল, অভাবের কথাটা কেমন করিয়া স্বামীর নিকট পাড়িবে। স্বামীকে এতটুকু ক্ষম করিতে তাহার মন সরে না, কিন্তু স্নলেখা উপায়হীন, ছেলেমেয়ে-গুলোই তাহার কাল হইয়াছে।

খাওয়া শেষ করিয়া স্নলেখা স্বামীর শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দেখিল, সন্দিপ ঘুমায় নাই, এমন কি, ভাল করিয়া শয়নও করে নাই, বালিশে হেলান দিয়া একটা কাগজ পেনসিল দিয়া ঘর কাটিতেছে।

—ওটা কি করছে! স্নলেখা বিষ্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করিল; সন্দিপ তাহাকে টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল—ওপাশের পড়ো জমিটার ফলবাগান করবো, তারই একটা প্ল্যান করছি, দেখো!

হায় কপাল ! স্নলেখা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সন্দিপের দেওয়া শালুকফুলের মালাগুলি তখনো তাহার খোঁপায় এবং গলায় জড়ানো রহিয়াছে। স্নলেখা স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, প্রতিভাদীপ্ত সেই সুন্দর মুখ আজো, এত অভাবের মধ্যেও কত সুন্দর, কত উচ্ছ্বাসময় ! স্নলেখার সব কথা কোথায় হারাইয়া গেল। সন্দিপ ততক্ষণ পেনসিল দিয়া স্নলেখাকে গ্লান বুঝাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—দেখ, সু, মাঝের ঐ যে কাঁটাল গাছটা,—ওর চারদিকে হবে মাটির বেদি, তাকে গোলভাবে ঘিরে গোল হয়ে থাকবে রজনীগন্ধার বাড়গুলো—ওর মাঝে রাস্তাটা, এক হাত চওড়া, লাল পাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা—কেমন ? ঐ কোণের দিকটায় যে কৃষ্ণচূড়াটা আছে, তার সঙ্গে ব্যালান্স রাখতে একোণেও একটা কৃষ্ণচূড়া—না হয় কামিনী ; চাঁপা গাছ একটা আনতেই হবে। চাঁপা ! ভারি সুন্দর ফুল—জানো—“আমারে ফুটিতে হোল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে—আমি চম্পা...” চাঁপা একটা চাই-ই, আর মালতীও একটা—কি বলো তুমি ? আঁ ? সন্দিপ স্নলেখার মুখের দিকে চাহিল। স্নলেখা সন্দিপের দিকেই চাহিয়া আছে, তাহার কথার এক বর্ণও স্নলেখার কানে যায় নাই। উত্তর কি দিবে স্নলেখা ? কিন্তু “শুনি নাই,” তাহা বলা চলে না, বলিল,—কি বললে, আর একবার বলো তো ?

হাসিয়া সন্দিপ বলিল—মন ঠিক নাই তোমার—পরমা নাই বুঝি ?

স্নলেখা বলিতে পারিল না যে পরমাই নাই, চুপ করিয়া রহিল সে !

নিঃশ্বাস ফেলিয়া সন্দিপ পেনসিলটা ফেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল নীরবে !

সবই তিস্ত হইয়া যাইতেছে। স্নলেখা সাস্থনার স্তরে স্বামীকে কিছু বলিতে চায়, কিন্তু বলিবার কথা তো ঐ এক মাত্র—পরমা নাই !

—স্নলেখা !—সন্দিপ ডাকিল, স্বর তাহার সজল স্নেহ করণ।

স্নলেখা এখনো উত্তর দিতে পারিতেছে না। ব্যাখ্যাস তাহার অন্তর মুচ্ড়াইয়া উঠিতেছে, কিন্তু উত্তর না দিলে

সন্দিপ হয়ত ভাবিবে, স্নলেখা তাহার দুঃখ বোঝে না,—কি বলো ! স্নলেখা মুখে মুতু হাসি টানিয়া বলিল।

—আমাকে গোটা দুই টাকা যোগাড় করে দিতে পার, সু, কলকাতায় লেখার দরুন কিছু পাওনা রয়েছে, গিয়ে নিয়ে আসি তাহলে ; ওঁরা ডাকে পাঠালেন না ! আর যদি পাই তো একটা চাকরীও...সন্দিপ থামিয়া গেল।

দুই-টা টাকা ! কোথায় পাইবে স্নলেখা ? হাতে তাহার বৎসর তিনের পুরাণো দুটি শাঁখের শাখা আর একগাছি নোওয়া, ঘরের ঘটিবাটিও যৎসামান্য।

দুই টাকা স্নলেখা কোথায় পাইবে ! পাইলে সে সন্দিপকে আজই কি এমনভাবে বিব্রত করিত ! স্নলেখা এখনো চুপ করিয়া রহিল। সন্দিপ নিজেই বলিল—তুমিই বা কোথায় পাবে টাকা ! আচ্ছা, আমিই দেখি কোথাও ধারধোর যদি পাই।

সন্দিপ উঠিয়া পড়িল ! কোন একটা কিছু করিবার ইচ্ছা হইলেই সে উত্তেজিত হইয়া আগাইয়া যায় এবং ঠিক যাইগার পৌছিবার পূর্বেই উত্তেজনা থামিয়া যায়—সে ফিরিয়া আসে। স্নলেখা বরাবর ইহা দেখিয়াছে।

তাই বলিল,—এখন যেতে হবে না, একটু বিশ্রাম কর, বিকালে দেখা যাবে।

—গরীবের বিশ্রাম করা পাপ স্নলেখা—বলিয়া গেঞ্জীটাকে টানিয়া লইয়া সন্দিপ বাহির হইয়া গেল। স্নলেখা বসিয়া বসিয়া সন্দিপের আঁকা গ্লানখানা দেখিতে লাগিল। পাশের জমিটার এমনি সুন্দর একখানা বাগান হইলে যে রাজার ঐশ্বর্য হইয়া উঠিবে। অথচ খরচ কতই-বা এমন ? পাঁচ সাত টাকা ! কোথায় পাইবে স্নলেখা আজ ! ছেলেমেয়েকে খাবার দিবার সংস্থানও যে নাই তার !

(৩) :

সিকতা একটা কাঠের পুতুল লইয়া ঘরে ঢুকিল—আমার ছেলের বিয়ে দেব মা, পুটুর মেয়ের সঙ্গে ; পন দিচ্ছে নগদ এক হাজার আর গহনা,—দশগাছা চুড়ি, গলায় সরস্বতী হার, মাথায় মুকুট, কানে...সিকতা অনর্গল গহনার ফর্দ দিয়া চলিল, থামিল যখন, তখন অতঃ তাহার বিশ হাজার টাকার গহনার ফর্দ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

স্নলেখা এতক্ষণ পরে মেয়েকে বলিল—‘বেশ, নাওগে বিয়ে।’ কিন্তু ওরা যে নীচু ঘর, আমরা কুলীন যে, আরো টাকা দিক।

স্বলেখার মনটা অকস্মাৎ হলিয়া উঠিল। তাহার পিতার কৌলিত্য-প্রীতিই স্বলেখাকে এই শিক্ষিত-গরীব লোকের গৃহীণী করিয়াছে, নতুবা হয়ত আরো একটু সম্পন্ন ঘরেই মেয়েকে তিনি দিতে পারিতেন। কিন্তু একি ভাবিতেছে স্বলেখা! তাহার অমন দেবতার মত স্বামী! আশ্রয়িকারে সে স্নান হইয়া উঠিল। তাহার মত স্বামীভাগ্যা কয়জন নারী পাইয়াছে? দারিদ্র্য! হোক, তথাপি সে স্থখে আছে। সিকতাকে কোনরূপে খেলিতে পাঠাইয়া দিয়া স্বলেখা বাস্তব খুলিল। বহুদিনের সঞ্চিত একটুকরা সোনা—তাহার মায়ের একটা ভাঙ্গা তাবিজ, তাহাই খুঁজিতেছে স্বলেখা। তিনটা টাকা সে উহা বেচিয়া যোগাড় করিবে। দুই টাকা সন্দিপের রেলভাড়া এবং এক টাকা স্বলেখার তিন-চারদিনের খরচ। স্বলেখা সমস্ত ঘাটিয়া বাহির করিল সোনাটুকু। জর্নৈক প্রতিবেশিনীর নিকট সে বহু জিনিস বিক্রয় করিয়াছে, বাঁধা দিয়াছে, তাহারই নিকট সোনাটুকু দিয়া স্বলেখা তিনটা টাকা লইয়া আসিল।

সন্দিপ ফিরিয়া আসিতেছে না কেন? কোথায় গেল সে। স্বলেখা মনে মনে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। খাওয়ার পর একটু বিশ্রামও করে নাই সন্দিপ আজ। কোথায় টাকা টাকা করিয়া ঘুরিতেছে।

বড় ছেলেটাকে দিয়া একটা টাকা ভাড়াইয়া স্বলেখা কিছু চাও চিনি কিনিয়া রাখিল। সন্দিপ চা খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে অথচ চা তাহার জুটিয়া উঠে না সব দিন।

ছেলেমেয়েদের খাইতে দিল স্বলেখা। চায়ের জল গরম করিল—এবার নিশ্চয়ই আসিবে সন্দিপ—বেলা যে পড়িয়া আসিল প্রায়। কিন্তু সন্দিপ তো ফিরিতেছে না। স্বলেখা বড় ছেলেকে পাঠাইল তাহাকে খুঁজিয়া ডাকিয়া আনিতে। ছেলেটা সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—মা, বাবাকে কোথাও দেখলাম না—কেউ বলতে পারল না কিছু। স্বলেখার অন্তর দ্রুতদ্রুত করিয়া উঠিল। অভাবের তাড়নায় যদি—ইহার পর স্বলেখা আর ভাবিতে পারিতেছে না। স্বলেখার বুকের ভিতর হাতুড়ি পড়িতে লাগিল যেন। কাঁদিতেও পারিতেছে না সে। কাঁদিবার কিই বা হইয়াছে! এখনি আসিবে সন্দিপ ফিরিয়া। টাকার চেষ্টায় ভিন্নগ্রামে গিয়াছে হয়ত বা। হয়ত বাল্যকালের কোন বন্ধুর বাড়ী গিয়াছে।

স্বলেখা মনকে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। ধূপ-দীপ জালিয়া স্বলেখা কর-ঘোড়ে প্রার্থনা করিল ভগবানের চরণে—সন্দিপ যেন এখনি ফিরিয়া আসে।

রান্না করিতেই হইবে নতুবা ছেলেমেয়েগুলো কাঁদিয়া অস্থির করিবে। স্বলেখা রান্নাঘরে ঢুকিল। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে; ছাতাও একটা লইয়া যায় নাই সন্দিপ। ভিজিয়া সারা হইয়া যাইবে। রান্না করিতে ভাল লাগিল না স্বলেখার। চালে ডালে সে খিচুড়ী চড়াইয়া দিয়া বসিয়া রহিল। বড় ছেলেটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া পড়িতেছে। ছোট ছেলেটা সিকতার সঙ্গে খেলা করিতেছে সেই স্বল্লোকে। এই সোনার সংসার ছাড়িয়া সন্দিপ কি নিরুদ্দেশ হইয়া গেল নাকি? অভাব? তা থাক, সন্দিপ তো অভাবে মুন্ডাইয়া পড়ে না, বরং স্বলেখাই ক্লান্ত হইয়া পড়ে সময়ে সময়ে। সন্দিপ তো এত অভাবেও ছেলেমেয়েদের লইয়া খেলা করে হাসিমুখে। কোথায় তবে গেল আজ সন্দিপ।

স্বলেখা ভাবনার কুলকিনারা পাইতেছে না। হৃশ্চিন্তা-গুলো এমনি ভিড়-জমাইয়া তুলিতেছে যে কিছু ভাবিতেও ভয় করিতেছে। খিচুড়ীটা ধরিয়া গেল নাকি। স্বলেখা তাড়াতাড়ি বাঁটিয়া নাখাইল। রাত্রি অনেকটা হইয়াছে। ছেলেমেয়েদের খাইতে দিল স্বলেখা। বিছানা পাতিয়া শোয়াইল তাহাদের। এখনো সন্দিপ ফিরিল না? আর স্বলেখা স্থির থাকিতে পারে না, তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। টপ্ টপ্ করিয়া তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। কাঁহাকে ডাকিবে সে এই রাত্রিতে! কেমন করিয়া খোঁজ করিবে সন্দিপের?

স্বলেখা অস্থির হইয়া এখর ওখর করিতে লাগিল। শয়ন-ঘরে তখনো সেই শালুকফুলের মালা দুটি—স্নান হইয়া গিয়াছে। স্বলেখা মালা দুটি চুষন করিল একবার। ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া গিয়াছে। উহাদের মুখ কেরোসিনের ডিবার আলোকে ভাল দেখা যাইতেছে না। জাগিয়া থাকিলে স্বলেখা উহাদেরই সঙ্গে কথা বলিয়া বাঁচিত। সে যেন আর কোন রকমেই সামলাইতে পারিতেছে না নিজকে। কেন সে বলিল সন্দিপকে অভাবের কথা? আজ তো সে-ই অর্থের

ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। সুলেখার মাথা ঠুকিয়া মরিতে ইচ্ছা হইতেছে।

—সিকতা!

সন্দিপ বাহির হইতে আহ্বান করিল। সুলেখা ছুটিয়া গেল বাহিরের দরজা খুলিয়া দিতে। হাতে আলোটাও লইতে ভুলিয়া গেল সে। সন্দিপ প্রবেশ করিল, কাঁধে একটা গাছ! বলিল—ভাবছিলে বুঝি খুব?—ভগবান আছেন। পোষ্ট অফিসে গিয়েই ত্রিশটা টাকা পেলাম, গত মাসের গল্প ছুটির দাম—তারপর সোজা চলে গেলাম গঞ্জে—বলিতে বলিতে টাকা কটি সুলেখার হাতে দিয়া বলিল, আট আনা লেগেছে চাপাগাছের দাম—বাকি সাড়ে উনত্রিশ টাকা আছে, শুণে নাও। সন্দিপ কখনো নিজের জন্ম এক পরস্রা নিজের হাতে ব্যয় করিতে জানে না। আলোতে কাঁধের গাছটা নামাইয়া ঘুহাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—ভাল জাতের চাপা, চলোতো, এখুনি এটা পুঁতে ফেলি—কাল বেড়া দিয়ে দিতে হবে—কালই বৈকালের ট্রেনে কলকাতা যাব কিনা—চলো, আলোটা নাও।

—আবার কলকাতা কেন? ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠে সুলেখা শুধাইল।

—একটা চাকরীও পেয়েছি যে, ঐ পত্রিকা অফিসেই—কিন্তু তুমি কান্দছো কেন লেখা? সুলেখা চুপ করিয়া রহিল। গাছটা সাবধানে রাখিয়া সন্দিপ সুলেখাকে স্পর্শ করিয়া বলিল, —কেঁদো না লক্ষ্মীটি, চাকরীটা যখন পাওয়া গেছে—চল, গাছটা পুঁতে ফেলি—

—যাচ্ছি—কিন্তু কথা দাও যে ঐ গাছ বড় হবে, তার ফুল ফুটবে, সেই ফুল আমার খোঁপায় পরাবে, তারপর যদি দরকার হয় তো যাবে কলকাতা—তার আগে নয়।

সন্দিপ বিশ্বাসে হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল সুলেখার অশ্রুসিক্ত চোখের পানে।

(৪)

সন্ধ্যায় সুলেখা সিকতাকে লইয়া ফুল গাছগুলির যত্নে মন দিয়াছে। আজ কাল সুলেখার প্রধান কাজ গাছগুলিকে

যত্ন করিয়া তাতে ফুল ফোটানো। জমিদার-গৃহিণীর দেবপূজায় বড়ই অনুরাগ। পূজায় ফুল লাগে তাঁর প্রতিদিন একরাশ। গৃহিণীর পুরাণো ষি সন্ধ্যামণি রোজ বড় একটা সাজি হাতে ফুল লইতে আসে সুলেখার বাগানে। কসে, গন্ধরাজ, জবা, চাঁপা, টগর, প্রভৃতি নানা রংয়ের নানাজাতীয় ফুল সাজি ভরিয়া সাজাইয়া দেয় সুলেখা প্রতিদিন। দৈনিক বরাদ্দ হইয়াছে জমিদার বাড়ীতে ফুলের দাম একটা টাকা।

জমিদার বাড়ী জুর্গেৎসব। পূজার তিন দিনে ফুল যোগাইতে হইবে আঠার টাকার। আরো মালা চাই অনেক গাছা!

এ বৎসর ছেলেমেয়েদের কাপড় কিনিবে সুলেখা মনের সাধ মিটাইয়া।

দিদি আয়—বাবা এসেছে। ছোট ভাইয়ের ডাক আসিয়া পৌঁছল সিকতার কানে। বাগানের কাজ ফেলিয়া দৌড়াইল সে ঘরের দিকে। গাড়া ভরা জন, ভিজানো গামছাখানি ভাঁজ করিয়া তার উপরে রাখা। সিকতা বাপের মুখ-হাত ধোয়ার জল ঢালিয়া দিতে লাগলো বাবার হাতে। সন্দিপ উঠিয়া দাঁড়াইয়া গামছায় মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—তোমার মা কোথায় রে খুকী!

—বাগানে! আর কোথায়; গাছ নিয়ে ব্যস্ত। ফুল ফোটাতে হবে গাছে বত ভাল করে পারেন! জল খাবার এনে দিই বাবা। মা সাজিয়ে রেখে গেছেন রেকাবীতে।

—আসছি—বলিয়া সন্দিপ বাগানের দিকে চলিল, সুলেখার পাশে গিয়াই দাঁড়াইলো, সুলেখার হৃদয় নেই।

—ফুলের আদরে আমি যে চাপা পড়ে গেছি একেবারে—ফুল সর্বস্ব,—আমি কি কিছুই নই!

সুলেখা চোখ ফিরাইয়া সন্দিপের দিকে চাহিল, কী প্রীতিভরা দৃষ্টি!

—ফুলের রূপ তো তুমিই এনে দিয়েছ আমার মনে!

সন্দিপ মিস্ত্রী হাসি মুখে ফুটাইয়া বলিলো—পূজা সংখ্যা মাসিকে আমার নূতন গল্প 'কনকাজলি' বের হচ্ছে—সু! তাতে তোমার ফুল-বাগানের রূপ দেখতে পাবে।

মধুরৈণ

শ্রীমানসী বসু এম, এ

চার

এইরূপ ভাবেই দিন চলিতে লাগিল। সুনীতি প্রকাশ্যে সৃজিতের সামিধ্য পরিত্যাগ করিলেও প্রত্যেক জিনিষেই সৃজিত তাহার উপস্থিতি অনুভব করিতেছিল। প্রভাতে বিছানায় বসিয়াই সে দাড়ী কামাইবার গরম জল ও স্কুর ইত্যাদি সম্মুখেই পায়, স্নান শেষ হইলেই তাহার প্রাতরাশ সামনেই হাজির হয়, সার্টির বোতাম ঠিক আঁটা থাকে, মোজা ফুটা হইয়া গেলে কখন রিফু হয়, কখন নতুন জোড়া আমদানী হইয়া তাহার স্কটের আলমারীতে রাখা থাকে। যদিও সুনীতিকে হুবেলা খাবার টেবিলে ছাড়া দেখিতে পায় না তবুও এ যে সবই সুনীতির সেবা তাহা সে অনুভব করিতে থাকে এবং যতই সহজ ভাবে ইহাকে দেখিতে চায় ততই সে সন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। সপ্তাহ অন্তে বিলাতী ডাক লিখিবার সময় ভাষা হারাইয়া যায় এবং মাস শেষে যখন বড় ঘরের অঙ্কের চেক পাঠায় তখন নিজেকে অতিশয় অপরাধী বলিয়া মনে হয়।

তবুও দিন চলিতেছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে জগৎবাবুর ছেলেমানুষীতে দুজনেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। খাবার টেবিলে বসিয়া ছুটির দিনে জগৎবাবু বলিয়া বসিলেন, মেট্রোতে একটা বস্ত্র ফোনে রিজার্ভ করে রেখেছি। জিতু আজ নীতিকে নিয়ে যাস। সুনীতির সম্মুখে এরূপ কথায় সৃজিত আড়ষ্ট হইয়া যায়; ‘না’ কেমন করিয়া বলিবে? কিন্তু হাঁ বলাও যে অসম্ভব। সুনীতি পলকের জন্ত রাজিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে, না জ্যাঠামশাই আপনাকে ফেলে আমি কোথাও যেতে পারবো না। “আমার দাঁহ যখন হবে তখন তাকে সাবধান করিস নীতি, এ বুড়ো ছেলের জন্তে কোন ভয় নেই।” সৃজিতের মাথা হেঁট হইয়া যায়, মুখে রক্ত ছুটিয়া আসে, লুকাইবার জন্ত হঠাৎ খাদ্যত্রব্যের উপর অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া উঠে। সুনীতি হাল ধরে, “না জ্যাঠামশাই, এ বুড়ো ছেলে বোলেও যেতে পারবো না, যদি একান্তই আপনার আদেশ হয় তাহলে আপনাকেও যেতে হবে।” সৃজিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া জোর করে,

একটু চলুন না, অসুবিধা হলেই ফিরে আসিব। শেষ অবধি জগৎবাবুকে সুনীতি টানিয়া নিয়া চলে। এর পর দুজনেই সাবধান হয়, সৃজিতেরও একটা না একটা এনগেজমেন্ট থাকে, সুনীতিও ঠিক সৃজিতের বেড়াইতে ঘাইবার মুহূর্তে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পায় না। সৃজিত তাহার টু-সীটের গাড়ীতে বাহির হইয়া গেলে সুনীতি স্বস্তরের সহিত বড় গাড়ীতে বেড়াইতে যায়। সেদিন সৃজিত যখন অফিসে যাইতেছিল, জগৎবাবু বলিয়া বসিলেন, ওরে আজ এস পি পালের নতুন ক্যাটলগ দিয়ে গেছে, নতুন নতুন অনেক গহনার ডিজাইন দেখছিলাম, একটা হীরার কণ্ঠি কিনে আনিব। সৃজিত অবাক হইয়া বলে “হীরার কণ্ঠি কি করবেন বাবা?”

হাসিয়া জগৎবাবু বলেন, “আমার দরকার আছে, তুই আনিব বাপু।” সৃজিত জানে সুনীতিকে বিবাহের সময় পিতা বহু অলঙ্কার দিয়াছিলেন, তাই হীরার কণ্ঠি সুনীতির জন্ত কি না বুঝিতে পারিল না, তবু বলিল, বেশ ত আমি ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে বেরব, পছন্দ করে আনবেন। জগৎবাবু বাধা দিলেন, তোদের চেয়ে কি আমাদের পছন্দ বেশী হবে? সৃজিত একটু কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, কত দামের হবে। জগৎবাবু রাগিয়া উঠিলেন, দামের জন্তে ভাবনা নেই বাবু আমিই দেব; জিনিষটা কেবল ভাল দেখে এনে। সৃজিত অপ্রস্তুত হইয়া যায়। পিতার নিকট হইতে প্রত্যেক মাসে সে মোটা রকম হাত খচর পায়। নিজের বেতনের টাকা প্রথম মাসে পিতাকে দিতে তিনি বলেন, এই মাসের টাকা দিয়ে আমার একটা শাল কিনব, পরের মাস থেকে টাকা তুই রাখবি, এখন খরচ ত বাড়ল। সৃজিত ইচ্ছামত অজস্র অর্থব্যয় করে, পিতা কখনো জিজ্ঞাসা করেন না, তাই দামের কথায় একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং বিকালে কিরিবার সময় অতিরিক্ত দামের একটা কণ্ঠি কিনিয়া আনিব। অবশ্য এজন্ত তাহাকে মোটা অঙ্কের চেক কাটিতে হইল। সুনীতির অনুপস্থিতিতে সৃজিত বাড়ী কিরিয়াই পিতাকে অলঙ্কার দিয়া আসিল, জগৎবাবু খুসী হইয়া বসিলেন,

বাবা বেশ জিনিষ হয়েছে। তোদের কাছে কি আমাদের পছন্দ? দামের কথা তিনিও জিজ্ঞাসা করিলেন না, স্বজিতও কিছু বলিল না। কিন্তু মুখিল হইল খাবার টেবিলে জগৎবাবু স্বনীতিকে হারটা দিয়া বলিলেন, এটা জিতু কিনে এনেছে, তোমার পছন্দ হয় কি না দেখত মা। স্বনীতি স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যই কি স্বজিত গহনা দিয়া তাহাকে অপমান করিবে? স্বজিতের আনত মুখে সে কি পাঠ করিল সেই জানে, তবে নিশ্চিত হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিল, না স্বজিত সেরূপ প্রকৃতির লোক নহে এবং এইটুকুই স্বনীতির সাক্ষ্য। হাসিয়া কহিল, বেশ পছন্দ করেছেন, খুব সুন্দর হয়েছে, কিন্তু আবার কণ্ঠি কেন জ্যাঠামশাই? বিয়ের সময় এত গহনা দিয়েছিলেন যে মরবার সময় পর্য্যন্ত সে পরে যেতে পারব। স্বজিত বাখিত হইল। স্বনীতি হাসিয়া কথা বলিলেও কত দুঃখে স্বনীতির মৃত্যুর কথা মনে পড়ে তাহা সে বুঝে, কিন্তু কি বলিবে সে? জগৎবাবু রাগিয়া বলিলেন, বুড়ো মানুষের কাছে মরবার কথা বললে কি বলে আজ। তোমার জন্মদিন, সে কি আমি ভুলে গেছি? সকালে তোমার বাবার আশীর্ব্বাদী চিঠি আসেনি? স্বনীতি হেঁট হইয়া খণ্ডরের পদধূলি মাখায় দিয়া বলে, আমার অজ্ঞান হয়ে গেছে জ্যাঠামশাই। দিন আমি এখনি পরছি। বলিয়া কণ্ঠি তখনি গলায় পরিয়া খণ্ডরকে আবার প্রণাম করিল। জগৎবাবু পরম স্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, “মা, তুমি সর্ব্বস্বত্বী হও।” স্বজিত নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আরও একদিনের ঘটনা। নিজের চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া জগৎবাবু ধীরে স্বস্ত্রে বসিয়া প্রশ্ন করিলেন, “গভর্ণরের পাটির নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিস জিতু?” স্বজিত রোষ্টের আলু মুখে পুরিয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। জগৎবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই বাবিত? “হঁ, যেতেই হবে, অনেক পরিচিত লোক আসবেন।” স্বনীতি এই সময় এক প্লেট সিদ্ধাড়া আনিয়া নামাইয়া রাখিল। জগৎবাবু চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, খেতে বোস, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল; ও বাবা এখন সিদ্ধাড়া করে নিয়ে এলে। বুড়োছেলেকে অত সব খাইয়ে অস্থির করে দেবে। স্বনীতি খান চারেক সিদ্ধাড়া খণ্ডরের পাতে দিয়া বলিল, খেয়ে দেখুন জ্যাঠামশাই এ ঘি আমি নিজে মাখন ভুলে তৈরী করেছি, খেলে কোন অসুখ হবে না। জগৎবাবু পরম-

তৃপ্তি সহকারে সিদ্ধাড়া মুখে দিয়া বলিলেন, চমৎকার হয়েছে বুড়ি; জিতুকে খান কয়েক দাও। স্বজিত সিদ্ধাড়া খাইতে ভাল বাসেনা পাছে বা স্বনীতি কিছু ভাবে এই ভয়ে না বলিতে পারিল না এবং একান্ত মনোযোগের সহিত সিদ্ধাড়া খাইয়া প্রমাণ করিল যে তাহারও খুব ভাল লাগিয়াছে। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কথাবার্ত্তাও সমাজ তত্ত্ব ছাড়িয়া রাজনীতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জগৎবাবু স্বনীতির দিকে চাহিয়া বলিলেন, জান, তোমার শাশুড়ীর সেই নীল রংএর বেনারসীটা পরে যেও। স্বনীতি জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে খণ্ডরের দিকে চাহিল। জগৎবাবু স্বজিতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, পাটির কথা তুই নাকি কি এখনো বলিস নি জিতু? স্বজিত হাঁ না বলিবার পূর্বেই স্বনীতি তারম্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, না জ্যাঠামশাই, আমি কিছুতে যাবোনা; ও সব আমার ভালো লাগে না। জগৎবাবু ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলিলেন, ছেলে মানুষী কোরোনা নীতি, দার্জিলিংএ থাকতে কত বার গভর্ণরের পাটিতে গেছ। তোমার কত পরিচিতরা আসবেন। জিতু যাচ্ছে তুমি না গেলে ভাল দেখাবে কেন? আর তুমি যাবে নাইবা কেন! ইহার উপর কথা চলে না; কিন্তু পরিচিত অনেকে আসিবেন বলিয়াই স্বনীতির যাইবার ইচ্ছা নেই, কিন্তু একথা কেমন করিয়া সে বলিবে? স্বজিতও নির্বাক হইয়া রহিল।

পরদিন খণ্ডরের নির্দেশ মত সাজ-সজ্জা করিয়া স্বনীতি যাইবার মুহূর্ত্তে বলিতে আসিল। প্রায় চার মাস তাহার বিবাহ হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত স্বজিতের সহিত সে একা কোথাও যায় নাই, তাও এই সাজসজ্জা করিয়া! কিন্তু উপায় নাই; তাহার হৃদয়ের বেদনা অগ্নির ব্রীচিবে কেমন করিয়া? সে বড় ঘরের বধু, পদস্থ লোকের স্ত্রী, সে মর্যাদা রাখিতে সে বাধ্য। লজ্জিত মুখে সে জগৎবাবুকে বলিতে আসিল, ঠিক সময়ে চা খাবেন জ্যাঠামশাই, আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলাম। স্বজিত তাহার নতুন সূট পরিয়া বাহির হইল। জগৎবাবু পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন, স্বনীতির অপেক্ষা তাহারও লজ্জা কম হইতেছিল না; কিন্তু পিতার কাছে নিষ্কৃতি নাই। স্বনীতি ঘুরিতেই জগৎবাবু খুসীর সহিত বলিয়া উঠিলেন, বাঃ স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকুরের মতই দেখাচ্ছে মা তোমায়। স্বজিতের সামনেই স্বনীতি হাসিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী ঠাকুর কি আমার মত কালো

জ্যাঠামশাই। জগৎবাবু মেহ ভরে স্নানীতির মাথা নাড়িয়া দিয়া বলিলেন, কে বলে আমার মা কালো? স্নানীতি ছল ছল চোখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার কালো রূপের কথা পিতার মেহে বাল্যে কোন দিন মনে হয় নাই, কৈশোরে সমপাঠিনীদের আঁচায় কোন দিন সে কথা ভাবে নাই, কিন্তু এখন স্নজিতের সুন্দর মুক্তির পাশে নিজেকে তার বড় বেমানান লাগে।

একমাত্র স্নজিতের নিবিড় প্রেমই তাহার এ কালো রূপ আলো করিয়া দিতে পারিত। স্নজিত স্নানীতি প্রবেশ করিতে এক পলক তাহাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া চোখ নামাইয়া লইয়াছিল। স্নানীতির কথায় আর একবার চাহিয়া দেখিল; স্নানীতির সজল নয়ন বোধ হয় তাহার চোখে পড়িয়া থাকিবে, তাই আর বাক্যব্যয় না করিয়া অগ্রসর হইল।

সারা পথ স্নজিত একটু বিমনা হইয়াই গাড়ী চালাইল। পিতার নিষেধ সত্ত্বেও সে নিজে চালাইল, শোফেয়ারকে চালাইতে দিল না; উদ্দেশ্য চুপচাপ পাশপাশি বসিয়া থাকিবে, অথচ কথা কহিব না, এটা বড় বিস্তী দেখাইবে। গাড়ী চালাইলে সে লজ্জার দায় হইতে মুক্তি পাইবে। স্নানীতি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্নজিতের সহিত কথা কহিবার লেশমাত্র চেষ্টা করিল না। ফিরিবার পথে স্নানীতি বড় অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্নজিত লক্ষ্য করিয়া ভিতরে বসিল। স্নানীতি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দমন করিতেছিল, ভিতরে তাহার ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল; গাড়ীর এক কোণে সে নিজের মত চুপ করিয়া ঠেঁশ দিয়া বসিয়া ছিল। পাটিতে অনেক পরিচিতারা আসিয়াছেন, সকলেই স্নজিতকে ও তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, অভিনন্দন, পরিহাস-কোটকে সবই তাহাদের সহ করিতে হইয়াছে। স্নজিতকে অবশ্য সহজেই সকলে ছাড়িয়া দিয়াছে; কিন্তু সমস্ত ধাক্কা স্নানীতির উপর আসিয়া লাগিয়াছে। যাঁহা সে পায় নাই, পাইবার আশাও করে না, হাসি দিয়া বাক্য দিয়া ভাল করিয়া তাহাই পাইয়াছে, এই প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছে যাহাতে কেহ না কোনরূপ সন্দেহ করিয়া খুসী হয় অথবা গায়ে পড়িয়া সহানুভূতি প্রকাশ করে। স্নানীতি আর পারে না। নির্জনগৃহে একবার বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িবার জন্য তাহার মন চাহিতেছিল। স্নজিত নিষ্ঠুর নয়, স্নানীতির অবস্থা বুঝে; আজিকার অভিযান তাহাকে বেদনাই দিবে তাহাও সে বুঝিয়াছিল; কিন্তু উপায় ছিল না। পিতাকে বলাও যায় না,

তার কথা তুচ্ছ করাও যায় না। স্নানীতির প্রতি চাহিয়া স্নজিত কিছু চিন্তিত হইয়া উঠিল। স্নানীতির স্বভাবের বিপরীত ভাবে সে ভাবিয়া পড়িয়াছে। শোফেয়ারকে ময়দানের উপর দিয়া গাড়ী চালাইতে হুকুম দিয়া স্নানীতিকে যত্নস্বরে প্রশ্ন করিল, অস্বস্থ বোধ করছ কি। স্নানীতি কথা বলিতে পারিল না, কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল ‘না’; স্নজিত একপলক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, তোমার হাতটা দেখি; স্নানীতি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া সোজা হইয়া বসিল ও হাত সরাইয়া লইয়া এবার শাস্তকণ্ঠেই উত্তর দিল “না, আমি ভালই আছি।” সমবেদনায় স্নজিতেরও চোখ ছল করিয়া উঠিল; কিন্তু সে নীরবেই রহিল। ইহার পরও পূর্বের ভায় দিন চলিতে লাগিল।

স্নজিত রাত্রে আটার রুটি খায়। সেদিন রাত্রে লুচী দেখিয়া বিস্মিত হইল। স্নানীতি খন্তরকে ম্যালাড পরিবেশন করিতেছিল, স্নজিতের দিকে চাহিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল; তোমার সর্দি হয়েছে তাই লুচী করতে দিয়েছি। ভিতরের স্ফোচ না কমিলেও বাহিরে তাহার আজ কাল সহজ ভাবেই কথাবার্তা বলে যদিও ভুবেলা খাবার সময় ছাড়া ছুজনের সাফাং প্রায়ই হয় না। স্নানীতিকে স্নজিত অপ্রতিভ করিতে চায়না, লুচীর প্রেট টানিয়া লইয়া বলিল, ছুথানা রুটি টোষ্ট খেলেও চলত। অবশ্য, বিকালে তাহার সর্দি ভাব লাগিতেছিল, কিন্তু স্নানীতি ত তা জানেনা। শতকর্মের মধ্যেও সে স্নজিতের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। স্নানীতি/ব্যস্তভাবে বলিল, টোষ্ট এনে দেবো? জগৎবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, তোমার ডাক্তারী মা ঠিক, লুচি ভাল। রাত্রে স্নজিত শুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, স্নানীতি ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, এসময় সে আসেনা, জগৎবাবুর কাছে বসিয়া বই পড়িয়া শুনায় বা কোন সাংসারিক আলোচনা করে; স্নজিত চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না, স্নানীতি খাটের পাশে দাঁড়াইয়া যত্নস্বরে কহিল, ‘শরীর কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে?’ সত্যই স্নজিতের শরীর ভাল লাগিতেছিল না, সেইজন্য শুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, স্নানীতির কথায় বিস্মিত হইলেও হাসিয়া বলিল, ‘না’ না সেরকম খারাপ কিছু নয়, শুধু মাথাটা একটু ধরে আছে।’ স্নানীতি বলিল, ‘এ্যাসপিরিন-দেবকি? স্নানীতির উৎকণ্ঠা দেখিয়া স্নজিত সম্মতি জ্ঞাপন করিল। স্নানীতি দেখিল, স্নজিত নিজেই পায়ের আঙ্গুল টানিতেছে; সম্ভব পা ব্যথা করিতেছে,

সুনীতির মনে হইল, বলে পা টিপিয়া দিই, কিন্তু সন্ধ্যা আসিয়া কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। সজিত যদি মনে করে, সুনীতি গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিবার চেষ্টা করিতেছে কিংবা আর কিছু। তবুও সুনীতি চেষ্টা করিয়া বলিল, ‘রাজু একটু পালিয়ে তেল মালিস করে দিকনা—মত সর্দি রয়েছে।’ সজিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, না না সে ভারি অসুস্থ লাগবে। এখন মন্দ লাগছে না; শুভ নাহি। সুনীতি বীরে বীরে বাহির হইয়া গেল।

অধিক রাত্রে অসহ্য কঠোর যন্ত্রণার সঙ্গে সজিতের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, চারিদিক নিস্তব্ধ কেবল টেবিলের ছোট ঘড়িটার টিক টিক আওয়াজ হইতেছে। ‘আপন মনেই যন্ত্রণায় দুএকবার উঃ আঃ করিয়া উঠিল; সুনীতির ঘরে খট করিয়া আলো জলিয়া উঠিল ও পরক্ষণেই সুনীতি ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। টেবিলের উপর নীলশেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটা জলিয়া দিয়া সজিতের মাথার কাছে নিঃশব্দে সরিয়া আসিয়া কপালে হাত দিয়া সহজ স্বরে প্রশ্ন করিল, ‘মাথার কি যন্ত্রণা হচ্ছে।’ সজিত চক্ষু মুদ্রিয়া বলিল, ‘উ বড্ড।’ সুনীতি একপাশে বসিয়া বীরে বীরে সজিতের মাথার চুলে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া টিপিতে লাগিল। সজিত অভিভূত হইয়া পড়িল। এই নিঃশব্দ সেবার মূল্য সে পরিশোধ করিবে কি প্রকারে? কোন অধিকারে সে সেবা লইতে চায়, সুনীতিকে সে কি দিয়াছে? যে নারী সারাক্ষণ পার্শ্বে থাকিয়া তাহার সুখ-সুবিধার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, তাহাকে আজ পর্যন্ত সে কি দিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সুনীতি ঘুমায়ে নাই, ঘুমাইলে এত মৃদু কাতরোক্তিতে উঠিয়া আসিত না। তাহার এই একাগ্রতার মূল্য সে কি দিয়া পরিশোধ করিবে। যাহাকে সে ভালবাসে না, তাহার সেবাই বা লইবে কি প্রকারে? কিছুক্ষণের জন্য সজিত বোধহয় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সুনীতির কোমল হস্ত তখনও মৃদুভাবে সজিতের কপালে সমানে বুলাইয়া বাইতেছিল। নিজের স্বার্থপর-তায় সজিত মাথার যন্ত্রণাও ভুলিয়া গেল, মৃদুস্বরে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলিল, ‘আমিত এখন সুস্থ হয়েছি, তুমি শুনে না কেন?’ সুনীতি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, তুমি জেগেছ তবে থার্মোমিটারটা দিয়ে নিই এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া থার্মোমিটার ধরিয়া সজিতের হৃদয়ে দিল, সজিত নিঃশব্দে

তাহার আজ্ঞা পালন করিল। সে যে নিজে ডাক্তার এবং সুনীতি তাহার অনাদৃত স্ত্রী তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। সুনীতি থার্মোমিটার ধাপে পুরিয়া রাখিয়া দিয়া সজিতের কপালে পুনরায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, সামান্যই জ্বর হয়েছে, কালই ছেড়ে যাবে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার মত সজিতের শরীর ও মনের অবস্থা এখন নাই, তবুও সে না মনে করিয়া পারিল না, সেদিন পাট্ট হইতে ফিরিবার পথে সজিত সুনীতিকে অবসর দেখিয়া হাত দেখিতে গিয়াছিল এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও সুনীতি সজিতের স্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল, সেই সুনীতিই আজ স্বচ্ছন্দে সজিতের শয্যায় বসিয়া নির্জন গৃহে তাহার সেবা করিতেছে, মুখের ভাব দেখা না গেলেও সজিত নিশ্চিত বলিতে পারে, সেখানে কোন ভাবের লুকোচুরি নাই, সজিতের স্ব স্ব সুনীতির নিকট লুপ্ত হইয়া; গেছে সে সেবাকারিণী অসুস্থের সেবা করিতেছে, কোনরূপ ভাবের প্রেরণা সুনীতিকে আচ্ছন্ন করে নাই। ইচ্ছাতির মতই সে শক্ত। সুনীতির মত সজিত দ্বিধা কাটাইতে পারিলনা, মৃদুস্বরে পুনরায় কহিল, যদিও রাত বেশী নেই তবুও—সুনীতি দৃঢ়স্বরে বাধা দিল, না, তুমি ঘুমাও, আমার ঘুম এখন আর হবে না। ক্লান্ত শরীরে সজিতের নিদ্রাই আসিতেছিল, সে পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

প্রভাতে অধিক বেলায় সজিতের নিদ্রা ভাঙিল। শরীর বেশ ব্যথার হইয়া গেছে, মাথার যন্ত্রণা একেবারেই নাই। রাজু অপেক্ষা করিতেছিল; সজিতের সাড়া পাইয়া গরমজল ইত্যাদি লইয়া আসিল এবং পরক্ষণেই বেয়ারা পথ্য আনিয়া হাজির করিল। জগৎবাবু সংবান পাইয়া হস্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং পুত্র সুস্থ আছে জানিবাও ডাক্তারকে ফোন করিতে গেলেন; কিন্তু সুনীতির দেখা পাওয়া গেল না। সজিতের কি জানি কেন মনে হইতেছিল, সুনীতি একবার আসিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। সারা সকালটায় সুনীতি একবারও আসিল না; যদিও নিয়মমাফিক সময়মত সবই আসিয়া হাজির হইতেছিল; একবার মনে হইল, ডাকিতে পাঠায়, কিন্তু সন্ধ্যা পৌরিল না এবং নিজে কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও সুনীতির উপর হঠাৎ তাহার অভিমান হইল। ক্ষুণ্ণভাবে বেয়ারার আনতি সেদিনের পত্রগুলি খুলিয়া দেখিতে লাগিল; একখানি পত্রে সিলোনের ছাপ দেখিয়া পত্রখানি তাড়াতাড়ি

খুলিয়া ফেলিল। পত্রখানি লিখিয়াছে স্বজিতের মামাতো বোন নীরা, তাহার স্বামী সেখানে খুব বড় কর্ম করেন, নীরা দেশে বড় একটা আসিতে পায় না। বিবাহের সময় স্বজিত মনের দৃষ্থে কাহাকেও খবর দেয় নাই; কিন্তু সব আত্মীয়স্বজনের ভিতর ঐ বোনটি স্বজিতের বড় আপনার; তাই বিবাহের পর স্বজিত সময়ে সংবাদ না দেওয়ার অনেক গল্প দেখাইয়া পত্র দিয়াছে, নতুবা নীরার বড় অভিমান হইবে। নীরা চার পৃষ্ঠা ধরিয়া উত্তর দিয়াছে। কয়েকটা লাইনের উপর স্বজিতের কোতুংল আকৃষ্ট করিয়া রাখিল। “তোমার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে না পেয়ে যত আমি দুঃখিত হয়েছি জিতুতা কিন্তু নীতির সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে জেনে ঠিক ততখানিই সুখী হয়েছি, জেনো। সেই নীতি যার Idial আমাদের মতে, আকাশ দিয়ে উড়ে চলত? সেই নীতিই আজ আমাদের বাড়ীর বো, ভারী আনন্দ হয়েছে ভাই। বরাবরই আমার ইচ্ছা ছিল, নীতিকে এই বাড়ীতেই বাঁধবার, কিন্তু তাকে ঘরে আনবার উপযুক্ত তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেতাম না; কিন্তু তুমি তখন বিলেতে; বাইরের সৌন্দর্য্য তোমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে; ভিতরের সৌন্দর্য্য হয়ত চোখে পড়বেনা; ভাবতাম, বোডিংএ আমরা সকলেই বলাবলি করতাম, নীতিকে যে বিয়ে করবে সে তপস্যা করছে। জান ওর কি নাম ছিল—আমরা ওকে Lady Younger Pitt বলে ডাকতাম। নিশ্চয়ই নীতির কাছে সে সব গল্প শুনেছ? নীতির চেয়ে বিদ্বা আছে, নীতির চেয়ে শুশ্রূষা বেশী জানে এমন মেয়ে আছে, নীতির চেয়ে বুদ্ধিমতী আছে, কিন্তু এক সঙ্গে নীতিকে পাওয়া মুশ্কিল, নীতির সেই “Give and take” Principle কেমন বুঝছ? আমরা ত অন্ধ হয়ে ওর Principle এর ফরমুলা বের করতাম। আমাদের পরম শুভ কামনা জেনো। নীতিকে এই চিঠি দেখিয়ে উত্তর দিতে বোলো, কেমন সংসার হচ্ছে জানাতে। নীরার স্বামী ও নীরার পত্রে শুভ ইচ্ছা জানাইয়া লিখিয়াছে—“বিদ্বা স্ত্রী পেয়ে স্বজিতদা তাদের ভুলিয়া গিয়াছে। স্বজিতের মুখের উপর ফোভের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সত্যি কি সে ভুল পথে চলিয়াছে?

না জীবনটাকে যত সহজ ভাবিয়াছিল তা নয়। স্বজিত পত্রখানা খামে ভরিয়া রাখিয়া স্বনীতিকে কিরূপে সংবাদ জানাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। স্বনীতিকে সহজ ভাবে সে গ্রহণ করিতে পারে নাই, সেই জন্য বাক্যালাপ করিতে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ করে। স্বনীতি আপন সম্মানে দীপ্ত; স্বজিতকে সে কৃপা করে কিন্তু স্বজিত তা পারে কই? স্বনীতি দিয়াই চলে, স্বজিতের ফিরাইবার শক্তি নাই; কিন্তু গ্রহণ করে সঙ্কোচের সহিত।

স্বনীতি পথের বাটা লইয়া প্রবেশ করিল। স্বজিতের খাটের পাশে টিপয়ের উপর রাখিয়া দিয়া স্বজিতের কপালে হাত দিয়া মুদ্রণের কহিল, কেমন আছ, জ্বর ত নেই দেখছি, কোন কষ্ট হচ্ছে না আর? অসতর্ক মুহূর্তে স্বজিতের অভিমান-দীপ্ত কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল—এতক্ষণে বুঝি আসবার সময় হ'ল? আমি কতক্ষণ ধবে প্রতীক্ষা করছি। কথাটা বলিয়াই তাহাদের সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়া তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। স্বনীতি থার্মোমিটার দেখিতেছিল, স্বজিতের মুখ দেখে নাই। কথা শুনিয়া তাহার মুখের ভাব কঠিন হইয়া আসিল, জ্বৎ ব্যঙ্গ স্বরে কহিল, ‘তাই নাকি’; কিন্তু তখনি স্বজিতের দিকে চাহিয়া সে অতিশয় লজ্জিত হইয়া উঠিল। স্বজিত অস্বস্থ এ অবস্থায় তাহাকে আঘাত করা স্বনীতির কিছুতেই উচিত হয় নাই। “সেখানে প্রেম নাই, সেখানে অভিমানই বা কেমন করিয়া আসে? কিন্তু ইহার পর উভয়েই নীরব হইয়া গেল। স্বনীতি টেবিলের উপরকার জিনিষ পত্র গুছাইতে বাস্তব রহিল। স্বজিতও নীরার পত্রের কথা বলিতে পারিল না। এবারো আসিয়া জগৎবাবু ও ডাক্তারের আগমন সংবাদ জানাইতে উভয়েই মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

সকলে চলিয়া যাইলে স্বজিতের মনে হইল, আজ মেল ডে নীরাকে পত্র লেখা হয় নাই, কিন্তু পত্র লিখিবার মত স্বজিতের মনের অবস্থা নয়। বিলাত হইতে ফিরিবার পর এই প্রথম মেল যাইবে, যে মেলে রীটা পত্র পাইবে না; তবুও স্বজিত সে জগৎ দুঃখ বোধ করিল না। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গলা সাহিত্যে নারীর দান

শ্রীমমতা রায়

(১)

চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ এই দুইজন অদ্বিতীয় কবি বাঙ্গালীর জীবনে ও ইতিহাসে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে ; কাশী-দাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ ধর্ম ও মানসিক রাজ্য অধিকার করিয়া আছে ; কিন্তু ইহাদের সমকক্ষ কি কোন মহিলা কবির পরিচয় আমরা বঙ্গসাহিত্যে পাই ? প্রত্যুত্তরে হয়তো নিরাশ হইতে হইবে কিন্তু যদি বাঙ্গালীর মনোরাজ্যের ও ভাবধারার সমস্ত অলিগলির খোঁজ পাওয়া যায়, যদি বাংলার অকৃত্রিম বেদনা-বোধের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে ইতিহাস লেখা হয় নাই, অথচ বাহ্য জাতীয় জীবনের পশ্চাৎপটে থাকিয়া বিভিন্ন রাগে রঞ্জিত করিয়াছে তাহাকে সর্বদা সুন্দরভাবে গঠন করিবার জন্য নারীর দান কম নয়। সুদূর পল্লীপ্রান্তে যে ছেলে ভুলান ছড়া, যুমপাড়ানি গান, ব্রতকথা, বারমাসী গান, উদ্ভূত হইয়া একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়িয়া একই ভাবস্রোতের বহা আনিয়াছিল, বাঙ্গালীর সন্তান পিতামহী ও মাতামহীর ক্রোড়ে থাকিয়া যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, বালিকারা শিবপূজায় বলিয়া যে মন্ত্র রচনা করিয়া ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিল তাহা সাহিত্যে ও জীবন গঠনে নিশ্চয়ই নগণ্য নহে। এইরূপে পল্লীপ্রান্তে বৃদ্ধ পিতামহী ও মাতামহীর গানে ও ঠানদিদির রসরচনায়, কেশ-বিছাসের ছড়ার মধ্য দিয়া যে সাহিত্য সকলের অজ্ঞাতে ভুমিষ্ট হইয়া ডাক ও থনার বচনে লালিত হইয়াছিল—তাহার বিশাল ধারাস্রোত ও প্রভাব রামাইপণ্ডিত হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একটানা স্রোতে চলিয়া আসিয়াছে। এই সকল অজ্ঞাতনানা মহিলারাই যে চণ্ডীদাস রামপ্রসাদের পূর্ববর্তিনী নহেন তাহা কে বলিবে ? এতদ্ব্যতীত সমস্ত সাহিত্যিকের সাক্ষ্যের পশ্চাতে নারীর সাধনা ও প্রেরণা যে কতখানি কার্যকরী হইয়া আছে তাহাকে চোখে দেখা না গেলেও কি কেহ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন ?

নানাকারণে বাঙ্গালার সমাজে নারীর যে স্থান নির্ধারিত

হইয়াছে তাহা পর্যাপ্ত পরিমাণে আত্মবিকাশের পরিপন্থী। জাতীয় জীবনের কর্মকান্ত জগত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হইয়া, তাহারা যে কেবল প্রভাবিত হইল তাহা নহে, নানাদিক দিয়া বঞ্চিত ও হইল—ইহাই তাহাদের আত্মবিস্মৃতির গোড়ার কথা। সমাজ বাহাদের অধিকার স্বীকার করে নাই, পুরুষ বাহাদিগকে অবলা বলিয়া কোনঠাসা করিয়াছিল, ধর্ম ও সংস্কারের চাপে বাহারা সোজা মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই—আমাদের নিকট হইতে, জাতীয় জীবনের মনোমুকুরে প্রতিফলিত আলেখ্য লিখনে ভার পড়িলেও যে তাহা সাধিত হওয়া হ্রস্ব তাহা বোধহয় খুলিয়া বলিতে হইবে না। সেইজন্যই তাহাদের নিকট হইতে স্নেহ সর্ব সাহিত্যের সন্দর্শন পাওয়া যায় নাই। জাতীয় জীবনের বহিঃপ্রান্ত হইতে নির্বাসিতা নারী অন্তঃপুরবর্তিনী হইয়াও সকল দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। বাহিরের কর্মজগত হইতে বিচ্যুত হইয়া হৃৎস্বের ও অশ্রুর হিসাব লইবার ভার পড়িল তাহার উপর। জীবনের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিতা হইয়াও তাহাকে মাতৃস্বের গৌরবের সমস্ত দায়িত্ব লইয়া জীবনকে দেখিতে হইল। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে যে সাহিত্য পাওয়া যায় তাহা বেদনায় পরিপূর্ণ, হৃৎস্বের ভারাক্রান্ত, মূর্ত্তিহীনতায় মনোর ও বন্ধনছেদনের প্রচেষ্টায় মগ্নিত। পুরুষের জীবনও যে খুব প্রশস্ত ছিল তাহা নহে ; কিন্তু যে বেদনার হৃৎস্ব-চাপ গোড়ায় গিয়া পীড়াগ্রস্থ করিল তাহার অধিকাংশ ভার বহন করিতে হইল নারীকে। ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্যন্ত যে সকল কবির নাম পাওয়া যায়—তাহার মধ্যে মহিলাকবির স্থান একেবারে শূণ্য নহে। সপ্তদশ শতাব্দীর চন্দ্রাবতীর নাম সর্বাগ্রে আমাদের মনে আসে। সামান্য ক্রটির জন্য জয়চন্দ্র জীবনে যে ভুল করিয়া বসিল তাহারই ফলে চন্দ্রাবতীর সমস্ত জীবন যে গভীর আত্মত্যাগের মধ্যে কাটিল তাহাও যেমন অশ্রুভারাক্রান্ত, তৎবিরচিত যে রামায়ণ-টির বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও সেই জীবনের ব্যর্থতার পরিচয়

বহন করে। ইহাতে যে জীবনের আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা মানব-সমাজ ও জীবন ইহাতে সম্পূর্ণ নিভূতে বিরাজিত। তাহাতে যে সমাজের ও জীবনের যোগাযোগ পাওয়া যায় তাহা নিবিড় সম্পর্ক-সঞ্জাত হওয়া অপেক্ষা আবহমান-কাল-পরিপুষ্ট ভাবশ্রোতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। সুতরাং পুরুষের দানের নিকট নারীর দান এই সমাজের মধ্যে একান্তভাবে নিস্ত্রাণ না হইলেও বিশেষ বৈশিষ্ট্য-সঞ্জীবিত নহে।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ফিরঙ্গী বণিকের ব্যবসা ও রাজনৈতিক কার্যের একটি বিশেষ কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল। শক্তি ও কূটনীতির দিকদিয়া ভারতীয় রাজশক্তি পরাভব স্বীকার করার ফলে ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসার পর যে পরিবর্তন আসিল—তাহাতেই নিহিত ছিল মুক্তির বীজ। রামমোহন তাহারই স্বপ্ন দেখিলেন। রামমোহন ইহাতে দয়ানন্দ পর্যন্ত তাহারই উপাসনা চলিয়াছিলো। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম ঢাল আমরা সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু আত্মবিশ্বস্ত জাতির প্রথম মুক্তি ও লুপ্ত চেতনার জাগৃতি আসিয়াছিল। পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সংমিশ্রণে বাংলার সংস্কৃতি একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করিল। সমাজের অনেকগুলি নিষ্ঠুর আচার ও মিথ্যা সংস্কার ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় হইল। নারীর চোখে যুগস্থর্ঘ্যের প্রথম প্রভাত কিরণ পড়িল। তাহার পরেও যদিও অতঃপর ইহাতে বহিজগতে আসিতে নারীর একশত বৎসর কাটিয়া গেল, তথাপি চিমনি ও কলের বাষ্পীর সহিত যন্ত্রদানব আসিয়া যে নাগরিক সভ্যতার আভাস দিয়া গেল তাহার ফলে বিশেষ সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ-জীবনের প্রকৃত মূল্য অনেক পরিমানে পরিবর্তিত হইতে বাধ্য হইল। নারীর সমস্ত দাবী ভারতীয় সমাজে এখনও স্বীকৃত হয় নাই কিন্তু য হা হইয়াছে তাহা নারী সমস্ত সম্মা দিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। উত্তরোত্তর তাহার পরিসর ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তরের সন্ধানে চলিয়াছে। বাংলার প্রকৃতির মধ্যে আলোছায়ার ভিতর যে স্রবের মুচ্ছনা বিরাজ করিতেছে, ধাতুশীর্ষে নীলিমার স্বচ্ছ বিস্তারে ও নদীকূলে যে গীত ঋতুপরিবর্তের সহিত বিচিত্র ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে তাহা অনায়াসে স্পষ্ট অনুভব বিহবল বহু-হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া ছন্দোবদ্ধ হইয়াছে। এই স্বাভাবিক ভার-প্রবণতার সহিত পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রকাশ-রীতির সম্মিলনে বাঙ্গালীর কাব্য-

সাহিত্য বিশেষ হ্রস্বশব্দ ইহিয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যক্ষেত্রে প্রতিভার সহিত ভাবের, ভাবার সহিত ছন্দের, রূপের সহিত রীতির যে অপূর্ণ সমন্বয় হইয়াছে—তাহা আশ্চর্যজনক ও অপূর্ণ।

কবির কাজ বিশ্ববস্তুর ও বিশ্বরসকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করা। তিনি অন্তরের অল্পভূতি সাহায্যে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন; বিশ্বের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন; তাই তাঁহার সাহিত্য সকল কালের ভাঙারে সঞ্চিত হইয়া আছে। কবির সৌন্দর্য্য দেউলে তাই বিশ্ববাসীর আমন্ত্রণ; কবিও সেই-জন্ত বিশ্বজনের। বাহিরের রূপ অন্তরের অল্পভূতি, বাস্তব ও কল্পনা, ইন্দ্রিয় ও মতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যপিপাসা ও হৃদয়বৃত্তি এক কথায় বাস্তব প্রীতি, ও অবাস্তব ধ্যান—ইহাদের মিলনে শ্রেষ্ঠকাব্য ঘটিয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভায় তাহারই সম্যক প্রকাশ। তাহার মণীষী কাব্য-সম্ভারকে বাণীর দেউলে—সেই স্থানে লইয়া গিয়াছে যেখানে বিশ্বের মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ কবির অর্ঘ্যে নিত্য পূজার সাজি পরিপূর্ণ থাকে। বঙ্গসাহিত্যে এই অধিকার বাহারা পাইয়াছেন তাঁহারাই অমরতা লাভ করিয়াছেন। সচঞ্চল সজীবতার প্রাণস্পর্শী রমনীয়ত্বের এই অর্ঘ্য মুমূর্ষী দেবীর সোপ-করণ নৈবেদ্য হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছে। এই উপকরণের শব্দ কঙ্কাল, রীতি অবয়ব, অলঙ্কার ভূষণ, বাক্যার্থ মন, ব্যঞ্জনা বুদ্ধি ও রস আত্মা। প্রতিভা ছন্দিত রীতির সাহায্যে ভাবকে বাসনা ও কল্পনার মধ্য দিয়া রসে রূপান্তরিত করিতে প্রয়াস পাইলে সাধারণতঃ কবি-প্রতিভায় পর্যাবসিত হয়। এই জাতীয় প্রতিভা নবীনচন্দ্রের কাব্যে তাদৃশ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের এই প্রচ্ছদ পটের উপর মহিলা কবির কাব্য প্রতিভা বিচার করিলেও নিঃসন্দেহে দেখাইতে পারা যায় যে ক্ষুদ্র পরিসর, অল্প সময় ও সুযোগের অভাবের মধ্যে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়াও বিশেষ বিশেষ স্থানে তাহার উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রতিভা বিরাজিত, প্রত্যেকেই পরিমার্জিত। আধুনিকতার সবুজের অভিযানে রূপ-ঐশ্বর্য্য ও নবীনত্বের চাপল্যে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র ও তলাইয়া গিয়াছেন, এবং সেইরূপে কামিনীরায়, মানকুমারী ও গিরীন্দ্র মোহিনী বিশ্বত

হইতে বসিলেও—সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদের দান চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। নগরের ভড়িতালোকের পার্শ্বে যদি সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত আকাশের তলে তুলসীমূলের প্রদীপের কোন মূল্য থাকে তবে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্জীবিত জীবনের যে ছন্দকে তাঁহারা রূপায়িত করিয়াছেন তাহারও মূল্য নির্দ্ধারিত হইবেই। অতাব ও ছঃখবোধের তাড়নায় একদিকে তাহা যেমন বেদনাসঙ্কুল, আশা ও সাহসের মহিমায়-ও তেমনি উদ্দীপ্ত; অলঙ্কার-বৈচিত্র্যে সঞ্জীব, ছন্দভঙ্গিমায় উন্মুখর, পদ-লালিত্যে কমনীয়। তাহাদের অনেক কবিতা হয়তো গভীর ভাবদ্যোতক নয়, কল্পনার রথে চড়াইয়া বহুদূর লইয়া যায় না, কিন্তু সহজ বর্ণনায় সাধারণ বিষয়কে যে অসাধারণ করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহার নির্দেশ বর্তমান। মানকুমারী “কাব্যকুমারঞ্জলি” ও “কনকাজলিতে” বাংলার পল্লীপ্রাঙ্গণ, তুলসীতলা, শিবপূজা ও নিত্যনৈমিত্তিক ভাবগুণিকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। সরলতা ও সরসরচনা-নৈপুণ্যে তাঁহারা বৈশিষ্ট্য সঞ্জীবিত। তাহার মধ্যে ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার ও যমকের ছড়াছড়ি নাই কিন্তু বর্ণনা ‘স্বচ্ছলতায় সুপরিপুষ্ট।’ নমো দেব মহাদেব;” আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ, পতিতোদ্ধারিণী প্রভৃতির মধ্যে তাহাই বিরাজিত। মানকুমারী বহু যে শুধু ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াই যশ অর্জন করিয়াছেন তাহা নহে। মহাকাব্য রচনাকার্যেও বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার বীরকুমার বধ কাব্য এই বিষয়ে প্রাধান্য লাভের জলন্ত সাক্ষ্য। এইক্ষেত্রে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মাইকেল প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুন্দর অলঙ্করণের বিশেষ বিজয়-কেতন ও হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ সমর্থক। বীরকুমার বধ কাব্যের সরলতা ও ভাবের দ্যোতনায় মহাকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে যেন কোন অংশে সমকক্ষ এবং কোন কোন অংশে বৈশিষ্ট্য লাভও করিয়াছে। ইহা কেবল ছন্দ ও অলঙ্কার রীতির সাহায্যে বাঁচিয়া নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপে শিরকুশলতা ও কাব্যরসের সন্ধান দেয়।

মানকুমারী বাহার সন্ধান দিয়েছেন সেই বেদনাবোধের সহিত আশার সংমিশ্রণে কামিনী-রায়ের কাব্যগুলি অপূর্ণ সার্থকতায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রশোকে তিনি গভীর বেদনা-বোধকে রূপায়িত করিয়া বলিয়াছেন—

“তোমার দেহের সাথে হলো ভঙ্গীভূত
আমার অগম্য আশা।”

তিনিই আবার প্রভাতকে বরণ করিয়া বলিয়াছেন :—

“আয়রে প্রভাতে নিতে মার আশীর্বাদ,
প্রাণাধিক, আজ যেরে জন্মদিন-তোর;
ষোড়শ কলায়-পূর্ণ; সৌন্দর্য্য কৈশোর;
দাঁড়া আজ পুত্র মিত্র। নিশার বিবাদ
মিশে যাক উষালোকে।”

তাহার—“না-না না-মানবের তরে”র মধ্যে সেই সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাই “আশার স্বপ্নে” তিনি দেখিয়াছেন—

“দেখিলু যতক ভারত-সন্তান
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান
আসিছে যেন গো তেজো মূর্ত্তিমান
অতীত সুদিনে আসিত যথা।”

এবং এতদ্ব্যতীত তাহার “ধরার দেবতা” ও “প্রত্যেকে আমরা পরের তরে” চিরদিনের আদরের সামগ্রী হইয়া আছে। সেইজন্ম হেমচন্দ্র বাহা বলিয়াছেন তাহা প্রনিধান ষোণ্য-ফলতঃ বাংলা ভাষায় এইরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি। কবিতাগুলি আজকালকার ছাঁচে ঢালা নয়। বাহারা এই ছাঁচের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদের নিকট এই পুস্তক কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহা বলিতে পারি না; তবে এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বাহারা নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিবেন তাঁহারা এই লেখিকার অসাধারণ প্রতিভা ও প্রকৃত কবিত্ব শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের ভাবার সবলতা, রচনার নির্মলতা এবং সর্বত্র হৃদয় গ্রাহিতাশ্রমে নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি।”

এদিকে গিরীন্দ্র মোহিনী দেবীর “গ্রামাছবি” খানি ছবির মতই সুপরিষ্কট—

‘মাটিতে নিকানো ঘর দাওয়াগুলি মনোহর
সুস্থখেতে মাটির উঠান।

খড়ো চালখানি ছাঁটা লতিয়া করলা লতা
মাচা বেয়ে করেছে উঠান।

পিঁজারায় বস্ত্র বাঁধা ‘বউকথা’ কহে কথা
বিড়ালটা শুইয়া দাবাতে

মঞ্চে তুলসী চারা, গৃহে শিল্প কড়ি বাঁরা
থোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।”

যে কবিতার বিষয়বস্তু দৈনন্দিন ঘটনা ও ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তকে
কিম্বা মহাকাব্যের বিশালতাকে অবলম্বন করিয়া গভী
ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাই ইন্দিরা দেবী, প্রিয়দা-
দেবী, হেমলতাদেবী, রাধারাণা দেবী, ছায়া দেবী, মৈত্রেয়ী,
অপরাজিতা, উমা ও নিরুপমা দেবীর হস্তে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ
করিয়াছে। কানিনী রায়ের একটানা স্রের সেখানে যতিচিহ্ন
পড়িয়াছে। তাহার বিষয় বৈচিত্রে, ছন্দে, ভাবদ্যোতনায় সঙ্গীত
ধর্ম সত্যেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথ কালিদাস রায় বা কিরণধনের
সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে। ইন্দিরা দেবীর “অভিমানী”—

হাসি খেলার অভিনয়ে অঞ্চলে ঢাকি
ভেবেছিলেম এমনি করে তোমায় দেব ফাঁকি
বুকে আমার যে সুর বাজে গুঞ্জরে যা মর্ম্মমাবে—

ভেবেছিলেম স্রের সাজে রাখবো তারে ঢাকি
হাসি খেলার মিথ্যাছলে তোমায় দিয়ে ফাঁকি !
প্রিয়দা দেবীর “আশাভীতে—
তোমায় পারি না বাঁধিতে
নিত্য নবীন ছন্দে গাঁথিতে
ওরে মোর ভালবাসা
তোমায় পারি না বাঁধিতে ভাবে রূপ দিতে
তেমন নাহিকো ভাষা।

নিরুপমা দেবীর—আঁখি সম্বন্ধে :—

কে বলেরে আঁখি ? ও যে মনের দর্পন
ঐ ছুটি কালো তারা ও যে অমৃতের ধারা
অসীমে সমীমে বাঁধে সেতুর মতন।

(ক্রমশঃ)

শরতে

কুমারী গীষ্মকণা সর্বাধিকারী

শরতের রাণী এসেছে !

জগজ্জননী আবাহনে আজি
অপরূপ সাজে সেজেছে।

সাথে সে এনেছে বিবিধ কুহুম—

চম্পক, জবা, শতদল ;

কুমুদ-কল্লারে ভরিয়াছে দেশ

রবির কিরণে ঝল মল !

কণ্ঠে দোলা'বে শেফালির মালা,

হস্তে পরা'বে যুথিকার বালা,

অপরাজিতার নূপুর গড়িয়া

মায়েরে সাজাবে রাণী ;

মায়েরে পুজিয়া মায়েরে তুষিয়া

শুনবে অভয় বাণী !

আকাশ-বাতাসে ঝঙ্কত আজ

মা'র আগমনী গান,

দোয়েল-কোয়েল স্রমধুর স্রের

ধরে পঞ্চম তান্।

কাশের গুচ্ছ চামর ঢুলায়

ক্ষেতে ক্ষেতে ধান্ নৈবেদ্য সাজায়

রক্ত পলাশ আরতির দীপ্

জ্বলেছে আজিকে যতনে,

হুর্গতিহরা শুভ-আবাহন

ধ্বনিত গগনে পবনে !

সুনীল অশ্বরে নাহি মেঘ লেশ,

কনক কিরণে ভ'রে গেছে দেশ

জাগ গো স্তম্ভ জাগ গো ভক্ত

পূজিতে সিংহবাহিনী ;—

হুর্গতদের দৃষ্ট দূরিতে

আসিছে আনন্দদায়িনী !

আমার পল্লীনিবাস*

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

ইষ্টারের ছুটি। এক পুত্র আই, এস, সি পরীক্ষা দিতেছিল তাহার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আর এক পুত্র ও এক পৌত্রের স্কুলে ম্যাট্রিক পরীক্ষার সিট পড়িয়াছে—তাহাদের খুব মজা, লম্বা ছুটি। বাটাতে পরামর্শ চলিতে লাগিল কোথাও বেড়াইতে যাওয়া যাউক, কিন্তু যাইবার জায়গা আর স্থির হয় না। অবশেষে স্থির হইল দেশেই যাওয়া যাক। দেশ মানে Home তবে বিলাত ফেরতদের বিলাত নহে, আমার পল্লীনিবাস।

আমার পল্লীনিবাস হুগলি জেলার অন্তঃপাতী হোয়েড়া নামক এক গণ্ডগ্রামে। কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল দূরে। তবে সুবিধা এই উহা একেবারে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত। রাত দুপুরেও সেখানে যাওয়া যায়। নিকটতম রেল স্টেশন খনিয়ান—গ্রাম টিহার প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আমাদের গ্রামখানি একেবারেই গণ্ডগ্রাম। পূর্বে ইহা যে বহু সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার প্রমাণ গ্রামের সর্বত্র পাওয়া যায় দুইটি বিষয় হইতে—প্রথম, বহু শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও তত্র অবস্থিত উপবাসী ও ভগ্ন শিবলিঙ্গ নিচয়ের অবস্থিতি। দ্বিতীয়, অনেক বড় বড় ভগ্ন দ্বিতল গৃহরাজির ইষ্টকরাজির লুই ইটের স্তুপের আকারে পরিণত। গ্রামখানি আয়তনে কলিকাতার গড়ের মাঠের চেয়ে কিছু বড় হইবে। মধ্যস্থলে, আমরা চলিত কথায় যাহাদিগকে ভদ্রলোক বলি, তাঁহাদের বাস। তাঁহাদের বাটাগুলি অধিকাংশই পাকা দালান। জল অনাচরনীয় জাতীগণের মাটির ঘর। গ্রামের রহিদিকে পশ্চিমের এক অংশে কয়েক ঘর মুসলমানের বাস।

ভদ্রলোকদের মধ্যে দুইটি জাতির প্রাধান্য। ব্রাহ্মণ ও সদগোপ। সদগোপগণই গ্রামের জমিদার ও সেই জন্য প্রভূত ক্ষমতাসালী; কায়স্থ ও বৈদ্য নাই। গ্রামের পূর্বে প্রান্তে কয়েক ঘর গোয়াল আছে তাহারা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। হইবারই কথা। তাহারা যে দুধ বিক্রয় করে তাহার অর্ধেকই জল। অনাচরনীয় জাতির মধ্যে আছে ডোম, মুচি, হাড়ী, বাগদী,

জেলে প্রভৃতি। ইহারা সাধারণতঃ মজুর বা কৃষাণের কার্য করে এবং কতক কতক জাত-ব্যবসাও করে। মুসলমানদের অধিকাংশই কৃষাণের কার্য করে। কৃষাণের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাওয়াতে সাঁওতাল পরগণা হইতে বহু সাঁওতাল আসিয়া গ্রামের ভাবৎ পতিত জমিতে কুঁড়ে ঘর তৈয়ারি করিয়া বাস করিতেছে। ইহারা খুব কশ্মঠ ও পরিশ্রমী। দিন মজুরী করিয়া ও জমি ভাগে চাষ করিয়া ইহারা বেশ স্বচ্ছল অবস্থাতেই আছে।

আমি এই গ্রামের মাইনার স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলাম, পাশ করি নাই। এগার বৎসর বয়স্ক কালে এই শ্রেণী হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতার আসিয়া আর্চামিশন ইন্সটিটিউশনের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হই। বেশ স্মরণ আছে, মাইনার ক্লাসের অধীত অক্ষ শাস্ত্রের বাঙ্গালা চার ও ইংরাজী স্কুলের ইংরাজী আট গুলাইয়া ফেলিয়া অক্ষশাস্ত্রের প্রথম অর্ধবার্ষিক পরীক্ষাতে একশতের মধ্যে মাত্র আঠার নম্বর পাইয়াছিলাম। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ হইলেও ত্রুটি পিতার নিকট অনেকগুলি চপেটাঘাত পাইয়াছি। শেষে ওটা সড়গড় হইয়া যাওয়াতে বার্ষিক পরীক্ষায় ৮৫ পাইলাম দেখিয়া পিতৃদেব খুলী হইলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সকল বিষয় বাঙ্গালায় পঠনপাঠন হইতেছে। পাশ করিয়াই ছেলেরা আই, এস, সি তে সকল বিষয় যখন ইংরাজিতে পাঠ করিবে তখন অনেকে আমারই দশাগ্রস্থ হইবে বলিয়া ভয় করিতেছি।

সে যাহা হউক, স্কুলটি এখনও আছে, তবে তাহার অবনতি হইয়াছে। এখন তাহা মাইনার হইতে অপার প্রাইমারী স্কুলে পরিণত হইয়াছে। Co-education দেখিলাম। জন চল্লিশ ছেলে ও জন আঠেক মেয়ে স্কুলে পড়ে। গ্রামের লোকসংখ্যা কত ঠিক বলিতে পারিতেছি না। সেন্সস ফিগার দেখিতে পাই নাই। কত ঘরই বা লোক আছে তাহাও আমার ঠিক জানা নাই। সেটেলমেন্টের পরচায় উহা পাওয়া যাইবে। তবে আন্দাজি বলিতেছি গ্রামে প্রায় দেড়শত ঘর লোকের বাস।

* এই প্রবন্ধটি দুই বৎসর আগে লেখা। গত ডিসেম্বর মাসে যখন বহু লোক বোমা পড়িবার ভয়ে কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রামও ভর্তি হইয়া গিয়াছিল। আবার সবাই গ্রাম ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। গ্রাম পুনর্মুখিকো ভবঃ হইয়াছে। পঃ নিঃ

তাহাদের মধ্যে ভদ্রলোক হইবে জন-পকাশ ঘর। প্রত্যেক ঘরে যদি পাঁচ জন লোক ধরা যায়, তবে গ্রামে প্রায় সাড়ে সাত শত লোকের বাস। উহার মধ্যে ভদ্রলোকের সংখ্যা হইবে আড়াই শত; অবশ্য স্ত্রী পুরুষ ছেলে পুতে নইয়া। পূর্বে আরও বহু লোকের বাস ছিল। বাল্যকালে দেখিয়াছি, আমাদের বাটীর আশেপাশে অনেক গুলি গৃহস্থের বাটী দিল। তাহারা হয় এখন নিবংশ না হয় অস্তিত্ব গিয়াছে। তাহাদের বাটীগুলি এখন প্রায় নিশিচহ্ন; জঙ্গলে ভর্তি হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামের মোটামুটি বিবরণ পাইলেন। বিশেষ বিবরণ কিছু কিছু না দিলে গ্রামের ছবিটা স্পষ্টতর হইবে না। মনে করিতেছি যে ‘গ্রামে কিই বা আছে’, আর, ‘কিই বা নাই’ এই দুই পর্যায়ে সংবাদগুলি ফেলিলে গ্রামের ছবিটা ফুটাইয়া তোলা যাইবে। তাই করি।

গ্রামে কি কি আছে

(১) পুকুর ও ডোবা—গ্রামে ঢুকিয়া প্রথমই নজরে পড়ে অসংখ্য পুকুর ও ডোবা। ইহাদের মধ্যে বড় বড় পুকুরগণও দুই চারিটি আছে। এইগুলি কাটান হইয়াছিল অবশ্য প্রধানতঃ পানীয় জল, বাসন ও কাপড় কাচা ও স্নানের জন্ত। ডোবাগুলি এখন প্রায় সব মজিয়া গিয়াছে, উহার জল এখন কেহ খায় না। ঐগুলি বাসন মাজা ও কাপড় কাচার জন্তই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইতেছে। তাহা ছাড়া পূর্বে মাটির-ঘরই অধিকাংশ ছিল। ঐগুলি নির্মাণের জন্ত প্রয়োজনীয় মাটির জন্যও ডোবা খোঁড়ার আবশ্যকতা ছিল। অবশ্য সকল পুকুর ও ডোবার জলে বাঙ্গালীর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য মৎস্য পালিত হইয়া থাকে। এই সর্ববিধ কারণে পল্লীগ্রামে পুকুর ও বিশেষতঃ ডোবার এতই প্রাচুর্য্য হইয়াছে যে ধরণ আমার বাটীর চতুর্দিকে canon to the right of them, canon to the left of them এর মত পুকুর আছে—right, left, front ও back লইয়া কম করিয়া ছয়টি। ইহাদের মধ্যে মাত্র একটির জল পানোপযোগী। বাকীগুলি সব ডোবা।

পুকুরগুলি সবই ভাগের মা—সরিকানি। মাছ-ভাগের সময় এক বা আধ আনি ভাগিদারের ভাগ্যে মাত্র একখানা মাছও পড়িতে দেখা যায়। সরিকানি বলিয়া পুকুরগুলি পরিষ্কার হয় না। পানায় ভর্তি, জলের রং সিদ্ধি গৌলার মত সবুজ।

উহাদের চতুর্দিকের পাড় মলমূত্র ত্যাগের জন্ত আবাল বৃদ্ধ বর্ণিতা নির্বিশেষে সকলেরই জন্য নির্দিষ্ট। তার উপর ঐ সকল পাড়ে রোপিত তাল-কাঁঠাল-চ্যুত বিষ্ণু-জাম-বংশ নারিকেল বৃক্ষের সারি হইতে অসংখ্য পাতা ও ডাল পুকুরের জলে অনবরত পড়িতেছে ও পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির করিতেছে। পানীয় জলের জন্য নির্দিষ্ট কোনও পুকুরিনী (reserved tank) নাই। কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি হইলে রোগীর বিছানাপত্র পুকুরিনীর জলেই ধোয়া হয় এবং সেই জল তৎক্ষণাৎ ঘড়ায় ভরিয়া বাটীতে লইয়া গিয়া পল্লীবধূরা কলেরা বিস্তারের সহায়তা করেন। একজন ইংরাজ সতাই বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামের পুকুরের জল-diluted sewage. এই সকল পুকুর ও ডোবার জলেই মশককুল সবগে বংশ বৃদ্ধি করে এবং তাহারই ফলে পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার দ্রুত বিস্তৃতি সাধিত হয়। পুকুরগুলি পরিষ্কার করিয়া মালিকদের নিকট হইতে খরচ আদায় করিবার ক্ষমতা গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের আছে। কিন্তু পরের ইলেকশানে ভোট পাওয়া যাইবে না এই ভয়ে কোনও মেম্বারই এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না। তবে ভরসা এই যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কয়েকটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে ইন্দারা আছে এবং ইউনিয়ন বোর্ড গোটা দুই তিন টিউব ওয়েল করিয়া দিয়াছেন।

(২) জঙ্গল—গ্রামের দ্বিতীয় প্রধান দ্রষ্টব্য জঙ্গল। আমি কবি নহি, বৈজ্ঞানিক। এই সকল জঙ্গলের শোভা আমি মোটেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহি। গ্রামে বড় বড় গাছ থাকুক, তাহাতে আপত্তি করি না। বড় বড় গাছের সংখ্যাও ত কম নাই—মাল্লু প্রভৃতি একশত বৃক্ষ ত আছেই। থাকুক। এই সকল গাছে কাক, চড়ুই, শালিক হইতে আরম্ভ করিয়া দোয়েল, শ্রামা, ফিঙ্গা, মায় বসন্তকালের কোকিল পর্যন্ত বাস করে এবং কবিতার খোরাক যোগায়। কিন্তু লতা-গুহ্ম সমন্বিত অহিফুলের আবাসস্থল জঙ্গলে যে গ্রাম ভরিয়া গেল। লোকের বসতি যতই বিরল হইয়া আসিতেছে, জঙ্গলও ততই দ্রুত বর্ধিত হইতেছে। অশুখ বৃক্ষ শিবমন্দিরকেও মানিতেছে না, পরিত্যক্ত মন্দিরগুলির চূড়া ভেদ করিয়া গগনস্পর্শী হইবার স্পর্ধা করিতেছে। স্ফুজল স্ফুলা বঙ্গভূমির উর্বরক্ষেত্রে এই সকল জঙ্গল বড়ই দ্রুত বাড়িতে থাকে। পল্লীগ্রামের সর্প-ভীতি আদৌ অমূলক নহে। এই সকল জঙ্গল পুত্রপৌত্রাদি

ক্রমে বর্দ্ধিত ও লালিত পালিত অহীকুলের অবস্থান ভূমি। কিন্তু এই সব জঙ্গল কাটে কে? গ্রামের বর্দ্ধিস্থ লোক যাহারা, তাহারা ত সব গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছেন। আছেন ত যত বিধবা নিষ্কর্যা যুবক ও বালখিল্যের দল। জঙ্গল কাটাইতে পারে—ইউনিয়ন বোর্ড। তাহারা কিছু করিবে না। পল্লী-গ্রামও ধ্বংসের মুখে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে।

(৩) ম্যালেরিয়া—হুগলি, বর্দ্ধমান, চব্বিশ-পরগণা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহ ম্যালেরিয়ার ডিপো। অতো পচা ডোবা যেখানে, সেখানে ম্যালেরিয়ার বাহন মশককুল যে ম্যালেরিয়া ঘরে ঘরে বহন করিয়া আনিয়া দিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ছেলে পুন্দের পেটজোড়া লিভার পিলে, ডিগ্‌ডিগে সুরু চেহারা। সোয়ান যাহারা তাহারাও শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত উলোট পালোট করিয়া বার বার জরে ভোগে। পৌষ মাসে আবার বাড়িয়া ওঠে। জ্বরও হয়, জর ছাড়িলে ভাতও খায়। তাহাদের অধিকাংশ মরিবার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বড় একটা ঔষধ খায় না। পয়সা কোথা পাইবে? পয়সার অভাবে মশারিও কিনিতে পারে না। মশাই যে ম্যালেরিয়ার বাহন তাহাও তাহারা জানে না। আমি দেশে যখন যাই, সন্ধ্যা হইলেই মশারির ভিতর প্রবেশ করি। সন্ধ্যার লোকজন দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মশারির ভিতর হইতে আমাকে কথাবার্তা কহিতে দেখিয়া তাহারা মনে করে—নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ। তাহাদিগকে যখন বলি যে মশার কামড় হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে—তখন তাহারা অবিস্বাসের হাসি হাসে। তাহা ছাড়া কুইনাইনের বড়ির ফাইলও সঙ্গে লইয়া যাই। দু দিন অন্তর চারি হইতে আট গ্রেণ কুইনাইন বাড়ীর সকলকে খাইতে দিই। ভয়ে ভক্তিতে তাহারা খায়। এইরূপে অনেক বার দেশে গিয়াও ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি। ম্যালেরিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ উৎসন্ন গেল। ইহার প্রতিকারের যে যে উপায় আছে তাহা সরকারি প্রবন্ধেই নিবদ্ধ আছে—কাজে কিছুই হয় না। জঙ্গল কাটা, ডোবা ভরাট, অন্ততঃ পরিষ্কার করা, তাহাতে কই, মাগুর, সিজি প্রভৃতি মশকভিষ অহারকারী মৎস্যের আবাদ করা ও জলে কেরোসিন দিয়া ভিষ নষ্ট করা, ম্যালেরিয়া হইলে যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন খাওয়া, ঘরে ঘরে মশারি ব্যবহারের প্রচলন, গ্রামে গ্রামে পাশ

করা ডাক্তার বসান প্রভৃতি সবই ব্যয় সাপেক্ষ। এ সব করে কে? ফলে যাহারা রোজগার করেন তাহারা “যঃ পালয়তি সঃ জীবতি,” পল্লী অবলম্বন করেন। যাহারা তাহা পারে না, তাহারা পল্লীগ্রামে জীবনমৃত হইয়া বাস করে।

(৪) বিধবা—গ্রামে কিছুদিন থাকিলেই শীঘ্রই দৃষ্টি পতিত হইবে, গ্রামের বিধবার সংখ্যার উপর। আশে পাশে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে দেখিতে পাই যে সেই সেই বাড়ীতে আছেন মাত্র এক একটি বিধবা। কর্তার অধিকাংশ স্থলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, রাখিয়া গিয়াছেন এক একটি বিধবা। এই সকল বিধবা নাবালক ও স্থল বিগেমে সাবালক পুত্র ও কন্যা লইয়া খুশুরের ভিত্তি কামড়াইয়া পড়িয়া আছেন। আবার এই সকল বিধবাদের মধ্যে অনেকগুলিই কর্তাদের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। দাঁড়ান, আমি গুণিয়া বলিতেছি। আমার বাটার আশে পাশের বাটাগুলিতে ছয়জন বিধবা আছেন, তাহার মধ্যে চারিজন সধবা অবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। বিপত্তাকের সংখ্যা এ গ্রামে খুবই কম, মাত্র একজনের নাম জামি। তিনি মৃতদার হইয়া আর বিবাহ করেন নাই। ভালই করিয়াছেন; তিনিও আর একটি বিধবা রাখিয়া যাইতেন। ঘরে ঘরে এক একটি বিধবা কর্তাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যে, এই গ্রামে সধবা অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা খুব কম হইবে না। অন্ততঃ পাঁচ মাথায় সিঁদুর পরেন, একরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি কম। এই সকল বিধবাদের মধ্যে যাহারা গরীব তাহাদের বড় কষ্ট। ইহাদের সংসার কিরূপে চলে পরে বলিব।

(৫) দলাদলি—গ্রামে এত যে দারিদ্র্য ও রোগের প্রাবল্য, তবু সেখানে দলাদলির অভাব নাই। পল্লীগ্রামে পর স্পরের সহিত সৌহারদের কথা খুবই শোনা যায়, কিন্তু কাজে ত বড় একটা দেখিতে পাই না। সকল গ্রামেই সামান্য জমি জমা লইয়া বা সন্নিবে সন্নিবে মধ্য মধ্য সদরে মামলা ত লাগিয়াছে আছে। মামলা বাধাইয়া দিবার ও পরিচালন করিবার লোকেরও অভাব নাই। সেই সব মামলায় হারজিত অহুসারে কোনও সামাজিক ছুতানাতায় বিপক্ষপক্ষীয় লোক-দিগকে জন্ম করিবার উদ্দেশ্যে দলাদলির আরম্ভ হয়। ক্রমে মারামারি, পুলিশ ফৌজদারি, মাথাকাটাফাটিও ঘটিয়া থাকে। গ্রামের জমিদার অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল দলাদলির পৃষ্ঠপোষক এবং পুরোহিত ও নাপিত উহাদের যন্ত্রস্বরূপ। ইউনিয়ন বোর্ড

স্থাপিত হওয়ার পর হইতে অনেক স্থলেই গ্রামের অধিবাসী ঐ বোর্ডের মেম্বার নিচয় ও প্রেসিডেন্ট মহাশয় স্বয়ং দলাদলির খুব বড় পাণ্ডা। তাঁহারা ভাল একটা করিতে পারেন না, মন্দ করিতে তাঁহাদের অনেকেরই উৎসাহ ও আগ্রহ। ম্যালেরিয়ার পরই দলাদলি বঙ্গের গ্রাম সমূহের সর্বনাশ সাধন করিতেছে।

(৬) কৃষিজাত দ্রব্য—পূর্বেকার কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া অনেকে হয়ত বলিবেন, মশাই, পল্লী গ্রামের সবই কি মন্দ? ভাল কি কিছুই নাই? আছে না, নিশ্চয়ই আছে। নহিলে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বঙ্গের তথা ভারতের লক্ষ লক্ষ পল্লী গ্রামের অস্তিত্ব আছে কি করিয়া! দেশের প্রধান সম্পদই ত পল্লী-গ্রামে। প্রত্যেক পল্লীগ্রামের চতুষ্পার্শ্বে দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যহিত আমাদের সকলের অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেছে। পল্লীগ্রামের কৃষককুলহিত ম্যালেরিয়ার ভূগিয়া ভূগিয়াও আমাদের ডান হস্তের জোগাড় করিয়া দিতেছে। শরৎ ও হেমন্তকালে বঙ্গের চক্রবালরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অনন্ত ধান্যক্ষেত্রগুলিতে জাত ধান্যগুচ্ছের শোভা যিনিই স্বচক্ষে একবার দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন, পল্লী-গ্রামের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি। প্রাবৃটের অজস্র বারিধারায় একান্ত সিক্ত হইয়া পল্লীগ্রামের কৃষককুল ধাত্ত রোপণ করিয়াছে। নব কিশলয় সদৃশ ধাত্তের এই ছোট ছোট গুচ্ছগুলি ক্রমে বদ্ধিত হইয়া বঙ্গের সমস্ত মাঠকে এক নয়নাভিরাম হরিৎবর্ণের দিগন্ত বিস্তৃত কমলার আসনে পরিণত করিয়া ফেলে। পরে হেমন্তের আগমনে ও উহার শেষ পর্য্যন্ত সেগুলি হরিদ্রাভবর্ণে পরিণত হইলে শীষ সমেত কর্তিত হইয়া কৃষককুলের বাটীতে আনিত হয়। স্তব্ধবর্ণরঞ্জিত ধান্যগুলি কৃষকেরা কতক মরাই ঝাধিয়া রাখিয়া দিল—কতক তড়ুলে পরিণত করিল। নবান্ন উৎসব ঘরে ঘরে প্রতাপালিত হইল। সহরবাসী আমরাও নূতন চাউলে নবান্ন করিলাম। এইরূপে কোটি কোটি মন ধান্য পল্লীগ্রামের কৃষককুল পল্লীর মাঠ হইতে উৎপন্ন করে।

পল্লীগ্রামে অবশ্য শুধু ধানই হয়, এমন নহে। আলু পটল, বেগুন, তরিতরকারী, শাকসজি, গুড়, দুধ, ছানা সবই উৎপন্ন হয় পল্লীগ্রামে। মাছও আসে পল্লীগ্রামের পুকুরিগা, নদী হইতে। বাঙ্গালার শত করা ৮০ জন অধিবাসী কৃষি জীবী। ইহাদিগকে ম্যালেরিয়া, অহিকুল, দারিদ্র্য, জল, দলাদলি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করা যায় তাহার কার্য্যকরী উপায়

যাহাতে উদ্ভাবিত হয় তাহার জ্ঞান সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

গ্রামে নাই কি কি?

পল্লীগ্রামে প্রধানতঃ নাই শিল্প। পূর্বে হিন্দু সমাজে বিভিন্ন শিল্প বিভিন্ন খণ্ড জাতির পেশা ছিল। তখন আধুনিক যন্ত্রযুগ আরম্ভ হয় নাই। পল্লীগ্রামের স্বল্প প্রয়োজন গ্রামের শিল্পীরাই যোগাইত। যান্ত্রিকযুগে এই সকল জাতি গ্রামে প্রায়ই নাই, সেইজন্য বিবিধ শিল্পও গ্রাম হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমাদের গ্রামেও হইয়াছে তাই। সর্বত্র ঐ একই ব্যাপার। আমাদের গ্রামের হিসাবটা এখানে দিলাম।

পুরোহিত—মাত্র একজন আছেন। তিনিই গ্রামের বেদবাস, মহু এবং রঘুনন্দের মিলিত সংস্করণ। তাঁহাকে ঘে দল হাত করিতে পারিবে, গ্রাম্য দলাদলিতে গেই দলই জিতবে। পূর্বে পুরোহিত আরও অনেক ছিল। এখন তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ অগ্ন্যত্র চাকুরি বা অন্তঃ কিছু করেন।

মন্সরা—এক ঘর আছে।

কুমার—নাই। আগেও ছিল না।

তাঁতি—নাই। পূর্বে পাঁচ ছয় ঘর ছিল। এখন এক ঘরও নাই। মহাত্মা গান্ধীর চরকা ও তাঁতের সপক্ষে আন্দোলন এখানে একেবারেই ব্যাহত।

কলু—নাই। পূর্বে একঘর ছিল। কলের তৈলের ব্যবহারের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কলু অন্তর্হিত হইয়াছে।

ছুতার—নাই। গুলিলাম একজন মুচি কিছু কিছু ছুতারের কাজ শিখিয়াছে।

জেলেন—নাই বলিলেই হয়। পূর্বে অনেক ঘর ছিল। তাহাদের ছেলেদের মধ্যে দুই একজন জেলের কাজ করে। দেশে রোজ মাছ পাওয়া যায় না।

মুচি—জাতি মুচি দুঘর আছে। কিন্তু তাহারা চামড়ার কাজ করে না।

কামার—নাই। পূর্বে একজন ছিল।

ধোপা—নাই। গ্রামান্তর হইতে একজন আইসে। অধিকাংশ বাটীতে মেয়েরাই সোড়া ও সাজিমাটি দিয়া ‘ফারে’ কাপড়-চোপড় কাচিয়া লন।

ডাক্তার—পাশ করা ডাক্তার একজনও নাই। তিনজন বইপড়া ডাক্তার আছেন—দুইজন হোমিওপ্যাথি ও একজন এলোপ্যাথি ঔষধ দেন। ইহারা কেহই কোনও দিন কোনও মেডিকেল স্কুলের সাইনবোর্ড পর্যন্তও দেখেন নাই। পাশকরা ডাক্তার আমাদের গ্রাম হইতে চারি মাইল দূরে পাওয়া যায়।

আধুনিক শিল্প, কলকারখানা কিছুই নাই। চারি মাইল দূরে একটা ধানের কল আছে।

এ ছাড়া আধুনিক সভ্যতার নানাবিধ অঙ্গ, যথা ডাকঘর, লাইব্রেরী, ক্লাব প্রভৃতি কিছুই নাই। হাট হয় সপ্তাহে দু'বার। তাও একমাইল দূরে। গ্রামে একখানা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও একখানা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' আইসে। অনেকে মিলিয়া পড়ে। পূর্বেই বলিয়াছি যে গ্রামে পশ্চাৎ বৎসরের উপর ধরিয়া একটি স্কুল আছে। পূর্বে উহাতে মাইনর ক্লাস পর্যন্ত পড়া হইত, এখন হয় অপার প্রাইমারী পর্যন্ত। মাহিনা ১০ হইতে ১০ আনা। গভর্ণমেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড কয়েক টাকা করিয়া গ্র্যান্ট দেন। সম্প্রতি অনাচরনীয় জাতির ছেলেদের জন্য একটি নাইট স্কুল হইয়াছে। এইটি একদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে গেলাম। ৫০টা ছাত্র দেখিলাম। ডোম, মুচি, সাঁওতাল, বাউরি প্রভৃতি জাতির ছেলেরা পড়ে। ছেলেদের বয়স ১০ হইতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত। বাঙ্গালা ও ধারাপাত শিখিতেছে, কেহ কেহ ইংরেজী পড়িতে শুরু করিয়াছে। সন্ধ্যা ৬।০ হইতে ৯।০ পর্যন্ত ক্লাশ হয়। তেলের খরচ সপ্তাহে মুষ্টিভিক্ষার সংগৃহীত চাউল বেচিয়া পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা সকলেই দিনের বেলা, হয় লাঙ্গল চাষ করে বা গরু চরায়। ছেলেরা সরস্বতী পূজা করিয়াছিল, সরস্বতী-স্তোত্রও সকলে আওড়াইল। বাঙ্গালা হাতের লেখা দেখাইল। একজন ইংরাজিতে নিজের সহি করিয়া দেখাইল। এই নৈশ বিদ্যালয়টি সম্প্রতি ৮।৯ মাস স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামের স্কুল বাটীতেই বসে। কোনও গ্র্যান্ট এখনও হয় নাই। দুজন শিক্ষকই এখন অবৈতনিক। এইরূপে নাইট স্কুল গ্রামে গ্রামে হওয়া উচিত। এই সকল অনাচরনীয় জাতিকে আমরা এতদিন পশুর শ্রেণীতে রাখিয়া দিয়াছিলাম। ইহা-দিগকে মানুষের গণ্ডীর ভিতর আনিবার ইহাই একমাত্র সহজ উপায়।

লোকের চলে কি করিয়া?

পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রামে জাতিগত শিল্প কিছুই প্রায় নাই, আধুনিক শিল্পও নাই। বঙ্গদেশে শতকরা ৯৩ জন পল্লীগ্রামে বাস করে এবং শতকরা ৮০ জন লোকের উপজীবিকা কৃষি। শতকরা ২০ জন লোকের উপজীবিকা শিল্প বলিয়া দেখান হয়, তাহারা ছোট, বড়, মাঝারি সহর, রেল স্টেশন বা কলে কাজ করে। আমাদের এই গওগ্রামে শতকরা একশত জনের উপজীবিকাই কৃষি। ছোট বড়, ভদ্র ইত্যর, প্রত্যেক গৃহস্থের অবস্থানুসারে দুই, পাঁচ, দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ বিঘা জমি আছে। এ অঞ্চলে পাট খুব কমই হয়। শতকরা নিরানব্বই বিঘা জমিতে ধানই উৎপন্ন হয়। দু'দশ বিঘাতে আলু ও আঁক হয়। ডাল, কড়াই খুব কমই হয়। ভদ্রলোকদের মধ্যে বাঁহারা গ্রামে থাকেন, তাঁহারা মজুর ভাড়া করিয়া চাষ আবাদ করেন। বাঁহারা থাকেন না, মাঝে মাঝে আইসেন—তাঁহারা জমি ভাগে দেন, উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক পান। চাষাভুষারা নিজেরাই নিজের জমি চাষ করে। অজন্মা না হইলে চাষের ধান ও খড় সষৎসরের মত রাখিয়া সকলে বেচিয়া ফেলে এবং তাতেই গৃহস্থের এক রকম চলিয়া যায়। বিক্রয়লব্ধ অর্থে জমির খাজনা, পরিধেয় বস্ত্র, হুন-তেল প্রভৃতি হয়। অনেক বাড়ীতে গাইগর আছে—দুধ প্রায় কিনিতে হয় না। বাঁহাদের পুকুর আছে, তাহারা মাছও পান—তবে রোজ নহে। বাড়ীর আনাচে কানাচে শাক সজীও গৃহস্থ উৎপন্ন করে। বাঁহাদের বাগান আছে, আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, সজনার ডাঁটা প্রভৃতি তাহাদিগকে কিনিতে হয় না। আমাদের বাটীতে দেখি, প্রত্যাহই কলমী, শুশুনি, হেঙ্গল শাক আসিতেছে। শুনিলাম, স্থানীয় ঝি-টা প্রত্যাহ পুষ্করিণী হইতে এগুলি তুলিয়া আনে।

গৃহস্থের মুষ্কিল হয় যদি সময় মত বৃষ্টি না হওয়াতে গ্রামে অজন্মা হয়। উপরি উপরি ছ তিন বৎসর ধান না হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য। সুজন্মার দিন খাজনা প্রভৃতি দিয়া থুইয়া ও সংসার প্রতাপালন করিয়া গৃহস্থের সঞ্চিত অর্থত বিশেষ থাকে না, বিশেষতঃ বাঁহাদের জমি কম তাহাদের সংসার চলাই কষ্টকর। তত্বেপরি বিবাহ, ছেলে পিলের ভাতভূজনা, পূজা আশ্রয় প্রভৃতিতে গৃহস্থ সুজন্মার দিনেও বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না। তবে মোটা ভাত-কাপড় একরকম চলিয়া

যায়। গত বৎসর এ গ্রামে ধান ভালই হইয়াছিল। দেখিলাম বাড়ী বাড়ী ধানের ছোট বড় গোলা ও খড়ের গাদা। গ্রহস্থের দিন এবৎসর স্বচ্ছলই কাটিতেছে। মধ্যে তিন চারি বৎসর অজন্মা হইয়াছিল, তখন দেখিয়াছিলাম, গ্রহস্থের অত্যন্ত কষ্ট, আংশিক দুর্ভিক্ষ। তদুপরি বৃষ্টি না হইলে দারুণ জল কষ্ট হয়—পুষ্করিণী, কুয়া সব শুকাইয়া যায়। তখন তিন চারি ফারলং দূর হাঁটিয়া আসিয়া কোনও ভাল পুষ্করিণী হইতে পল্লীবৃদ্ধের পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়।

এই জন্ত যাহাদিগকে শুধুই চাষের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহাদিগের অবস্থা সকল বৎসর সমান যায় না। চাষ ছাড়া সকলকেই কিছু উপরি রোজগার করিতে হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে উপরি রোজগার করা মুশ্লিল। কোনও শিল্প নাই। ভদ্রলোক ও চাষাভুষার উপরি রোজগার করিবার পন্থা অবশ্য বিভিন্ন, কারণ ভদ্রলোকের ছেলেরা অল্পস্বল্প ইংরাজি ও বাঙ্গালা লেখাপড়া জানে ও হাতের কাজে অনভ্যস্ত, চাষীরা নিরক্ষর কিন্তু মাঠের কাজে অভ্যস্ত। গ্রামের এই দুই শ্রেণীর লোকদের উপরি রোজগারের পন্থার মোটামুটি যে সার্ভে করিয়াছি তাহা এইরূপ—

ভদ্রলোকদের মধ্যে

(১) গ্রামের চারি পাড়ায় চারিজন মুদির দোকান করিয়াছে।

(২) পাঁচ ছয় জন কলিকাতায় চাকরি করে, এবং সেই জন্ত তাহারা ডেলী প্যাসেঞ্জারী করে। রেলের মাসিক টিকিট ১০।০ অথচ ইহার মাহিনা পায় ২৫। হইতে ৪০। টাকা। সকালে কলিকাতায় যায়, সন্ধ্যায় বাড়ী আইসে। অতঃপর মাসিক টিকিট কিনিয়া ডেলী প্যাসেঞ্জারী করিবার তাৎপর্য কি, জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে কলিকাতায় থাকিতে হইলেও ১৫। টাকার কম মেসে খরচ হয় না।

(৩) দুই জন কলিকাতায় চাকুরি করে ও থাকে, শনিবারে বাটী আইসে ও সোমবার কলিকাতায় যায়।

(৪) তিনজন স্থানীয় জমিদারের তিন সরিকের গমস্তাগিরি করে। জমিদারেরা সামান্য পত্তনদার, গমস্তারা মাসে টাকা পাঁচেক হস্ত পায়।

(৫) একজন, মগরা রেল স্টেশনে কাজ করে। মগরা আমাদের গ্রাম হইতে চারি মাইল দূরে।

(৬) একজন মগরায় একটি ধানের কলে মুহুরির কাজ করে।

(৭) একজন চুঁচুড়া আদালতের কোনও উকিলের টাউটগিরি করে। সকাল যায়, সন্ধ্যায় বাটী ফিরে।

(৮) একজনের খনিয়ানের হাটে (১ মাইল দূর) একটি সাইকেল-মেরামতির দোকান আছে।

(৯) তিনজন গ্রাম্য ডাক্তার, তাহাদের মধ্যে একজন কলিকাতায় চাকুরি করে ও একজন গ্রামের স্কুলের হেড পণ্ডিত।

(১০) একজন স্কুলের পণ্ডিত।

(১১) একজন খনিয়ান ডাকবরের পিয়নের কাজ করে।

(১২) একজন কলিকাতার কোনও টিউব-ওয়েলের দোকানে কাজ করে ও বঙ্গদেশের নানাস্থানে টুর করে। মধ্যে মধ্যে দেশে আসে।

(১৩) একজন স্কুলে অবসর প্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার। রিটারির করিবার পর প্রভিডেন্ট ফণ্ডের অনেকগুলি টাকা পাইয়াছেন।

(১৪) একজন ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারী। মাসে টাকা কুড়ি পান।

(১৫) দুই ভায়েদের মধ্যে একজন কলিকাতা কর্পোরেশনে ও একজন সরকারি চাকুরি করে—দুজনেই ভাল মাহিনা পায়। পূর্বে ডেলী পেসেঞ্জারি করিত, এখন সপরিবারে কলিকাতায় থাকে, মধ্যে মধ্যে দেশে যায়।

আমার বোধ হয়, আমি ভদ্রলোকদের মধ্যে সকলেরই উপরি রোজগারের ফিরিস্তি দিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার অধিকাংশের মাসিক আয় ৫। হইতে ২৫। কেহ কেহ বেশী পান।

চাষীদের মধ্যে :-

(১) গরুর গাড়ী কাহারও কাহারও আছে, গাড়ী টানিবার অল্প গরু বা মহিষও আছে। গরুর গাড়ী ভাড়া দিয়া তাহারা ভূপয়সা বেশ রোজগার করে। মগরায় ধান ও খড় বেচিতে, সেখান থেকে ইট ইত্যাদি আনিতে যাইলে ১৫ টাকা ভাড়া পায়। খনিয়ান যাইতে হইলে ১০ পায়। ইহার প্রায় বার মাসই গাড়ীর ভাড়া পায়।

(২) এখানে বালি তোলায় খাদ বিস্তর হইয়াছে,

আপনারা মগরার বালির কথা শুনিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক শুধু মগরা কেন, আমাদের ও অঞ্চলটার সমস্ত জায়গা হইতেই বালি উঠিতেছে। এই সকল বালির খাদে এত মজুর কাজ করে যে স্থানীয় মজুরে কুলায় না। মালিকদিগকে অন্তঃস্থান হইতে মজুর আমদানী করিতে হয়।

(৩) যখন চাষ আবাদ থাকে না অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখে চাষীরা ঘরামির কাজ করে, অর্থাৎ মাটির ঘরের খড়ের চাল মেরামত করে। দৈনিক মজুরী পায় ১০ হইতে ৫০ হিসাবে।

(৪) কিবাণগিরি করিয়া মজুরেরা দৈনিক ১০ ও চাষের সময় ৮০ হইতে ১০ পায়। লাঙ্গলের মজুরি দৈনিক ১০ হইতে ৫০ হয়।

(৫) ডোমেরা কেউ কেউ বুড়ি, কুলা প্রভৃতি বোনে ও হাটে বেচিয়া হুপসায় পায়।

(৬) মুচিরা হাঁস ও মুগলমানেয়া মুরগি পুষ্টিয়া ডিম ও মুরগি বেচে। ডিমের দাম এক পয়সায় একটা।

(৭) বাগদি, কুলী প্রভৃতি জাতিরা ছাগল পোষে, পাঠা এবং খাসি বেচিয়া একসঙ্গে দু-চারি টাকা পায়।

(৮) তরিতরকারি, কলা, তরমুজ, ফুট কেহ কেহ উৎপন্ন করিয়া হাটে বেচিয়া আইসে।

(৯) আম কাঁটালের সময় বাগান ইজারা লইয়া কেহ আম কাঁটাল বেচে।

(১০) গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে বহু খেজুর গাছ আছে। শীতের সময় স্থানীয় বা অগ্র স্থান হইতে আগত লোকজন খেজুর রস বাহির করিয়া বিস্তর খেজুর গুড় প্রস্তুত করে।

(১১) একজন চাষও করে, রাজ মজুরের কাজও করে।

এইরূপে চাষী মজুরেরা বার মাসই কিছু না কিছু রোজগার করিবার সুবিধা পায় ও করে। হু পাঁচখানা গরুর গাড়ী যাহার আছে, সে বেশ হু পয়সা রোজগার করে। আমি অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে বাঙ্গালা দেশের চাষীরা বৎসরের মধ্যে ছয় মাস বসিয়া থাকে। আমাদের এ অঞ্চলে কিন্তু এ কথা খাটে না দেখিতেছি। চাষীরা ছয়মাস বসিয়া থাকিলে খাইবে কি? তাহাদের সকলের জমিজমা নাই। তাহারা ক্ষেতে, গৃহস্থের বাড়ীতে বা বালির খাদে দিন মজুরি করিয়া খায়।

বিধবাদের চলে কিরূপে?

আমি পূর্বেই বলিয়াছি এ গ্রামে বিধবাদের সংখ্যা খুব বেশী। তাহাদের চলে কিরূপে, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদের অনেকেরই সংসার বড়ই কষ্টে চলে। বাঁহাদের স্বামী টাকা পয়সা বা জমি জমা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের চলে এক রকমে। কিন্তু বাটীতে সাবালক ছেলে পুত্র না থাকিলে চাষবাসের কার্যেও তাঁহাদিগকে অন্যের উপর নির্ভর করিতে ও সেইজন্য ঠকিতে হয়। তাহাদের চলে এইরূপে :—

(১) হাতে টাকা পয়সা থাকিলে গহনা বা অগ্র কিছু বাঁধা রাখিয়, তাঁহারা টাকা ধার দেন এবং টাকার মাসিক এক পয়সা বা দুই পয়সা সুদ পান। জিনিস বন্ধক থাকাতে আসল মারা যায় না।

(২) বাঁহারা গরীব তাঁহারা অনেকেরই গাইগর পোষেন এবং গরুর দুধ হইলে, কতকটা ছেলেপুলেদের জন্য রাখিয়া বাকিটা গোয়ালাকে বেচিয়া ফেলেন। তাহাতে কিছু পান।

(৩) ইঁহারা আবার সম্পন্ন গৃহস্থের নিকট হইতে ‘ধান ভাড়া’ লন, অর্থাৎ ধান আনিয়া তাহা সিন্ধু করিয়া, ঢেঁকিতে কুটিয়া চাউল করিয়া দেন এবং নির্দিষ্ট হারে চাউল পান।

(৪) ইঁহারা মুড়িও ভাজেন ও বেচিয়া কিছু কিছু পান।

তবে এই সকল উপায়ে তাহাদের যে আয় হয় তাহাতে সংসার স্বচ্ছলে চলা মুশ্কিল। আজকাল ঢেঁকি চাউলের চাহিদা খুব বেশী হইয়াছে। যদি গ্রামে গ্রামে কোনও মহাজন এই সকল বিধবাদের বাড়ীতে বাড়ীতে ধান দিয়া চাউল তৈয়ারি করিয়া লন ও বিক্রয় করেন বা চালান দেন, তাহা হইলে মহাজনেরা লাভবান হন ও গ্রামের গরীব বিধবারাও খাইতে পান। এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কেহই করিতেছেন না, কিন্তু করা উচিত।

পূর্বেই বলিয়াছি আমার গ্রাম একটা গণগ্রাম। বঙ্গদেশের প্রায় সকল গ্রামের অবস্থাই এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা হীন। অবশ্য বড় বড় গ্রামও আছে। ছোট সহরও অনেক আছে। তাহাদের কথা এখানে বলি নাই। আমার গ্রামের যে বাস্তব ছবি এখানে দিলাম আপনাদের মধ্যে বাঁহাদের দেশ পল্লীগ্রামে, তাঁহারা তাঁহাদের গ্রামের ছবির সহিত ইহা মিলাইয়া দেখিবেন ত। অনেকটা মিলিয়া যাইবে নিশ্চয়ই। অনেক সময়েই কবিকল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান অনেক থাকে।

বর্তমান যুগের নারী-সমস্যা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শিক্ষার কথা

বাংলাদেশের একজন কবি 'মহিলা'-কাব্য-রচয়িতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় গাহিয়াছেন : 'সেই দেশ ধন্য যেথা রমণী পূজিতা।' আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সেই কথা রচিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কথা ও কাজে কত প্রভেদ!

সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার সমান নহে। সমাজ তাহাকে বরাবরই পীড়ন করিয়াছে। বহুবিবাহ, কোলিত্ব, বিধবাদের প্রতি নির্ঘাতন এ সমুদয়ের ইতিহাস সমাজে সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। বেশীদিনের কথা নয়—সংস্কার-প্রার্থী মহাত্মাগণ বিপ্লব কুলীন-কুমারী ও বিধবাদিগকে বিবিধ অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া নানারূপে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; এমন কি তাঁহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হইয়াছে। বাংলাদেশে সেই প্রায় শত বৎসর পূর্বকার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কত বড় নির্মমতা আমাদের দেশের মহিলায় সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। স্বরাগমনরত স্বামীদের দুর্ব্যবহার কাহিনী সেকালের সংবাদপত্রে সঙ্গীতে ও 'স্বলভসমাচার', 'সোম-প্রকাশ', 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় আজও লিখিত রহিয়াছে। তারপর সেকালের দৃষ্টবুদ্ধি যৎকৈরা মেয়ে চুরি করিয়া যে 'ভরার মেয়ের কলঙ্ককাহিনী' উদ্ভব করিয়াছিল, তাহা বর্তমান সময়েও অনেকের মনেই জাগরুক আছে।

আমরা সেই অতীতের কথা স্মরণ করিব না। বর্তমানের কথাই আলোচনা করা যাক। বাংলাদেশে এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিভক্ত হইয়া যে ভাবে বর্তমান বাংলাদেশ সৌরভৌগোলিক সীমা গঠিত হইয়াছে, তাহার জনসংখ্যা পূর্ব হইতে অনেক কম।

এই বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, পাঁচ বৎসরের অধিক বয়স্ক নারীর মধ্যে হাজার করা ৩০ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানেন। সে লেখা-পড়া-অর্থ কোঁচ রকমে নাম সহ করা

কিংবা দুই একখানি চিঠি লেখা মাত্র। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে—৫১, ৮৭, ০০০, ইহার মধ্যে শতকরা ৫৫ মুসলমান আর হিন্দু হইতেছে ৪৩ জন। বর্তমান সময়কার আদমশুমারির বিবরণী আমাদের কাছে নাই। জনসংখ্যার দিক দিয়া দেখা যাইতেছে যে হিন্দু কমিতেছে—মুসলমানেরা সংখ্যায় বাড়িতেছে। আমার হাতের কাছে কিছু পুরাণো কাগজ পত্রে ঢাকা জেলার জনসংখ্যার বিবরণী দেখিলাম। ঐ বিবরণী ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে পরিগৃহীত। Mr. A. H. Blay সাহেব কর্তৃক ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে The History and statistics of the Dacca District নামক গ্রন্থে Thoranton Gazetteer উদ্ধৃত করিয়াছেন : In April 1851, the total population of the District was officially returned at 600,000. It has never been accurately ascertained, but the results obtained in the course of Revenue Survey, from 1857 to 1860, which are given below, are probably as correct as can be expected in default of a regular census. Men—305, 307, women, 378, 154, children, 226, 154. Total 904, 615. This shows an increase of some 300,000 since the office return. The population of the District consists of Hindoos, Mahomedans and Christians, in the following proportions. Hindoos 455, 182. Mahomedans 449, 223. Christians 210. It is calculated that the population of the entire district consists of Hindoos and Mahomedans

nearly equal proportions আর একটি কথাও প্রশিধান বোগ্য যে Religious quarrels between Hindoos and Mahomedans (are of rare occurrence, both classes living together in perfect peace and harmony."

এক সময়ে হিন্দু ও মুসলমান যেখানে প্রায় সমতুল্য ছিল, সেখানে বর্তমান সময়ে কত বড় পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। আমার মনে হয় ইহার মূলে রহিয়াছে হিন্দু সমাজের ক্রটি, নারীজাতির প্রতি আমাদের ব্যবহার ইত্যাদি অনেক কিছু। আমরা উদাহরণস্বরূপ ঢাকা জেলার এক সময়ের জনসংখ্যা ও সামাজিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিলাম।

আমরা অনেক সময় নারীজাতির শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলেই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, খনা, লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির নাম করি। প্রত্যেক যুগেই ঐরূপ কয়েকজন অসাধারণ মহিলার জন্ম হইয়া থাকে। সেজন্য রিচার্ট নারী সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন উন্নতি হইয়াছিল, এমন কথা কি বলিতে পারি? তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথার বলিতে হয় :

‘অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,

গভীর ঘুমের আয়োজন।

(এ যে) স্বপনের স্বপ্ন, স্মরণের ছলনা,

আর নাহি তাহে প্রয়োজন।

* * * * *

ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে,

মানবের সাথে যোগ দিতে হবে;

তা’ যদি না পার চেয়ে দেখ তবে

ওই আছে রসাতল ভাই।’

আগে চল আগে চল ভাই।’

আমাদের দেশে মুসলমান শাসনকালে কিরূপ এবং কতটা স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহা অর্থাৎ কিনা ইংরাজ রাজত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আজিও গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। কাজেই ইংরাজ রাজত্বকালে কিভাবে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হয় তাহাই একটু আলোচনা করিব।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাঙ্গালাদেশে নূতন শিক্ষা বিভাগ গঠিত হইবার পর সর্বপ্রকার শিক্ষা বিষয়ক আদেশ প্রচারিত হওয়ার পূর্বে ইংরাজ গভর্নমেন্ট স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন এবং উহার উন্নতিবিধান করিতে তাঁহাদের শিক্ষা নীতির অঙ্গীভূত করেন নাই। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উক্ত আদেশ পত্রের ৫৭ ও ৮৩ অনুচ্ছেদে ডিরেক্টর সভা বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্য দানের পষ্ট আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কার্যকরী হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। সে সময়ে এ দেশে প্রবাসী ইংরাজেরা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ‘স্ত্রী শিক্ষা এ দেশের লোকের সংস্কার ও সামাজিক নীতি বিরুদ্ধ’। কেননা তাহারা শিক্ষা লাভ করিলে অন্তঃপুরে থাকিতে চাহিবে না, এবং পুরুষের শাসনাধীনে রহিবে না। ইহাই ছিল অসম্পষ্ট ধারণা। সেকালের খৃষ্টান ধর্মব্রাহ্মণেরা ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না, এজন্য তাঁহাদের কাছে বাঙ্গাল পরিবারের মধ্যে কিরূপ শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল তাহা অজ্ঞাত ছিল। ১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষাকমিশন এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে—‘অতি প্রাচীন অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগের এবং পরবর্তী মধ্যযুগের হিন্দু বিদ্বাদিগের কিংবদন্তী পরিত্যাগ করিলেও বলিতে হইবে যে, ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত হওয়ার সময় এদেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে পারিবারিক কার্য-নির্বাহোপযোগী সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের পুরণ ও কাব্য গ্রন্থে বিবৃত উপাখ্যানাদি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত থাকায় তন্নিহিত নীতিসমূহ তাঁহাদের মনোমধ্যে হৃদয়স্পর্শী ঐতিহাসিক নীতির স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। ধর্মব্রাহ্মণ সম্প্রদায় (পুরোহিত) বালিকারা ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। সম্ভ্রান্ত পরিবারে ব্রাহ্মণ শিক্ষক বালকদিগের সঙ্গে বালিকাদিগকেও শিক্ষা দান করিতেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে সর্বকালেই বিশেষ শিক্ষিতা ও বিষয়কর্মে পটু স্ত্রীলোক ছিলেন। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধিশক্তি যে বিশেষ তীক্ষ্ণ এবং পুরুষদিগের অপেক্ষা উহাদের বুদ্ধির তেজ যে অধিককাল স্থায়ী থাকে, রিপোর্টে তাও উল্লিখিত হয়।’

আমাদের বাঙ্গালাদেশে খৃষ্টান মিশনারীরাই নূতন শিক্ষা

প্রণালী অনুসারে সর্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তারপর কি ভাবে বাঙ্গালার সর্বত্র পাঠশালা, মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নারীশিক্ষা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দীর্ঘ ইতিহাস, সে দীর্ঘ আন্দোলন ও সংস্কারের সম্বন্ধে বিস্তারিত কথা আর বলিব না।

শিক্ষয়িত্রীর অভাব যে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের একটি প্রধান অন্তরায় খৃষ্টান মিশনারীগণ প্রথমাবধি তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়েও সে প্রশ্নের সমাধান হয় নাই।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এখন শিক্ষার জন্ত আগ্রহ দেখা বাইতেছে, কিন্তু সে শিক্ষার দ্বারা নারীসমাজের উন্নতি কতটা হইয়াছে, কতটা তাঁহারা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিতেছেন, সমাজে তাঁহারা কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজে কতদূর তাঁহারা প্রভাব বিস্তার করিতেছেন এবং কি ভাবে দেশ ও জাতির এবং মহিলারা তাঁহাদের মহিলা সমাজের উন্নতি করিতে পারেন, তাহাই হইবে একে একে আমাদের আলোচ্য বিষয় এবং সে বিষয়ে আমরা সংগঠনমূলক কি কি কার্য করিতে পারি এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নারী সমাজও কোন্‌পথে অগ্রসর হইয়া কতটা উন্নত হইয়াছেন, তাহার তুলনামূলক আলোচনা করা একান্ত কর্তব্য।

বর্তমান নারী শিক্ষাসম্পর্কে একজন ইংরাজ লেখক বলেন;—
“Although it cannot be said that a great lady who rules a large household is uneducated; yet of that knowledge which tells the story of the past and its

achievements, which presents the world in its present industrial and social condition, and which depicts the marvels of nature and of science, the modern woman is as yet ignorant, and she must remedy this lack if she is to serve her country and her times worthily. The idea that learning is a disgrace has already been crushed. Even at the present day, there are a certain number of high schools for girls, and the B. A. degree has been granted to several native women students in Calcutta, while some now come to England to study.*

প্রতি বৎসর কলিকাতা গেজেট দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতি বৎসরই হিন্দু, মুসলমান বালিকারা শিক্ষার দিকে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন; কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান বালিকারা যে ভাবে শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাহা নারীদের পক্ষে কতটা কল্যাণকর তাহাই আলোচ্য বিষয়।

আমাদের দেশে নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে যাহারা চিন্তা করেন, আলোচনা করেন এবং সংগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রকৃতভাবে নারীসমাজের কল্যাণ করিতেছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ে যে ভাবে নারী জাতির মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা কখনও ভবিষ্যতে তাহাদের কল্যাণকর হইবে না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা যেরূপ যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে কথা পরের বার বলিব।

* Woman in world History—Her place in the Great Religions By E. M. White 110—111.

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরানীকে

অভিনন্দন

শ্রীকুমুদিনী বসু

শ্রীচরণকমলেশু,

আজ আপনার জন্মদিনে আমরা আমাদের প্রাণের আনন্দ জ্ঞাপন করবার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। আজ বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই যে তিনি আজিকার দিনে এই বাংলা দেশে তাঁর এমন একটি কন্যাকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করে ছিলেন, যিনি এ দেশকে নব জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করেছেন।

আপনি শ্রবির বংশে জন্মগ্রহণ করে, ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে সেই বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

আপনি স্বদেশভক্ত পিতার যোগ্য কন্যারূপে স্বদেশের সেবা করে দেশের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেছেন।

আপনি প্রতিভাময়ী মাতার যোগ্য উত্তরাধিকারিণী। আপনি তাঁর প্রতিভার উত্তরাধিকারিণী হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালিনী করে তাঁর গৌরবময় আসনকে অটুট রেখেছেন। তাঁর সাহিত্য-সেবার ধারা আপনার মধ্যে প্রবাহিত করে রেখেছেন।

বাংলাদেশ এক সময়ে শৌর্য্যে বীৰ্য্যে মহিমান্বিত ছিল। কিন্তু কালের প্রভাবে সে গৌরব হতে চ্যুত হয়ে বঙ্গ সন্তান ঘরমুখো বাঙ্গালী হয়ে একেবারে নিৰ্জীব হয়ে পড়েছিল।

সেই নিৰ্জীব বাঙ্গালীকে বীরত্ব মণ্ডিত করিবার জন্য আপনি “বীরচন্দী” উৎসবের সূচনা করে বাংলাদেশে নব জীবনের স্পন্দন এনে দিয়েছেন।

আপনি বাংলা দেশে নারী শিক্ষার অগ্রণী। আপনি নিজে জ্ঞানলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে দেশের অজ্ঞান কন্যাদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করবার জন্য “ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল” স্থাপন করে কত অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলে দিয়েছেন।

আপনার প্রতিভা দেশ-সেবা-ক্ষেত্রে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হয়ে নব নব রসাত্মক দোহা-বাসীকে তৃপ্ত করেছে।

আপনার প্রাণোদ্যাদকারী জাতীয় সঙ্গীত “জাতীত গৌরব-রাহিনী” শত শত দেশভক্তের প্রাণকে দেশপ্রেমে প্রারিত করে তুলেছে।

আজ আপনি ৭০ বৎসর অতিক্রম করলেন। পার্থিব জীবনের এই বৎসরগুলি আপনি আপনার স্বথ স্বচ্ছন্দতা, আরাম, বিলাস ব্যসনে ক্ষেপন করেন নি। আপনি ইচ্ছা করলেই সেইরূপ জীবন যাপন করতে পারতেন।

কিন্তু আপনি দুঃখকে মাথায় তুলে নিয়ে দেশসেবিকার জীবন বরণ করে নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে চলেছেন।

আপনি ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে ভারতের নমুনা আর্থানারীদের দ্বারা জীবনযাপন করে আমাদের বরণীয়া হয়েছেন।

আজিকার এই শুভ অন্তিম দিনে আপনি আমাদের প্রকার অর্থ্য গ্রহণ করুন।

বিধাতার চরণে আপনার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শৈশবে সদয়

তারকচন্দ্র রায়
(পূর্বানুস্মৃতি)

(৫) বিদ্যারম্ভ

অনুমান ৬৭ বৎসর বয়সে সদয়ের বিদ্যারম্ভ হয়। সে উৎসবে আমিই প্ররোহিত, আমিই গুরু, অপর কাহারও কিছু দরকার পড়ে নাই। মাটিতে লিখান হইতে মাইনর পরীক্ষা পর্যন্ত সকল দিনই আমিই আচাৰ্য্য। হাতে ধরিয়া কাপড় পিছানো, পিঠে করিয়া সাঁতার শিখান, সঙ্গে করিয়া পথে বেড়ান এক ধালে ভাত খাওয়ান প্রভৃতি যে কোন বালক-পোষিকার কার্য্য আমি আফ্রাদেবের সহিত সম্পন্ন করিয়াছি।

এক বিছানায় শোয়াইয়া মুখে মুখে আঁক শিখাইয়াছি।

প্রায়শঃ মোটকথা সদয়ের চরিত্র-গঠনে আমিই দায়ী অধিক।

চাঞ্চল্য বালকের স্বাভাবিক ধর্ম এবং আমার মতে স্বাস্থ্য উন্নতির ঐশ্বরিক বিধান। সদয় চঞ্চল ছিল বটে কিন্তু তাহার চাঞ্চল্য বিরক্তিকর ছিল না এবং পরিমাণে অধিক ছিল না। উহাতে একটু বিশেষত্ব ছিল—সে চুপি চুপি এই সদরে উৎপাত করিত না। ক্রোধ তাহার অধিকই ছিল কিন্তু তাহা ভিতরে ভিতরে থাকিত এবং প্রতিশোধ ইচ্ছা সে অন্তরে খোদিয়া রাখিত। অপকারের কাল বহুদিন চলিয়া গেলেও বিস্মরণ হইত না। কুটিলতা তাহার স্বভাবতঃই ছিল এবং আমিও যত্ন করিয়া তাহা রাখাইয়াছিলাম এবং আমারই ঐকান্তিক একাগ্রতায় তাহার কুটিলতা প্রয়োজন পরিমিত কুটিলতায় নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। মন্ত্রগুপ্তি, প্রয়োজনীয় কুটিলতা, প্রয়োজনীয় ক্রোধ, প্রতিযোগিতামূল্য, আত্মাভিমান এবং উচ্চাশা ও পূর্বানুস্মৃতি প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি বাহাতে সজীব থাকে, তজ্জন্ম আমি বিশেষ যত্ন করিয়াছি। সেক্সপিয়রের মত আমিই সদয়কে মন্ত্র দিয়াছিলাম—“Love all but trust a few” যে উদ্দেশ্য অন্তরে লইয়া সদয়কে গঠিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, ভগবানের ইচ্ছায় তাহা সফল হইয়াছে এবং আশা করি, কালে তাহার আরও বিস্মরণ হইবে।

গণগ্রামে গবে মাত্র মাষ্টার বাবুই মানুষ বাহিরের বিশালতা ছেলেদের চক্ষে পড়ে না, তাই তাহার মাষ্টারের অনুকরণই

সর্বপ্রযত্নে করিয়া থাকে। সদয় মনে করিত তাহার মাষ্টার বাবুর উপরে আর কেহ নাই, হইতেও পারেনা। তাই চলিতে, ফিরিতে, বলিতে কহিতে মাষ্টার বাবুর মত হইতেই তাহার অভিলাষ ছিল। আমি আজ গর্বের সহিত বলিতেছি ঈশ্বর তাহাকে ইচ্ছার অতিরিক্ত দান করিয়া স্মৃতি করিয়াছেন। নিপুণ শিল্পী যেমন কোন্ জিনিষে কি তৈয়ার হয় জানিয়া থাকেন, নিপুণ শিক্ষকও কোন্ ছেলেতে কি ফল হইবে পরিচয় পান।

এই অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে না লইয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলে শিক্ষকের পরিশ্রম ব্যথা যায়। আমি সদয়কে কাঁচা মাটি পাইয়াছিলাম এবং তাহার অঙ্গলক্ষণে এমন কতকগুলি শুভ পরিণামের আভাষ দেখিয়াছিলাম; বাহা এখন মনে হইতেছে ঠিকই দেখিয়াছিলাম, তাই তাহাকে মনের মত পুতুল গড়িতে এতটা যত্ন করিয়াছি।

সদয় ছোটবেলা হইতেই শারীরিক বলে দরিদ্র কিন্তু তাহার মানসিক বল খুব প্রবল। স্মৃতিশক্তি তাহার অতুলনীয়, সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং বুদ্ধিব্যবহার শক্তি বিশেষ প্রখর। কোনও কিছু শিখাইতে অধিক বেগ পাইতে হয় নাই। কামারের হাতুড়ি পেটার মত পুনঃ পুনঃ কোন কথাই বলিয়া পরিশ্রান্ত হই নাই।

ইচ্ছাক্রমে তাহার একটা বিশেষ দোষ ছিল। কিন্তু কেবল আমার নিকট নয়। জানিনা কালসাপ কি মতে এত গোষ মানিয়াছিল।

একদা আমার অনুপস্থিত কালে হেডপণ্ডিত তাহাকে পাঠ বলিতে ডাকেন। জানিনা বালকের মাথায় কি খেলিল! সে পণ্ডিত বাবুর নিকট পড়া দিলনা। সেক্রেটারীর ভাতিজা ও মাষ্টারবাবুর ঘরের ছেলে, তাই পণ্ডিত মহাশয় উহাকে দণ্ড দিতে সাহস পাইলেন না। কিন্তু রাগে অধীর হইলেন। সদয়ও নাক ফুলাইয়া বসিয়া রহিল। সেদিন কোনও কার্য্য উপলক্ষ্যে আমি এগারোটার পরে স্কুলে যাই। স্কুলে যাইয়া দেখি, পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ ভার। জিজ্ঞাসা করায় সকল কথা

অবগত হইলাম এবং সদয়কে এরূপ ধৃষ্টতা ও অবিমুখ্যকারিতার জ্ঞান সমুচিত দণ্ড দিলাম। স্নেহের খাতিরে ত্বায় বিচারে পদাঘাত করিতে আমি জানিনা। বিশেষ এইরূপ দোষ অবহেলায় অলক্ষ্য করিলে ছেলের কপাল খাওয়া হয়। সুখের বিষয় দেওর পরিমাণ অধিক হইলেও অভিভাবকেরা হুঃখিত হন নাই। অধিকন্তু তাহার মা শুনিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বলিয়াছিলেন “মুর্তি গড়িতে মাটি মারিয়া লইতেই হয়।”

বৈকালে, খাবারবেলা সদয়ের শ্রীত্ববধু (রাজচন্দ্রবাবুর স্ত্রী) হাসি করিয়া বলিয়াছিলেন “কেমন মাষ্টারবাবুর আফ্লাদ টের পেলে বাবু।” ইহার অনেক দিন পরে, শ্রীহটে পড়ার কালে

সদয় যখন বিদ্যায় বাড়ী আসিয়া বেশ ভালমানুষটির মত চলিতে ফিরিতে লাগিল তখনও উক্ত বধু হাঁসিয়া হাঁসিয়া একদিন বলিয়াছিলেন “কি বাবু, মাষ্টারবাবুর বেতের বাড়ি বোধ হয় মনে নাই—না হইলে তাঁহাকে এত ভক্তি করিতে না।” আমি শুনিয়াছি, সদয় এইকথায় যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল (অবশ্য বালকের মত)

“বেশ করেছেন—মেরেছেন, তোমাদের কি? মার খেয়েই ত মানুষ হয়।”

(ক্রমশঃ)

মহিলা-সমাচার

(শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ)

মহিলাদের জ্ঞান ব্রজমোহন পুরস্কার

বরিশালের স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পিতা ব্রজমোহন দত্তর স্মৃতিতে প্রতিবৎসর রচনা প্রতিযোগিতার পারিতোষিক ৪৫০ প্রদত্ত হইবার জ্ঞান গভর্ণমেণ্টের নিকট টাকা গচ্ছিত আছে।

বর্তমান বৎসর ৪৫০ হিসাবে দুইটা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। “সোভিয়েট রুশিয়ার নারীর স্থান”—বিষয় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। আগামী ১৫ই নভেম্বর মধ্যে প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে, রাইটার্স বিল্ডিংস, ব্লক নং ১ কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। যাহার রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনিই পুরস্কার পাইবেন এবং তাহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গলা বা সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। এই দুদিনে মহিলাদের একটা রচনা লিখিয়া ৪৫০ পাওয়া বিশেষ সুযোগ। হুঃখের কথা আমাদের মেয়েরা এ সব বিষয় খোঁজ রাখেন না এবং উদাসীন। সেই জ্ঞান গত বৎসর কোন ভাল লেখাই আসে নাই বলিয়া বর্তমান বৎসরে দুই জনকে ৪৫০ করিয়া পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

সরলাদেবীর সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি

একজন বিদূষী মহিলার সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়াতে অভিনন্দন উৎসব যেমন শ্রীতিকর তেমনিই গৌরবময়। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনে, সমাজ সেবায়, শ্রীশিক্ষা প্রসারে, সর্বোপরি দেশসেবায় সরলা দেবীর দান প্রচুর ও মহৎ। বাঙ্গালীর হৃদয়ে বীরত্বভাবের উদ্দীপনা করিবার উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ বীরগুণী ব্রত তিনিই প্রবর্তন করেন। তিনি একমাত্র ও প্রথম মহিলা যিনি নিখিল ভারত সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভানেত্রী হইয়াছিলেন। সে যুগের কংগ্রেস সরলা দেবীর ‘মম হিন্দুস্থান’ প্রভৃতি গানে উদ্বোধিত হইত। তিনি প্রথম মহিলা কংগ্রেসের এ, আই, সি, সি, র সভ্য হন এবং তাহারই মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রতিনিধি (ডেলিগেট) হইয়াছিলেন। তিনি ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদন সময়ে লেখকদের পারিশ্রমিক দিবার প্রথা ভারতে প্রথম প্রচলন করেন। ভারত শ্রী মহামণ্ডল স্থাপন করিয়া নিখিল ভারতের নারীর মধ্যে সম্মিলন ও শিক্ষার বিস্তারের উদ্যোগ সরলা দেবী করিয়াছিলেন।

সেইজন্তই বহু পুরুষ ও মহিলা সাহিত্যিক ও সাহিত্য

তাঁহার জন্মদিনে—২৩শে ভাদ্র তাঁহারই বাসভবনে
ন ও দ্রব্যোগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান
করিয়াছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসী প্রকাশ
স্থানে বাঙ্গলার এই সর্বজনময়ী মহিলার জয়ন্তী উৎসব করিতে
না পারায় ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত।

উৎসব ক্ষেত্রে প্রারম্ভে মহাবোধি সোসাইটির আচার্য্য
জিনরত্ন ও ধর্মানন্দ মঙ্গলাচরণ করেন। অতঃপর মহিলা
সাহিত্যিকবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, বৃহত্তর
ভারত সমিতির পক্ষে ডাঃ কালিদাস নাগ, কলিকাতা
ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট সম্পাদক শ্রীমুশীলকুমার চাটার্জি,
ইউনাইটেড প্রেসের পক্ষে শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত, নিখিল ভারত
বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতির পক্ষে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, তরুণ
সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতে শ্রীবুদ্ধদেব বসু, 'রবিবাসরের পক্ষে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায়, 'দীপালীর' সম্পাদক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,
অল বেঙ্গল স্কুল অব ফিজিক্যাল কালচার পক্ষে জে, কে, শীল,
ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী, ভারতী সম্পাদক (প্রাক্তনি) শ্রীসৌরীন্দ্র
মোহন মুখোপাধ্যায়, পুলিশ ইন্সপেক্টর শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল
সরলাদেবীর গুণকীর্ত্তন করেন ও শ্রদ্ধাঞ্জলির স্বরূপ এক একটি
পদ্মপুষ্প অর্থ্য প্রদান করেন। নিঃ তাঃ সংবাদপত্র সেবী
সঙ্ঘের সভাপতি ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্ল
চন্দ্র সরকার এবং বসুমতী সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
অভিবাদন জ্ঞাপন ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া সরলাদেবীকে
কিছু লিখিয়া পাঠান, তাহা সভায় পাঠ করা হয়।

কবি শ্রীগিরিজাকুমার বসু একটা প্রশস্তি কবিতা রচনা
করিয়া পাঠ করেন। সভা গান ও বাজনা দ্বারা মধুর করিবার
ব্যবস্থা হইয়াছিল। সরলাদেবীর একমাত্র পুত্র দীপক চৌধুরী

সকলকে জলযোগে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। 'ভারতের'
শ্রীযুক্ত দেবজ্যোতি বর্শন সরলাদেবীর জীবনী লিখিয়া এক
দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সরলা দেবীর উত্তর তেজো-
দীপ্ত ভাষায় উত্তর দেন। আমরাও সরলা দেবীর দীর্ঘ শান্তিময়
জীবন কামনা করি।

কৃতী ছাত্রী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বর্তমান বর্ষে শ্রীমতী চিত্রা
মজুমদার ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ
হইয়াছেন।

নাম-বিপত্তি—

গত সেপ্টেম্বরে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় একটি
সংখ্যায় সিনেমার একটি বিজ্ঞাপনে একজন অভিনেত্রীর নাম
ছাপা হয়েছে, "হেমলতা ঠাকুর"। চোখ পড়া মাত্র
চমকে উঠলাম,—আশ্চর্য্য কথা; বড়মার নাম এ ভাবে কে
ব্যবহার করলো! তৎক্ষণাৎ অল্পসম্মানে প্রবৃত্ত হইয়া জানা
গেল—ইনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁর নাকি আর এক নাম
"নমিতা"—জেনে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।

সংসারে ছিদ্রাঘেষী লোকের অভাব নাই। শত বৎসর
পরে কোন একজন সন্ধানী ব্যক্তি গবেষণা করে হয়তো
আবিষ্কার করবেন—"রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রীর
পৌত্রী, ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ, কবিগুরু রবীন্দ্র-
নাথের ভ্রাতৃপুত্রবধূ—সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি ও
বঙ্গলক্ষ্মীর সম্পাদিকা হেমলতা ঠাকুর উনসত্তর বৎসর বয়সে
সিনেমায় নেমেছিলেন।" এই হোল সে যুগের, সেকালের তথ্য।

সেরূপ আবিষ্কার-কর্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা জানাচ্ছি
যে ঠাকুর পরিবারের বধূ শ্রীহেমলতা দেবী (ঠাকুর) এবং
বিজ্ঞাপনে লিখিত ব্যক্তি এক নহেন।

কেন্দ্র সমিতির কথা

গত ১৩ই আগষ্ট কেন্দ্র সমিতির প্রচারক শ্রামনগর মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান; বর্তমানে উক্ত সমিতির সভ্যা-সংখ্যা খুবই কম; ৮টা মহিলা নিয়মিত শিল্প শিক্ষা করিতেছেন। শিক্ষার্থিনীদের অন্ত্যন্ত শিল্প হইতে এমতদ্বারীর উপরই বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল। সমিতির অন্তর্গত বালিকাবিদ্যালয়টা খুব ভালই চলিতেছে।

গত ২১শে আগষ্ট কেন্দ্র সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত সুধীরলাল সরকার বি, এ, ডোমজুড় পল্লীসংস্কার নারীমঙ্গল সমিতি পরিদর্শন করিতে যান; উক্ত সমিতির পরিচালকবর্গ বিভিন্ন অনুষ্ঠান দ্বারা প্রায় সওয়া তিনহাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া সমিতির নিজস্ব একটি বাড়ী তৈরী করিয়াছেন; সম্বন্ধে উক্ত নতুন বাড়ীতে কার্যারম্ভ করা হইবে; বর্তমানে শিল্প শিক্ষার ক্লাস বন্ধ থাকিলেও সাধারণ শিক্ষার জন্য বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সমিতির প্রশংসাহঁ কার্য সন্দেহ নাই; এই বিদ্যালয়ে প্রায় একশত বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে; এখন পর্যন্ত ইউ. পি. শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হইতেছে; আশা করা যায় যে, আগামী বৎসর (১৯৩৩ খৃঃ) হইতে এম.-ই. শ্রেণী পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে।

গত ২৬শে আগষ্ট কেন্দ্র সমিতির প্রচারক ব্যাটার (হাওড়া) মহিলা সমিতি পরিদর্শন করিতে যান; বর্তমানে সমিতির কার্য ভালই চলিতেছে; বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; এই বৎসরের প্রথমদিকে দেশের যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে বহু-সংখ্যক সভ্যা অন্তত চলিয়া যাওয়ায় সমিতির কার্যে কিছু বাধা পড়ে, কিন্তু সম্পাদিকা ও পরিচালকগণের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই আবার প্রায় স্বাভাবিক সর্বল অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে।

গত ২৪শে আগষ্ট কেন্দ্র সমিতির মহিলা-কর্মী শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ ও প্রচারক কাটিহার প্রভৃতি রেলওয়ে মহিলা সমিতিগুলি পরিদর্শন করিতে যান।

২৫শে তারিখ কাটিহার রেলওয়ে মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন, উক্ত সমিতির সভ্যা-সংখ্যা প্রায় ৫০জন; কিন্তু

তাৎকালিক স্থানীয় অবস্থার জন্য কয়েকজন সভ্যাই মাত্র সমিতির নিজস্ব গৃহে উপস্থিত থাকিয়া আগন্তকদের সম্বর্ধনা জানান এবং সমিতির সভ্যাদের নির্মিত কিছু শিল্পব্র্য প্রদর্শন করান; স্ততার দুর্মূল্যতার দরুণ তাঁতের কার্য ঠিক মতন চলিতেছে না; অন্ত্যন্ত শিল্প-শিক্ষা কার্যও সাধারণ ভাবেই চলিতেছে; কাটিং ও সেলাইয়ের কার্য বস্ত্রের নিদারুণ দুর্মূল্যতার দরুণ সভ্যাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভাবেই চালান হইতেছে; সাধারণ শিক্ষা বিভাগের কার্য ভালই চলিতেছে; তিনজন শিক্ষয়িত্রী প্রায় ৪০টা বালিকাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কেন্দ্র সমিতির নির্বাচিতা একজন শিল্প-শিক্ষয়িত্রী সপ্তাহে তিন দিন বয়স্ক মহিলাদের এবং তিন দিন বালিকাদের শিল্প-শিক্ষা দেন।

২৬শে সৈয়দপুর যান। সৈয়দপুর মহিলা সমিতির নিজস্ব বাড়ী নির্মিত হইয়াছে; দুইখানি মাঝারিকমের তাঁত এখানে আছে; এখানেও স্ততার দুর্মূল্যতার দরুণ তাঁতের কার্য চলিতেছে না; অন্ত্যন্ত শিল্প কার্য ভাল ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ২৭শে বৈকালবেলা বহু সভ্যা সমিতিগৃহে উপস্থিত হন; মহিলা-কর্মী মিসেস ঘোষ কি ভাবে কার্য করিলে সমিতির আরও প্রসারলাভ হয় ও সর্বসাধারণের স্তুষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তদ্বিষয়ে মহিলাদের বৃথাইবা বলেন এবং প্রচারক অন্ত্যন্ত স্থানে যে সব সমিতি বিশেষ সমুন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহাদের কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

২৯শে সান্তাহার হইয়া বগুড়া গমন করেন। বগুড়া মহিলা সমিতির উদ্যোগে ৩০শে তারিখে মহিলা সমিতির বাড়ীতে মহিলাদের একটি সভা হয়; মিসেস ঘোষ ও প্রচারক বাহাতে সমিতির কার্য বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিয়া দুঃস্থ মহিলা-দের উপকার-সাধনে সফল-মনোরথ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপ-দেশ দেন। এই সমিতির সভ্যা-সংখ্যা ৪০ জনের উপর, নিয়মিত শিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য কেন্দ্র সমিতির অর্থসাহায্যপ্রাপ্ত একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন এবং সম্পাদিকা নিজেও বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সমিতির

সম্পাদিকা আর একটি মহিলাকে লইয়া বগুড়া সহরের উপকণ্ঠবর্তী পল্লী-সমূহে যাইয়া মহিলাদের মধ্যে শিল্প শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পল্লী-নারী-মঙ্গল সমিতি স্থাপন করার জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন।

৩১শে আগষ্ট সাত্তাহার রেলওয়ে মহিলা সমিতির উদ্যোগে হাতি প্রাইমারী স্কুল ভবনে মহিলাদের একটি সভা হয়। বৈকাল থেকে প্রবলবৃষ্টি হওয়ায় কলোনীর সর্বস্থান হইতে প্রচুর মহিলা উপস্থিত হইতে না পারিলেও সমিতির সভ্যারা এবং নিকটবর্তী স্থান হইতে বহু মহিলা সভায় যোগদান করেন। মিসেস ঘোষই সভানেত্রী নির্বাচিত হন। মিসেস ঘোষ ও প্রচারক বক্তৃতা

করার পর সমিতির প্রসারলাভে সাহায্য করার জন্ত সাধারণের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করার বিশেষ প্রয়োজনবোধে মহিলাদের ভেতর হইতে কার্য্যকরী একটি পস্থানিদ্বেশের উপদেশ প্রার্থনা করা হয়; তদ্বিষয়ে স্থির হয় যে, আগামী ৮শারদীয়া পূজার ছুটির অবকাশে একটি শিল্পপ্রদর্শনী করিয়া সাধারণের উপস্থিতির ও যোগাযোগের সুযোগ করা হইবে।

বহুবাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই সমিতির কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে, কিন্তু এখনও ষথেষ্ট সভ্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই।

তোমারে ঘেরিয়া মোর কেঁদেছে কামনা

বন্দে আলী মিয়া

দ্বিতীয়ার বাঁকা চাঁদ উঠিয়াছে নভ আঙিনায়
মেঘ-শ্রান আলো তার আসিয়াছে মোর জানালায়,
একা আমি বসে আছি—ক্ষীণ দীপ জলিছে শিখানে
পূর্ব বায়ু ক্ষণে ক্ষণে বন-ফুল গন্ধ বয়ে আনে।
একা ঘরে নিরুজনে তব কথা মনে আজ পড়ে,
একদা এমনি রাতে জেগেছিলে তুমি মোর তরে।
আমি তো ভাবিনি কভু—আছিলো যে চির-পলাতক
সে কি কভু ধরা দেবে নিজে এসে হেন আশ্রমক।
ছরাশার পার হতে নেমে এলো ধরার ধূলায়
ফুলের মালিকা করে, তারে আমি পরিচয় গলায়।

দ্বিতীয়ার ভাঙা চাঁদ উঠিয়াছে নভ আঙিনায়
এমনি মাধবী রাতে তুমি আমি ছিহ্ন দুজনায়।
মিলনের অবসর নাহি ছিলো জনতার ভিড়ে,
চুপি চুপি তাই মোরা এসেছিহ্ন স্বপ্নের বাহিরে।
শরতের মধুরাতি—ফুটিয়াছে অচেনা সে-ফুল
উতলা সমীর হলো শেফালিকা-স্বরভি আকুল।
তোমারে ঘেরিয়া মোর নিশিদিন কেঁদেছে কামনা,
ভেবেছিহ্ন সেই ব্যথা কোনোদিন কারে জানাবো না।
রজনীর ছায়া-আলো প্রগল্ভতা এনে দিলো মনে
বক্ষমাঝে বেঁধে তোমা চুপি চুপি কহিহ্ন গোপনে।

মহিলা সমিতি

কাঁচড়াপাড়া মহিলা সমিতির

কার্য বিবরণী

মহিলাগণ বাহাতে একত্র সমবেত হইয়া নানা প্রকার গৃহশিল্প ও চাকরলা শিক্ষা করিতে পারেন এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতাদি আলোচনা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন, সম্ভবতঃ হইয়া তাহারা বাহাতে নারী জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারেন তদ্বৎশ্যে স্থানীয় মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

সর্বতোভাবে দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৬০ জন, তন্মধ্যে হিন্দু মুসলমান মিলিত।

গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্ত একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন। সকল সভ্যাই আপন আপন গৃহের ব্যবহারোপযোগী সূতা ও পশমের নানারূপ পোষাক, কাঁথা, বুনিবার আসন, গৃহের ব্যবহারার্থ দড়ির পাণোষ, ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া থাকেন। তাহারা আপন আপন ব্যবহারোপযোগী যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করেন, তাহার মূল্য আনুমানিক মাসে দশ টাকা।

সভ্যগণের প্রস্তুত দ্রব্যাদির ক্রয়ক্রয় কেন্দ্র সমিতির বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনীতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়, অবশিষ্টাংশ স্থানীয় প্রদর্শনীতে বিক্রয়ার্থ রাখা হইয়াছে।

সমিতিতে সেলাই ও কাট ছাঁট, রিগুকর্ষ, সূচিশিল্প, চিকণের কাজ, লেপ, আসন, কাঁথা, পাণোষ, ছেড়া কাপড় রং করিয়া তাহাদ্বারা নানা প্রকার সাদা ও রঙ্গীন ফুলের মালা প্রস্তুত করণ, নানা প্রকার উলের কাজ, কার্পেট প্রস্তুত, চিত্রাঙ্কণ, আলিপনা, কাপড়ের খেলনা তৈয়ার করা শিখান হয়।

এই সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্ত সমিতি হইতে জিনিষ সরবরাহ করা হয়। এবং প্রস্তুত দ্রব্যাদি সমিতিতে রাখা হয়। কখনও কখনও সভ্যগণ জিনিষ বাড়ী হইতে লইয়া আসেন ও প্রস্তুত দ্রব্যাদি বাড়ীর ব্যবহারার্থ লইয়া যান।

মাসে একবার সমিতির অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে স্থানীয় সকল মহিলাকেই নিমন্ত্রণ করা হয়। সম্পাদিকা মহিলাগণকে সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যধারা বুঝাইয়া দেন, এবং কি করিলে উন্নতি হইতে পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন। সমিতির মাসিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন। সমিতির অভাব অভিযোগও সেই সময় আলোচিত হয়। সভ্যগণ বাহা বাহা প্রস্তুত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাও সেই সময় দেখান হয়।

সমিতির স্থায়ী গৃহ নাই। ইনস্টিটিউটের একটা কক্ষে সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে, স্থায়ী গৃহ না থাকায় সমিতিতে যারপরনাই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বস্ত্র বয়ন, মণিপুত্রী তাঁতে তোয়ালে বোনা ইত্যাদি অনেক কাজ আছে বাহা শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাদিতে যেমন আগ্রহাসিতা, সভ্যগণও এইগুলি শিখিতে ততোধিক উৎসুক কিন্তু এইগুলি নিত্য স্থানান্তরিত করা যখন কাজেই শিখানও হয় না। আজকালকার দিনে গৃহশিল্প ও চাকরলা সকলেই অল্প বিস্তর জানেন। কাজেই নিজ নিজ গৃহে বসিয়াই এগুলি অনায়াসে করিতে পারেন তজ্জন্ত এতদূর হাটিয়া সমিতিতে আসা নিশ্চয়োজন বোধ করেন। বস্ত্রবয়ন অথবা তাঁতে সকল গৃহে থাকা সম্ভবপর নহে, সুতরাং এইগুলি সমিতিতে প্রচলিত করিতে পারিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত।

ছুংথের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আগ্রাণ চেষ্টা করিয়াও সমিতির উন্নতিকল্পে আমরা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

সভ্যগণ আপন আপন গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে কার্য করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করেন, সুতরাং আশা করা যায় যে, সমিতি নিজে উদ্যান থাকিলে, সভ্যগণ সমবেত ভাবে তাহার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইবেন।

সমিতির এক অধিবেশনে স্থির হয় যে, সভ্যগণের মধ্যে বাহারা ইংরাজী শিক্ষা করিতে চান তাহাদের জন্ত সমিতিতে ক্লাশ খোলা হইবে।

সমিতির এক অধিবেশনে এক দরিদ্র পক্ষু বিধবা উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুরবস্থার কথা সমিতির নিকট জানান। সমিতির মাসিক আয় অতি অল্প। বেতনাদি সমস্ত খরচ মিটাইয়া তহবিলে মাসে মাত্র ৫৭ টাকা জমা হয়। ইহা সত্ত্বেও সমিতি উক্ত বিধবাকে মাসে ২৭ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। বাহাতে এরূপ আরও বিধবাকে সাহায্য করিতে পারা যায় তজ্জন্ত গত মাস হইতে সভ্যাগণের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করা হইতেছে।

সমিতির ঋণদায়োগে গুরুসদয় দত্ত ও কবি রবীন্দ্রনাথের

মৃত্যুতে দুইবার দুইটা বিশেষ শোক সভার অধিবেশন হয়। বহু মহিলা উক্ত সভাগুলিতে উপস্থিত হইয়া মৃত আত্মাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

সমিতির প্রচেষ্টায় এখানে দাই ট্রেনিং ক্লাশ খোলা হয়। দশ জন ছাত্রী লইয়া ক্লাশ আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে দুইজন অনুপস্থিত হওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারে নাই। আটজন উত্তীর্ণ হইয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছে। আশা করা যায় এই আট জন দ্বারা মাতৃমঙ্গল ও শিশু মঙ্গলের কার্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইবে। কারণ তাঁহারা সকলেই শিক্ষিতা।

কাঁচড়াপাড়া মহিলা সমিতির বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব

১৯৪১

আয়	
গত বৎসরের দরুণ হাতে ছিল	৪৫-৯/-৫
ই, বি, রেলওয়ের নিকট হইতে	
মাসিক ২৭৫০ হিসাবে ১২ মাসের	৩৩৩-০-০
সরোজ নলিনী কেন্দ্র সমিতি হইতে	
মাসিক ১০০ হিঃ ১২ মাসের	১২০-০-০
ডিসেম্বরের টাকা আদায়	৬-০-০
মোট আয় টাঃ ৫০৪-৯/-৫	

ব্যয়	
শিক্ষয়িত্রীর বেতন মাসিক ২৫	হিসাবে টা ৩০০-০-০
শিক্ষয়িত্রীর গাড়ী-ভাড়া মাসিক ৪৭	হিঃ টাঃ ৪৮-০-০
শিক্ষয়িত্রীর বাসা ভাড়া মাসিক	
৩৫০ হিসাবে এক বৎসরের	টাঃ ৪৫-০-০
সমিতির কাঁচা মাল খরিদ ও	
অজ্ঞাত খরচ বাবদে টঃ	৭৩-০-৫
মোট খরচ টাঃ	৪৬৬-০-৫

মোট আয়—৫০৪-৯/-৫

মোট ব্যয়—৪৬৬-০-৫

হাতে আছে—৩৮ ৯/-০

সম্পাদিকা

কাঁচড়া পাড়া মহিলা সমিতি

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

গত অর্দ্ধশতাব্দী কাল যে সব মনীষীগণ নিজেদের প্রতিভা জ্ঞান, চরিত্র, সাধনা ও কর্মশক্তির দ্বারা বাঙ্গালী জাতিকে মহীয়ান করিয়াছিলেন, বিশ্বের দরবারে ঘাঁহারা বাঙ্গালীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—সেই সব দিক্‌পালের মধ্যে হীরেন্দ্র নাথ একজন। হায়! ‘একে একে নিভিছে দেউটা’

সে আজ চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা, যখন প্রথম হীরেন্দ্র নাথকে দেখি, তখন তাঁর দেহ সুঠাম, দৃষ্টি উজ্জ্বল, দেহের কান্তি সুন্দর, জ্ঞানালোকে মুখমণ্ডলভাসিত, সঙ্কল্পে দীপ্ত, বাগ্মীভাষ্য অপরাজ্যে! তখন হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার খ্যাতি বাংলার স্থধী ও ছাত্রমহলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

আমরাও তাঁহার প্রতিভার ও বক্তৃতার প্রচার প্রভাবে বাল্যজীবন হইতে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। মাতৃভাষার অনুরোধ ও উন্নতির জন্ত তাঁহার একনিষ্ঠতা দেখিয়া সাহিত্য সাধনায় আমাদের মতন কত শত যুবক আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এ বিষয় আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১শে ভাদ্র ষষ্ঠ্যর্থে লিখিয়াছেন—“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন উজ্জ্বল রত্ন; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র মন্ডন করিয়া তিনি যে অমৃত আহরণ করেন, তাহা মুক্ত হস্তে মাতৃভাষায় পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিশেষ দিকটা তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন, চিরজীবন তাহারই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের জাতীয় সম্পদ বেদ বেদান্ত, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান বাঙ্গলা ভাষার মধ্য দিয়া জাতির নিকট তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া প্রচার করিয়াছেন। ভগীরথ যেমন ধূজটীর জটাঞ্জাল হইতে জাহ্নবী-প্রবাহকে মর্ত্যালোকে আনয়ন করিয়াছিলেন, প্রাচ্য সংস্কৃতির ভাবধারা তিনি তেমনি আধুনিক বাঙ্গালী জাতির নিকট বহন করিয়া আনিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাবন হইতে বাঙ্গালী জাতির বহিস্থাধী চিন্তকে রক্ষা করিবার জন্ত মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন প্রভৃতি যে কাণ্ড আরম্ভ করিয়া-

ছিলেন, হীরেন্দ্রনাথ তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া জাতির জন্য জ্ঞানযোগীর মত সাধনা করিয়াছেন।”

হীরেন্দ্রনাথের জ্ঞানের ও কর্মের বিশালতা ও মূল্য আজ বর্তমান হৃদয়ে বিক্ষিপ্ত চিন্তের ভারতবাসী বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশীরেরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবে। তখনই তাহার জীবনের ও জ্ঞানের মহিমা দেশবাসীকে অমুপ্রাণিত করিবে।

মাত্র ৭৫ বৎসর বয়সে গত ৩০শে ভাদ্র ১৩৪২ সাল বুধবার মনীষী হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার চিরদিনের আকাজিক সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে কেবল বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির নহে, সমগ্র ভারতের যে অপরিদীপ্ত ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে। তিনি ব্রহ্মসাম্রাজ্য লাভ করণ, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আমাদের সমবেদনা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনকে কথঞ্চিৎ শান্তি প্রদান করিবে, ইহাই ভগবানের চরণে নিবেদন।

হীরেন্দ্র প্রতিভা

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জাহ্নয়ারী কলিকাতার চৌরবাগানের বিখ্যাত দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাল্যকাল হইতে হীরেন্দ্রনাথ যেমন মেধাবী ছাত্র ছিলেন তেমনই ভগবৎ প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার এই ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ তাঁহার স্নহুয়ার চিন্তে রোপন করিয়া দিয়াছিল, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিক উৎসবের সময় কেশবসেনের জন্মভিটায় বসিয়া হীরেন্দ্রনাথেরই নিকট শুনিয়াছিলাম—যখন আমার বয়স ১৪১৫ বৎসর তখন একদিন দোতালার ঘর হইতে একজন বাউল বেশধারী জ্যোতিষ্ময় ব্যক্তি, আমাদের উঠানে দাঁড়াইয়া একতারা বাজাইয়া হরিগুণগান গাহিতেছেন। তাঁহার সৌম্য প্রেমোজ্জ্বল মুক্তি, স্নহধূর কণ্ঠস্বর আমার অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার সেই দিনকার ছবি এবং

কণ্ঠস্থর আজীবন আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে।” এমনই এক মহাপুরুষের সাক্ষাতে হীরেন্দ্রনাথের জীবন সাধুসঙ্গ লাভের প্রকৃত উপকার পাইয়াছিল। আমাদের নিকট কত মহাজন

এমনই আসেন যান, আমরা কি তাহাদের প্রভাব বুঝিতে পারি? রতনই রতন চিনতে পারে।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

হিমালয় অভিযান—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত, পি ৬৫১ এ, মহানির্বাহণ রোড, পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও অক্লান্তশ্রমী হিসাবে যোগেন্দ্র বাবুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এক সময়ে তাঁহার চিত্র ‘মজুরের ইতিহাস’ পড়িয়া তাঁহার অসাধারণ ঐতিহাসিক অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছি। তারপর তিনি ঐতিহাসিক আরও কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার লিখিত ‘বঙ্গের মহিলা কবি’ ও ‘ভারত মহিলা’ জনসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। যোগেন্দ্র বাবুর প্রধান কীর্তি তৎসম্পাদিত ‘শিশু-ভারতী’। এ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব। ইংরাজীতে যেমন Childrens book of knowledge তেমনি যোগেন্দ্রনাথ ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় এই ‘শিশু ভারতী’ বা ৪০০০ হাজার পৃষ্ঠার ছেলেদের বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় মুগ্ধ হইয়াছি।

‘হিমালয় অভিযান’ বইখানি যোগেন্দ্র বাবুর লিখিত একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ পুস্তক নাই বলিলেই চলে। আমাদের ভারতীয় অভিযানকারীদের সম্বন্ধে কেহ এমন সুন্দরভাবে নানাতথ্য সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করেন নাই। আমরা কেবল বিদেশী পর্যটকগণের অভিযান-বিবরণই পড়িয়া আসিয়াছি। লিভিংষ্টোন, আয়ার, বার্ক,

ষ্ট্যানালি, প্রভৃতির আবিষ্কার ও হংসাহসিক অভিযান-বিবরণীই আমাদের বালক-বালিকার ও তরুণ তরুণীরা পড়িয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে সকল ভারতীয় অভিযানকারীরা আপনাদের জীবন বিপন্ন করিয়া এভারেট, কান্ধনজঙ্ঘা, তিব্বত মোঙ্গোলিয়া ও সিন্দুনদের এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস সন্ধানে গমন করিয়া বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা আমরা জানিতাম না। যোগেন্দ্রবাবু নানা হুপ্রাপ্য গ্রন্থ হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, কুমারজীব, পণ্ডিত কিম্ব সিংহ, কিম্বনলাল, শরৎচন্দ্র নাগ ও মোল্লা আভা মুহম্মদের হংসাহসিক অভিযান-বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সরস ও সাবলীল। পড়িতে পড়িতে নানা অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। পণ্ডিত কিম্ব সিংহ, কিম্বনলাল, শরৎচন্দ্র রায় ও মোল্লা আভা মুহম্মদের তিব্বত ও মোঙ্গোলিয়ার বিবরণ, হ্রদ, পর্বত, উৎস, বিহার ও মঠ, বগ্ন জন্ত ও বস্ত্র মানব প্রভৃতির অতি সত্য ইতিহাসও অপূর্ব বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিমালয় অভিযান বইখানি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের দ্রুত পাঠনের জন্য নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে এবং প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকরূপে ইহা পঠিত হওয়া কর্তব্য। পাইকা অক্ষরে অতি সুন্দরভাবে মুদ্রিত। প্রত্যেক পাঠাগারে “এই হিমালয় অভিযান” এক খানি রাখিলে, লাইব্রেরীর গৌরববর্দ্ধন করিবে। আমরা এইরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

সরোজনলিনী শিল্প-শিক্ষালয়

বর্তমানে যুদ্ধপরিস্থিতির জ্ঞাত সরোজনলিনী নারী শিল্প-শিক্ষালয় কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেখানে কলিকাতার মত সর্ববিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং শিল্প-শিক্ষার সমস্ত বিভাগই খোলা হইয়াছে। সংলগ্ন ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীগণকে সকলরকম স্বথ-সুবিধা দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। বর্তমান পূজা-অবকাশের পর কলিকাতা ও অন্তান্ত স্থানের ছাত্রীগণ যাহাতে কৃষ্ণনগরে গিয়া ভর্তি হইতে পারেন এবং শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ কোন ক্রটিই করিবেন না। সরোজনলিনী নারী-

শিল্প শিক্ষালয় বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-শিক্ষালয়। ইহার পাঠ্য-গ্রন্থিকা ও শিক্ষাপদ্ধতি অভিনব এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষান্তে নিতান্ত স্বল্প-জ্ঞান সম্পন্ন নারীও কৰ্মজীবনে প্রবেশ করিতে পারিবেন। মাতা-ভগিনী-কন্যা-বধূদের স্বাবলম্বিনী করিবার এই শুভ সুযোগ গ্রহণ করিবেন। জাহ্নবীরী হইতে নতুন সেসন আরম্ভ হয়, তৎপূর্বেই ভর্তি হইবার জ্ঞাত নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

শ্রীনারায়ণবাসিনী সোম

১২ ডি, আমহাষ্ট স্ট্রিট, কলিকাতা।

সম্পাদিকা

রণক্ষেত্রে সামনে পিছনে

প্রাচীনকাল থেকেই চা সৈন্যদের রসদের একটি অঙ্গ বলে' চলে আসছে। দুর্ধর তাতার বোকার অভিযান যেদিন মধ্য এশিয়ার সমতলভূমি অতিক্রম করে' ছুটে চলেছিলো, সেদিনও যুদ্ধের রসদ হিসাবে তারা সঙ্গে নিয়েছিলো চা। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে, পেনিন্সুলার যুদ্ধের সময়ও পাছে ঠিক সময়ে চা এসে না পৌঁছায় এই ভয়ে ডিউক অব ওয়েলিংটন সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকতেন বলে' জানা গেছে। তার পর ক্রাইমিয়ান যুদ্ধের সময় থেকে ইউরোপীয় দেশগুলিতে চা যুদ্ধের একটি অপরিহার্য রসদ বলে' গণ্য হতে লাগলো। সেই থেকে ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে চায়ের আদর এত বেশি বেড়ে গেছে যে এদের চা সরবরাহে যাতে কোনো ক্রটি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই এখন হয়েছে খাদ্য সরবরাহের এক প্রধান কাজ। এমন কি আজ ব্রিটিশ সৈন্যদের চা-প্রীতির ফলে "ক্যাকিন্"

কথাটার মানাই গেছে বদলে; কেননা আগে "ক্যাকিন্" বলতে শুধু বোঝাতো মদ খাবার ঘর।

আজকের যুদ্ধ চায়ের স্থান কোথায়, আর যুদ্ধরত সৈনিকদের কাছে এর মূল্যই বা কতখানি সেটা সেদিন খুব বিশদভাবে শোনা গেছে ইন্টারন্যাশনাল টা মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ডের এনিসিউর্যাণ্ট ডিরেক্টর অব প্রোপাগান্ডা, মিষ্টার এফ, ই, বি, গুলের একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায়। মিষ্টার গুলে বলেছেন:

"এই যুদ্ধ আর ব্রিটেনের দুর্দান্ত বিমান আক্রমণ সহ্য করার ক্ষমতার মধ্যে আমরা এই জিনিষটা দেখবার সুযোগ পেয়েছি যে চা-পায়ী একটা জাতের কতখানি শক্তি থাকে। আমরা আজ সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র এবং বতার ইত্যাদি অসংখ্য উপায়ে লোককে জানাতে পারছি যে—বতক্ষণ এক পেয়লা চা পাবে, ততক্ষণ গুলির মুখে দাঁড়িয়েও ইংল্যান্ড তার কাজ করে যেতে ক্রটি করবে না।"

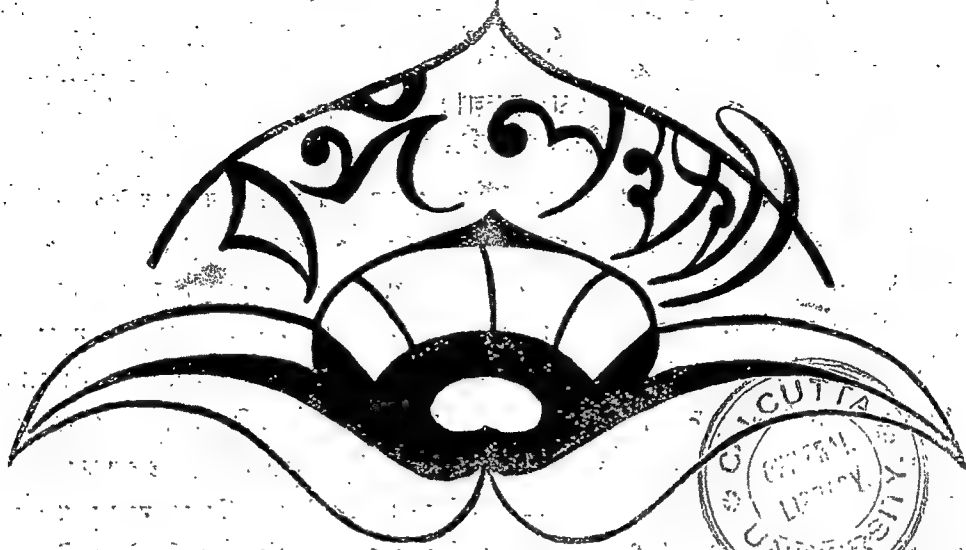
নোটিশ

আগামী ২৫শে আশ্বিন ১৩৪২ সন, ইংরেজী ১২ই অক্টোবর সোমবার হইতে শ্রীমদীয়া পূজা উপলক্ষে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিক পত্রিকার কার্যালয় আগামী ২৭শে অক্টোবর ১৯৪২ বাংলা ১০ই কার্তিক পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

বঙ্গলক্ষ্মী —



স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত



১৭শ বর্ষ

কার্তিক, ১৩৪৯

১২শ সংখ্যা

নব জাতক

পৃথিবী ছাড়িয়া চলি গেল কতজন,
কোন পথে গেল তারা—কার নিমন্ত্রণ
ডাকিল তাদের! এই সুন্দর ধরণী
রাখিতে নারিল ধরি,—হোল কি মরণই
শ্রেষ্ট সব চেয়ে, কালো লাগিল কি ভালো,
সব যার অন্ধকার নাহি অগ্নি-আলো!

হে মানব, মিলিল কি নিগূঢ় সন্ধান
অগ্নি-আলোকের সেই আদি জন্মস্থান—
টানিল তোমারে; নিল বৈচিত্রের পারে
রক্ত যেথা লুক্কাইত গুপ্ত রত্নাধারে।

গুপ্ত সেথা অগ্নি আলো, লুপ্ত সেথা দিন,
দৃশ্যমান বিশ্ব যেন মাতৃগর্ভে লীন।

হে জননী, হে অনাদি অন্ধকারময়ী
নিত্য নবজাত অগ্নি-আলো-মৃত্যুঞ্জয়ী!
পৃথিবীর গেল যারা, তাহাদেরও মাতা:
নব জন্ম দিও করি অন্ধকার-মাত।

‘নতুন’

(রস-রচনা)

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

‘নতুন’ কথাটা বাঙালা ভাষায় বেশ চলিয়া গিয়াছে। নিত্যন্ত শুদ্ধকথা ব্যবহারের প্রয়োজন-না হইলে নতনের পরিবর্তে ‘নতুন’ই বাঙালা ভাষায় চলতি কথা। নতুন বউ বা বই কেহ বলেন না, বড় একটা লেখেনও না—নতুন বই বা বউ বলা ত হয়-ই, লিখিলেও খুব দোষের হয় না। কবির দ্বিজেন্দ্রলাল ‘নতুন’র খুব পক্ষপাতী—তাই ‘নতুন’ কিছু কর, একটা নতুন ‘কিছু কর’ বলিয়া একপাতা কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহাজন-প্রদর্শিত পস্থা অবলম্বন করিয়া আমিও এই প্রবন্ধটির নাম রাখিলাম “নতুন”। আর একটা কাজও করিলাম, নতুনের বিশেষ্য পদ নতুনও করিলাম; বৈয়াকরনিকেরা দোষ না ধরিলেই বাঁচি।

নতুন সব জিনিষই যে ভাল—এটা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের মত নিশ্চিত সত্য, ইহাই সকলের ধারণা। সকলেই চান নতুন কিছু করতে, বলতে, পরতে, খেতে, আবিষ্কার ও উপভোগ করতে। কিন্তু একটু ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিতে যাইলেই দেখা যাইবে—সব নতুনই যে ভাল তা’ নয়। পুরাতনও এমন অনেক জিনিষ আছে, বাহা নতুনের চেয়ে অনেক ভাল, প্রয়োজনীয় বা হিতকর। এখানে নতুনের মহিমা ও অল্পপকারিতা জুই-ই একটু ভাল-করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা আছে।

প্রথমেই ধরুন বৈজ্ঞানিকের কথা। বৈজ্ঞানিক নতুনের চির-উপাসক। সে পুরাতনকে ভিত্তিমাত্র করিয়া ক্রমাগতঃ দিনের পর দিন নতুনের সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত ও করিয়াও যাইতেছে। গত একশত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান যে সকল নতুন নতুন তথ্য ও স্বাক্ষর আবিষ্কার করিয়াছে তাহাতে পৃথিবীর চিন্তাধারা, সভ্যতা, গমনাগমনবিধি, শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, বানিজ্য প্রভৃতির আশ্রয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জলীয়বাষ্পচালিত, রেলগাড়ী দেখিয়া কবি আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া লিখিয়া গেলেন ‘ছয়দণ্ডে চলে যায় ছয় দিনের পথ’। আর এখন ? এরোপ্লেন সাহায্যে এখন ছয় দিনের পথ

ছয় দণ্ড কেন, ছয় মিনিটেই বাওয়া যাইতেছে! হস্ত-লিখিত তাল পত্রের পুথির স্থলে এখন মুদ্রাযন্ত্রে অসংখ্য পুস্তক মুদ্রিত হওয়াতে পৃথিবীর ইতর-ভদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই শিক্ষা-বিস্তার সম্ভবপর হইয়াছে। সতার টেলিগ্রাফ যখন আবিষ্কৃত হইল—সকলে বলিল, এ ত একটা অদ্ভুত অভিনব আবিষ্কার! কিন্তু বৈজ্ঞানিক বসিয়া রহিলেন না। নতুনের আবাহনে তাঁহার গবেষণা চলিল। তাহার ফল হইল বেতারের আবিষ্কার। এখন বেতারে নিমেষের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলের চতুর্দিকে সংবাদ-সঙ্গীতাদি প্রতি নিম্নতই প্রেরিত হইতেছে। সিনেমাটোগ্রাফ বা চলচ্চিত্র যখন প্রথমে আবিষ্কৃত হইল, সকলে চমকিত হইয়া গেল। এখানেও বৈজ্ঞানিক কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলেন না; উহার নানাবিধ অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য বন্ধপরিচর হইলেন। পূর্বে বায়স্কোপের ছবিতে রংএর অভাব ছিল; বৈজ্ঞানিক অনেক চেষ্টার ফলে এখন ছবিতে রং ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এতেও বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। পূর্বে বায়স্কোপের ছবির মানুষ মুক ছিল। বৈজ্ঞানিক মুকের মুখে কথা ফুটাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৃতকার্য হইতেও বেশী বিলম্ব হইল না; মুকের মুখে কথা ফুটিল। বায়স্কোপের ছবির মানুষ এখন প্রয়োজন অল্পদূরে কাঁদে, হাসে, গান করে, চীৎকার করে। বজ্র-নির্ঘোষ, গান বাজনা, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস, বিরহ, বিলাপধ্বনি, সিংহগর্জন কিছুই এখন বাদ যায় না। সবই এখন টকি-মেসিনে ধরা পড়িয়া সিনেমাগৃহে যুগপৎ একই সময়ে সকল দর্শকের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। কত উদাহরণ আর দিব ?

বাস্তবিক নতুনের উপাসক এই বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী দিনের পর দিন অবিচলিত ও প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতির কত নতুন বার্তা আবিষ্কার করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। নতুনই বৈজ্ঞানিকের একমাত্র কাম্য। তবে জ্ঞান-রাজ্য যখন সীমাহীন ও অনন্ত, তখন বৈজ্ঞানিকের এই নতুনের সাধনা ও চিরদিন অব্যাহত থাকিবে।

বৈজ্ঞানিককে ছাড়িয়া চলুন যাই জামা-কাপড়ের দোকানে। এখানে কত নতুন নতুন ফ্যাশানের সাজী, ব্লাউস্, সেমিজ, পেটিকোট, ব্রুক্, কোট্ প্রভৃতি বড় বড় শো-কেসে সাজান দেখিবেন। দোকানে সাজী কিনিতে গেলেন, দেখিবেন সেখানে নতুনের অনন্ত মহিমা। দোকানদার বলিবেন—‘এই সাজীটাই নিন্ মশাই; এটা একেবারে এই বৎসরের আনু-কোরা নতুন ফ্যাশানের জিনিষ’ কাপড়-চোপড়ের ফ্যাশান প্রতি বৎসরই দেখিতেছি বদলাইতেছে। সাজীর কথাই ধরুন। নতুন নতুন কত ভোলই দেখিলাম। ছেলেবেলা দেখিয়াছি বোম্বাই সাজীর খুব রেওয়াজ ছিল, তারপর দিন কতক খুব চলিল পাঁসী সাজী। সাজীতে বিলাতী হরেক রকমের ফিতাবসানো পাড়। কাশ্মিরী সাজী তারপরে দিনকতক খুব চলিত হইল। তাহাতে কাশ্মিরের সুন্দর সুচের কাজকরা পাড়। স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে ও মধ্যে চলিল ছাপান মুর্শিদাবাদের গরদের সাজী। এখনও উহা চলিতেছে বটে, তবে এখন খুব বেশী চলিয়াছে জর্জেট সাজী। অতি সুন্দর জাপানী বা বিলাতী সিল্কের খোল, চটকদার সিল্কের হরেক রকমের পাড় বসানার দরুণ সস্তায় খুব চটুকে সাজী হইয়াছে। মেয়েদের কাছে কিন্তু শুনিতেছি যে জর্জেট সাজী এখন খুব সস্তা হওয়াতে ক্রমেই ছ্যা-ছ্যা হইয়া যাইতেছে। তাহিত ভাবনার কথাই বটেই। দোকানদারেরা ও এখন ভাবিতেছে—নতুন আর কি সাজী বানান যায়। তবে নতুনত্বের মোহ এক প্রকার সাজীকে বড় একটা স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেটা হচ্ছে বেনারসী সাজী। ইহার রকম ফের হইয়াছে বটে, কিন্তু আসলে বেনারসী সাজীটা সকলেরই পছন্দ।

এতক্ষণ সিল্কের সাজীর কথাই বলিতেছিলাম। সূতির সাজীও যে কত নতুন নতুন রকমের হইতেছে তাহা যেকোন একটা দোকানে গেলে আর বুঝিতে বাঁকি থাকে না। নানান স্থান হইতে এইরূপ অনেক সাজী আসিয়া কলিকাতার বাজারে জড় হইতেছে। বাংলাদেশের প্রস্তুত সাজীতে বঙ্গবন্ধুর আর ভূক্তি হইতেছে না। দেখা যাইতেছে যে সুবিখ্যাত ঢাকাই সাজীও এখন প্রায় অচল। আজকাল মাদ্রাজী, মাহাটি প্রভৃতি সাজী খুব চলিতেছে। মিলের সাজীর পাড়ের বাহার খুবই বাড়িয়াছে; দেখা দেখি তাঁতের সাজীতেও সেই সব পাড়ের অলঙ্করণ চলিয়াছে। সকলেই চেষ্টা

করিতেছেন—নতুন ভোলের, নতুন পাড়ের সাজী তৈয়ারী করিতে। আগামী বৎসরে নতুন ফ্যাশানের কি সাজী বাহির হইবে তাহার জ্ঞান অনেক গৃহিণী ও বধূ যে উদগ্রীব হইয়া কালান্তিপাত করিতেছেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মেয়েদের সাজী ছাড়িয়া এখন পুরুষদের ব্যবহৃত পোষাকের দিকটা দেখা যাক। পুরুষদের ধৃতি সম্বন্ধে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। মেয়েদের সাজীর পাড় যতই চওড়া ও জমকালো হইতেছে, পুরুষদের ধৃতির পাড় ততই সুন্দর হইতে সুন্দর হইতেছে। ছেলে বেলায় দেখিয়াছি আধ এমন কি একইকি পাড়ের ধৃতি। ক্রমে পাড় হইল কোয়ার্টার ইঞ্চি। এখন দেখি ছেলে বুড়ো সকলেই পরিতেছে নরুণপাড় ধৃতি। নরুণ আবার ক্রমেই ‘আলট্রা’ নরুণে পরিণত হওয়াতে, ধৃতির পাড় ক্রমে নিরাকার হইতেছে। কেন যে এটা হইতেছে—তাহা গবেষণার বস্তু বটে। কেহ কেহ বলিবেন, সস্তা হয়। তাই হবে। গৃহিণীর জ্ঞান চওড়া জমকালো পাড়ের সাজীতো কিনিতেই হইবে, নইলে নিস্তার কোথা? তাহাতে খরচ বিস্তর। ধৃতির পাড় সস্তা করিয়া এই বাড়তি খরচ পোষানর বোধহয় নরুণই একটা উপায় হইয়াছে।

পুরুষদের পোষাকের মধ্যে আর একটা জিনিষ খুব নতুন রকমের দেখিতেছি। সকলেই এখন চাদর বা উড়ানি ছাড়িয়াছেন বা ছাড়িতেছেন। চাদরের রেওয়াজ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সেদিন একটা ট্রামে উঠিয়া শুনিতে লাগিলাম—কয়জন উড়ানি ব্যবহার করিতেছেন। দেখিলাম জন পঁচিশ খ্রিশ লোকের মধ্যে কেবল আমি একেলাই উড়ানি পরিহিত। আরে মশাই—উড়ানি বা চাদর ছাড়েন কেন? চাদরের অনেক গুণ। চাদর প্রয়োজন হইলে শিরস্রাণ বা পাগড়ী হইতে পারে। হঠাৎ বৃষ্টি বা রৌদ্র হইলে চাদরটা মাথায় ঢাকা দিলে উহা কতকটা ছাতার কাজও করে। রাস্তার কোনও জিনিষ খরদ করিলে, তাহা লইয়া যাইবার জন্ত উহা গামছার কাজ করে। ফলাবে ব্রাহ্মণদের ছাঁদার লুচি বহনকল্পে উহা যে খুবই ব্যবহৃত হইত—সেটা যেন ভুলিবেন না। প্রয়োজন হইলে কোমরে জড়াইয়া বেশ পালোয়ান-সাজিয়া বীররসের অবতারণা কর্ণে উহা সহায়ক এবং মারামারি করিবার একান্ত প্রয়োজন হইলে, ঐ উপায়ে

আলগাধুতি বা মুক্তকচ্ছ বেশ শক্ত করিয়া বন্ধন করিবারও উপায়স্বরূপ হইতে পারে। এবাধি বহু গুণসম্পন্ন চাদর কেবল নতুনত্বের মোহে ছাড়িয়া বড় ভাল কাজ করিতেছেন না। উড়ানি ছাড়িলে কিছু খরচ কমে বটে, কিন্তু যে জিনিষটার গুণ এত, তাহার জন্ত কিছু খরচই না হয় করিলেন? তবে কি বুঝিতে হইবে যে গৃহিণীর চওড়া পাড় সাড়ী ক্রয়ের জন্ত নরুণ পাড় ধুতি পরিধান যেমন প্রয়োজন, চাদর পরিত্যাগও সেইরূপই অপরিহার্য্য হইয়াছে। আত্ম প্রবঞ্চনা আর কাহাকে বলে।

ধুতি চাদর ছাড়িয়া পুরুষদের আফিস যাইবার কাপড় চোপড়ের কথা একটু বলি। আফিস যাইবার পোষাকে অনেক নতুনত্ব দেখা যাইতেছে। প্রসন্ন গোয়ালিনীর উকিল, এবং বোবহার হাকিমেরও পোষাকে ছিল চোগাচাপকান। সেই চোগাচাপকান এখন প্রায় অন্তর্হিত। অত লটপট করা লম্বা পোষাক সাধারণ কার্যের পক্ষে উপযোগী নহে। তাহার বদলে দিনকতক চলিল গলাবন্ধ কোট, প্যান্টলুন, ও ক্যাপ। দেখিতেছি সেদিনও এখন অন্তর্হিত প্রায়। অল্প মাহিনার চাকুরে কেহ কেহ এখনও উহা পরেন বটে, কিন্তু সাহেবী পোষাকই এখন সর্বত্র প্রচলিত। সাহেবী পোষাক ব্যবহার সম্বন্ধে একটা হাশ্বকর দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। সেটা হইতেছে এইরূপ—পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বা বড় চাকুরী পাইলে বোতামওয়ালা কোট ও ক্যাপধারী সস্তা সস্তা সেগুলি ত্যাগ করিয়া নেকটাই, হ্যাট, গলাধোলা কোট লাগাইয়া একেবারে একদিনেই সাহেব সাজিলেন। সাহেবী পোষাকই যখন জগতে International পোষাক হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে, তখন আমাদের দেশেও সাহেবী পোষাক ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিবে এরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিলে বোধ হয় তাহা নিষ্ফল হইবে না।

কাপড়চোপড়ের দোকান ছাড়িয়া এইবার চলুন একবার খাবারের দোকানে যাই। সন্দেশের দোকানে চুকিয়া কত নতুন নতুন রকমের সন্দেশই না দেখিতে পাইবেন। কাঁচাগোলা, নরমপাক বা কড়া পাকের সন্দেশ দেখিতে ত' পাইবেনই; তা ছাড়া দেখিবেন হরেক রকমের নতুন ফ্যাশানের সন্দেশ—আবার-খাবো, চপসন্দেশ, ডিমসন্দেশ, মাগ ফ্রিজিডোয়ারে সংরক্ষিত আইসক্রিম সন্দেশ। নতুন গুড় উঠিতে

না উঠিতেই নতুন গুড়ের সন্দেশ পাইবেন। তারপর বিলাতী এসেম্বলর গুণে কমলালেবুর সন্দেশ, আমসন্দেশ, প্রভৃতি নতুন হইতে নতুনতর সন্দেশ গ্রন্থত হইয়া দর্শকগণের মনে সন্দেশাহুবাগ অহংরহঃ জগাইয়া দিতেছে। সেদিন দেখিলাম যে এক সন্দেশওয়াল 'কেলসিয়াম সন্দেশ' বাহির করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে তাঁহার সন্দেশে কেলসিয়াম থাকিতে উহা সবিশেষ পুষ্টিকর। একাধারে আহার ও ঔষধ। এইত চাই! সন্দেশওয়াল! যখন বৈজ্ঞানিক; এমন কি ডাক্তার পর্যন্ত হইয়াছেন তখন ভারতমাতার উদ্ধারের বিলম্ব যে আর অধিক নাই তাহা স্মৃতিশীল। রসগোল্লাও নতুন ভোল হইয়াছে। সনাতন রসগোল্লা পাতলা স্কীরে অর্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় থাকিয়া 'রসমালাই' নামে বিক্রয় করিতেছে। আবার উদর দেশে অল্প একটু রসুন পুর সন্নিবেশিত হরিদ্রাভ রংএর রসগোল্লা হইয়াছে 'রাজভোগ'। আচ্ছা, রসগোল্লার আরও একটু রকমফের করিয়া কেহ 'রাণীভোগ' বাহির করিয়াছেন কিনা কেহ খবর নাইবেন ত? করিলে নতুনত্বের বাজারে আবিষ্কারক রাতারাতি বড়লোক হইয়া যাইবেন নিশ্চয়ই। কড়াইগুটির কচুড়ি ও ফুলকপির সিংগাড়া অনেকটা নতুন খাবার। জিজ্ঞাসা করি ফুলকপি বা কড়াইগুটি উঠিবার বহুপূর্বে বা পরে খাবারের দোকানের সেগুলি বিক্রয় হয় কি করিয়া? এগুলিও দেখিতেছি স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজেরই মত, ইহাতে বাস্তিত্র দ্রব্যের সংস্পর্শ আছে, অস্তিত্ব নাই। মারোয়াড়ীদের প্রস্তুত খাবারও এখন বাঙালী দোকানে স্থান পাইয়াছে। প্যাঁড়া, গুজিয়া, বালুশাই, সর্কোপরি শোনপাপড়ি, ডালমুট এখন বাঙালী খাবার হইয়াছে। বাস্তবিকই আজকাল শোনপাপড়ি ও ডালমুট না হইলে সব পার্টিই মাটি। আবার চা পার্টিতে আজকাল ইংরাজী স্যাণ্ডউইচ ও কেক অনিবার্য্য খাবার হইয়া উঠিয়াছে। এত গেল নতুন নতুন খাবারের কথা। তা' ছাড়া খাবার প্যাক করিয়া গ্রাহককে দিবার পদ্ধতিতেও নতুনত্ব দেখা দিয়াছে। পূর্বে শালপাতার চৌকি করিয়া গ্রাহককে খাবার বা সন্দেশ দিবার পদ্ধতি ছিল; এখন বড় বড় দোকানে কার্ডবোর্ডের স্কন্দর ছবিওয়াল বাক্সে টিন-পেপারে ঢাকা দিয়া খাবার ও বিশেষতঃ সন্দেশ গ্রাহককে দিবার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রসগোল্লা ভ্যাকুয়াম টিনে মোড়ক

অবস্থায় পাইবেন। উহা যেখানে সেখানে লইয়া যাওয়া যায় এবং অবিকৃত অবস্থায় অনেকদিন থাকেও। এই যে সব নতুন পদ্ধতি বাহির হইতেছে তাহা বিজ্ঞান সম্ভব বলিয়া লেখক এগুলিকে সানন্দে বরণ করিতেছেন।

এইবার গহনার বাজারে বাই চলুন ত। সেখানে গিয়া দেখিবেন সব গহনার ডিজাইন 'নিতুই নতুন'। চারি পাঁচ বৎসর অন্তর গহনা ভাঙ্গিয়া আবার নতুন ফ্যাশানের গহনা না গড়াইলে গৃহিণীরা পরিতেই চান না। দেখিতেছি সে কালের অনেক গহনাই আজকাল আর বঙ্গবুলবধুর অকণ্ঠশোভা বৃদ্ধি করিতেছে না। সে কালের গৃহিণীদের নাকের নথ একটা বড় আদরের গহনা ছিল। সে নথ এখন একেবারে লুপ্ত। ভালই হইয়াছে। আগে অনেক কৰ্ত্তা সামান্য অপরাধেও গৃহিণীর নথ-নাড়া খাইতেন, এখন ঐ ভীতি হইতে তাঁহারা পরিত্রাণ পাইয়াছেন। কানের গহনারও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখিতেছি। আগে মেয়েদের কানে এক গোছা মাকড়ি স্থলিত; সেগুলি এখন গিয়াছে। তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে 'কানবালা'। এই কানবালা এখন যে কত নতুন ফ্যাশানের হইয়াছে, তাহার ইয়ভাই নাই। দৈর্ঘ্য ও ফাঁদে সেগুলি ক্রমেই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছে। যে সকল সিমস্তিনী এইগুলির গুরুত্ব বহন করিতে অসমর্থ, তাঁহারা কানে ইয়ারিং বা ইয়ারটপ পরিতেছেন। ঝুমকো একটি প্রাচীন গহনা। কিন্তু প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ যেমন অনেক বিষয়ে বাড়িতেছে, সেইরূপ আধুনিক কালে ঝুমকো-প্রীতি দেখিয়া বুঝিতেছি যে এখানেও প্রাচীনের প্রতি আশ্রয় দেদীপ্যমান। হাতের গহনারও চের পরিবর্তন হইয়াছে। আজকাল মহিলারা উপর হাতে কোনও গহনা বড় একটা পরিতেছেন না। উপর হাতের শোভা এখন গায়ের বডিসের পাড়ের বাহারেই খুলিতেছে। বড় জোর নতুন প্যাটার্নের আমলেট উপর হাতে পরেন দেখা যায়। সে কালের তাগা, যশম ও তাবিজ এখন অকারণে পরিত্যক্ত। তাগা পরিতে বলিলে কত বা বধূরা বলেন—বাবা, ওত 'গয়লা বড়' পরে। বাস্তবিকই প্রসন্ন গোয়ালিনীর উপর হাতে যে তাগা ছিল এটা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। নীচের হাতে দেখি একগোছা গহনা পরিবার রেওয়াজ প্রচলিত হইয়াছে। এইখানেই গহনার, বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইংরাজিতে বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'Largest

concentration'। চুড়ি অন্ততঃ প্রত্যেক হাতে আটগোছা করিয়া চাইই, তা'র উপর বালা, কলি, ব্রেস্লেট প্রভৃতিও আছে। ষাঁহার বেশী সোখিন তাঁহাদের নীচের হাতে আবার রিষ্ট-ওয়াচ দেখা দিয়াছে। ঘড়িটা হয়ত চলেই না, তবু পরিতে হইবে—তাই বলিতেছিলাম যে মেয়েদের হাতের রিষ্ট ওয়াচে ঘড়ির কাজ যতটা হউক আর না হউক উহা সম্ভাব্য একটা গহনার কাজ করে। কোমরের গহনা আগে ছিল গোটি ও চন্দ্রহার। সেগুলি নতুন আমলে উঠিয়া গিয়াছে। গহনার আর একটা বড় রকমের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়—কণ্ঠদেশ ও বক্ষে। আগ্রে কণ্ঠদেশের গহনা ছিল সোনার চিক্। তার জায়গায় আজকাল হইয়াছে মুক্তার কলার। কণ্ঠ ও বক্ষদেশের শোভাবর্দ্ধনকারী হার আছে বটে, কিন্তু এখন হরেক রকমের নেকলেস হারকে হার মানাইয়াছে। মাথার গহনাতেও নতুন দেখা দিয়াছে। নববধূর মাথার সামনে পাশচিরণী, টায়রা ও মটক বসিয়াছে। মাথার পিছন দিকে কাঁটা ও ফুলবিক কুন্তলের শোভা ঠিকই আছে। তবে কুন্তল প্রদেশে চিরুণীর ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। পায়ে সোনা পরিতে নাই, তাই রূপার মল পূর্বে বধূদের পদযুগলের শোভা বর্দ্ধন করিত। এখন 'মল' একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। আমরা যখন ভারতমাতার শৃঙ্গলই ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন বধূদের পায়ের বেড়ীরূপ 'মল' যে ভাঙ্গিয়া দিব, এতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! গহনার এত নতুন সাধিত হইলেও একটা গহনার কোনও পরিবর্তন হয় নাই, হইবেও না। সেটা হচ্ছে হাতের নোয়া। এই স্বস্তি লৌহ বলয় প্রত্যেক হিন্দু রমণী বিবাহের রাত্রিতে হস্তে ধারণ এবং যতদিন তিনি সধবা থাকিবেন, ততদিন তিনি অতি যত্ন ও ভক্তি সহকারে উহা হস্তে পরিয়া থাকিবেন, এক মুহূর্ত্তের জন্তও উহা খুলিবেন না। আবার অনেক সধবার হস্তে একগোছা নোয়াও দেখিতে পাওয়া যায়। এটা সাবিশ্রীর নোয়া, ওটা মা কালী বা মা দুর্গার পায়ে ঠেকান নোয়া ইত্যাদি। সধবার নোয়াই তাহার সবচেয়ে মূল্যবান গহনা—সোনা, জহরত, মুক্তাখচিত গহনার কাছে ইহার মূল্য লক্ষাধিক বেশী। মাথার সিন্দুর ও হাতের নোয়া অক্ষয় হউক—হিন্দু রমণীরা এর চেয়ে মূল্যবান গহনা কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সম্পাদিকার জল্পনা

বিপদ-গুরু

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে প্রথম—তাতেই তার মনুষ্যত্ব লাভ ঘটে না। মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে নানারকম শিক্ষা দীক্ষার মধ্য দিয়ে তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। শিশু প্রথম পিতামাতার কাছে সভ্য ও ভদ্র হতে শিক্ষা লাভ করে, তাই পিতামাতা প্রথম গুরু ও প্রধান গুরু। পরে পাঠগুরু, কর্মগুরু ও ধর্মগুরুর সংস্পর্শে এসে তার মনুষ্যত্ববোধ উদ্দীপ্ত হয়। পাঠগুরু বিদ্যা অভ্যাস করান, কর্মগুরু কৃতী হওয়ার নৈপুণ্য দান করেন হাতে কলমে, ধর্মগুরু অন্তরে শুভ বুদ্ধির সঞ্চার করে কল্যাণ লাভ করান। তাঁদের সকলকেই বড় প্রয়োজন মানুষের জীবনে—কিন্তু আর এক গুরু আছেন বীর শিক্ষাদানের শক্তি বড় কম নয়। তাঁকে মানুষ গুরু বলে জীবনে স্বীকার করতে চায় না, এড়িয়ে চলতে চায় কিন্তু তবুও তিনি শিক্ষা দিতে বিরত হন না। তিনি—হচ্ছেন বিপদ-গুরু। এই বিপদ-গুরু যে কি নিয়ে আসেন, কি দিয়ে যান, সেটা আজ ভাববার সময় হয়েছে, কারণ বর্তমানে আমরা বিপদের বেড়াজালে বেষ্টিত। বিপদ—ভগবানকে ভাবতে শেখায়, দশ জনকে মানতে শেখায়, প্রতীবেশীর মূল্য বোঝায়, ধনের ভরা, মানের ভরা ডুবিয়ে দিয়ে মানুষকে মানুষের মূল্য দিতে শেখায়, সকলকে সমান করে আনে চাপ দিয়ে। যখন ভক্তিতে ভগবানকে পাওয়া দুর্লভ হয়, তখন ভয় ভগবানকে এনে দেয় কাছে। তাই আজ সকলে ডাকছে, “তাহি মধুহৃদন।” বোমা পড়ার ভয়ে মানুষ পাগল হয়ে ছুটাছুটি শুরু করেছিল, কিন্তু ভয় আজ মানুষকে বিপদের সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে শিখিয়ে দিল। মানুষ এখন বিপদকে সামনে রেখে চলতে শিখেছে।

বাড়

প্রকৃতির বিপর্যয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার লোকের প্রাণ নষ্ট হচ্ছে। গরবাহুর বাসঘর ভেসে চলেছে প্লাবনে। মানুষ নিরাশ্রয়—নিরুপায়—অসহায়। পাঁচজন সাহায্য দিয়ে

তার কতটুকু সামলাতে পারে—যে যা পারে করুক, পুণ্য কাজে তাঁদের পুণ্য লাভ হবে, কিন্তু এটাই সব নয়। মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে, আত্মরক্ষায় সমর্থ করতে হবে, দরিদ্রের পারিশ্রমিক বাড়াতে হবে দ্বিগুণ, কোন কোন স্থলে তিনগুণ, তবেই তারা নিজেদের উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ করে—কতকটা নিরাপদে বাস করতে পারবে। শিক্ষা পেলে বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচবার উপায় আগে থাকতে ভাবতে পারবে। অজ্ঞ বলে তারা অধিক কষ্ট পায়।

মজুর খাটিয়ে উপযুক্ত মজুরী দিতে অনেকেই কাতর হন, ধমকে তাদের মুখখাবুড়া দেন। অজ্ঞ তারা—ভয়ে থেমে যায়—যা পায় তাই নিয়ে বাড়ী করে। এই সব অজ্ঞায়ের ফলে দুর্গতদের আজ এত দুর্গতি। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার গোড়া শক্ত করে বেঁধে দিলে শেষে আর আগায় জল ঢালতে হবে না। জনসাধারণের শক্তি যাদের পুঁজি তাঁরা এ বিষয়ে ভেবে দেখুন। গত ২২শে আশ্বিনের ঝড়ে বিপন্নদের হাহাকারে সমস্ত দেশ হায় হায় করে উঠেছে। দেশ, গ্রাম, পল্লী উজাড় হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। ভগবান নূতন বুদ্ধি দিন আমাদের বাঁচবার। বাঁচতে শেখাই আসল শিক্ষা।

কালীপূজা—অগ্নিদাহন—হালসীবাগান

ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, কালীপূজা অমাবশ্যায় হয়ে থাকে—এবং মহাপূজার ক্ষণটি নাকি দুপুর রাত্রে ঘটে। আমরা চিরদিন শুনেছি, অত রাত্রে অল্প বয়সী মেয়েরা শিশু নিয়ে পূজা দেখতে যায় না। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় তারা দেবীদর্শন ও প্রণাম করে আসে। বাড়ীর গৃহিণীরা ও বৃদ্ধারা কেউ কেউ রাত দুপুরে পূজার ক্ষণে গিয়ে থাকেন। বর্তমান আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারের মধ্যে বেশী রাত্রে শিশু নিয়ে মেয়েদের বাহির হওয়া সম্ভব ত নয়ই, অধিকন্তু অনেকে হয়ত পুরুষ অভিভাবক না নিয়েও যান। অন্ধকার পথে গুপ্তার ভয়ও তো আছে। বেশী ভিড়ে শিশু চুরি ও মেয়েদের গায়ের গহনা ছিনিয়ে নেওয়ার কথা কে না শুনেছে!

বর্তমান হালসীবাগানের অগ্নিদাহনে জানা গেল, শিশু-বালক-বালিকা ও নারীর দলই দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন অধিকাংশ। এটি অবশ্য বৈকাল চারটার ব্যাপার। কিন্তু গা' ভরা গহনা পরে ঐ ভিড়ে যাওয়াটা যে কত অবুজির কাজ সহজেই বেঝা যায়।

এক এক বাড়ীতে শুনছি গোষ্ঠীস্বত্ব সবাই গিয়েছেন, একজনও ফেরেন নি। বাড়ী যেমন তেমনি তালাবদ্ধ রয়েছে। এ খবর যে কি নিদারুণ মর্মান্তিক, বলা যায় না। বড় দুঃখে বলতে হয়, অবিবেচনা পূর্বক শিশু, বালক, বালিকা নিয়ে মেয়েদের একরূপ ক্ষেত্রে যাওয়া কেন! বারোয়ারীতলায় যাত্রাগানের গন্ধ পেলেই ছুটে যাওয়া নেশার কাজ! দেবীদর্শন, পূজা দেওয়া, মানসিক শোধ, এগুলি স্বতন্ত্র জিনিষ, দিন দুপুরে—ভিড় যখন কম, তখন সেগুলি করা

চলে। পুরুষ যা পারে—বিপদে যতটা নিজকে সামলাতে পারে, মেয়েরা তা পারে না—এটা ভাল করে ভাবলে যা-তা করার বুদ্ধি একটু স্থির হয়। ছোটবেলার শোনা কথাটি আজ স্মরণ করি। রাতে ও ভিড়ে মেয়েদের ভেবে চিন্তে বার হওয়া উচিত।

উদ্যোক্তা কর্তৃপক্ষরা নারী ও শিশুদের জন্য যদি আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা করেন তবে সেসময় রীতিমত সুবন্দোবস্ত করা দরকার। ব্যবস্থার ত্রুটিতে কী সর্বনাশ ঘটতে পারে, বর্তমান ব্যাপারটি তার জাজল্যমান প্রমাণ নয়, কে বলতে পারে? অনেক লোক জড় করতে গেলে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়—বুঝতে হবে। এতগুলি জান্ত মানুষ পুড়ে মারা গেল, এজন্য ভগবানের কাছে দায়ী কে?

প্রেম ও পদ্ধতি

কুমারী প্রীতিসুখা সিংহ

পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানুষের অনেক কিছুই ভেসে যায় কালের মহাযাত্রায়—যায় না শুধু স্বভাব। অস্থি-মজ্জা, শিরা—উপশিরায় স্বভাবের একগুঁয়েমী জড়িয়ে থাকে অক্টোপাসের মতোন তাই জ্ঞানীরা বলে গেছেন, 'স্বভাব যায় না ম'লে'। হাজার বছর পূর্বের শিল্প-সাহিত্যের নমুনা আজকে সাড়ে বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের দুর্বোধ্য নয়—নতুন মন প্রাচীন মনের চিন্তাধারা, শিল্প চাতুর্য, সাহিত্য প্রভৃতির বিশ্লেষণে সর্বদাই অনুসন্ধিৎসু। এই যে প্রাচীন ও নবীনের সরল বোঝা পড়া, এর মূলে দাঁড়ায় যে মানুষের শুধু অনুভূতি ও প্রবৃত্তি নয়, কিন্তু জ্ঞান ও কল্পনাসক্তিও সেকালে যা ছিল একালে ঠিক তাই আছে। হস্ত-শিল্পের প্রথা, আকৃতি ও ঘটনা পরিবর্তিত হয় কিন্তু বুদ্ধি, চিন্তাধারা ও আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন হয় না। মানুষের জীবন শিল্প, প্রচলন, সংস্কার, আদর্শ, ধর্ম প্রভৃতি ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক আবহাওয়ায় বদলে যায়—থাকে শুধু প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ; ইজিপ্টের গ্র্যানাইটের মতোন স্থাবর মূর্তি নিয়ে। দ্বিতীয় রামেসিসের বিরাট প্রতিমূর্তির স্থগুথে বসে শিল্পী যখন খোদাই করে যাচ্ছিলো—তখন মুহূর্তের জন্যে হস্ত ভেবেছিল; একপায়ে দাঁড়িয়ে দুই তিন জোড়া হাত ছানি দিচ্ছে এই রকম মূর্তি তৈরী করলে হয় না? শিল্পীর

এই কল্পনাকে হেসে উড়িয়ে দেয়া চলেনা কারণ পরবর্তীকালে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে গেছে সেইটে—ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সমাজ-শিল্পীরাও মানুষকে নিয়ে সমস্যা পড়েছেন, চান মানুষের স্বভাবকে বদলে দিতে কিন্তু কৃতকার্য হননি সমগ্রভাবে।

মানুষের অপরিবর্তনশীল অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির মূলে হচ্ছে প্রেম—প্রেমের ইতিহাস যদি লেখা হ'ত, তার চও বোধ হয় শিল্পের ইতিহাসের মতোনই হ'ত। প্রেমে জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সমানই থাকে তবে বিভিন্নযুগের লোক বিভিন্ন ভাবে বিষয়টির কল্পনা করে। প্রচলন ও জনমতের ছাঁচে প্রেমের বিষয় বস্তু যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল পরবর্তী আধুনিক যুগে সেই রূপের নাম হ'ল অস্বাভাবিক। মহাযুদ্ধের পরে প্রণয়ধারার এই পুণরাবির্ভাব হয়েছিলো ইউরোপে।

বেশভূষার বা ফ্যাশানের ধারার মত প্রেমের ধারা সুস্পষ্ট ও সাবজেনীন নয়। দুটি বিরুদ্ধ ও স্বতন্ত্র মতবাদ পুরুষ ও নারীর মনের মধ্যে থাকে যে গুলি প্রেমের জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের বিষয়কে রূপ দেয়। প্রথম মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্মের আদর্শ এবং কাল্পনিক ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছিলো। দ্বিতীয়টি অসম্পূর্ণ এবং অস্বীকৃত মতবাদ যার

ভিত্তি হচ্ছে আধুনিক মনস্তত্ত্ব। জনমত, আদর্শ, কুসংস্কার ও প্রচলন যেগুলি প্রথম মতবাদকে তুলে ধরেছিলো এবং প্রেমাত্মকভাবে সহায়তা করেছিলো সেগুলি সামরিক আবহাওয়ার তরুণ-মনকে নিরাশ করে তুললো। কাষেই প্রেমিক বাস্তবের রাজ্য ছেড়ে কল্পনার আশ্রয় নিলো। নতুন মতবাদটির কারণস্বরূপ তরুণমনের চিন্তাধারাকে ধরা যেতে পারে।

প্রাচীন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিলো খৃষ্টধর্মের ও ঔপন্যাসিক আদর্শ—খৃষ্টীয় আদর্শে কামানুরাগের তফাতে থাকা এবং ঔপন্যাসিক আদর্শে তার পূজা করা। রুশো প্রেমের জন্তেই প্রেমের পূজা আরম্ভ করলেন—রুশোর পূর্বে হেলেনের প্রতি প্যারিশের প্রণয়, দিদো ও এনিসের প্রণয় এবং পাওলো ও ফ্রান্সিস্কার প্রেমকে সর্বধ্বংসী ব্যাধি মনে করা হ'ত। রুশোকে অনুসরণ করে রোমান্টিক কবিতা মধ্যযুগের কামপ্রবৃত্তিকে একটা মলিনতার আবহাওয়া থেকে মুক্ত করে এনেছেন পবিত্রতার প্রকোষ্ঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেমের মূলে খৃষ্টীয় পবিত্র সমস্তাধর্ম একদিকে যেমন ছিল তেমনি অত্রদিকে মিটিসিজম-এর ছোঁয়াচ ছিল।

কিন্তু পবিত্রতা ও স্বাভাবিকতা বলে কোন ভেদ প্রেমে নেই। সকল প্রকার প্রণয় আচরণই মানুষ ও পশুর মধ্যে দেখা যায়। এই সব আদর্শ ও মতবাদের স্থায়ী সামাজিক প্রয়োজনীয়তায় ঝাপ খাওয়ানো।

বিংশশতাব্দীতে প্রেমসম্বন্ধীয় ধারণা বাস্তব-মূলক। নতুন আমলের লোক প্রেমের 'প' নিয়ে মাথা ঘামায় না। মন-বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে যৌন-আচরণের প্রচার যা পূর্বে অসাধারণ, অদ্ভুত ও চর্যাচার বলে লোকের ধারণা ছিলো পরে তা সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং ইহাকে সাধারণতঃ প্রেমের স্বাভাবিকতা বলা হ'ত। আগে যেমন যৌন-সম্বন্ধে আলোচনা সূষ্ট ছিল না, আধুনিক কলকল্লার যুগে তেমনি এই সম্বন্ধে গবেষণা অবাধ ও সরল হয়ে এসেছে। কালের প্রবাহে নরনারীর প্রেম-রহস্য ভয় এবং কদর্যতার খোলস ছেড়ে সহজ হয়েছে। আমেরিকান তরুণ তরুণী এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী—তাদের মতে প্রেম টেনিস খেলা, হাওয়া খাওয়া এবং আনন্দ উৎসবের মতোই সহজ।

প্রেম সম্বন্ধে আলোচিত দুটি মতবাদের কোনটি ভাল কোনটি মন্দ বিচার করা যায় না : দুটিরই সম্মুখোন্মুখ আছে।

প্রাচীন মতটি জটিলতার জন্তে মন্দ এবং নতুন মত অবাধ সরলতার জন্তে মন্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রেমকে অত অবাধে প্রশ্রয় দিলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় খুব তুচ্ছ, তাই Pascal বলেন, প্রেম সম্বন্ধে অত স্বাধীন হওয়া ঠিক নয়। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি এবং সমাজ সংস্কার ধর্ম এই দুটি প্রণয়ের মূলে থাকে—ধর্ম সংস্কারকে মুছে ফেলে বাধা ঠেলে দিয়ে যে ভালবাসার জন্ম, তার ভিত্তি দৃঢ় হয় না রুশোর পদচিহ্ন অনুসরণ করে রোমান্টিক কালের লোকে ধারণা করেছিলো যে কামই প্রেমের পথ—শাসক সম্প্রদায় ও পুরোহিত হতে তকাত থাকলে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন উপভোগ করা যায়, শেলীর মনও এই কথায় সায় দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

তরুণ-মনের আকাঙ্ক্ষাই হল অনুরাগে রাঙা হওয়া—কিন্তু, অবাধ প্রশ্রয়ে প্রেম, আকাঙ্ক্ষা ও আলস্যহীন হয়ে দাঁড়ায়, স্তবরাং খুব বেশী আটক যেমন অনিষ্টকর, খুব বেশী স্বাধীনতাও তাই। আজকাল প্রেমে পড়াটা যেন তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বেশী সরলতা ভাল নয়। যৌনপ্রবৃত্তিকে প্রেমে পরিণত করবার জন্তে লরেন্স যে দমন নীতির কথা বলেন তা সমাজের দিক দিয়ে দমন নয়—জঘন্যাবেগের দমন। অজানার প্রতি উৎসুক ও কৌতুহলী না হলেও ব্যক্তিত্ব কেউ ভুলতে পারেনা স্তবরাং যে ব্যক্তিত্বের জোরে যৌনপ্রবৃত্তিকে প্রেমে পরিণত করা যাবে সেইটে পৌরানিক আকার ধারণ করবে। একটি পুরাতত্ত্বের সৃষ্টি করে আমরা তার নাম ব্যক্তিত্ব দিতে পারি। পুরাণ বা কল্পনা, কাল্পনিক বিষয়, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ভগবানের যোগ আছে—মানুষের ব্যক্তিত্বের পরে ধারণা আমাদের আছে, কিন্তু অস্ত্রীর বিষয় সুস্পষ্ট ধারণা নেই, সেই জন্তে ভগবানের বিষয় যা মন চায় তাই ভাবি। মানুষ যদি প্রেমকে মানবীয়ভাবে গ্রহণ করত তাহলে আধ্যাত্মিক প্রেম বলে কিছু থাকত না, পাপীর শাস্তি হতনা বা ধর্ম বিরুদ্ধবাদীর কদাচারের জন্তে কারাগারের ব্যবস্থা থাকত না। নতুন প্রাকৃতিকতত্ত্ব যার বর্ণনা করেছেন ব্রেক, রবার্ট বার্নস্ এবং লরেন্স, তার ফলে আন্তরিক প্রতিরোধ যৌনপ্রবৃত্তিকে প্রণয়ে পরিণত করবার অস্ত্র। Nietzschean এর পূর্ব যুগের তরুণ এই অস্ত্র বা কৌশলের প্রত্যাশা করতে পারে। এই মতের সাহায্যে প্রেমের রূপ বদলে দেয়া যায়—নতুন ও সুন্দর রীতিতে পরিণত করা যায় ; যে ভংগি সুদূর পৌত্তলিক যুগের লোকের ধারণারও অতীত ছিল।

মধুরেণ

(পূর্বস্মৃতি)

শ্রীমানসী বসু, এম্-এ

পাঁচ

সুজিত দুচার দিন পরেই সারিয়া উঠিয়া অফিস বাইতে লাগিল কিন্তু গোলমাল বাধাইলেন জগৎবাবু নিজে। ইঠাৎ তাঁহার পুরাতন অস্ত্রখটা নতুন করিয়া উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে শয়্যাগত করিয়া ফেলিল। সুজিত নিজে ডাক্তার, পিতার শরীরের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিল। ডাক্তার নাসে বাড়ী ছাইয়া ফেলিল কিন্তু জগৎবাবুর অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইল না। আশ্চর্য্য সেবা করে সুনীতি, সুজিতকে ও মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, পিতা যে কন্ঠার সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন কেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুজিত নিজে ডাক্তার কিন্তু সুনীতির গুণস্বার একাংশ ও সাধন করিতে পারে না। আজ কতদিন যাবৎ সুনীতি রাত্রি জাগরণ করিতেছে; নাসকে সে সেবা করিতে দেয়না, তাহারা সাহায্যকারিণীরূপে থাকে কিন্তু তথাপি তাহার সংসারকর্মে এতটুকু বিচ্যুতি নাই। সুজিত আশ্চর্য্য হইয়া যায়; এত ছোট মানুষটা, কেমন করিয়া এত সব করে। পিতার পাশে সুজিতকে সে রাতে বাইতে দেয়না। তাহাকে সুজিতেরই স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়। আজকাল এই সুনীতির প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা ছাড়া ও যে হাওয়া মনের মধ্যে বহিতে শুরু করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে সুজিত লজ্জিত হয়। একরাতে সুনীতিকে কিছু ক্লান্ত দেখাইতেছিল; সুজিত ডাক্তারের কর্তব্য অরণ করিয়া তাহাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম করিতে জিহ্ন করিতে লাগিল। সুনীতি পরিহাসের স্বরে কহিল “ভুলে যাচ্ছ কেন, এই জনাই ত আমার বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলে?” পরমুহূর্ত্তে সুজিতের ক্রিষ্ট মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া অন্ততাপের স্বরে মুহূর্ত্তে বলিল “আমার কোন কষ্ট ত হচ্ছে না, ব্যস্ত হচ্ছে কেন, দেখছ ত জ্যাঠামশায় ছেলেমানুষের মত আমার আঁকড়ে থাকতে চান; একটু উঠে গেলে কত ব্যস্ত হয়ে উঠেন? কথা সত্য, সুজিত নীরবে

রহিল। আর এক রাতে সুজিত পিতার ঘরে ঢুকিবার মুখে পিতার গলার আওয়াজ পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। জগৎবাবু বলিতেছিলেন, “নীতি সত্যি করে বলতো মা, জিতুর কাছে কি ভুই স্বার্থ প্রাপ্য পাম?” সুনীতির লজ্জিত মুগ্ধ স্বর শুনা গেল... “মাঃ আপনি কি যে বলেন জ্যাঠামশায়।” পিতা স্নেহ স্বরে বলিলেন “ওরে আমার বুড়ো চোখকে কি ভুই কাকি দিতে পারিস? কিন্তু আমি বলছি নীতি; একদিন জিতু তার ভুল বুঝবে। তোমার মর্যাদা ত ধুলার লুকাবার জিনিষ নয় মা।” কোন দুরাগতের ন্যায় সুনীতির ক্ষীণকণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল; “আপনি সেই আশীর্বাদ করুন জ্যাঠামশায়।” সুজিত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। পিতার স্নেহ চক্ষুকে সেত ফাঁকি দিতে পারে নাই। আজ সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, কেন পিতা সর্বদ্যময় তাহাদের দুজনকে একত্র করিবার চেষ্টা করিতেন; পিতার এই শুভ ইচ্ছাকে সে ছেলেমানুষী ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছে। সুজিত নীরবে খোলা ছাদে পাখচারী করিতে লাগিল।

প্রায় চার সপ্তাহ রোগ ভোগ করিয়া জগৎবাবু পুত্র ও পুত্র-বধূকে আশীর্বাদ করিতে করিতে মারা গেলেন। পিতৃহীন সুজিত ছেলেমানুষের মতই অধীর হইয়া উঠিল, আত্মীয়স্বজনদের গোলমালে বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল কেবল সুনীতি নিঃশব্দে সকলের আগোচরে নিজের ঘরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সুনীতিই জানে সে আজ কত অসহায় হইল; প্রায় ছয়মাস হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে; স্বামীর ভালবাসা সে পায় নাই, স্বামীকে প্রায় সে চেনেই না, একমাত্র স্বপ্নের স্বপ্নে সে নিজেকে ভুলিয়া ছিল, আজ সর্বদ্যকমে রিক্ত হইল। কিন্তু এ রিক্ততা ত কাহারও নিকট খুলিয়া বলিবার নয়।

দিন কাহারও জন্য দাঁড়াইয়া থাকে না, সুনীতিদেরও দিন কাটিতে লাগিল। সুজিতের পিনীমাতা আসিয়াছেন, সুনীতি, স্বেচ্ছায় তার হাতে সংসারের ভার তুলিয়া দিয়াছে এবং

পিসিমার আঞ্জাখীনে থাকিয়া সর্বকক্ষে সহায়তা করিতেছে; এতটুকু বিরক্তি বা কর্তৃত্বের দাবী করে নাই। বধূর ব্যবহারে পিসিমা অতিশয় প্রীত হইলেন। সকল সময়ে সর্বকক্ষে ব্যাপৃত থাকিয়াও যে সুনীতি ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে— তাহা সজ্জিত ছাড়া কেহ বুঝিতে পারে না। তাহার অবস্থা স্মরণ করিয়া সজ্জিত মাঝে মাঝে উদাস হইয়া যায় কিন্তু প্রতিকার কিছু স্থা জিয়া পায় না; সে চাহিয়া দেখে সুনীতি আরো রোগী হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ওষ্ঠা-পর্শপর্শের স্বেদ কঠিন ভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু নিজের কর্তব্য কৰ্ম হইতে তাহার এতটুকু বিচ্যুতি নাই। রাঁত্রে সজ্জিতের ক্লমলশয্যা পাতিয়া দিয়া সহজ ভাবেই সে আর কিছু প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করে। সজ্জিতের ইচ্ছা করে তাহাকে নিকটে বসাইয়া তাহার রক্ষা চুলগুলির উপর ধীরে ধীরে হাত কুলাইয়া দিতে, তাহার শীর্ণ গণ্ডে একটি চুখন আঁকিয়া দিতে কিন্তু সহজে সে কিছুই পারেনা— নীরবে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের কথা জানায়। জগৎবাবু মারা যাওয়ার পর হইতে তাহাদের মধ্যকার বাধা আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রদ্ধার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সুনীতির বাবা দার্জিলিং হইতে আসিলেন এবং সঙ্গে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা স্মিত্রা আসিয়াছিল। সজ্জিত সসন্মানে তাঁহাকে বসাইয়া শ্যালিকাকে লইয়া অন্তরে পৌছাইয়া দিতে গেল; তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, এই স্ত্রে যদি সুনীতির সহিত কথা বলিয়া তাহার বিষমমুখে হাসি ফুটাইতে পারে। স্মিত্রাকে পিসিমার নিকট পৌছাইয়া দিয়া সজ্জিত নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল কিন্তু সেখানে সুনীতিকে দেখিতে পাইল না কিন্তু টেবিলের উপর অনেক গুলি পত্র দেখিয়া স্মিত্রা হস্তে সেগুলি খুলিয়া দেখিতে লাগিল। পত্র পড়িতে পড়িতে সজ্জিত একটু অন্তমনস্ক হইয়া গিয়াছিল কিন্তু ঘরের পাশেই কাহাদের অচ্যুতঘরে আলোচনা কাণে আসায় তাহার চমক ভাঙ্গিল এবং স্বপ্নকাল মনোযোগ দিয়া সে বাহা শুনিয়া তাহাতে তাহার কণ্ঠস্বর আরক্ত হইয়া উঠিল। আলোচনাটা হইতেছে তুলনামূলক; সুনীতি ও স্মিত্রাকে লইয়া এবং আলোচ্য বিষয় হইতেছে রূপ বাহা স্মিত্রার অজস্র পরিমাণে আছে এবং সুনীতির নাই। আলোচনা সুনীতির সম্মুখে হইতেছে না

তাহা সজ্জিত জানে কিন্তু কাছাকাছি যদি সুনীতি কোথাও থাকে এবং আলোচ্য অংশ তাহার কাণে যায়— সজ্জিত মনঃক্ষেপে দেখিতে পাইল তাহার ওষ্ঠাধরে বিজ্রপের কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই পিসিমার বিরক্তিপূর্ণ গভীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, “ছিঃ ছিঃ, এ তোমরা কি করছ? ঘরের লক্ষী, কতী, তার রূপের আলোচনা কেন বাছা?” মুহূর্তে সকলেই চুপ হইয়া গেল, কেবল কোন মুখেরা কহিল, আলোচনা নয়, মেজ বোনটি খুব সুন্দর তাই বলছিলাম; তা বিয়ের সময় তুমিও ত বৌদিকে দেখে কত রাগ করেছিলে পিসিমা? এসব ঘরে পিসিমা বলিলেন দাদার কাছে এই নিয়ে রাগ করেছিলাম সত্যি, “বললাম দাদা এ তুমি কি করলে; আমাদের বাপের বংশে যে কেউ জামাই পর্যন্ত কালো করেনি, আর জিতুর কেনের কি অভাব ছিল? কত রূপসী যে তার পায়ের নীচে গড়াগড়ি খাচ্ছিল?” “দাদা বললেন, দিদি, ওপরের চামড়া দেখে যেই ভুল করুক তুমি কোরোনা, শুধু এই চামড়াটাই কি সব?” আমি রাগ করে বললাম, কেন আমার মা, বৌদি এদের কি চামড়াই সার ছিল? দাদা হেসে বললেন, ওরে, তাঁরা ছিলেন হীরে আর এ যে মাথার নীলকান্ত মণি। পিসিমা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন “আজ দাদা নেই; আমার বলবারও সময় হলো না যে দাদা সত্যি নীলকান্ত মণি তুমি এনেছ। জিতুর ভাগ্য ভাল।” পিসিমার কথায় সজ্জিত যেন আজ নূতন জিনিষ দেখিতে পাইল। স্নেহময় পিতার কথা স্মরণ করিয়া তাহার চক্ষু ও সজ্জল হইয়া উঠিল।

রাঁত্রে খাইতে বসিয়া সুনীতির বাবা কথাটা তুলিলেন “জিতু, সুনীতির শরীর বড় খারাপ হয়েছে আর ও আঘাত বড় পেয়েছে তোমার বাবা মারা গিয়ে, তোমার যদি অমত না হয় তবে ওকে দিন কতক দার্জিলিং এ নিয়ে যাই, এ সময়টাও ভাল। সজ্জিত মনে মনে চমকিয়া উঠিল, সুনীতির সহিত তাহার অন্তরের সংঘর্ষ স্থাপিত না হইলেও তাহার জীবনের সহিত সে যে ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া গেছে। সুনীতি কাছে নাই—এ কথা ভাবিতেও যে ব্যথা লাগে কিন্তু কি উত্তর সে দিবে? যদি না বলে তাহা হইলে কি অগ্নয় হইবে না? কোন অধিকারে

সে হুকুম করে? যদি হ্যাঁ বলে তাহা হইলে সুনীতি হয়ত ক্ষুব্ধ হইবে, হয়ত কিছু মনে করিবে কিন্তু তাহার কিছু বলিবার পূর্বেই সুমিত্রা বলিয়া উঠিল, আমি দিদিকে যাবার কথা বলেছিলাম বাবা, কিন্তু দিদি বললে, এ সময় জামাই বাবুকে একা ফেলে যেতে পারবে না। এখন ওঁর মন খারাপ; এই জ্যাঠামশায় মারা গেছেন। সুনীতির প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বজিতের মন ভরিয়া উঠিল। সমস্ত মুষ্টিলের আসান একা সুনীতি করিয়া আসিতেছে স্বজিত খশুরকে আশ্বাস দিল, সামনের ছুটাটার ওকে নিয়ে আমি দিন কতকের জন্ত যুরে আসব; অনেক দিন এক ভায়গায় আছে, ওর শরীরটা ভাল নেই। সুনীতির বাবা স্মিত-হাস্যে বলিলেন, সেই ভাল। আমার মা কিনা তাই বুড়ো ছেলের ভুল শুধরে দিয়েছে। পিতার কাণ বাঁচাইয়া সুমিত্রা কহিল 'আচ্ছা জিতু বাবু দিদি আপনাকে ভয় করে কেন অত, আপনি বুঝি খুব বকেন?' স্বজিত বিস্মিত হইয়া বলিল 'সে কি? কিন্তু পরক্ষণে সুমিত্রার দিকে চাহিয়া দেখিল কোতুক ভরে সুমিত্রা কাটিয়া পড়িতেছে, স্মিতহাস্যে কহিল 'আমি বকিনা, তোমার দিদি আমার বকেন।' সুমিত্রা হাসিয়া বলিল 'বারে, তবে যে দিদি কেবলি সব কথায় কথায় বলে, উনি ভালবাসেন না, উনি পছন্দ করেন না, উনি বিরক্ত হ'ন। 'উনি'র ভয়ে দিদি আমাদের ভুলেই গেছে দেখছি।' স্বজিত মুহূর্ত্ত হাস্যে কহিল, তোমার উনি এলে তুমিও ঐ রকম করবে। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শীঘ্রই উচিত ব্যবস্থা করে প্রমাণ করে দিব।

সুমিত্রার সম্মুখে সুনীতি এত স্বচ্ছন্দভাবে স্বজিতের সহিত গল্প করিল যে তাহা কেবলমাত্র লোকদেখানো কিনা তাহা স্বজিত বুঝিতে পারিল না। সুনীতির অসঙ্কোচ কথাবার্তায় স্বজিতের আড়ষ্টতাব অনেক কাটিয়া গেল, সেও কথাবার্তায় যোগ দিল। সুনীতি সুমিত্রাকে রহস্য করিয়া রাগাইল—স্বজিতের কথার উপর টিপ্পনী করিয়া তাহাকে হাসাইতেও ছাড়িল না। সুনীতির এ দিকটাই স্বজিতের নিকট নতন, তাহার মুগ্ধমন অকারণ পুলকে পূর্ণিত হইতেছিল। বিকালের ট্রেণে সুমিত্রাদের উঠাইয়া দিয়া স্বজিত বেশ খুসী মনে ফিরিয়া আসিল; তাহার মনে হইতে ছিল, আজ সে সুনীতির সহিত বেশ অসঙ্কোচে কথা বলিতে পারিবে। আজ সে

স্বীকার করিতে পারিবে, রীটার মূর্ত্তি-বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সুনীতিকে আজ নিজের করিয়া পাইবার ক্ষমতা তাহার সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হইয়া আছে। সুনীতির ক্ষমা সে নিশ্চয় পাইবে।

স্বজিত তন্ময় হইয়াই ভাবিতেছিল কিন্তু খুট করিয়া একটু শব্দ হইতে সেদিকে চাহিয়া দেখিল, সুনীতি নিশাঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং এখন নিজের কক্ষে ঢুকিয়া ভারী পর্দা টানিয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তে স্বজিতের তাসের অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। শয্যার উপর বিনীত থাকিয়া সে ভাবিতে লাগিল, একনিষ্ঠ প্রেমিক রীটাকে ভুলিয়া সে যে সুনীতির নিকট ভিক্ষা পাত্র ধরিতে যাইতেছিল তাহার উপযুক্ত হইয়াছে। রীটাই তাহার চির প্রেমসী হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বজিত হাজার চেষ্টা করিয়াও সুনীতির সুকুমার মূর্ত্তি মনে হইতে বিদায় করিতে পারিল না। আবার পূর্বের জ্ঞান দিন কাটিতে লাগিল। সুনীতি নিপুণ ভাবে সেবা করে, নিজের মনের কাছেও স্বজিত তাহা অস্বীকার করিতে পারে না কিন্তু সেবা সে চায় না সে চায় সেবা-কারিনীকে। যদিও সুনীতি স্বজিতের ভোজনের সময় ঠিক করিয়া উপস্থিত থাকে। স্বজিতের বন্ধুবান্ধব আসিলে সুনীতি আতিথ্যের কিছুমাত্র ত্রুটি করেনা। স্বজিতের ইচ্ছা বুঝিয়া নিজেই আসিয়া স্বজিতের আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবের রাব্রে বা চায়ে নিমন্ত্রণের কথা স্বজিতের নিকট উত্থাপন করে এবং একাই সমস্ত ব্যবস্থা করে। আয়োজন-অভ্যর্থনাও সে যেমন নিপুণ ভাবে করে, সেই রকম নিপুণ ভাবে করে আন্তরিকতার অভিনয়। হ্যাঁ, স্বজিত তাহাকে অভিনয়ই বলিবে কারণ তাহা কৃত্রিম, সুনীতি তাহারা চলিয়া যাইলেই সাজ অর্থাৎ খোলস খুলিয়া ফেলিয়া পূর্বের স্থানে ফিরিয়া যায় তথাচ সব সময় স্বজিতের মনে বেদনা খচখচ করিতে থাকে; তাহার কেবলি মনে হয়, লাভ তাহার কিছুই নাই, লোকসান বড় বেশী রকম হইতেছে।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। অচ্ছ আকাশ, বসন্তের বাতাস, কোকিলের অবিশ্রান্ত কুহুতান স্বজিতের মনে রংএর পরশ বলাইয়া তাহাকে উদাস করিয়া দিতেছিল। সামনের খোলা ছাতে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় সে শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে পায়চারী করিতে লাগিল। চারিদিকে নিস্তব্ধ, নিশাঙ্গে চাহিয়া

ধাকিয়া সজ্জিতের চিরন্তনী বন্ধনের কথা মনে হইল। সজ্জিত ভাবিতে লাগিল, এ পৃথিবীতে একা কেউ নয়, ঈশ্বরের আইন অনুসারে সকলেই প্রেমিকার সহিত বন্ধনে পড়িয়াছে, ঐ ত জ্যোৎস্নাধারায় স্নাত হইয়া ধরিত্রী আবেশে বিহ্বল, ঐ ত অসংখ্য গৃহে সকলেই নিজের প্রেমসীর সাথে মিলিত হইয়াছে শুধু সজ্জিতই I such a night একা দাঁড়াইয়া আছে। মোহিনীর রাত্রি তাহার মনে আগুণ ধরাইয়া দিতেছিল; সজ্জিত আপন মনে বলিয়া উঠিল "why not I with thine?" কতক্ষণ সে আপন ভোলা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল জানে না, তাহার ঘড়ীতে চং চং করিয়া তিনটা বাজিয়া উঠিল, সজ্জিতের চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে নিশ্চিন্দে ঘরে আসিয়া বসিল। স্নানীতির ঘরে তখনও আলো জলিতেছে, সজ্জিত একটু বিস্মিত হইল কারণ ছাতে বাইবার সময় ঘর অন্ধকার ছিল। সজ্জিত কোতুলকী হইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল একবার একটু ইতস্ততঃ করিল কিন্তু পর মুহূর্তে পদা তেলিয়া ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল। স্নানীতি টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, টেবিলের উপর পুস্তক কাগজ ইত্যাদি ছড়ান রহিয়াছে। স্নানীতি তবে সজ্জিত ঘুমাইলে রাগে পড়াশুনা করে; সজ্জিত ঘুমাইল মনে করিয়া পড়াশুনা করিতে বসিয়াছিল কিন্তু ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সজ্জিত মন হইতে দ্বিধা বাড়িয়া কেলিয়া টেবিলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, মাথার উপর ফ্যান চলিতেছে; টেবিল ল্যাম্প সম্মুখে রাখিয়া স্নানীতি কি লিখেতেছিল, অর্ধসমাপ্ত ফুলফাস কাগজ সম্মুখে রহিয়াছে, স্নানীতির হাতে কাউন্টেন পেন পর্যন্ত ধরা রহিয়াছে। পেপারওয়ার্ডের কক্ষচ্যুত হইয়া একখানা কাগজ পড়িয়া গেল সজ্জিত হেঁট হইয়া কাগজ খানা যথাস্থানে রাখিতে গিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। কাগজ খানা কোন বড় জার্নালের সম্পাদকের চিঠি; সজ্জিত পত্র খানা পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। স্নানীতিকে সন্নিবন্ধ অনুরোধ করা হইয়াছে, স্নানীতি যেন তাহার লেখা পাঠাইতে আর দেরী না করে এবং লেখা পাইলেই তাহারা চেক পাঠাইয়া দিবে, অবশ্য স্নানীতির নামটা বঙ্গলক্ষী রাখিয়া স্নানীতি পত্র আদান প্রদান করে। সজ্জিত একমুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিল। সজ্জিতের অজ্ঞাতসারে স্নানীতি সারারাত্রি পরিশ্রম করিয়া আর্টিকেল লিখিয়া অর্থোপার্জন করে। কিন্তু কেন? সজ্জিতের ত টাকার অভাব নাই, লণ্ডনবাসিনী প্রিয়ার জন্ত সে যে প্রত্যেক মাসে বড় অঙ্কের চেক পাঠায়। একটা কথা সজ্জিতের মনে

হইয়া গেল; পিতার মৃত্যুর পর হইতে একটা খাতা সে এতাবৎ টেবিলে প্রায় দেখিতে পায়, স্নানীতি হয়ত তাড়াতাড়িতে রাখিয়া গিয়াছে ভাবিয়া সে তখন দেখেই; দিন কয়েক আগে অগ্রমানে সে খাতাখানা খুলিয়া দেখিয়াছিল সেখানা স্নানীতির সংসারের জমা ও খরচ লিখিবার খাতা। জমার ঘরে সজ্জিত প্রত্যেক মাসে যে চেক কাটিয়া দেয় তাহাতে সারামাসের খরজ ছাড়াও অনেক উদ্ভব থাকে তদ্রূপ জমার ঘরে প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ টাকা বেশী লেখা থাকে; সজ্জিত ভাবিয়াছিল, ঐ টাকার কথা স্নানীতিকে জিজ্ঞাসা করিবে কিন্তু স্নানীতি যদি কিছু ভাবে, যদি সজ্জিত হিসাব চাইতেছে তবে ইত্যাদি ভাবিয়া সজ্জিত কিছু প্রশ্ন করে নাই; আজ তাহার অর্থ বুঝিল স্নানীতি Paying guest হিসাবে থাকিতে চায়। সত্যই সজ্জিত ত তাহাকে পত্নীর মর্যাদা দেয় নাই, তাহার অর্থ স্নানীতি গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া। পিতারসময়ে সে গৃহলক্ষী ছিল। আজ সজ্জিত প্রথম পরিপূর্ণ বিছাতালোকে তাহার অনাদৃত পত্নীর প্রতি চাহিয়া রহিল। স্নানীতির মুখ স্নান হইয়া গেছে, টানা টানা চোখের কোনে এখনও অশ্রুর চিহ্ন সুস্পষ্ট। স্নানীতি কাদিতেছিল। অল্পশোচনায় সজ্জিতের মন ভরিয়া উঠিল; কেন সে সব দিক বিবেচনা না করিয়া স্নানীতিকে বিবাহ করিয়াছিল। আজ তাহার মনে হইল, স্নানীতির মুখখানা সত্যই সুন্দর। রীটা নয়, তাহার কথা মনে করিতে ইচ্ছা হয় না। সজ্জিত কতক্ষণ আত্ম-সমাহিত হইয়াছিল জানে না, স্নানীতি একটু নড়িয়া উঠিতেই তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। হৃদয় স্নানীতি তাহাকে ভুল বুঝিবে এরূপ ভাবে দেখিলে, সজ্জিত নিশ্চিন্দে স্নানীতির মাথার নীচে একটা বালিশ শুষ্কিয়া দিল ও আলোর সুইচ বন্ধ করিয়া দিয়া ভারী জ্বদে বাহির হইয়াগেল।

প্রভাতে তাহার ঘুম ভাঙিতে একটু দেরী হইয়া গেল। পোষাক পরিয়া যখন সে টেবিলের সামনে আসিল, তাহার অনেক আগেই স্নানীতি চায়ের তোড় জোড় লইয়া বসিয়া আছে। আজ তাহার মুখ কিছু বিষণ্ণ ও মন বিরক্ত, মাথায় বালিশ ও আলো বন্ধ দেখিয়া তাহার বুঝিতে বাকী ছিলনা যে সমস্ত ব্যাপারটাই সজ্জিতের বোধগম্য হইয়াছে; এইবার তাহাকে একটা জবাবদিহীর সম্মুখে পড়িতে হইবে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে স্নানীতি ক্রমশঃ তাহার সহশক্তি হারায়া ফেলিয়াছে, আজ তাহা সে বুঝিতেছিল, তত্পরি তাহার শরীর ও বিশেষ অস্থূল বোধ হইতেছিল।

ক্রমশঃ

বাংলা সাহিত্যে নারীর দান

(পূর্বস্মৃতি)

শ্রীমমতা রায়

কিন্তু

হৃপাশে কেবল অচেনা-খুমের
ঠেলা ঠেলি এয়ে কত ভিড়
এ যেন রাতের অন্ধ তামাসা
সুনিবিড়।
পথিকে পথিকে কেহ না শুধায়
নিজমনে শুধু পথে চলে যায়
হুঁচকারিটা প্রাণ তার মাঝে যেন
ঋতুরকার ঋতু নীড়
হৃপাশে কেবল অচেনা মুখের
ঠেলাঠেলি এয়ে কত ভিড়।
রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ নহে অথচ তাহারই স্বর সুনয়ন
ভাবে ধ্বনিত হইয়াছে...
শুধু কি চলেছে নিজে? নানা ভাতো নয়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এয়ে নৃত্য ছন্দময়
চলিয়াছে তালে তালে
গগনের নীল ভালে
চলিয়াছে রবি শশী গ্রহ তারা
তোমার চলার বেগে হয়ে আত্মহারা—
তোমারে দিয়েছে ব্যথা
শুনি নাই-প্রাণ ঢালা তব মন্তব্যকথা,
তোমার করেছি অপমান
চেলায় ফিরারে দেখি তোমার আহ্বান
ঐ যেথা বিশ্বপ্রেম বীণা তারে
সর্বকাল সর্বলোক সর্বজাতি বিচিত্র বাক্যারে
মহান্ ওঙ্কারে
বাজায় একটা স্বর
নেই যেথা ঘেঘাঘেঘ ভেদাভেদ নাই কোন দূর
শুধু এক প্রেম মন্ত্রধ্বনি

অনন্ত অনন্তকাল উঠিছে রণনি,

সেই ধ্বনি শুনাইলে সবে
বলিলে যে বিশ্বপ্রাণ ব্যাকুলতা অভিসারে চলে
থুজে পাবে প্রাণের সন্ধান?
হে দিশারী তাই বুঝি নিজের তুমি হলে আগুয়ান।
[অনলব্রত]
তাহার বিভিন্ন ছন্দ আমাদিগকে সত্যোক্তনাথের কথা মনে
করাইয়া দেয়—

সিন্দুর হিল্লোলে
চঞ্চল-কম্পিত-শঙ্কিত মন দোলে
সিন্দুর হিল্লোলে।
উচ্ছল বিক্ষেপ বিহবল ভ্রান্ত
শিব প্রলঙ্কর সূন্দর শাস্ত
সদ্যত বঙ্কত
উত্তাল উদ্দাম উন্মাদ কল্লোলে
সিন্দুর হিল্লোলে।
এই সকলের মধ্যে অপরাজিতা দেবী ভাব ও প্রকাশ-
নৈপুণ্যে যে কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অভিনব ও
উপভোগ্য।
‘ভাইফোঁটায়—’

‘‘ভায়েদের আজ পরমারটা বোনেই রেঁধে দেয়,—নয়?
কাঁচা ছুধ আর গাওয়া ঘি মিশিয়ে গগুণ দিতে হয়।
পায়স তা হদে রাঁধবই আমি, ওটা তো নিয়মই আছে।
আরো আন্ধার আছে মা আমার আঁরকে তোমার কাছে।
রাধারানীর ‘ররণার গান’ নৃত্যছন্দের স্বরণ করাইয়া দেয়—
উপল, ওগো উপল, তোমার শিকল-ডোরে
মিছাই সখা বাঁধতে প্রয়াস করছে মোরে।
অচল হ’তে জন্মি’ চলি অগাধ পানে,
সুনীল আকাশ-নীল সাগরের স্বপন দেখে জাগায়ে প্রাণে।

তুলিয়াছেন। ইহাই বঙ্গসাহিত্যে তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।
দ্বিতীয়তঃ নারীর সমস্যা পুরুষের হস্তে সুসঙ্গত রূপে ফুটিয়া
উঠা দুঃসাহ্য। নারীর সহজ মনের ছন্দ পুরুষকে সবল
ভাবে ধরিতে হইলে তাহার সংস্কার ও করুণা শক্তিই
অনেকাংশে পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং আমাদের
সমাজে স্ত্রীলোকের সহিত মিশিবার সেরূপ বিস্তৃত ক্ষেত্র
না থাকায় নানা প্রকার অসুবিধার মধ্যে আগাইতে হয়।
এই কারণেই বঙ্গিমবাবুর নারী চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই
নারীজনোচিত হয় না। এই এবং শরৎবাবু এমত চরিত্র
আঁকিয়াছেন যাহা অতি সহজ পরিচয়ে রমণীয়। নারী
নিজের সমস্যার সম্মুখীন হইয়া সাহিত্যে যে রূপ দিয়াছেন
এবং নিজেদের মনোভাব ও মতামত যেরূপে ব্যক্ত করিয়া
ছেন তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের একটা বিরট অভাব ও
সমস্যার সমাধানে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। স্বাভাবিক
শিল্প প্রবণতা ও সৌন্দর্য্য উপভোগে আনন্দ প্রকাশের
প্রচেষ্টাই কাব্যের মূল উৎস। সেই জন্যই মানুষ যাহা
জীবন প্রভাতে সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ভাষা কবিতা।
বাঙ্গালী প্রকৃতির স্বভাব সৌন্দর্য্যে তাহার উত্তরাধিকারী
হইয়া সেই ক্ষেত্রে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে।
জীবনের জটিলতম সমস্যা-সঙ্কল প্রেমের মীমাংসার ভাষা

রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যকে গল্প উপন্যাস ও নাটকে স্ফুট করিয়াছেন নারী জাতির অবদান তাহাতে পরিপূরক হিسابে কার্য্যকরী হইয়াছে। সাহিত্য স্ত্রী পুরুষ নিরপেক্ষ হইয়া রসস্থষ্টি করে। কাজেই নর বা নারীর হস্তে যে সাহিত্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করিবে তাহা নহে। তবুও স্ত্রীলোকের রচিত সাহিত্যে একটা বিশেষ সুর অনুরণিত হইয়া থাকে, পুরুষের সৃষ্ট সাহিত্যে যাহার একান্ত অভাব অনুভূত হয়। পুরুষ কোন বিশেষ দৃষ্টি-কোন ইহিতে সমাজ ও সমস্যাকে দেখিয়া থাকে; স্ত্রীর তাহার পক্ষে জগৎ যে প্রকার প্রতিভাত হয় তাহার মধ্যে অনেকখানি অজানা কল্পনা জড়িত থাকিবেই; পক্ষান্তরে রমণী কোন দৃষ্টিতে তাহা দেখিয়া থাকে তাহার সম্যক প্রতিচ্ছবি তাহাতে থাকিতে পারে না। যে দিকটা পুরুষের হাতে কোন দিন রূপায়িত হইত না—নারীর সাহিত্যের আসরে সেই দিকটা বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া

গদ্য। কারণ তাহার কার্য প্রয়োজনের চাহিদা মিটান।
এ ক্ষেত্রেও তাহার স্থান বিশেষ উচ্চ। এ ক্ষেত্রেও
পুরুষের পাশাপাশি নারীজাতি সমান ভাবে কৃতিত্ব
দেখাইয়াছেন।

এ কথা নিঃসন্দেহে - সত্য যে ইংরাজের আমলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নানাভাবে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাংলা কাব্য ও গীতিকাব্য জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমকক্ষ বলিয়া গর্ব বোধ করিতে পারিলেও আধুনিক সাহিত্যের গতি ঈশ্বর শৃংখের সময় হইতে বিহারীলালের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথে - ক্রমবিকাশের পথে বিভিন্নমুখী হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তাহার পরিসর আরো বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। মানব জীবনের জটিলতম সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নশ্রেণীর ও বিভিন্ন স্তরের জনগণ কিছুই বাদ রাখ নাই। এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বঙ্গভাষা বাহার সংস্পর্শে

সর্বোচ্চ স্বন্দর রূপ লইয়া সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “শকুন্তলা” ও “সীতার বনবাস” বা টেকচাঁদ ঠাকুরের “আলালের ঘরের দুলাল” কোনটাই সাহিত্য রসে পরিপুষ্ট না হইলেও ভাষাতে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাই দেখা গিয়াছিল। এই প্রকার প্রচ্ছদপটের উপর বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রকে “সহসা একটা জোয়ার একটা বিশাল চেউ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে! আমাদের যাহা ছিল এবং আমরা যাহা পাইলাম তাহার পার্থক্য এত অধিক যে আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি না। কিন্তু বঙ্কিমও পারিপূর্ণ হইতে পারেন নাই; তাঁহার মধ্যেও অনেক সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছিল। প্রকৃত বাঙ্গালীর চরিত্র হই একটা গ্রন্থ ছাড়া পাওয়া যায় নাই। মানবের সুখ দুঃখের চিত্র হইতে তাহার চরিত্রে দেবোচিত পুরুষকারের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। যে বঙ্গ সাহিত্য দেব দেবীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল তাহা দেবোচিত পুরুষকারের জয়গানে পঙ্কমুখ হইয়া দুর্জয় মুহূর্তের কনিক পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিল। মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিবার প্রচেষ্টা তাহার অনেক পরে হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সামাজিক রীতি নীতি, প্রচলিত প্রথা, মতবাদ ও ধর্ম সংস্কারকে যথাযথ বজায় রাখিয়া তাহারই মানদণ্ডে মানুষকে বিচার করিয়া শাস্তির বিধান করা হইতেছিল সুতরাং ইহার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পণ্ডিত মনো-বৃত্তি ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। সাহিত্যের মানদণ্ড কি হইবে ও তাহার উদ্দেশ্য কিছু আছে কিনা তাহা লইয়া পণ্ডিত-সমাজে অদ্যাপি বিস্তর মতভেদ থাকিলেও সাহিত্য যে নিঃসন্দেহে রসস্থিতি করিয়া আনন্দ দান করিয়া থাকে এবং মানবের সুখ দুঃখ লইয়া কারবার করিলেও সুখ দুঃখের ভাবে প্রপীড়িত না হইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়, সে বিষয়ে সকলেই একমত। এই প্রকার প্রচ্ছদপটে প্রতিফলিত বঙ্গ সাহিত্যে নারীর আসন যেখানে শূন্য হইবার আশঙ্কায় বিচলিত সেখানে অধিক পরিমাণে তৎবিপরীত অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। বিশেষ করিয়া উপন্যাস সাহিত্যে তাহারা যে স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু

ইংরাজী বা ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় তাহা সমুদ্রের নিকট গোম্পদের তুল্য হইলেও সবিশেষ আশা প্রদ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া নারীদেরও মানসিক পরিধি ও দৃষ্টিশক্তি অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। নতুন ভাব ও নতুন দৃষ্টি লইয়া তাহারা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিশেষ কোন সময়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কে ছাড়াইয়া উঠা কুঃসাধ্য হইলেও সাহিত্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা শক্ত ব্যাপার নহে। বঙ্কিমের যুগে জন্মিয়া বঙ্কিমকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন মনিষা না হইলে রবীন্দ্রনাথের যুগে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াইয়া উঠা এক প্রকার অসম্ভব এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আসিয়া কেহ জোর করিয়া সে দাবী করিতে পারে না। রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে কবির সন্দর্শন লাভ ঘটিবে তাহার সূচনা যে না দেখা গিয়াছে তাহা নহে; কিন্তু তাহাকে নিঃসন্দেহে খাঁটি জিনিষ বলিয়া চিনিয়া উঠা কুঃসাধ্য।

এই ক্ষেত্রে নিরুপমা ও অমূল্য দেবী, অগ্রণী। তাঁহাদের পূর্বে যে সকল মহিলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীই সর্বোত্তম আমাদের স্মৃতি পথে আসেন। স্বর্ণকুমারী সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় প্রকার উপন্যাস লিখিয়া যশঃ অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে “দীপনির্বাণ,” “ফুলের মালা,” “মিশর রাজ” ও “বিজ্রোহ” প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ কথিত হইয়াছে যে তাঁহার এই উপন্যাসগুলি বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের আওতায় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে; কচিং শ্রেষ্ঠতা গুণে অতিক্রম করিয়াছে, নয় অধীনে থাকিয়া ক্রমে পুষ্ট হইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে—তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাসের ভাষা মনুষ্যত্বের সারবস্তু ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের দিক দিয়া এবং সময় সময় রমেশচন্দ্রের অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ “ফুলের মালা” উপন্যাসে ঐতিহাসিকতার দাবী ও মর্যাদা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে; এ কথা হয়তো ঠিক যে নারীর প্রতিভা নতুন দিকে পরিচালিত হয় না, কিন্তু তাহা হইতেও

অধিক সত্য এই যে, তাহা যেরূপে পরিচালিত করা হইয়াছে সেই দিকেই নূতন আলোক পাত করিয়াছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের মধ্যেও ঐতিহাসিক উপন্যাস চূড়ান্ত ভাবে উৎকর্ষ লাভ করে নাই, তদপ্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়াও বিশেষ কেহ স্ববিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই এই দিকে হাত পাঁকাইবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন : এবং তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে স্বর্ণকুমারী নিঃসন্দেহে যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাষা, বর্ণনাবৈচিত্র্য, মনুষ্যত্বের সারবত্তা ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার রচনার অধিকাংশে রমেশচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকগণের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্থান কোন দিক দিয়া নিম্ন হইবেনা বরং নানাদিক দিয়া উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। জাতীয় জীবনের উঠা পড়া ও নৈরাত্তের হিসাব নিকাশ করিয়া তিনি সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই গুলির মধ্যে ছিন্নমুকুল, হুগলীর ইমামবাড়ী, হেমলতা ও “কাহাকে” বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে আবহাওয়ার মধ্যে ঐ গুলি রচিত হইয়াছিল তাহা ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের যুগ। ধর্ম ও সমাজ লইয়া পথে ঘাটে ও বসিবার ঘরে যে তর্কের ঝড় উঠিত তাহা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করিয়া সে যুগে বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক বঙ্কিম ব্যতীত কেহ এই জাল-ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। স্বর্ণকুমারী দেবীর মধ্যে সেই দোষ বর্তমান। তাহার এই সকল লেখাগুলিতে অধিকাংশই তর্কগুলির মধ্যে খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তিনি সমস্ত দোষ কাটিয়া উঠিয়াছেন “কাহাকে” উপন্যাসে। এখানে তর্কের ধূলি মছর; বাদ-বিসম্বাদের বৃথা কোলাহল নাই, একটি শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে সমস্ত কার্য সম্পূর্ণভাবে চলিয়াছে। সমগ্র মহিলা উপন্যাসিকের ভিতর বঙ্গসাহিত্যে যদি বৈশিষ্ট্যের জন্ত গোরব করিবার কিছু থাকে তাহা হইলে নিঃসন্দেহে তাহা “কাহাকে” লেখিকার পাইবার যোগ্য। এই পুস্তকটির সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য: “স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক ও অত্যাশ্চর্য সামাজিক উপন্যাসে

চিরস্থায়িত্বের কোন লক্ষণ নাই; কিন্তু “কাহাকে” তাহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান ও অত্যাশ্চর্য মহিলা উপন্যাসিক হইতে তাহার প্রতিভার স্বাক্ষরের পরিচায়ক।” ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার মধ্য দিয়া নারী হৃদয়ের আসল রূপটি ধরা পড়িয়াছে। বঙ্কিমবাবুর “ইন্দিরা” বা “রজনী” ও রবীন্দ্রনাথের বহুগ্রন্থের মধ্যে নারী হৃদয় উদ্ঘাটিত হইলেও তাহাতে যেটুকু কৃত্রিমতা ছিল তাহার অভাবই এই পুস্তকটিকে বাংলা সাহিত্যে উচ্চস্থান লাভের অধিকারী করিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে কামিনী রায় ও স্বর্ণকুমারীর আবির্ভাবে যে অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল তাহা পরে নানাদিক দিয়া পুষ্পসম্ভার-সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার ও আগামীকালের যে সমস্যা জীবনকে জটিলতম গম্বীরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাকে বাদ দিয়া সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। সাহিত্যের মধ্যে “সনাতনত্বের” বা শাস্ত্রতীর বিজয় বার্তা ঘোষিত থাকিলেও তাহা যুগধর্মকে অগ্রাহ করিয়া রচিত হইতে পারে না। সেই জন্যই আমরা একদিকে যেমন নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবীর মধ্যে রক্ষণশীলতা পাই তেমনি অপর দিকে আধুনিক জীবনের বাস্তব চিত্র—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, অপরাজিতা, ইন্দিরা দেবী, আশলতা সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী, হেমলতা দেবী, মমতা দেবী (ঘোষ) সীতা ও শান্তা দেবীর লেখায় পাইয়াছি। এই সকল লেখায় দুইটা ভিন্নমুখী ভাবাদর্শ সম্মিলিত হইয়াছে।

আত্মবিকাশের পথে আত্মোপলব্ধির মানদণ্ডে সাম্যের ভিত্তিতে, নূতনভাবে গড়িবার প্রচেষ্টায়, কার্যময় স্বার্থরক্ষার বিরুদ্ধেও প্রচলিত সংস্কার-সুদৃঢ় সামাজিক ব্যবস্থাগুলির মূল্যই অনেক পরিরূপিত হইয়া গিয়াছে। সংস্কার ও আন্দোলনের যৌর্য্য-আবর্তে অনেক সময়ে মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। সংস্কারকামিগণ তীব্র ভাষায় যখন হিন্দুসমাজের সকল আদর্শই বিক্ষত করিতেছিল, যখন সত্যনিষ্ঠায় আচারে ও সংযমের মধ্যে অসারতা দেখাইতেছিল তখন অনুরূপা দেবীর লেখার মধ্যে যে সুর বাজিয়া উঠে তাহা এই সকলের অহুষ্ঠানের প্রকৃত অর্থ ও অপরদিকে, তাহার যথাসাধ্য পরিচয় দিয়াছিল এবং তাহারই কলে সমাজের এইদিকে নূতন নূতন আলোকপাত হইয়াছিল। হিন্দু ধর্মপ্রাণ জাতি; তাহার ধর্ম ও আচারনিষ্ঠা যে বাহিরের ছদ্মবেশ মাত্র নয়; তাহার মূল উৎস যে জীবনের অভিজ্ঞতার উপর এবং সেই মূলের উপর ভিত্তি না করিলে মঙ্গল যে কোনদিন আসিতে পারে না—তাহারই উপলব্ধি তাহার প্রত্যেক পুস্তকের বক্তব্য বিষয়। হিন্দু ধর্মের নামে ভণ্ডামি হইয়াছে; মালচন্দন

ও মন্ত্রের চাপে যে জীবনকে অসঙ্গত অর্থহীন বলিয়া মনে হয়, তাহার অন্তরালে যে গভীর অর্থ, তাহাকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই ইহার মূলমন্ত্র। ধর্মকে যখন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করা যায় তখনই হয় তাহার ভগ্নামি; কিন্তু ধর্ম যখন জীবনে মহৎভাব ও উন্নতির পরিপোষক হয় তখন জীবনে অপরিহার্য হইয়া উঠে। এমনি করিয়া—অনুরূপা দেবী হিন্দুধর্মের আদর্শের সকলদিক গুলি ও তাহার অন্তর্নিহিত সত্য সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। মহানকে মহান ভাবে, আদর্শকে আদর্শ হিসাবে দাঁড় করাইয়াছেন—এই খানেই তাঁহার তথা কথিত প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির প্রারম্ভিক ইতিহাস। মন্ত্রশক্তি, পথহারা, মা, বাগদত্তা, পোষাপুত্র, জ্যোতিহারার মধ্যে তাহারই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে সমাজ জীবনে এই সকল প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থিত হইয়াছিল এবং তাহাদের এক নায়কত্বের কর্তৃত্বের প্রতি যে সন্দেহ ও প্রশ্ন দেখা দিয়াছিল, আত্মবিকাশের পথে বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছিল—অনুরূপা দেবী তাহারই একটি প্রতিবাদ। আদর্শের পায়ে আত্ম-সমর্পন করিয়া লাঞ্ছনা সহ্য করিবার মত ক্ষমতার যে মহত্ত্ব আছে, স্বাধিকার বিস্তারের দাবীতে ও তৎজ্ঞাত কোলাহলের মধ্যে যেখানে ব্যক্তিগত বিষয়ই সম্মুখবর্তী হইয়া দেখা দেয় সেখানে তাহা যে ক্ষুণ্ণ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবদাস পার্বতীর জন্ত তিলে তিলে আত্ম বিসর্জন করিয়াছিল; পিয়ারীর বাহু আবরণের মধ্যে যে রাজলক্ষ্মী বাঁচিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট অনুভব আমরা পাইয়াছি; সেখানে জীবনের স্বার্থকতা চাওয়া হইয়াছে সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্তনের মধ্যে জীবনের হীনতম অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া; কিন্তু আদর্শের নিকট আত্ম সমর্পন করিয়া নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া আগাইয়া গিয়াও বিন্দুমাত্র আদর্শচ্যুত না হওয়ার মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অনুরূপা দেবীর গ্রন্থ-বলীতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ আছে। তবুও আমরা এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে অক্ষুণ্ণভাবে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাহার অনেকগুলি পুস্তকই ‘রসোত্তীর্ণ’ হয় নাই। “মা” ও “বাগদত্তা” মন্তব্যের অতি প্রাচুর্য্য অথবা ভারাক্রান্ত

হইয়াছে, “পোষাপুত্র” ও “জ্যোতিহারার” চরিত্র বিকাশের সতেজ ক্ষুধা প্রতিহত হইয়াছে।

অনুরূপা দেবীর সমগ্র লেখা পরিধিতে যেমন বিশাল তেমনি গভীর ভাবদ্যোতক। তিনি লিখিয়াছেন বিস্তর, তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা অনেক; তাঁহার ‘মা’ ও ‘অরপূর্ণার মন্দির’ অত্যন্ত জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তা অবশ্য কলাক্ষুণ্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে নাও পারে। তথাপি ইহার দান বঙ্গ সাহিত্যে নিতান্ত অল্প নয়। ইহার তুলনায় নিরুপমা দেবী অনেক কম লিখিয়াছেন; কিন্তু সংঘমে, ভাব গভীরতায় তিনি অনুরূপা দেবীর উচ্চে স্থান পাইবার যোগ্য। তাঁহার দিদির মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং দাম্পত্য মনোমালিন্যের ছবি সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ‘সুর’ অনুরূপা দেবীর সুরের সহিত একই তারে বাধা। নিপুণ শিল্প-কুশলতা, সুস্ব-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ও ভাব গভীরতায় দিদি বঙ্গ সাহিত্যে একটি অতুল্য রত্ন হইয়া আছে।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী “পারের আলো”র আদর্শ হিন্দু বধূর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই আদর্শের ঠিক বিপরীত বস্তুতাত্ত্বিকতা প্রধান চিত্র সীতা ও শান্তাদেবীর গ্রন্থ গুলির মূখ্য বিষয়। গ্রন্থের নায়িকারা অতি আধুনিক; তাহারা আদর্শের ধার ধারেন না; অধিকাংশ স্থলেই গরীবের মেয়ে স্কুল মাষ্টারী করিয়া বা অন্য প্রকার উপ-জীবিকা আহরণোপযোগী কার্যে লিপ্ত থাকিয়া পুরুষের কর্মক্ষেত্রে সমান ভাবে অবতীর্ণ হইয়া দ্বন্দ্ব সঙ্কল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। “সেখানে কিন্তু Romanticism এর আতিশয্য নাই, আছে জীবনের ধূলিধূসর বাস্তবতার রূঢ় সত্যরূপ। জীবনের অনেকখানি স্থানেই ব্যর্থতার বিফল। সেই জন্ত জীবনে যৌবনের মুকুল কি প্রকারে প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বেই ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার ইতিহাস বর্তমান। এতদ্ব্যতীত সমাজের নানাপ্রকার বৈষম্য থাকায় সহর জীবনের পথে যে অকারণ জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও তাহাদের লেখনী এড়াইয়া যায় নাই। সীতা দেবীর রচনার মধ্যে বজ্রমনি, ছায়াবাঁথি, আলোর আড়াল, ও বস্তা উচ্চাদের। শান্তা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ “চিরন্তনী” বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে একটি উজ্জল রত্ন।

উপন্যাস-সাহিত্যে মহিলারা যে পরিমাণে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, ছোটগল্প রচনায় ও তেমনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন। সীতা দেবীর, প্রভাবতী দেবীর, আশালতা-দেবীর, শৈলবালা ঘোষজায়ার, ও অত্যাশ্রয় মহিলাদের ছোটগল্প “টেকনিক” ও শিল্পকলার দিক দিয়া একান্ত উপভোগ্য ও অনবদ্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জয়শ্রী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী ও অত্যাশ্রয় মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় গল্প, রচনা ও রসচিত্রে যথেষ্ট পরিবেশ থাকে।

শিশুসাহিত্যে নিঃসন্দেহে সুখলাতা রাও, প্রিয়দর্শনা দেবী ও জাহানারা বেগম চৌধুরী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহাদের হস্তস্পর্শে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সুন্দররূপে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একটি বিষয়ে তাহাদের আসন সম্পূর্ণরূপে শূন্য। নাটক বঙ্গ সাহিত্যে আজিও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও গিরীশচন্দ্রের পর আরও কয়েকজন ঐক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করিলেও বিশ্বসাহিত্যে তাহার স্থান খুব উচু নয়। এ ক্ষেত্রে নারীজাতি শিল্পনৈপুণ্যের

কোনই দাবী করিতে পারে না। তাহার কারণও অবশ্য যথেষ্ট বিদ্যমান। নারীজাতির স্বাধীনতা ও জীবনের পরিচয় সেদিনের; কাজেই নাটক—বাহা জীবনের “Interpretation”—তাহার সম্যক পরিপুষ্টি আশা করিতে পারা যায় না।

রচনার প্রারম্ভে যে নৈরাশ্রের সূচনা হইয়াছিল তাহা যে অধিকাংশেই অমূলক তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্পর্শে যে সাহিত্য নব জীবন লাভ করিয়াছিল, দেখা গেল ঠিক তাহারই পাশাপাশি একটি বিশাল স্রোত স্বর্ণকুমারী হইতে সীতা, শান্তাদেবীর সংস্পর্শে দ্বিগুণতর সার্থকতায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। নবযুগের সূচনা হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর যে তাহা নানা ফলপুষ্পে সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাণীমন্দিরের পূজা কেবলই পুরুষভক্তের নৈবেদ্য-নিবেদনে সম্পূর্ণ হইতে পারে না; যথা সময়ে নারী সে বিষয়ে অবহিত হইয়া যে অধ্যাসক্তার নহিয়া গিয়াছেন তাহাতে স্বয়ং বাগ্‌দেবীও আশ্চর্য্যান্বিতা না হইয়া পারিবেন না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচনার সাহায্য করিয়াছে :—

- | | |
|---|--|
| ১। অমরুপা দেবীর গ্রন্থাবলী। | ২। নিরুপমা দেবীর গ্রন্থাবলী। |
| ৩। কামিনী রায়ের—আলোছায়া প্রভৃতি। | ৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস। |
| ৫। নিরুপমা দেবীর—গোধূলী। | ৬। শশাঙ্কমোহন সেনের—বঙ্গবাণী। |
| ৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। | ৮। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বপতি চৌধুরী। |

শরৎ প্রশস্তি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মিত্র

বঙ্গের শোভা অপূর্ণপ আজি

শরতের রাগী এসেছে ;

কুসুম ফুটায়ে কুঞ্জ কাননে

বিমোহন সাজে সেজেছে।

গাছে গাছে ফুল নাহি ধরে আর

পাখীরা গাহিছে গান,

দোয়েল, কোয়েল সকলেই গাছে

সেকি প্রাণময় তান !

আকাশেতে মেঘ ভেসে ভেসে যায়

বরে মাঝে মাঝে জল ;

সরিৎ-সায়রে কুমুদ কল্লার

ফুটে শত শতদল।

প্রান্তর হ’তে আনন্দ-সঙ্গীত

বাতাসে ভাসিয়া আসে ;

দূরে ও নিকটে ক্লেশ ক্লমাকর

দলে দলে চলে চাষে।

ভ্রূংখ দৈগ্ধ বুচিবে এবার

গোলায় তুলিবে ধান ;

জাগিয়া জাগিয়া সোণার স্বপনে

ফুল তাদের প্রাণ।

বাঙলা, বাঙালী মহানন্দে আজ

স্বাগত জানায় শরতে ;

দুর্গতিহারা শিবের জায়াকে

শরতই আনায় মরতে।

দর্পচূর্ণ

বন্দে আলী মিয়া

[ঐতিহাসিক একাক্ষ নাটিকা]

(স্থান বেবিলন সত্ৰাটের দরবার কক্ষ। কাল—
প্রাতঃকাল। সভাসদগণ স্ব স্ব আসনে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে
উপবিষ্ট। ভীমদর্শন গ্রহরীগণ মৃত্তকুপাণ হস্তে দূরে দূরে
দণ্ডায়মান। প্রাসাদের সিংহ-দ্বারে মধুর স্বরে নহবৎ
বাজিতেছে—এই স্থান হইতে তাহার ধ্বনি ঐতিগোচর
হইতেছে।)

মন্ত্রী : মহামান্য সত্ৰাট নমরুদশাহ রাজদরবারে আগমন
করছেন। সভাকবিগণ, সত্ৰাটের অভ্যর্থনা-সঙ্গীত দ্বারা
প্রভাতকালীন রাজ-সভার সূচনা করো।

[সত্ৰাট প্রবেশ করিতে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন
করিলেন।]

সভাকবিগণের সমক্ষে গীত :

জয় বাদশাহ নমরুদ শাহ—
জয় বেবিলন পতি,
বাতাস ঘাঁহার বন্দনা গায়
অরিগণ করে নতি—
আজি প্রভাতের নবীন আলোকে
তঁার যশখ্যাতি ধায় দিকে দিকে
তিনি সবাঁকার পালনকারী গো
প্রজাপুঞ্জের গতি।

সকলে : জয় বেবিলনাধিপতি মহামান্য নমরুদ শাহের
জয়। (ছুইবার)

নমরুদ : সভাসদগণ, দূতমুখে সংবাদ পেয়েছি—এসিয়া
অভিভানে যে দুর্ব্বার সৈন্যদল প্রেরিত হয়েছিলো তারা গ্রীস
তুরস্ক, আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষ জয় করেছে। আজ আমি
অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিশ্বর। আমার বিজয়-নিশান সর্বদেশে উড্ডীন
হয়ে আমার অমিত পরাক্রম সর্বকর্ত্তে ঘোষণা করছে।

মন্ত্রী : যথার্থ জাঁহাপনা। আপনার শৌর্য বীর্য
আপনার দুর্ব্বার শক্তির কথা সমগ্র ধরিত্রী বিদিত। আজ
আপনি সমগ্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

[একজন দরবেশ সভার দ্বার প্রান্তে আসিয়া হাঁক দিবে]

দরবেশ : সর্বশক্তিমান খোদার নামে কিছু ভিক্ষা দিন
জাঁহাপনা।

নমরুদ : সর্বশক্তিমান খোদা নয়—সর্বশক্তিমান আমি।

দরবেশ : এমন পাপ কথা উচ্চারণ করতে নেই। আপনি
তঁার সৃষ্ট সামান্য মানব।

নমরুদ : কে তুই ভিক্ষুক। জানিস, কে আমি ?

দরবেশ : জানি, আপনি সত্ৰাট নমরুদশাহ কিন্তু আপনি
কি জানেন জাঁহাপনা, খোদা এত বিরাট বীর তুলনায়
আপনি ধূলিকণার চেয়েও ক্ষুদ্র।

নমরুদ : মুর্থ ককির, আমি প্রবল পরাক্রান্ত সত্ৰাট
নমরুদ। আমার বিজয়-অভিযান চলেছে দেশ হতে দেশান্তরে ;
আমি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তে তোর শিরশ্ছেদ করতে পারি।
কিন্তু না, তোকে আমি দেখাবো—একমাত্র খোদা আমি—অন্য
খোদা নাই। সমগ্র মানব শুধু আমারই উপাসনা করবে।
উজীর সাহেব।

মন্ত্রী : হুকুম জাঁহাপনা ?

নমরুদ : আপনি রাজ্যমধ্যে প্রচার করে দিন, আমি
সর্বশক্তিমান—সবাঁকার উপাস্ত—আমি খোদা। প্রজারা
আমার প্রতিমূর্ত্তি গঠন করে যেন সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁর পূজা
আরম্ভ করে। যে আমাকে ব্যতীত অন্য খোদার বন্দনা
করবে—সে সবংশে ধ্বংস হবে।

মন্ত্রী : যো হুকুম খোদাবন্দ !

দ্বিতীয় দৃশ্য—

[স্থান—সম্রাট নমরুদের বিশ্রাম কক্ষ। কাল—সায়াহ্]

নমরুদ : আজর !

আজর : হুকুম শাহান্শাহ !

নমরুদ : তুমি আমার বিশ্বাসী ভৃত্য ; কিন্তু তোমার পুত্র এব্রাহিম আমার প্রাসাদে প্রবেশ করে আমারই প্রতিমূর্তি ধ্বংস করেছে। এ স্পর্দ্ধার উপযুক্ত শাস্তি আমি দেবো।

আজর : জাঁহাপনা, দিন-হনিয়ার মালিক, এব্রাহিম বালক—বালকের বুদ্ধি চপল ; তাকে ক্ষমা করুন শাহান্শাহ !

নমরুদ : ক্ষমা ! ক্ষমা নাই। নমরুদ পাষণ—দয়া মায়ামমতা তার নাই। প্রতিহারী !

[প্রতিহারীর প্রবেশ ও কুর্গিশ]

প্রতিহারী : হুকুম খোদারন্দ !

নমরুদ : কোতোয়ালকে আমার হুকুম জ্ঞাপন করো, আজরের পুত্র এব্রাহিমকে অগ্নি-দগ্ধ করে হত্যা করা হবে। এই মুহূর্তেই অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করতে বলা।

প্রতিহারী : হো হুকুম সম্রাট।

আজর : এব্রাহিম, প্রাণাধিক পুত্র আমার !!

(মুচ্ছিত হইয়া পতন।)

= গান =

[দূরে রাজপথ দিয়া গান করিতে করিতে চলিয়া গেল]

ভিখারিনীর গান :

ওরে বেভুল, ভুল করে তুই মরলি মিছে হায়

দীন-হনিয়ার প্রভু খোদা চিনলি নাকো তার।

মন্ত্রী : গবাক্ষ পথে চেয়ে দেখুন জাঁহাপনা রাজপ্রাসাদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কী ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে ! আগুনের লেলিহান শিখা সর্পের ফণার মতো উদ্ভাসিত।

নমরুদ : যথার্থ উজীর সাহেব (দূরে কোলাহল) ওই—ওই দেখুন এব্রাহিমকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবার জন্ত জ্বলাদ নিয়ে যাচ্ছে। উপযুক্ত বিচার হয়েছে ! আমার প্রতিমূর্তি ধ্বংস করার উপযুক্ত শাস্তি। মূর্থ এব্রাহিম, বালক বলে ক্ষমা—হা—হা—হা—! সকলে শিক্ষা লাভ করুক—নরুদের বিরুদ্ধাচরণ করার শাস্তি মৃত্যু।

মন্ত্রী : কী আশ্চর্য্য জাঁহাপনা, এব্রাহিমকে অগ্নিতে

নিক্ষেপ করা হলো কিন্তু তার কেশাগ্রও দগ্ধ হলো না !

নমরুদ : বটে ! অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! কী ভয়ঙ্কর অগ্নি তথাপি এব্রাহিম তার মধ্যে প্রবেশ করেছে অক্ষত ! নিশ্চয়ই বালক যাদু-বিদ্যার দ্বারা আপনাকে রক্ষা করছে। বেইমান—শয়তান, জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বাদ ! এই তরবারির আঘাতে ওর শির দ্বিখণ্ডিত করে দেবো। জ্বলাদ—জ্বলাদ—!

দৈববাণী : নমরুদ !

নমরুদ : কে ? ও কে আমার নাম উচ্চারণ করে ? কই, কেউ তো নাই ! তবে কি শূন্য থেকে দৈববাণী !!

দৈববাণী : নমরুদ, খোদা যাকে রক্ষা করেন তার অনিষ্ট করবার সাধ্য কারো নাই।

নমরুদ : বটে ! খোদা !! খোদাকে আমি হত্যা করবো।

তৃতীয় দৃশ্য

নমরুদ : উজীর সাহেব।

মন্ত্রী : হুকুম খোদাবন্দ !

নমরুদ : আমি শকুনী সংগ্রহ করবার আদেশ দিয়েছিলুম—

মন্ত্রী : সে আদেশ বিস্মৃত হই নি জাঁহাপনা ! শত শত শকুনী সংগৃহীত হয়েছে।

নমরুদ : উত্তম। ওর মধ্যে চারটা শক্তিশালী শকুনী আমার প্রয়োজন। শুনেছি, এব্রাহিমের খোদা নাকি আকাশে থাকে—সেই খোদাকে হত্যা করবার জন্ত এখনি আকাশে যাত্রা করবো।

মন্ত্রী : বহৎ আচ্ছা জাঁহাপনা !

নমরুদ : শুভ্রন উজীর সাহেব, একটা হাওদার চার পাশে শকুনী চারটাকে শক্ত করে বাঁধতে হবে। হুঁসিয়ার, যেন ছিঁড়ে না যায়। তারপর তাদের মাথার ওপরে চারদিকে চার খণ্ড মাংস ঝুলিয়ে দিতে হবে। মাংসের লোভে শকুনীরা ওপরের দিকে উড়ে উঠতে থাকবে। এমন করে আমরা মেঘলোকে প্রবেশ করে খোদাকে হত্যা করে আসবো।

মন্ত্রী : বহৎ আচ্ছা জাঁহাপনা। আপনার বুদ্ধিকে

সহস্রবার ধত্ববাদ। এমন না হলে কেউ খোদা হতে পারে।

নমরুদ : সেনাপতি!

সেনাপতি : হুকুম খোদাবন্দ!

নমরুদ : চারজন স্ত্রীপুণ তীরন্দাজ সেনা আমার প্রয়োজন।

সেনাপতি : বহুৎ আচ্ছা শাহান্‌শাহ।

মন্ত্রী : জাঁহাপনা, আপনার অভিলষিত শকুনী বাহিত আসন ও তীরন্দাজ সেনা প্রস্তুত।

নমরুদ : উত্তম। এইবার তবে আমাদের অভিধান আরম্ভ হোক।

[পাখীগুলি আসন লইয়া ধীরে ধীরে শূন্যে উড়িয়া গেল]

দৃশ্যান্তর

[স্থান—মেঘলোক]

নমরুদ : এই তো মেঘের রাজ্যে এসে পড়েছি। খোদা কোথায় আছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তীরন্দাজগণ চারদিকে তীর নিক্ষেপ করো।

১ম তীরন্দাজ : যো হুকুম জাঁহাপনা।

(চারদিকে ইতস্ততঃ তীর ছুঁড়িতে লাগিল)

২য় তীরন্দাজ : শাহান্‌শাহ, আমরা যে তীরগুলো ছুঁড়েছি সেগুলো রক্তমাখা হয়ে এখানে ফিরে এসেছে।

নমরুদ : তবে আর সন্দেহমাত্র নাই, খোদা নিহত হয়েছে—তার বক্ষ-রক্তে তীরের অগ্রভাগ রঞ্জিত। চলো আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাই।

[নেপথ্যে বহু কণ্ঠের ধ্বনি : ওই আমাদের বাদশা খোদাকে খুন করে ফিরে আসছে। ” “জয় নমরুদ খোদার জয়। ” ইত্যাদি।]

গান

ভিখারিনীর গান :

মদ পেয়ে তুই হলি মাতাল—হুঁস নাইরে তোর

পাঁকের মাঝে ডুবুলিরে তুই—কাটবে কবে ঘোর!

এখনো সময় আছে

ক্ষমা চাও তাঁহার কাছে

সকল ধরার কিছুই তাঁহার নাইকো অগোচর ॥

চতুর্থ দৃশ্য

নমরুদ : স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের অধিপতি আমি নমরুদ। এতাহিমের খোদাকে হত্যা করেছি আমি—আমি সর্বজীবের অধিশ্বর—আমি খোদা। বাদীগণ!

বাদী : আদেশ জাঁহাপনা।

নমরুদ : আনন্দ করো, ক্ষুণ্ণ করো। মুঠি মুঠি হীরা জহরৎ তোমাদের বখশিস।

বাদীদের গীত :

গান

অভিনন্দন লহো গো বীর—ত্রিভুবন জয়ী তুমি

তোমার পরশে হোল পবিত্র

আজি এ মর্ত্যভূমি।

তোমার পরশে হলো পবিত্র আজি এ মর্ত্যভূমি।

[বেগমের প্রবেশ]

বেগম : সন্ধ্যাট।

নমরুদ : বেগম? এসো। কি সংবাদ?

বেগম : তোমার এই স্বর্ণ প্রাসাদের ধন-ঐশ্বর্য—এই মদমত্ত আত্মসত্তারিতার মাঝ থেকে আমার মুক্তি দাও সন্ধ্যাট।

নমরুদ : তুমি কি অসুস্থ বেগম?

বেগম : অসুস্থ আমি নই—অসুস্থ তুমি। তোমার সাম্রাজ্য আজ আমাকে অহরহ দগ্ধ করছে—তোমার অহঙ্কার আমার-বুকে পাষণ হয়ে বসেছে—আমায় মুক্তি দাও।

নমরুদ : একি প্রলাপ উক্তি তোমার বেগম?

বেগম : প্রলাপ! প্রকৃতিস্থ তুমি নও তাই বুঝতে পারছো না। সামান্য মানবের এ-কি অসীম স্পৃহা—আমি তাই তাবুছি—

[দরবেশ দ্বার প্রাপ্ত হইতে হাঁকিলঃ]

দরবেশ : সর্বশক্তিমান খোদার নামে কিছু দান করুন জাঁহাপনা।

নমরুদ : ফকির, তোদের খোদাকে হত্যা করে আজ আমি ত্রিভুবন জয়ী।

দরবেশ : ভুল—ভুল বাদশাহ। তিনি অনন্ত, অসীম, অদৃশ্য। তাঁকে হত্যা করেছেন একথা বাতুল ব্যতীত কেহ বিশ্বাস করবে না। তাঁর সৃষ্ট সামান্য ধূলি কণা থেকেও আপনি ক্ষুদ্র।

নমরুদ : বটে! নগণ্য ভিখারী হয়ে এত স্পর্ধা ভোর। জানিস, শুধু রূপা করেই তোকে এতকাল জীবিত রেখেছি।

দরবেশ : কিন্তু আপনি ও জেনে রাখুন সম্রাট, তাঁরই প্রদত্ত সামর্থ্য লাভ করে আপনি তাঁকেই অস্বীকার করছেন। সামান্য মানব হয়ে খোদাতালাার প্রতিদ্বন্দ্বীতা! এ পাপের ক্ষমা নাই। তিনি ইচ্ছা করলে আপনার রাজ্য, ঐশ্বর্য, শৌর্য, বীর্য এক নিমেষে চূর্ণ করতে পারেন।

নমরুদ : হা—হা—হা, বুধাই তোর এই ভীতি প্রদর্শন। ওরে মূর্থ ফকির, তোদের খোদা যদি জীবিতই থাকে তবে তাকে সৈন্ত সংগ্রহ করতে বল। আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো।

দরবেশ : তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান? বেশ, আপনি আয়োজন করুন—তিনি সর্বদাই প্রস্তুত।

পঞ্চম দৃশ্য

[স্থান—উন্মুক্ত প্রান্তর। কাল অপরাহ্ন।]

(দরবেশ উপাসনারত)

হে খোদা—হে নিখিল বিশ্বের অধিশ্বর, তুচ্ছ মানব অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে—তুমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দাও প্রভু। সে উপলব্ধি করুক এবং পৃথিবীর সকল মানব তাকে দেখে শিক্ষালাভ করুক, ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসীর পরিণাম কি ভয়াবহ। নমরুদ তার অগনিত সৈন্ত নিয়ে এখনি এই স্থানে এসে হাজির হবে—তুমি তোমার সৃষ্ট অতি দুর্বল অতি ক্ষুদ্র প্রাণী দিয়ে নমরুদের সৈন্যদের হত্যা করো প্রভু।

[দূরে নমরুদ-সৈন্যের রণবাদ্য ও বিউগিল ধ্বনি শোনা গেল। সৈন্যগণের ও নমরুদের প্রবেশ।]

নমরুদ : ওহে ফকির, কোথায় তোর খোদার সৈন্ত? কার সঙ্গে যুদ্ধ করবো? [দূরে মশকের ভন্ ভন্ শব্দ]

দরবেশ : ঐ 'কাফ' পর্বতের দিকে চেয়ে দেখুন জাহাপনা।

নমরুদ : ও তো মশক দেখতে পাচ্ছি।

দরবেশ : ওরাই খোদার সিপাহী লস্কর।

নমরুদ : উন্মাদ ফকিরের কথায় বিশ্বাস করে আমিও উন্মাদ হয়ে গেছি। আচ্ছা বেশ, তবে যুদ্ধ আরম্ভ হোক।

দরবেশ : মশকগণ, এইবার তবে বাদশাহের সৈন্তদের আক্রমণ করো।

[রণ-দামামা বাজিতে আরম্ভ হইবে।]

১ম সৈন্ত : উঃ বাবাগো—মলুম গো।

২য় সৈন্ত : রক্ষা করো গো, প্রাণ যায়—মশা নাকের মধ্যে দিয়ে মাথার ভেতর ঢুকেছে।

৩য় সৈন্ত : উঃ, কী কামড়—মরণ কামড় দিচ্ছেরে বাবা, আর সহ করতে পারি না। মাথায় গদা ঠুকি তবু যদি একটু নিস্তার পাই।

(গদার আঘাত)

নমরুদ : কী আশ্চর্য! সৈন্যেরা নিজেদের মস্তকে নিজেরা লগুড়াঘাত করে ভুতলশায়ী হচ্ছে। সেনাপতি।

সেনাপতি : হুকুম খোদাবন্দ।

নমরুদ : এর কারণ কি?

সেনাপতি : সৈন্যদের নাসারন্ধ্রে মশক প্রবেশ করে দংশন শুরু করেছে।

নমরুদ : বটে! মশক দংশন এত অসহ!! সৈন্তগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করছে কেন?

সেনাপতি : প্রাণভয়ে জাঁপনা।

নমরুদ : মশকের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন! বেদ্বিমান, শরতানের দল, ওদের শিরশ্ছেদ করো।

সেনাপতি : একা ওদের রোধ করতে পারি এমন শক্তি আমার নাই জাঁপনা।

নমরুদ : আমারই বেতনভোগী নফর হয়ে আমারই কথা অমান্য—বিশ্বাসঘাতক! তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেব শির। কিন্তু—কিন্তু—সেনাপতি—সেনাপতি, সেনাপতি!

সেনাপতি : হুকুম খোদাবন্দ।

নমরুদ : আমার ও মস্তকে বোধ হয় মশক প্রবেশ করেছে। কী যন্ত্রণা!! সেনাপতি!

সেনাপতি : আদেশ করণ জাঁপনা।

নমরুদ : নিরতিশয় যন্ত্রণা বোধ করছি, আমার প্রমাদে নিয়ে চলে।

দরবেশ : জাঁহাপনা।

নমরুদ : ফকির, এক্ষণে কি প্রয়োজন!

দরবেশ : • খোদাকে যদি হত্যা করেছেন সম্রাট তবে এই মশক-সৈন্য কে পাঠিয়েছেন বলতে পারেন?

নমরুদ : তোমার তত্ত্বকথা শুনবার অবকাশ আমার নাই।

দরবেশ : থাকবে কেন জাঁহাপনা। যে-মশক দেখে অবজ্ঞায় হেসেছিলেন—সেই তুচ্ছ মশকই মস্তকে প্রবেশ করে আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কিন্তু মনে রাখবেন সম্রাট—পৃথিবীর কোনো হেকিম আপনাকে আরোগ্য করতে পারবে না।

—গান—

ওরে বেতুল, পিছন ফিরে দেখরে চেয়ে,

আপন দোষে সব হারালি

অন্ধ রলি চক্ষু পেয়ে ॥

বর্ষ দৃশ্য

[রোগ-শয্যায় শায়িত নমরুদ। হেকিম, বেগম, বাদী ইত্যাদি।

নমরুদ : হেকিম সাহেব।

হেকিম : আদেশ করুন হজুরালী।

নমরুদ : চল্লিশ দিন গত হতে চললো, এ অসহ যন্ত্রণার কিছুমাত্র উপশম তো হলো না। আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে কি এর কোনো ঔষধ নাই?

হেকিম : আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি জাঁহাপনা।

মস্তকে কাঠ খণ্ড দিয়ে আঘাত করা ব্যতীত ইহার দ্বিতীয় উপায় বোধ হয় নাই।

বেগম : সম্রাট, একটি অনুরোধ তুমি রাখবে?

নমরুদ : কী অনুরোধ বলো?

বেগম : তোমার পাপের জন্ত খোদাতা'লার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি ব্যতীত তোমার চিকিৎসকই নাই।

নমরুদ : সাবাধান বেগম, তোমার স্পর্কার উপযুক্ত শাস্তি এখনি পাবে।

বেগম : সম্রাট, তুমি-অন্ধ। এত সাজা ভোগ করেও তোমার জ্ঞান হলো না!

নমরুদ : চল্লিশ দিন তো সামান্য। যদি সারাজীবন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করি তথাপি তোমাদের খোদাকে মানবো না। [দরবেশের প্রবেশ।

দরবেশ : জাঁহাপনা, আপনি খোদাকে মানেন না বটে কিন্তু আপনার এই প্রসাদ, এই গৃহদ্বার, এই বেবিলন নগরী খোদাকে মানেন।

নমরুদ : আবার এসেছো তুমি ফকির?

দরবেশ : এসেছি সম্রাট, ঐ শুহুন—চার্দিক থেকে কি শব্দ উদ্ভূত হচ্ছে।

[শব্দ হইতে থাকিবে : “খোদা এক—খোদা অদ্বিতীয়।”]

নমরুদ : কোতোয়াল!

কোতোয়াল : হুকুম শাহানশাহ।

নমরুদ : এই প্রাসাদ—এই বেবিলন নগরী পুড়িয়ে দাও।

কোতোয়াল : কিন্তু—কিন্তু জাঁহাপনা।

নমরুদ : শরতান, আমার হুকুমের ওপরে কথা! জব্বাদ!

কোতোয়াল : জব্বাদকে ডাকতে হবে না জাঁহাপনা—

আমি আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি।

[অগ্নি সংযোগ করিল]

বেগম : হায়, কি সর্বনাশ হলো গো—!

নমরুদ : চুপ করো বেগম। এরা আমার শত্রু—এদের ধ্বংসের প্রয়োজন হয়েছিলো। আমার সাধের বেবিলন, আমার বিরুদ্ধাচরণ করলি তাই তোর এই শাস্তি।

দরবেশ : বুধাই এ সব পুড়িয়ে দিলেন জাঁহাপনা। আপনার এই দেহ পর্যন্ত খোদাকে স্বীকার করে।

[শব্দ হইতে থাকিবে : “খোদা এক—খোদা অদ্বিতীয়।”]

নমরুদ : বটে! নিজের দেহ পর্যন্ত আমার হুকুম। যাও, নিপাত যাও।

[তরবারির আঘাতে পদদ্বয় ছেদন]

বেগম : হায় হায় সম্রাট, তোমার কি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে! নিজের দেহ নিজে তরবারি দ্বারা বিধ্বস্ত করলে, একটুও মমতা হলো না!

নমস্কার : নীরব হও বেগম, বুঝা চীৎকার কোরো না।

সকলে : (চীৎকার করিয়া) হায় হায়, আমাদের কি

দরবেশ : এখনো খোদার শরণ নিন জাহাপনা—তিনি

সর্বনাশ হলো—আজ আমাদের কি দুর্দিন !

আপনাকে পাগ থেকে মুক্ত করবেন—পরকালে শান্তিতে
রাখবেন।

দরবেশের গান :—

নমস্কার : ও সব বুজুকি আমার কাছে চলবে না

—গান—

ফ—কি—র—

বেগম : কি সর্বনাশ হলো গো, সম্রাট মূর্ছিত হয়ে
পড়েছেন। হেকিম সাহেব !

পাপের খেলা ফুরিয়ে গেল

খোদার কাছে চল এবার,

এক নিমেষে শেষ হলো তোর

অহমিকার অহংকার।

হেকিম : জাহাপনার দেহে প্রাণ নাই মা—তিনি

আমাদের ছেড়ে গেছেন।

—ষবনিকা—

অযোধ্যা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এই কি রামের অযোধ্যা সেই ? অযোধ্যা আর নাই !

রহিয়াছে রামায়ণের এ যেন ছিন্ন মলাটটাই।

ক্ষুদ্র সহর, নাহিক মোটেই প্রাচীনত্বের চিনা,

সন্দেহ হয়, সেই পুরাতন মুক্তিকা আছে কি না ?

কোথায় ভুবন-বিখ্যাত পুরী দেব ও নরের প্রিয় ?

ধ্বংস ও ধার পূজার জিনিষ, পরম দর্শনীয় !

কিছু নাই—চলো, হয়ে গেছে দেখা, পলাইয়া যাই ত্বর,

পিছন ডাকিল পুণ্য সরযু তেমনি কলস্বর।

২

চমকি উঠিল, কে বলিল, যেথা দাড়াইয়া আছ তুমি

জানিয়ে ঋষ্য শৃঙ্গের ভই বিশাল যজ্ঞভূমি।

হেলায় যেখানে করিছ আঘাত হস্ত-যষ্টি দিয়া,

রাজা দশরথ ছিলেন সেখানে সন্মমে দাঁড়াইয়া।

বসিয়া রয়েছে যেখানে, তোমার কেনারা রয়েছে পাতা,

মা কৌশল্যা প্রণাম করিল ওখানে নোয়ায়ে মাথা ;

যেখানে নবীন অশ্বথ তরু একাকী দাঁড়ায়ে, আছে

লক্ষা হইতে পুষ্পক রথ নামিল উহারি কাছে।

যুচে গেল ভ্রম, যুগ-ষবনিকা ধীরে গেল যেন সরি

ভাঙিল নগরী আনন্দময়ী সেই কোশলেশ্বরী।

৩

ভাঙিছে গড়িছে এ পুরীর পরে কতই দালান কোঠা,

প্রতি রেণু এর মহিমাযিত সেই অযোধ্যা গোটা।

ইহারে ঘিরিয়া স্বধা-পরিবেশ দিয়াছেন বায়িকী,

প্রাণময় নয় সকলি ইহার আমি রামময় দেখি।

আনন্দ মোর ধরে না বক্ষে, বুঝিনে পেলাম কি যে

মস্তক মোর নত হয় ভূমে, অঁখি-পাতা উঠে ভিজে।

রবীন্দ্র-প্রতিভা*

শ্রীমদনমোহন নিয়োগী, বি-এ

অনিন্দিত-সুন্দরকান্তি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী। রবীন্দ্র-প্রতিভা কোন একটি ক্ষুদ্র গভীতে সীমাবদ্ধ ছিল না, উহা স্বর্গারশ্মির দ্বারা পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন তাহাই তাঁহার প্রতিভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে এত শোক-সভা আহুত হইয়াছে এবং এত অগণিত ব্যক্তি বক্তৃতা, কবিতা ও প্রবন্ধে তাঁহাদের গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন ভারতবাসীর মৃত্যুতে আজ পর্যন্ত সেরূপ দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার প্রতিভা পৃথিবীর সর্ব দেশ ও জাতিকে একান্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি ছিলেন বাংলার গেটে, বাংলার একাধারে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সেক্সপিয়র ও টলষ্টয়। তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে 'স্পার-ম্যান' বা মহামানব বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, সেইজন্য এই যুগকে রবীন্দ্রযুগ বলিলে মোটেই অতুক্তি করা হইবে না। এত বিভিন্ন বিষয়ে এত অধিক সংখ্যক রচনা পৃথিবীর কোনও লেখক লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি শাখাই তাঁহার দানে পুষ্ট। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, গান প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তাঁহার দান অক্ষুরন্ত। কিন্তু তাঁহার কবি-প্রতিভাই তাঁহাকে বিশ্বের কাছে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি পূর্বেরকার শীর্ণপ্রাণ কাব্য সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া ছিলেন। 'মালঞ্চ', 'শেষের কবিতা' ও 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ তাঁহার কবিত্বপ্রতিভার অপূর্ণ নিদর্শন। তিনি একদিকে ছিলেন 'মিষ্টিক' ও 'রোমান্টিসিষ্ট', অতীতদিকে ছিলেন 'রিয়ালিষ্ট' ও 'জ্যাকুৱালিষ্ট'। তাঁহার ভক্তিমূলক কাব্য 'গীতাঞ্জলি' ও উহার ইংরাজী অনুবাদ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। অপার ভগবৎ-ভক্তি তাঁহার বহু কবিতাতেই দেদীপমান। রবীন্দ্রনাথ সকল ছন্দের অধিকারী হইলেও

'গদ্যছন্দ' নামে এক নূতন ছন্দের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর অনেক কবি এই 'গদ্যছন্দ' অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন।

উপন্যাস রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের সহিত সমান আসনের অধিকারী। 'গোরা' 'চোখের বালি' 'নোকাডুবি' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার উপন্যাস রচনার প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। রবীন্দ্রনাথ বহু উপন্যাসে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বহুবিধ জটিল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে ছোটগল্পের সৃষ্টিকর্তা বলিলে অতুক্তি হয় না। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে ছোট গল্প বলিয়া বড় একটা কিছু ছিল না বলিলেই চলে। 'ক্ষুধিত পাবাণ', 'কাবুলিওয়ালা', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি তাঁহার রচিত অসংখ্য ছোট গল্প বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি প্রধান সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি একদিকে যেমন আমাদের অপার আনন্দ দেয়, 'কখন হাঁসার কখন আবার কাঁদায়,' তেমনি অতীতদিকে ঐগুলিতে বহু শিক্ষণীয় তথ্যের সমাবেশ দেখা যায়। আজ যে বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্য ছোটগল্পে প্রাবৃত, উহাদের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ।

নাটক রচনায় রবীন্দ্র প্রতিভা কোন অংশে কম ছিল না। যদিও রবীন্দ্র রচিত নাটক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই, তথাপি পাঠ্য হিসাবে ঐগুলির মূল্য কম নয়। 'শেষরক্ষা' ও 'চিরকুমার সভা' নাটকে তিনি সুন্দর হাস্যরসের সমাবেশ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ Problem play নামে এক নূতন ধরনের নাটক সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধরনের নাটকের নমুনা তিনি বিংশ শতাব্দীর নাট্য-

* ১লা নভেম্বর তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে আহুত সভায় পঠিত।

কার বার্গার্ডশ, ওয়েলস্, গলসওয়ারদীর নাটকে পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'রাজারাগী' ও 'ডাকঘর' প্রভৃতি কয়েকখানি allegorical নাটকও রচনা করিয়াছেন। তিনি 'বিসর্জন', 'অরূপরতন', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি কয়েকখানি গীতিনাট্য (Dramatic lyric) রচনা করিয়াছিলেন।

তিনি শুধু নাট্যকারই ছিলেন না, তিনি একজন স্নিগ্ধ নটও ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু নাটকে কোনও না কোন চরিত্রের ভূমিকায় তিনি অনেক স্থানে অবতীর্ণ হইতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা সর্বজন বিদিত। তাঁহার স্বমধুর কণ্ঠে গীত তাঁহার রচিত গান শ্রোতার কাণে কি মধুরই শুনাইত, তাহা যিনি তাঁহার গান শুনিয়াছেন তিনিই জানেন।

ইংরাজী সাহিত্য রচনা করিতেও তাঁহার পারদর্শিতার অভাব ছিল না। 'গীতাঞ্জলি' ইংরাজী অনুবাদ করিয়া তিনি বিশ্বসমাজে কবির আসন প্রাপ্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ Talks in China, The hungry stone প্রভৃতি কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলি হইতে দেখা যায় যে ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার কত গভীর দখল ছিল। প্রবন্ধকার হিসাবেও তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। ইহা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ প্রায় দুহাজার গান রচনা করিয়াছিলেন। এগুলির অধিকাংশ এখন ঘরে বাহিরে সর্বত্র বাঙ্গালায় গীত হইতেছে। অন্ধন শিল্পেও তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল এবং তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি অনেক স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে—সেগুলি একটা বৃহৎ ঘরকে পূর্ণ করিত।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের আর একটি বড় দিক আছে। তিনি ছিলেন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, দেশের একনিষ্ঠ সেবক। বাংলাদেশ ও বাংলা দেশবাসীর প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহ ছিল। বাংলার মাটি, বাংলার জল তাঁহার অন্তরকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—

'বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
হে ভগবান!'

বঙ্গভঙ্গ-রহিত করিবার জন্ত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জননায়ক স্বরেন্দ্রনাথ যখন 'settled fact'কে 'unsettle' করিবার জন্ত আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও সেই আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়াছিলেন। স্বরেন্দ্রনাথ ছিলেন কস্মী, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বাধি। সেই যুগে তিনি সঙ্গীত ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বঙ্গবাসীর মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহা ও জাতীয়তা বোধ জাগাইয়া তুলিয়া ছিলেন। ভারতের দুঃস্থ, নিপীড়িত নরনারীর প্রতি তিনি কখনও সহানুভূতি হারান নাই। তাই জালীন্ডলাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি 'শ্রাব' উপাধি পরিহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন মিস্ র্যাথবোন ভারতের নিন্দা করিয়াছিলেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কঠোরভাবে জবাব দিয়াছিলেন। তিনি চাইয়াছিলেন ভারতের বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে একতা আনিতে; কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে একতার অভাবে কোন বড় কাজ করা যায় না, একতাই শক্তি। তাই তিনি হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য জাতিকে একতাহুত্রে আবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন—

এসো হে আর্ধ্য, এসো অনাৰ্য্য; হিন্দু, মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃষ্টান,
এসো ব্রাহ্মণ, গুচি করি মন ধরো হাত সবাংকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার;—

মার অভিষেকে এসো এসো স্বরা,

মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা;

সবার পরশে পবিত্রকরা তীর্থনীরে,

আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল স্বদেশপ্রেমিকই ছিলেন তাহা নহে, তিনি ছিলেন একজন বড় বিশ্বপ্রেমিক। তিনি চীন এবং ভারতের ব্যবধান দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মিলনের সেতুর দ্বারা। জাপান যখন এশিয়াতে নববিধান সৃষ্টিকল্পে চীনের উপর অমানুষিক আক্রমণ ও অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ জাপানী কবি নগুচিকে এই আক্রমণের কুফল জানাইয়া কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আজিকার এই ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের অমানুষিক হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তাঁহার প্রাণ সর্বদাই কাঁদিয়া উঠিত। তাই বলিতেছিলাম, তিনি ছিলেন একাধারে স্বদেশহিতৈষী এবং সমস্ত বিশ্বের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলন ঘটাইবার জন্য বহু চেষ্টাই করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের রচনার মধ্য দিয়া ইংরাজ কবি Kipling রচিত “The east is east, the west is west and the twain shall never meet” পদের অন্তর্নিহিত ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিতে কতক পরিমাণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গ্রাম্য সংস্কারের দিকেও রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল; কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে গ্রামের উন্নতি ভিন্ন জাতির উন্নতি সম্ভবপর নহে। দেশে যাহাতে গ্রাম্য শিল্পের প্রসার হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি শান্তিনিকেতনের নিকট শ্রীক্ষেতন স্থাপন করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই, কিন্তু তিনি যে “বিশ্ব-ভারতী” স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সেটি নিকট ভবিষ্যতে প্রাচ্যের এক অভুলনীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, যে রীতিতে দেশে শিক্ষা দেওয়া হয় সে শিক্ষা মাতৃবের অন্তরবৃত্তিকে

মার্জিত করিতে পারে না। তাই তিনি বোলপুরে প্রাচীন আদর্শে যে অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার যশঃ ইতিমধ্যেই শুধু সমস্ত ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে কবির নাম উচ্চারণে প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয় গর্বে ভরিয়া ওঠে, যে কবি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনিষী, সেই কবি রবীন্দ্রনাথ প্রায় দেড় বারের মধ্যে বাঙ্গালী জাতিকে, তথা বিশ্ববাসীকে, শোক সাগরে ডুবাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মরণের মরিয়াও অমর। কবি বলিয়াছেন যে—

“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।”

সত্যি রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ‘মানবের মাঝে’ বাঁচিয়া থাকিবেন। যতদিন বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন প্রত্যেক বাঙ্গালী তাঁহার কাব্যসিদ্ধি হইতে মধুসূদনের ভাষায় ‘আনন্দে করিবে পান সুখা নিরবধি।’

হান্নোহানা

বেগম জেবু আহমদ

কে দিয়েছে মিষ্টি সুবাস রাতের পরা হান্নোহানা?
কোমল দেহ স্নেহভরে গড়েছে কার হাত দুখানা।
কি মিষ্টি তোর গন্ধ, ওগো ফুলের রাণী হান্নোহানা,
পরীরা সব স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে এসে দেয় কী হানা।
আঁধার যখন ছায় ধরণী কোথায় আছিস্ যায় না জানা
তখনই তো কারসাজি তোর রাতের পরা হান্নোহানা।
পর্দানশীন—তাইতে বুঝি দিনের আলোয় ফুটে মানা
মেলা রাতের পর্দা তলে লুকিয়ে থাকিস্ হান্নোহানা।
লজ্জাশীলা ফুল তুমি যে লাজুক কবির নয় অজানা
মিতালি তাই তোর সাথে তাই আঁধার রাতের হান্নোহানা॥

অদৃষ্ট বিগ্রহ

মনোহর দেহ যাহা কুমি কীট পূর্ণ তাহা
শাশানে সমাপ্তি যার, তাহা তুমি নও হে।
ভাব গ্রাহ মনোময়* হৃদে যাহা লব্ধ হয়,
স্বরূপ হে আমার তাহা, তুমি জ্যোতির্ময়, হে।
“অদৃষ্টবিগ্রহো দেবো ভাবগ্রাহো মনোময়ঃ”

(যোগীষাঙ্কবক্ষ্য)

নিঃসন্তান

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

প্রশান্ত ও আভার বিবাহ হয়েছে আজ দশ বৎসর। প্রশান্তর টাকাকড়ি যথেষ্ট আছে। তার উপর তার স্ত্রীও খুব সুন্দরী—এই সৌভাগ্যের জন্ত বন্ধুদের কাছে মাঝে মাঝে সে একটা হিংসার পাত্র হ'য়ে পড়ত। প্রশান্তর প্রথম জীবনটা কিন্তু নানারকম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কেটেছিল—সে সব কথা খুব কম লোকেরই মনে আছে।

প্রশান্ত ডিগ্রী নিয়ে প্রথমে 'ল কলেজ' ভর্তি হয়। তার পিতা ছিলেন সহরের বেশ একজন সম্ভ্রান্ত লোক—তার ইচ্ছা ছিল প্রশান্ত 'ল' পাশ ক'রে বিলাতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়—কিন্তু তা'র ইচ্ছা আর কার্য্যে পরিণত হ'তে পারল না।

বছর দু' এক পড়বার পর প্রশান্ত কেন যে স্বদেশী আন্দোলনের দিকে মন দেয় তা' আজও কারো জানা নেই। তা'র ফলে তা'কে জেলে যেতে হয়। কিন্তু মৌবনের খেয়ালের এই-ই শেষ নয়। তা'র পিতা ছিলেন রাজভক্ত—গোঁড়া সরকারী পক্ষের লোক। তিনি পুত্রের এ কার্য্যের জন্ত তা'কে ক্ষমা ত করলেনই না, পরন্তু তা'কে ত্যাগ করলেন। প্রশান্ত সেই অবধি পিতার ত্যাক্য পুত্র। প্রশান্ত তা'র পিতার একমাত্র সন্তান হ'লেও তা'কে পিতার অগাধ সম্পত্তির আশায় চিরদিনের জন্ত জলাঞ্জলি দিতে হয়।

জেলে হ'তে মুক্তি পেয়ে তা'কে নূতন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে হয়। অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে পড়ল। উপার্জনের কোন পন্থাই সে দেখতে পেল না। অবশেষে তা'কে বাধ্য হ'য়ে ব্যাঙ্কে ৩০ টাকা মাহিনার একটি কেরানীর চাকুরী জোগাড় করে নিতে হয়। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাকুরী আরম্ভ করল—জগতে তাকে বড় হ'তেই হবে—এই আশায়! প্রশান্ত যে লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছেলে ছিল আর বুদ্ধি যে তা'র সাধারণের অপেক্ষা যথেষ্ট তীক্ষ্ণ এটা কর্তৃপক্ষের নজরে পড়তে বেশী সময় লাগে নি। দিন দিন তা'র পদোন্নতি হ'তে লাগল। তা'র চাকুরীর যখন এই রকম অবস্থা, তখন ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার মারা

গেলেন। কর্তৃপক্ষের তরফ হ'তে প্রশান্তর ডাক পড়ল—প্রশান্ত নিজেই একটু ইতস্তত করতে লাগল।

বোর্ডের মিটিংএ চেয়ারম্যান প্রশান্তকে জেনারেল ম্যানেজারের পদ দিতে রাজী হ'লেন। বোর্ডের সকল মেম্বার এক বাক্যে বললেন, “তোমার উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস”। প্রশান্তর নিজের উপরও বিশ্বাস বড় কম ছিল না। তাই প্রথমে যদিও সে একটু ইতস্তত করছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবটা সামলে নিয়ে সে জেনারেল ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করতে রাজী হ'ল। চেয়ারম্যান শেষে বললেন—“তোমার উপর আমরা অনেকখানি আশা করি প্রশান্ত; আগের ম্যানেজার যা বা সুবিধে পেতেন তা' তুমি সবই পাবে।” প্রশান্ত যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে প্রফুল্ল মনে বাড়ী ফিরে এল। প্রশান্তর এই অভাবনীয় উন্নতিতে অনেকে ঈর্ষা করল, অনেকে আবার সন্দেহনা জানাল। প্রশান্তর এ' সবে বেশী কিছু এসে যায় নি। সামনে তা'র প্রশস্ত ভবিষ্যত—স্থির চিত্তে, অদম্য উৎসাহে, কঠোর পরিশ্রমে তা'কে কাজে লাগতে হবে। পদস্থ চাকুরী পাবার পরই অনেক বড় সরকারী কর্মচারী তাদের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে প্রশান্তর দ্বারস্থ হ'তে লাগল। তারা যেন প্রশান্তর এই জেনারেল ম্যানেজারের চাকুরী পাবার জন্তই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু এত বড় উন্নতির গোড়া শক্ত না করে প্রশান্ত বিবাহ করাটা যুক্তি সম্মত মনে করে নি।

চাকুরীটা যখন তার পাকাপাকি হ'য়ে গেল, প্রশান্ত বিবাহ করল; কিন্তু যৌতুক নিল না কিছুই। লোকে বলাবলি করতে লাগল “অমন ছেলে, ইচ্ছে করলে অনেক টাকাই ত নিতে পারতো, বৌও সুখী পেত!” পরে লোকে আবার শুনে পেল, প্রশান্তর স্ত্রী খুব একজন বড় লোকের মেয়ে ছিল কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পূর্বেই স্ত্রীর পিতার ব্যবসা নষ্ট হ'য়ে যায় এবং অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে পড়ে। তখন সকলে প্রশান্তর সম্বন্ধে নানারকম মতামত প্রকাশ

করতে থাকে। কেহ বলে, হয়ত আগে থেকে কথা হ'য়েছিল, তাই কথা রাখার জন্তই প্রশান্ত বিবাহ করেছে, কিন্তু এই রকম কথা রাখার স্বার্থকতা তারা খুব বেশী দেখেন না, ইত্যাদি। কেহ বলেন, কোন রকম প্রণয় ঘটিত ব্যাপার হবে, হয়ত—আজকালকার ছেলেদের ব্যাপারই ওই। এই রকম নানা কথা কানাকানি হ'তে লাগল। মেয়ে মহলে ত এই কথাটা খুব একটা আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল। প্রশান্ত ব্যতীত আর কেহই—কিন্তু জানত না তার এই সুন্দরী স্ত্রী আভাকে ঘরে আনতে তাকে কত কষ্ট ও ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছে। আভার পিতার ব্যবসা নষ্ট হবার জন্তই আভার পিতামাতা এক রকম জোর করে আভাকে রাজী করিয়েছে—প্রশান্তর মত ছেলের সঙ্গে আভার বিবাহ না হলে তারা হয়ত পথে বসত। প্রশান্ত আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। যে দিন সে আভাকে প্রথম ঘরে আনে সে দিন আভার আনত জলভরা চোখ ছাড়া কেমন যেন একটা ভীতি ভাব সে লক্ষ্য করেছিল।

(২)

দশ বৎসর হ'ল প্রশান্ত ও আভার বিবাহ হয়েছে। প্রশান্তর সমবয়সীরা সকলেই আজ বিবাহিত—সকলেই পুত্র কন্তার পিতা। এর মধ্যে আবার অনেকের অবস্থা স্বচ্ছল নহে কিন্তু তাদের ঘরেই পুত্র কন্তার সংখ্যা কিছু বেশী। অনেকের সংসার আবার এমন যেন অচল হয়েও কোন রকমে চলে যাচ্ছে। প্রশান্তর অবস্থা খুবই স্বচ্ছল, তার নিজের বাড়ী আছে;—গাড়ীতে ছাড়া তাকে পথে বড় একটা দেখা যায় না। অনেকগুলো চাকর বামুন; এর উপর বৎসর বৎসর তার মাহিনা বেড়ে চলছে। বৎসরের মধ্যে দু'বার সে ও তার স্ত্রী হাওয়া বদলাতে যায় (যদিও স্বাস্থ্য তাদের ভালই)। প্রশান্তর সবই আছে—কিন্তু সবার মাঝেই তার একটা বড় অভাব আছে, সে নিঃসন্তান। নিঃসন্তান হয়ে প্রশান্ত যে কত বড় দুঃখী তা তার বন্ধুবান্ধবেরা কি করে জানবে? তার কোন কিছুই স্থখের হৌত না, বাড়ীতে একটা ফুটফুটে ছোট ছেলে কিংবা মেয়ে নেই বলে। “নিঃসন্তান হলে জীবনটা সম্পূর্ণ হয় না।” এই পুরাণ প্রবাদটি প্রশান্তর মনে বড় খোঁচা

দিত। তার উন্নতির জন্ত সে এত খাটে কেন? এত অগাধ সম্পত্তি সে কার জন্তে রেখে যাবে? বৃদ্ধ বয়সে কি নিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেবে? এই সব প্রশ্ন তাকে দিনের পর দিন চাবুকের মত মারত। সুন্দর একটা সংসার গড়ে তুলবে বলেই ত প্রশান্ত বিবাহ করেছিল। কিন্তু তার কেন এমন হ'ল! সে ত ব্যক্তিগত তুষ্টির জন্ত বিবাহ করে নি। বিবাহের পর হ'তেই ছোট একটা খোঁচা কি খুব কোলে নেবার জন্ত সে কত আশাই না করে এসেছে। কতদিন সে ভেবেছে আজ নিশ্চয়ই আভা সলজ্জ ভাবে তার গুপ্ততম বার্তা তাকে জানিয়ে এত দিনের আকাঙ্ক্ষা তার চরিতার্থ করবে। কিন্তু উঃ! বিধাতার কি নিষ্ঠুর নিয়তি! সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে সে যে আশার রঙিন জাল বুনত, পত্নীর নিকট হ'তে তার কোন আভাষ না পেয়ে তা' ছিঁড়ে একাকার হয়ে যেত। যতই দিন যেতে লাগল, নিরাশার অন্ধকার ততই তাকে গ্রাস করতে লাগল। যে মুহূর্তের আশায় সে ভবিষ্যতের পানে মুখ তুলে চেয়েছিল তা এখনও এল না। প্রশান্ত তার বন্ধু বান্ধবদের প্রায়ই স্ত্রী এবং পুত্র কন্তা সহ নিমন্ত্রণ করতো—তার গোছানো নিরিবিবি সংসারে একটু অগোছানো, একটু বিশৃঙ্খলা আনতে। বন্ধুরা, বন্ধু পত্নীরা যখন বাড়ীর আসবাব পত্র ও তাদের সুন্দর ভাবে গোছানো বস্তুগুলি দেখে প্রশংসায় শত মুখ, প্রশান্ত তখন হয়ত কোন ছোট একটা খোঁচাকে নিয়ে আত্মহারা হয়ে থেলা করছে, কোলে নিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে। যদি কেহ প্রশান্তকে বলতেন—“আপনার বাড়ী সত্যি খুব চমৎকার, এমন সুন্দর সাজানো, এমন সুন্দর আসবাব,—আর যেটি যেখানে রাখলে ভালো দেখায় সেটি ঠিক সেখানেই রয়েছে—আপনারা ভাগ্যবান,” শেষের কথা ছুটি প্রশান্তর মনে গিয়ে খচ করে বিধিত—বড় ব্যথার স্থানটার আঘাত করত। প্রশান্ত উত্তরে বলত—“হ্যাঁ, বস্তুগুলি বেশ ভালই তবে বড় নিরিবিবি; আমাদের আরও লোকের দরকার।” এই বলে সে আভার দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখত যেনি আভা কোন মতে চোখের জল চেপে রেখেছে। এমনি ভাবে প্রশান্তর দিনগুলি কোনক্রমে কেটে যেতে লাগিল।

প্রশান্ত একদিন তার এক বন্ধুর বাড়ী সস্ত্রীক বেড়াতে গেল।

ভদ্রলোকের তিনটি ছেলে মেয়ে; ছোটটিকে ভারী স্নন্দর দেখতে, এক মাথা কঁকড়ানো চুল। তারা গান গেয়ে, নেচে প্রশান্তকে দেখাচ্ছিল। প্রশান্ত কিন্তু সেই খোঁকাঁকে নিয়েই ব্যস্ত; তার সকল উপদ্রব সহ করে সে সুখে মগ্ন! খোঁকাঁও এইরকম একজন বড় সঙ্গী পেয়ে মহা খুসী। কখনও সে প্রশান্তর চুল টেনে দিচ্ছে কখনও বা রিষ্টওয়াচটির টিক্ টিক্ শব্দ শুনে সবিস্ময়ে তার এই সাথীটিকে জিজ্ঞাসা করছে “ঘড়ি? টিক্ টিক্ টিক্”। প্রশান্ত তাকে আদর করে কোলে নিয়ে বলছে “হ্যাঁ ঘড়ি নেবে?” এই বলে শিশুর উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই নিজের হাত হ’তে ঘড়িটা খুলে খোঁকাঁকে দিয়ে দিল। ভদ্রলোক মহা ব্যস্ত হ’য়ে তার হাত হ’তে রিষ্টওয়াচটি কেড়ে নিয়ে এক ধমক দিলেন। প্রশান্ত হাঁসল। ভদ্রলোকের হাত হ’তে ঘড়িটি নিয়ে আবার খোঁকাঁকে দিয়ে দিল। এই দুই বন্ধুর ভিতর যে বয়সের অনেকখানি তফাৎ তা কারোই মনে হোল না। তখন আমোদ প্রমোদে দুইবন্ধু একেবারে মগ্ন হয়ে রইল।

আভা ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছে কিন্তু মাঝে মাঝে সেও স্বামীর এই ছোট ছেলের সঙ্গে খেলা আড়চোখে দেখছিল। যদি তার বাড়ী ও এরকম শিশুদের কলহাস্যে মুগ্ধরিত থাকত, তবে সে কত সুখীই না হত! কিন্তু এ সৌভাগ্য হতে তারা বঞ্চিত। প্রশান্ত হঠাৎ মুখ তুলতেই আভার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সে স্পষ্ট দেখতে পেল আভার বুকের ভেতর কি ঝড় বইছে। তাড়াতাড়ি সে খোঁকাঁটিকে ছেড়ে দিল। ছোট ছেলের মধ্যে ডুরে থাকা যেন আভাকে ভৎসনা করা! কিন্তু কে কাকে ভৎসনা করবে? জগতে কি কেউ জানে কার দোষে তারা আজ নিঃসন্তান। ডাক্তারের সঙ্গে সে পরামর্শ করেছে—কি করা যায়? কি দোষে এ দুর্ভাগ্য? কার দোষে জীবনটা এমনিধারা দুর্ভর হ’য়ে উঠেছে? সে শুধরিয়ে নিয়ে ভাবল, না; না; কারোও দোষ নয়, কেহ দায়ী নয়; তবে কেন...কেন? মহা সমস্যা, কিছুই বোঝা যায় না, কোন উপায়ই নেই! প্রশান্ত মনে মনে একবার অতীত জীবনের প্রতি তাকাল।

(৩)

সে নিষ্কলঙ্ক স্বাস্থ্যবান যুবক... বিবাহের পূর্বে কতবারই বা সে আভাকে দেখেছে? দু’বার কি তিন বার। সেই

প্রথম ছুটির দিনে জামালপুরে একটি স্নন্দর মেয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলছিল। সে বুঝল তারাও বাদলী আর সম্ভবতঃ ছুটিতে এসেছে। সে মেয়েটিকে ভাল ভাবে লক্ষ্য করল। তার কথাও শুনল, কিছুক্ষণ বাদে সে আলাপ করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে ভালবাসল! দুদিন ছায়ার মত তাদের সঙ্গে ঘুরল। তার প্রেমের ঘুমুয়া যেন সহসা কার ইঙ্গিতে জোয়ার এল। দুইদিন পরে তারা তাদের বাড়ী চলে গেল। কিন্তু যৌবনের সেই কয়েকটি চঞ্চল মুহূর্তের স্মৃতি তার জীবনে গভীর ভাবে দাগ বসিয়ে দিল। খেলাঘরের খেলা প্রায়ন্তেই ভেঙ্গে গেল। তার আর ভাল লাগল না—সেও বাড়ী ফিরে এল। সে খবর নিয়ে জানল ভদ্রলোক টাটার এক কারখানায় কাজ করেন আর মেয়েটা তাঁর মেয়ে। তারপর সে আবার তাদের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। তারা ভদ্রতার খাতিরে প্রশান্তকে অভ্যর্থনা করল। মেয়েটার ভেতর একটা গাঙ্গুীর ভাব—প্রশান্তকে দেখে তার বিস্মিত চক্ষু যেন বলল “বিদেশের দৈবাৎ আলাপ কি তোমার আমাদের পরিবারের মধ্যে বৈশেষের অধিকার দিয়েছে?”

প্রশান্ত ফিরে গেল সত্য কিন্তু এক সপ্তাহের ভেতর আভার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করল। সে আভাকে ও আভার পিতাকে খুবই নরমভাবে চিঠি লিখল। আভার সম্মতিই তার প্রার্থনীয় ছিল। আভা মনস্থির করে ফেলল। সে স্নন্দরভাবে এক অপূর্ব দৃঢ়তা নিয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল! প্রশান্ত মনে মনে ভাবল “যাক্ গে...হয়ত আমি তার উপযুক্ত নই।”

সময় কারোর জন্ত অপেক্ষা করে না—সে ঠিক তার আপন কাজ করে যেতে লাগল। ছমাস পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রশান্ত হঠাৎ কাগজে দেখল আভার বাবার ব্যবসা নষ্ট হয়েছে। প্রশান্তর মনে এই সংবাদ এক নূতন অল্পভূতির সৃষ্টি করল। কেমন করে তার ভাগ্য পরিবর্তন হল! সে তাদের টাটার ফিরে গিয়ে নিজেই আবার বিবাহের প্রস্তাব করল। আভার পিতামাতা যেন তাকে দেখে লজ্জায় মিশে গেলেন আর কেমন যেন একটু বিরক্ত হ’লেন। প্রশান্ত বলল যে সে আভাকে সুখে রাখবে, তার বিবাহিত আর অবিবাহিত জীবনের পার্থক্য আর রাখবে না। আভার ভেতর যেন একটা নিরাশার ভাব। আভার পিতা আভার পক্ষ্য নিয়ে বললেন “তুমি অপেক্ষা কর, এক মাস কিংবা দু’মাস, হয়ত দু’মাসও তোমাকে বৈধা ধরে

থাকতে হবে। তুমি ত জান আমরা কি রকম বিপদের মধ্যে পড়েছি, কত দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। আমাদের বিপদের দিনে আমাদের মধ্যে ফিরে এসে সত্যি তুমি তোমার উদারতার পরিচয় দিয়েছে; সকলে ত তোমার মত হয় না ইত্যাদি।

প্রশান্ত পুরা ছ'মাস অপেক্ষা করল। তারপর সে যেন ব্যস্ত হয়েই আবার চিঠি লিখলো। তার চিঠির মধ্যে একটা উৎসাহের সুর ছিল। এইবার আভা তার হ'ল। আভার পিতা লিখলেন, আভা সম্মতি দিয়েছে। প্রশান্তর সঙ্গে আভার শুভ পরিণয় হয়ে গেল।

(৪)

পরে কতকবার সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিবাহের কথা ভেবেছে। প্রথমেই কি তার ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় নি? প্রথম প্রত্যাখানের পর কেন সে তার সকল আশায় জলাঞ্জলি দিলে না? হয়ত সে আভারই মত সুন্দরী, শান্ত আর বড় ঘরের মেয়ে পেত যে তাকে সম্পূর্ণ সুখী করতে পারত। এই চিন্তায় ডুবে গেলে তার মন এক অব্যক্ত বেদনায় ভরে যেত। কেমন করে আস্তে আস্তে তার প্রেমের যমুনায় ভাটা পড়তে শুরু হল, তা সে জানতেও পারল না। কেমন করে তার চোখের সম্মুখের রঙ্গিন কাঁধের স্থানে কাল কাঁচ এসে উপস্থিত হল, তা সে জানতে পারল না। আগে সে রঙ্গিন কাঁচের ভেতর দিয়ে পৃথিবী দেখত সুন্দর, তার আশা ভরসাকে দেখত উজ্জ্বল, আভার সঙ্গে তার পরিণয় সম্বন্ধ দেখত অপূর্ণ। কিন্তু এখন সে সবই অন্ধকার দেখে। অনেক রকম চিন্তা ছ' করে এসে তার মনকে তোলপাড় করে দেয়।

আভা কি তার বিবাহের আগেই এই অশান্তির আভাস পেয়েছিল, আর হয়ত সেই জন্যই সে সম্মত হয় নি। সে কি ভেবেছিল যে তার স্বামীকে সে সুখী করতে পারবে না, সে সারা জীবন নিঃসন্তান থাকবে?

তাহা হলে সমস্ত আভার দোষ?

প্রশান্ত মাঝে মাঝে চিন্তায় পাগল হয়ে যেত! সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর গভীর রাতে যখন সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকত তখন অসীম করুণা আর বেদনায় হৃদয় মথিত হয়ে

উঠত। দরজা খোলবার আগে সে দাঁড়িয়ে শুনত যে কোন চাপা কান্নার শব্দ কানে আসে কি না। তাহার পর শান্ত হয়ে চোরের মত চুপে চুপে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত— আভার স্বাভাবিক নিঃশ্বাস শুনে সে সাহসনা পেত; আর ভোরে তার ভালবাসা ও স্নেহের দানে মগ্নিত চুষন করে আভাকে ঘুম হতে জাগাত। আবার আভা যখন তার প্রতিদান প্রাণ দিয়ে দিত, প্রশান্তর তখন মনে হোত, আভার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। যখন আভা তার দৈনন্দিন কাজে লাগত, প্রশান্ত তার গৃহপ্রবেশের দিনে আবেগ নিয়ে তাকে তার নিতানুতনতার জন্য আদর করত। কিন্তু বাড়ীতে আর কেহ যদি থাকত—এই কথাটি তার মন হ'তে যেন মুছে যেত না।

(৫)

গ্রীষ্মের এক স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় প্রশান্ত অফিস হতে ফিরে চিন্তাগ্রস্ত মনে সোজা একেবারে আভার ঘরে ঢুকে পড়ল। অতর্কিতে ধরা পড়ে গিয়ে আভা যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কিন্তু প্রশান্তর চোখে সেটা ধরা পড়ল না! আভা একথানা চিঠি পড়ছিল, প্রশান্তকে দেখেই সেটা কোনরকমে সহজভাবে পড়া শেষ করে ভাঁজ করে ফেলল। প্রশান্ত খুব সহজস্বরেই বলল—“কি, বাড়ীর চিঠি বোধহয়? খবর সব ভাল নিশ্চয়ই এই বলে আদর করবার জন্য প্রশান্ত আভাকে কাছে ডেকে নিতেই, আভা কিরকম চঞ্চল হয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি সে উত্তর দিল—“হ্যাঁ...”

এই বলেই সে প্রশান্তর বুকে মুখ লুকিয়ে নিজেকে সামলে নিল।

প্রশান্ত ঠাট্টার সুরে বলল—“এ যে দেখছি মাসিক পত্রিকা, —লম্বা চিঠি, মাসুল লেগেছে বেশী!”

“তা ত হবেই—তুমিও সময়-সময় যে রকম লম্বা চিঠি লেখো—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল চিঠিই লিখছো” এই বলেই প্রশান্ত খানিকটা খুব হেসে নিল। স্বামীর হাতে চিঠির খাম পর্যন্ত; আভার মুখ ভরে হাঁসের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। প্রশান্ত খাম হাতে খানিকটা চিঠি বার করে দেখল অনেকগুলো কাগজ ভাঁজ করা। উপরের কাগজেই তার শাস্ত্রভীর স্পষ্ট হাতের লেখা। হঠাৎ আভার দিকে চেয়েই প্রশান্তর মনে হোল তার এ কাঁজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না

কাবণ আভা কোনদিন স্বামীর চিঠি পড়ে না—পড়ার আগ্রহ পর্য্যন্ত দেখায় না। এই ভেবেই চিঠির কাগজগুলো তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত থামের মধ্যে পুরে ফেলল। দোষীর স্বরে প্রশান্ত বলল—“মাপ করো, আভা, এ কাজটা আমি ঠিক করছিলাম না...”। আভা ভেতর ভেতর সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল। যতখানি পারে সহজস্বরে বলল—“বাড়ীর চিঠি, বিশেষ দরকারী খবর কিছুই নেই।” কথার মোড় ঘুরিয়ে আভা বলল—“আজ যে বড় তাড়াতাড়ি, অস্থবিস্থ কিছু করেনি ত ?

প্রশান্ত বলল—“না, না, আমি ভাবলাম এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা আজ একটু বেড়াব,—তাই একটু তাড়াতাড়ি চলে এলাম। চল, এখন একটু বেড়াতে যাওয়া যাক্।”

প্রশান্ত কাপড় চোপড় বদলাতে গেল। আভা তাড়াতাড়ি তার ক্যাসবাক্স খুলে একটি সুন্দর কাঠের বাজ্ঞে চিঠিখানা রেখে নিল। নিজের চুলটা তাড়াতাড়ি বেঁধে নিয়ে, কাপড় বদলে তৈরী হয়ে নিল। তারপর দু'জনে বেড়াতে বেড়িয়ে গেল। গ্রীষ্মের সন্ধ্যাটা বেশ লাগল ! (ক্রমশঃ)

শোক

শ্রীমমতা ঘোষ

তোমারে আজ কোন কথাটি কব—
কেমন করে জুড়াব তোর ক্ষত,
সান্ত্বনারি ভাবাই নাহি মেলে—
বুদ্ধি-বিচার আজ যে মূর্ছাগত।
আমার হিয়া প্রবোধ নাহি মানে,
অবুঝ চিত্ত আছড়ে কেঁদে মরে ;
যে গেছে তায় দেখতে চাহে আঁখি,—
তোমার তরে আকুল অশ্রু বারে।
দুঃসহ এই দুঃখেরি ভার তুমি
দূর বিদেশে করছ বহন একা,
কেমন করে কাটছে তোমার দিন
জানতে চাহি, যায় না যে হায় দেখা।
ক্ষণেক সে যে চোখের আড়াল হ'লে
মায়ের পরাণ উঠত আকুল হ'য়ে,—
হারিয়ে গেছে চির কালের মত—
কোথায় গেল কে দেবে আজ ক'রে ?
না-জানারি অন্ধকারের মাঝে
হাতড়ে বেড়াই হারানো সেই ধনে,
কোথাও তারি মেলে না উদ্দেশ—
স্মৃতি শুধু আপন জনের মনে।
তোমার হাতের অক্ষরেরি মাঝে
বারে বারে তোমায় ফিরি খুঁজে,
অস্তরেরি সমস্ত প্রেম দিয়ে
ব্যথা তোমার চাই যে নিতে মুছে।
পারি না যে! তাইতো কঁাদে মন,
সাধ্য কত সীমার মাঝে বাঁধা,

আজকে তোমার দারুণ দুঃখের দিনে
এক সাথেতে হ'ল না হায় কঁাদা।
বর্ষা শুরু হয়েছে এইখানে—
আকাশ-চোখে মেঘের অশ্রু দোলে,
আঁধার করা দিনগুলি যে আরো
সারা হৃদয় কাতর ক'রে তোলে।
এমনি এক শ্রাবণ-শরীরীতে
কান্না মাণিক এল মোদের ঘরে,
সলিল-শিশু সইলনারে তাপ—
গরম হাওয়ায় তাইতো গেল বা'রে।
আসার সময় দেয়নি কিছু ক্রেশ,
যাবার সময় কষ্ট দিল না যে,—
এক দিনেতে হ'ল যে সব শেষ
এই বেদনা বক্ষে তোমার বাজে।
মা হয়েছে—তোমার চিরদিন
চোখে চোখে দেখার আশা মনে,
দেখলে পরে পরাণ ওঠে ভরে—
প্রমাদ গণ ক্ষণেক অদর্শনে
যা ঘটেছে এই হয়েছে ভাল—
পায়নি দুঃখ এই রবে সান্ত্বনা,
ক্লিষ্ট করুণ কাতর মুখের ছবি
দেখনি তার—দেখনি যন্ত্রণা।
ফুটেছিল উজল ফুলের মত—
ছড়িয়েছিল গন্ধ চারিধারে ;
বিধাতা তায় নিলেন তুলে তাই
অলক্ষিতে জীবন-পরপারে।

এষা

(স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উদ্দেশ্যে)

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

হে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মবিদ্যা আয়াসেতে আয়ত্ত করিয়া,
ল জনে জনে নিত্যানন্দ নিত্যসত্যে আপনি চিনিয়া ।
গুপ্ত সাধক তুমি, “গীতায় ঈশ্বরবাদ” ঘোষণা তোমার,
অবতার-তত্ত্বে” সখে, অভিনব তত্ত্বকথা ক’রেছ প্রচার ।
তব নব “প্রেমধর্ম” মোহমগ্ন অ-জাগায় নিয়ত জাগায় ?
অচেতন, সচেতন সম্বিং সন্ধিনী পেয়ে অজস্র ধারায় ।
প্রেমিক বেদান্ত-রত্ন, পাণ্ডিত্যের অন্বনিধি, তুমি অতুলন,
মৃত্যু-সিন্ধুপার হ’য়ে, অ মরণে দেখাইলে নাহিক মরণ ।
হিমাঙ্গির “হিমানীতে” ক’রেছিলে নিমন্ত্রণ একাধিকবার,
যাই নাই ব’লে সখে, অভিমানে ভ’রেছিল হৃদয় তোমার ।
আজ চাই “প্রিয়সঙ্গ” “দিলখুসা”, হিমানীতে” কর নিমন্ত্রণ,
দেখিবে, এবার যা’ব, তিনে এক-হইবারে টুটা’য়ে:বন্ধন ।
তোমরা আজিকে নাই, আছে অফুরন্ত স্মৃতি হে লোক-বন্দিত,
মরলোকে, অমরায়, কীর্তির গাথায় সখে হও হে নন্দিত ।

কেন্দ্র সমিতির কথা

রেলওয়ে সমিতি পরিদর্শন—গত অক্টোবর মাসের প্রথম দিনে কাঠিহার শান্তাহার, এবং সৈয়দপুর রেলওয়ে মহিলা সমিতিগুলির শিরপ্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, এম, এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস, সহ সভানেত্রী মিস্ নীরজবাসিনী সোম, বি, এ, বি, টী, ও মহিলা কর্মী শ্রীযুক্তা স্ববোধবালা ঘোষ বেঙ্গল এবং আসাম রেলওয়ের ওয়েল ফেয়ার অফিসার মিঃ এম, এ, বারি ও তদীয় পত্নী সমভিব্যাহারে উক্ত স্থানগুলিতে গমন করেন । এই অক্টোবর মাসে প্রত্যেক স্থানেই এক একটি সভার আয়োজন হয়, স্থানীয় রেলওয়ের কর্মচারীগণ ব্যতীতও বহু

গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মহিলা সভায় ও উৎসবে বোগদান করেন । ডাঃ নিয়োগী, মিস্ সোম, মিঃ বারী মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য, উপকারিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সমন্বোচিত বক্তৃতা দ্বারা মহিলা সমিতির সভ্যা ও কর্মস্বরূপের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন ।

শান্তাহার মহিলা সমিতিতে একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় । অভিনয়টিও সাধারণের বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল ।

রেলওয়ে সমিতির উন্নতি সাধনে এবং কেন্দ্র সমিতির সহিত উহাদের যোগাযোগ সংরক্ষণে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষতঃ মিঃ বারীর উৎসাহ ও সহায়ত্ব বিশেষ প্রশংসনীয় ।

ঐ মাসে কেন্দ্র সমিতির প্রচারক ঢাকুরিগা মহিলা সমিতি পরিদর্শন করেন ।

ইতিনা মহিলা সমিতির বার্ষিক কার্যবিবরণ

কালের কঠোর ও কঠিন শাসন কোনরূপে এড়াইয়া ইতিনা মহিলা সমিতি আজ দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইল। তাহার এই দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী জীবন কাহিনীর গতানুগতিক পর্যালোচনা আমি আজ করিব না, করিবার মত যোগ্যতা ও অধিকার অর্জিত হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। তাহারই জীবন কাহিনী আলোচনার ও বলিবার বিষয় হইয়া দাঁড়ায় যাহার প্রকৃত জীবন আছে, যাহার সতেজ প্রাণশক্তি সহস্র বাধা বিয় উপেক্ষা করিয়া নিত্য নূতন পথে নূতনভাবে আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে, সত্য ও স্বন্দরের চিরমুক্ত পথে শুধু আপনার সহজ ও স্বচ্ছন্দ অবাধ রাখিতে পারে। কিন্তু সেই অধিকার ও আগ্রহ কোথায়? জীবনী শক্তির অভাব ঘটলে শরীরের কাঠাম হাজার স্বন্দর হইলেও অনতিবিলম্বে তাহা ধ্বংসসূপে পরিণত হয়। বাঁচাইবার বা আগলাইবার মত প্রাণ এখনও যদি ইতিনা মহিলা সমিতির দেহে সঞ্চারিত না হয় তবে এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিবে কে? অতি দ্রুত ও পরিতাপে আজ আমায় বাধ্য হইয়াই একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে আজ বার্ষিক বিবরণীতে বিবরণী কিছুই নাই বলিলেই হয়।

১। আমাদের এই মহিলা সমিতি স্থাপনের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য কেন্দ্র সমিতি পূর্বাগর বিবরণীতে জ্ঞাত আছেন-বিধায় তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। এই মহিলা সমিতির সভ্য সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। বর্তমানে মাত্র ২২ বাইশজন আছেন। বেশীরভাগ সভ্যাই—আন্তরিকতার সহিত সমিতির উন্নতির জন্ত কার্য করেন না।

২। শিশু-মঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল বিষয়ে সমিতির ট্রেণ্ড সভ্যারা উপদেশ দিয়া থাকেন এবং গত বৎসরের ট্রেণ্ড দাইরা ব্যবসা করিয়া থাকে—ইহাতে শিশু মঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল কার্যের উন্নতি দেখা যায়।

৩। গৃহশিল্প শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই, কোন শিক্ষার প্রতি নাই। তবে মহিলারা নিজ নিজ চেষ্টায় কতক কতক শিল্প শিক্ষা করিয়া, কাঁথা মেলাই, পোষাক তৈয়ার, স্বতার আসন তৈয়ার, জামা তৈয়ার, মিঠাই তৈয়ার, ডাইলের বড়ী

দেওয়া, নারিকেল শুপা ইত্যাদি নিজ নিজ বাড়ীতে কিন্ত এইসব জিনিষ বিক্রয় করা হয়না। মহিলাদের তৈরী জন্ত করা হয় না স্বতরাং নহে।

৪। এই পর্য্যন্ত মহিলা সমিতি হইয়াছে কারণ এখানে এইবৎসর স্বাস্থ্য ঋতু সাত মাস ব্যাপী ম্যালেরিয়া জরে আলোচ্য বিষয় ছিল স্বাস্থ্যের উন্নতি, যাহাতে গ্রামের পুরুষ কন্দিরা মহিলা সহানুভূতি প্রকাশ করেন তাহার চেষ্টা।

৫। সমিতির কোন স্থায়ী তাহার কারণ; মহিলারা এক এক মা অধিবেশন করিয়া থাকেন।

৬। সমিতি সম্বন্ধে সাধারণের সহানুভূতি নহে। পুরুষদের সহানুভূতি আদৌ নাই। যে দুই কন্দির সহানুভূতি মহিলা সমিতির উপর ছিল কালের গ্রাসে সমিতি সেই দুইজনকেই হারাইয়াছেন। পুরুষ ও না একত্রে চেষ্টা না থাকিলে কোন কার্যই সূচুভাবে গড়িয়া তোলা যায় না।

৭। সমিতির অধিকাংশ সভাই নিজ নিজ বাড়ীতে সজী বাগান ও ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা নিজ নিজ সংসারের কার্য চালাইয়া থাকেন।

৮। গোপালন ভদ্র মহিলারা নিজ হাতে করেন না। তবে নিম্নশ্রেণীর মহিলারা নিজ হাতে গোপালন করিয়া থাকেন। এই বিষয় সমিতিতে আলোচনা হইয়া থাকে।

৯। বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষা বিধান ও পারিবারিক জীবনে অধিকতর নৈপুণ্য লাভের জন্ত সমিতির সভ্যগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে কিন্তু প্রতি পরিবারে উহার চেষ্টা ও যত্ন নাই। তাই বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না।

বিধবাদের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা সাধ্যায়ত্ত নহে— কারণ—
অর্থাত্ভাব খুব বেশী।

। ইতিনা মহিলা সমিতির প্রথম চেষ্টায় ও সাহায্যে
একটি উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
হা এম, ই, স্কুলে পরিণত হইয়া সরকার হইতে মাসিক

৭৫ টাকা এবং ডিস্ট্রিক্টবোর্ড হইতে মাসিক ৩০ টাকা সাহায্য
পাইতেছে। এ বৎসর এই বালিকা বিদ্যালয় হইতে দুইটি
ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছে।

গ্রামের দুঃস্থ পরিবারদের বাড়ী গিয়া মহিলা সমিতির
সভ্যারা—ব্যারাম, পীড়ায় গুস্তায়া ও পথ্যাপথ্যের সাহায্য করিয়া
থাকেন।

আয়—

ব্যয়—

১৮৭ সালের তহবিল—

দুঃস্থ পরিবারের পথ্যাপথ্য বাবদ

জের—

১২৮১০

ব্যয় হয়—

২১০

১৮৮ সালের একটি বিবাহের সোজ তুলনী

সরোজনলিনী দত্ত বিলুডিস ফাণ্ডে

পাওয়া যায়—

৫

দেওয়া হয়—

১০৮

২৪৮১০

এ্যাফিলিয়েশন

১৯৪২ মে পর্যন্ত—

৭

সমিতির অন্ত্যন্ত ব্যয়—

১১৫

১৬৮৫

ইতিনা মহিলা সমিতির সম্পাদিকা

বিনীতা—শ্রীচারুবালা গুপ্তা

দেয়ালের আড়ালে

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

বুখখানি দেখি তার দেয়ালের আড়ালে,

টুং টুং কি যে শুনি, শুনি কানে ছবেলা,—

একবার সকালে ও একবার বিকেলে।

কি ছার মহয়া-বনে ডেকে মরে কোয়েলা।

দেখি কালো চোখ-ছুটি, দেখি কালো কবরী,

খিল খিল কি যে হুর ভেসে আসে বাতাসে,—

দেখি লাল চোঁট-ছুটি,—মরি মরি আমরি ॥

তালে তালে নাচে যেন বরগাটী আকাশে ॥

কি যে মধু নামে তার, লেখা কি যে আখরে,—

এঁকে দিল নামাবলী মোর ছুটি পাজরে ॥

ফলদীপিকা

শ্রীগণপতি সরকার

পূর্বানুবৃত্তি

পূর্বে যে সকল যোগের কথা বলা হইয়াছে তাহার অবিরোধে এই যোগ বুঝিতে হইবে। (সুত্রক্ষণ্য শাস্ত্র)
এই যোগগুলি ৭ম হইতে গণনীয় অর্থাৎ ৭ম হইতে ৭টি গৃহে পর পর গ্রহগণ থাকিলে বন্ধকী, ৭ম হইতে ৬টিতে থাকিলে
৭ম হইতে ৫টিতে পাশ, ৭ম হইতে ৪টিতে কেদার, ৭ম হইতে ৩টিতে শূল, ৭ম হইতে ২টিতে যুগ, এবং ৭ম হইতে
গোলযোগ।) ॥৩৫॥ (৩৯)।

বন্ধকী বা বন্ধকী বা বীণা যোগফল—নৃত্যগীত প্রিয় ও ধনী।

দাম যোগফল—ভ্যাগী, ভূপতি এবং উপকারী।

পাশ যোগফল—ভোগী, ধনী, সংস্কার ও সদ্ব্যবহৃত।

কেদার যোগফল—শ্রীমান, কৃষিজীবী, ক্ষেত্রযুক্ত ॥৩৬॥ (৪০) ॥

শূল যোগফল—হিংস্র, ক্রোধশীল, দরিদ্র।

যুগ যোগফল—পাশবী ও দ্রব্যহীন।

গোল যোগফল—নিঃস্ব, পাপী, ম্লেচ্ছযুক্ত, কুশিলী, অলস এবং অন্নাগ্নি ॥৩৭॥ (৪১) ॥

লগ্ন বা চন্দ্রের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমে শুভ গ্রহগণ থাকিলে অধিযোগ হয়। অধিযোগে জাত ব্যক্তি নেতা, দীক্ষা ও
ভূপতি হয়। (ইহা চন্দ্র সম্পর্কীয় অধিযোগের ফল)। আর লগ্ন সম্পর্কীয় অধিযোগের ফলে—খ্যাত, শ্রীমান, দীর্ঘজীবী
মনস্বী হয়। (এইরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে যে, চন্দ্রের সপ্তমে, বা ষষ্ঠে বা অষ্টমে শুভ গ্রহগণ থাকিলে যথাক্রমে নেতা
ও ভূপতি হয়। আর এইরূপ লগ্নের ৭মে বা ৬ষ্ঠে বা ৮মে সৌম্য গ্রহগণ থাকিলে যথাক্রমে শ্রীমান, দীর্ঘজীবী
মনস্বী হয়) ॥৩৮॥ (৪২) ॥

“অধিযোগ” জাত ব্যক্তি নরেন্দ্র, স্থিরসম্পদ, বহুবল পোষক, রিপূরণাজয়কারী, চিরায়ু এবং প্রসিদ্ধি
হয় ॥৩৯॥ (৪৩) ॥

কোনও ভাব শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট ও যুক্ত হইবে, উহার অধিপতি উদিত থাকিয়া শুভভাবস্থ হইয়া উচ্চস্থ বা স্বর্গস্থ
হইবে। এইরূপ ভাব ও ভাবপতি লগ্ন হইতে দ্বাদশ ভাব পর্যন্ত পরপর ১ চামর, ২ ধেনু, ৩ শৌর্য, ৪ জলধি, ৫ ছত্র, ৬ অস্ত্র,
৭ কাম, ৮ আশ্রয়, ৯ ভাগ্য, ১০ খ্যাতি, ১১ সুপারিজাত, ১২ মুখ—এই ১২টি যোগ সম্পন্ন করে ॥৪০॥ (৪৪) ॥

চামর যোগফল—সুপর্ণক্ষের চন্দ্রের ত্রায় প্রত্যহ বিশেষ শোভা বৃদ্ধি হয়, কীর্তিমান, জনপতি, চিরজীবী ও
শ্রীমান হয় ॥৪১॥ (৪৫) ॥

ধেনু যোগফল—অন্ন, পান ও বিভবযুক্ত, অখিল বিদ্যাসম্পন্ন, বহু কুটুম্বযুক্ত, স্বর্ণ রত্ন ধনধান্যদ্বারা সমৃদ্ধ, কু
শোভাসম্পন্ন। ৪২ ॥ (৪৬) ॥

শৌর্য যোগফল—কীর্তিমান, অমুজগণ কর্তৃক বিশেষযুক্ত, এবং পালিত, অতি বিক্রমশালী, রামচন্দ্রের ত্রায়
নিরত, অতিদক্ষ ॥ ৪৩ ॥ (৪৭) ॥

জলধি যোগফল—গো-সম্পদ ধনধান্যাদি শোভিত গৃহ, বহু পরিপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ স্ত্রী রত্ন বস্ত্র ভূষণযুক্ত, অত্যন্ত
অধিকারপ্রাপ্ত, স্থির স্বর্থ, হস্তি-অশ্ব-যান প্রভৃতিতে গমনকারী, রাজাদ্বারা সম্মানিত, দ্বিজ ও দেবকর্ষা নিরত এবং পথপার
ও জলসত্র প্রদানকারী ॥৪৪ ॥ (৪৮) ॥

ছত্র যোগফল—সৌভাগ্যলক্ষী সন্তান যুক্ত সংসার, যশস্বী, মিষ্টভাবী, মনীষী, মন্ত্রী রাজপুত্র্য, ধনাঢ্য, এবং উ
যুক্ত ভীষ্ম-বুদ্ধি সম্পন্ন ॥৪৫॥ (৪৯) ॥